বাংলার ছোটগল্প

বাংলার ছোটগল্প

তৃতীয় খণ্ড

সম্পাদনা

ড. বিজিত ঘোষ

প্রজ্ঞা
৯এ নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

BANGLAR CHHOTO GALPA
Collection of Bengali Short Stories
3rd Volume
Edited by
Dr Bijit Ghosh

Price Rs 100/

প্রচ্ছদ ঃ সুনীল শীল

ISBN 81 7332 375 5

দাম ঃ ১০০ টাকা

পুনশ্চ, ১১৪ এন ডাঃ এস সি ব্যানার্জী রোড, কলকাতা - ৭০০০১০ থেকে সন্দীপ নায়ক কর্তৃকপ্রকাশিত এবং ডটলাইন প্রিন্ট অ্যান্ড প্রসেস ১১৪ এন ডাঃ এস সি ব্যানার্জী রোড কলকাতা ৭০০ ০১০ থেকে মুদ্রিত।

'তবু মনে বেখো যদি দূবে যাই চলে।
যদি পুরাতন প্রেম ঢাকা পড়ে যায় নবপ্রেমজালে।
যদি থাকি কাছাকাছি,
দেখিতে না পাও ছায়াব মতন আছি না আছি
তবু মনে বেখো।।
যদি জল আসে আঁখিপাতে,
এক দিন যদি খেলা থেমে যায় মধু রাতে,
তবু মনে রেখো।'

জয়তী-বাদল-কে

প্রাসঙ্গিক কয়েকটি কথা ঃ তৃতীয় খণ্ড

তৃতীয় খণ্ড শুরু করেছি বিশেষ প্রতিভাধর, অসামান্য শক্তিমান, কালজয়ী কথাকোবিদ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে। থেমেছি হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ে এসে।

শরদিন্দুর একটিমাত্র গল্পে কি তৃপ্ত হওয়া আদৌ সম্ভব? মনে পড়ছে তাঁর 'রক্তমুখী নীলা', 'আংটি', 'অমিতাভ'-র মতো অনবদ্য গল্পগুলির কথাও।

অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশীর প্রধান পরিচয় পণ্ডিত, গবেষক এবং সুপ্রাবন্ধিক হিসেবেই। যদিও বেশ কয়েকটি নাটক ও একাধিক উপন্যাসও লিখেছেন তিনি। বিশেষ করে চমৎকার কিছু গল্পের স্রষ্টা হিসেবে প্রমথনাথ বিশীর কথা হয়তো অনেকেই জানেন না। তাঁর লেখা 'ভিক্ষুক-কুকুর-সংবাদ', গাধার আত্মকথা', 'হাতুড়ি' প্রভৃতি অসামান্য ব্যঙ্গাত্মক গল্পগুলির কথা ভোলা যায় না।

এই সঙ্গে মনে পড়ছে শৈলজানন্দের (মুখোপাধ্যায়) 'টিনের গাড়ী', 'ভুতুড়ে খাদ', মনোজ বসুর 'নরবাঁধ' 'বন্যা', 'দুঃখ', 'মানুষ', 'অমানুষ', 'বাস্তুবন্দী', 'চোর', 'নবাববাড়ি', 'বনমমর', শিব্রাম চক্রবর্তীর 'কল্কে কাশির কাণ্ড', 'আপনি কী হারাইতেছেন, আপনি জানেন না', 'হর্ষবর্ধন অদৃশ্য হন', জরাসন্ধের ব্যাঙ', মণীশ (যুবনাশ্ব) ঘটকের 'কালনেমি', 'স্বপ্ন', 'বাক্সিন্দন' ইত্যাদি।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের বিশেষ উল্লেখযোগ্য গল্প তো অসংখ্য। 'মেথর-ধাঙড়', 'মুচি হয়ে শুচি হয়', 'হাড়ি-মুচি-ডোম', 'হাড়ি-হাজরা', 'কাঠ-খড়-কেরোসিন', 'নীরব কবি', 'কালনাগ', 'ট্যাক্সি', 'হাড', 'নুরবানু', 'বাঁশবাজি', 'অরণ্য', 'প্রাচীর প্রান্তর', 'বিবাহিতা', 'অকাল বসন্ত', 'উপজীবিকা', 'সদ্যসূর্যোদয়', 'মুচি', 'চিতা', 'স্বাক্ষর', 'টুটাফুটা', 'কাক', 'যশোমতী', 'ধনধান্য', 'এক-রাত্রি', 'বস্ত্র' ইত্যাদি গল্প সমকালের এক-একটা ঐতিহাসিক দলিল।

এ ছাড়াও মনে পড়ছে সরোজকুমার রায়চৌধুরীর 'সিগারেটের টুকরো', 'আষাঢ়ে গল্পের নমুনা', 'ক্ষুধার দেশের যাত্রী', 'ছন্নছাড়া', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'নিরুদ্দেশ', 'পোনাঘাট পেরিয়ে', 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে', 'সাগর সংগম', 'সংক্রান্তি', 'ভবিষ্যতের ভার', 'জনৈক কাপুরুষের কাহিনী,' 'শুধু কেরাণী,' 'স্টোভ', 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার,' 'মহানগর', 'গল্প', 'হয়তো' প্রভৃতি অনবদ্য গল্পগুলির কথা।

মুজতবা আলীর 'পাদটীকা'; প্রবোধকুমার সান্যালের 'গুহায় নিহত', 'অবৈধ,' 'হরপার্বতী সংবাদ', 'তুচ্ছ', 'ছিছি', 'মোহানা', 'প্রেতিনী', মুক্তিস্নান', 'কামেরাম্যান', 'ঐতিহাসিক', 'বিষ', 'বৈয়াকরণ', সতীনাথ ভাদুড়ীর অপরিচিতা,' 'ঈর্ষা', 'অজা-গড়', 'তলানির স্বাদ,' 'রোগী', 'দিগ্‌ভ্রান্ত', 'একচক্ষু', 'পত্রলেখার বাবা', 'ডাকাতের মা', 'মুষ্টিযোগ', 'গণনায়ক' ইত্যাদি অসামান্য সৃষ্টি।

অজস্র কালজয়ী ছোটগল্পের রচয়িতা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তার মধ্যে 'টিচার', 'শিপ্রার অপমৃত্যু', 'ছোটবকুলপুরের যাত্রী', 'হারাণের নাতজামাই', 'মাসিপিসি', 'শিল্পী', 'মেজাজ', 'প্রাগৈতিহাসিক', 'বাগদীপাড়া দিয়ে', 'দুঃশাসনীয়', 'সর্পিল', 'সরীসৃপ', 'সমুদ্রের স্বাদ', 'শৈলজ শিলা', 'হলুদপোড়া', 'গুণ্ডামী', 'কংক্রীট', একান্নবর্তী', 'আজকাল পরশুর গল্প'-গুলি তো চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

বুদ্ধদেব বসুর 'ঘরেতে ভ্রমর এলো', 'রজনী হলো উতলা', 'সার্থকতা', 'ফেরিওয়ালা', 'হৃদয়ের জাগরণ', 'আদর্শ', 'সুন্দরের জন্ম' গল্পগুলি সমকালে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। জনপ্রিয়তা পেয়েছিল স্বর্ণকমল ভট্টাচার্যের 'হাতেখড়ি'-ও।

লীলা মজুমদারের 'মহালয়ার উপহার' প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য। আশাপূর্ণা দেবী মূলতঃ ঔপন্যাসিক হলেও অসংখ্য প্রথম শ্রেণীর গল্পও রচনা করে গেছেন। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য 'বিপন্ন সুখ', 'জানা ছিল না', 'ইস্পাতের পাত', 'নির্দায়', 'মলাটের সুখ', 'শাস্তি', 'পাসেব ঘর', 'মাটির পৃথিবী', 'অনাচার', 'বন্দিনী', 'হারজিৎ', 'নিখাদ', 'সব জাতি', 'আহত ফণা', 'ইজ্জত', 'অভিনেত্রী', 'আত্মহত্যা', 'ছিন্নমস্তা', 'পৃথিবী চিরন্তনী', 'নিবারণচন্দ্রের শেষকৃত্য' ইত্যাদি।

সোমনাথ লাহিড়ীর 'আইনের তালিম', 'সম্পত্তি', 'কামরু আর জোহরা', সুবোধ ঘোষের 'সুন্দরম্', 'পরশুরামের কুঠার', 'ফসিল', 'গোত্রান্তর', 'জতুগৃহ', 'অলীক', 'কর্ণফুলির ডাক', 'চতুর্ভুজ ক্লাব', 'ভাটতিলক রায়', 'কৌন্তেয়', 'অযান্ত্রিক'-এর কথা কি ভোলা যায়?

হাসিরাশি দেবীর 'বনান্তরাল', বিমল মিত্রের 'রাণীসাহেবা', 'পুরুষমানুষ', 'আমেরিকা', 'জেনানা সংবাদ', 'সাতাশে শ্রাবণ', 'লজ্জা হরণ', 'পুতুলদিদি', 'বাদশাহী', 'ঘরন্তী', জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'তারিণীর বাড়ি বদল', 'খাল পোল ও টিনের ঘরের চিত্রকর', 'হিংসা', 'এক অঙ্কের নাটক', 'সামনে চামেলি', 'বুনোওল', 'ছোটলোক', 'ছিদ্র', 'সমুদ্র', 'শালিখ কি চড়ুই', 'বনের রাজা', 'বিষ', 'চোর', 'গিরগিটি, কমলকুমার মজুমদারের 'জল', 'তেইশ', তাহাদের কথা', 'লুপ্ত পূজাবিধি', 'মতিলাল পাদরী'; সুশীল রায়ের 'রাজা'; হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের 'সাপিনী', অভিনেত্রী'-র মতো বিখ্যাত গল্পগুলিকে গ্রহণ করতে পারিনি, তাবও থেকে অধিক ভালো এঁদের একটি করে গল্প পূর্বেই নির্বাচন করে ফেলেছি বলে।

তৃপ্তির মাঝে এমন অতৃপ্তির রেশ নিয়েই শেষ হয়েছে তৃতীয় খণ্ডটি। এই খণ্ডে গল্পের সংখ্যা ৪০। সময়সীমা ১৮৯৯ থেকে ১৯১৬।

পুনশ্চ ঃ বিশেষ উৎসাহী/আগ্রহী সহৃদয় পাঠকদের জ্ঞাতার্থে কয়েকটি কথা। দশ খণ্ডের 'বাংলার ছোটগল্প' গ্রন্থের **কেবলমাত্র প্রথম খণ্ডেই রয়েছে বাইশ পৃষ্ঠার একটি তথ্যসমৃদ্ধ দীর্ঘ ভূমিকা**। সেখানে আছে বাংলা গদ্যের সূচনা, গদ্যগ্রন্থ, গদ্য-সাহিত্য, আদি-গল্প, গল্প; **ছোটগল্পের আবির্ভাব** ঃ তার **জন্ম ও উৎস** সন্ধান, **সংজ্ঞা** ইত্যাদি বিষয়ের উপব দীর্ঘ আলোচনা।

আছে অসংখ্য ছোটগল্প সৃষ্টির অনিবার্য প্রেরণা হিসেবে অপরিহার্য পটভূমিসমূহের (ভারতবর্ষের বহু বিচিত্র সামাজিক পরিস্থিতি, নানা ধরনের রাজনৈতিক আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-সংঘাত-সংঘর্ষ, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-লাভ, স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের নানাবিধ সমস্যা, সংকট ইত্যাদি) তথ্য ও প্রমাণ সহযোগে বিস্তৃত বিশ্লেষণ।

বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামন্বন্তরে ভেঙে-পড়া বাংলার সমাজ-অর্থনীতি, **দেশভাগ, খণ্ডিত-স্বাধীনতা-প্রাপ্তি, উদ্বাস্তু-স্রোত**, সেই মহা-প্রলয়ের সময়েব জীবন্ত ছবিও (এক-একটি কালজয়ী গল্পের সঙ্গে যে পটভূমির অঙ্গাঙ্গী যোগ) প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় আমি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

আগস্ট-আন্দোলন, ১৯৪৬-এর ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা তথা **'গ্রেট ক্যালক্যাটা কিলিং'** আর ঠিক তারপরই **তেভাগা আন্দোলন**, পববর্তীকালে **'নকশাল আন্দোলন', 'জরুরী অবস্থা'**, বার বার বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির উত্থান, — এ-সব কিছুই বাংলার গল্পকে দিয়েছে নতুন প্রাণ। তারও অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ সেখানে করেছি আমি।

আবার বিভিন্ন সাহিত্য-আন্দোলন (**'কল্লোল', 'শ্রুতি', 'হাংরি জেনারেশন', 'শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্য আন্দোলন,' 'এই দশক', 'নিম সাহিত্য-আন্দোলন', 'নতুন রীতির গল্প আন্দোলন'** ইত্যাদি), লেখক-পাঠক-সম্পাদক-প্রকাশকের ছোটগল্প ব্যাপারে দায়িত্বহীনতা ও দায়িত্বের কথা, সর্বোপরি পাঠকের কাছে সে-কাল ও এ-কালের ছোটগল্পের প্রতি আকর্ষণ-বিকর্ষণের সম্ভাব্য কারণগুলিও বিশ্লেষিত হয়েছে সেই ভূমিকায়।

তাই, উৎসুক শ্রদ্ধেয় পাঠক সেটি একবার দেখে/পড়ে নিলে সম্পাদকের শ্রমের ভার কিছুটা লাঘব হবে।

(ড. বিজিত ঘোষ)

সূচীপত্র

অচিন পাখি

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্যোমকেশ ও আমি গত ফাল্গুন মাসে বীরেনবাবুর কন্যার বিবাহ উপলক্ষে দু'দিনের জন্য কলিকাতার বাহিরে গিয়াছিলাম। শহরটি প্রাচীন এবং নোংরা। কলিকাতা হইতে মাত্র তিন ঘণ্টার পথ। ট্রেন বদল করিতে না হইলে আরও কম সময়ে যাওয়া যাইত।

বীরেনবাবুর সহিত আমাদের দীর্ঘকালের ঘনিষ্ঠতা। তিনি কলিকাতায় পুলিস কর্মচারী ছিলেন। বহুবার বহু সূত্রে তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছি। অতিশয় সজ্জন ব্যক্তি। বছর দুই আগে অবসর লইয়া এই শহরে বাস্তুভিটায় বাস করিতেছেন। কন্যার বিবাহে আমাদের সনির্বন্ধ নিমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন। ব্যোমকেশেরও হাতে কাজ ছিল না। তাই বিবাহের দিন পূর্বাহ্নে আমরা বীরেনবাবুর গৃহে অবতীর্ণ হইলাম।

বিয়ে-বাড়িতে যথাবিহিত কর্মতৎপরতা ও হৈ হৈ চলিতেছে, সানাই বাজিতেছে। বীরেনবাবু ছুটিয়া আসিয়া আমাদেব সম্বর্ধনা করিলেন এবং একটি ঘরে লইয়া গিয়া বসাইলেন। ঘরের মেঝেয় ফরাস পাতা , বরাযাত্রীদের জন্য যথারীতি সাজানো। কিন্তু বর ও বরযাত্রীরা স্থানীয় ব্যক্তি, তাহারা সন্ধ্যার পর আসিবে। উপস্থিত ঘরটি খালি রহিয়াছে।

আমরা তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিলাম। চা জলখাবার আসিল। বীরেনবাবু আমাদের সঙ্গে আলাপ করিতে কবিতে একটু উস্‌খুস্ করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনি কন্যাকর্তা, আজকের দিনে আপনি বসে আড্ডা মারলে চলবে কি করে? যান, কাজকর্ম করুন গিয়ে।'

বীরেনবাবু একটু অপ্রতিভভাবে এদিক ওদিক চাহিতেছেন এমন সময় ঘরের বাহিরে কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'কই হে বীরেন, মেয়ের বিয়ের কি ব্যবস্থা করলে দেখতে এলাম।'

'এই যে দাদা।' বীরেনবাবু তাড়াতাড়ি গিয়া একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোককে ঘরের মধ্যে লইয়া আসিলেন—'ভালই হল আপনি এসে পড়েছেন। এঁরা আমার দুই বন্ধু, কলকাতা থেকে এসেছেন। নাম জানেন নিশ্চয়ই, আমাদেরই দলের লোক। ইনি হলেন স্বনামধন্য ব্যোমকেশ বক্সী, আর উনি সুলেখক অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়।'

'নাম শুনেছি বৈকি।' বলিয়া ভদ্রলোক আমাদের প্রতি তীক্ষ্ণায়ত দৃষ্টিপাত করিলেন।

বীরেনবাবু বলিলেন, 'ইনি হচ্ছেন নীলমণি মজুমদার। পুলিশের নামজাদা অফিসার ছিলেন, এখন রিটায়ার কবেছেন।'

আমরাও ভদ্রলোককে দেখিলাম। গৌরবর্ণ লম্বা চেহারা ; বয়স বোধ করি ষাটের ঊর্ধ্বে কিন্তু শরীর বেশ দৃঢ় আছে , পিঠের শিরদাঁড়া তাঁহার হাতের লাঠির মতই শক্ত এবং ঋজু। মুখ দেখিয়া মনে হয় জবরদস্ত রাশভারী লোক। গলার স্বর গম্ভীর।

ব্যোমকেশ বলিল, 'বসতে আজ্ঞা হোক।'

নীলমণি মজুমদার লাঠিসুদ্ধ হাত তুলিয়া নমস্কার করিলেন এবং আমাদের মুখোমুখি হইয়া উপবিষ্ট হইলেন। বীরেনবাবু বলিলেন, 'নীলমণিদা. আপনারা তাহলে গল্পসল্প করুন, আমি একটু—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি প্রস্থান করুন। কেবল চাকরকে বলে দেবেন যেন তামাক দিয়ে যায়। গড়গড়া দু'টো নিষ্কর্মার মত হাত-পা গুটিয়ে বসে আছে।'

বীরেনবাবু প্রস্থান করিলে ব্যোমকেশ নীলমণিবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনারও কি আদি নিবাস এই শহরে?'

নীলমণিবাবু মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'না। আদি নিবাস ছিল পূর্ববঙ্গে। কিন্তু সে-সব গেছে। রিটায়ার করে বুড়ো বয়সে কোথায় যাব, তাই এখানেই আছি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এখানে আপনাব আত্মীয়-স্বজন আছেন বুঝি?'

নীলমণিবাবু বলিলেন, 'আত্মীয়-স্বজন আমার কেউ নেই। বিবাহ করিনি, সারা জীবন কেবল কাজই করেছি। পুলিসের কাজে একটা মোহ আছে , আমি আমার কাজে সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছিলাম। তারপর যখন রিটায়ার করলাম, তখন এই শহরেই রয়ে গেলাম। এই শহরটার সঙ্গে আমাব একটা নাড়ির যোগ আছে , প্রথম যখন সাব-ইন্সপেক্টর হয়ে পুলিসে ঢুকেছিলাম, তখন এই শহবেই পোস্টেড হয়েছিলাম। আবার রিটায়ার করলাম এই শহর থেকেই।'

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'শহরটার ওপর মায়া পড়ে গেছে আর কি। কতদিন রিটায়ার করেছেন?'

'সাত বছর।'

এই সময় ভৃত্য আসিয়া দুই ছিলিম তামাক দু'টি গড়গড়াব মাথাব উপব বসাইয়া দিযা চলিয়া গেল।

নীলমণিবাবু একটি গড়গড়ার নল হাতে লইলেন, অন্যটি লইল ব্যোমকেশ। কিছুক্ষণ নীরবে ধূমপান চলিল। উৎকৃষ্ট তামাক ; ধূম-গন্ধে ঘর আমোদিত হইয়া উঠিল।

ব্যোমকেশকে প্রথমে দেখিয়া এবং তাহার পরিচয় পাইয়া অনেকেই তাহাকে পরম কৌতূহলের সহিত নিরীক্ষণ করিয়া থাকে। নীলমণিবাবুও তামাক টানিতে টানিতে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার নিবীক্ষণের মধ্যে একটু বিশেষত্ব ছিল। ভক্ত-সুলভ পুলক-বিহ্বলতা একেবারেই ছিল না , বরং তিনি যেন চক্ষু দিয়া ব্যোমকেশকে তৌল করিতেছিলেন, ব্যোমকেশের খ্যাতি ও ব্যক্তিত্বের মধ্যে কতটা সামঞ্জস্য আছে তাহাই ওজন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। নীলমণিবাবু বুদ্ধিজীবী পুলিস কর্মচারী ছিলেন, স্বচক্ষে দেখিয়া মানুষের চরিত্র নির্ণয় করা তাঁহার কাজ ছিল ; পরের মুখে ঝাল খাইবার লোক তিনি নন। তাই ব্যোমকেশকে তিনি নিজের বুদ্ধির নিকষে যাচাই করিয়া লইতে চান।

অবশেষে গড়গড়ার নলটি মুখ হইতে সরাইয়া তিনি যখন কথা বলিলেন, তখন তাঁহার কথার মধ্যেও এই প্রচ্ছন্ন অনুসন্ধিৎসা বক্রভাবে প্রকাশ পাইল। তিনি বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, আপনাকে নিয়ে লেখা রহস্য কাহিনীগুলি সবই আমি পড়েছি। লক্ষ্য করেছি, সব সমস্যাই আপনি সমাধান করেছেন। তাই জানতে ইচ্ছে হয়, আপনি কি কখনো কোনো রহস্যের মর্মোদ্‌ঘাটনে অকৃতকার্য হননি? কখনো কি ভুল করেননি?'

ব্যোমকেশ গড়গড়ার নল আমার হাতে দিয়া সবিনয়ে হাসিল। বলিল, 'কখনো ভুল করিনি এত বড় বলার স্পর্ধা আমার নেই। নীলমণিবাবু, আমি সত্যান্বেষী। ভুল-ভ্রান্তি অনেক করেছি ; এমনও অনেকবার হয়েছে যে অপরাধীকে ধরতে পারিনি। কিন্তু সত্যের সন্ধান পাইনি এমন বোধ হয় কখনো হয়নি। অবশ্য বলতে পাবেন আমি ক'টা বহস্যই বা পেয়েছি। আমার চেয়ে হাজার গুণ বেশি রহস্য ঘটনা নিয়ে কাজ করেছেন আপনি। আপনি যতদিন

চাকরিতে ছিলেন প্রত্যহ দু'চারটে ছোট-বড় কেস নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হয়েছে। আমাকে যদি তাই করতে হত, আমারও অসংখ্য কেস অমীমাংসিত থেকে যেত সন্দেহ নেই।'

ব্যোমকেশের উত্তর শুনিয়া নীলমণিবাবু মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়াছেন মনে হইল। তিনি তখন আবার কথা বলিলেন তখন তাঁহার কণ্ঠস্বরে একটু ঘনিষ্ঠতার সুর ধ্বনিত হইল। তিনি বলিলেন, 'দেখুন ব্যোমকেশবাবু, পুলিসের কাজে অনেক ঝামেলা। চুনোপুঁটির কারবারই বেশি, রুই-কাৎলা কদাচিৎ মেলে। আবার মজা জানেন, ওই চুনোপুঁটিগুলোকেই ধরতে প্রাণ বেরিয়ে যায়, রুই-কাৎলা ধরা খুব শক্ত নয়।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তা বটে। ডাক্তারেরা বলেন শক্ত রোগের ওষুধ আছে, সর্দি-কাশি সারানোই কঠিন। তা—আপনার চারে যে-ক'টি রুই-কাৎলা এসেছে তাদের সকলকেই আপনি খেলিয়ে ডাঙায় তুলেছেন নিশ্চয়।'

নীলমণিবাবু কিছুক্ষণ উত্তর দিলেন না। ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া হাতের নলটি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিলেন। তারপর ব্যোমকেশের দিকে একটি সুতীক্ষ্ণ কটাক্ষ হানিয়া বলিলেন, 'সব মাছই ডাঙায় তুলেছি ব্যোমকেশবাবু, কেবল একটি বাদে। আমার পুলিস-জীবনের শেষ বড় কেস। এই শহরেই ব্যাপারটা ঘটেছিল। কিন্তু কিনারা করতে পারলাম না।'

ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, 'আসামী কে তা জানতে পেরেছিলেন, কিন্তু প্রমাণ পেলেন না?'

নীলমণিবাবু ঈষৎ দ্বিধাভরে বলিলেন, 'একটা লোককে পাকা রকম সন্দেহ করেছিলাম, কিন্তু কিছুতেই তার অ্যালিবাই ভাঙতে পারলাম না। তারপর এমন একটা ঘটনা ঘটল যে সব ওলট পালট হয়ে গেল। সত্যিকার আসামী যে কে সে সম্বন্ধে ধোঁকা আর কাটল না।'

'হুঁ', বলিয়া ব্যোমকেশ আমার হাত হইতে নল লইল এবং তাকিয়ায় ঠেস দিয়া টানিতে লাগিল। নীলমণিবাবু ব্যোমকেশের দিকে চক্ষু স্থির রাখিয়া গড়গড়ায় একটি লম্বা টান দিলেন, তারপর নল রাখিয়া দিয়া বলিলেন, 'আপনি গল্পটা শুনবেন?'

ব্যোমকেশ উঠিয়া বসিল, বলিল 'নিশ্চয়, বলুন না। ভারি চমকপ্রদ গল্প হবে মনে হচ্ছে।'

'চমকপ্রদ কিনা আপনি বিচার করবেন। আমি যা-যা জানি সব আপনাকে বলছি। হয়তো আপনি আসামীকে সনাক্ত করতে পারবেন।' বলিয়া নীলমণিবাবু একটু হাসিলেন।

ইহা শুধু গল্প শুনাইবার প্রস্তাব নয় ইহার অন্তরালে একটি চ্যালেঞ্জ রহিয়াছে। নীলমণিবাবু যেন ব্যোমকেশকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন—এস দেখি, তোমার কত বুদ্ধি প্রমাণ কর।

ব্যোমকেশ কিন্তু রণাহ্বান গায়ে মাখিল না, হাসিয়া বলিল, 'আরে না না, আপনার মত অভিজ্ঞ পুলিস কর্মচারী যার কিনারা করতে পারেনি, আমার দ্বারা কি তা হবে? তবে গল্প শোনার কৌতূহল আছে। আপনি বলুন।'

আমরা নীলমণিবাবুর কাছে সরিয়া আসিয়া বসিলাম। তিনি পকেট হইতে একটা কৌটা বাহির করিয়া এক চিমটি জর্দা মুখে দিলেন। পান নয়, শুধু জর্দা। ইহাই বোধ হয় তাঁহার আসল নেশা।

তিনি গলা ঝাড়া দিয়া গল্প আরম্ভ করিবার উপক্রম করিতেছেন, বীরেনবাবু ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, 'আর এক দফা চা হবে নাকি? মধ্যাহ্ন ভোজনের এখনো বিস্তর দেরি। বিয়ে-বাড়ির ব্যাপার—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আসুক চা। এবং সেই সঙ্গে আর এক প্রস্থ তামাক।'

সম্মুখে চায়ের পেয়ালা এবং বাঁ হাতে গড়গড়ার নল লইয়া আমরা বসিলাম। নীলমণি মজুমদার তাঁহার স্বাভাবিক গম্ভীর গলায় গল্প বলিতে আরম্ভ করিলেন।—

রিটায়ার করিবার বছর তিনেক আগে নীলমণিবাবু এই জেলার সদর থানার কর্তা হইয়া আসেন। তাঁহার তিনটি প্রধান গুণ ছিল ; যে-বুদ্ধি থাকিলে তদন্তকর্মে কৃতকার্য হওয়া যায় সে-বুদ্ধি তাঁহার প্রচুর পরিমাণে ছিল ; তিনি অতিশয় কর্মঠ ছিলেন ; এবং তিনি ঘুষ লইতেন না। শহরটা পুলিস সেরেস্তায় দাগী শহর বলিয়া পরিচিত ছিল ; খুন-জখম এবং আরও নানা প্রকার অবৈধ ক্রিয়াকলাপ এখানে লাগিয়া থাকিত। নীলমণিবাবু পূর্ব হইতে এ শহরের সহিত পরিচিত ছিলেন, শহরের ধাত জানিতেন। তিনি আসিয়া দৃঢ় হস্তে শাসনের ভার তুলিয়া লইলেন।

বছর দেড়েক কাটিয়া গেল। নীলমণিবাবুব সতর্ক শাসনে শহর অনেকটা শান্ত-শিষ্ট ভাবে আছে। নীলমণিবাবুর অভ্যাস ছিল হপ্তায় দু'একবার কাহাকেও কিছু না বলিয়া গভীর রাত্রে সাইকেলে চড়িয়া বাহির হইয়া পডিতেন। শহরের একটা অংশ ছিল বিশেষভাবে অপরাধপ্রবণ ; তাহারই অন্ধকার অলিগলিতে তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতেন , পাহারাওয়ালারা নিয়মিত রোঁদ দিতেছে কিনা লক্ষ্য করিতেন। তাঁহার সাইকেলে আলো থাকিত না , সঙ্গে থাকিত পিস্তল এবং একটি বৈদ্যুতিক টর্চ। প্রয়োজন হইলে টর্চ জ্বালিতেন।

যে-রাত্রির ঘটনাটা লইয়া এই কাহিনীব আবম্ভ সে-রাত্রে নীলমণিবাবু সাইকেল চড়িয়া যথারীতি বাহির হইয়াছেন। নিষুতি রাত, কোথাও জনমানব নাই, রাস্তার আলোগুলো দূরে দূরে মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে। ভদ্র পাড়া যেখানে অভদ্র পাড়াব সঙ্গে মিশিয়াছে সেইখানে আম কাঁঠালের বাগান-ঘেরা কয়েকটা পুরাতন বাড়ি আছে। বাড়িগুলি জীর্ণ, আম-কাঁঠালের গাছগুলি বর্ষীয়ান। পূর্বে বোধ হয় এই স্থান ভদ্রপল্লীর অন্তর্ভুক্ত ছিল, এখন ভদ্রপল্লী ঘৃণাভবে দূরে সরিয়া গিয়াছে ; ক্ষয়িষ্ণু বাড়িগুলি দুই পক্ষের মাঝখানে সীমানা রক্ষা করিতেছে। এখানে যাহারা বাস করে তাহাদের সামাজিক অবস্থাও ত্রিশঙ্কুর মত স্বর্গ ও মর্তের মধ্যবর্তী।

মন্থর গতিতে সাইকেল চালহিয়া এই পাড়ার ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে নীলমণিবাবু দেখিলেন, সম্মুখে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে কয়েকজন লোক একটি মাচার মত বস্তু কাঁধে লইয়া একটি বাড়ির ফটক হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে। তাদের ভাবভঙ্গী সন্দেহজনক।

নীলমণিবাবু জোরে সাইকেল চালাইলেন , কাছাকাছি আসিয়া বৈদ্যুতিক টর্চ জ্বালিয়া লোকগুলার মুখে ফেলিলেন, উচ্চকণ্ঠে হুকুম দিলেন, 'দাঁড়াও।'

চারজন লোক ছিল , তাহারা একসঙ্গে কাঁধ হতে মাচা ফেলিয়া পলায়ন করিল, মুহূর্তমধ্যে অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল। কিন্তু অদৃশ্য হইবার পূর্বে একজনের মুখ নীলমণিবাবু অস্পষ্টভাবে দেখিতে পাইযাছিলেন , সে ওই বাড়িব মালিক সুরেশ্বর ঘোষ।

পলাতকেবা বিভিন্ন দিকে গিয়াছে, নীলমণিবাবু তাহাদের ধরিবার চেষ্টা করিলেন না। তিনি মাচার নিকট গিয়া সাইকেল হইতে নামিলেন, এবং মাচার উপর টর্চের আলো ফেলিলেন।

মাচা নয়, মড়া বহিবার চালি। তাহাতে বাঁধা-ছাঁদা অবস্থায় পড়িয়া আছে একটি স্ত্রীলোকের দেহ। স্বাস্থ্যবতী সধবা যুবতী, দেহে কোথাও আঘাতের চিহ্ন নাই , কিন্তু মৃত।

নীলমণিবাবু হুইসল্ বাজাইলেন। একজন পাহারাওয়ালা কনস্টেবল কাছেপিঠে ছিল, দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিল। প্রতিবেশীরাও ঘুম ভাঙিয়া নিজ নিজ গৃহ হইতে বাহির হইল।

প্রতিবেশীরা সকলেই মৃতদেহ সনাক্ত করিল , সুরেশ্বরের স্ত্রী হাসি। বাড়িতে অন্য কেহ থাকে না, কেবল সুরেশ্বর ও তাহার স্ত্রী হাসি।

নীলমণিবাবু কনস্টেবলকে থানায় রওনা করিয়া দিলেন, তারপব দু'জন প্রতিবেশীকে লইয়া বাড়ি অনুসন্ধান করিলেন। বাড়িটি একতলা হইলেও আকারে ছোট নয়, ছয়খানি ঘর। কিন্তু অধিকাংশ ঘরই ব্যবহার হয় না। দুইটি ঘরে ব্যবহারের চিহ্ন পাওয়া যায় , তন্মধ্যে

একটি শয়নের ঘর। এই ঘরটি বেশ বড়, তাহার দুই পাশে দুইটি খাট। দুইটি খাটেই বিছানা পাতা; একটিতে কেহ শয়ন করে নাই, অপরটি দেখিয়া মনে হয় ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু বাড়িতে কেহ নাই।

বাগানেও কেহ নাই . বড় বড় আম-কাঁঠালের গাছগুলা সাির দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। নীলমণিবাবু প্রতিবেশীদের জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মেয়েটির অসুখ করেছিল কিনা আপনারা জানেন?'

একজন প্রতিবেশী বলিল, 'অসুখ করেনি। আজই বিকেলবেলা ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে বিনোদবাবুর সঙ্গে কথা বলছিল?''

'তাই নাকি! বিনোদবাবু কে?'

'বিনোদ সরকার, সোনারূপোর দোকান আছে।'

ফটকের কাছে ফিরিয়া আসিয়া নীলমণিবাবু দেখিলেন, থানা হইতে দুইজন সাব-ইন্সপেক্টর ও কয়েকজন জমাদার কনস্টেবল প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তিনি অল্প কথায় ব্যাপার বুঝাইয়া দিয়া একজন সাব-ইন্সপেক্টরের সঙ্গে মৃতদেহ হাসপাতালে রওনা করিযা দিলেন, চারজন কনস্টেবল চালি বহিয়া লইয়া গেল।

প্রতিবেশীরা তখনও কেহ চলিয়া যায় নাই, নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করিয়া জল্পনা করিতেছিল। নীলমণিবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মেয়েটির স্বামীর পুরো নাম কি?'

একজন বলিল, 'সুরেশ্বর ঘোষ।'

সে কোথায়?'

প্রতিবেশীরা কিছু বলিতে চায় না ; শেষে একজন অনিচ্ছাভরে বলিল, 'সুরেশ্বর সন্ধ্যের পর খেয়ে-দেয়ে বেরিয়ে যায়, রাত্রি একটা-দেড়টার আগে বাড়ি ফেরে না।'

'কোথায় যায়?'

'শুনেছি কালীকিঙ্কর দাসের দোকানে তাসের আড্ডা বসে, সেখানে যায়।'

'কালীকিঙ্কর দাসের দোকান কোথায়?'

প্রতিবেশীরা ঠিকানা দিল। নীলমণিবাবু তখন জমাদারকে অকুস্থলে বসাইয়া সাব ইন্সপেক্টরকে সঙ্গে লইয়া কালীকিঙ্কর দাসের দোকানের উদ্দেশ্যে চলিলেন। প্রতিবেশীদের বলিয়া গেলেন, 'কাল সকালে আসব, আপনাদের এজেহার নেব।'

কালীকিঙ্করের দোকান সুরেশ্বরের বাড়ি হইতে আধ মাইল দূরে, শহরের নিকৃষ্ট অংশ পার হইয়া যেখানে বাজার-হাট আরম্ভ হইয়াছে সেইখানে। লোহা-লক্কড়ের দোকান। বাজারের এই অংশটির নাম লোহাপটি।

নিষুতি বাজারের ভিতর দিয়া নীলমণিবাবু কালীকিঙ্করের দোকানের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দোকানের সামনে রাস্তার পাশে ভারী ভারী লোহার ছড় গুচ্ছাকারে পড়িয়া আছে। কিন্তু দোকানের দ্বার বন্ধ। নীলমণিবাবু নিঃশব্দ পদে এদিক-ওদিক ঘুরিয়া দেখিলেন, পাশের একটি জানালার ফুটা দিয়া শীর্ণ আলোকরশ্মি বাহিরে আসিতেছে। তিনি সন্তর্পণে জানালার কাছে গিয়া ফুটার মধ্যে চক্ষু নিবিষ্ট করিলেন।

তক্তপোশের উপর ফরাস পাতা ; চারজন লোক বসিয়া নিবিষ্টমনে তাস খেলিতেছে। তাহাদের মাঝখানে ফরাসের উপর কিছু টাকা ও নোট জমা হইয়াছে। বাজি রাখিয়া খেলা চলিতেছে। তিন তাসের খেলা।

সাব-ইন্সপেক্টর সাইকেল লইয়া রাস্তায় দাঁড়াইয়া ছিল। নীলমণিবাবু হাত নাড়িয়া তাহাকে ইশারা করিলেন, সে সাইকেল রাস্তায় শোয়াইয়া দিয়া দ্বারের সামনে গিয়া দাঁড়াইল। নীলমণিবাবু তখন জানালায় টোকা দিলেন।

চারজন খেলোয়াড় একসঙ্গে জানালার দিকে ঘাড় ফিরাইল, চারজোড়া চোখ শঙ্কিত উৎকণ্ঠায় চাহিয়া রহিল ; তারপর একজন এক খামচায় সম্মুখের টাকাকড়ি তুলিয়া লইয়া পকেটে পুরিল।

নীলমণিবাবু কড়া সুরে বলিলেন, 'দোর খোল।'

চারজন মুখ তাকাতাকি করিল, তারপর একজন, গলা উঁচু করিয়া বলিল, 'কে?'

নীলমণিবাবু বলিলেন, 'পুলিস। দোর খোল।'

আবার খেলোয়াড়দের মধ্যে মুখ তাকাতাকি। তারপর একজন, বোধ হয় দোকানের মালিক কালীকিঙ্কর দাস, উঠিয়া গেল। নীলমণিবাবু জানালা হইতে সরিয়া দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। দ্বার খুলিল। রোগা অস্থিসার লোকটা দুইজন ইউনিফর্ম-পরা পুলিস কর্মচারীকে দেখিয়া এক পা পিছাইয়া গেল, 'কে! কি চাই?'

নীলমণিবাবু বলিলেন, 'তুমি কালীকিঙ্কর দাস?'

'হ্যাঁ। কি চাই?'

'এখানে আর কে কে আছে?'

কালীকিঙ্কর ঢোক গিলিয়া বলিল, 'আমার তিনজন বন্ধু আছে।'

নীলমণিবাবু আর বাক্যব্যয় করিলেন না, ইন্সপেক্টরকে সঙ্গে লইয়া দোকানে প্রবেশ করিলেন। পাশে অফিস-ঘরের দরজা, অফিস-ঘরে গিয়া তিনি দেখিলেন, তিনজন খেলোয়াড় তখনও ফরাসের উপর বসিয়া আছে, একজন তাস ভাঁজিতেছে। তিনি কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া সকলকে নিরীক্ষণ করিলেন। সকলেরই বয়স পঁয়ত্রিশ হইতে চল্লিশের মধ্যে, চেহারায় কোনও বৈশিষ্ট্য নাই। কেবল এক ব্যক্তি, যে ব্যক্তি তাস ভাঁজিতেছিল, হাড়ে-মাসে মজবুত গোছের লোক। দেখিয়া মনে হয় এই লোকটাই পালের গোদা।

নীলমণিবাবু প্রশ্ন করিলেন, 'সুরেশ্বর ঘোষ কার নাম?'

মজবুত লোকটি ভুরু তুলিয়া চাহিল, তারপর তাস রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, 'আমি সুরেশ্বর ঘোষ। কি দরকার?' তার স্বর শান্ত ও সংযত।

নীলমণিবাবু একে একে চারজনের দিকে চক্ষু ফিরাইয়া বলিলেন, 'তোমরা দুপুর রাত্রে মড়া নিয়ে ঘাটে পোড়াতে যাচ্ছিলে। ভেবেছিলে একবার পুড়িয়ে ফেলতে পারলে আর কোনো ভয় নেই।'

চারজনের মুখেই অকৃত্রিম বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল। সুরেশ্বর বলিল, 'মড়া! কি বলছেন! কার মড়া?'

নীলমণিবাবু বলিলেন, 'ন্যাকামি করে পার পাবে না। আমি দেখেছি তোমাকে। যে-চারজন মড়া নিয়ে যাচ্ছিল, তুমি তাদের একজন।'

সুরেশ্বর বলিল, 'কবেকার কথা বলছেন?'

'আজকের কথা বলছি। আজ রাত্রি বারোটার কথা।'

'বাজে কথা বলছেন। আজ রাত্রি সাড়ে আটটার সময় আমরা এখানে তাস খেলতে বসেছি, এক মিনিটের জন্যে কেউ বাইরে যাইনি।'

'বটে! সারাক্ষণ তাস খেলেছ! জুয়া?'

তিনজনে ঘাড় চুলকাইতে লাগিল। সুরেশ্বর কিন্তু তিলমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বলিল, 'হ্যাঁ, জুয়া খেলছিলাম। আমরা চার বন্ধু মিলে মাঝে মাঝে খেলি।'

নীলমণিবাবু দেখিলেন এখানে ইহাদের কাবু করা যাইবে না, থানায় লইয়া যাইতে হইবে। বলিলেন, 'আপাতত জুয়া খেলার অপরাধে আমি তোমাদের অ্যারেস্ট করছি। থানায় চল।'

অতঃপর কিছুক্ষণ কথা-কাটাকাটি চলিল, শেষ পর্যন্ত তাহারা থানায় যাইতে রাজী হইল। নীলমণিবাবু বলিলেন, 'যদি জামিন যোগাড় করতে পার, আজ-রাত্তিরেই ছেড়ে দেব।'

রাস্তায় কিছুদূর যাইবার পর সুরেশ্বর বলিল, 'মড়ার কথা কী বলছিলেন? কার মড়া?'

নীলমণিবাবু বলিলেন, 'তোমার স্ত্রীর।'

সুরেশ্বর রাস্তার মাঝখানে দাঁড়াইয়া পড়িল, 'অ্যাঁ! আমার স্ত্রী! কি বলছেন আপনি?'

'বলছি, তোমার স্ত্রী খুন হয়েছে।'

'না না! এসব কি রকম কথা। আমি বিশ্বাস করি না। হাসি। — না, আমি বাড়ি চললাম।'

'বাড়ি গিয়ে কোন লাভ নেই। মৃতদেহ হাসপাতালে চালান দেওয়া হয়েছে।'

থানায় পৌঁছিয়া নীলমণিবাবু চারজনকে হাজতে পুরিলেন। তারপর অফিসে বসিয়া একে একে তাহাদের জেরা আরম্ভ করিলেন। প্রথমে ডাকিলেন সুরেশ্বরকে। সে টেবিলের পাশের একটি চেয়ারে উপবিষ্ট হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি কাজ কর?'

সুরেশ্বর বলিল, 'অনেক রকম ব্যবসা আছে। পাইকিরি ব্যবসা। আমি পয়সাওয়ালা লোক, পুঁচকে দোকানদার নই।'

'বাড়িটা তোমার?'

'হ্যাঁ।'

'কতদিন কিনেছ?'

'পাঁচ ছয় বছর হবে। উনিশ হাজার টাকায় কিনেছিলাম।'

নীলমণিবাবুকে টাকার কথা শুনাইয়া লাভ হইল না, তিনি অটলভাবে প্রশ্ন করিয়া চলিলেন, 'কতদিন আগে বিয়ে করেছিলে?'

'সাত বছর আগে।'

'শ্বশুরবাড়ি কোথায়?'

'এই শহরে।'

'শ্বশুরের নাম কি?'

'দিনমণি হালদার।'

'সে এখন কোথায়?'

'জানি না। সম্ভবত জেলে।'

'জেলে?'

'হ্যাঁ। জেল আমার শ্বশুরের ঘর-বাড়ি।'

'হুঁ। শ্বশুরের সঙ্গে তোমার সদ্ভাব আছে?'

'মুখ দেখাদেখি নেই।'

নীলমণিবাবু কিছুক্ষণ চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া রহিলেন। শেষে বলিলেন, 'বৌয়ের সঙ্গে তোমার সদ্ভাব ছিল?'

একটু দ্বিধা করিয়া সুরেশ্বর বলিল, 'বিয়ের সাত বছর পরে যতটা সদ্ভাব থাকা সম্ভব ততটা ছিল।'

'ছেলে পিলে নেই?'

'না। বৌ বাঁজা।'

নীলমণিবাবু আঙুল তুলিয়া বলিলেন, 'আজ রাত্রি বারোটার সময় তুমি আর তোমার বন্ধুরা মিলে তোমার স্ত্রীর মৃতদেহ বাড়ি থেকে বার করে নিয়ে যাচ্ছিলে, আমি টর্চের আলো ফেলে তোমাকে দেখেছি।'

সুরেশ্বর নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলিল, 'আপনি ভুল দেখেছেন। রাত্রি বারোটার সময় আমি আর আমার বন্ধুরা কালীকিঙ্করের দোকানে বসে তাস খেলছিলাম।'

'হুঁ। তোমার স্ত্রীর স্বভাব-চরিত্র কেমন ছিল?'

'মেয়েমানুষের স্বভাব-চরিত্রের কথা কে বলতে পারে? তবে পাড়া-পড়শীরা বদনাম দিত।'

'কি বদনাম দিত?'

'আমি রাত্রি করে বাড়ি ফিরি। কয়েক মাস থেকে কে একজন নাকি বাগানে এসে হাসির সঙ্গে দেখা করত।'

'স্ত্রীকে এ বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করেছিলে?'

'করেছিলাম। সে বলেছিল সব মিথ্যে কথা।'

'আর কিছু?'

'আর কি। একবার হাসির আলমারি খুলে তার মধ্যে এমন কয়েকটা গয়না দেখেছিলাম যা আমি তাকে দিইনি।'

'কোথা থেকে গয়না এল বৌয়েব কাছে খোঁজ নিয়েছিলে?'

'কি হবে খোঁজ নিয়ে? মেযেমানুষ যদি নষ্ট হতে চায় কেউ তাকে আটকাতে পাবে না।'

'কিন্তু খুন করতে পারে।'

'আমি হাসিকে খুন করিনি।'

নীলমণিবাবু আরও অনেকক্ষণ নানাভাবে জেরা করিলেন, কিন্তু সুরেশ্বরকে টলাইতে পারিলেন না। বরং তাহার ঠোঁট-কাটা স্পষ্টবাদিতা দেখিয়া মনে হয় সে সত্য কথা বলিতেছে।

সুরেশ্বরকে হাজতে ফেরৎ পাঠাইয়া নীলমণিবাবু কালীকিঙ্করকে ডাকিয়া আনিলেন। কালীকিঙ্কবের হাড়-বাহির-করা শবীরের মধ্যে লৌহ কঠিন একটি মন ছিল, নীলমণি অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহা বাঁকাইতে পারিলেন না। চার বন্ধু বাত্রি সাড়ে আটটার সময় তাহাব দোকানে তাস খেলিতে বসিয়াছিল, নীলমণিবাবু আসা পর্যন্ত এক মুহূর্তের জন্যও কেহ বাহিবে যায় নাই, এ কথার নড়চড় হইল না।

অন্যান্য বিষয়ে কিন্তু কালীকিঙ্কর সোজাসুজি উত্তর দিল। সুবেশ্বর তাহার আজীবনের বন্ধু, তাহার ঘরের খবর সবই কালীকিঙ্কর জানে। সুরেশ্ববের অবস্থা আগে ভাল ছিল না, যুদ্ধের বাজারে সে পয়সা করিয়াছে। হাসিকে সে বিবাহ করিয়াছিল গরীব অবস্থায়। হাসির বাপটা ছিল একাধারে চোর এবং বোকা ; চুবি করিয়া ধবা পড়িয়া যাইত এবং জেলে যাইত। হাসির মাযেবও বদনাম ছিল। বস্তিতে বাস কবিলে ভদ্রলোকেব মেয়েরও চালচলন খাবাপ হইয়া যায় ; যেমন দেখিবে তেমনি তো শিখিবে। হাসির বাপ যখন জেলে থাকিত তখন নাকি হাসির মায়ের ঘরে লোক আসিত। সুরেশ্বর যখন হাসিকে বিবাহ করিতে উদ্যত হয, তখন বন্ধুবা সকলেই মানা কবিয়াছিল , কিন্তু সুরেশ্বর কাহারও কথা শুনিল না। তারপব যুদ্ধের বাজারে সুরেশ্বর টাকা করিয়াছে, বাড়ি কিনিয়াছে ; কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তেমন বনিবনাও নাই। সুরেশ্বর বাড়িতে বেশি থাকে না, বাহিবে বাহিবে দিন কাটায়। কিন্তু তাই বলিয়া সে স্ত্রীকে খুন করিয়াছে একথা একেবারেই সত্য নয়। সুরেশ্বর তেমন লোকই নয় । সে ভদ্র সন্তান , জীবনের আরম্ভে অনেক দুঃখ-কষ্ট পাইয়া বস্তিতে থাকিয়া বড় হইয়াছে বটে, কিন্তু তার মনটা খুব উঁচু।

কালীকিঙ্করের বন্ধু-প্রশস্তি শেষ হইলে নীলমণিবাবু জিজ্ঞাসা কবিলেন, 'সুরেশ্বরের শ্বশুর দিনমণি হালদার এখন কোথায়?'

কালীকিঙ্কর বলিল, 'বছর দুই আগে দিনু হালদার জেল থেকে বেরিয়ে এখানে এসেছিল। হাসির মা তখন মরে গেছে। দিনু হালদার দু'তিন দিন মেয়ে-জামাইয়ের কাছে ছিল। একদিন সুরেশ্বরের সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেল। দিনু হালদার কোথায় চলে গেল। তারপব থেকে আর তাকে দেখিনি। বয়স হয়েছিল, জেল খেটে শরীরও ভেঙে পড়েছিল। হয়তো মরে গেছে।'

অতঃপর নীলমণিবাবু কালীকিঙ্করকে ফেরৎ পাঠাইয়া দেবু মণ্ডলকে আনাইলেন। দেবু মণ্ডল কয়লা ও জ্বালানি কাঠের ব্যবসা করে , বিত্তবান ব্যক্তি। সুরেশ্বরের বাল্যবন্ধু, সুখে-দুঃখে নিত্য-সহচর। সুরেশ্বরের স্ত্রীকে খুন করিযা তাহারা পোড়াইতে লইযা যাইতেছিল একথা সর্বৈব মিথ্যা। তাহারা তাস খেলিতেছিল। বন্ধু-পত্নীর চরিত্র সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে সে অক্ষম , তবে হাসি সদ্‌বংশের মেয়ে ছিল না একথা যথার্থ।

দেবু মণ্ডলকে নীলমণিবাবু ভাঙিতে পারিলেন না, নূতন কোনও তথ্যও আবিষ্কৃত হইল না। তিনি অবশেষে বলিলেন, 'শ্মশান ঘাটে তোমার কাঠের আড়ৎ আছে?'

দেবু মণ্ডল থতমত খাইযা বলিল, 'আছে। শহরে দুটো আড়ং আছে, আর শ্মশানে একটা।'

নীলমণিবাবু কুঞ্চিত চক্ষে কিছুক্ষণ তাহার পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, 'এবার সত্যি কথা বলবে?'

দেবু মণ্ডল বলিল, 'সত্যি কথাই বলছি।'

চতুর্থ ব্যক্তির নাম বিলাস দত্ত। ঠিকাদারদের কাজ করে, বিল্ডিং কনট্র্যাক্টর , অতিশয় মিষ্টভাষী ও রসিক। নীলমণিবাবুকে একটি অশ্লীল রসিকতা শুনাইয়া ঘাড় নিচু করিযা জিভ কাটিল। তাস খেলার ব্যাপার সম্বন্ধে কিন্তু তাহার মনে লেশমাত্র সংশয় নাই। নীলমণিবাবু দেখিলেন বিলাস দত্ত যে শ্রেণীর লোক, সে অজস্র মিথ্যা কথা বলিবে কিন্তু কাজের কথা একটিও বলিবে না। তিনি হতাশ হইযা বলিলেন, 'তুমি ঠিকাদার, তোমার অনেক বাঁশ আছে?'

বিলাস দত্ত বলিল, 'বাঁশ! আছে বৈকি, এন্তার বাঁশ আছে। ভারা বাঁধবার জন্যে দরকার হয় কিনা।'

নীলমণিবাবু বলিলেন, 'হুঁ, মড়ার চালি বাঁধবার জন্যেও দরকার হয।'

বন্ধু চতুষ্টয়ের জেরা শেষ করিতে রাত কাবার হইয়া গেল।

পরদিন কিন্তু তাহাদের আর হাজতে আটকাইয়া রাখা গেল না। তাহাদের উকিল জামিন দিয়া তাহাদের খালাস করিয়া লইয়া গেলেন। নীলমণিবাবুর মনে অভ্রান্ত বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, সুরেশ্বর ঘোষ স্ত্রীকে খুন করিয়াছে এবং বাকি তিনজন এই ব্যাপারে লিপ্ত আছে। কিন্তু প্রমাণ নাই , তিনি যাহা চোখে দেখিয়াছেন তাহার কোন সমর্থক নাই , তাহার সাক্ষ্য উকিলের জেরায় উড়িয়া যাইবে। তাই বর্তমানে তিনি তাহাদের নামে খুনের অভিযোগ আনিতে পারিলেন না। কেবল জুয়া খেলার অভিযোগেই তাঁহাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইল।

তিনি কিন্তু খুনের তদন্তে বিরতি দিলেন না। তিনি দুইজন সহকারী লইয়া সুরেশ্বরের প্রতিবেশীদের সঙ্গে দেখা করিলেন, তাহাদের বয়ান শুনিলেন। শেষে বেলা প্রায় একটার সময় সুরেশ্বরের বাড়িতে গেলেন। ফটকে একজন কনস্টেবল পাহারায় ছিল, সে বলিল, সুরেশ্বর বেলা এগারোটা নাগাদ ফিরিয়া আসিয়াছে এবং বাড়িতে আছে।

নীলমণিবাবু গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সুরেশ্বর শয়নকক্ষের একটা খাটে শুইয়া ঘুমাইতেছে। পুলিসের জুতার শব্দে সে রক্তবর্ণ চক্ষু মেলিয়া উঠিয়া বসিল, জড়িত স্বরে বলিল, 'আবার কী চাই?'

নীলমণিবাবু বলিলেন, 'আমরা বাড়ি তল্লাশ করতে এসেছি।'

'করুন তল্লাশ। যা ইচ্ছে করুন।' বলিয়া সে আবার শয়নের উপক্রম করিল। তাহার বোধ হয় বেলা পর্যন্ত ঘুমানো অভ্যাস, তার উপর কাল সারা রাত্রি জাগরণে গিয়াছে, আজ বোধ হয় সারা দিন ঘুমাইবে। কিন্তু—স্ত্রীর মৃত্যুতে তাহার মনে কি একটুও দাগ পড়ে নাই? খুন করুক বা না করুক, এমন নিশ্চিন্ত ভাবে ঘুমাইতেছে কি করিয়া!

যাহোক, নীলমণিবাবু তাহাকে ঘুমাইতে দিলেন না। বলিলেন, 'তোমার স্ত্রীর গয়নাগুলো দেখতে চাই।'

সুরেশ্বর বিরক্ত মুখে উঠিয়া একটা দেয়াল-আলমারির কপাট খুলিল, তাহার একটা তাকে কাপড়-চোপড়ের পেছন হইতে এক থাবা সোনার গহনা বাহির করিল। আটপৌরে গহনা কিছু আছে, তাছাড়া তোলা গহনা। নীলমণিবাবু বলিলেন, 'এর মধ্যে কোন্ গয়না তুমি দাওনি?'

সুরেশ্বর একটা আংটি, এক জোড়া কানের দুল, একটা চুলের কাঁটা বাছিয়া তাঁহার হাতে দিল। এ গহনাগুলি নূতন, ব্যবহৃত হয় নাই।

নীলমণিবাবু সেগুলি নিজের পকেটে রাখিয়া বলিলেন, 'এগুলো আমি রাখছি। পরে ফেরৎ দেব।'

তারপর তাহার সমস্ত বাড়ি ও বাগান তন্ন তন্ন করিলেন, কিন্তু এমন কিছুই পাওয়া গেল না যাহা হইতে হাসির মৃত্যুর কোন হদিস পাওয়া যায়।

বৈকালে সাড়ে তিনটার সময় নীলমণিবাবু সুরেশ্বরের বাড়ির তদন্ত শেষ কবিলেন এবং সহকারীদের ফেরৎ পাঠাইয়া নিজে বিনোদ সরকারের দোকানের দিকে চলিলেন। বাজারেব মধ্যে বিনোদ সরকারের সোনা-রূপার দোকানটা তাঁহার দেখা ছিল, বেশ বড় দোকান, দোকানের মধ্যে কারিগরদের কাজ করিবার কারখানা।

বিনোদবাবু দোকানে ছিলেন, একটি সুসজ্জিত কক্ষে টেবিলের সামনে বসিয়া গড়গড়ায় তামাক টানিতেছিলেন। লোকটির বয়স অনুমান পঞ্চাশ, কিন্তু ভারি শৌখিন মানুষ। গায়ে তসরের পাঞ্জাবি, গিলে করা ফরাসডাঙার ধুতি, গোঁফের উপর-নীচে কামাইয়া অত্যন্ত সূক্ষ্ম করিয়া তোলা হইয়াছে, মাথার সম্মুখ ভাগে এক গোছা চুল তিনদিক হইতে টাকের আক্রমণ কোনমতে ঠেকাইয়া রাখিয়াছে। আকৃতি একটু খর্ব, কিন্তু তদনুপাতে বেশ গোলগাল।

পুলিস দেখিয়া তিনি একটু বিব্রত হইলেন, বলিলেন, 'কি ব্যাপার বলুন তো? আমার দোকানে কি কোন গণ্ডগোল হয়েছে?'

নীলমণিবাবু সামনেব চেয়ারে বসিলেন, বলিলেন, 'না। আপনার কাছে কিছু খবর জানতে এসেছি।'

বিনোদবাবু আতস্থ হইলেন, নীলমণিবাবুর দিকে পানের ডিবা ও জর্দার কৌটা বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন, 'কি খবর?'

নীলমণিবাবু পান লইলেন না, জর্দাব কৌটা হইতে এক চিম্‌টি জর্দা লইয়া মুখে দিলেন, ধীবে ধীবে বলিলেন, 'সুরেশ্বর ঘোষেব স্ত্রী মাবা গেছে আপনি জানেন?'

বিনোদবাবু চেয়ার হইতে প্রায লাফাইয়া উঠিলেন, 'হাসি মারা গেছে! সে কি! কাল বিকেলে যে আমি তাকে দেখেছি।'

'কাল রাত্রে মারা গেছে।'

'বাত্রে! কিন্তু বিকেলবেলা সে তো ভালই ছিল। কিসে মারা গেল? কী হয়েছিল তার?'

'আমাব বিশ্বাস কাল রাত্রে তাকে খুন করা হয়েছে।'

'খুন!' বিনোদবাবু আস্তে আস্তে চেয়ারে বসিলেন, কিছুক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিয়া হঠাৎ টেবিলের উপর প্রচণ্ড চাপড় মারিয়া বলিলেন, 'সুবেশ্বর খুন করেছে। ও ছাড়া আর কেউ নয়।'

'সুরেশ্বরের কিন্তু অকাট্য অ্যালিবাই আছে।'

'থাক অ্যালিবাই, এ সুরেশ্ববের কাজ। সুরেশ্বর আর ওর ওই তিনটে বন্ধু মহা ধূর্ত আব পাজি। ওদের অসাধ্য কাজ নেই।'

নীলমণিবাবু বলিলেন, 'আপনি হাসিকে অনেক দিন থেকে চেনেন?'

'ওকে ছিল তার ছোট বয়স থেকে দেখে আসছি।' তিনি নলটি মুখ হইতে লইয়া কিছুক্ষণ নলের অগ্রভাগ পরিদর্শন করিলেন, একবার নীলমণিবাবুর দিকে চকিত কটাক্ষ

নিক্ষেপ করিলেন ; তারপর হ্রস্ব স্বরে বলিলেন, 'আপনি পুলিস, আপনার কাছে লুকোব না, কম বয়সে আমি একটু—ইয়ে—হাসির মায়ের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল। সে আজ বিশ-বাইশ বছর আগেকার কথা। হাসির বাপটা ছিল হতভাগা চোর, নেশাখোর, জালিয়াৎ। স্ত্রী-কন্যাকে খেতে দিতে পারত না। হাসির মা পেটের দায়ে— কিন্তু সে যাক। বছর কয়েব আগে হাসির মা মারা গেল। মৃত্যুকালে আমাকে ডেকে মিনতি করে বলে গিয়েছিল, হাসিকে তুমি দেখো, জামাইয়ের মন ভাল নয়। —তার মৃত্যু-শয্যার অনুরোধ আমি এড়াতে পারিনি , হাসিকে মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আসতাম। হাসির মা সতীসাধ্বী ছিল না, কিন্তু তার প্রকৃতি ছিল বড় মধুব।'

কিছুক্ষণ আর কোন কথা হইল না। তারপব নীলমণিবাবু বলিলেন, 'তাহলে আপনার সন্দেহ সুরেশ্বরবাবু হাসিকে খুন কবেছে?'

বিনোদবাবু যেন স্মৃতি-সমুদ্রের তলদেশ হইতে উঠিয়া আসিলেন, 'অ্যাঁ! হ্যাঁ, আমাব তাই বিশ্বাস।'

'কিন্তু কেন? মোটিভ কি?'

'দেখুন, সুরেশ্বর যখন হাসিকে বিয়ে করেছিল, তখন তার চালচুলো কিছু ছিল না। তারপর যুদ্ধের বাজারে সে বড়লোক হল। তখন তার উচ্চাশা হল সে ভদ্রসমাজে মিশবে, দশজনের একজন বলে গণ্য হবে। কিন্তু হাসি বেঁচে থাকতে সে-সম্ভাবনা নেই , হাসির মা-বাপের কেচ্ছা শহরে কে না জানে? তাই সুরেশ্বর হাসিকে মেরেছে। এবার নতুন বিয়ে করে ভদ্রলোক হয়ে বসবে।'

'হাসির স্বভাব-চরিত্র কেমন ছিল?'

'হেলাগোলা মেয়ে ছিল, মনে ছল-কপট ছিল না। একটু হয়তো পুরুষ-ঘেঁষা ছিল, ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে থাকত, রাস্তা দিয়ে লোক গেলে ডেকে কথা কইত। কিন্তু তাতেও তাকে দোষ দেওয়া যায় না। পাড়াব মেয়েরা ওর সঙ্গে ভাল কবে কথা বলত না, কেউ বা বাঁকা কথা বলত। হাসিও তো মানুষ, তারও তো কথা কইবার দুটো লোক দরকার। আমি জোব করে বলতে পাবি, অন্য দোষ তার যতই থাক, মন্দ সে ছিল না।'

নীলমণিবাবু কৌটা হইতে আর এক টিপ জর্দা মুখে দিলেন, তারপর পকেট হইতে গহনাগুলি বাহির করিয়া বিনোদবাবুর সম্মুখে রাখিলেন, 'দেখুন তো, এগুলো চিনতে পারেন?'

'হাসির গয়না নাকি?' বলিয়া বিনোদবাবু সেগুলি হাতে তুলিয়া লইলেন, তারপর মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'এ গয়না আমি হাসিকে কখনো পরতে দেখিনি।'

'আপনি কখনো তাকে গয়না উপহার দেননি?'

বিনোদবাবু মাথা নাড়িলেন, 'না। আমি তাকে পুজো আর দোলের সময় একখানা করে শাড়ি দিতাম। গয়না কখনো দিইনি।'

নীলমণিবাবু বলিলেন, 'এ গয়না কি আপনার দোকানে তৈরি?'

বিনোদবাবু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া গহনাগুলি আবার পরীক্ষা করিলেন, বলিলেন, 'না, এ গয়না আমার কারিগরের তৈবি নয়। কিন্তু, দাঁড়ান—' তিনি ঘণ্টি টিপিয়া চাকরকে ডাকিলেন—'রামদয়ালকে পাঠিয়ে দাও।'

চশমা চোখে বয়স্থ কারিগর রামদয়াল আসিলে, তাহার হাতে গহনাগুলি দিয়া বলিলেন, 'দেখ তো, এ গয়না কি আমাদের তৈরি?'

রামদয়াল ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল, ''আজ্ঞে না, এ গয়না কলকাতার কারিগরের তৈরি।'

'আচ্ছা, যাও।'

নীলমণিবাবুও উঠিলেন, গহনাগুলি পকেটে রাখিয়া বলিলেন, 'আজ তবে উঠি, যদি দরকার হয় আবার আসব।'

'যখন ইচ্ছে আসবেন।'

সেদিন সন্ধ্যাকালে নীলমণিবাবু সিভিল সার্জন মেজর বর্মণের বাংলোতে গেলেন। বাংলোতেই অফিস। মেজর বর্মণ দিনের কাজ শেষ করিয়া উঠি-উঠি করিতেছেন, নীলমণিবাবু বলিলেন, 'খবর নিতে এলাম।'

মেজর বর্মণ বলিলেন, 'বসুন। পি এম্ করেছি। রিপোর্ট কাল পাবেন।'

'কি দেখলেন? মৃত্যুর সময়?'

'আন্দাজ রাত্রি দশটা।'

'মৃত্যুর কারণ?'

'যতদূর দেখেছি গায়ে আঘাতের চিহ্ন ছিল না।'

'বিষ-টিষ নাকি?'

মেজর বর্মণ একটি সিগার ধরাইয়া তাহাতে মন্দ-মন্থর টান দিলেন, 'বিষ নয়। বড় আশ্চর্য উপায়ে মেরেছে। আপনার সন্দেহভাজনের মধ্যে মিলিটারি-ম্যান কেউ আছে নাকি?'

নীলমণিবাবু বলিলেন, 'মিলিটারি-ম্যান কেউ নেই। কিন্তু মেয়েটির স্বামী যুদ্ধের সময় মিলিটারি কন্ট্র্যাক্টর ছিল, গোরাদের সংস্পর্শে এসেছে। কী ব্যাপার বলুন?

মেজর বর্মণ বলিলেন, 'মেয়েটির গায়ে আঘাতের চিহ্ন বাইরে থেকে দেখা যায় না, কিন্তু তার গলার তরুণাস্থি, যাকে thyroid cartilage বলে, সেটা একেবারে চূর্ণ হয়ে গেছে।'

নীলমণিবাবু স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, 'মানে গলা টিপে মেরেছে!'

'না। গলা টিপে মারলে চামড়ার ওপর আঙুলের দাগ থাকত। আর, গলা টিপে মারার মধ্যে বৈচিত্র্য কিছু নেই।'

'তবে?'

মেজর বর্মণ কয়েকবার সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিলেন, 'গত মহাযুদ্ধে সৈনিকদের অস্ত্রহীন যুদ্ধের কৌশল শেখানো হয়েছিল, আপনি জানেন?'

'না। সে কি রকম?'

'মনে করুন বনে-জঙ্গলে যুদ্ধ হচ্ছে। আপনি নিরস্ত্র অবস্থায় একজন সশস্ত্র শত্রুর হাতে ধরা পড়লেন। পালাবার পথ নেই, পালাবার চেষ্টা করলে সে আপনাকে গুলি করে মারবে। এ অবস্থায় আত্মরক্ষার উপায় কি?— আপনি কৌশলে শত্রুর ডান পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন, তারপর হঠাৎ তার দিকে ঘুরে ডান হাতের পোঁচা দিয়ে সজোরে মারলেন তার গলায়। Thyroid cartilage ভেঙে গেল, তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হল।'

'তৎক্ষণাৎ মৃত্যু?'

'হ্যাঁ। গলা টিপে মারতে গেলে আক্রান্ত ব্যক্তি যুদ্ধ করে মুক্ত হবার চেষ্টা করে। এতে ওসব বালাই নেই, সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু।'

নীলমণিবাবু কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, 'আশ্চর্য! মেয়েটির মৃত্যু এইভাবে হয়েছে এতে আপনার সন্দেহ নেই?'

'কোন সন্দেহ নেই!'

'আচ্ছা, আজ উঠি। কাল সকালে লোক পাঠাব রিপোর্টের জন্যে।'

নীলমণিবাবু থানায় ফিরিয়া আসিলেন। সুরেশ্বর যে হাসিকে খুন করিয়াছে ইহাতে তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু একটা ধোঁকা রহিয়াছে। যে লোকটা রাত্রে আসিয়া হাসির সঙ্গে দেখা করিত, সে কে? সে-ই কি হাসিকে গহনাগুলো উপহার দিয়াছিল? হাসির সহিত

লোকটার কিরূপ সম্বন্ধ? সে যদি হাসির 'বন্ধু' হয় তবে হাসকে খুন করিবে কেন?

সে-রাত্রে আর কিছু হইল না। পরদিন সকালে একজন সাব-ইন্সপেক্টর ও একজন রাইটার জমাদারকে সঙ্গে লইয়া নীলমণিবাবু আবার সুরেশ্বরের বাড়িতে গেলেন। আজ যেমন করিয়া হোক সুরেশ্বরের নিকট হইতে তিনি স্বীকারোক্তি আদায় করিবেন।

সুরেশ্বরের বাড়ির সদর দরজা খোলা, বাড়িতে কেহ আছে বলিয়া মনে হইল না। দু'চার বার ডাকাডাকি করিয়া নীলমণিবাবু সঙ্গীদের লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। শয়নকক্ষের খোলা দরজার সামনে গিয়া তাঁহাদের গতি রুদ্ধ হইল। মেঝের উপর সুরেশ্বর মরিয়া পড়িয়া আছে।

গত রাত্রে সুরেশ্বর যথা-নিয়ত কালীকিঙ্করের দোকানে তাস খেলিতে গিয়াছিল। রাত্রি আন্দাজ বারোটার সময় গৃহে ফিরিয়া আসে। তারপর কি হইয়াছে কেহ জানে না।

সিভিল সার্জেন মেজর বর্মণ সুরেশ্বরের মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া রিপোর্ট দিলেন, গলার thyroid cartilage ভাঙিয়া তাহার মৃত্যু হইয়াছে। অর্থাৎ যে উপায়ে হাসির মৃত্যু হইয়াছিল ঠিক সেই উপায়ে সুরেশ্বরেরও মৃত্যু হইয়াছে।

গল্প শেষ করিয়া নীলমণিবাবু কিছুক্ষণ হেঁট মুখে বসিয়া রহিলেন, তারপর মুখ তুলিয়া বলিলেন, 'এই হচ্ছে ঘটনা। তদন্তের সূত্রে আমি যা-যা জানতে পেরেছিলাম সব আপনাকে বলেছি। আমি প্রথমে সুরেশ্বরকে সন্দেহ করেছিলাম, পরে দেখলাম, হাসি আর সুরেশ্বরকে একই লোক একই উপায়ে খুন করেছে। আমি আসামীকে ধরতে পারিনি, আসামী কে তাও জানতে পারিনি। আপনি বলতে পারেন কে আসামী?'

ব্যোমকেশ গালে হাত দিয়া শুনিতেছিল, বলিল, 'আরো কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দেবেন?'

নীলমণিবাবু বলিলেন, 'উত্তর যদি জানা থাকে নিশ্চয় দেব।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'সুরেশ্বরের ওয়ারিস্ কে?'

'সুরেশ্বরের এক খুড়তুতো বোন। সুরেশ্বর উইল করেনি। খুড়তুতো বোনটি অনাথা বিধবা, কলকাতায় কোথায় রাঁধুনি-বৃত্তি করত, সে-ই সব পেয়েছে।'

'যাক।— যে-রাত্রে সুরেশ্বরের মৃত্যু হয়, সে-রাত্রে ওর তিন বন্ধু কালীকিঙ্কর, দেবু মণ্ডল আর বিলাস দত্ত কোথায় ছিল?'

'সুরেশ্বরের বাড়ি যাবার পর ওরা তিনজন প্রায় সারা রাত কালীকিঙ্করের দোকানে বসে তাস খেলেছিল। আমি ওদের প্রত্যেকের পিছনে চর লাগিয়েছিলাম, তাদের কাছেই খবর পেয়েছি। ওরা সুরেশ্বরকে খুন করেনি।'

'হুঁ। বিনোদ সরকারের পিছনে চর লাগিয়েছিলেন?'

'না। বিনোদ সরকারের উপর আমার সন্দেহ হয়নি। তার কোনো মোটিভ ছিল না। সুরেশ্বরকে হয়তো মারতে পারতো, কিন্তু হাসিকে মারবে কেন?'

'তা বটে। দিনমণি হালদার তখন কোথায় ছিল খোঁজ নিয়েছিলেন?'

'নিয়েছিলাম। সে তখন পঞ্চাশ মাইল দূরে একটা গ্রামে ছিল। আমাশায় ভুগছিল। নড়বার ক্ষমতা ছিল না। তাছাড়া ওভাবে খুন করবার কৌশল সে জানবে কোত্থেকে?'

'হুঁ। আচ্ছা, একটা কথা বলুন। আপনার কি মনে হয় হাসির স্বভাব-চরিত্র মন্দ ছিল?'

'না। আমার বিশ্বাস সে ভাল মেয়ে ছিল।'

ব্যোমকেশ নতমুখে ভাবিতে ভাবিতে বলিল, 'কিন্তু তার রক্তে দোষ ছিল। তার মা— কি নাম হাসির মায়ের?'

'অমলা।'

ব্যোমকেশ চোখ তুলিয়া নীলমণিবাবুর পানে চাহিল ; তিনিও প্রখর চক্ষে তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার শরীর ক্রমশ কঠিন হইয়া উঠিতে লাগিল। কিছুক্ষণ দুইজনের চোখে চোখ আবদ্ধ হইয়া রহিল ; তারপর ব্যোমকেশ তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিল, নির্বাপিত গড়গড়ার নলটা হাতে তুলিয়া লইল।

নীলমণিবাবু আত্মসংবরণ করিয়া ধীরস্বরে বলিলেন, 'আর কিছু জানতে চান?'

ব্যোমকেশ নিরুৎসুকভাবে মাথা নাড়িল, 'আর কিছু জানবার নেই।'

নীলমণিবাবু একটু বাঁকা সুরে বলিলেন, 'কিছু বুঝলেন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'সবই বুঝেছি, নীলমণিবাবু।'

নীলমণিবাবু কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রহিলেন, শেষে বলিলেন, 'সবই বুঝেছেন। হাসিকে .ক খুন করেছিল আপনি বুঝেছেন?'

'বুঝেছি বৈকি। হাসিকে খুন করেছিল সুরেশ্বর।'

'তাই নাকি। তাহলে সুরেশ্বরকে মারল কে?'

'সুরেশ্বরকে মেরেছিল—হাসির বাপ।'

'হাসির বাপ। কিন্তু দিনমণি হালদার সে-সময় পঞ্চাশ মাইল দূরে ছিল—'

'আমি দিনমণি হালদারের কথা বলিনি, হাসির বাপের কথা বলেছি। হাসির জন্মদাতা পিতা।'

নীলমণিবাবু নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। দেখিতে লাগিলাম তাঁহার মুখ হইতে পরতে পরতে রক্ত নামিয়া যাইতেছে। অবশেষে তিনি যখন কথা বলিলেন তখন তাঁহার কণ্ঠস্বরের গাম্ভীর্য আর নাই, ক্ষীণ স্খলিত স্বরে বলিলেন, 'জন্মদাতা পিতা—কার কথা বলছেন?'

ব্যোমকেশ দুঃখিতভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, 'কার কথা বলছি আপনি জানেন, নীলমণিবাবু। গল্পটা আমাকে না বললেই ভাল করতেন।'

অতঃপর নীলমণিবাবু কী বলিতেন তাহা আর শোনা হইল না। বীরেনবাবু প্রবেশ করিয়া বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, রান্না তৈরি। আপনারা স্নান করে নিন। নীলমণিদা, আপনিও মধ্যাহ্ন ভোজনটা এখানেই সেরে নিন না?'

নীলমণিবাবু ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

'না না, আমি চললাম। অনেক দেরি হয়ে গেল।' বলিয়া তিনি দ্রুত প্রস্থান করিলেন। আমাদের দিকে দৃক্‌পাত করিলেন না।

আহারাদি সম্পন্ন করিয়া দুইজনে তাকিয়া মাথায় দিয়া লম্বা হইয়াছিলাম। গড়গড়া চলিতেছিল।

বলিলাম, 'কি করে বুঝলে বল।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'নীলমণিবাবুর গল্প শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল হাসির প্রতি তাঁর পক্ষপাত আছে। অথচ তাঁর গল্প অনুযায়ী, হাসিকে জীবিত অবস্থায় তিনি দেখেননি। তার চরিত্র সম্বন্ধে যে সাক্ষী প্রমাণ পাওয়া যায়, তাতে তাকে পতিগতপ্রাণা সতীসাধ্বী মনে কববার কারণ নেই। সে প্রগল্‌ভা ছিল, তার স্বামী তাকে সন্দেহ করত, একজন অজ্ঞাত লোক রাত্রে তার সঙ্গে দেখা করত। তবে তার প্রতি নীলমণিবাবুর পক্ষপাত কেন?'

'হাসির মা অমলাও সীতা-সাবিত্রী ছিল না। অমলার স্বামী দিনমণি হালদার জেলখানার পোষা পাখি হয়ে দাঁড়িয়েছিল , মাঝে মাঝে ছাড়া পেত, আবার জেলে গিয়ে ঢুকত। দিনমণি হালদার হাসির বাপ নাও হতে পারে।'

'বিনোদ সরকারও হাসির বাপ নয়। হাসির মায়ের সঙ্গে যখন তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, তখন হাসির বয়স তিন-চার বছর। তবে কে?'

'নীলমণিবাবু গল্প বলবার আগে কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, পুলিসের চাকরিতে ঢুকে প্রথম তিনি এই শহরে পোস্টেড হয়েছিলেন। দিনমণি পেশাদার চোর, তাকে ধরতে কিংবা তার

ঘর-দোর খানাতল্লাশ করবার জন্যে হয়তো নীলমণিবাবু গিয়েছিলেন। তিনি তখন যুবক, হয়তো দিনমণিব কুহকময়ী স্ত্রীর ফাঁদে পড়ে গিয়েছিলেন ; দিনমণি জেলে যাবার পর গোপনে দু'জনের মেলামেশা হয়েছিল।'

'দু-তিন বছর পরে নীলমণিবাবু এ জেলা থেকে বদলি হয়ে গেলেন ; যাবার আগে জেনে গেলেন তাঁর একটি মেয়ে আছে। মেয়ের নাম হাসি। দূরে গিয়েও তিনি হাসি ও হাসির মায়ের খবর রাখতেন। তিনি বিয়ে করেননি, তাই সংসারের বন্ধন হাসিকে ভুলিয়ে দিতে পারেনি। সংসাবে হাসিই তাঁর একমাত্র রক্তের বন্ধন।'

'কর্মজীবনের শেষের দিকে তিনি আবার এই শহরে ফিরে এলেন। হাসির মা তখন মবে গেছে, হাসির বিয়ে হয়েছে। নীলমণিবাবু অভ্যাস ছিল তিনি গভীর রাত্রে সাইকেল চড়ে শহরে তদারক করতে বেরুতেন। সেই সময় তিনি হাসির সঙ্গে দেখা করতেন, তাকে ছোটোখাটো দু'-একখানা গয়না উপহার দিতেন। হাসিকে নিজেব পরিচয় দিয়েছিলেন কিনা বলা যায় না। তবে হাসি হয়তো আন্দাজ কবেছিল।'

'যে-রাত্রে সুরেশ্বর হাসিকে খুন করে সে-রাত্রে নীলমণিবাবু হাসির সঙ্গে দেখা কবতে যাচ্ছিলেন। তারপর যা-যা হয়েছিল সবই নীলমণিবাবুর মুখে শুনেছি। আমার বিশ্বাস সুরেশ্বর তাস খেলতে খেলতে উঠে এসে হাসিকে খুন করেছিল, তারপর ফিরে গিয়ে বন্ধুদের বলেছিল—বৌকে খুন করেছি, এখন তোরা আমাকে বাঁচা। চারজনের মধ্যে অটুট বন্ধুত্ব। তারা পরামর্শ করে স্থির করল, মড়া পুড়িয়ে ফেলা যাক, তারপর রটিয়ে দিলেই হবে, হাসি কুলত্যাগ করেছে।'

'নীলমণিবাবু চার বন্ধুকে থানায় ধবে আনলেন, কিন্তু তাদের অ্যালিবাই ভাঙতে পারলেন না। তিনি যখন দেখলেন তাঁর মেয়ের হত্যাকারীকে ফাঁসিকাঠে লটকাতে পারবেন না তখন তিনি ঠিক করলেন নিজেই তাঁকে খুন করবেন। তিনি আর বিলম্ব করলেন না, হাসির মৃত্যুর চব্বিশ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই সুরেশ্বরকে খুন করলেন।'

'কিন্তু ভেবে দেখ, আমি যেভাবে গল্পটাকে খাড়া করেছি, তার আগাগোড়াই অনুমান। এই অনুমান কেবল তখনি সত্যে পরিণত হতে পারে যদি নিশ্চয়ভাবে জানা যায় যে, নীলমণিবাবু হাসির বাপ। আমি তাঁর জন্যে ফাঁদ পাতলাম, আচমকা জিজ্ঞেস করলাম—হাসির মায়ের নাম কি? তিনি না ভেবেচিন্তে বলে ফেললেন—অমলা!'

'হাসির মায়েব নাম তিনি জানলেন কি করে? দশ বছর আগে সে মরে গেছে, এই মামলায় তাব নাম একবারও কেউ উচ্চারণ করেনি। তবে নীলমণিবাবু জানলেন কি করে? আর সন্দেহ রইল না।'

'আমার সামনেই হাসির মায়ের নাম উচ্চারণ করেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, অসাবধানে তিনি ফাঁদে পা দিয়েছেন, আমিও তাঁর মুখ দেখে বুঝতে পেরেছিলাম আমার ফাঁদ পাতা বার্থ হয়নি। নীলমণিবাবুর অজানা আসামী স্বয়ং নীলমণিবাবু।'

ব্যোমকেশের যুক্তিজালে ছিদ্র পাইলাম না। বলিলাম, 'নীলমণিবাবু তাহলে নিরস্ত্র যুদ্ধের কায়দা আগে থাকতে জানতেন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'না। বিদ্যেটা তিনি সিভিল সার্জন মেজর বর্মণের কথা শুনে শিখে নিয়েছিলেন।'

ব্যথার দান

নজরুল ইসলাম

দারার কথা

গোলেস্তান

গোলেস্তান! অনেক দিন পরে তোমার বুকে ফিরে এসেছি। আঃ মাটির মা আমার, কত ঠাণ্ডা তোমার কোল! আজ শূন্য আঙিনায় দাঁড়িয়ে প্রথমেই আমার মনে প'ড়ছে জননীর সেই স্নেহ-বিজড়িত চুম্বন আর অফুরন্ত অমূলক আশঙ্কা, আমায় নিয়ে তাঁর সেই ক্ষুধিত স্নেহের ব্যাকুল বেদনা ... সেই ঘুম-পাড়ানোর সরল ছড়া,—

"ঘুম-পাড়ানি মাসী-পিসী ঘুম দিয়ে যেয়ো,
বাটা ভ'রে পান দেবো গাল ভ'রে খেয়ো!"

আরও মনে পড়'ছে আমাদের মা-ছেলের শত অকারণ আদর-আবদার। ... সে মা আজ কোথায়?

দু'-একদিন ভাবি, হয়তো মায়ের এই অন্ধ স্নেহটাই আমাকে আমার এই বড-মা দেশটাকে চিনতে দেয়নি। বেহেশ্‌ত্‌ থেকে আব্দারে ছেলের কান্না মা শুনতে পাচ্ছেন কি না জানি নে, কিন্তু এ আমি নিশ্চয় ক'রে ব'লতে পারি যে, মাকে হারিয়েছি ব'লেই—মাতৃ স্নেহের ঐ মস্ত শিকলটা আপনা হ'তে ছিঁড়ে গিয়েছে ব'লেই আজ মা'র চেয়েও মহীয়সী আমার জন্মভূমিকে চিনতে পেরেছি। তবে এও আমাকে স্বীকার করতে হবে, মাকে আগে আমার প্রাণ-ভরা শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভালবাসা অন্তরের অন্তর থেকে দিয়েই আজ মা'র চেয়েও বড় জন্মভূমিকে ভালবাসতে শিখেছি। মাকে আমি ছোট ক'রছি নে। ধ'রতে গেলে মা-ই বড়। ভালবাসতে শিখিয়েছেন তো মা। আমার প্রাণে স্নেহের সুরধনী বইয়েছেন তো মা। আমাকে কাজে-অকাজে এমন ক'রে সাড়া দিতে শিখিয়েছেন যে মা। মা পথ দেখিয়েছেন, আর আমি চ'লেছি সেই পথ ধ'রে। লোকে ভাবছে, কি খামখেয়ালী পাগল আমি! কি কাঁটা-ভরা ধ্বংসের পথে চ'লেছি আমি। কিন্তু আমার চলার খবর মা জানতেন, আর সে-কথা শুধু আমি জানি।

আমায় লোকে ঘৃণা ক'রছে? আহা, আমি ঐ তো চাই। তবে একটা দিন আসবেই যে-দিন লোকে আমার সঠিক খবর জানতে পেরে দু'-ফোঁটা সমবেদনার অশ্রু ফেলবেই ফেলবে। কিন্তু আমি হয়তো তা আর দেখতে পাব না। আর তা দেখে অভিমানী স্নেহ-বঞ্চিতের মত আমার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না আসবে না। সে-দিন হয়তো আমি থাক্‌ব দুঃখ-কান্নার সুদূর পারে।

আচ্ছা মা। তুমি তো ম'রে শান্তি পেয়েছ, কিন্তু এ কি অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে গেলে আমার প্রাণে? আমি চিরদিনই ব'লেছি, না—না—না, আমি এ-পাপের বোঝা বইতে পারব না ; কিন্তু তা তুমি শুনলে কই? সে-কথা শুধু হেসেই উড়িয়ে দিলে, যেন আমার মনের কথা সব জান আর কি। ... এই যে বেদৌরাকে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে গেলে, এর জন্যে দায়ী কে? এখন যে আমার সকল কাজেই বাধা। কোথাও পালিয়েও টিকতে পারছি নে। ... আমি আজ বুঝতে পারছি মা, যে, আমার এই ঘর-ছাড়া উদাস মনটার স্থিতির জন্যেই তোমার চির-বিদায়ের দিনে এই পুষ্প-শিকলটা নিজের হাতে আমায় পরিয়ে গিয়েছ। ঐ মালাই তো হ'য়েছে আমার জ্বালা। লোহার শিকল ছিন্ন ক'রবার ক্ষমতা আমার আছে, কিন্তু ফুলের শিকল দ'লে যাবার মত নির্মম শক্তি তো নেই আমার। .. যা কঠোর, তার ওপর কঠোরতা সহজেই আসে ; কিন্তু যা কোমল পেলব নমনীয়, তাকে আঘাত ক'রবে কে? তারই আঘাত যে আর সইতে পারছি নে।

হতভাগিনী বেদৌরা! সে কথা কি মনে পড়ে — সেই মায়ের শেষ দিন? — সেই নিদারুণ দিনটা? মায়ের শিয়রে মরণের দূত ম্লান মুখে অপেক্ষা ক'রছে— বেদনাপ্লুত তাঁর মুখে একটা নির্বিকার তৃপ্তির আবছায়া ক্রমেই ঘনিয়ে আসছে,—জীবনের শেষ রুধিরটুকু অশ্রু হ'য়ে তোমার আর আমার মঙ্গলেচ্ছায় আমাদেরই আনত শিরে চুঁইয়ে প'ড়ছে। মা'র পূত সে শেষের অশ্রু বেদনায় যেমন উত্তপ্ত, শান্ত স্নেহ-ভরা আশিসে তেমনই স্নিগ্ধ-শীতল। তোমার অযতনে-খোওয়া কালো কোঁক্ড়ান কেশের রাশ আমাকে শুদ্ধ ঝেঁপে দিয়েছে, আর তার অনেকগুলো আমাদেরই অশ্রু-জলে সিক্ত হ'য়ে আমার হাতে-গলায় জড়িয়ে গিয়েছে,— আমার হাতের ওপর কচি পাতার মত তোমার কোমল হাত দু'টি থুয়ে মা অশ্রু-জড়িত কণ্ঠে আদেশ ক'রছেন,—"বাবা, প্রতিজ্ঞা কর্,— বেদৌরাকে কখনো ছাড়বি নে।"

তার পর তাঁর শেষের কথাগুলো আরও জড়িয়ে ভারী হ'য়ে এল,—"এর কেউ নেই যে বাপ! এই অনাথা মেয়েটাকে যে আমিই এত আদুরে আর অভিমানী ক'রে ফেলেছি।"

সে কি ব্যথিত-ব্যাকুল আদেশ, গভীর স্নেহের সে কি নিশ্চিন্ত নির্ভরতা!

তার পর মনে পড়ে বেদৌরা, আমাদের সেই কিশোর মর্মতলে একটু একটু ক'রে ভালবাসার গভীর দাগ, গাঢ় অরুণিমা। ... মুখোমুখী ব'সে থেকেও হৃদয়ের সেই আকুল কান্না, মনে পড়ে কি সে-সব বেদৌরা? তখন আপনি মনে হ'ত, এই পাওয়ার ব্যথাটাই হ'চ্ছে সব চেয়ে অরুন্তুদ। তা না হ'লে সাঁঝের মৌন আকাশ-তলে দু'জনে যখন গোলেস্তানের আঙুর-বাগিচায় গিয়ে হাসতে হাসতে ব'সতাম তখন কেন আমাদের মুখের হাসি এক নিমেষে শুকিয়ে গিয়ে দুইটি প্রাণ গভীর পবিত্র নীরবতায় ভ'রে উঠত? তখনও কেন অবুঝ বেদনায় আমাদের বুক মুহুর্মুহু কেঁপে উঠত? আঁখির পাতায় পাতায় অশ্রু-শীকর ঘনিয়ে আসত? ..

আজ সেটা খুব বেশী ক'রেই বুঝতে পেরেছি বেদৌরা। কেননা, এই যে জীবনের অনেকগুলো দিন তোমার বিরহে কেটে গেল, তাতে তোমাকে না হারিয়ে আরও বড় ক'রে পেয়েছি। তোমায় যে আমি হারিয়েছিলাম সে তোমাকে এত সহজে পেয়েছিলাম ব'লেই। বিরহের ব্যথায় জানটা যখন 'পিয়া পিয়া' ব'লে ফরিয়াদ ক'রে মরে, তখনকার আনন্দটা এত তীব্র যে, তা একমাত্র বিরহীর বুকই বোঝে, তা প্রকাশ ক'রতে আর কেউ কখ্‌খনো পারবে না। দুনিয়ায় যত রকম আনন্দ আছে, তার মধ্যে এই বিচ্ছেদের ব্যথাটাই হ'চ্ছে সবচেয়ে বেশী আনন্দময়।

আর সেই দিনের কথাটা? সে-দিন বাস্তবিকই সেটা বড় আঘাতের মতই প্রাণে বেজেছিল। আমার আজও মনে প'ড়ছে, সে-দিন ফাগুন আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে আকাশে বাতাসে ফলে ফুলে পাতায়। ... আর সবচেয়ে বেশী ক'রে তরুণ-তরুণীদের বুকে।

আঙুরের থোকাগুলো রসে আর লাবণ্যে ঢলঢল্ ক'রছে পরীস্তানের নিটোল-স্বাস্থ্য ষোড়শী বাদশাজাদীদের মত। নাশপাতিগুলো রাঙিয়ে উঠেছে সুন্দরীদের শরম-রঞ্জিত হিঙুল গালের মত। রস-প্রাচুর্যের প্রভাবে ডালিমের দানাগুলো ফেটে ফেটে বেরিয়েছে কিশোরীদের অভিমানে-স্ফুরিত টুক্‌টুকে অরুণ অধরের মত। পেস্তার পুষ্পিত ক্ষেতে বুল্‌বুল্‌দের নওরোজের মেলা ব'সেছে। আড়ালে আগ্‌ডালে ব'সে কোয়েল আর দোয়েল-বধূর গলা-সাধার ধূম প'ড়ে গিয়েছে, কি ক'রে তা'রা ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে তাদের তরুণ স্বামীদের মশগুল ক'রে রাখবে। ... উদ্দাম দখিন হাওয়ার সাথে ভেসে-আসা একরাশ খোশবুব মাদকতায় আমার বুকে তুমি ঢ'লে প'ড়েছিলে। শিরাজ-বুল্‌বুল্-এর দিওয়ান পাশে থুয়ে আমি তোমার অবাধ্য দুষ্টু এলো চুলগুলি সংযত ক'রে দিচ্ছিলাম, আর আমাদের দু'জনারই চোখ ছেপে অশ্রু ব'য়েই চ'লেছিল।

মিলনের মধুর অতৃপ্তি এই রকমে বড় সুন্দর হ'য়েই আমাদের জীবনেব প্রথম অধ্যায়ের পাতাগুলো উল্টে দিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় সব ওলট-পালট হ'য়ে গেল ঠিক যেমন বিরাট্ বিপুল এক ঝঞ্ঝার অত্যাচারে একটা খোলা বই-এর পাতা বিশৃঙ্খল হ'য়ে যায়। ... সে এলোমেলো পাতাগুলো আবার গুছিয়ে নিতে কি বেগই না পেতে হ'যেছে আমায়, বেদৌরা। .... তা হোক্, তবু তো এই চমনে এসে তোমায় ফের পেয়েছি। তুমি যে আমারই। বাঙালী কবির গানের একটা চরণ মনে প'ড়ছে—

"তুমি আমারি যে তুমি আমারি,
মম বিজন জীবন-বিহারী!"

তারপর সেই ছাড়াছাড়ির ক্ষণটা বেদৌরা, তা কি মনে প'ড়ছে? আমি শিরাজের বুল্‌বুলের সেই গানটা আবৃত্তি ক'রছিলাম,—

"দেখ্‌নু সে-দিন ফুল-বাগিচায় ফাগুন মাসের ঊষায়,
সদ্য-ফোটা পদ্ম ফুলের লুটিয়ে পরাগ-ভূষায়,
কাঁদচে ভ্রমর আপন মনে অঝোর নয়নে সে,
হঠাৎ আমার প'ড়ল বাধা কুসুম চয়নে যে।
কইনু,—'হাঁ ভাই ভ্রমর! তুমি কাঁদচ সে কোন্ দুখে
পেয়েও আজি তোমার প্রিয়া কমল-কলির বুকে?"
রাঙিয়ে তুলে কমল-বালায় অশ্রু-ভরা চুমোয়
ব'ললে ভ্রমর,—"ওগো কবি, এই তো কাঁদার সময়।
বাঞ্ছিতারে পেয়েই তো আজ এত দিনের পরে,
ব্যথা-ভরা মিলন-সুখে অঝোর ঝরা ঝরে।"

এমন সময় তোমার মামা এসে তোমায় জোর ক'রে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল ; আমার একটা কথাও বিশ্বাস ক'রলে না। শুধু একটা উপেক্ষার হাসি হেসে জানিয়ে দিলে যে, সে থাকতে আমার মত একটা ঘর-বাড়ী-ছাড়া বয়াটে ছোকরার সঙ্গে বেদৌরার মিলন হ'তেই পারে না। ....

আমার কান্না দেখে সে ব'ললে যে, ইরানের পাগলা কবিদের দিওয়ান প'ড়ে প'ড়ে আমিও পাগল হ'য়ে গিয়েছি। তোমার মিনতি দেখে সে ব'ললে যে, আমি তোমাকে যাদু ক'রেছি।

তার পর অনেক দিন ঘুরে ঘুরে কেটে গেল ঐ ব্যাকুল-গতি ঝর্‌নাটার ধারে। যখন চেতন হ'ল, তখনও বসন্ত-উৎসব তেমনি চ'লেছে, শুধু তুমিই নেই। দেখলুম, ক্রমেই তোমার আল্‌তা-ছোপানো পায়ের পাতার পাতলা দাগগুলি নির্ঝরের কূলে কূলে মিশিয়ে আসছে, আর রেশমী চুড়ির টুক্‌রোগুলো বালি-ঢাকা প'ড়ছে।

আমি কখনো মনের ভুলে এ-পারে দাঁড়িয়ে ডাকতুম,— বেদৌবা! অনেকক্ষণ পরে পাথরের পাহাড়টা ডিঙিয়ে ও-পার হ'তে কার একটা কান্না আসতে আসতে মাঝপথে মিশিয়ে যেত—"রা—আঃ—আঃ!"

সারা বেলুচিস্তান আর আফগানিস্তানের পাহাড় জঙ্গলগুলোকে খুঁজে পেলুম, কিন্তু তোমার ঝরনা-পারের কুটীরটির খোঁজ পেলুম না।

একদিন সকালে দেখলুম, খুব উন্মুক্ত একটা ময়দানে একজন পাগলা একা আস্‌মান-মুখো হ'যে শুধু লাফ মারছে, আর সেই সঙ্গে হাত দু'টো মুঠো ক'রে কিছু ধ'রবার চেষ্টা ক'রছে। আমার বড্ডো হাসি পেলে। শেষে ব'ললুম—"হ্যাঁ ভাই উৎরিঙ্গে! তুমি কি তিড়িং তিড়িং ক'রে লাফিয়ে আকাশ-ফড়িং ধ'রছ?"

সে আরও লাফাতে লাফাতে সুর ক'রে ব'লতে লাগল—

"এ-পার থেকে মারলাম ছুঁরি লাগল কলা গাছে,
হাঁটু বেয়ে রক্ত পড়ে চোখ গেল রে বাবা।"

এতে যে মরা মানুষেরও হাসি পায়। অত দুঃখেও আমি হো-হো ক'রে হেসে ব'ললুম—"ভাই, তুমি কি কবি?"

সে খুব খুশী হ'যে চুল দুলিয়ে ব'ললে—"হাঁ হাঁ, তাই।"

আমি ব'ললুম—"তা তোমার কবিতার মিল হ'ল কই?"

সে ব'ললে,—"তা নাই বা হ'ল, হাঁটু দিয়ে তোর রক্ত প'ড়ল তো।" এই ব'লেই সে আমার নবোদ্ভিন্ন শ্মশ্রুমণ্ডিত গালে চুম্বনের চোটে আমায় বিব্রত ক'রে তুলে ব'ললে,—"অনিলের নীল রংটাকে সুনীল আকাশ ভেবে ধ'রতে গেলে সে দূরে স'রে গিয়ে বলে,—"ওগো, আমি আকাশ নই, আমি বাতাস—আমি শূন্য, আমায় ধরা যায় না। আমায় তোমরা পেয়েছ। তবুও যে পাইনি ব'লে ধ'রতে আস, সেটা তোমাদের জবর ভুল।"

এক নিমেষে আমার মুখের মুখর হাসি মূক হ'য়ে মিলিয়ে গেল। ভাবলাম, হা ঠিকই তো। যাকে ভিতরে অন্তরের অন্তরে পেয়েছি, তাকে খাম্‌খা বাইরের পাওয়া পেতে এত বাড়াবাড়ি কেন? তাই সে-দিন আমার পোড়ো-বাড়ীতে শেষ কান্না কেঁদে ব'ললুম,—"বেদৌরা! তোমায় আমি পেয়েছি আমার হৃদয়ে—আমার বুকের প্রতি রক্ত কণিকায়।" ...

তার পর এই যে হিন্দুস্থানের অলিতে গলিতে 'কম্বলিওয়ালে' সেজে ফিরে এলুম, সে তো শুধু ঐ এক ব্যথার সান্ত্বনাটা বুকে চেপেই। ভাবতুম, এম্‌নি ক'রে ঘুরে ঘুরেই আমার জনম কাটবে, কিন্তু তা আর হ'ল কই? আবার সেই গোলেস্তানে ফিরে এলুম। সেখানে আমার মাটির কুঁড়ে মাটিতে মিশে গিয়েছে, কিন্তু তারই আর্দ্র বুকে যে তোমার ঐ পদচিহ্ন আঁকা র'য়েছে, ... তাই আমায় জানিয়ে দিল, যে, তুমি এখানে আমায় খুঁজতে এসে না পেয়ে শুধু কেঁদে ফিরেছ।

সেই পাগলটা আবার এসে জানিয়ে দিয়ে গেল যে, তুমি চমনে ফুটে শুকিয়ে যাচ্ছ।...

আমি এসেই তোমায় দূর হ'তে দেখে চিনেছি। তবে তুমি আমায় দেখে অমন ক'রে ছুটে পালালে কেন? সে কি মাতালের মত ট'লতে ট'লতে দৌড়ে লুকিয়ে প'ড়লে ঐ খোর্মা গাছগুলোর আড়ালে! সে কি অসম্বৃত অশ্রু ঝ'রে প'ড়ছিল তোমার। আর কতই সে ব্যথিত অনুযোগ ভ'রে উঠেছিল সে করুণ দৃষ্টিতে!

কিন্তু কোথা গেলে তুমি? বেদৌরা তুমি কোথায়? ...

বেদৌরার কথা

বোস্তান

মা গো, কি ব্যথিত পাণ্ডুর আকাশ। এই যে এত বৃষ্টি হ'য়ে গেল, ও অসীম আকাশের কান্না নয় তো?—না, না, এত উদার যে, সে কাঁদবে কেন? আর কাঁদলেও তার অশ্রু আমাদের সঙ্কীর্ণ পাপ-পঙ্কিল চোখের জলের মত বিস্বাদ আর উষ্ণ নয় তো। দেখছ, সে কত ঠাণ্ডা। ..

কিন্তু আমি কি স্বপ্ন দেখছি? একেবারে এক দৌড়ে চমন থেকে এই বোস্তানে এসেছি। তা হোক্, এতক্ষণে যেন জানটা ধড়ে এল। ... আম'লো! এত হুঁক্‌রে হুঁক্‌রে বুক ফেটে কান্না আসছে কিসের? মানুষের মনের মত আর বালাই নেই। ঐ জ্বালাতেই তো আমায় জ্বালিয়ে খেলে গো! — কি? তার দেখা পেয়েছি ব'লে এ-কান্না? তাতে আর হ'য়েছে কি?

সে যে ফিরে আসবেই, সে তো জানা কথা। কিন্তু এত দিনে কেন? এ অসময়ে কেন? এখন যে আমার মালতীর লতা রিক্তকুসুম! ওগো, এ মরণের তটে এ দুর্দিনে কি দিয়ে বাসর সাজাব? যদি এলেই, তবে কেন দু'দিন আগেই এলে না? তা হ'লে তো তোমায় এমন ক'রে এড়িয়ে চ'লতে হ'তো না! সেই দিনই—যেদিন আবার ঐ চমনের শুক্‌নো বাগানের ধারে তোমায় দেখতে পেয়েছিলাম—সেই দিনই তোমার বুকে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে ব'লতাম,—"এস প্রিয়, ফিরে এস!"

আমরা নারী, একটুতেই যত কেঁদে ভাসিয়ে দিতে পারি, পুরুষরা তা তো পারে না। তাদের বুকে যেন সব সময়েই কিসের পাথর চাপা। তাই যখন অনেক বেদনায় এই সংযমী পুরুষদের দু'টি ফোঁটা অসম্বরণীয় অশ্রু গড়িয়ে পড়ে, তখন তা দেখে না কেঁদে থাকতে পারে, এমন নারী তো আমি দেখি না!

সেদিন যখন কত বছর পরে আমাদের চোখাচোখি হ'ল, তখন কত মিনতি-অনুযোগ আর অভিমান মূর্ত হ'য়ে ফুটে উঠেছিল আমাদের চারটি চোখেরই সজল চাউনিতে -হ্যাঁ, আর কেমন 'বেদৌরা' ব'লে মাথা ঘুরিয়ে কাঁপতে কাঁপতে সে ঐ খেজুরের কাঁটা ঝোপটায় প'ড়ে গেল! তা দেখে পাষাণী আমি কি ক'রেই সে চোখ দু'টো জোর ক'রে দু'-হাত দিয়ে চেপে এত দূর যেন কোন্ অন্ধ অমানুষিক শক্তির বলে ছুটে এলাম?

পুরানো কত স্মৃতিই আজ আমার বুক ছেপে উঠছে। সেই গোলেস্তানে এক জোড়া বুলবুলেরই মত মিলনেই অভিমান, মিলনেই বিচ্ছেদ-ব্যথা আর তারই প্রগাঢ় আনন্দে অজস্র অশ্রুপাত! তার চিন্তাটাও কত ব্যথিত-বিধুর! তার পর সেই জুয়াচোরের জোর ক'রে আমায় ছিনিয়ে-নেওয়া দয়িতের বুক থেকে,—অনেক কষ্টে তার হাত এড়িয়ে প্রিয়ের অন্বেষণ। — ওঃ কি-ই না ক'রেছি তাকে আবার পেতে! কই তখনও তো সে এল না!

তার পর ভিতরে-বাইরে সে কি দ্বন্দ্ব লেগে গেল! ভিতরে ঐ এক তৃষের আগুন ধিকি-ধিকি জ্বলতে লাগল, আর বাইরে? বাইরে ফাগুনের উদাস বাতাস প্রাণে কামনার তীব্র আগুন জ্বালিয়ে দিলে! ঠিক সেই সময় কোথা থেকে ধূমকেতুর মত সয়ফুল্-মুলক্ এসে

আমায় কান-ভাঙানি দিলে— ভালবাসায় কি বিবাট শান্ত স্নিগ্ধতা আর করুণ গাম্ভীর্য, ঠিক ভৈরবী রাগিণীর কড়ি-মধ্যমের মত। আর এই বিশ্রী কামনাটা কত তীব্র—তীক্ষ্ণ—নির্মম। এই বাসনার ভোগে যে সুখ, সে হ'চ্ছে পৈশাচিক সুখ। এতে শুধু দীপক রাগিণীর মত পুড়িয়েই দিয়ে যায় আমাদের! অথচ এই দীপকের আগুন একবাব জ্ব'লে উঠবেই আমাদের জীবনের নব-ফাল্গুনে। সেই সময় স্নিগ্ধ মেঘ-মল্লারের মত সান্ত্বনার একটা-কিছু পাশে না থাকলে সে যে জ্ব'লবেই—দীপক যে তাকে জ্বালাবেই।

তাই তো যে-দিন পুষ্পিত যৌবনেব ভারে আমি ঢ'লে ঢ'লে প'ড়ছিলাম, আর একজন এসে আমার যাজ্ঞা ক'রলে, তখন আমার এই বাহিরের প্রবৃত্তিটা দমন ক'রবার ক্ষমতাই যে রইল না! তখন যে আমি অন্ধ। ওগো দেবতা, সে-দিন তুমি কোথায় ছিলে? কেউ যে এল না শাসন ক'রতে তখন! হায়, সেই দিনই আমার মৃত্যু হ'ল! সেই দিনই আমি ভিখারিণী হ'য়ে পথে ব'সলাম। ওগো, আমার সেই অধঃপতনের দিনে চোখে যে পুঞ্জীভূত অন্ধকারের নিবিড় কালিমা একেবারে ঘন-জমাট হ'য়ে ব'সেছিল, তখন এখনকাব মত এতটুকুও আলোক যে সে-অন্ধকারটাকে তাড়াতে চেষ্টা করেনি। হয়তো একটি রশ্মিরেখার ঈষৎপাতে সব অন্ধকার সে-দিন ছুটে পালাত। তা হ'লে দেখতে গো, কে আমার সমস্ত হৃদয়-আসন জুড়ে রাজাধিরাজ একচ্ছত্র সম্রাটের মত ব'সে আছে।

তবু যে আমার এ অধঃপতন হ'ল, তা সে-দিনও বুঝতে পারিনি, আজও বুঝতে পাবছিনে, কেমন যেন সব গোলমাল হ'য়ে যাচ্ছে! কিন্তু আমি যদি বলি, আমার প্রেম—বক্ষের গভীর গোপন-তলে-নিহিত মহান্ প্রেম, যা সর্বদাই পবিত্র, তা তেম্‌নি পূত অনবদ্য আছে আর চিরকালই থাকবে, তাব গায়ে আঁচড় কাটে বাইরের কোন অত্যাচার-অনাচারেব এমন ক্ষমতা নেই,- -তা হ'লে কে বুঝবে? কেই বা আমায় ক্ষমা ক'রবে? তবু আমি ব'লব, প্রেম চিরকালই পবিত্র, দুর্জয়, অমর , পাপ চিরকালই কলুষ, দুর্বল আর ক্ষণস্থায়ী।

ওঃ---মা। কি অসহ্য বেদনা এই সারা বুকের পাঁজবে পাঁজরে!.. কি সব ভুল ব'ক্‌ছিলাম এতক্ষণ? ঠিক যেন খোওযাব দেখছিলাম, না? ... পাপ ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু নদীর বান-ভাসির পর যেমন বান রেখে যায় একটা পলির আবরণ সারা নদীটার বুকে, তেম্‌নি পাপ রেখে যায় সঙ্কোচের পুরু একটা পর্দা , সেটা কিন্তু ক্ষণস্থায়ী নয়, সেটা হযতো অনেকেরই সারা জীবন ধ'রে থাকে। পাপী নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে হাজার ভাল ক'রে চ'ললেও ভাবে, আমার এ দুর্নাম তো সারাজীবন কাদা-লেপ্টা হ'য়ে লেগেই থাকবে। চাঁদের কলঙ্ক পূর্ণিমার জোৎস্নাও যে ঢাকতে পারে না! এই পাপেব অনুশোচনাটাও কত বিষাক্ত—তীক্ষ্ণ! ঠিক যেন এক সঙ্গে হাজার হাজার ছুঁচ বিঁধছে বুকের প্রতি কোমল জায়গায়। ...

আবার আমার মনে প'ড়ছে সেই আমার বিপথে-টেনে-নেওয়া শয়তান সয়ফুল্ মুল্‌কের কথা। সে-ই তো যত 'নষ্ট গুড়ের খাজা'। এখন তাকে পেলে নখ দিয়ে ছিঁড়ে ফেলতাম!

আমরা নারী, —মনে করি, এতটুকুতেই আমাদের হৃদয় অপবিত্র হ'য়ে গেল, আর অনুশোচনায় মনে মনে পুড়ে মরি। আমরা আরও ভাবি যে, হয়তো পুরুষদের অত সামান্যতে পাপ স্পর্শে না। আর তাদের মনে এত তীব্র অনুশোচনাও জাগে না। কিন্তু সেই যে সে-দিন, যে-দিন আমার বাসনার পিয়াস শুকিয়ে গিয়েছে, আর মধু ভেবে আকণ্ঠ হলাহল পানের তীব্র জ্বালায় ছট্-ফট্ ক'রছি, আর ঠিক সেই সময় সহসা বিরাট বিপুল হ'য়ে আমার ভিতরের প্রেমের পবিত্রতা অপ্রতিহত তেজে জেগে উঠেছে— সে তেজ চোখ দিয়ে ঠিকরে বেরুচ্ছে— সেই দিন--ঠিক সে-দিন—সয়ফুল্ মুল্‌ক্ সহসা কি রকম ছোট হ'য়ে গেল! একটা দুর্বার ঘৃণামিশ্রিত লজ্জার কালিমা তার মুখটাকে কেমন বিকৃত ক'রে দিলে! সে দূব থেকে কেমন আমার দিকে একটা ভীত-চকিত দৃষ্টি ফেলে উপর দিকে দু'হাত তুলে আর্তনাদ ক'রে উঠল—

"খোদা! আমি জীবন দিয়ে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'রব। তবে যেন সে-জীবন মঙ্গলার্থেই দিতে পারি, শুধু এইটুকু ক'রো খোদা!"

তার পর কেমন সে উন্মাদের মত ছুটে এসে আমার পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে ব'ললে, — "দেবী, ক্ষমা ক'রো এ শয়তানকে! দেবীর দেবীত্ব চিরকালই অটুট থাকে, বাইরের কলঙ্কে তা কলঙ্কিত হয় না, বরং সংঘর্ষণের ফলে তা আরও মহান উজ্জ্বল হ'য়ে যায়! কিন্তু আমি?—আমি? ওঃ, ওঃ, ওঃ!" সে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল। তার সে-ছোটা থেমেছে কিনা জানিনে।

কিন্তু এ কি? আবার আমার মনটা কেন আমাকে যেন ভাঙানি দিচ্ছে শুধু একবার দেখে আসতে যে, তিনি তেম্নি ক'রে সেই খেজুর-কাঁটার ঝোপে বেহুঁশ হ'য়ে প'ড়ে আছেন কি না। ... না, না,—এ প্রাণ-পোড়ানি আর সইতে পারি নে গো—আর সইতে পারি নে! হ্যাঁ, তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রবই ক'রব, একবার শেষ দেখা , তার পর ব'লব তাঁকে—ওগো, তোমার সে বেদৌরা আর নেই, সে ম'রেছে, ম'রেছে। তার প্রাণ তোমারই সন্ধানে বেরিয়ে গিয়েছে! তুমি তাকে বৃথা এমন ক'রে খুঁজে বেড়াচ্ছ। বেদৌরা নেই—নেই— নেই!

তার পর — তার পর? তার পরেও যদি তিনি আমায় চান, তা হ'লে কি ব'লব তাঁকে, কি ক'রব তখন?— না, তখনও এম্নি শক্ত কাঠ হ'য়ে ব'লব, —ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না গো দেবতা, ছুঁয়ো না! আমার এ অপবিত্র দেহ ছুঁয়ে তোমার পবিত্রতার অবমাননা ক'রো না।

আঃ মা গো! কি ব্যথা! বুকের ভিতরটা কে যেন ছুরি হেনে খান্ খান্ ক'রে কেটে দিচ্ছে। ..

দারার কথা

গোলেস্তান

তুমি কি সেই গোলেস্তান? তবে আজ তুমি এত বিশ্রী কেন! তোমার ফুলে সৌন্দর্য নেই, শুধু তাতে নরকের নাড়ী-উঠে-আসা পূতিগন্ধ। তোমার আকাশ আর তেমন উদার নয়, কে যেন তাকে পঙ্কিল, ঘোলাটে ক'রে দিয়েছে! তোমার মলয় বাতাসে যেন লক্ষ হাজার কাচের টুক্‌রো লুকিয়ে র'য়েছে। তোমার সারা গায়ে যেন বেদনা। ..

কি ক'রলে বেদৌরা তুমি? বেদৌরা! —নাঃ, এই যে ব্যথা দিলে তুমি, এই যে প্রাণ-প্রিয়তমের কাছ থেকে পাওয়া নিদারুণ আঘাত, এতেও নিশ্চয়ই খোদার মঙ্গলেচ্ছা নিহিত আছে! আমি কখনই ভুলব না খোদা, যে, তুমি নিশ্চয় মহান্ আর তোমার-দেওয়া সুখ-দুঃখ সব সমান ও মঙ্গলময়! তোমার কাজে অমঙ্গল থাকতে পারে না, আর তুমি ছাড়া ভবিষ্যতের খবর কেউ জানে না। ব্যথিতের বুকে এই সান্ত্বনা কি শান্তিময়!

আচ্ছা, তবু মন মানছে কই? কেন ভাবছি, এ নিশ্চয়ই আঘাত? তৃষাতুর চাতক যখন 'ফটিক জল—ফটিক জল' ক'রে কেঁদে কেঁদে মেঘের কাছে এসে পৌঁছে, আর নিদারুণ মেঘ তার বুকে বজ্র হেনে দিয়ে বিদ্যুৎ হাসি হাসে, তখন কেন মনে করি, এ মেঘের বড়ই নিষ্ঠুরতা! —কেন?

কিন্তু এত দিনেও নিজের স্বরূপ জানতে পারলুম না। আগে মনে ক'রতুম আমি কত বড় —কত উচ্চ! আজ দেখছি, সাধারণ মানুষের চেয়ে আমি এক রত্তিও বড় নই! আমারও মন তাদের মত অমনি সঙ্কীর্ণতা আর নীচতায় ভরা। নইলে আমি বেদৌরার এ দোষ সরল মনে ক্ষমা ক'রতে পারলুম না কেন? হোক্ না কেন যতই বড় সে দোষ। বাহিরটা তার নষ্ট হ'য়েছে বটে, কিন্তু ভিতরটা যে তেমনি পবিত্র আর শুভ্র র'য়েছে। অনেকে যে ভিতরটা

অপবিত্র ক'রে বাহিরটা পবিত্র রাখবার চেষ্টা ক'রে, সেইটাই হচ্ছে বড় দোষ। কিন্তু এই যে বেদৌরার সহজ সরলতায় তার ভিতরটা পবিত্র র'য়েছে জেনেও তাকে প্রাণ খুলে ক্ষমা ক'রতে পারলুম না, সে দোষ তো আমারই ; কেননা আমি এখনও অনেক ছোট। জোর ক'রে বড় হবার জন্যে একবার ক্ষমা ক'রতে ইচ্ছে হ'য়েছিল বটে, কিন্তু তা তো হ'তে পারে না। সে যে হৃদয় হ'তে নয়! নাঃ, আমাকে পুড়ে খাঁটি হ'তে হবে। খুব দূরে থেকে যদি মনটাকে ঠিক ক'রতে পারি, তবেই আবার ফিরব, নইলে নয়। ওঃ, কি নীচ আমি! প্রথমে বেদৌরার মুখ থেকে তার এই পতনের কথা শুনে আমিও তো একেবারে নরক-কুণ্ডে গিয়ে পৌঁছেছিলুম। মনে ক'রেছিলুম, আমিও এম্নি ক'রে আমার সুপ্ত কামনায় ঘৃতাহুতি দিয়ে বেদৌরার ওপর শোধ নেব। তার পর নরকের দ্বার থেকে কেমন ক'রে হাত ধ'রে অশ্রু মুছিয়ে আমায় কে যেন ফিরিয়ে আনলে! সে বেশ শান্ত স্বরেই ব'ললে, —"এ প্রতিশোধ তো বেদৌরার ওপর নয় ভাই, এ প্রতিশোধ তোমার নিজের ওপর!" ভাবলুম, তাই তো, অভিমানের ব্যথায় ব্যথিত হ'য়ে এ কি আত্মহত্যা ক'রতে যাচ্ছিলুম! আমি আবার ফিরলুম।

তার পর বেদৌরাকে ব'লে এলুম, " বেদৌরা! যদি কোন দিন হৃদয় হ'তে ক্ষমা ক'রবার ক্ষমতা হয়, তবেই আবার দেখা হবে, নইলে এই আমাদের চির বিদায়। মুখে জোর ক'রে ক্ষমা ক'রলুম ব'লে তোমায় গ্রহণ ক'রে আমি তো একটা মিথ্যাকে বরণ ক'রে নিতে পারিনে। আমি চাই, প্রেমের অঞ্জন আমার এই মনের কালিমা মুছিয়ে দিক্।"

বেদৌরা অশ্রু-ভরা হাসি হেসে ব'ললে—"ফিরতেই হবে প্রিয়তম, ফিরতেই যে হবে তোমার। এ সংশয় দু'-দিনেই কেটে যাবে। তখন দেখবে, আমাদের সেই ভালবাসা কেমন ধৌত শুভ্র বেশে আরও গাঢ় পূত হ'য়ে দেখা দিয়েছে! আমি তোমারই প্রতীক্ষায় গোলেস্তানের এই ক্ষীণ ঝর্নাটার ধারে ব'সে গান আর মালা গাঁথব। আর তা যে তোমায় প'রতেই হবে। ব্যথার পূজা ব্যর্থ হবার নয় প্রিয়! . . "

কোথায় যাই এখন, আর সে কোন্ পথে? ওগো আমার পথের চিরসাথি, কোথায় তুমি?

সয়ফুল্-মুল্‌কের কথা

* * *

আমি সেই শয়তান, আমি সেই পাপী, যে এক দেবীকে বিপথে চালিয়েছিল। ভাবলুম, এই ভুবনব্যাপী যুদ্ধে যে-কোনো দিকে যোগ দিয়ে যত শীগ্‌গীর পারি এই পাপ জীবনের অবসান ক'রে দিই। তার পর? তার পর আর কি? যা সব পাপীদের হয়, আমারও হবে।

পাপী যদি সাজা পায়, তা হ'লেও সে এই ব'লে শান্তি পায় যে, তার ওপর অবিচার করা হ'চ্ছে না, এই শাস্তিই যে তার প্রাপ্য। কিন্তু শাস্তি না পেলে ভিতরের বিবেকের যে দংশন, তা নরক-যন্ত্রণার চেয়ে অনেক বেশী ভয়ানক।

যা ভাবলুম, তা আর হ'ল কই! ঘুরতে ঘুরতে শেষে এই মুক্তিসেবক সৈন্যদের দলে যোগ দিলুম। এ পরদেশীকে তাদের দলে আসতে দেখে এই সৈন্যদল খুব উৎফুল্ল হ'য়েছে। এরা ম'নে ক'রছে, এদের এই মহান্ নিঃস্বার্থ ইচ্ছা বিশ্বের অন্তরে অন্তরে শক্তি সঞ্চয় ক'রছে। আমায় আদর ক'রে এদের দলে নিয়ে এরা বুঝিয়ে দিলে যে, কত মহাপ্রাণতা আর পবিত্র নিঃস্বার্থপরতা প্রণোদিত হ'য়ে তারা উৎপীড়িত বিশ্ববাসীর পক্ষ নিয়ে অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক'রছে এবং আমিও সেই মহান্ ব্যক্তিসঙ্ঘের একজন। আমার কালো বুকে অনেকটা তৃপ্তির আলোক পেলুম!

খোদা, আজ আমি বুঝতে পারলুম, পাপীকেও তুমি ঘৃণা কর না, দয়া কর। তার জন্যেও সব পথই খোলা রেখে দিয়েছ। পাপীর জীবনেও দরকার আছে। তা দিয়েও মঙ্গলের সল্‌তে জ্বালানো যায়। সে ঘৃণ্য অস্পৃশ্য নয়।

কিন্তু সহসা এ কি দেখলুম! দারা কোথা থেকে এখানে এল? সে-দিন তাকে অনেক ক'রে জিজ্ঞেস করায় সে ব'ললে, "এর চেয়ে ভাল কাজ আর দুনিয়ায় খুঁজে পেলুম না, তাই এ-দলে এসেছি।"

আঘাত খেয়ে খেয়ে কত বিরাট গম্ভীর হ'য়ে গিয়েছে সে। আমাকে ক্ষমা চাইতেই হবে যে এই বেদনাতুর যুবকের কাছে ; নইলে আমার কোথাও ক্ষমা নেই। এর প্রাণে এই ব্যথার আগুন জ্বালিয়েছি তো আমিই, একে গৃহহীন ক'রেছি তো আমিই।

কি অচিন্ত্য অপূর্ব অসমসাহসিকতা নিয়ে যুদ্ধ ক'রছে দারা! সবাই ভাবছে, এত অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রাণের প্রতি ভ্রূক্ষেপও না ক'রে বিশ্ববাসীর মঙ্গলের জন্যে হাসতে হাসতে যে এমন ক'রে বুকের রক্ত দিচ্ছে, সে বাস্তবিকই বীর, আর তাদের জাতিও বীরের জাতি! এমন দিন নেই, যে-দিন একটা-না-একটা আঘাত আর চোট না খেয়েছে সে। সে-দিকে কিন্তু দৃষ্টিই নেই তার। সে যেন অগাধ অসীম এক যুদ্ধ-পিপাসা নিয়ে প্রচণ্ড বেগে মৃত্যুর মত কঠোর হ'য়ে অন্যায়কে আক্রমণ ক'রছে। যতক্ষণ এতটুকুও জ্ঞান থাকে তার, ততক্ষণ কার সাধ্য তাকে যুদ্ধস্থল থেকে ফেরায়! কি একরোখা জেদ! আমিও কিন্তু বুঝতে পারছি, এ সংগ্রাম তার বাইরের জন্য নয়, এ যে ভিতরের ব্যথার বিরুদ্ধে ব্যর্থ অভিযান। আমি জানি, হয় এর ফল অতি বিষময়, নতুবা খুবই শান্ত-সুন্দর।

ক'দিন থেকে বোমা আর উড়োজাহাজ হ'য়েছে এর সঙ্গী। বাইরে ভিতরে এত আঘাত এত বেদনা অম্লান বদনে সহ্য ক'রে কি ক'রে একাদিক্রমে যুদ্ধ জয় ক'রছে এই উন্মাদ যুবক? ভয়টাকে যেন আরব সাগরে বিসর্জন দিয়ে এসেছে!

আজ সে একজন সেনাপতি। কিন্তু এ কি অতৃপ্তি এখনও তার মুখে বুকে জাগছে? রোজই জখম হচ্ছে, কিন্তু তাকে হাসপাতালে পাঠায় কার সাধ্য! গোলন্দাজ সৈনিককে ঘুমাবার ছুটি দিয়ে ভাঙা-হাতেই সে কামান দাগছে। সেনাপতি হ'লেও সাধারণ সৈনিকের মত তার হাতে গ্রিনেডের আর বোমার থলি, পিঠে তরল আগুনের বাল্‌তি, আর হাতে রিভল্‌ভার তো আছেই। রক্ত বইয়ে, লোককে হত্যা ক'রে তার যে কি আনন্দ, সে আর কি বলব! সে ব'লছে, পরাধীন লোক যত কমে ততই মঙ্গল।

আমি অবাক্ হচ্ছি, এ সত্যি-সত্যিই পাগল হ'য়ে যায় নি তো!

*　　　　*　　　　*

এ কি ক'রলে খোদা! এ কি ক'রলে? এত আঘাতের পরেও হতভাগ্য দারাকে অন্ধ আর বধির ক'রে দিলে? এই পৈশাচিক যুদ্ধ-তৃষ্ণার ফলে যে এই রকমই একটা কিছু হবে, তা আমি অনেক আগে থেকেই ভয় ক'রছিলাম! আচ্ছা করুণাময়, তোমার লীলা আমরা বুঝতে পারিনে বটে, কিন্তু এই যে নিরপরাধ যুবকের চোখ দু'টো বোমার আগুনে অন্ধ আর কান দু'টো বধির ক'রে দিলে, আর আমার মত পাপী শয়তানের গায়ে এতটুকু আঁচড় লাগল না, এতেও কি ব'লব যে, তোমার মঙ্গল-ইচ্ছা লুকানো রয়েছে? কি সে মঙ্গল, এ অন্ধকে দেখাও প্রভু, দেখাও! এ অন্ধের দাঁড়াবার যষ্টিও যে ভেঙে দিয়েছি আমি! তবে কি আমার বাহিরটা অক্ষত রেখে ভিতরটাকে এমনি ছিন্ন-ভিন্ন আর ক্ষত-বিক্ষত ক'রতে থাকবে? ওগো ন্যায়ের কর্তা! এই কি আমার দণ্ড,—এই বিশ্বব্যাপী অশান্তি? ....

*　　　　*　　　　*

আজ আমাদের ঈপ্সিত এই প্রধান জয়োল্লাসের দিনেও আমাদের জয়পতাকাটা রাজ-অট্টালিকার শিরে থর্ থর্ ক'রে কাঁপছে। বিজয়-ভেরীতে জয়নাদের পরিবর্তে যেন জান-মোচ্‌ড়ানো শ্রান্ত 'ওয়ালট্‌জ্'-রাগিণীর আর্ত সুর হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বেরুচ্ছে। তূর্য-বাদকের স্বর ঘন ঘন ভেঙে যাচ্ছে। আজ অন্ধ সেনানী দারার বিদায়ের দিন! অন্ধ-বধির-আহত দারা যখন আমার কাঁধে ভর ক'রে সৈনিকদের সাম্‌নে দাঁড়াল, তখন সমস্ত মুক্তিসেবক সেনার নয়ন দিয়ে হু হু ক'রে অশ্রুর বন্যা ছুটেছে। আমাদের কঠোর সৈনিকদের কান্না যে কত মর্মন্তুদ, তা বোঝাবার ভাষা নেই। মুক্তিসেবক-সৈন্যাধ্যক্ষ ব'ললেন—তাঁর স্বর বারংবার অশ্রুজড়িত হ'য়ে যাচ্ছিল,—"ভাই দারাবী!... আমাদের মধ্যে 'ভিক্টোরিয়া ক্রস্', 'মিলিটারী ক্রস্' প্রভৃতি পুরস্কার দেওয়া হয় না, কেননা আমরা নিজে নিজেই তো আমাদের কাজকে পুরস্কৃত ক'রতে পারিনে। আমাদের বীরত্বের, ত্যাগের পুরস্কার বিশ্বব্যাপীর কল্যাণ . কিন্তু যারা তোমার মত এই রকম বীরত্ব আর পবিত্র নিঃস্বার্থ ত্যাগ দেখায়, আমরা শুধু তাদেরই বীর বলি।"

সৈন্যাধ্যক্ষ পুনরায় ঢোক গিলে আর কোটের আস্তিনে তাঁর অবাধ্য অশ্রুফোঁটা ক'টি মুছে নিয়ে ব'ললেন—"তুমি অন্ধ হ'য়েছ, তুমি বধির হ'য়েছ, তোমার সারা অঙ্গে জখমের কঠোর চিহ্ন,— আমরা ব'লব, এই তোমার বীরত্বের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার! অনাহূত-তুমি বিশ্বের মঙ্গল-কামনায় প্রাণ দিতে এসেছিলে, তার বিনিময়ে খোদা নিজ হাতে যা দিয়েছেন, — হোক না কেন তা বাইরের চোখে নির্মম —তার বড় পুরস্কার, মানুষ আমরা কি দেব ভাই? "খোদা নিশ্চয়ই মহান্ এবং তিনি ভাল কাজের জন্যে লোকদের পুরস্কৃত করেন"– এ যে তোমাদেরই পবিত্র কোর্‌আনের বাণী! অতএব হে বীর সেনানী, হয় তো তোমার এই অন্ধত্ব ও বধিরতার বুকেই সব শান্তি সব সুখ সুপ্ত র'য়েছে। খোদা তোমায় শান্তি দিন!"

দারা তার দৃষ্টিহীন চোখ দু'টি দিয়ে যতদূর সাধ্য সৈনিকগণকে দেখবার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে অশ্রুচাপা কণ্ঠে শুধু ব'লতে পেরেছিল— "বিদায়, পবিত্র বীর ভাইরা আমার!"

আমিও অন্ধ দারার সঙ্গে আবার এই গোলেস্তানেই এলাম! আর এই তো আমার ব্যর্থ জীবনের সান্ত্বনা, এই নির্বিকার বীরের সেবা! দারা আমায় ক্ষমা ক'রেছে, আমায় সখা ব'লে কোল দিয়েছে। এতদিনে-না এই হতভাগ্য যুবকের রিক্ত জীবন সার্থকতার পুষ্পে পুষ্পিত হ'য়ে উঠল। এতদিনে না সত্যিকার ভালবাসায় তাকে ঐ অসীম আকাশের মতই অনন্ত উদার ক'রে দিলে! রাস্তায় আসতে আসতে তাকে জিজ্ঞেস ক'রলাম,—"আচ্ছা ভাই, তুমি বেদৌরাকে ক্ষমা ক'রেছ?"

সে কান্না ভরা হাসি হেসে সাধকশ্রেষ্ঠ প্রেমিক কবীর এই গজলটা গাইলে,--

"ওগো প্রিয়তম! তুমি যত বেদনার শিলা দিয়ে
আমার বুকে আঘাত ক'রেছ, আমি তাই দিয়ে যে
প্রেমের মহান মসজিদ তৈরি ক'রেছি।"

আমার বিশ্বাস, শিশুদের চেয়ে সরল আর কিছু নেই দুনিয়ায়। দারাও প্রেমের মহিমায় যেন অম্‌নি সরল শিশু হ'য়ে প'ড়েছে। তার মুখে কেমন সহজ হাসি, আবার কেমন অসঙ্কোচ কান্না! তা কিন্তু অতি বড় পাষাণকেও কাঁদায়! আমি সে দিন হাসতে হাসতে ব'ললাম,— "হাঁ ভাই, এই যে তুমি অন্ধ আর বধির হ'য়ে গেলে, এতে মঙ্গলময়ের কোন মঙ্গলের আভাস পাচ্ছ কি?"

সে ব'ললে, -"ওরে খোকা, এই যে ওদের আজ ক্ষমা ক'রতে পেরেছি--এই যে আমার মনের সব গ্লানি সব ক্লেদ ধুয়ে মুছে সাফ্ হ'য়ে গিয়েছে, সে এই অন্ধ হ'য়েছি ব'লেই

তো —এই বাইরের চোখ দু'টোকে কানা ক'রে আর শ্রবণ দু'টোকে বধির ক'রেই তো! অন্ধেরও একটা দৃষ্টি আছে, সে হ'চ্ছে অন্তর্দৃষ্টি বা অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি। এখন আমি দেখছি দুনিয়া-ভরা শুধু প্রিয়ার রূপ আর তারই হাসির অনন্ত আলো। আর এই কালা কান দু'টো দিয়ে কি শুনছি, জানিস? শুধু তার কানে-কানে বলা গোপন প্রেমালাপের মঞ্জু গুঞ্জন আর চরণভরা মঞ্জীরের রুণু-ঝুনু বোল! আমি যে এই নিয়েই মশগুল।" ব'লেই অভিভূত হয়ে সে গান ধ'রলে,—

"যদি আর কারে ভালবাস, যদি আর নাহি ফিরে আস,
তবে তুমি যাহা চাও, তাই যেন পাও, আমি যত দুখ পাই গো!
আমার পরান যাহা চায়, তুমি তাই তুমি তাই গো,
তুমি ছাড়া মোর এ জগতে আর কেহ নাই কিছু নাই গো!"—

কানাড়া রাগিণীর কোমল গান্ধারে আর নিখাদে যেন তার সমস্ত আবিষ্ট বেদনা মূর্ত্তি ধ'রে মোচড় খেয়ে খেয়ে কেঁদে যাচ্ছিল! কিন্তু কত শান্ত স্নিগ্ধ বিরাট নির্ভরতা আর তৃপ্তি এই গানে!

সব চেয়ে আমার বেশী আশ্চর্য বোধ হ'চ্ছে যে, বেদৌরা আমাকে ক্ষমা ক'রেছে, অথচ তার এ-বলায় এতটুকু কৃত্রিমতা বা অস্বাভাবিকতা নেই। এ যেন প্রাণ হ'তে ক্ষমা ক'রে বলা!

খোদা, তুমি মহান্! "যার কেউ নেই তুমি তার আছ।" এই প্রেমিকদের সোনার কাঠির স্পর্শে আমি-যে-আমি, তারও আর কোন গ্লানি নেই, সঙ্কোচ নেই!

আজ এই বিনা কাজের আনন্দ, —ওঃ তা কত মধুর আর সুন্দর!

বেদৌরার কথা

গোলেস্তান

(নির্ঝরের অপর পার)

তিনি আমায় ক্ষমা ক'রেছেন একেবারে প্রাণ খুলে, হৃদয় হ'তে! এবার এ-ক্ষমায় এতটুকু দীনতা নেই। এ যে হবেই, তা তো আমি জানতামই, আর তাই যে এমন ক'রে আমার প্রতীক্ষার সকাল সাঁঝগুলি আনন্দেই কেটে গিয়েছে! আমার এই আশায় ব'সে থাকা দিনগুলি বিরলে-গাঁথা ফুলহারগুলি আর বেদনা-বারিসিক্ত বিরহ গানগুলি তাঁরই পা'য়ে ঢেলে দিয়েছি। তিনি তা গলায় তুলে তার বিনিময়ে যা দিয়েছেন, সে তো গো তাঁর আমায় দেওয়া ব্যথার দান!

তিনি বললেন—"বেদৌরা! কামনা আর প্রেম, এ দুটো হ'চ্ছে সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। কামনা একটা প্রবল সাময়িক উত্তেজনা আর প্রেম হচ্ছে ধীর, প্রশান্ত ও চিরন্তন। কামনার প্রবৃত্তি বা তার নিবৃত্তিতে হৃদয়ের দাগ-কাটা ভালবাসাকে যে ঢাকতেই পারে না এ হ'চ্ছে ধ্রুব সত্য। এই রকম বিড়ম্বিত যে বেচারারা এই কথাটা একটু তলিয়ে দেখে ধীরভাবে বিশ্বাস করে না, তারা মস্ত ভুল করে, আর তাদের মত হতভাগ্য অশান্ত জীবনও আর কারুর নেই। বাদলার দিনে কালো মেঘগুলো সূর্যকে গ্রাস ক'রতে যতই চেষ্টা করুক না কিন্তু পারে না। তবে তাকে খানিকক্ষণের জন্যে আড়াল ক'রে থাকে মাত্র। কেননা সূর্য থাকে মেঘের নাগাল পাওয়ার অনেক দূরে। কোন্ ফাঁকে আর সে কেমন ক'রে যে অত মেঘের পুরু স্তর ছিঁড়ে রবির কিরণ দুনিয়ার বুকে প্রতিফলিত হয়, তা মেঘরা ভেবে পায় না, আর পাগলের

জানতে চেষ্টা করিনে। তার পর মেঘ কেটে গেলেই সূর্য হাসতে থাকে আরও উজ্জ্বল হ'য়ে। কারণ, তাতে তো সূর্যের কোন অনিষ্টই হয় না,— সে জানে, সে যেমন আছে তেমনি অটুট থাকবেই ; ক্ষতি যা তোমার আমার —এই দুনিয়ার। তাই ব'লে কি বাদলের মেঘ আসবে না? সে এসে আকাশ ছাইবে না? সে আসবেই, ও যে স্বভাব , তাকে কেউ রুখতে পারবে না। তবে অত বাদলেও সূর্য-কিরণ পেতে হ'লে মেঘ ছাড়িয়ে উঠতে হয়। সেটা তেমন সোজা নয়, আর তা দরকারও করে না। কামনাটা হ'চ্ছে ঠিক এই বাদলের মত , আর প্রেম জ্ব'লছে হৃদয়ে ঐ রবিরই মত একই ভাবে সমান ঔজ্জ্বল্যে!

'কামনায় হয় তো তোমার বাহিরটা নষ্ট ক'রেছে, কিন্তু ভিতরটা তো নষ্ট ক'রতে পারেনি। তা ছাড়া, ও না হ'লে যে তুমি আমাকে এত বেশী ক'রে চিনতে না, এত বড় ক'রে পেতে না। বাইরের বাতাস প্রেমের শিখা নিবাতে পারে না, আরও উজ্জ্বল ক'রে দেয়। আর আমার অন্ধত্ব ও বধিরতার জন্যে কেঁদো না বেদৌরা, এ-গুলো থাকলে তো আমি তোমায় আর পেতাম না।"

পুষ্পিত সব গাছ থেকে অশ্রুচাপা কণ্ঠে "পিয়া পিয়া' ক'রে বুলবুলগুলো উড়ে গেল!

তিনি আবার ব'ললেন– "দেখ বেদৌরা, আজ আমাদের শেষ বাসর-শয্যা হবে। তার পর রবির উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তুমি চ'লে যাবে নিঝরটার ও-পারে, আর আমি থাকব এ পারে। এই দু'পারে থেকে আমাদের দু'জনেরই বিরহগীতি দুইজনকে ব্যথিয়ে তুলবে। আর ঐ ব্যথার আনন্দেই আমরা দু'জনে দু'জনকে আরও বড়—আরও বড় ক'রে পাব!"

সেই দিন থেকে আমি নির্ঝরের এ পারে

আমারও অশ্রু ভরা দীর্ঘশ্বাস হু হু ক'রে ওঠে, যখন মৌন-বিষাদে-নীরব সন্ধ্যায় তার ভারী চাপা কণ্ঠ ছেপে একটা করুণ রাগিণী ও পার হ'তে কাঁদতে কাঁদতে এ-পারে এসে বলে,—

"আমার সকল দুখের প্রদীপ জ্বেলে দিবস গেলে করব নিবেদন,
আমার ব্যথার পূজা হয়নি সমাপন।"

মেয়েমানুষ

জীবনানন্দ দাশ

বৈশাখের দুপুরবেলা।

চপলা আধঘণ্টা না ঘুমোতেই জেগে গেল। জানালার ফাক দিয়ে কৃষ্ণচূড়া গাছগুলো দেখা যায়—ফুল ঝরছে।

পাশের রুমে কড়া চুরুটের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে—স্বামী অফিস থেকে ফিরে এসেছে তাহলে?

চপলা উঠে দাঁড়াল। চুরুট হাতে হেমেন্দ্র ঢুকলে, চপলার দিকে একবার তাকিয়ে বললে— মোটর ফিট করতে বলে দিয়েছি।

চপলা আড়মোড়া দিয়ে বললে—থাক, আজ আর যাব না।

—বাঃ তুমিই তো বলেছিলে আজ শনিবার আছে—

—বলেছিলাম তো কিন্তু কোথায় যাব? সিনেমায়? কী আছে আজ? হেমেন বললে-- দেখি কাগজটা নিয়ে আসি।

কাগজ নিয়ে হেমেন ঘরে ঢুকতেই চপলা বললে,—থাক্, সিনেমা, ভালো লাগে না।

হেমেন ঈষৎ হতাশ হয়ে বললে—মনসুনের আগে রেস তো আর শুরু হবে না—

—থাক রেসফেসে আর দরকার নেই—অনেক টাকা খুইয়ে—দেখি কাগজটা—

হেমেন কাগজটা স্ত্রীর দিকে ঠেলে দিয়ে অবসন্ন হয়ে একটা কুশনের ওপর বসে চুরুটটা হাতে করে হাঁফাতে লাগল। একটা কোলা ব্যাঙ যেন টাই বেঁধে ছিটের কোট ঝুলিয়ে বসেছে।

চপলার বয়স চল্লিশ পেরিয়ে গেছে— হেমেনের ঊনপঞ্চাশ। দুজনেরই শরীর মোটা হয়ে চলেছে—মাথায় চুল পাতলা হয়ে আসছে—

হেমেনের প্যান্টের বেল্ট তার ভুঁড়িটাকে যেন আর সামলাতে পারে না, হেমেনের মুখও যেন তার ভুঁড়ির মতোই, চপলার মুখও হেমেনের মতোই যেন—কল্পনা বা স্বপ্নের কোনো চিহ্ন যেন এদের মুখাবয়বের ত্রিসীমানায়ও কোনোদিন ছিল না। হেমেনের নিজের অফিস। কয়েকখানা মাঝারি গোছের ট্রাক—ইট সুরকি ও সিমেন্ট নিয়ে কলকাতার শহরে ছোটাছুটি করছে—দশবছর ধরে। আরো নানারকম ব্রাঞ্চ বিজিনেস আছে। সামান্য কনট্রাক্টর হয়ে চব্বিশ পরগনায় জীবন শুরু করেছিল সে। এখন তার সমস্ত ব্যবসার হেড অফিস কলকাতায়—দু-তিন লাখ টাকা খাটছে।

চপলা কাগজখানা দেখছিল।

ঢনঢনিয়া মাড়োয়াড়ি মস্তবড় এক ভোজ দিয়েছে; নিমন্ত্রিত লোকজন-এর ভিতর প্রায় শতখানেক নাম উঠেছে; চপলা অত্যন্ত গভীর অভিনিবিষ্ট হয়ে একটি একটি করে নাম দেখছিল—সমস্তটুকু দেখতে তার আধঘণ্টা লাগল, হেমেনের চুরুট ফুরিয়ে গেল; চপলা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কাগজটা রেখে দিলে। না, এখন তারা এত বড়লোক হয় নি যে ওসব কলমে নাম তাদের উঠবে—কিন্তু ঢনঢনিয়ার বাড়ি ভোজে তার স্বামীও তো গিয়েছিল—চপলা নিজেও তো গিয়েছিল। না—নিজেদের যতটা তারা মনে করে ততটা নয়, এখনো

তার ঢের পেছনে, একশোটা নামের লিস্টের ভিতর তাদের নাম কোথাও নেই আজও নেই—এখন তাদের বয়স প্রায় পঞ্চাশ হতে চলল।

চপলা ঈষৎ অস্থির হয়ে উঠল। চুপচাপ বসে থাকলে মনটা কেমন বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে— মানুষদের ওপর—পৃথিবীর ওপর—নিজেদের জীবনের অকৃতকার্যতার ওপর।

চপলা নড়ে-চড়ে উঠে-বসে বললে—চলো, লীলাদের বাড়ি যাই।

— বেশ টয়লেট করে এস।

আধঘণ্টার ভেতর টয়লেট সেরে সাজসজ্জা করে চপলা এসে বললে—চা খেয়েছিলে?

হেমেন মাথা নেড়ে বললে—না।

— তাহলে ইয়াসিনকে বলি, একটু করে দিক।

— থাক আমি আর একটা চুরুট জ্বালাই এর চেয়ে, কোথায় যাবে?

-- চলো লীলাদের ওখানে যাই।

— লীলা? দ্বিজেন ওকে নিয়ে চলে যাবে শুনেছিলাম।

— কোথায়?

- শিলঙে।

-- কেন?

—কলকাতায় এই গরমে আমরাও তো দু চারদিনের জন্য কোথাও গেলে পারতাম, সবাই তো যাচ্ছে --

— একটু চেপে থাকো, কয়েকটা বড় অর্ডার এসেছে—ভালো ছেলেটির মতো এখন একটু চেপে থাকো তো লক্ষ্মীটি। কিন্তু লীলাকে নিয়ে দ্বিজেন যাচ্ছে? সত্যি!

হেমেন একটু হাসল।

চপলা বললে- ওদের দুজনে তো একদম বনে না— জানো?

দ্বিজেনের জন্য দুঃখ করতে লাগল চপলা। হেমেনেরও দুঃখ—দ্বিজেনের জন্য।

মোটরকারটা কেমন বিগড়ে গেছে, হেমেন হতাশ হয়ে কারটার দিকে একবার তাকাল,
— মোটরকার-এর কী হয়েছে যেন।

চপলা বললে—এই যা, — তাহলে আর—, চল ওপরে চলে যাই—

হেমেন যন্ত্রপাতিগুলো পরিষ্কার করে ঘাঁটিয়ে দেখল, মোটরকারটার দিকে হাঁ করে একবার তাকাল—পাঁচ মিনিটের মতো নটখট করলে সে, কিন্তু গাড়ি একচুলও নড়ল না।

ড্রাইভারের হাতে গাড়িটা ফেলে দিয়ে হেমেন বললে—চলো, বাসে যাই। বাসেই গেল তারা।

হেমেন বাসা করেছে বালিগঞ্জ অ্যাভিনিউতে —দ্বিজেন এখনো সেই সাবেকি শ্যামবাজারে থাকে। অনেক বলেকয়েও তাকে অ্যাভিনিউর দিকে টেনে আনা গেল না, সে কেবল বলে আচ্ছা আসছি—আসছি—কিন্তু আসে না, এই দশ বছরের ভিতরেও সে আসতে পারল না, টাকা দ্বিজেনের কম কি? কঞ্জুস সে একেবারেই না —লীলাও না, কিন্তু আসলে এদের বনে না, কেন যে পরস্পরের ভিতর এরকম বনে না—স্বামী-স্ত্রীতে— হেমেন বুঝে উঠতে পারছিল না। কেন যে এরা পরস্পরকে আঘাত করে শুধু?

বাস ভরতি, চপলাকে দেখে কেউ উঠে দাঁড়াল না। পরের স্ট্যান্ডে একজন উঠে গেল—হেমেন চপলাকে সেই দিকেই পাঠিয়ে দিল। দু-এক মিনিট পরে যখন তার বোধ হল যে একটা কুলি না কী চপলার পাশে বসে আছে তখন তাড়াতাড়ি স্ত্রীর হাত ধরে তাকে বাস থেকে নামিয়ে ছাড়ল হেমেন।

এরপর এরা ট্যাক্সি করল।

তেতলায় না পৌঁছতেই লীলার গলা—

হয়তো চাকরবাকর ধমকাচ্ছে। খুব বেয়াড়া বেয়াদব চাকরই বটে—লীলার আওয়াজও তেমনি খনখনে। হেমেনের মনে হল এই হচ্ছে জাঁদরেল আওয়াজ—তার স্ত্রীর যা নেই। এ না হলে ঘরের চাকরবাকরগুলোই লাই পেয়ে যায়, বন্ধুর কামিন দাবড়ে রাখতে পারা যায় না। কিন্তু তার নিজের এরকম গলা নেই। পদে-পদে কত ব্যবসার কাজ জলের মতো হাসিল হয়ে গেছে। এরকম ভাবতে ভাবতে হেমেন তৃপ্তির সঙ্গে দোতলায় পাপোসে নিজের বুটজোড়া ভালো করে ঘষে নিলে—চপলা হাই হিল ঘষলে।

চপলাকে বললে—লীলার সঙ্গে খবরদার লেগো না কিন্তু। ফর্ম ঠিক রেখো কিন্তু বুঝলে?

চুরুটটা জ্বালাবে কিনা বুঝতে পাবলে না সে , পকেটের থেকে বের করলে অন্তত ; কিন্তু তেতলায় উঠতে না- উঠতেই সেটা পকেটের ভিতর ফেলে দিল।

লীলার গলার আওয়াজ ডাইনিং রুমের দিক থেকে আসছে—হয়তো চাকরবাকব নিযে কী না-কী- হেমেনরা সেদিকে গেল না। দ্বিজেনটা হয়তো ড্রয়িংরুমে আছে—চপলাকে নিয়ে ড্রয়িংরুমের ভিতর ঢুকল হেমেন। কিন্তু কই, কেউ তো এখানে নেই।

—দ্বিজেন—

কোনো শব্দ নেই।

ঘড়িতে পৌনে তিনটে।

বেডরুমেও কেউ নেই। অগত্যা ডাইনিংরুমের দিকে গেল তারা, ঢুকে দেখল ডিনাব টেবিলের ওপর লীলা বসে —এ কী দারুণ রণচণ্ডী , হাতে তাব দুখানা রুটিকাটা ছুরি নাচছে, দ্বিজেন একপাশে একটা চেয়ারে বসে এক স্লাইস পাউরুটি হাতে করে চুপ কবে রয়েছে।

—দ্বিজেন—

—দ্বিজেনবাবু

লীলা আগবাড়িয়ে বললে—হয়েছে হয়েছে—ওকে আর আশকাবা দিতে হবে না—

একটা রুটিকাটা ছুরি ডিসের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিল লীলা , আর একখানা নিজেব হাতের ভিতর রেখে বললে—এই আমাদের চা খাওয়া শেষ হল। চপলা বললে—ভালোই।

হেমেন একটা চেয়ার টেনে এনে দ্বিজেনের গলায় হাত জড়িয়ে ফিসফিস করছিল। লীলা বললে--ওকে আর আশকারা দিও না ঠাকুরপো।

চপলা বললে—আহা বেচারা সারাদিন খেটেখুটে আসে—

লীলা চোখ গবম করে বললে— বেচারা মানে?

--আমি বলছিলাম দ্বিজেনবাবু—

—দ্বিজেনবাবু বেচাবা, আর আমি?

চপলা কোনো কথা বললে না।

— বেচারা সারাদিন খেটেখুটে আসে—তাবপর চপলা চুপ করে রইল।

লীলা বললে—সারাদিন খেটেখুটে আসে বলে তাকে নিয়ে কী করতে হবে?

চপলা বললে-- তোমরা নাকি বেড়াতে যাচ্ছ?

ছুরিটা দিয়ে নখ কাটতে-কাটতে লীলা বললে— কে বলেছে? কোথায়?

দ্বিজেন বললে—ছুবিটা দিয়ে নখ কেটো না—

লীলা দৃঢ়মুষ্টিতে ছুরির বাঁটটা ধরে দ্বিজেনের দিকে তাকাল— হেমেনের প্রাণ কেঁপে উঠল ; দ্বিজেনের গলার থেকে হাত তুলে নিয়ে অত্যন্ত দাক্ষিণ্যের সঙ্গে লীলার দিকে তাকাল সে।

দ্বিজেন বললে—এটা রুটিকাটা ছুবি নয়? ভুলে যাও কেন?

হেমেন দ্বিজেনের কাঁধ আস্তে চাপড়ে দিয়ে বললে—আহা থাক্, থাক্ না।

—থাকবে? কেমন থাকবে দেখাচ্ছি আমি। দ্বিজেনের কপাল লক্ষ্য করে লীলা হঠাৎ ছুরিটা মারল। ছুরিটা ফসকে দেওয়ালে গিয়ে লাগল।

কয়েক মিনিট সকলেই স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল।

আবো একটা ছুরি ছিল টেবিলে—কিন্তু লীলাও সেটা আর তুললে না। দ্বিজেন চশমাটা চোখ থেকে খসিয়ে নিয়ে মুছতে মুছতে বললে— ভোঁতা একটা রুটি কাটা ছুরি কপালে লাগলেও বা কী হত?

লীলা বললে—কিন্তু চোখে লাগত যদি—

—তাহলে কী হত?

—কী হত—ডিম বেরিয়ে যেত আব কী হত।

হেমেন বললে—ছি!

চপলা বললে— তোমাব স্বামীর ওরকম হলে তোমাব ভালো লাগত না কি লীলা?

লীলা বললে —স্বামী আমাব ! বড্ড স্বামী।

হেমেন আশ্চর্য হয়ে বললে—বলে কী?

চপলা হেমেনকে চোখ ইশারা করে বললে—'চুপ'।

দ্বিজেন মাথা নিচু করে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল। লীলা খানিকক্ষণ গোঁজ হয়ে চুপ করে রইল। তারপর বললে —সকলে মিলে ছুঁচোটেনের মতো ভুইয়েবুইয়ে নজর দিয়ে মাথা একেবারে খেয়ে ফেলেছে —

হেমেন বললে —কাব মাথা? দ্বিজেনের?

—আর কার।

—কে খেয়েছে?

—কেন তুমি—আব তোমাব স্ত্রী—

হেমেন রক্তাক্ত জমাট মুখে লীলার দিকে তাকাল। সেও হয়তো একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসবে চপলা সভয়ে হেমেনেব দিকে তাকিয়ে দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল।

দ্বিজেন হেমেনকে একটা ঠোনা দিয়ে বললে—চা খাবে নাকি?

চপলা বললে— দ্বিজেনবাবুব ভালো খাওয়া হয়নি বুঝি—আচ্ছা আমি তৈরি করছি।

লীলা আগুন হয়ে বললে — কেন তুমি তৈরি করে দিলে ভালো খাওয়া হবে আব আমি তৈরি করে দিলে হবে না?

চপলা সে কথাব কোনো জবাব না দিয়ে স্টোভ জ্বালাতে গেল।

লীলা চপলাব কব্জি চেপে ধরে বললে—

—জ্বালাও তো দেখি স্টোভ—জ্বালাবে। হাঁ?

দারুণ মোচড় খেয়ে চপলা টপকাতে টপকাতে নিজেকে সামলে নিয়ে একটা চেয়ারে গিয়ে বসল—সমস্ত শরীর তাব রিমঝিম করে উঠেছে যেন।

দ্বিজেন ফ্যানটা খুলে দিয়ে চেয়ারসুদ্ধ চপলাকে তুলে নিয়ে ফ্যানেব নীচে বসাল। তাবপর আস্তে আস্তে চপলার মাথায় হাত বুলোতে লাগল। লীলা বললে—জানি নে আবার! এই সবই তো করো তুমি! ... সাধে কি আমি চটি তোমার ওপর—যেই একটু নজর দিতে ভুলেছি—

লীলা উঠে দাঁড়াল।

দ্বিজেন আস্তে আস্তে সরে নিজের জায়গায় গিয়ে বসল।

লীলা বললে—তোমার লজ্জা করে না? চপলার সঙ্গে তোমার রক্তের কোনো সম্বন্ধ নেই—কী করে চেয়ারসুদ্ধ তুমি তাকে টেনে নিলে? তার গায়ে হাতই-বা দিলে কী করে।

হেমেন নড়ে চড়ে উঠল ; চপলা চোখ ইশারা করে তাকে থামতে বললে।

লীলা বললে—আর যদিও-বা কোনো আত্মীয়তা থাকত, সে তো তোমার স্ত্রী নয়, বোনও নয়, কী করে তার গায়ে হাত দিলে তুমি? আমার চোখের সামনেই এত, চব্বিশটা ঘণ্টা হাইকোর্টের নাম করে তুমি কী কর জানি না?

হেমেন বললে—কী করে?

লীলা বললে—এর ওপর আবার বিজিনেস ফেঁদেছে—

হেমেন বললে—বিজিনেস করেই তো—

চপলা বললে—কীসের বিজিনেস? দ্বিজেনবাবুর?

—কেন জে, বি, এ্যাণ্ড কোং—তুমি জানো না?

এতক্ষণ পরে কথাবার্তা ব্যবসার দিকে মোড় নিয়েছে দেখে হেমেন যথেষ্ট শান্তি বোধ করল। চুরুটটা এতক্ষণ পরে বের করলে, জ্বালিয়ে নিয়ে একটা টান দিয়ে অত্যন্ত আয়েসের সঙ্গে বললে—জে বি এ্যাণ্ড কোং কোম্পানি হচ্ছে-

লীলার মুখের দিকে তাকিয়ে চপলা বললে—থাক্-

হেমেন বললে—বাঙালি ফার্ম, এর ভেতর একজনও বিলেতি মানুষ নেই, না ইওরোপের, আমেরিকার, এমনকি মাড়োয়াড়ি অবধি নেই।

হেমেনের মনে হল সকলকে সে কোম্পানির রহস্য উদঘাটন করে স্তম্ভিত করেছে, কিন্তু কেউই স্তম্ভিত হয় নি; কেউ তার কথা শুনছিল না।

হেমেন বলে চললে—মাড়োয়াড়ি নেই, ভাটিয়া নেই পশ্চিমা মুসলমান নেই—শুধু বাঙালি হিন্দু—ব্যস্!

হেমেন বললে—ওয়ার-এর সময় এই কোম্পানি স্টার্ট করা হয়, প্রথম হয় রেঙ্গুনে, তখন অনেক কিছুই বুজরুকি হয়েছিল বটে, কিন্তু এটা বজরুকি নয়, একেবারে কৌশলে, তখন দ্বিজেনের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না।

দু-মিনিট গভীর আনন্দের সঙ্গে চুরুট টেনে পরম পরিতৃপ্ত হয়ে হেমেন বললে—দ্বিজেন তো গুডউইল কিনেছে তিনবছর আগে—লীলার দিকে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাকাল হেমেন।

বললে—প্র্যাকটিশ শিগ্‌গিরই ছেড়ে দেবে।

চপলা বললে—কেন?

হেমেন জ্বলন্ত চুরুটটার দিকে সস্নেহে তাকিয়ে বললে—এই বিজিনেসের কাছে প্র্যাকটিশ আবার কী?

লীলা বললে—বিজিনেস করে টাকা জমিয়ে হবে কী?

হেমেন অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে লীলার দিকে তাকাল।

লীলা বললে—এই তো চোখের সামনে দেখলাম চপলার সঙ্গে কীরকম ব্যবহার করল চপলা তার কেউ না—মাথায় হাত রেখে পিঠ বুলিয়ে ফিস ফিস করে কানে কানে কথা বলে কি নোংরামির পরিচয় দিল বলো তো ঠাকুরপো?

দেখেছি এগারো-বারো ঘণ্টা বাইরে থাকে—

হেমেনের মন গজগজ করে উঠছিল—লীলার কথা ফুরোতে না-ফুরোতেই ফুক ফুক করে হেসে উঠল।

চপলা বললে—উনি তো আঠারো ঘণ্টা বাইরে থাকেন—

লীলা বললে—হ্যাঁ উনি—তোমার ওঁর ওই টেকো মাথা বোঁদা চেহারা দেখে কোনো মেয়ে ওর সঙ্গে গাঁট বাঁধতে আসবে?

হেমেনের দিকে তাকিয়ে ফিক করে হেসে লীলা বললে—ঠাকুরপো, তোমার নাক যেন বুড়ো আঙুলের মতো উঁচিয়ে আছে—বাপরে বাপরে।

লীলা হো হো করে হেসে গড়াতে লাগল—টাকা টাকা মুখ—নাক টেবু টেবু চোখদুটো প্যাঁট-প্যাঁট করছে—কোনো মেয়ে এসব দেখে এলে না—

হেমেন লাফিয়ে উঠে বললে—বটে। খুব দমফাই হচ্ছে বুঝি? আজও যদি চোখ মারি তো কুড়ি পঁচিশটা মেয়ে এমন ফ্যা ফ্যা করে আমার পায়ের কাছে এসে গড়াবে।

লীলা হেসে কুটি কুটি হয়ে বললে—চোখ মারি! ঠাকুরপো মারবে আবার চোখ—তাহলেই হয়েছে—

চপলা বললে—ছি। চোখ মারামারি আবার কী। তুমি কক্ষনো যা কর না সেই সব নিয়ে আবার বড়াই করো বলো কেন?

লীলাকে বললে—না কক্ষনো না, বুঝলে দিদি এই কুড়ি পঁচিশ বছর ধরে ওঁর সঙ্গে আছি—একদিনের জন্যও কোনো মেয়ে মানুষের দিকে উনি ফিরেও তাকানও নি—ওঁর ব্যবসায়ের সমস্ত লোক জানে যে ওর কারবার অকলঙ্ক চরিত্র—কলকাতা শহরের সমস্ত লোক জানে—

হেমেন অত্যন্ত অপমানিত হয়ে বসেছিল—চপলার কোনো কথা তার কানেও গেল না। লীলা তার পুরুষত্বকে কী কঠিনভাবেই না আঘাত করেছে! আপাদমস্তক গা জ্বলে যাচ্ছিল তার। রাগে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়িয়ে টেবিলের ওপর দড়াম দড়াম করে ঘুষি মারতে মারতে হেমেন ক্রোধান্ধ হয়ে বললে—চুলোয় যাক চরিত্র! মেয়েরা আবার আমার ঝোঁপর দালাল পাচ্ছে না—আমার সমস্ত বাড়ির খবর আমি বের করে দিচ্ছি।

চপলা বললে—তুমি পাগল হলে নাকি?

হেমেন জবাব দিয়ে বললে—কলকাতার সমস্ত বড় ঘরের মেয়েদের এখন পথে দাস করাতে পারি জানো লীলা?

চপলা বললে—দ্বিজেনবাবু

দ্বিজেন বললে—চলো, তোমাদের মোটরে দিয়ে আসি

হেমেন এক ঝটকায় দ্বিজেনকে ঠেলে দিয়ে বললে—ভেবেছ একেবারে চরিত্র হাতে করে বসে আছি—হেমেন খুব সচ্চরিত্র ছেলে—মেয়েরা তাকে একটা পয়গম্বর বলে ভাবে—কলকাতার শহরে তিনদিন পরে সাওতাল পরগনা বানিয়ে দিতে পারি

কাঁপতে কাঁপতে বললে—কলকাতা তো কলকাতা—লীলার মতো যত সব প্যাঁচা পেঁচি চপলার তো যত সব প্যাঁচা পেঁচি—সবার যখন জয়পুরে গেলাম পাথরের বাড়ি দেখতে—ফিরছি এমন সময়—

কিন্তু রাজপুতরমণী দেবলা দেবী চন্দ্রকুমারীদের সঙ্গে রোমান্সের কথা শেষ করলে না আর হেমেন। শুরুই শুধু করে রাখল—কেউ কোনো উত্তরও দিচ্ছে না দেখে, লীলাকেও যথেষ্ট প্যাঁদানি দেওয়া হয়েছে বলে মনটা তার নিরস্ত হয়ে আসছিল।

নতুন একটা চুরুট বার করে হেমেন শান্তি পাচ্ছে—চুরুটটা জ্বালিয়ে, টেনে মনটা তার ঠাণ্ডা হয়ে উঠছে, চপলার প্রতি, দ্বিজেনের প্রতি এমনকি লীলার প্রতিও অনুকম্পায় মমতায় তার সমস্ত প্রাণ ভরে উঠল।

বললে—চল লিলি, বায়োস্কোপ দেখতে যাই।

কিন্তু ঘড়িতে তখন চারটে বেজে গেছে প্রথম শোতে গিয়ে আর লাভ নেই। ছটার পারফরমেন্সের জন্য এদের সবাইকে সে তৈরি হতে বললে। তারপর নিজেই স্টোভ টেনে নিলে।

লীলা বললে কেন?

—গরম জল করব।

—কেন?

—বাঃ, দ্যাখো না? তোমরা মেয়েরা তো আর করবে না, এখন পুরুষদেরই মশলা পিষতে হবে, বানাতে হবে, দেখো, কী রকম খাসা চা করি।

কিন্তু লীলার কাছ থেকে কোনো সহানুভূতি বা আশ্বাস পেলে না হেমেন।

চপলা বললে—এখন আবার চা খাবে কে? কারু খাবার দরকার নেই—

হেমেন বললে—আলবাৎ খাবে—

চপলা বললে— কেউ খাবে না—তুমি স্টোভ নিবিয়ে ফেল।

হেমেন একটু চোখ টিপে মুচকি হেসে বললে—দিদিমারা খাবে- –

চপলা বললে— কারা?

স্বামীর দিকে তাকিয়ে দেখল সে—বাস্তবিকই হেমেনকে সুন্দর দেখাচ্ছে না মোটেই, টেবু-টেবু নাক, ট্যাক-ট্যাক মুখ, চোখ প্যাট-প্যাট করছে।

হেমেন বললে—তুমি আর লীলা।

লীলা বললে—আমরা দিদিমা?

হেমেন বললে—জানলে দ্বিজেন, এরা আবার আমাদের চেহারা নিয়ে ঠাট্টা করবে, কে বলবে এরা আধবয়সী মেয়েমানুষ? একটা হ্যাঁচকা দেখলেই মনে হবে বাপরে বাপ, ঠানদিদি ঠাকমা এল আবার, মনে হয় না দ্বিজেন?

কিন্তু দ্বিজেন, কিছু বলবার আগেই লীলা এক ঝটকায় স্টোভসুদ্ধ প্যান উলটে ফেলে দিল। জলটা হুস করে চারদিকে ছিটকে পড়ল! হেমেন পুড়তে-পুড়তে বেঁচে গেল। স্টোভটা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছিল। দ্বিজেন আর প্যানট্রির থেকে ননকু এসে সমস্ত নিভিয়ে নিস্তব্ধ করে দিল।

সিনেমায় আর যাওয়া হল না।

দিন তিনেক কেটে গিয়েছে।

টি বি আর্মস্ট্রং কোম্পানির পাশ দিয়ে হেমেনের মোটর আস্তে আস্তে চলছিল, একবার ভিতরে ঢুকে শ্রীমানকে দেখে যাবে নাকি ভাবছিল হেমেন। বড়রাস্তায় একটা গলির কাছে মোটর থামিয়ে আর্মস্ট্রং কোম্পানির দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল হেমেন। ব্যবসায়ের যে কোনো পত্তনের দিকে তাকাতে গিয়েই সে কোমল সবুজ হয়ে ওঠে - তার জীবনের সমস্ত কল্পনা ও কুহক পৃথিবীর সমস্ত সওদাগরের বাক্সের ভিতরে শুধু।

হেমেনের মনে হল আর্মস্ট্রং এর ফ্ল্যাট এমন বড় না কিছু স্টিফেন হাউসের কিংবা একশো নম্বর ক্লাইভ স্ট্রিটের একটা কামরা মতো শুধু যেন।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল হেমেন, তার নিজের অফিসটাই কতটুকু? কিন্তু চুনকাম করে নিয়েছে সে হুইটলির আর্মস্ট্রং এর মতো একটা বাঙালি কোম্পানি এসে কাজ করে দিয়ে গেছে—কিন্তু আর্মস্ট্রং এখনো তেমনি বিবর্ণ জায়গায় জায়গায় চুন বালি খসে পড়ছে। মোটর থেকে নামল হেমেন।

হাঁটতে হাঁটতে মনে হল সমস্ত ব্যবসাই আজকাল বসে যেতে বসেছে- -গত দেড় বছর ধরে ক্রমাগত ক্ষতি দিয়ে আসছে সে। আর কিছুকাল এরকম চললে ব্যবসা বন্ধ করে দেবে সে—ব্যাঙ্কে এখনো যা টাকা আছে তার সুদ দিয়ে তাদের দুজনার এখনো বেশ চলবে। কোনো ছেলেপিলে হয় নি তাদের। একটা অপরিসীম শান্তিতে চুরুটটাকে জ্বালাল।

দ্বিজেন উঠে পড়বে ভাবছিল।

হ্যালো খাস্তগির—অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে হেমেনের দিকে তাকাল সে।

আজ শুধু ব্যবসায়ের কথাই হল, তিন দিন আগের ঝক্কি ঝকমারির বেদনার নিরাশার কেউ কোন উল্লেখই করল না। ব্যবসায়ের দুর্গতিই দুজনকে সব থেকে বেশি বিষণ্ণ করে দিয়েছে ব্যর্থ করে ফেলেছে।

চার-পাঁচ দিন পরে হেমেনের অফিস থেকে তাকে নামিয়ে নিয়ে গেল দ্বিজেন। সাহেবপাড়ার এক গ্রিল ফিলের দিকে মোটর ঘুরিয়ে চলল দুজনে।

—নাঃ ঢুকেই পড়া যাক।

গিয়ে বসল। শুয়োর ভেড়া মুর্গীর মাংসের নানারকম জিনিস, কফি, কিছু পুডিং ফল আইসক্রিম একে-একে আসছিল। হেমেন বললে ব্যাপারটা কী জানলে দ্বিজেন- -ব্যাঙ্কে এখনো লাখ দেড়েক রয়েছে-—

দ্বিজেন বললে—লাখ দেড়েক।

হেমেন বললে —এখনো ট্রাকগুলো দস্তুর মতো অর্ডার নিয়ে কলকাতা শহরে ছুটে বেড়াচ্ছে।

হেমেন বললে এই দেড় লাখ টাকার ইন্টারেস্টে আমি আর চপলা দুজন মানুষ তো শুধু এলাহি চালে থেকে যেতে পারি বালিগঞ্জের বাড়ি তো রয়েইছে।

একটু থেমে করবার নেই। ব্যাস কী হবে ব্যবসা করে আর।

— ভালো লাগে না কিছু দ্বিজু।

দ্বিজেন জিজ্ঞেস করলে কেন ভালো লাগে না। ব্যাঙ্কে দ্বিজেনেরও লাখখানেক রয়েছে। বালিগঞ্জে না হোক অন্য জায়গায় তারও বাড়ি রয়েছে। বেশ ভালো বাড়িই। কিন্তু তবুও কেমন একটা নির্মমতা নিরর্থকতা পেয়ে বসেছে তাকে। অনেকদিন ধরে। হেমেনের এই সন্দ্যাগত ভালো না লাগার চেয়ে সে ঢের আলাদা জিনিশ।

হেমেন বললে - সত্যি কিছু ভালো লাগে না কেন বল তো দ্বিজু?

- কেন ভালো লাগে না বল তো হেমেন?

কী যেন মনটা কেমন টসকে গেছে -

কেন?

— বাস্তবিক, টাকাই কি সব দ্বিজু?

দ্বিজেনের কাছ থেকে কোনো জবাবের অপেক্ষা না করেই হেমেন বললে---বাস্তবিক, লীলা যা বলেছিল ঠিকই, আমাকে একটা খটকা লাগিয়ে দিয়েছে –

দ্বিজেন ঘাড় হেঁট করে খাচ্ছে।

হেমেন বললে —এই ভুঁড়ি—টাক মাথা—ট্যাবা ট্যাবা মুখ—- টেবু-টেবু নাক— চোখ দুটো পিট পিট করছে বাস্তবিক আমি কী হয়েছি বলো তো—?

দ্বিজেন বললে —একটু হালকা হয়ে নাও না-

হালকা হয়ে কী হবে, চেহারাই একেবারে বদলাবে। সেদিন একজন মেয়ের পিছনে লেগেছিলাম

সে কী।

- মেয়েদের ফেরে ফেলে আমি না থাকি যে তা নয়। কিন্তু চপলা তা জানে না. কিন্তু এদ্দিন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ছুঁড়িদেরকে এনে বায়স্কোপ দেখিয়ে ভাবতাম সব সাধ মিটল বুঝি। কিন্তু তাতে শুধু হয় না-- আরো কী একটা জিনিশের প্রয়োজন যেন—

দ্বিজেন বললে— কেন চপলাই তো রয়েছে —

- কিছু না—

রোস্ট খেতে খেতে ছুরিটার দিকে একবার তাকাল।

হেমেন বললে—না চপলা তো রয়েইছে, এমন চমৎকার গিন্নি, ও না থাকলে কি আর চলত, এসব মেয়েদের নামে কোনো নালিশ চলতে পারে না।

একটু থেমে--কিন্তু আমি চাই কী জানো?

দ্বিজেন মুখ তুলল, একটা ভালো ছুরি বেছে নিলে।

হেমেন বললে—মেয়েরা আমাকে দেখে ভুলে যায়—আমার কাছে এসে নিজেদের নিবেদন করে। এসব কোনো পুরুষ না চায় দ্বিজেন?

এরপর দু তিন মিনিট স্তব্ধ হয়ে খুব তাড়াতাড়ি করে কাঁটা ছুরি চালিয়ে নিতে লাগল হেমেন।

হেমেন তারপর বললে—কিন্তু লীলা যা বলেছে—ঠিকই। সে পুরুষ আমি নই যার পেছনে মেয়েরা পইপই করে ঘুরবে। কেন ঘুরবে? আমার পেছনে? আমি কী?

দ্বিজেন বললে— আমিই-বা কী?

—নাও নাও—তোমার সুন্দর চেহারা আছে। আমি আমার গুডউইল দিয়ে দিতে রাজি, তোমার চেহারা যদি পাই—

হেমেন বললে—তুমি তো বরাবরই মেয়ে পটকে এসেছ, আমি জানি না নাকি। বিলেতে, ইন্ডিয়ান বড়লোকের ছেলে, নিজে রোজগার করেছ তার উপর এই এমন চেহারাখানা। সে আমি জানি—তুমি ঢের মেয়ে পটকে এসেছ—

হেমেন কিছুতেই এই ব্যথা উতরে উঠতে পারছিল না, আর ওই বেদনা তাকে অভিভূত করে ফেলেছে।

দ্বিজেন বললে— মেয়ে পটকানোই কি সব?

—এসেছ তো পটকে—অনেক মেয়ে!

মেয়ে পটকে আর কী হয় হেমেন?

—ও অনেক হয়, জীবনে অনেক ফূর্তি করেছ। এখন তুমি চোখ বুজে তৃপ্তিতে মরতে পার, পার নাকি?

হেমেন বললে—পার না কি।

কোনো জবাবের প্রতীক্ষা না করেই বললে—পারা উচিত তোমার , আমি হলে তো পরম শান্তিতে চোখ বুজতে পারতাম—

গভীর ক্ষোভে হেমেন কফির পেয়ালা ধরল।

বললে- এই যে এখনো আধবুড়ো হয়ে গেছ, চার পাঁচজন ব্যারিস্টার গিন্নির সঙ্গে এখনো তোমার ইয়ার্কি চলে, আমি দেখেছি না নিজের চোখে?

দ্বিজেন বললে—ইয়ার্কি শুধু, আর কিছু না হেমেন?

—কিন্তু ইয়ার্কিটাই ঢের মিষ্টি—আমি তো নিজেই চেয়ে চেয়ে কতবার দেখলাম। আমাদের সঙ্গে ওরকম ইয়ার্কিই-বা করতে আসে—

— কেন, চপলা?

—ঠাট্টা করো না দ্বিজেন—

দ্বিজেন বললে—নিজের বধূর সঙ্গে হাসি তামাসাই তো সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে।

হেমেন একটা চুরুট ধরিয়ে বললে অর্বিশ্যি সেখানে তুমি ঠকেছ।

দ্বিজেন কোনো এক জায়গায় খানিকটা ঠকে গেছে বলে কয়েক মুহূর্ত যেন তৃপ্তির সঙ্গে হেমেন চুরুট টেনে নিল।

কিন্তু তারপরেই দ্বিজেনের সুন্দর মুখ চমৎকার টাই ও সুন্দর সুন্দর ব্যারিস্টার বধূদের সঙ্গে এর ছেনালির কথা ভেবে হেমেনের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। মনের ভিতর একটা আঘাত পুষে খানিকটা চুরুট টেনে গেল। তারপর বললে—তোমার ব্যবসা গেলেই বা তোমার কি হয় দ্বিজেন? মানুষের জীবনের আসল জিনিশটাই তো তুমি পেয়েছ , মেয়েরা তোমাকে ভালোবাসে। নিজের সেন্টিমেন্টালিজম তুমি কত জায়গায় গিয়ে মেটাতে পার—

দ্বিজেন সিগারেট কেস বের করলে।

হেমেন বললে - তোমার বেশ মজা, লীলা তোমার মনটাকে দিয়েছে খিচড়ে—ওদিকে তাই তোমার জন্যে ভালো। লীলা যদি ভালো গিন্নি হত তাহলে মেয়েদের সঙ্গে ছেনাল করে বেড়াবার তাগিদও থাকত না তোমার। সেটা তেমন ভালোও লাগত না হয়তো। লাগতো?

একটু পরে—অর্বিশ্যি ছেনালপনা সব সময়ই ভালো লাগে, বিশেষত যে রকম বাগিয়ে নিয়েছ চারিদিকে , কিন্তু এখন যেমন লীলার উপর বিমুখ বৈরাগ্য করে একা মোটরখানা নিয়ে বিরহীর মতো ঘুরে-ঘুরে উচ্ছ্বাস করবার সুবিধে পাও লীলা অন্যরকম হলে কি পেতে?

ক্ষোভ—আকাঙ্ক্ষায় হেমেনের মন ভরে উঠল। দ্বিজেনের একদিনের জীবনও যদি সে পেত। হলই-বা দ্বিজেনের স্ত্রী ফটফটে—পরের স্ত্রীদের এমন হাতে পায়ে গুছিয়ে রাখতে ওর মতো কে পেরেছে।

হেমেন বললে— সেন্টিমেন্টালিজম শুধু? ওদের সঙ্গে তুমি কী করো না করো—আজীবন তুমি পথেঘাটে কত বাড়ি ভেঙে এসেছ কেউ কি তার খবর রাখে?

একটু থেমে —আমি যদি সমস্ত জীবনও ক্ষয় করি তবু একটি মেয়ের সাচ্চা খাঁটি ভালোবাসা পাব না ? আর তোমাকে কত মেয়ে যেচে ভালোবাসতে আসে—

একটু পরে— কেন এমন হয় দ্বিজু?

হেমেনই বললে—অবিশ্যি আমার চেহারাটা? এ নিয়ে মেয়ে পটকানো যায় না দ্বিজেন।

নিরাশার অতল অন্ধকূপের ভিতর ডুবে গিয়ে হেমেন স্তব্ধ হয়ে চুরুট টানতে লাগল। জীবনে প্রেম হল না, প্রণয় হল না, ছেনালি অবধি হল না। একজন পরের স্ত্রীকে আটকে রেখে মোকদ্দমায় যদি সে পড়ত তাহলেও যে একটা ক্ষোভ মিটত। এখন যেন রক্ত মাংস বিবেচনা বুদ্ধি বিবেক সমস্ত কামড়াচ্ছে তাকে-- হাল্ হাল্ করে কামড়াচ্ছে। কেন এমন হল? সারা জীবন, জীবন বলে জীবন, এমন পয়ারাম সেজে গেল কেন সে। মেয়ে পটকানোর একটা সময় থাকে। ত্রিশের পর ওসব কথা আর না —

হেমেনের সমস্ত মুখ মাথা টাক টস টস করে ঘামতে লাগল।

ভুল করে চুরুটের জ্বলন্ত দিকটা একবার কামড়ে ধরে হেমেন শরীরের যন্ত্রণাও যথেষ্ট পেল। সব রকম যাতনার একশেষ হল তার।

দ্বিজেন বলে- বলাই ভালো আমরা বুড়ো হয়ে গেছি ওসব দিয়ে আমাদের আর কী হবে--

--কে বুড়ো? তুমিও না- আমিও না।

--পঁচিশের পর সকলের বুড়ো — মেয়ে-মানুষ নিয়ে খেলা করার দিক দিয়ে সতেরো-আঠারো—কুড়ি-বাইশ এই হচ্ছে বয়স।

হেমেন হাঁ করে তাকাল।

দ্বিজেন বললে—আমারও যা হয়েছে—এই বয়সেই।

-- কেন, এখনো তো—

—কিছু না, কিছু না, আমি তোমার হাত ছুঁয়ে বলছি—আমি এখন শুধু একটু শান্তি চাই -- মেয়েদের পিছু-পিছু ঘুরে নয় হেমেন,—কিন্তু নিজেরই ঘরে, নিজের স্ত্রীকে নিয়ে, জানো না তুমি, কিন্তু কেউ আমাকে ভালোবাসে না!

কেউ না?

--না।

হেমেন হা করে তাকিয়ে রইল।

দ্বিজেন বললে—কুড়ি বছরের মেয়েরা আমাকে ভালবাসবে কেন---আমার বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি হতে চলল। সে ভদ্রলোকের মেয়েরাই হোক বা অ্যাংলো ইন্ডিয়ানই হোক। আঠারো-কুড়ি বিশ বাইশ বছরের মেয়েদের হৃদয়ের ওপর কোনোরকম কিছু দাবি আমরা অনেক দিন হারিয়ে ফেলেছি। আমাদের তারা জ্যাঠামশাই ভাবে , হয়তো ঠাকুর্দাও।

হেমেন আমোদ পেয়ে হি হি করে হাসতে লাগল। দ্বিজেনের এই সব সাফ কথা শুনে মনের ভারটা যেন তার অনেকখানি কমে গেছে। বাস্তবিক দ্বিজেন যা বলে তাই। না হলেও ব্যারিস্টার তো। এমন মিঠে করে জিনিসের আসলটি বার করে নিয়ে আসে।

পরে একটু হেমেন খুব অভিনিবিষ্ট হয়ে বললে—কুড়ি না হোক, পঁচিশ না-হোক-- অন্তত ত্রিশ বছরের মেয়েরা।

—তাও না। তাদের জন্য ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ বছরের ছোকরারা রয়েছে। পৃথিবীতে সৌন্দর্যের অভাব নেই। আমি ঢের দেখেছি। এমন-কি কুড়ি-পঁচিশ বছরের ছোকরাদের সঙ্গেও তারা প্রেম করবে—প্রেম হবে একেবারে মরীয়া হয়ে। আমি দেখেছি—ঢের।

দ্বিজেন বললে—একজন চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ-পঞ্চাশ বছরের গিন্নি হয়তো এক আধ মুহূর্তের জন্য আমার প্রতি একটু নরম হতে পারে, তুমিও যেমন একটু গদগদ হয়ে উঠতে পার তাকে দেখে—কিন্তু ভালোবাসা নয়—কিছুই নয়—একেবারে রাবিশ।

দ্বিজেন মাথা তুলে বললে—ভেবে দেখো, হয়তো মোটরে চড়ে চলেছি, একটি বিশ আর একটি ত্রিশ বছরেব ছোকবাকে সঙ্গে নিয়ে। আঠারো বছবের, চল্লিশ বছরেব, পঞ্চাশ বছরের তিনটি মেয়েমানুষ দেখলাম পাশের মোটরে, ধবো তিনজনেই বেশ দেখতে। কিন্তু, তবুও, হয়তো আঠারো বছরের দিকেই আমার মনে যাবে।

হেমেন বললে—তা যাবে।

—কিন্তু সেই মেয়েটির মন কি এই পঞ্চাশ বছরেব বুড়োর দিকে আকৃষ্ট হবে—সমস্ত পৃথিবী বিকিয়ে গেলেও।

হেমেন হাঁ কবে তাকাল।

তারপর হি হি করে হাসতে লাগল।

দ্বিজেন বললে—আমার ভাইপোকেই সে ভালোবাসবে - না হয আমার ছেলেকে—আমাকে কিছুতেই নয়—

—!

—ভালোবাসা, রোমান্স, এমন কি কামনার কথাও আর বলো না হেমেন! ওসব ভাবতে গেলেও ঢের ব্যথা।

পকেটের থেকে দেশলাই বের করে দ্বিজেন বললে—আমাদেব এই পড়ন্ত বযসে সৌন্দর্য আর ভালোবাসার কথা চিন্তা করতে গেলেই জীবনকে এমন থুকথুড়ি মনে হয়।

সিগারেটটা নিভে গিয়েছিল, জ্বালিয়ে নিয়ে দ্বিজেন বললে—আমাদের পকেটে এমন আর কিছু উঠবে না, শুধু ঘবের বধূ ছাড়া, আমাদের জন্য আর কিছু নেই।

দ্বিজেনেব সেই ঘরের বধূ যে লীলা এবং নিজেব চপলা—এই ভেবে হেমেন ঢের পরিতৃপ্তি পেলে।

বিল সে নিজেই মিটিয়ে দিল।

দ্বিজেন বললে— খোকা তুমি, আহা তোমার মা নেই বোন নেই—তোমার জন্য ভারি কষ্ট হয়।

সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। হেমেন বললে—দ্বিজু, চলো আমরা টালিগঞ্জ, আলি, চেতলা, বেহালা বেড়িয়ে আসি।

—সত্যি এত সব জায়গা ঘুরবে তুমি?

—নিশ্চযই। হেমেন সজোরে মাথা নেড়ে বললে।

—কেন?

—এমনিই।

—কোনো ব্যবসা-টাবসার সুবিধের জন্য—

—না।

—এমনিই?

—অনেক বদভ্যাস বসেছিল মনেব ভিতরে—

—ফিরতে যে অনেক রাত হয়ে যাবে।

— হোক।

—দ্বিজেন বললে—তুমি যাও , আজ আমাব দরকার আছে।

বিজিনেস! তাহলে দ্বিজেনকে ছেড়ে দিতে পারে সে। হেমেনের সমস্ত মন এখন প্রেম কামনা ও মেয়েমানুষের থেকে উঠে এসে আবাব ব্যবসাব গদিতে পরম আরামে ও নিবিড় শ্রদ্ধায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে বসেছে গিয়ে। জীবনটা তার কাছে ব্যর্থ নয় আর, প্রাণের ভেতর কোনো খোঁচ নেই, সমস্ত পৃথিবী অসীম অর্থে ভরা।

হেমেন আকাশটার দিকে তাকাল—আতার বিচির মতো অন্ধকারে সমস্ত কলকাতায় আকাশটা গেছে ভরে ; মেঘের অন্ধকাব—টিপ টিপ কবে বৃষ্টি পডছিল , তাব এখন ভালো লাগল, চপলার কথা মনে হল। বধূব মমতা ও ভালোবাসায তাব সমস্ত মনটা ভবে উঠল। হেমেনের মতন এমন নিবিড় পবিতৃপ্ত মানুষ কলকাতার রাস্তায় আজ আর একটিও নেই যেন। আজ সমস্ত বাত চপলাকে ভালোবাসবে সে— আজ সমস্ত বাদলের বাত ভবে এমন একটা অপরিসীম শান্তি পাবে সে।

কিন্তু তবুও এখনই চপলার কাছে যাবে না সে।

বিজিনেস ইজ বিজিনেস। সে বিজিনেসেব মানুষ। সে সঙ্কল্প করেছে, দ্বিজেনের কাছে, স্বীকার পেযেছে যে টালিগঞ্জে আলিপুব চেতলা, বেহালা বেড়িয়ে আসবে। বেড়ানোটা এমনিই — কোনো ব্যবসার উপলক্ষ নিযে না, হোক তাই। ফিবতে ফিরতে এগারোটা বাজবে, বাজুক। কিন্তু দ্বিজেনকে বলেছে সে যে টালিগঞ্জ আলিপুব চেতলা বেড়াবে, বলেছেই নড়চড় নেই, সেটা দুর্বলতা, একজন ব্যবসায়ীব পক্ষে সে রকম ঢিলেমি ব্যবসা পথটাই পরিষ্কাব ভরে দেয়।

স্টিযারিং হুইল ঘুরিযে হেমেন চলল।

একটা ট্যাক্সি নিয়ে দ্বিজেন পিছু-পিছু চলল।

বালিগঞ্জ অ্যাভিনিউ-এর দিকে দ্বিজেন যখন মোড় নিল— হেমেন তার ঢের আগেই টালিগঞ্জের দিকেছুটে চলেছে। দ্বিজেন এ-গোঁয়ারকে খুব ভালো করেই চেনে , রাত বারোটার আগে ও আব ফিববে না।

দ্বিজেন তেতলায় উঠে দেখল চপলা—গড়াচ্ছে।

এই বিবাট মেদকে দেখে প্রথমটা তাব মন কেমন কুঞ্চিত হয়ে উঠল , কিন্তু তবুও এই মেদের নীচে যে হৃদয় রয়েছে তা এমন চমৎকাব—এত নমনীয। এই মেয়েটিকে নিয়ে আধঘণ্টা-একঘণ্টা-দুঘণ্টা কাটল দ্বিজেনের। কিন্তু তাবপরে—বাত সাড়ে দশটা বেজে গেছে—বুকটা কেমন ঢিবঢিব করতে লাগল দ্বিজেনের। হেমেন যে-কোনো মুহূর্তেই এসে পডতে পাবে—খটখট খটখট করে—একটা বেতো টাট্টুর মতো।

এমন বিবক্তি লাগতে লাগল তাব।

তবু কিন্তু ও বেরিয়ে যেতে হবে—। ড্রয়িংরুম থেকে ড্রয়িংরুমে অনেক ঘোরে সে বটে, কিন্তু তবুও তারপর বেরিয়ে যেতে হয়। গিন্নিরাও চায় যে তাদের স্বামী আসুক— এ অতিথি বেরিয়ে যাক বেরিয়ে যাক। বেরিয়ে সে গেলই।

পান্নালাল

সজনীকান্ত দাস

যাঁহারা তরুণ বলিতে নরুনপাড় ধুতি-পরিহিত, অতিরিক্ত কাব্যপাঠ্যের দরুন চশমারূপ যন্ত্রের সাহায্যে পথ চলিতে চলিতে যে কোন চওড়া-পাড় চলিষ্ণু শাড়িকে তরুণী কল্পনা করিয়া করুণভাবে তাহার অনুসরণ করিয়া শেষ পর্যন্ত হতাশ হইয়া বরুণ দেবতার কোলে দেহরক্ষা করিতে দ্বিধা করে না—এরূপ এক সম্প্রদায়ের বাঙালী ছোকরার কথাই মনে করিয়া থাকেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই আমাদের পান্নালাল হাজরাকে দেখেন নাই। পান্নালাল তরুণ বইকি। যে বৎসর ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয় , পান্নালাল সে বৎসর হামাগুড়ি দিয়া দরজার চৌকাঠ ডিঙাইতে শুরু করিয়াছে, অভিধানে পাওয়া যায় এমন দুই চারটি শব্দও উচ্চারণ করিতেছে এবং মায়ের কোমর ধরিয়া প্রায় উদয়শঙ্করী ভঙ্গিতে নাচিতেও আরম্ভ করিয়াছে; সুতরাং পান্নালালকে পোস্ট-ওয়ার তরুণও বলা চলে। তাহা ছাড়া সে যখন এম. এ. পড়িতেছে এবং স্কটিশ চার্চ কলেজ হইতে গত বৎসর বি.এ ডিগ্রী লইয়াছে, তখন একই অধ্যাপকের নাকের সম্মুখে আধুনিক তরুণীদের পাশে বসিয়া ক্লাস করিয়াছে নিশ্চয়ই, একই গেট দিয়া বাহির হইয়া তাহাদের পিছনে পিছনে সদর রাস্তা পর্যন্ত যে যায় নাই, অথবা একই ট্রামে বা বাসে ক্বচিৎ কখনও ভ্রমণ করে নাই, এমন কথা হলপ করিয়া বলা যায় না। চোখোচোখি বা ছোঁওয়াছুঁয়ি নিশ্চয়ই হইয়া থাকিবে, তবে তাহাতে সাধারণত যে রোমান্সের কল্পনা করিয়া আমাদের মনে পুলক সঞ্চার হয়, পান্নালালের ক্ষেত্রে তাহা দানা বাঁধিয়া উঠিবার অবকাশ পায় নাই , সে কটমট করিয়া চাহিয়াছে এবং ধাক্কা দিয়া নিজের পথ করিয়া লইয়াছে মাত্র।

পান্নালালের চেহারা ভাল, শরীর রীতিমত মজবুত, চুল ব্যাক- ব্রাশ করা, চওড়া কপাল চশমাহীন চোখ, মানানসই নাক, গোঁফের রেখামাত্র আছে, শ্যামবর্ণ, হাফ-হাতা শার্ট, মালকোঁচা মারা ধুতি — মুখে চোখে প্রতিভার উজ্জ্বল দীপ্তি , সমস্ত দেহে চপল তারুণ্য—পাঞ্জা কষিয়া, ঘুষি ছুঁড়িয়া ও নানাবিধ দুষ্টামি করিয়া তাহার প্রকাশ, কবিতা লিখিয়া, প্রেমপত্র ছাড়িয়া বা চোরা চাউনি ছুঁড়িয়া নহে। কলেজে স্পোর্টসে সর্বাগ্রে তাহার নাম ; প্রফেসর জব্দ করার পাণ্ডা সে। এক কথায়, পান্নালাল তরুণ হউক আর নাই হউক, অত্যন্ত মডার্ন।

কলেজে তাহার সহপাঠীদের মধ্যে তথাকথিত তরুণের অভাব নাই। তাহারা জটলা করিয়া দেখে, একলা একলা মজে, বারোয়ারি বউদিদিদের কাছে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, বায়রন অনুবাদ করিয়া প্রেমপত্র লেখে, কলেজ হইতে লুকাইয়া পটাসিয়াম সায়ানাইড সংগ্রহ করে এবং মাঝে মাঝে মিউনিসিপাল মার্কেট হইতে টাকা খানেকের রজনীগন্ধা অথবা গোলাপফুল কিনিয়া শয্যায় বিছাইয়া মরিয়াও বসে , তাহারা অতি-আধুনিক গল্প-কবিতা নিজেরা পড়িয়া সহপাঠিনীদের পড়াইতে চায়, ঠিকানা ভুল করিয়া তাহাদের দুই একখানা উদগ্র সাইকলজিকাল উপন্যাস সহপাঠিনীদের বইয়ের বোঝার মধ্যে চলিয়া যায়, ছবিও যে দুই চারখানা এদিক

ওদিক গিয়া না পড়ে তাহা নয়; কোন্ বান্ধবী কবে কোন্ সিনেমায় যাইবে, তাহার হিসাব তাহারা রাখিয়া থাকে এবং মাসিক সাপ্তাহিকে দুই একটা উদ্দেশ্যমূলক কবিতাও ছাপাইয়া থাকে। পান্নালাল এইসব পিঁচুটিমার্কা ছেলেদের সুনজরে দেখে না।

পান্নালাল, যখন ফোর্থ ইয়ার আর্ট্‌সে, মিস করুণা মিত্রের সে বছর থার্ড ইয়ার। একেবারে যাহাকে বলে অপরূপ, সে ছিল তাহাই। বাপ বড়লোক, ভবানীপুর হইতে মোটরে কলেজে আসিত। সে যে দেখিবার মত একটা বস্তু—এ কথা কলেজের খোঁড়া দারোয়ান হইতে আরম্ভ করিয়া বুড়া প্রফেসরগুলা পর্যন্ত মনে মনে স্বীকার করিতেন, ছেলেদের তো কথাই নাই। এক পিরিয়ড হইতে অন্য পিরিয়ডে ঘর বদলের সময় পথে বারান্দায় একেবারে হুড়াহুড়ি পড়িয়া যাইত—করুণা ঘামিযা চুমিয়া একেবারে লাল হইয়া তবে ক্লাসে ঢুকিতে পারিত।

এ হেন করুণা মিত্র পান্নালাল হাজরার প্রেমে পড়িয়া গেল। সহপাঠিনীদের নিষ্কাম দূতীগিরির চোটে পান্নালালের গায়েও একদিন আচমকা ইহার আঁচ আসিয়া লাগিল। সে প্রথমটা একটু থতমত খাইল বটে, কিন্তু ভাল করিয়া ক্রিকেট-মাঠের ফিল্ডিঙের চোখে একবার আপাদমস্তক করুণাকে দেখিয়া তাহার মন্দ লাগিল না। ব্যস্, সেই এক সেকেণ্ড। তারপর গুজগুজ ফুসফুস না করিয়া সে একেবারে স্ট্রেট করুণার গাড়ির কাছে গিয়া বলিল, সোজা বাড়ি যাবেন তো? আমি আপনার সঙ্গে রসা রোড পর্যন্ত যাব। দেবেন একটা লিফ্‌ট?

বিষম অবাক হইলেও করুণা খুশি হইয়া উঠিল। কিন্তু কি করা উচিত—প্রথমটা হঠাৎ ঠিক করিতে না পারিয়া একবার ড্রাইভারের মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়া ফেলিল, তা বেশ তো, আসুন না। —কলেজের গেটের সামনে তখন অর্ধোদয় স্নানের ভিড়।

গাড়ি ছাড়িতেই পান্নালাল ভূমিকামাত্র না করিয়া বলিল, শুনলুম, আপনি নাকি আমাকে ভালবেসেছেন?

ড্রাইভারের সামনে লটকানো আয়নাটায় করুণাব লজ্জিত মুখখানা মন্দ দেখাইল না। সে যেন একটা ধাক্কা খাইল, এই অপ্রত্যাশিত অভদ্র প্রশ্নের জবাবই বা সে কি দিবে? খানিকক্ষণ চুপ কবিযা থাকিয়া একটু ঠেস দিয়াই বলিল, আপনার আত্মপ্রত্যয় তো দেখছি অসাধারণ!

আন্‌ডন্টেড পান্নালাল এবার অবাক। এক মিনিট মাথা চুলকাইয়া সে বলিয়া উঠিল, তা হ'লে গুজবটা মিথ্যে। ধন্যবাদ। এই ড্রাইভার, রোখো!

লজ্জায় নিজের গাড়ির তলায় পড়িয়া করুণার মরিতে ইচ্ছা হইল। কিন্তু তাহার সময় ছিল না। সুতরাং লজ্জার মাথা খাইয়াই সে পান্নালালের একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, যা শুনেছেন সত্যি, কিন্তু—

চট করিয়া হাত ছাড়াইয়া লইয়া পান্নালাল বলিল, ওসব কিন্তু টিন্তু আমি বুঝি না। প্রেমে প'ড়ে থাক, ভাল। তবে আরও দু বছর সবুর করতে হবে। এম.এ.টা পাস ক'রে নিই। এর মধ্যে এক ছত্র চিঠি লিখবে না বা কখনও আমার দিকে ফ্যালফ্যাল ক'রে চাইবে না। রাজী?

করুণার হাসি পাইল, ভাল লোককে সে বাছিয়া লইয়া'ছে। গম্ভীর হইয়া বলিল, রাজী, কিন্তু—

আবার কিন্তু?

বাবা মা যদি এর মধ্যে কোথাও আমার বিয়ে দিয়ে ফেলেন?

খুন হয়ে যাবেন, খুন হয়ে যাবেন। —বলিতে বলিতে পান্নালাল চলন্ত গাড়ির দরজা খুলিয়া রাস্তায় লাফাইয়া পড়িল। গাড়ি তখন পোড়াবাজারের মোড় ফিরিতেছে।

বি.এ. পাস করিয়া পান্নালাল যখন ইউনির্ভাসিটি পোস্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাসে ভর্তি হইল, তখন দুইজনে প্রথম ছাড়াছাড়ি। তথাপি ছাত্রছাত্রী-মহলে সকলেই জানিত, রামের যেমন সীতা, সত্যবানের যেমন সাবিত্রী, পান্নালালের তেমনই করুণা; —দুইজনের সম্পর্ক জ্যামিতির যেন একটা স্বতঃসিদ্ধ।

কিন্তু করুণার বাপ-মায়ের তাহা জানিবার কথা নয়। অমন চেহাবা এবং এমন গুণ— মেয়েকে যে কোনও আই. সি. এস লুফিয়া লইবে; নিদেন পক্ষে একজন ব্যরিস্টার। মোদ্দাকথা, পয়সাওয়ালা বিলেতফেরত একজন চাইই।

পান্নালালের সেদিকে হুঁশ নাই। সে কলেজে বরাবর রাইট-অ্যাবাউট-টার্ন করিয়াছে, করুণাদের বাড়িব দরজা কখনও মাড়ায় নাই। সে জানিত, যেদিন দরজা মাড়াইবে, সেদিন একেবারে শ্বশুরশাশুড়ীকে করণীয় প্রণামটাও সারিযা লইবে ; তৎপূর্বে যাতাযাত, লেগ বিফোর উইকেটের মত, ভাল নয়। করুণা নিজের স্বার্থ ভাবিয়া বাবা-মার সহিত পান্নালালের আলাপ করাইতে ব্যস্ত হইত, কিন্তু পান্নালালের ধমকে চুপ করিযা যাইত। তাহাব ব্যস্ততাব আরও একটা কাবণ ধীবে ধীবে গজাইযা উঠিতেছিল—ব্যারিস্টার বাবিদবরণ রায সম্প্রতি বড় ঘন ঘন যাতায়াত শুরু করিয়াছে। মায়ের তাহাকে ভারী পছন্দ, এবং মায়েব পছন্দই বাবার পছন্দ।

করুণার শাড়ি ও ব্লাউজের রঙমিল বা রঙছুট লইয়া ব্যাবিস্টার বাবিদবরণ আজকাল মাথা ঘামাইতে শুরু করিয়াছে, কলেজ হইতে ফিরিতে দেরি হইলে এক্সপ্ল্যানেশন চায। করুণা ভিতবে ভিতরে রাগে গরগর করিতে থাকিলেও ভয়ে পান্নালালকে কিছু বলে না। টাকেব উপর আবার পান্নালালের টাঁক বেশি।

পান্নালালের এম. এ. পরীক্ষার আর বছরখানেক বাকি, করুণা বি এ. পাস করিয়া ঘরে বসিয়া আছে ; ভারতীয বাছাই টীমেব সঙ্গে পান্নালালের সাউথ আফ্রিকা যাইবাব কথা উঠিযাছে। করুণা প্রমাদ গণিল। নানা দিক বিবেচনা করিয়া একদিন ইউনিভার্সিটির দরজায় পান্নালালকে ধরিয়া বলিল, আমার ক্ষিদে পেয়েছে।

পান্নালাল তখন বেলেঘাটায় ভিজিযানাগ্রামের সঙ্গে দেখা করিতে যাইবে স্থিব করিয়াছে, ভয়ানক ব্যস্ত, চ্যালারা সব তাহাব পিছনে। চটিয়া উঠিযা বাঁ হাতেব বুড়া আঙুল দিয়া পুঁটিরামের দোকানটা দেখাইয়া বলিল, ওইখানে যাও, এটা ইউনিভার্সিটি।

করুণাও চটিল, বলিল, তা জানি। তোমাকে এখনই আমার সঙ্গে আসতে হবে, কথা আছে।

পান্নালাল রাগিয়া কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু করুণার মুখ দেখিযা তাহার মনে হইল, ব্যাপারটা গুরুতব। চ্যালাদেব হাতেব ইশারায় কি বলিল বুঝা গেল না, করুণাকে বলিল, চল।

রয়াল হোটেলে চায়ের অর্ডার দিয়া একটা পার্টিশন-করা খোপে ঢুকিয়া পান্নালাল বলিল, ব্যাপার কি বল তো?

করুণা শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, ব্যারিস্টার বারিদবরণ।

চড়াৎ করিয়া পান্নালালের মাথায় রক্ত চড়িয়া গেল, বলিল, গড ব্লেস হিম।

করুণা তাহাকে আরও চটাইবাব জন্য বলিল, গড নয়, পুরুত— আসছে অঘ্রাণে।

বটে!—বলিয়া রাগে পান্নালাল একটা আট আনা দামের আস্ত কেক মুখে পুরিল।

করুণা ব্যস্ত হইয়া তাহার হাত ধরিল, বলিল, কর কি? অসুখ করবে যে।

করুক অসুখ। আমি যাব না সাউথ আফ্রিকা। বয়!

করুণা বলিল, বয় নয়, এবার বাবার সঙ্গে দেখা করতে হবে।

হুঁ, তোমার বাবা নয়, একেবারে শ্বশুবমশায়েব সঙ্গে দেখা কবব। জড মেরে দেব এক্কেবারে। বয়!

করুণা ভয় পাইয়া বলিল, আবার বয়! পালিয়ে বিয়ে করবে নাকি আমাকে?

পান্নালাল এবার ভীষণ চটিয়া টেবিল চাপড়াইয়া বলিল, অ্যাম নট এ কাওয়ার্ড। তোমার বাবা সম্প্রদান করবে, তবে বিয়ে করব।

করুণা বাঁকা হাসি হাসিয়া বলিল, আরও ক্রিকেট খেলে বেড়াও। মেয়ে না হযে ক্রিকেটের বল হ'লেও—

ফাজলামি ক'রো না। বয়!

করুণাকে পান্নালাল যখন বাড়ি পৌঁছাইয়া দিল, তখন রাত্রি সাড়ে আটটা হইবে। ব্যারিস্টার বারিদবরণ টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বাহিরেব ঘরে করুণার মাযের সহিত গল্প করিতেছে, দেখা গেল। করুণা অনুভব করিল, পান্নালালের হাতের মাস্‌ল ক্রমশ শক্ত হইতেছে। ভয় পাইযা বলিল, প্রতিজ্ঞা কর, বিশ মিনিটের মধ্যে হ্যারিসন রোড পৌঁছবে, নইলে আমি ঘরে ঢুকব না। বল।

পান্নালাল প্রায চীৎকার করিযা উঠিয়াছিল, চাপিযা গিয়া চলিতে চলিতে বলিল, আচ্ছা -- আচ্ছা।

বক্সিংএব চ্যালা হরেকৃষ্ণ শীল হইল স্পাই। সে যথারীতি রিপোর্ট দাখিল করিতে লাগিল।

৩রা সেপ্টেম্বব—রাত্রি ৭ $\frac{১}{২}$ টা হইতে ৯টা— করুণার গান, পাঁপরভাজা, চা।

৫ই সেপ্টেম্বর— বৈকাল ৫ $\frac{১}{২}$ টা —মা, বারিদবরণ, করুণা— লেক, জলে ঢিল ছোঁড়া।

১৯এ সেপ্টেম্বর—ঐ তিনজন—মার্কেট, গিয়াসুদ্দীন---কেক, চকোলেট, বারিদবরণের মানিব্যাগ। চ্যাটার্জির ফুলের স্টল—বারিদবরণ, ফুল।

২৩এ সেপ্টেম্বর —বাড়িব ছাদ—করুণা, মা, পরে বারিদবরণ। মা নীচে, পরে করুণাও।

২৪এ সেপ্টেম্বর—বারিদবরণ—ডিনাব —রাত্রি ১২টা।

১লা অক্টোবব রাত্রি আটটায রিটায়ার্ড ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এল সি মিত্র মহাশয়ের 'হার্মিটেজ' নামক বাডিব দরজাব কোলাপ্‌সিব্‌ল গেটের সামনে একজন লম্বা জোয়ান পুরুষ হিন্দুস্থানী দাবোয়ানেব সহিত তর্ক করিতেছে, দেখা গেল। তাহাব বাম বগলে বালিশ-মোড়া একটি শতরঞ্জি এবং ডান হাতে একটি প্রমাণ সাইজ সুটকেস। দারোয়ান যত বলিতেছে, ই বাড়ি নেহি হ্যায় বাবু, সে ব্যক্তি ততই জিদ চড়াইয়া বলিতেছে, আবে বাবা, এহি বাড়ি, ই তো বিশ নম্বর হ্যায়? শেষ পর্যন্ত কোলাপ্‌সিব্‌ল গেট ফাঁক হইতে লাগিল, দারোয়ান আর রাখিতে পারে না। দরোয়ান হাঁকিল—সাব!

বারিদবরণ তখন ড্রয়িং-রুমের সোফায় বসিয়া করুণার ছেলেবেলার ফোটোর অ্যাল্‌বাম দেখিতেছিল, করুণার মা চোখে চশমা আঁটিয়া কি একটা পত্রিকা পড়ার ফাঁকে ভাবী জামাতা বারিদবরণের সহিত বার্তালাপ করিতেছিলেন। 'সাব' অর্থাৎ মিঃ মিত্র কাছাকাছি কোথাও গিয়া থাকিবেন।

দরোয়ানের চীৎকার শুনিয়া বারিদবরণ ছুটিয়া আসিল, বলিল, কোন্ হ্যায়?

দরোয়ান তখন প্রায় ঘায়েল হইয়াছে, ক্লান্ত কণ্ঠে বলিল, হুজুর, বোলর্তেহে সাবকা দামাদ, বাকি—

আগন্তুক চীৎকার করিয়া বলিল, বাকি কি রে ব্যাটা? নগদ জামাই।

মিসেস মিত্র এতক্ষণ ড্রয়িং-রুমের পর্দা ফাঁক করিয়া ব্যাপার কি দেখিতেছিলেন, তাঁহার পিছনে করুণা উঁকি মারিতেছিল। পান্নালাল ইহার মধ্যে ঠোঁটে আঙুল দিয়া করুণাকে চুপ করিয়া থাকিতে ইঙ্গিত করিল। করুণা ভয় পাইয়াছিল, কিন্তু চুপ করিয়া রহিল।

বাবিদবরণ ব্যারিস্টার ছুটিয়া মিসেস মিত্রের কাছে আসিল, বলিল, আপনাদের কোনও জামাই হবে।

মিসেস মিত্র আকাশ হইতে পড়িলেন, অমন একটা গলাবন্ধ কোট গায়ে বোঁচকা-সম্বলিত লোকের সহিত আত্মীয়তা স্বীকার করিতে তাঁহার লজ্জা হইবার কথা। বলিলেন, জামাই? তা হবেও বা, মিত্তির গুষ্টির সবাইকে আমি আবার চিনিও না। ডালপালা নিয়ে বংশটি তো সোজা নয়। তা বাপু, উনি আসা পর্যন্ত ঐ ঘরে বসতে বল, ও চোয়াড়ে চেহারার সামনে আমি বেরুতে পারব না।

মায়ের কথা শুনিয়া করুণা মনে মনে গজরাইতে লাগিল, চোয়াড়ে চেহারাই বটে!

বিপদ বুঝিয়া ব্যারিষ্টার বারিদবরণ সেদিন বিদায় লইল।

যে ঘরে পান্নালালকে বসিতে দেওয়া হইল, সেটা চাকরবাকরদের ঘর, এক রকম খালিই থাকে। একটা তক্তাপোশ পাতা আছে, তাতে অনেক-কালের বাসি ধূলা। পান্নালাল তাহারই উপরে শতরঞ্চিটা পরিপাটি করিয়া পাতিয়া লইল। দুই দিকের দেওয়ালে দুইটা তাক, ধূলিমলিন জীর্ণ বই দিয়া ঠাসা ; তাহারই একটা টানিয়া লইয়া ধূলি ঝাড়িয়া পড়িতে বসিবে— পিছনের দরজা দিয়া করুণা পা টিপিয়া টিপিয়া উপস্থিত। বলিল, এ করছ কি? তোমার জ্বালায় কি শেষে আত্মহত্যা করব?

পান্নালাল গম্ভীরভাবে বইয়ের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে বলিল, তার দরকার হবে না। তুমি শুধু কালা-বোবা সেজে ব'সে থাক।

করুণা রাগিয়া বলিল, সোজা কথা কিনা! তোমাকে যা-তা সব বলবে—

বলুকগে।

করুণা আর থাকিতে পারিল না, পান্নালালের হাত হইতে জীর্ণ বইখানা কাড়িয়া লইয়া বলিল, আর ভালছেলেগিরি ফলাতে হবে না। ওঠ, তক্তাপোশটা ঝেড়ে দিই।

দরোয়ানটা যেখানে বসে, সেখান হইতে ঘরের ভিতরটা দেখা যায়। সে আড়চোখে চাহিয়া দেখিল, দিদিমণি আগন্তুক বাবুকে উঠাইয়া তক্তাপোষের ধুলা ঝাড়িতেছে। সে সুর করিয়া তুলসীদাস পড়িতে লাগিল।

ব্রিজ খেলায় হারিয়া উত্তেজিতভাবে রাত্রি সাড়ে দশটার সময় মিঃ মিত্র বাড়ি ফিরিলেন। গৃহিণীর মুখে ব্যাপারটা শুনিয়া আরও উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, সর্বনাশ করেছ, জামাই, না আমার মুণ্ডু। ও নিশ্চয়ই স্বদেশী ডাকাত, ফেরারী, আজকাল এ রকম আকছার হচ্ছে। চল, কোথায় দেখি।

আমি বাপু পারব না, তুমি একলাই যাও।

মিঃ মিত্র অগত্যা শঙ্কিত চিত্তে কম্পিত পদক্ষেপে ঘরে ঢুকিয়া পান্নালালের হাতকাটা গেঞ্জি চড়ানো শক্ত-সমর্থ চেহারাটা দেখিয়াই যাহা বলিতে আসিয়াছিলেন, তাহা ভুলিয়া গিয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন, তা বাবাজী, মুখ হাত ধুয়েছ তো, জল-টল—

পান্নালাল দ্রুত উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, আজ্ঞে, সে হবে'খন।

তা বাবা তুমি বুঝি—

পান্নালাল মাথা চুলকাইতে লাগিল। তাহার লজ্জাটা মিঃ মিত্র নিজেই যেন অনুভব করিয়া বলিয়া উঠিলেন, তুমি বুঝি আমাদেব সুরেশের জামাই? অনেকদিন তো তাদের সঙ্গে—

মরিয়া হইয়া কথাটা ঘুরাইয়া লইবার জন্য পান্নালাল বলিল, আপনাদের শরীর ভাল আছে তো? আর রুবি? তাকে সেই—

রুবি করুণার ডাকনাম।

মিত্র মহাশয় হঠাৎ লজ্জা অনুভব করিলেন। ভাবিলেন, অন্যায় হইতেছে, ছোকরা স্বদেশী ডাকাত নয়, নিকট-আত্মীয়ই কেহ হইবে। নেহাৎ চাকরদের ঘরটায় তাহাকে—

তা বাবা, মুখ-হাত ধোও, খাওয়া-দাওয়া কর। ওরে হরে!

হরি আসিতেই বলিলেন, দেখ, দক্ষিণের কুঠুরিটা—

খুড়তুতো ভাই সুরেশের কাছে পাছে অপ্রস্তুত হইতে হয়—এই ভাবিযা তিনি শঙ্কিতই হইয়া পড়িলেন।

প্রথম রাত্রের ফাঁড়া নির্বিঘ্নেই কাটিয়া গেল। করুণা কিন্তু সে রাত্রে ভাল করিয়া ঘুমাইতে পারিল না।

পরদিন ভোরে উঠিয়াই পান্নালাল হরিকে ডাকিযা পোয়াটাক ছোলা ভিজাইতে বলিয়া ঘটা করিয়া ডন বৈঠক শুরু করিল। ছোলা-ভিজাব কথা শুনিয়া সদ্য-ঘুমভাঙা মিত্রগৃহিণী চটিয়াই আগুন। কি বলিতে যাইতেছিলেন, করুণা চাপা দিবাব জন্য বলিয়া উঠিল, তুমি জামাইয়ের সঙ্গে দেখা করবে না মা?

দায় পড়েছে আমার। — বলিয়াই তিনি একবার দক্ষিণের কুঠুরি বারান্দাটা ঘুরিয়া আসিলেন, খালি গায়ে মাস্‌ল-ফোলা পান্নালাল তখন দরদব করিয়া ঘামিতেছে ও গুনগুন করিয়া একটা ভজন গাহিতেছে। দৃশ্যটা মিত্রগৃহিণীর মন্দ লাগিল না। চমৎকার শরীর! নিজের অজ্ঞাতসারে তাঁহার মন স্নেহসিক্ত হইতে লাগিল। মিঃ মিত্রের কাছে আসিয়া বলিলেন, তুমি যাও একবার, ভাল ক'রে জামাইয়ের সঙ্গে—

এই ফাঁকে করুণা চট করিয়া একবার ঘরে ঢুকিল, বলিল, খুব রঙ্গটাই শুরু করেছ যা হোক! শেষরক্ষে কিসে হবে শুনি!

পান্নালাল যেন শুনিতেই পায় নাই, এমনভাবে বলিল, আদা আছে? নুন আর আদা?

কি বুদ্ধি তোমার। আমি আনব কি ক'রে? হরিকে ডেকে বল।

ছোলা-ভিজা, নুন, আদা, মধু, দাঁতন—সাহেব-আখ্যাত রিটায়ার্ড ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের গৃহে যে সত্যই ডাকাত পড়িয়াছে। যে কোন মুহূর্তে অগ্ন্যুৎপাত আশঙ্কা করিয়া করুণা ভিতরে ভিতরে কাঁপিতে লাগিল। পান্নালাল নির্বিকারচিত্তে হুকুম দিল, খাঁটি সরষের তেল চাই আধ পোয়া।

হরি অনেককাল এ বাড়িতে কাজ করিতেছে, কিন্তু এমনটি কখনও দেখে নাই। ফিরিঙ্গী বাবিদবরণকে দেখিযা তাহার মেদিনীপুব-মার্কা প্রাণে মাঝে মাঝে বিরক্তি ধরিত। আগন্তুকের ধরনটা নূতন হইলেও দেশী। সে খাঁটি সরিষার তেল আনিতে ছুটিল।

গতরাত্রের জামাই-আসার ব্যাপারটা কতদূর গড়াইল, তাহা দেখিবার জন্য বারিদবরণ সকালেই আসিয়াছিল। তেল মাখিয়া স্নান সারিয়া পান্নালাল তখন চা খাইতে ড্রয়িং-রুমে আসিয়াছে, বারিদবরণের ঠিক পাশেই তাহার চেয়ার। দৈনিক বাজার করা মিঃ মিত্রের বিলাস, তিনি বাজারে গিয়াছেন। চা আসিয়াছে, করুণা এক কোণে বসিয়া গম্ভীরভাবে পাশাপাশি উপবিষ্ট বারিদবরণ ও পান্নালালকে দেখিতেছে, মিত্রগৃহিণী রান্নার তদারক করিতে ভিতরে গিয়াছেন।

কথায় কথায় বারিদবরণ প্রশ্ন করিল, আপনি থাকেন কোথায়?

কাহারও দিকে না তাকাইয়া চায়ে চুমুক দিতে দিতে পান্নালাল বলিল, কলকাতা, হ্যারিসন রোড।

বারিদবরণ চমকাইয়া উঠিল, বলিল, মানে?

করুণা বিপদ গণিল, সে আর ঘরে থাকিতে সাহস করিল না।

পান্নালাল শান্তভাবে পেয়ালাটা সামনেব ট্রেতে রাখিয়া চেয়াবটা ঘুরাইয়া বাবিদবরণেব মুখামুখি বসিয়া বলিল, মানে অতি সোজা, আপনাকে তাড়াতে এসেছি।

পান্নালালের দেহটার দিকে আপাদমস্তক চাহিয়া বারিদবরণ একবার টাকে হাত বুলাইল, তারপর খামকা চেঁচাইয়া উঠিয়া বলিল, তার মানে? হোয়াট ডু ইউ মীন?

আই মীন হোয়াট আই সে।

বারিদবরণ আরও চেঁচাইতে যাইতেছিল, পান্নালাল বলিল, চুপ, চেঁচিয়েছেন কি ঘাড় ধ'বে—

কি?

কিছু নয়, সামান্য ব্যাপার। করুণার আশা আপনাকে ছাড়তে হবে, ট্রাই ইওর লাক এল্‌স্‌হোয়ার। ও আমার।

বারিদবরণ ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেল, কাতরভাবে বলিয়া উঠিল, গায়ের জোর নাকি? মিঃ মিত্রকে—

সোজা এখান থেকে বাড়ি যাবেন। মিঃ মিত্র কিংবা মিসেস মিত্রকে কিছু বলেছেন কি ফাটিয়ে দোব আপনার টাক। পান্নালাল হাজরাব নাম শুনেছেন?

বক্সার?

আজ্ঞে হ্যাঁ, তিনিই আপনার সম্মুখে। গুড্‌বাই।

বারিদবরণ ব্যারিস্টার এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল, কেহ কোথাও নাই। রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে সে বাহিব হইয়া গেল। একেবারে ল্যান্সডাউন মার্কেটের পথে।

মাঝরাস্তায় হরেকৃষ্ণ তাহাকে ধরিল, বলিল, এদিকে নয়, মিঃ রায়। আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দেবার হুকুম আছে আমার ওপর। একটা ফিটন ডাকব?

বারিদবরণ ভাবিল, গুড গড, ইংরেজ-রাজত্ব কি আর নাই।

বারিদবরণকে বাড়ির দবজা-তক পৌঁছাইয়া দিয়া হরেকৃষ্ণ বলিল, নমস্কার, আমরা আশেপাশেই থাকব। মিঃ মিত্রের বাড়ির দিকে কদিন যাবেন না যেন, দেখবেন। নমস্কার।

রাগে ও গরমে বারিদবরণের টাকে ঘাম দেখা দিল। টেলিফোনও ছাই মিঃ মিত্রেব বাড়িতে নাই যে,—। তাহা ছাড়া সেই গুণ্ডাটা সেখানে আস্তানা গাড়িয়াছে।

বারিদবরণ-সমস্যা যতক্ষণে শেষ হইল, ততক্ষণে পান্নালাল চা খাইয়া দক্ষিণের ঘবে নিশ্চিন্ত আরামে খবরের কাগজ পড়িতে বসিয়াছে। মিঃ মিত্র বাজার হইতে ফিরিয়াছেন এবং বারিদবরণ তাঁহার সহিত দেখা না করিয়া চলিয়া যাওয়াতে গৃহিণীর উপর তম্বি

কবিতেছেন। করুণা এই অবসরে চুপি চুপি পান্নালালের কাছে গিয়া বলিল, এসব করছ কি বল তো? আমাকে পাগল না ক'রে ছাড়বে না দেখছি। ধরা পড়লে—

পড়লে কি? ধরা তো পড়বই।

বাবা যদি পুলিস-টুলিস ডাকেন, যদি তোমায় অপমান করেন?

সতী দেহত্যাগ কববে, আমি দক্ষযজ্ঞ বাধিয়ে দোব। তোমাকে কাঁধে ফেলে ধেই ধেই ক'রে নাচব। —বলিয়া পান্নালাল করুণাকে কাঁধে তুলিতে গেল। করুণা পলাইয়া বাঁচিল।

মিঃ মিত্র ও পান্নালাল টেবিলে সামনাসামনি খাইতে বসিয়াছে, খাওয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, মিঃ মিত্র হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, তা হ'লে সুবেশের—

মিসেস মিত্র চাটনি আনিতে রান্নাঘরে গিয়াছেন, করুণা সামনের বারান্দায় পায়চারি করিতেছে, তাহাব ঘোর সবুজ রঙের লালপাড় শাড়িটা পান্নালালের মগজে রঙ ধরাইয়া দিল। সে হঠাৎ হাত গুটাইয়া লইয়া বলিল, আজ্ঞে, আমি সুবেশের কেউ নই।

মিত্র সাহেব চমকাইতেই দইযেব প্লেট হইতে চামচটা ঝনাৎ করিয়া মেঝেতে পড়িল। এমন ভয় পাইয়া গেলেন যে, মনে হইল, তিনি একটা বিভল্‌বারও যেন দেখিয়াছেন। গোড়ায় যাহা ভাবিযাছিলেন, তাহাই বুঝি ঠিক , স্বদেশী ডাকাতির আসামী না হইয়া যায় না। চটিযা পুলিস ডাকাও ঠিক হইবে না।

মিঃ মিত্রের গোড়ার সন্দেহের কথাটা পান্নালাল করুণার কাছে শুনিয়াছিল, বিনীতভাবে বলিল, কোনও উপায ছিল না আমার। পুলিসে তাড়া ক'বে বেড়াচ্ছে, আমি নিরুপায় হয়ে—

সর্বনাশ! চট্টগ্রাম?

আজ্ঞে না, হিলি। কটা দিন আমাকে আশ্রয় দিন, আপনাকে বিপদে আমি ফেলব না। দুদিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকলেই—

এতদিন পরে মিঃ মিত্র ইষ্টদেবতাব শবণ লইলেন। তাঁহার মনে হইল, টিকটিকি পুলিসে তাঁহাব বাড়ি ঘেরাও করিয়াছে, থানায় এজাহার আব আদালতে সাক্ষী দিতে দিতে তাঁহার প্রাণ ওষ্ঠাগত, হয়তো আসামীর কাঠগড়াতেই তাঁহাকে দাঁড়াইতে হইবে, গৃহিণী এবং করুণার উপরও নিশ্চয়ই জুলুম চলিবে, আর মাসিক পেন্‌শনের টাকাগুলি—মিঃ মিত্র আর ভাবিতে পারিলেন না, চট করিয়া এঁটো হাতেই পান্নালালের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, বাবা, আমি বুড়ো মানুষ, তুমি আমার ছেলের বযসী, আমাকে বাঁচাও বাবা।

মিত্র গৃহিণী চাটনি লইয়া ঘবে প্রবেশ কবিতেছিলেন, স্বামীর কাণ্ড দেখিয়া তিনি অবাক। সাহেব তো সকালে কখনও সেই ওষুধটা খান না, তবে?

জানালাব ফাঁক দিযা করুণা ঘটনাটা দেখিয়া গিয়াছে। পান্নালাল আঁচাইযা পরম পরিতৃপ্তির সহিত পান চিবাইতে চিবাইতে দক্ষিণের ঘবটায় প্রবেশ করিতেই সে ঝড়ের মত সেখানে গিয়া বলিল, দেখ, বাবাকে নিয়ে যদি অমন রসিকতা শুরু কর, তা হ'লে আমি মার কাছে সব ফাঁস ক'রে দোব কিন্তু। বাবা বুড়ো মানুষ—

পরে সুদে আসলে সব শোধ দোব কবি, এখন বেগতিক। তোমার টেকো ব্যারিস্টারটার চিঠি এসে পড়বে আজ সন্ধ্যায়, না হয কাল সকালে, তখন? আসল লোকটাকে না হয় হরেকেষ্টর জিম্মায় রেখে দিয়েছি, এখন ডাকঘরকে ঠেকাই কি ক'বে?

ওই বুদ্ধি নিয়েই তুমি শেষরক্ষে করবে ভেবেছ, না? মশাই, চিঠির ব্যবস্থা আমি করব, সে তোমাকে ভাবতে হবে না। কিন্তু এদিকে অঘ্রাণ মাস যে এসে পড়ল, তার হিসেব আছে?

পান্নালাল যেন সদ্য আকাশ হইতে পড়িল, চোখ দুইটা ছানাবড়ার মত কবিয়া সে একবার করুণাব দিকে চাহিল। পবক্ষণেই চট করিয়া মালকোঁচা মারিয়া লইযা ডান হাতের

চাপড়ে বাঁ হাতের বাইয়ে কুস্তিগীরের ভঙ্গিতে আওয়াজ তুলিতে তুলিতে বলিল, কুছ পরোয়া নেহি।

করুণা আর অপেক্ষা না করিয়া বাবার ঘরে আড়ি পাতিতে ছুটিল।

স্বামী-স্ত্রীতে ততক্ষণে পরামর্শ স্থির হইয়া গিয়াছে। রুবির বিয়েটা লইয়াই যত গোল, নতুবা তাঁহারা আজই শিমূলতলা রওনা হইয়া আত্মরক্ষা করিতেন। বারিদবরণের সঙ্গে অবিলম্বে দেখা হওয়া দরকার। সে পর্যন্ত ডাকাতটাকে ঘাঁটাইয়া কাজ নাই।

সন্ধ্যার দিকে মিঃ মিত্র বাহির হইয়া গেলেন। রাত্রি আটটা নাগাদ তিনি রাগে একেবারে অগ্নিশর্মা হইয়া যখন বারিদবরণের বাসা হইতে ফিরিলেন, তখন এদিকেও বিষম বিপর্যয় ঘটিয়া গিয়াছে।

পান্নালাল এবং করুণার কলেজঘটিত ব্যাপারের বিবরণ সংগ্রহ করিতে বারিদবরণকে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। ছাত্রছাত্রী-মহলে তাহারা উভয়ে বিশেষ পরিচিত, তাহাদের প্রেম এত পুরাতন যে, সকলে প্রায় তাহা ভুলিতে বসিয়াছে। কেবল মিঃ মিত্র, মিসেস মিত্র এবং ব্যারিস্টার বারিদবরণই যেন চোখ বুজিয়া কাল কাটাইতেছিলেন।

মিঃ মিত্র বাড়ির বাহির হইয়া যাওয়ার পরেই মিসেস মিত্রও ছাতে উঠিয়া পায়চারি শুরু করিয়াছিলেন ; হঠাৎ কি একটা কাজে নীচে নামিয়া করুণাকে আপেলের পুডিংটা সম্বন্ধে কি একটা কথা বলিতে গিয়া একটু বিস্মিত হইলেন। করুণা ঘরে নাই। এ ঘর ও ঘর খুঁজিলেন, কোথাও নাই। হঠাৎ মনে একটা সন্দেহের উদ্রেক হওয়াতে পা টিপিয়া টিপিয়া দক্ষিণের ঘরের খোলা দরজার কাছে গিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার অন্তরাত্মা জ্বলিয়া উঠিল। স্বদেশী ডাকাতটা চিত হইযা বিছানায় পড়িয়া আছে, আর তাঁহার আদরের কন্যা পাকা গিন্নীর মত তাহার শিয়রে বসিয়া চিরুনি দিয়া তাহার চুল আঁচড়াইতেছে। যুগপৎ বিস্ময়ে এবং ক্রোধে তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন।

পান্নালালই প্রথমে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা শয়তানী বুদ্ধিও যে তাহার মাথায় খেলে নাই, তাহা নয়। সে যেন মিসেস মিত্রকে দেখে নাই—এই ভাবে হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া করুণার টুঁটি চাপিয়া ধরিয়া বলিবে ভাবিয়াছিল, আমরা স্বদেশী ডাকাত, হত্যার চাইতেও নিদারুণ, খুনের চাইতেও নির্মম, তোমার গয়না-গাঁটি যা আছে দিয়ে ফেল, দেশের কাজ, মায়ের—

কিন্তু প্রহসনটাকে আর বেশিদূর টানিতে ইচ্ছা হইল না। সে বিছানা হইতে লাফাইয়া উঠিয়া মাথা নীচু করিয়া ঘরের এক পাশে দাঁড়াইল। করুণা মায়ের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া বলিল, মা, আমাকে মাফ কর। তাহার চোখে জল।

মা মেয়ে বাহির হইয়া গেল।

সমস্ত ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত শুনিয়া মা বলিলেন, এদ্দিন বলিস নি কেন? বললে এত গোল হ'ত না। আর ওই বা এত গোঁয়ারগোবিন্দ কেন, একেবারে বাড়ি চড়াও হয়ে জামাই হতে এসেছে?

অবনত মস্তকে আমতা আমতা করিয়া করুণা বলিল, ওই ওর কেমন বদ-স্বভাব মা, কোনও কাজই আর পাঁচজনের মত করবে না।

তা হ'লে তো ওর হাতে পড়লে কষ্ট পাবি তুই।

আমার স'য়ে গেছে মা।

এবারে মায়ের কথা জোগাইল না। প্রসঙ্গটা ঘুরাইবার জন্য বলিলেন, তুই যা মা,

পান্নালালের কাছে, আহা, বাছাকে কালকে একটা মশারিও দেওয়া হয় নি। এক কাপ চা খাবে কি না জিজ্ঞেস কর।

এমন সময় কাটা টিকটিকির লেজের মত লাফাইতে লাফাইতে লাঠিহস্তে মিঃ মিত্রের প্রবেশ। কোথায় সে হারামজাদা, দেখে নোব, আমার সঙ্গে চালাকি! রুবি—রুবি!

মিসেস মিত্র ততক্ষণে তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিতেছেন, আঃ, কর কি? কাকে হারামজাদা বলছ? ও তোমার জামাই যে। বুড়ো বয়সে—

জামাই, না তোমার মুণ্ডু! বাড়ি চড়াও হয়ে জামাই হতে আসবে? চাই না অমন—

ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, চুপ কর, ওই ওর কেমন স্বভাব!

তিনি করুণার কাছে যেমন শুনিয়াছিলেন, ঘটনাটা স্বামীর কাছে বলিতে লাগিলেন। পান্নালাল ও করুণা ততক্ষণে আসিয়া মিত্র সাহেবের পায়ের ধূলা লইয়াছে। রিটয়ার্ড ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে মেয়ে ও ভাবী জামাইকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, তা দেখ বাপু, তোমার চালাকে বারিদবরণের ওখান থেকে—

পান্নালাল তাঁহার কথা শেষ হইতে দিল না, বলিল, আজ্ঞে, আমি এখনই যাচ্ছি।

রেশ

তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী

হাসছে সকলে।

খুশিতে ডগমগ হ'য়ে হাসছে বন্ধুবান্ধব-আত্মীয় স্বজন। ওদের হাসির বৈঠকে যোগদান করতে পারছে না দীননাথ। হাসি দেখলে চাপাকান্না বুকের ভেতর উঠছে।...

একসময় হাসির খোঁজে অস্থির হয়ে পড়ছিল দীননাথ। নিজের মনের কোণে খুঁজতো। পথযাত্রী খদ্দের পরিবারবর্গের চোখেমুখে অনুসন্ধানীদৃষ্টি ফেরাতো কাজের ফাঁকে ফাঁকে।

এতো তল্লাসেও, হাসিপাগল দীননাথ, তার আকাঙ্ক্ষিত হাসি দেখতে পায়নি কারো চোখেমুখে।

দোকানে খদ্দের এসেছে। প্রতিমা কিনতে। ছেলে অমরনাথ আর্টস্কুলে পড়া শিল্পী—দেখাচ্ছে বোঝাচ্ছে জ্যামিতির ছকমাপা নিয়ম-কানুনে তৈরী প্রতিমা। —পিরামিডিক্যাল—ত্রিকোণের মধ্যে, চারকোণার কিউবিক্যাল, স্তম্ভপ্যাটার্নের সিলিন্ড্রিক্যাল, গোলের ভেতর স্ফিঅ্যারিক্যাল।

খদ্দেরদের ঠোঁটের কোণে প্রশংসার হাসি ফুটে উঠছে। পুত্রের গালে খাঁজ পড়ছে গৌরবের হাসিতে। দেখলে খানিকক্ষণ সেকেলে বৃদ্ধ দীননাথ চেয়ে চেয়ে। মন ভরল না। মনে হল, ধনীর ধন্যবাদ আর গৌরব-গরবের মিতালী ঘটছে জ্যামিতির মাপেরই মতো—এ যেন যান্ত্রিক হাসি।

হাসির কলরোল শুনতে পেল রাস্তায় সেদিন। দোকান থেকে বেরিয়ে এলো ত্বরিৎগতিতে দীননাথ। যতো সবার মুখ দেখছে, ততো বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যাচ্ছে।— শবযাত্রীদের হাসির লহর। বোধহয় বৃদ্ধ মরায় বিষয় পেল এরা সব, তাই উত্তরাধিকারীর উল্লাস এদের হাসির রবে। বৃদ্ধশবের খাটশুদ্ধ নিয়ে নাচানাচি করে চলার বহর এতো!

দোকানের লাগোয়া চালাঘরের ভেতর যখুনি গেছে, তখুনি দেখেছে, স্ত্রী-পুত্রবধূ নাতিনাতনী যেন এক একটি বিষাদখিন্ন প্রতিমা। অভাব-অনটনের নিষ্পেষণে নিস্তেজ। হাসির ফোয়ারা শুকিয়ে গেছে একেবারে। বিফল হয়ে ফিরে এসে, ভারায় উঠেছে আবার দীননাথ। আবার রঙেভরা মাটির সরায় তুলি ডুবিয়েছে। দুর্গাপ্রতিমার মুখে বুলিয়েছে। চোখ-ঠোঁটে রঙের যাদুতে হাসি ফোটাতে চেষ্টা করেছে। পারে নি। হাসির জায়গায় কান্নাই এনে ফেলেছে যেন প্রতিবারে। বার বার প্রতিমার মুখ-চোখ-ঠোঁটের রঙ তুলে ফেলতে হয়েছে তাকে এই একই কারণে। তার হাতের মূর্তি জীবন্ত হয়ে ওঠে তুলির ছোঁয়ায়। স্বর্গীয় হাসি হেসে ওঠে। বনেদিঘরের বৃদ্ধেরা এখনো বলে সে কথা। তাই এই বয়সে ষাটের কোঠা পেরিয়েও—অসমর্থ দেহ নিয়ে ঠাকুর গড়তে হয়। ছেলের গড়ামূর্তি পছন্দ হয় না বাবুদের। তার গড়া চাই! ভেতর ভেতর রাগে ফেটে পড়ে দীননাথ বাবুদের ওপর! — সে পারছে না। অভাবের তাড়নায় যে তারও ভাবের থলি শূন্য হয়ে গেছে—এটা কেউ বোঝে না। শুধু জুলুম আর জুলুম!

মূর্তিগড়া—দোকানের ভার অমরনাথের ওপর দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে চেয়েছিল, হওয়া গেল না। ঠাকুর্দার খদ্দেরদের ছেলেরা বাবার জীবদ্দশায় রেহাই দেয়নি। বাবার খদ্দেরদের ছেলেরাও তাকে দিচ্ছে না। দেবেও না।

পূজোর দিন যতোই এগিযে আসছে, ততোই যেন দীননাথ উগ্রমেজাজী হয়ে উঠছে। সদাহাসিখুশি মাটির মানুষ দীননাথের ব্যতিক্রম ঘটছে। সকলে বিস্মিত—তটস্থ।

কাউকে কিছু বলতে পারছে না দীননাথ—নিজের মনোবেদনার কথা। বলতে গেলে, আত্মসম্মানের কপাট পড়ে যায় মুখে তক্ষুণি। এদিকে দারুণ দুশ্চিন্তা বেড়েই চলেছে-—তাড়াতাড়ি মূর্তি শেষ করতে না পারলে, পূজোর সময় বিপদে পড়বে লোকে তার জন্যে। পূর্ব সুনাম ক্ষুণ্ণ করে যা' তা মুর্তি গড়েও দেওযা যায না কিছুতেই। লোকের চোখে ধুলো দেওয়া বাপ ঠাকুর্দার কোষ্ঠিতেও লেখা নেই।

দীননাথ, আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও মনোমতো করে তুলতে পারছে না মাযেব মুখখানাকে।—অসুবনাশিনী করুণাময়ী সহাস্যবদনে অসুরকে বধ ক'রে মুক্তি দিচ্ছেন। ধ্যানেব এই ভাবরূপ সারাজীবন ধরে প্রতিমায় ফুটিয়েও এখন অপারগ হচ্ছে। আশ্চর্য! সহাস্যবদনাকে নিজের মনের ধ্যানে আনতে পারছে না এক মুহূর্তও। মায়ের হাসি ফুটছে না তাই।

নিজের ওপর ধিক্কার এলো দীননাথের। ভাগ্যেব নির্মম পরিহাস। এই রকম যখন মানসিক অবস্থা—সেই সময় একদিন ঈপ্সিত হাসি দেখতে পেল হঠাৎ। দেখতে পেল বড় করুণ অবস্থাব ভেতব দিয়ে।

ভাবায উঠে, দিক্‌হারা পথিকেব মতো, মায়ের মুখে তখন রঙ চড়াচ্ছে দীননাথ। দোকানের লাগোযা চালাঘবের দবজা ঠেলে, এসে উপস্থিত হ'ল দু'বছবের নাতনী—রতন মণি। চোখে জল। জলের সঙ্গে আব্দারের সুরের বায়না। একে মন-মেজাজ সপ্তমে চড়েই আছে তার ওপর সোনায সোহাগ যোগাল নাতনীর ছিঁচকাঁদুনেপনা। বিবক্ত হ'যে উঠল দীননাথ। নাতনীকে ভেতরে যেতে বললে, ধমকালে। হিতে বিপবীত হ'ল। রতনমণির গোঁয়ের কান্না উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল। অগত্যা ভারা থেকে নামতে হ'ল দীননাথকে।

নাতনী আলমারীতে সাজানো সাববন্দী মাটির ফলের দিকে আঙুল দেখাচ্ছে কেবল। রঙের-কারিগরিব মহিমায় নকল ফল আসল দেখাচ্ছে—তাজা—একেবাবে যেন গাছ থেকে পাড়া হয়েছে সবে। খেযাল ধবলে, ফলগুলো পাবার জন্যে হুলুস্থুল বাধায় রতনমণি। এ কাণ্ড ঘটে মাঝে মাঝে। অন্য সময় আদর কবে, দোকান ঘর থেকে সবিয়ে নিয়ে যায রতনমণিকে দীননাথ। ফলের নেশা ভোলাবাব চেষ্টা করে। ভোলায়ও। এবাবে কিন্তু কোনো চেষ্টাই কবলো না সে সব। বরং আলমারী থেকে একটা মাটির আম বার কবে ওর হাতে দিলে তাড়াতাড়ি বিদায কববার জন্যে।

নিমেষে চোখের জলে হাসির ঝলক উছলে পড়ল বতনমণিব। বাঞ্ছিত ফল পেযে মুখভবা হাসি।

বিমুগ্ধ চোখে দেখছে এই হাসি দীননাথ। এই হাসিই যেন খুঁজছিল সে এতদিন ধবে। মনের জড়তা অবসাদ কেটে গেল মুহূর্তে। দ্বিগুণ শক্তি এসে পড়ল দেহমনে। ভাবায উঠল। তুলি হাতে নিলে! ...

ফুটল স্বর্গীয় হাসি মৃন্ময়ীমূর্তির মুখের ভাঁজে ভাঁজে। —আগেব সুনাম অক্ষুণ্ণ হয়ে থাকবে দীননাথের। লোকে বলবে, জীবন্ত প্রতিমা। দীননাথ মরেনি এখনো। বেঁচে আছে। তুলি তার মৃতসঞ্জীবনী!

দীননাথের চোখে মুখে খুশি উপচে পড়ছে। প্রতিমার মুখ দেখছে বাব বার। দেখেও সাধ মিটছে না। অন্যবারে নিজের অন্তবের হাসি প্রতিমাব মুখে পলেপ দেয সে। এবারে সে উৎসে তার আকাল লেগেছে। নাতনীব হাসিব রঙে তুলি ডুবিয়েছে। আগেকার সমস্ত শিল্পকৌশলেব মাধুর্য ম্লান করে দিয়েছে তাব এই নতুন সৃষ্টি।

তাবস্বরে কেঁদে উঠল বতনমণি। বুঝল বোধহয় ঠকেছে দাদুর কাছে। মাটির আমে দাঁত বসিয়ে আঘাত পেয়েছে।

পিছন ফিরে তাকিয়ে এ দৃশ্য দেখলে দীননাথ। বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠল। নীচে নেমে এসে, কোলে তুলে নিলে নাতনীকে। প্রতিমার দিকে তাকালে একবার। প্রতিমা হাসছে আর ব্যঙ্গ করছে যেন তাকে। এই তুমি স্রষ্টা! সৃষ্টির অহংকার! ঠকিয়ে হাসি চুরি!

চোখে জল এল দীননাথের অনিচ্ছাকৃত দোষের জন্য। অন্যমনস্ক হ'য়ে—রতনমণিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল দোকান থেকে।

রতনমণির শিশুমন যন্ত্রণা ভুলল। কান্না ভুলল। দেখা-দৃশ্য ভুলল না কিন্তু দীননাথ। দুষ্টক্ষতের মতো মনের গভীরে দাগ কেটে বসেছে। অন্যবারের মতো প্রতিমাকে জীবন্ত করে তোলার কৃতিত্ব তার এবারে এতোটুকু নেই। চুরিকরা হাসির প্রলেপ দেবীর মুখে।

প্রতিমা দেখে সবাই হেসেছে। পঞ্চমুখে প্রশংসা করেছে। বলেছে, মা আমাদের সদানন্দময়ী হাসিমুখী।

সরে গেছে তক্ষুণি দীননাথ। খদ্দেরদের কথাগুলো যেন কানে গরম সীসেগলা ঢেলেছে। এ সুখ্যাতি পাবার অধিকারী সে নয়।

মূর্তিটি নিয়ে ছেলের সঙ্গে, স্ত্রীব সঙ্গে, বন্ধুবান্ধব—সকলের সঙ্গেই ভীষণ মন কষাকষি সুরু হ'ল দীননাথের। কিছুতেই মূর্তিটি বেচবে না সে। ওরাও নাছোড়বান্দা—বেচতেই হবে।

সমবয়সীরা বললে, ভীমরতি ধরেছে। তা না হ'লে এতোবড় একটা যোগ কি কেউ ছেড়ে দেয়! আশ্চর্য! লক্ষ্মী-সরস্বতী একসঙ্গে—যশ-অর্থ!

স্ত্রী ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল—পূজো চলে গেলে তো মূর্তি পড়ে পড়ে কাঁদবে, তখন হাসি থাকবে কোথায়! মূর্তি ঘরে রাখলে, হাসি দেখলে কি পেট ভরবে? সারা বছবের পেটের যোগাড় তো এই সময়! কথা শুনলেও গা জ্বলে ওঠে। বলে কিনা ও মূর্তিতে আমাব দেওয়া নেই কিছু, বেচার অধিকারও নেই তাই। মাথা খারাপের আর বাকি কোথায়? বলি তবে কার?

কাব? বলতে গিয়েও পারল না দীননাথ। কথা জড়িয়ে গেল। সবম এলো। নিজেব দুর্বলতা চাপতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল মৌনধর্মের আড়ালে।

অমরনাথও বোঝাল বাবাকে। দ্বিগুণ থেকে চতুর্গুণে দব উঠেছে। এই বেলা, আর দেরী নয়। পুবোনোরা পায়ে সুতো ছিঁড়িয়ে, ঘটপূজো করবে বলে চলে গেছে। এবারে ছেলের দলও সরবে কিন্তু। এখনো ঝোঁকটা রয়েছে—জ্যামিতি মাপের প্রতিমা ভালো লাগছে না। এই মূর্তিই প্রাণবন্ত ঠেকছে ওদেব চোখে। মওকা ছাড়া ঠিক হবে না।

না, না, না। তিনটে অব্যক্ত স্বর যেন কষাঘাতে আহত হয়ে বুক ছিঁড়ে বেরিয়ে এলো দীননাথের।

হতভম্ব স্তব্ধ সকলে।

দীননাথের এই ধনুক-ভাঙা পণকে ভাঙতে নিভৃতে পরামর্শ চলল। বন্ধুবান্ধব স্ত্রী-পুত্র এক জোট হল।

খদ্দের এসেছে।

দীননাথ চোখের সামনে অবিশ্বাস্য ঘটনা দেখছে। বাক্য সরছে না মুখে। স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার অনুমতির প্রত্যাশা না করেই সকলে মিলে লরীতে তুলে দিলে প্রতিমা। বিক্রি হয়ে গেছে! অপরিসীম আনন্দে মশগুল সবাই। একটি প্রতিমায় এতোগুলো টাকা আর এতো সুখ্যাতি কেউ পায়নি এই কুমারপাড়ায় এর আগে কখনো।

মূর্তি চলে যাচ্ছে। লরীর গতি বাড়ছে। মন্থর থেকে দ্রুত হচ্ছে। বড় রাস্তায় আরো বাড়ল। অদৃশ্য হয়ে গেল লরীসমেত প্রতিমা।

সমবেত সকলের হো-হো-হা-হা শব্দের হাসি যেন দীননাথের কানে করুণকান্নার সুরে বাজছে—রতনমণির কান্না!

লবঙ্গীয় উন্মাদাগার

প্রমথনাথ বিশী

লবঙ্গ দেশের রাজা একদিন শুনিতে পাইলেন যে, বিদেশ হইতে একজন বড় এঞ্জিনিয়ার রাজধানীতে আসিয়াছে। তিনি এঞ্জিনিয়ারকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সে ব্যক্তি রাজসমীপে পৌঁছিলে রাজা বলিলেন যে, আপনি এখানে আসিয়াছেন দেখিয়া আমি খুশী হইলাম— আমার একটি কাজ করিয়া দিলে আপনাকে আমি যথাসাধ্য পারিতোষিক দিব।

এঞ্জিনিযারের নাম সকল শর্মা।

সকল শর্মা শুধাইল—কি কাজ রাজন্! আমাব সাধ্যাতীত না হইলে নিশ্চয আমি করিতে চেষ্টা করিব।

বাজা বলিলেন—আমার রাজধানীতে একটি পাগলা গারদ বা উন্মাদাগার তৈয়ারী করিতে চাই।

সকল শর্মা বলিল—এ আব কঠিন কি? আমি কত হাসপাতাল, বিদ্যালয ও বিজ্ঞানাগাব তৈয়ারী করিয়াছি, একবারে উন্মাদাগার তৈযারী কবিয়া দিব—ঐসব তৈয়াবী করিযা হাতে খড়ি তো হইয়াই আছে। কিন্তু মহারাজ, উন্মাদাগারটি কত বড় হইবে আগে তাহা জানা আবশ্যক।

রাজা বলিলেন, একটা রাজ্যের পাগল আর কয়জন হইবে? প্রকৃতিস্থ লোকের সংখ্যার চেযে অনেক কম হইবে সন্দেহ নাই। তবু তুমি এক কাজ করো—রাজধানীতে ঘুবিয়া দেখো, কত জনেব দেখা পাও। তারপরে সেই সংখ্যা অনুসারে উন্মাদাগারটি গড়িয়া দাও।

সকল শর্মা বলিল—যে আজ্ঞা, রাজন! তবে বিপদ এই যে, পাগল সব সময়ে চোখে দেখিলেই বুঝিতে পাবা যায় তাহা নয়। বিশেষ, পাগল দুই প্রকার —বদ্ধ পাগল, ও মুক্ত পাগল। বদ্ধ পাগলদের সহজেই চিনিতে পারা যায়; কিন্তু মুক্ত পাগলগণই বিপদ বাধায়— তাহাদের চেনা বড়ই কঠিন, কারণ তাহাদের আচরণ প্রায স্বাভাবিক সুস্থ লোকের মতোই। গোলাকার পৃথিবী যেমন উত্তর ও দক্ষিণে হঠাৎ চাপা তেমনি মুক্ত পাগলগণ অন্যান্য সব বিষয়ে প্রকৃতিস্থ হইলেও বিশেষ বিশেষ বিষয়ে অস্বাভাবিক।

তার পরে সকল শর্মা বলিল—যাহা হোক, মহাবাজ, আমাব চেষ্টার ত্রুটী হইবে না— আমি রাজধানীতে বাহির হইলাম, পাগলের সংখ্যা নির্ণয় করিয়া যথোপযুক্ত উন্মাদাগার শীঘ্রই গড়িযা দিতেছি, আপনি চিন্তা করিবেন না।

এই বলিয়া সকল শর্মা বাজধানী পর্যটনে বাহির হইল।

২

সকল শর্মা পথে বাহির হইযা একটি বিরাট অট্টালিকা দেখিতে পাইল, দেখিল তাহার সিংহদ্বারে লিখিত আছে 'অত্যুচ্চ বিদ্যাগার।' তাহার কৌতূহল বোধ হইল। সে ইতিপূর্বে বিদ্যা ও উচ্চ বিদ্যা দেখিয়াছে, কিন্তু অত্যুচ্চবিদ্যা কখনো দেখে নাই। বাড়ীটাতে সে ঢুকিল।

অসংখ্য সিঁড়ি ভাঙিয়া চারতলায় উঠিয়া বুঝিল, অত্যুচ্চ বিদ্যার সাক্ষাৎ পাইতে হইলে ফুসফুস মজবুত হওয়া আবশ্যক। চারতলায় একটি হল ঘর। সকল শর্মা দেখিল যে, ঐ ঘরে একজন ব্যক্তি (তাহার আচরণ দেখিয়া বুঝিল যে সে অধ্যাপক না হইয়া যায় না) ব্যস্তভাবে পায়চারি করিতেছে আর বলিতেছে—আমি তান্ত্রিক প্রক্রিয়া করিয়া বৃষ্টি নামাইয়াছি—বিশ্বাস না হয় দেখুন ঐ বৃষ্টি হইতেছে, সকাল বেলায় প্রক্রিয়া করিয়াছি—এখনো দেখুন, আমার কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা রহিয়াছে। অধ্যাপক বলিতেছে—কাল অভিচাব করিয়া মন্ত্রী বেটাকে মারিব, পরশু মারিব ধর্মাধিকরণকে।

সে বলিতেছে আব ক্রমাগত নাসারন্ধ্রে নস্য (অপরের কৌটা হইতে লইয়া) দিতেছে। অন্যান্য অধ্যাপকেরা মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া শুনিতেছে। এমন সময় একজন অধ্যাপক বলিল—আমার সিনিয়র বেটাকে মাবিতে পারেন কি? তাহা হইলে আমার উন্নতি ঘটে।

তান্ত্রিক অধ্যাপক বলিল— কেন পারিব না?

অপর একজন অধ্যাপক বলিল—আপনি অভিচার তো জানেন—শুনিয়াছি আপনি ব্যাভিচারেও পারদর্শী! এ বিষয়ে—

তাহার কথা শেষ হইবার পূর্বেই তান্ত্রিক লাফাইয়া তাহাব ঘাড়ে পড়িয়া বলিল - ভৈবব প্রেরিতোহসি! আজ তোর রক্ত পান করিব।

তাহার ভাব দেখিয়া সকলে—অর্থাৎ অন্যান্য বিজ্ঞ অধ্যাপক কেহ সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল না, বরঞ্চ বলাবলি করিতে লাগিল—সবই মহামায়ার ইচ্ছা!

একজন বলিল—মরে তো মন্দ হয় না, আমার প্রোমোশন হয়।

আর একজন বলিল— যেটা মরে সেটাতেই লাভ।

অপর আর একজন বলিল—আহা দু'জন মরে না? দুদিন ছুটি পাওয়া যায়--অনেকদিন শ্বশুরবাড়ী যাওয়া হয় নাই।

তখন মনোভাবের অভিব্যক্তিতে ঘরের মধ্যে এক বিচিত্র দৃশ্য উপস্থিত হইল। কেহ কাঁদিতেছে, কেহ হাসিতেছে, কেহ প্রার্থনারত, কেহ পকেট হইতে মোদকের গুলি বাহিব করিয়া খাইতেছে—তান্ত্রিক তাহার শত্রুর ঘাড়ে কামড় দিয়াছে আব সেই হতভাগ্য বলিতেছে—মবিব তাহাতে দুঃখ নাই কিন্তু চাকুরিটি যাইবে যে। লবঙ্গ দেশবাসীব চাকুবি গেলে আব কি থাকে।

এমন সময়ে ঘরের বাহিরে একদল ছাত্র জুটিযা গেল। তাহাবা সেই অপূর্ব দৃশ্য দেখিয়া বলিল—এ যে সাম্রাজ্যবাদের লড়াই। চলো, সবাই একটা ধর্মঘট করি।

এই সব ব্যাপার দেখিয়া সকল শর্মা অত্যুচ্চ বিদ্যার একটা আভাস পাইল। সে মনে মনে 'নোট' করিয়া লইয়া নীচে নামিয়া আসিল।

সকল শর্মা চলিতে চলিতে দেখিতে পাইল, একটি অর্ধ সমাপ্ত অট্টালিকাকে ঘিরিয়া এমন প্রায় দশ হাজার লোক বসিয়া আছে। সেই জনতার মধ্যে সদ্যজাত শিশু হইতে মুমূর্ষু বৃদ্ধ অবধি আছে। জনতাটি দেখিয়া সকল শর্মা বুঝিতে পারিল যে, এখানে এইভাবে তাহারা দীর্ঘকাল বহিয়াছে, কারণ উনুনের ছাই জমিতে জমিতে স্তূপাকার হইয়াছে। তাহার আরও মনে হইল যে, ইহারা শীঘ্র এই স্থান ছাড়িবে না, কাবণ ছায়া পাইবে আশায় অনেকেই বৃক্ষ রোপণ করিতেছে। কিন্তু কেন যে তাহারা এখানে আছে—আব ঐ অসমাপ্ত বাড়ীটাই বা কি, সে কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। তখন সে জনতার একজনকে শুধাইল—বাপুহে, তোমরা এখানে বসিয়া রোদে পুড়িতেছ, জলে ভিজিতেছ, ব্যাপারটা কি? আর ঐ বাড়ীটাই বা কি?

তাহার কথা শুনিয়া জনতা একবাক্যে অর্থাৎ একধ্বনিতে হাসিয়া উঠিল, বলিল, দেখ্, দেখ্ একটা পাগল দেখ্!

কেহ বলিল— লোকটা এই বাড়ীটা চেনে না?

কেহ বলিল— লোকটা জীবনের উদ্দেশ্য জানে না।

কেহ কেহ বলিল—সাবধানে কথা বলিস্। এমন লোকের পক্ষে হঠাৎ কামড়াইয়া দেওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

লোকটা অর্থাৎ সকল শর্মা বলিল—যা বলিলে সবই সত্য—তবু আসল ব্যাপার কি খুলিয়াই বলো না। তারপরে তাহাদেব সম্মিলিত ভাষণ হইতে সে বুঝিতে পারিল যে, ঐ বাড়ীটি সম্পূর্ণ হইলে একটি 'সিনেমা হাউস' হইবে। পাছে বিলম্ব হইয়া গেলে টিকিট না মেলে তাই সকলে সময়মতো অর্থাৎ কিছু আগে আসিয়া বাসিয়া আছে। সে শুনিল যে, তাহারা এখানে এই অবস্থায় প্রায় আড়াই বৎসর রহিয়াছে। বাড়ী তৈয়ারী করিতে করিতে মালিকের টাকা ফুরাইয়া যাওয়া সে ব্যবস্থা কবিতে গিয়াছে, টাকা লইয়া সে আবার শীঘ্রই ফিরিবে। আব যদি নাই ফেরে—তাই বলিযা তো সাধনমার্গ ত্যাগ করিতে পারা যায় না। তাছাড়া অন্যত্র গিয়াই বা তাহারা কি করিবে? সময মতো সিনেমা দেখা ছাড়া ল বঙ্গবাসী জীবদেব আর কি-ই বা উদ্দেশ্য আছে?

সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া সকল শর্মা বলিল—আচ্ছা, তোমরা ঠিক করিয়া বলিতে পাবো যে, তোমরা পাগল নও?

একজন ছোকরা বলিয়া উঠিল—সাধনপন্থাব নিষ্ঠা দেখিয়া যদি আমাদেব পাগল মনে কবো তবে আমরা পাগল। কিন্তু যীশু, বুদ্ধ, রামকৃষ্ণ, গান্ধী—তাহাবাও কি এইরূপ পাগল নহেন?

আর একজন বলিল— বাজে কথায় সময় নষ্ট করা উচিত নয— হঠাৎ টিকিট ঘর খুলিতে পাবে—অতএব অন্যমনস্ক হইও না।

সকল শর্মা দেখিল যে, তাহার সঙ্গে আর কেহ কথা বলে না—তাই সে অন্যত্র যাইতে বাধ্য হইল।

ল-বঙ্গ দেশের বাজধানী দেখিযা সকল শর্মার চক্ষু ধন্য হইযা গেল। এখানে পথেব কি জনতা আর কি ব্যবস্থা! যানবাহনেব ছাদ হইতে চাকা অবধি সর্বত্র যাত্রী ঝুলিতেছে, প্রত্যেক খানি গাড়ী যেন এক একটি নরনারীকুঞ্জর। সে দেখিল মোটরগুলি তীব্রবেগে ছুটিয়া আসিযা যাত্রী পথিককে চাপা দিতে চেষ্টা করিতেছে—আব মজা এই যে, চাপা পড়িলে মোটরেব চাকার হানি হইল বলিযা সবাই আহত পথিককেই মারে। নিহত হইলে মড়াব উপর খাঁড়াব ঘা দেয়। সে দেখিল, বাজারে এক টাকার জিনিষ দশ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইতেছে—কিন্তু তাই বলিয়া কি ক্রেতার অভাব আছে? সে দেখিল, কো-এডুকেশনের মতো ল-বঙ্গ দেশে 'কো পারচেজিং' প্রথা চলিত। দোকানে ক্রেতা জোড়ায় জোড়ায় বর্তমান, একজন স্ত্রী, একজন পুরুষ। স্ত্রীলোকটি দর কষে, জিনিষ গ্রহণ ও পবে ব্যবহার সবই করে, পুরুষটিব ভার কেবল দাম দিবার। দাম শুনিয়া পুরুষটি ইতস্ততঃ কবিলে মেয়েটি বলিযা ওঠে, তোমার কি চক্ষুলজ্জা নাই? এমন জানলে আমি ... এমন হলে আমি আজই .. হতভাগ্য পুরুষ বহু পরিশ্রমেব বাহ্য প্রতীকস্বরূপ খানকতক কড়কড়ে নোট বাহিব করিয়া দেয, মেয়েটাব মুখে হাসি ফোটে, বিক্রেতাব মুখে আভাসে খেলিয়া যায়—এই জন্যেই তো ওরা শক্তিময়ী।

রাজধানীর প্রান্তে ফুটবল খেলা হইতেছিল—সকল শর্মা সেখানে গেল। সে দেখিল, বাইশজন খেলোয়াড়ে মিলিয়া বেফারিকে মারিতে চেষ্টা করিতেছে, বেফারি চতুর, সে

ক্রমাগত মার বাঁচাইয়া যাইতেছে, ফলে বেচারা চামড়ার গোলকটার উপরে দমাদম লাথি পড়িতেছে। খেলার সময় শেষ হয়-হয়, রেফারি অনাহত রহিয়া যায়, ঠিক এই রকম অবস্থায় দশ হাজার দর্শক খেলার মাঠে ঢুকিয়া পড়িল—তাহারা রেফারির প্রহার দেখিবার আশায় টিকিট কিনিয়াছে—খেলোয়াড়দের অপটুতায় পয়সা নষ্ট হইতে তাহারা দিবে না। দশ হাজার দর্শকের চেষ্টা নিষ্ফল হইবার নয়, রেফারি মারা পড়িল—পরদিনের সংবাদপত্রগুলি বলিল—রেফারিকে মারিতে গিয়া আরো শতাবধি লোক মারা পড়িয়াছে। কিন্তু এমন হইয়াই থাকে—পাকা ফলটি লক্ষ্য করিয়া ঢিল ছুঁড়িলে সঙ্গে কাঁচা ফল কি পড়ে না?

সকল শর্মা বুঝিল, ল-বঙ্গ দেশের উন্মাদাগার অপ্রশস্ত হইলে চলিবে না। পরদিন মধ্যাহ্নে সে একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকার কাছে গিয়া উপস্থিত হইল। দেখিতে পাইল বাড়ীটির চূড়ায় এক জোড়া নাতি-বৃহৎ দাঁড়ি-পাল্লা খোদিত। সে বুঝিল, ইহা একটি বাজার বা দোকান বাড়ী। সে ভিতরে ঢুকিল, কেহ বাধা দিল না। সে প্রকোষ্ঠ হইতে প্রকোষ্ঠান্তরে গেল, কেহ বাধা দিল না। প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে ক্রেতা ও বিক্রেতা সে দেখিতে পাইল। সে দেখিল, বিক্রেতা মাথায় পরচুলা পরিযা গম্ভীরভাবে চেয়ারে আসীন—আর ক্রেতা ও দালালগণ তাহার সম্মুখে কত কাকুতি মিনতি, কত আবেদন-নিবেদন করিতেছে। সে ভাবে ভাষায় বুঝিল, খুব দামী জিনিষ বিক্রয় হইতেছে। কিন্তু জিনিষটা যে কি তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। তখন সে একজন পুলিশকে শুধাইল—ভাই, এখানে কি বিক্রয় হয়?

তাহার কথা শুনিয়া পুলিশ রুল উঁচাইয়া মারিতে আসিল—সকল শর্মা ছুটিতে ছুটিতে কলার খোসায় পা ফসকাইয়া স্কেটিং করিবার মতো এক মুহূর্তে পঞ্চাশ গজ চলিয়া গেল। কাছেই দুইজন রিপোর্টার দাঁড়াইয়া ছিল, তাহারা ছবি তুলিয়া লইয়া বলিল, "ভালই হল, অবসর সময়ে কাশ্মীরে ভারতীয় সৈন্যরা স্কেটিং করিতেছে বলিয়া ছবিটাকে চালিয়ে দেবো—দেশের লোকেও খুশি হবে—আবার 'ওরাও' একটু জব্দ হবে।'

সকল শর্মা রিপোর্টারদের বলিল, — ভাই, ছবির একখানা কপি পাই না?

একজন রিপোর্টার বলিয়া উঠিল—মশকরা করবার আর জায়গা পাননি!

অপরজন বলিল—প্রত্যেক কপি দশ টাকা!

সকল শর্মা বলিল—আমার ছবি আমাকে কিনতে হবে?

সে বলিল— কেন নয়? বাজার ঘুরে দেখো না!

সকল শর্মা প্রস্থান করিল।

সকল শর্মা মাঝে মাঝে রাজপ্রাসাদে গিয়া রাজার সঙ্গে দেখা করিত। রাজা শুধাইতেন, কি, আমরা পাগলা গারদের কত দূর?

সকল শর্মা বলিত—আগে পাগলের সংখ্যা নির্ণয় করিয়া লই।

রাজা হাসিয়া বলিতেন—খুঁজিয়া পাইতেছ না বুঝি! দেখো, আমি আগেই বলিয়াছিলাম, এ রাজ্যে পাগল বেশী নাই।

সকল শর্মা উত্তর করিত না—চলিয়া আসিত।

একদিন পথ চলিতে চলিতে সকল শর্মা দেখিতে পাইল যে, একজন বৃদ্ধকে একদল বালক ঘিরিয়া ধরিয়াছে, বলিতেছে যে, এখনি মাপ চাইতে হইবে আর এক শ' টাকা জরিমানা দিতে হইবে।

সকল শর্মা শুধাইল—ব্যাপার কি?

একটি পাঁচ বৎসরের বালক বলিল—দেখুন, এই ভদ্রলোক আমাকে অপমান করিয়াছে, তাই আমার ক্লাবের সদস্যগণ দণ্ডবিধান করিতে আসিয়াছে।

সকল শর্মা শুধাইল—এই ভদ্রলোক তোমার কে?

বালকটি বলিল—বাড়ীতে 'ফাদার', পথে ভদ্রলোক।

সকল শর্মা দেখিল, ভদ্রলোকটি নিরুপায় হইয়া পুত্রের নিকটে ক্ষমা চাহিল আর তখনি ক্লাবের সেক্রেটারীর হাতে নগদ এক শ'টাকা গণিয়া দিল।

সকল শর্মা মনে মনে 'নোট' করিয়া প্রস্থান করিল। এইভাবে মাসাবধি কাল রাজধানীর পথে পথে ঘুরিয়া সকল শর্মা পাগলা গারদ তৈয়ারী করিতে লাগিয়া গেল এবং আরও এক মাস পরে রাজ-প্রাসাদে গিয়া রাজাকে সংবাদ দিল—রাজন্ পাগলা গারদ তৈয়ারী হইয়াছে।

রাজা বলিলেন—চলো, দেখিয়া আসি।

এই বলিয়া তিনি সকল শর্মার সহিত উন্মাদাগার দেখিতে বাহির হইলেন।

রাজা শুধাইলেন, কোথায় গারদ?—

সকল শর্মা বলিল—চলুন দেখাইতেছি।

রাজা সহরের মধ্যে কোথাও গারদ দেখিতে পাইলেন না, তখন সকল শর্মা তাঁহাকে রাজধানীর প্রান্তে লইয়া গিয়া দেখাইল যে, সে সমস্ত রাজধানীটা প্রাচীর দিয়া ঘিরিয়া দিয়াছে। রাজা বলিলেন—এ কি করিয়াছ?

সকল শর্মা বলিল—এই তো পাগলা গারদের বেষ্টনী।

রাজা বলিলেন—কিন্তু গারদ কোথায়?

সকল শর্মা বলিল— রাজন্ রাজধানীটাই গারদ। ইহার চেয়ে ছোট গারদ হইলে কুলাইত না।

রাজা শুধাইলেন তার মানে?

সকল শর্মা বলিল —মানে তো স্পষ্ট। রাজধানীর সকলেই পাগল।

রাজা আবার শুধাইলে— সে কি রকম?

সকল শর্মা তাহার মাসাধিককাল নগর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়া বলিল—ইহারা যদি পাগলা না হয় তবে পাগল আর কাহাকে বলে?

রাজা বলিলেন —তবে আমিও কি পাগল?

সকল শর্মা বলিল- -সত্য বলিতে কি রাজন্.. আপনিও পাগল।

কেন?

- কোন প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি কি এতগুলি পাগলের উপরে রাজত্ব করিতে পারে?

রাজা ক্ষিপ্ত হইয়া বলিলেন- তোমার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দান করিব।

সকল শর্মা বলিল--তাহা হইলে আপনার পাগলামি সম্বন্ধে যেটুকু সন্দেহ ছিল তাহাও দূরীভূত হইবে। পাগলের রাজ্যে প্রকৃতিস্থ ব্যক্তির এইরূপ পরিণাম ছাড়া কি হইতে পারে?

তাহার কথা শুনিয়া রাজা ও অমাত্যগণ তাহাকে তাড়া করিল। সে ছুটিতে ছুটিতে বেগতিক দেখিয়া পথের একটি manhole খুলিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিল এবং এক ডুব সাঁতারে নদীতে পড়িয়া সহরের বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

তাহার দুর্দশা দেখিয়া রাজা ও অমাত্যগণ হাসিয়া উঠিল, বলিল—যাক পাগলাটা পালাইয়াছে, ভালই হইয়াছে।

রাজা প্রাচীরটা ভাঙ্গিয়া দিবার আদেশ দিলেন।

আমাদের অনন্ত

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

অনন্ত লায়েককে নিয়ে গল্প লেখা যায় তা আমি নিজেই জানতাম না। নায়ক তার উপাধি। গ্রামেব লোক বলে লায়েক।

অনেক কালের পুরনো দিনেব গ্রাম। অনন্ত লায়েক ছিল সেই গ্রামের লোক।

অনন্তকে কেউ গ্রাহ্যই করতো না। বলতো, ওটা আবাব মানুষ।

আমাব কিন্তু তা মনে হতো না। আমি প্রায়ই যেতাম তাব কাছে। ভাবি মজাব মজার কথা বলতো। শুনতাম আর হাসতাম।

গ্রামেব এক টেরে ছোট্ট একখানি মাটির বাড়ি।

গরীব বেচাবা—একাই থাকে। নিজেই রান্না করে খায়। সংসারের যাবতীয় কাজ তাকে একাই করতে হয। স্ত্রী-পুত্র আত্মীয় স্বজন কেউ কোথাও নেই। বছব পঞ্চাশেক বয়স। হাঁপানীর রুগী। সাদা ধপধপ করছে গায়ের রং।

হাতে একটি মোটা লাঠি নিয়ে বাড়ির উঠোনে বসে থাকে আব হাঁপাতে হাঁপাতে অনর্গল বক্ বক্ করে।

একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, লায়েক, তুমি বিয়ে করনি?

লায়েক বলেছিল, করেছিলাম বই-কি! আমাব তখন পনেবো বছর বয়েস। বাবো বছরেব বৌ—মনে হতো যেন বাইশ বছরের বুড়ি। পাঁচ বছর ছিল আমার কাছে। সেই পাঁচ বছবেই আমাকে ত্রিভুবন দেখিয়ে দিয়েছিল।

বলেই খানিকটা দম ছেড়ে দিয়ে বললে, ফু। .

আবার দম টেনে কিছুটা সামলে নিয়ে বলতে আরম্ভ করলে, ভীমরুল দেখেছিস? মৌমাছি নয়, বোলতা নয়—একেবারে ইয়া মোটা ভীমরুল। যেমন গাবদা ভুতুম চেহারা, তেমনি ছুঁচের মতন হুল। আমার বৌটা ছিল সেই ভীমরুল-জাতীয় মেয়ে। আমি কিছু বলেছি কি, অমনি দিত হুল ফুটিয়ে। আব আমিও তেমনি—এই দেখেছিস লাঠি।

হাতের লাঠিটা মাটিতে একবাব ঠুকে লায়েক বললে, আমিও দিতাম ভাল্লুক নাচ নাচিয়ে।

এই বলে সে তার বৌ কেমন করে তাকে গালাগালি দিতে দিতে 'ওবে বাপ্ রে—ওরে মারে' বলে তিড়িং-বিড়িং করে লাফাতো, অঙ্গভঙ্গী কবে দেখাতে লাগলো।

সে বিচিত্র ভঙ্গী দেখে আমি তো হেসেই অস্থির!

বললাম, তাহলে তুমি খুব আনন্দেই ছিলে বল।

—হ্যাঁ, তা ছিলাম। পাঁচটি বছর। তার পরেই সে পালালো।

—পালিয়ে গেল? কোথায়?

হাতের লাঠিটা ওপরের দিকে তুলে বললে,—সগ্গে। - -না, না। সগ্গে তাব জায়গা হবে না। তাব কথার চোটে দেবতারা পাগল হয়ে যাবে। সে গেছে ঠিক নবকে। আমাদেব গাঁয়েব

কেউ যদি যায় তো তার সঙ্গে দেখা হবে। তাকে বলে দোবো—কথাটা অসমাপ্ত রেখেই লায়েক আমাকে জিজ্ঞাসা করে বসলো—আমাদের গাঁয়ের কে নরকে যাবে বলতে পারিস?

বড় কঠিন প্রশ্ন। এর জবাব আমি দেবো কেমন করে?

চুপ করে রইলাম।

লায়েক ভাবলে আমি কিছু ভাবছি।

আমরা বসেছিলাম লায়েকের বাড়ির উঠোনে। সুমুখে ভাঙ্গা মাটির প্রাচীর। তার ওপারে একটা পুকুর। এই পুকুরে এককালে প্রচুর কলমী শাক হতো। তাই এই পুকুরটার নাম কলমী-সাড়া। সেই কলমী-সাড়ার ঘাটে বসে কামিনী বাসন মাজছিল। অনন্ত লায়েকের প্রতিবেশিনী সে। যেমন রোগা, তেমনি মুখরা।

লায়েক আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে,— অত ভাবছিস কি? ভাবতে হবে না। এই দ্যাখ—আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।

বলেই হাতের লাঠিটা উঁচিয়ে কামিনীকে দেখিয়ে দিয়ে বললে,—এই কামিনী-মাগী যাবে নরকে।

ভাঙ্গা দেয়ালের ফাঁকে সবই দেখা যায়। কামিনী দেখতে পেলে।

দেখতে পেলে অনন্ত তারই দিকে তাকিয়ে লাঠি দেখিয়ে কি যেন বলছে।

কামিনী চুপ করে থাকবার মেয়ে নয়। তক্ষুণি বলে উঠলো, এই হেঁপো। কী বলছিস আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে?

অনন্ত বললে, বলছি—এই কামিনী মরবার পর ওকে নিয়ে যাবার জন্যে সগ্গ থেকে রথ আসবে।

কথাটা বিশ্বাস করলে না কামিনী। বললে, তোর মুখ থেকে তো ভাল কথা বেরোয় না অনন্ত, তুই এই কথা বললি?

—বিশ্বাস হচ্ছে না?

—না।

অনন্ত বললে, —বেশ তবে বলিনি। বলেছি মরলে তুই নরকে যাবি। হলো?

কামিনী ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো। —আ মর মুখপোড়া, তুই নরকে যা, তোর চোদ্দপুরুষ যাক্।

— চোদ্দপুরুষ পাব কোথায় কামিনী? আমার সেই দজ্জাল বৌটাকে পাঠিয়েছি। তোর জন্যে সেখানে একটা জায়গা রাখতে বলে দিয়েছি।

আর যায় কোথায়! কামিনীর হাতের বাসন হাতেই রইলো। ঘাটের জলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে এমন সব কথা বলতে লাগলো যা শুনলে কানে আঙ্গুল দিতে হয়।

অনন্তও কথা বলতে জানে। সেও কিছু বাকি রাখলে না। তবে হাঁপের টানের জন্যে খুব বেশি চেঁচাতে পারলে না। শুধু বললে, বল্ তোর যা খুশি তাই বল্, আমি তোর এমন একটা কেলেঙ্কারীর কথা জানি যা শুনলে তোর ওই ধিঙ্গি আইবুড়ো মেয়েটাকে নিয়ে গাঁ ছেড়ে পালাতে হবে।

সেটা কী-এমন কথা— শোনবার জন্য কামিনী উদগ্রীব হয়ে উঠলো। বললে, —বল্ তুই ড্যাকরা পোড়ারমুখো, তোকে এক্ষুণি বলতে হবে। কামিনী-বামনি কাউকে ডরায় না।

অনন্ত বললে, —আমার যখন খুশি তখন বলবো। এখন আমার হাঁপের টান উঠেছে—এখন বলতে পারবো না।

কামিনী বললে,—বলবি কেমন করে রে মুখপোড়া, বলবার কিছু নেই যে।

—আছে কি নেই পরে বুঝবি। তখন তোকে আমার পায়ে ধরতে হবে।

কোনো রকমে টেনে টেনে এই পর্যন্ত বলে অনন্ত আর-কিছু বলতে পারলে না।

কিন্তু কামিনী থামলো না। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে সে বলে যেতে লাগলো, মর মর, মরে যা না তুই। অমনি হাঁপাতে হাঁপাতে দম বন্ধ হয়ে মরে যা। আমাদের হাড় জুড়োক, গাঁয়ের লোক নিশ্চিন্তি হোক।

অনন্ত কথা বলতে পারছে না। তখনও সে হাঁপাচ্ছে আর আমার দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে বলছে, শুনলি? শুনলি?

অনেকক্ষণ পরে একটু সামলে নিয়ে বললে, এই মাগীর সব্বনাশ আমি করবো, করবো—কববো—তুই দেখে নিস।

কামিনীর সর্বনাশ সে করেছিল। আমরা তা দেখেও নিয়েছিলাম।

কেমন করে করেছিল সেকথা পরে বলছি।

কলমী-সাড়াতে সেদিন মাছ ধরানো হচ্ছিল।

জেলে জাল ফেলেছে পুকুরে। জাল ভর্তি ছোট ছোট মাছ উঠছে। রুপোর পাতের মত চিক চিক করছে মাছগুলো। জেলে সেগুলো একটি একটি করে দেখছে আর জলের ওপর ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে। বলছে, এত ছোট মাছ এখন ধরব না। আর একটু বড় হোক।

পুকুরের পাঁচজন অংশীদার পুকুরের পাড়ের ওপর বসে আছে।

শম্ভু ছিল ঘাটের কাছে বটগাছটার শেকড়ের ওপর বসে। সে বলে উঠলো, মাছ তোর বড় হবে কখন বাবা? বেলা যে দুপুর গড়িয়ে গেল। খাব কখন?

পাশেই অনন্তর বাড়ি। তার ভাঙ্গা প্রাচীর টপকে ঝুপ করে অনন্ত এপারে এসে নামলো। হাঁপানীটা তার বেড়েছে বোধহয়। বাঁশের লাঠিটা হাত থেকে নামিয়ে সে বসে বসে হাঁপাতে লাগলো। বুকের পাঁজরাগুলো দপ দপ করে ওঠা নামা করছে। দেখলে মনে হয়—এক্ষুণি বুঝি দম বন্ধ হয়ে যাবে।

খানিক পরে ফু ফু করে নাকে মুখে নিশ্বাস ফেলে একটুখানি সুস্থ হলো। তারপর তার ডাগর ডাগর চোখ দুটি তুলে অংশীদারদের শুনিয়ে শুনিয়ে বললে, তোমাদের এই কলমী সাড়া আগলাবার ভার আমার। ধরতে গেলে আমি জিম্মাদার। এই পুকুর থেকে কই একটি চুনোপুঁটি যাক দেখি চুরি। সব ব্যাটা জানে যে এই অনন্ত শম্মা বসে বসে ধুঁকছে সারা রাত। যাব আর অমনি তে রে বে রে। তার চেয়ে কাজ নেই বাবা—

রতন বললে, —তুমি সারারাত জেগে থাকো?

নায়েক বললে, —হ্যাঁ ভাই, এই শালা পাজি ব্যারাম আমাকে ঘুমোতে দেয় না কি? মাঝে মাঝে এক চটকা করে ঘুমিয়ে নিই, তারপর সেই কুঁকড়ো-ডাকা রাত পর্যন্ত হাপর টানি। —ফু!

আবার দম উঠতে লাগলো।

একটুখানি সুস্থ হয়ে বললে, তোমরা পাঁচ ভাগীতে একটি করে মাছ যদি দাও তো আমার হলো গিয়ে পাঁচটি। আজ-কাল দুদিন চলে যাবে। আজ বেলা হয়ে গেছে। অন্ন আমার পিস্তুত। আজ শুধু হাতা-চড়চড়ি। কালকে বসে বসে কালিয়া রাঁধবো।

বলতে বলতে সে উঠে দাঁড়ালো। —নাঃ রোদে বসি—শালা বাতাসের চোটে একেবারে হাওয়া-গাড়ি ছুটিয়ে দিলে।

গাছের তলা থেকে সরে অনন্ত একটু দূরে গিয়ে বসলো।

পাশেই ছিল নিশু ভট্‌চাজ। অনন্তর হাঁপানীর কষ্ট দেখে বললে, তুমি ময়নাবুনির ওষুধ খেলে না কেন অনন্ত? ধম্মরাজের মাদুলি?

ওষুধ-মাদুলির নাম শুনে দপ করে যেন জ্বলে উঠলো অনন্ত।

বললে, ধেৎ তেরি ওষুধ কাঁহাকা। ওষুধের নাম করিস না আমার কাছে।

তারপর তার হাতের ঠ্যাঙ্গাটা বারকতক মাটিতে ঠুকে ঠুকে বলতে লাগলো ঠাকুর-দেবতার ইয়ে করি আমি—জানিস? সব ব্যাটা-বেটিকে চেনা আছে আমার। পঁচিশ গণ্ডা মাদুলি নিয়েছিলাম, আর না হবে তো হাজারো রকমের ওষুধ। কিন্তু বেয়ারামের কই এতটুকু টল-বেটল হলো? সেই যে-কে সেই। শেষকালে রেগেমেগে দিলাম ছিঁড়ে একদিন মাদুলিগুলো সব। পটাপট ছিঁড়েছি আর ফেলেছি এই কলমী-সাড়ার জলে। বাস, এই বার একদিন শিঙ্গে ফুঁকে দিলেই খালাস। শিঙ্গের আওয়াজ পেলে আসিস যেন তোরা। —ফু!

এক সঙ্গে অনেকগুলো কথা বলে অনন্ত আবার দম টানতে লাগলো।

সামনে দিয়ে একটা কালো কুকুব পেরিয়ে যাচ্ছিল, অনন্ত তার পিঠের ওপর দিলে এক লাঠি বসিয়ে। কুকুরটা কাঁই কাঁই করে ছুটে পালালো।

—আর একটু হলেই বাছাধন চণ্ডীচরণ। সে বছর তখন সেই মোটা লাঠিটা থাকতো আমাব হাতে। রাখুর ছেলেটা ভেংচি কেটে দেখাচ্ছিল আমি কেমন করে হাঁপাই— সেই ছেলেটাকে ঠ্যাঙ্গাতে গিয়ে এমন এক বাড়ি মেবে ফেললাম ওদের মেজবৌ-এর হাতে যে একেবারে চেড়েক-ডেডেং! আঙ্গুলের গিটগুলো দড়িব মতন ফুলে উঠলো। ব্যস, সেই থেকে এই ছোট লাঠি। —ফু

অনন্ত তার হাতের লাঠিটা তুলে একবার দেখালে।

কিন্তু তাব নজর ছিল জেলের দিকে। জালটা তখন সে পুকুরেব পাড়ে তুলে ঝাড়তে আরম্ভ করেছে।

অনন্ত উঠলো। কোমরে-কাঁকালে হাত দিয়ে চলতে চলতে দুবার বসে তাড়াতাড়ি তার কাছে গিয়ে বিড়ালের মত ছোঁ মেবে দাঁড়ালো।

—ফেলিস নে ফেলিস নে বাবা, ওটা তোর রুই-কাৎলার বাচ্চা নয় তারু, ওটা সবল পুঁটি।

টপ করে অনন্ত তার জাল থেকে মাছটাকে একরকম জোব কবেই টেনে ছাড়িয়ে নিলে।

জেলে তো বেগে আগুন।

—জান্ দিযে দিতে পাবি ঠাকুর, মাছ দিতে পাবি না।

মাছটি সে অনন্তব কাছ থেকে কেড়ে নেবার জন্য হাত বাড়িয়েছিল।

অনন্ত মরি-বাঁচি কবে তাড়াতাড়ি ত'র বাড়িব দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললে,—বেশ বাপু বেশ, দিসনে তুই। ভারি তো একটা আঙুলের মতন পুঁটি মাছ!

অংশীদারদের ভেতর শিবু বসেছিল জেলের কাছাকাছি। সে বলে উঠলো, পারলি না কেড়ে নিতে? দিতে হতো তোর হাতেব ওই জালটা দিয়ে এক সাপ্‌টি মেরে। বাছাধনের মাছ কেড়ে নেওয়া বেবিয়ে যেতো। জীবনে আর কখনও কোনও জেলের পাশ মাড়াতো না হেঁপো।

কথাটা অনন্ত শুনতে পেলে।

শুধু কানে গিয়ে বাজলো না কথাটা। তার বুকে গিযেও বাজলো।

মবণাপন্ন রুগীর বড় বাজে।

অনন্ত ফিরে এলো। শিবুর কাছে গিয়ে সে তার কোঁচড় থেকে মাছটি বের করে তাব পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে বললে, নে তোর মাছ!

বলেই সে হাঁপানীর টানে সেইখানে বসে পড়লো।

পাশেই বসেছিল নিশু ভট্‌চাজ। ব্যাপারটা ভাল হয়নি দেখে সে নিজেই একটু লজ্জিত হয়ে পড়লো। আধ-মরা মাছের বাচ্চাটি সে মাটি থেকে তুলে নিয়ে অনন্তর হাতে গুঁজে দিয়ে বললে, না না অনন্ত রাগ করিসনি। ছিঃ। আমার ভাগ থেকে আমি তোকে একটা মাছ দেবো। যা বাড়ি যা।

অনন্ত গেল না। হাঁপের টানটা তখন সে সামলে নিয়েছে। নিজে সামলেছে না নিশুর এই সহানুভূতি তার বুকের সেই রোগ-যন্ত্রণাকে অতিক্রম করে হৃদয়কে স্পর্শ করেছে তাই-বা কে জানে।

মাছটি নেবার ইচ্ছা তার ছিল না, কিন্তু নিশুর কথাটা সে অগ্রাহ্য করতে পারলে না। ছোট্ট মাছটি আবার সে তার আঁচলে গুঁজে নিয়ে শিবুকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললে, আমি না হয় গরীব হাঁপানীর রুগী, ছোট্ট একটি পুঁটি মাছ নিয়েছি, তাও সে মাছ তোর একার নয়—পাঁচজন অংশীদারের। আর তুই কিনা বসে বসে হুকুম দিলি—ওকে মারলি না কেন? আমি ওই তারু-জেলের মার খাব?

খুব জোরে জোরে কথাগুলো বলতে গিয়ে অনন্তর বুকের পাঁজরগুলো হাপরের মত আবার ওঠা-নামা করতে লাগলো। বড় বড় চোখদুটো আরও বড় হয়ে উঠলো, আর সেই চোখের কোণে দেখা গেল—দু' ফোটা জল টল্ টল্ করছে।

মুখের চেহারা দেখে মনে হলো দম নিতে তার খুব কষ্ট হচ্ছে। হঠাৎ এতখানি উত্তেজিত হওয়া তার উচিত হয়নি।

তবু সে কথা না বলে থাকতে পারলো না। বলল, এই কলমী-সাড়ার সব মাছ আমি যদি চুরি করে খাই তো তোরা কেউ টেরও পাবি না। আমার ওই ঘরের ভেতর থেকে সারারাত আমি জলের দিকে তাকিয়ে থাকি আর হাঁপাই। কলমী-সাড়াকে আমি ভালবেসে ফেলেছি। কত লোক চুরি করে ছিপ্ ফেলে মাছ ধরতে এসেছিল। কাউকে আমি একটা চুনো পুঁটিও ধরতে দিই নি। গালাগালি দিয়ে মন্দ কথা বলে তাদের সবাইকে আমি তাড়িয়েছি। আমার ভয়ে এখন আর কেউ আসে না। আমি মন্দ কথা বলতে পারি। মুখ আমার খুব খারাপ কিন্তু মন্দ কাজ আমি করতে পারি না। চুরি আমি কখনও করবো না, কাউকে করতেও দেবো না। ভাল কাজ আমি করতে জানি!

শিবুর লজ্জা হলো কিনা জানি না। একটি কথাও সে বললে না। মাথা হেঁট করে চুপ করে বসে রইলো।

নিশু তার কাছে গিয়ে বুকে হাত বুলিয়ে তাকে থামিয়ে দিলে। একটা জায়গায় বসিয়ে দিয়ে বললে, বোস্ এইখানে। একটু জিরিয়ে নে।

অনন্ত বসলো।

জেলে তখন মাছ ভাগ করছিল। পাঁচ ভাগ পাঁচজন অংশীদারের, আর এক ভাগ তার নিজের। নিশু ভট্‌চাজকে সেইখানে গিয়ে দাঁড়াতে হলো।

অনন্ত সেইখান থেকে দেখতে পেলে হরিমাস্টার পুকুরের পাড় দিয়ে কামিনীর বাড়ি যেতে যেতে মাছ ভাগ করার জায়গায় থম্‌কে দাঁড়ালো।

গ্রামে একটি মাইনর স্কুল আছে, হরিমাস্টার সেখানকার একজন টিচার। ভিন্ন গ্রামে বাড়ি। স্কুলের একটা ঘরে থাকে আর কামিনীর বাড়িতে দু-বেলা খায়। তখন ছিল সস্তাগণ্ডার বাজার। কামিনীকে মাসে পনেরোটি করে টাকা দেয়।

এখন দুপুরবেলা। রবিবার। ছুটির দিন। স্নান করে কামিনীর বাড়িতে খেতে যাচ্ছিল। অনন্ত ডাকলে, হরিমাস্টার শোনো!

হরিমাস্টার তার কাছে এসে দাঁড়াতেই অনন্ত বললে, এসো তুমি আমার সঙ্গে। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

অনন্ত উঠে দাঁড়াতেই তার কাছে ছুটে এলো নিশু ভট্চাজ্।

বড় একটি মাছ তার হাতে দিয়ে নিশু বললে, এইটে নিয়ে যা তুই।

অনন্ত অবাক হয়ে তাব মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। কি যে বলবে বুঝতে পাবলে না।

—অমন করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন, বাড়ি যা।

অনন্তর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এলো। বললে, তোব নিজেব ভাগের এই বড় মাছটা কেন দিলি নিশু?

নিশু বললে, আমার খুশি। বলেই সে চলে গেল। সেখানে দাঁড়ালো না।

অনন্তও হরিমাস্টাবকে সঙ্গে নিয়ে তার বাড়িতে এলো।

অনন্তর বাড়ি থেকে কামিনীর বাড়িব ভেতর পর্যন্ত সবকিছু দেখা যায়। কামিনীর আঠারো উনিশ বছরের যুবতী মেয়েব নাম নিরুপমা। ডাক-নাম নরি।

নরি রান্নাবান্না করে। হরিমাস্টাব দুবেলা খায তাদেব বাড়িতে। নবি তাকে খেতে দেয়। অনন্ত বসে বসে সব দেখে।

নরি আর হরি। দুজনের খুব ভাব। কথা যেন তাদের আর ফুরোতে চায় না। দুজনে অনর্গল কথা বলে আর হাসাহাসি করে।

সেদিন রাত্রি তখন অনেক। চারিদিক নিস্তব্ধ। কলমী-সাড়ায় একটানা ব্যাঙের ডাব ছাড়া আর কোথাও কোনও শব্দ নেই। দিনের মত জ্যোৎস্নার আলো।

অনন্তব ঘুম নেই। বসে বসে হাঁপাচ্ছে, আর বাইবের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

কামিনীর সদর দবজাব কাছে হট্ করে একটা আওয়াজ হলো। অনন্ত দেখলে—নরি দরজা খুললে। এদিক থেকে হরিমাস্টার এসে দাঁড়িয়েছে। দুজনে ঘরে ঢুকলো।

সর্বনাশ। অনন্ত দেখলে, এরা অনেকদূর এগিয়েছে।

এমনি একদিন নয়, দিনের পব দিন।

অনন্ত ভাবলে, কথাটা একদিন হবিমাস্টারকে জিজ্ঞাসা কববে।

কামিনীও অনন্তর দু'চক্ষেব বিষ।

অনন্ত প্রায়ই ভাবে কামিনীর এই মেয়ের কেলেঙ্কাবীর কথাটা দেবে গাঁযের ভেতর প্রচার কবে। তাহলেই কামিনী জব্দ হবে।

মাসখানেক পরে হরিমাস্টার একদিন নিজেই এলো অনন্তর কাছে।

অনন্ত বললে, কি খবব—হরিমাস্টার?

হরিমাস্টার কিন্তু কোনও জবাব দেয় না। চুপ করে দাঁড়িয়েই থাকে।

নরির সঙ্গে নট-ঘটির কথাটা জিজ্ঞাসা করবার এই উপযুক্ত সুযোগ।

কিন্তু কিছুই তাকে জিজ্ঞাসা করতে হলো না। হরিমাস্টার নিজেই ধরা দিলে।

অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বিষণ্নমুখে হরিমাস্টার বললে, আচ্ছা লায়েক, তুমি তো তোমার এই ব্যারামটার জন্যে অনেক ডাক্তার-কোবরেজের কাছে যাওয়া-আসা করেছ, অনেকের সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে, কোনও ভাল ডাক্তাবের খবর দিতে পারো— যে সব রকম রোগের ওষুধ জানে?

—সব রকম রোগ কি রকম? তাব নাম বলবে তো?

—নাম কিছু নেই। এই ধরো—

শেষে আমতা-আমতা করে বললে কোনও মেয়ে যদি ভাবে তার পেটের ছেলেটাকে নষ্ট করে দেবে—এই রকম আর কি। তারই ওষুধ দিতে পারে সেই রকম ডাক্তার।

অনন্ত মনে মনে হাসলো। হেসে বললে, বুঝেছি।

—না না কিছু বোঝোনি। কী বুঝেছো তুমি?

অনন্ত বললে, সবই বুঝেছি। আমি নিজের চোখে দেখেছি— তোমার আর নরির কাণ্ড-কারখানা।

হরিমাস্টারের মুখের চেহারা অন্যরকম হয়ে গেল।

চট্ করে সে হেঁট হয়ে অনন্তর পাদুটো জড়িয়ে ধরে বললে, আমি তোমার পায়ে ধরছি লায়েক, কথাটা তুমি কাউকে বোলো না।

—বলবো না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি করবে তুমি?

হরিমাস্টার বললে, তবে আর তোমার কাছে ডাক্তারের কথা বললাম কেন?

অনন্ত কি যেন ভেবে বললে, তিনদিন পরে তুমি আসবে আমাব কাছে। কি করতে হবে আমি বলবো।

কিন্তু এই তিনদিনের ভেতরেই—মানে তার পরের দিনই কলমী-সাড়াব ঘাটে কামিনীর সঙ্গে অনন্তর ঝগড়া হয়ে গেছে।

সেইজন্যই অনন্ত বলেছিল, আমি তোর এমন একটা কেলেঙ্কারীর কথা জানি যা শুনলে তোর ওই ধিঙ্গি আইবুড়ো মেয়েটাকে নিয়ে গাঁ ছেড়ে পালাতে হবে।

এর জন্যে কামিনীও তাকে বলতে কিছু বাকি রাখেনি। গালাগালি দিয়ে বলেছিল—তুই আমার কিচ্ছু করতে পারবি না মুখপোড়া।

অনন্ত সেদিন তিন সত্যি করে বলেছিল— তোর সব্বনাশ আমি করবো—করবো—করবো।

আজ তার সুযোগ পেয়ে গেল অনন্ত।

তিনদিন পরে হরিমাস্টার তার কাছে আসতেই অনন্ত বললে, তুমি কিছু ভেবেছো মাস্টার?

মাস্টার বললে, ভাববে তো তুমি লাযেক।

অনন্ত বললে, আমি যা বলবো তা তুমি শুনবে?

—হ্যাঁ, শুনবো।

—নরিব মা কিছু জানে?

—না।

অনন্ত জিজ্ঞাসা কবলে, তোমার বাড়িতে কে আছে?

—আমার বুড়ি মা ছাড়া আর কেউ নেই।

— তোমার বাড়ির অবস্থা কেমন?

মাস্টার বললে,—খুব খারাপ নয়। জমিজমা যা আছে তাই দিয়ে চলে যায়।

অনন্ত বললে, —এখানকার এই চাকরিটা যদি ছেড়ে দাও তাহলে কেমন হয়?

—তাহলে শোনো লায়েক।

এই বলে হরিমাস্টার বসলো তার পাশে। বললে, নরির যখন ওইরকম হয়ে গেল তখন আমি একবার ভেবেছিলাম—

বলেই চুপ করে রইলো মাস্টার। মনে হলো কথাটা সে বলতে পারছে না।

অনন্ত বললে,—চুপ করে রইলে কেন? কি ভেবেছিলে বল।

হরিমাস্টার বললে, —ভেবেছিলাম চাকরি ছেড়ে দিয়ে বাড়ি চলে যাই। তারপর ভাবছিলাম—নরিব কি হবে? তাই যেতে পারিনি। ভেবে ভেবে কিছু করতে না পেরে তোমার কাছে এসেছি।

কামিনীব ওপর বাগ তখনও পড়েনি অনন্তর।

অনন্ত বললে,—এ ছাড়া তোমাব আর কোনও পথ নেই মাস্টার। তুমি চাকরি ছেড়ে দিয়ে বাড়ি চলে যাও। নইলে এ কথা জানা-জানি হয়ে গেলে গ্রামের লোক তোমাকে মেরে ফেলবে।

কথাটা শুনে হরিমাস্টাবের মুখখানি শুকিয়ে গেল। শুধু বললে, আপনি যেতে বলছেন আমাকে?

—হ্যাঁ, বলছি।

—নবিব কি হবে?

অনন্ত বললে, — সে আমবা দেখে নেবো। তুমি তো বাঁচবে।

মাস্টাব বললে, — তবে তাই হোক, মাইনেটা পেলেই আমি চলে যাব।

সেই কথাই ঠিক ছিল।

মাইনে পেলেই হরিমাস্টার গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে।

কামিনী বিপদে পডবে।

অনন্ত তাইতেই খুশি।

কামিনীকে তখন সব কথা খুলে বলতেও হবে না। মাস্টার চলে গেলে তার মেযে নরিই কেঁদে কেঁদে মাকে বলবে।

এমন সময় কলমী-সাড়ায় সামান্য একটি মাছ আনতে গিয়ে কী ঘটনা যে ঘটে গেল—যার জন্য অনন্ত একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেল।

হরিমাস্টাবকে পুকুরেব পাড় থেকে বাড়িতে ডেকে এনে অনন্ত বললে, মাস্টাব, তোমাব বাড়ি যাওয়া হবে না। হবিমাস্টার বললে, বাড়ি যেতে তো আমি চাই নি-—লায়েক, নরির জন্যে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।

অনন্ত জিজ্ঞাসা কবলে, নবিকে তুমি ভালবাসো না ফুর্তি কবেছ?

হবিমাস্টার বললে, না লাযেক, আমি তোমাব পা ছুঁযে বলছি—নবিকে আমি সত্যি ভালোবাসি। বাড়ি যেতে আমি চাই না।

অনন্ত হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, –ব্যস্ তাহলে নরিকে তুমি বিয়ে কর।

— সেকথা আমি ভেবেছিলাম লায়েক, কিন্তু নরিব মাযেব ভযে আমি কিছু বলতে পারি নি।

একটু সামলে নিযে অনন্ত বললে, সে ভাব আমার।

—কিন্তু তোমার সঙ্গে নবিব মায়েব তো সদ্ভাব নেই লায়েক। সেদিন কলমী-সাডাব ঘাটে তোমার সঙ্গে তার কি হয়েছে জানি না, তবে সারাদিন ধবে তোমাকে সে গালা গালি দিয়েছে আমি শুনেছি। এরপব তুমি তাকে এ-কথা বলবে কেমন করে?

— ধেৎ তেরি, তুমি মাস্টাব না ঘোড়ার ডিম।

হাঁপাতে হাঁপাতে এই কথা বলে অনন্ত।

—তুমি নরিকে আমার কাছে ডেকে নিযে এসো, মাস্টার।

নরি এল। এসেই কাঁদতে লাগলো। নরির কান্না আর থামে না।

লায়েক বললে, আমার কাছে কেঁদে কি হবে? যা তোর মায়ের কাছে গিয়ে কাঁদগে, যা।

নরি কিন্তু এক পাও নড়লো না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলো।

অনন্ত শেষে নিজেই গেল কামিনীর কাছে—হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল হরিমাস্টারকে আর নরিকে।

—শোন্ এইবার—আমি তোর সব্বনাশ করে দিতে পারি কিনা।

সবকিছু শুনে কামিনী তো অবাক।

অনন্তর সাজানো ব্যাপার নয় তো! —কামিনী ভাবলে। কিন্তু নরির কথা শুনে বিশ্বাস হলো।

তারপর আবার ঝগড়া!

অনন্ত বলে, বিয়ে আমার বাড়িতে হবে।

কামিনী বলে, তোর বাড়িতে হবে কেন রে মুখপোড়া? আমার বাড়ি নেই?

শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো বিয়ে কামিনীর বাড়িতেই হবে। কিন্তু বৌভাত হবে অনন্তের বাডিতে। যেহেতু হরিমাস্টারের কেউ কোথাও নেই।

তার যে মা আছেন কামিনীর কাছে গোপন করে গেল। অনন্ত বললে, আমারও কেউ কোথাও নেই। আমাব জমি-জমা যা কিছু আছে সবই দিয়ে যাবো হরিকে আর নরিকে। তুই দ্যাখ্ মুখপুড়ি আমি ভাল কাজ করতে জানি।

কামিনী বললে, তোকে ভালো কাজ করতে আমি দেবো কেন রে মুখপোড়া? আমার জমিজমা নেই? তুই নরির চৌদ্দপুরুষের কে রে?

শেষপর্যন্ত ফয়সালা হয়ে গেল। বিয়ে অনন্তেব বাড়িতেই হবে। কামিনী শুধু দেখবে দাঁড়িযে দাঁড়িয়ে।

—আমি শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবো?

—তুই কন্যা সম্প্রদান করবি। আর আমি হবো বরকর্তা।

কামিনীকে শেষ পর্যন্ত সব কথাতেই রাজি হতে হলো।

গ্রামেব লোক নেমন্তন্ন খেতে এসে কামিনী ও লায়েকের ভাব দেখে তো অবাক।

মনে হচ্ছে যেন অনন্তর হাঁপের ব্যারাম কখনও ছিলো না।

কামিনী কথা বলতে জানে না।

খাজাঞ্চিমশায় ও ভাইঝি

মনোজ বসু

ছোট শহর, দুটি মাত্র পাকা রাস্তা , রাস্তায় কেরোসিনের আলো সর্বসাকুল্যে গোটা কুড়ির বেশি নয়। কিন্তু মিউনিসিপ্যাল ইলেকশনের উদ্যোগ আয়োজন দেখে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

মিস্ত্রি-মজুর তো অনেকেই। তারা অত শত বোঝে না, জিজ্ঞাসা করে, —হ্যাঁ মশায়, চাকরিটায় মাইনে কত?

বিমানবিহারী জবাব দেয়,—এক পয়সাও নয়, ভাই। এ শুধু ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়ানো।

তারা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে, কথাটা বিশ্বাস হতে চায় না। বিমান জমিদারের ছেলে, কলিকাতায় থেকে লেখাপড়া করত। এই কিছুদিন হ'ল বাড়ি এসে জমিদারি দেখতে আরম্ভ করেছে। জমিদারির কতদূর কি বোঝে, সে বলতে পারবেন বুড়া খাজাঞ্চি গোপাল ঘোষ , আরও অনেকে হয়তো পারবে, কিন্তু সে যাই হোক, তার মোটরের হর্ন শুনলে কাছারির আমলা গোমস্তা মায় ম্যানেজারকে অবধি তটস্থ হতে হয়। বুড়া কর্তা শ্রীনাথ রায় অবধি ছেলের সামনে কথা বলতে ভরসা পান না। যে দুটো পাকা রাস্তা আছে তার উপর দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা ধুলোর ঝড় উড়িয়ে বিমান মোটর হাঁকিয়ে বেড়াত। সেই লোক ইদানীং খদ্দর প'রে গান্ধি টুপি মাথায় দিয়ে পায়ে হেঁটে জনে জনের কাছে ধরনা দিয়ে বেড়াচ্ছে, বিনা লাভে মহিষ তাড়াবার এমন উৎসাহ কলিকালের দিনে আর কোথাও তো দেখা যায় না। চোখ টিপে একজন মন্তব্য করল,— আছে, আছে গো, মাইনে না থাক, দু চার পয়সা এদিক ওদিক আছে বই কি।

আস্তে বললেও কথাটা বিমানের কানে গিয়েছে। ঘাড় নেড়ে তৎক্ষণাৎ সে স্বীকার ক'রে নিল। —আছেই তো, ঠিক বলেছ ভাই। সেই লোভেই সামলা-ছেঁড়া ছোকরা উকিলের দল উঠে প'ড়ে লেগেছে। আর যেখানে এক টাকা দিলে হয়, তোমরা সেখানে চার টাকা ট্যাক্স দিয়ে মরছ।

ছোকরা উকিলই বটে, কিন্তু দল সুদ্ধ নয়—একটি মাত্র লোক। সে কিশোরীলাল। বিমান বুঝলে কিশোরীলাল সম্বন্ধে বিষোদ্গার কেউই কানে নিচ্ছে না। কিন্তু এই সব বলতেই তো আসা। বলতে লাগল, — সে রকম আর হবে না ভাইসকল। তোমাদের বাপ-মায়ের আশীর্বাদে - জান তো সবাই - পেটের ভাবনা হয় না। উপরি আয়ের কি দরকার আমার? নতুন বাজেটের সময় ট্যাক্স এবার অর্ধেক কমিয়ে দেব।

বিমান উঠে যেতে খুব হাসাহাসি আরম্ভ হ'ল। একজন বলল, — চোর সবাই! কিশোরীবাবুও যে সাধু তা বিশ্বাস করি না — যে যাই বল। তবে তার হ'ল ছেঁড়া জামা, পাঁচসিকের জুতো। ওই জামা জুতোর দামটাই না হয় সে উসুল করবে। তুমি বাবা জমিদারের

ছেলে, হেঁ হেঁ, তুমি গেলে মোটরের তেল জোগাতে জোগাতে আমাদের হাড় কখানা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে।

এই মহাযুদ্ধে জনৈক উলুখড়ের বিষম বিপদ হয়েছে , তিনি ওই গোপাল খাজাঞ্চি। পঁচিশ বছর চাকরির মধ্যে এমন অঘটন আর কখনও ঘটে নি। অপরাধের মধ্যে কিশোরীলালের খুড়া তিনি। কেবল খুড়া বললেই হবে না, বাপের চেয়ে বেশি। গোপাল জমা-ওয়াশীল বাকি ক'রেই জীবনটা কাটিয়ে দিলেন, বিয়ে করবার ফুরসৎ হ'ল না। গানবাজনা করতে জানেন না, কিন্তু ওই বিষয়ে অনুরাগ খুব। আনুষঙ্গিক আর একটা সুখ আছে, বটতলার বাছা বাছা গানের বই ও নাটক পড়া। এরই উপর এসেছে কিশোরীলাল ও বনমালা, — ভাই বোন দু'টি। বছর দশেক আগে তারা মা-বাপ হারিয়েছে, এই দশ বছর ধ'রে গোপাল ওই মনিব দু'টির কাছে বড় ভয়ে ভয়ে থাকেন। অত ভয় তিনি শ্রীনাথ রায়কেও করেন না।

দুপুরে ঘুম থেকে উঠে হাতমুখ ধুয়ে গোপাল গড়গড়ার নলটি কেবল মুখে ধরেছেন, বনমালা অগ্নিমূর্তিতে এসে দাঁড়াল।

—শুনেছেন কাকাবাবু?

নল মুখ থেকে প'ড়ে গেল।

—বিমানবাবু নাকি ব'লে বেড়াচ্ছেন, 'পিঁপিড়ার পাখা ওঠে মরিবার তরে'?

কবিতা শুনে গোপাল মহা খুশি হয়ে উঠলেন। —বলেছে নাকি? তা হ'লে পড়াশুনো করেছে কিছু কিছু। আমি ভাবতাম, কলকাতায় ব'সে ব'সে খালি ঘাস কাটত।

নিজের রসিকতায়, গোপাল নিজেই হেসে উঠলেন। বললেন, —বড্ড খাসা পদ্য রে, অমন আর হয় না! ওর পরের ছত্র বলতে পারিস মালা?

তাঁর উল্লাসে কিছুমাত্র যোগ না দিয়ে বনমালা বলতে লাগল,—আর বলেছেন, তুমি নাকি তাঁদের এস্টেটের টাকা ভেঙে দাদার ইলেকশনের জন্যে খরচ করছ।

—বলেছে নাকি? গোপালের মুখে হাসি নিভে গেল, বললেন, —এটা মিথ্যে কথা। কিশোরী তো একটা পয়সাও আমার কাছ থেকে নেয় না।

বনমালা বললে, —আচ্ছা.কাকাবাবু, এই বুড়োবয়সে তোমার চাকরির দরকারটা কি?

গোপাল ঘাড় নেড়ে বললেন, —কিছু না, কিছু না।

কিশোরী কোর্টে যায় নি, কোন্ দিক দিয়ে এসে অতি সংক্ষেপে সে রায় দিল, ---ওই চাকরি ছেড়ে দিতে হবে।

— আচ্ছা।

কিশোরী বললে, —আজই কিন্তু।

—আচ্ছা।

চাদরটা কাঁধে ফেলে গোপাল তাড়াতাড়ি নেমে গেলেন। গলি পেরিয়ে সদর রাস্তায় এসে তবে হাঁপ ছাড়লেন। জমিদার-বাড়ি এসে চুপিচুপি মহেশ দারোয়ানের কাছে শুনলেন, সংবাদ বড় শুভ—বিমান বাড়িতে নেই, দুপুরে দুটো নাকে মুখে গুঁজে দলবল নিয়ে বেরিয়ে গেছে। শ্রীনাথ উপরে আছেন, তিনিও নামেন নি।

তিন চার জনে প্রকাণ্ড এক সামিয়ানা কাঁধে ভিতরে ঢুকল। —ব্যাপার কি?

মহেশ বলল,— শোনেন নি খাজাঞ্চিবাবু? মঙ্গলবারে যাত্রা হবে।

গোপাল উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। — বলিস কি? কার দল? কি পালা হবে, শুনেছিস কিছু?

মহেশ বিরক্তমুখে বলতে লাগল, —জ্বালাতন আর কি? মঙ্গলবারে সমস্ত রাত জেগে আবার বুধবারেব ওই হাঙ্গামা। আমাদের যেন মানুষের শরীর নয়, বড়বাবুর বিচার-বিবেচনা নেই।

তখন মনে পড়ল, ইলেকশন তো বুধবারে। তার অবশ্য পাঁচ দিন বাকি। গোপাল চিন্তিত ভাবে বললেন,— গোলমালের মধ্যে যাত্রা কি জমবে? কর্তামশায়ের খেয়াল হয়েছে বোধ হয়। তা নইলে আর এমন বুদ্ধি কার?

মহেশ বলল,— বুদ্ধি বড়বাবুর। যাত্রা না ঘোড়াব ডিম। যারা ভোট দেবে, যাত্রার নাম ক'বে তাদের রাত্রি থেকেই আটকে রাখবার ফিকির। সকালবেলা গাড়িতে পুরে পুরে চালান কববে। মিষ্টিমণ্ডা খেয়ে ভোট দিয়ে—তারপর ছুটি। একটু চুপ ক'রে থেকে বললে,— বুদ্ধিটা খুব ভাল। কিন্তু আমাদের যে জানে কুলোয না।

কাছাবি-ঘরে ঢুকে গোপাল হাতবাক্সের সামনে বসলেন। বাঁ দিকে রাশীকৃত কানফোঁড়া খাতা। সেই সব খাতার নিচে আছে—অভিমন্যুবধ গীতাভিনয়। হাতবাক্সে কনুই ভর দিয়ে পা ছড়িয়ে গোপাল বই খুলে বসলেন। তারপর কর্তা নামলেন, নেমে বৈঠকখানার দিকে গেলেন। গোপাল চোখ না তুলেই সমস্ত টের পাচ্ছেন। চোখ তোলবার জো নেই ; খাসা জমেছে বইখানা, বড় চমৎকার বই!

একটু পরেই ডাক এল, — গোপাল!

—আজ্ঞে, যাই।

আবও পাতা দুই এগিয়েছে। কর্তা আবাব ডাকলেন,—কই গো, কি করছ তুমি?

রসভঙ্গে বিরক্ত হয়ে গোপাল জবাব দিলেন, —একটা জরুরি হিসেব দেখছি, দেরি হবে।

মিনিটখানেক পরে প্রবল হাসির সঙ্গে সচকিত হয়ে মুখ তুলে দেখেন, শ্রীনাথ স্বয়ং এসে দাঁড়িয়েছেন। হাসতে হাসতে বললেন,—আ-হা-হা, ঢাকছ কেন? দেখি, দেখি, হিসেবটা কিসেব! পবশু থেকে বইটা উড়ে গেছে , তখনই জানি, গোপালচন্দোর ওই নিয়ে হিসেব ধবেছেন। বলি, এমন অভিনিবেশ ইস্কুলে পড়বার সময ছিল কোথায়? তা হ'লে যে চাই কি একটা হাকিম হয়ে বসতে পাবতে!

বুড়ার দু হাতে দুটা রেকাব। একটা হাতবাক্সের উপর রেখে বললেন, —লুচি ন্যাকড়া হয়ে যাচ্ছে, ও নড়বড়ে দাতে ছিঁড়বে না কিন্তু। হিসেবটা না হয় দু মিনিট বন্ধ থাকুক। ওরে ইাক, জল দিয়ে যা দু গ্লাস।

মহানন্দে আহার চলেছে, এমন সময়ে সুতীব্র আলো সমস্ত উঠোন উদ্ভাসিত ক'রে বিমানবিহারীর মোটর এসে দাঁড়াল। জুতোর আওযাজে মার্বেলেব মেঝে কাঁপিয়ে সোজা সে এসে দাঁড়াল কাছারি ঘরেব মধ্যে।

ইতিমধ্যে যাদুমন্ত্রে যেন সেখানকার অবস্থা বদলে গেছে। শ্রীনাথের হাতের রেকাবি ঢুকেছে তক্তাপোশের তলায়, আর গোপালেরটা গেছে খাতাপত্রের আড়ালে। হাতেব কাছে এক আদালতের সমন পেয়ে গোপাল তারই উপর শশব্যস্তে যোগ দিয়ে চলেছেন।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে বিমান বলল, —এখানে কি বাবা?

শ্রীনাথ বললেন,—জলকবের হিসাব নিচ্ছি। তুমি যাও বাবা, কাপড়চোপড় ছেড়ে ঠাণ্ডা হও গে।

বিমান বলল—ঠাণ্ডা হব কি, মাথায আমার আগুন জ্বলছে! সমস্ত অঞ্চল ঘুবে দেখে এলাম, কোন আশা নেই।

শ্রীনাথ অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। একবাব ছেলেব দিকে আব একবাব গোপালেব দিকে চেয়ে ব'লে উঠলেন, — তাই তো, তা হ'লে কি হবে?

—এমন কিছু হবে না। কিশোরী জিতবে, আমি বিষ খাব। —ব'লে গোপালের দিকে কঠোর একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে বিমান গটমট ক'রে উপরে উঠে গেল।

গোপাল নিশ্বাস ফেলে ন'ড়ে চ'ড়ে বসলেন। শ্রীনাথ বলতে লাগলেন,— পাগল, পাগল! আমাদের সময় এসব ছিল না, আমরা বেশ ছিলাম। আমরা খেতাম, ঘুমোতাম, পাশা খেলতাম, কোন হাঙ্গামা ছিল না। কি বল হে, গোপাল?

গোপাল ততক্ষণে পুনশ্চ গীতাভিনয় খুলে বসেছেন। শ্রীনাথের কথা তাঁর কানেই গেল না। বললেন, —কর্তামশায়, যাত্রায় কি পালা হবে ঠিক করলেন? অভিমন্যু-বধ হোক না, খাসা জমবে!

— বেশ, বেশ। তোমরাই ঠিক ক'র। তারপর গোপালের পিঠে একটা ঝাঁকি দিয়ে বললেন,—ওঠ হে, সন্ধ্যে হয়ে গেল, আর কত কাজ করবে? চল, একহাত পাশায় বসি গে।

হাতবাক্স ও লোহার সিন্দুকে চাবি এঁটে সমস্ত গুছিয়ে গাছিয়ে নিতে, এর মধ্যে বিমান আবার নেমে এল। এ সময়ে তার নামবার কথা নয়, আজ চোখে মুখে তার যেন আগুন ফুটে বেরুচ্ছে। এসে গম্ভীরভাবে চেয়ার টেনে বসল। গোপালের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল, —খাজাঞ্চিমশায়, কিশোরীকে বলেছিলেন সে কথা?

গোপাল ঘাড় নাড়লেন,—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

শ্রীনাথ বললেন,—কি কথা, বাবা?

বিমান বলতে লাগল, —আমার চিরশত্রু কিশোরী। কলেজে পাশাপাশি বসতাম, ও ক্লাসে ব'সে ব'সে ঝিমাত, ক্লাসের বাইরে হৈ-হৈ ক'রে বেড়াত, আর আমি সমস্ত রাত জেগে পড়তাম। তবু সে কোন বার আমায় ফার্স্ট হতে দেয় নি। এখানে ইলেকশন হচ্ছে, তাতেও সে আমার পথ আটকে দাঁড়াল। নতুন উকিল হয়ে এসেছে, যাতে প্র্যাকটিস জমে সেই তো তার দেখা উচিত। আমি বরং দু-দশ জনকে ব'লে দেব। এই আমাদের এস্টেটে তো কত কাজকর্ম রয়েছে! এসব হ্যাঙ্গামে দরকারটা কি! সব কথা ভাল ক'রে বুঝিয়ে বলেছিলেন, খাজাঞ্চিমশায়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—স'রে দাঁড়াতে রাজি হয়েছে?

গোপাল মৃদুস্বরে জবাব দিলেন, —আজ্ঞে—

উৎসাহের প্রাবল্যে বিমান চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। — বেশ, বেশ, তবে আর কি। তা হ'লে লিখে দিক একটা কিছু, আমি কালই ছাপিয়ে বিলি ক'রে দেব। হঠাৎ গোপালের মুখের দিকে চেয়ে সন্দেহ হ'ল। বললে,— আপনি বলেন নি বোধ হয় খাজাঞ্চিমশায়?

গোপাল সভয়ে জবাব দিল, আজ্ঞে, বলব।

মুহূর্তে বিমানের দৃষ্টি রুক্ষ, স্বর কঠোর হয়ে উঠল। বললেন বইকি! কিশোরী কেল্লা ফতে করুক, এই সব ব'লে হাসি ঠাট্টা করবেন। তারপর চারিদিক তাকিয়ে ব'লে উঠল,—ও, কালেক্টরের নিবেশ নেওয়া হয়ে গেছে এর মধ্যে? খাতাগুলো আর একবার দয়া ক'রে বের করতে হবে। আমি একবার দেখতে চাই।

সকলে নির্বাক। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে মাটির দিকে তাকিয়ে বিমান মুহূর্তকাল দাঁড়িয়ে রইল। তারপর মুখ ফিরিয়ে দ্রুতবেগে উঠোন পেরিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল। খাতা বের করবার অপেক্ষায় রইল না।

এরই দিন দুই পরে এক কাণ্ড হয়ে গেল। গোপাল সম্প্রতি নদীর ধারে নতুন বাড়ি করেছেন। বিমান শুনেছে কথাটা, কিন্তু তেমন কানে নেয় নি। তারা এক একটা রাস্তা ধ'রে

ঘুরছিল। তখন আসন্ন সন্ধ্যা, নদীর জল ডুবন্ত সূর্যের আলোয় ঝিকমিক করছে। বিমান আর জন দুই তিনকে নিয়ে ঢুকে পড়ল গোপালের বাড়ি। নীচের তলায় কেউ নেই, ঘরদুয়োর হাঁ-হাঁ করছে।

অক্ষয় সন্দেহ প্রকাশ করল—এত বড় বাড়ি ভাড়া নেবে ভূপাল শা? আড়তদারি ক'রে কত টাকা করেছে সে?

ফিরে যাবে মনে করছে, এমন সময় আলো হাতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল বনমালা। বিমান চেনে না, কিন্তু বনমালা তাকে চিনতে পারল। ছোটবেলায় কতবার সে গোপালের সঙ্গে জমিদারের বাড়ি গিয়েছে, বিমান ছুটির সময় বাড়ি আসত, সেই সময় তাকে দেখেছে দু একবার।

বনমালা বলল,—আসুন। আলো টেবিলের উপর রেখে সকলকে চেয়ার দেখিয়ে দিল।—কি দরকার বলুন তো।

এমন সপ্রতিভ মেয়ে বিমান খুব কম দেখেছে। এ রকম জায়গায় তো আশাই করা যায় না। ছাপানো নানা রকম নিবেদনপত্র তারা ছড়াতে ছড়াতে যাচ্ছিল , একজনে তার একখানা বনমালার হাতে দিল।

বনমালা হেসে বলল,— ভোট চাইতে এসেছেন?

বিমান বলল, –বুঝছেন তো দুর্ভোগ। বাড়ির কর্তারা কোথায় সব?

বনমালা বলল, – এখন কেউ নেই। থাকুন আর না থাকুন এ বাড়ির ভোট আপনি তো পাবেন না

এ রকম স্পষ্টভাষায় কেউ 'না' বলে না। সবাই স্বীকার করে এমন কি দিব্যি ক'রে বলতেও অনেকে পরবর্তি নয়। যদিও বিমান জানে, সেই দিব্যি ওয়ালাদের শতকরা নব্বই জন ভিন্ন দলের। বিমান চমকে গেল। বললে— ভোট পাব না, কারণটা শুনতে পাই?

বনমালা বলল কারণ একটা নয় তো। প্রথমত আপনি বড়লোক, অতএব ভিন্ন জাত

বিমানবিহারী অধীরভাবে তর্ক আরম্ভ করল,- কেন বড়লোক হওয়া কি অপরাধ? বড়লোক হ'লে মানুষ হতে নেই? এসব ধারণা কেন আপনাদের হয়? কে ব'লে বেড়ায় এসব?

বনমালা বলল আচ্ছা এ বিচার না হয় আর একদিন হবে। আজ আপনার অনেক কাজ। বরঞ্চ অন্য কোথাও গিয়ে ভোটের চেষ্টা করলে মিছামিছি সময় নষ্ট হবে না।

বিমান আরও চেপে বসল। থাকুক গে কাজ। চাই না অন্যের ভোট। খান দুই মোটর আছে ব'লেই আপনাদের ভোট পাবার অনধিকারী নই, এইটে প্রমাণ ক'রে তবে আজ এখান থেকে উঠব।

বনমালা খিলখিল ক'রে হেসে উঠল। বলল – প্রমাণ করলেও ভোট পাবেন না। যেহেতু এটা গোপাল ঘোষের বাড়ি। কিশোরীলাল ঘোষ আমার দাদা।

বাড়িতে কেউ নেই, এটা বনমালা মিথ্যা বলেছিল। গোপাল ছিলেন তিনি এসব টের পান নি। তিনি উপরে ছিলেন। বনমালা বলল – শোন কাকাবাবু আজ মজা হয়েছে। বিমানবাবু এসে হাজির। বললেন ভোট দাও। তারপর হাসতে হাসতে বলল – আমার ভোটটা আমি ওকে দেব ভাবছি

গোপাল সায় দিয়ে বললেন, দেওয়া তো উচিত। কিশোরী যদি এই খেয়ালটা ছাড়ত, আমার ভোটও ওকে দিতাম। বড় ভাল ছেলে।

বনমালা ঠোট বেঁকিয়ে বলল,—ভাল না হাতী। কি বলছিল, জান?

গোপাল রীতিমত চ'টে উঠলেন।— বলেছে তা গায়ে ফোস্কা উঠেছে নাকি? অমন ঢের ঢের ব'লে থাকে। আমাদের সময় কি হ'ত? তখন ভোটের কুরুক্ষেত্তোর ছিল না, বেধে যেত তবলার বোল, কি পাশার দান নিয়ে। তোদের আমলে তো খালি মুখের কথা। আমাদের বেলায় হাতাহাতি হয়ে যেত।

পরদিন বাপের সঙ্গে দেখা হতেই বিমান বলল, —খাজাঞ্চিমশায়ের বাড়িখানা দেখেছ?

শ্রীনাথ উৎসাহ ভরে বলতে লাগলেন, —খাসা বাড়ি। আমায় যে নিয়ে গিয়েছিল একদিন। যাই বল বাবা, আমাদের বাড়ি বড় বটে, কিন্তু গোপালের বাড়ি ছোট হ'লেও যেন ছবির মত। আমার তো ইচ্ছে করে, ওই রকম একটা জায়গা পেলে রাতদিন গিয়ে প'ড়ে থাকি।

বিমানের মুখেব দিকে চেয়ে বুড়ার কথা বন্ধ হ'ল। ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বিমান বলল, —বাড়ি ভাল, সে আমিও মানি। কিন্তু কত মাইনে পান খাজাঞ্চিমশায?

শ্রীনাথ ইতস্তত করে বললেন, —তিরিশ বোধ হয়।

বিমান বলল, —তিরিশ নয়, আটাশ টাকা। তা-ও আট মাসে বাকি প'ড়ে রয়েছে, নিয়ে যাবারই ফুরসৎ হয় না। পাঁচ বছরের কাগজ উল্টে দেখলাম, বরাবর পুজোর সময় একসঙ্গে বারো মাসের মাইনে নিয়ে যান। বাকি এগাবো মাস কি ক'বে চলে তা হ'লে?

সে কৈফিয়ৎ যেন শ্রীনাথেরই দেবার কথা। বলতে লাগলেন,— জমা-জমি আছে কিছু কিছু। কিশোরীও রোজগার করছে।

—আব বাড়ি?

কবেছে একরকম ক'রে। বাড়িভাড়া লাগে না, তাতেই তো চ'লে যায়।

কঠোর কণ্ঠে বিমান বলল,—কিসে চলে, তা বোঝবাব বুদ্ধি আমাব আছে। কিন্তু বড্ড সেয়ানা, কাগজপত্রে ধরা-ছোঁওয়া পাচ্ছি না যে। যাই হোক বাবা, নতুন খাজাঞ্চি রাখতে হবে। এস্টেট ফাঁক ক'রে দিচ্ছেন। কাঁচা পয়সা, নইলে কিশোরী অমন ক'রে দু হাতে ছড়াতে পারে? কোর্ট থেকে নিজে যা আয় করে, সে তো আমাব অজানা নেই৷

একটু পরেই হেলতে দুলতে পান চিবাতে চিবাতে গোপাল এসে উঠলেন। বাপে ছেলেয তখনও কথাবার্তা হচ্ছে। প্রথমটা গোপাল বিমানকে দেখেন নি, তাবপর দেখতে পেয়ে পাশ কাটাবার উদ্যোগে ছিলেন। বিমান ডাকল,—শুনুন, খাজাঞ্চিমশায়—

গোপাল তটস্থ হয়ে এসে দাঁড়ালেন।

—আপনি ইংরেজি জানেন না। তাতে এস্টেটের কাজকর্মের অসুবিধা হচ্ছে। আমরা একজন ইংরেজি জানা ক্যাশিয়ার রাখব।

গোপাল জবাব দিলেন,—আজ্ঞে।

—আজই আপনি ম্যানেজারের কাছে চার্জ বুঝিয়ে দেবেন। খেসাবৎ হিসাবে আপনাকে তিন মাসের মাইনে দিয়ে দেওয়া হবে।

মাথা নীচু ক'রে গোপাল বলল, — যে আজ্ঞে।

তাড়াতাড়ি কাছারি-ঘরে ঢুকে পড়তে পারলে গোপাল বাঁচেন। পিছন হ'তে বিমান বলল,—বেলা হয়ে গেছে, এখন আর কাজ নেই, বিকেলেই সমস্ত বুঝিয়ে দেবেন তা হ'লে।

শ্রীনাথ চুপচাপই ছিলেন, কিন্তু বড় কটু হয়ে উঠছে দেখে আর না ব'লে পাবলেন না। বললেন, —অর্থাৎ তুমিই বলছিলে না গোপাল, চাকরি আর ভাল লাগে না ; সেই কথাই বলছিল, আর কি। তা তোমাব যদি ইংরেজি জানা তেমন কেউ থাকে, ববং—

বিদ্রূপের হাসি হেসে বিমান বলল,—তা কিশোরী যদি আসে, চাকরিটা তাকে দিতে পারি। কোর্টে যা পায়, তার চেয়ে মন্দ হবে না।

বিমান বেরিয়ে গেল। শ্রীনাথ আজ আর কাছারি-ঘরে গল্প করতে এলেন না, উপরে উঠে গেলেন। সময় নষ্ট করবার লোক গোপাল নন, যথারীতি অভিমন্যু-বধ খুলে বসেছেন। হরিচরণ মুহুরি অনেক দিনের লোক, গোপালকে বড় ভালবাসে। এগিয়ে এসে ফিসফিস ক'রে বলল,—খাজাঞ্চিমশায়, বিমানবাবুকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলুন একবার।

মুখ না তুলেই গোপাল বললেন,—কি বলব আবার?

হরিচরণ বলতে লাগল, —বাইরেটাই ওঁর ওই রকম। আসলে বড়বাবু লোক খারাপ নন। ইলেকশন নিয়ে মেজাজ বিগড়ে আছে কিনা—

—থাকুক গে! —ব'লে গোপাল গীতাভিনয়ের পাতা উল্টালেন।

বিমান কিন্তু ভুলে যায় নি। পরদিন আবার গোপালকে ধ'রে বসল, —খাজাঞ্চিমশায়, ম্যানেজার বলছিল আপনি হিসেবপত্র বুঝিয়ে দেন নি।

গোপাল বললেন, — আজ্ঞে, না।

—আজই দেবেন।

ঘাড় নেড়ে গোপাল ঘরে গিয়ে উঠল।

মঙ্গলবার সকালবেলা দল এসে পড়ল। অধিকারীর গলায় বাইশখানা মেডেল। গোপাল সেদিন দুপুরে ঘুমুলেন না, খেয়ে উঠেই অমনই চাদর কাধে ফেললেন। বনমালা রান্নাঘরের দিকে ছিল, সে যেন হাত গুনে টের পায়। সে ঝগড়া করতে এসে দাঁড়াল।

—এক্ষুণি চললে যে।

গোপাল সভয়ে বললেন, —জানিস নে তো কত কাজ!

—কাজ, কাজ! জিজ্ঞাসা করতে পারি, এত কাজের দরকারটা কি?

গোপাল হেসে ব্যাপারটি উড়িতে দিয়ে বললেন, -দরকার কি, শোন কথা। বলি, টাকাটা তো খোলাম-কুচি নয়, না খাটলে টাকা দেবে কেন?

ফলে কিন্তু উল্টো উৎপত্তি হ'ল। মেয়ের অভিমান উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। বলল, —কাকাবাবু, আমরা অনেক খাই, বুড়ো বয়সে তাই তোমায় এমন ক'রে খেটে মরতে হয়। বেশ, এখন থেকে একবেলা ক'রে খাব। আসুক দাদা—

— খেটে মরি আমি? গোপাল এবার হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন। —গোপালচন্দোর খেটে চাকরি করে, এ তো শ্রীনাথ রায়ও বলতে পারবে না। সকাল সকাল যাচ্ছি, সে তো না খাটবার ফিকির রে. সবাই রাত জেগে মরবে, আমি নটা না বাজতেই চ'লে আসব। দেখিস।

যাত্রা বিকেলবেলা আরম্ভ হবার কথা, কিন্তু আরম্ভ হতেই সাড়ে আটটা। গোপাল নিশ্বাস ফেলে ভাবলেন, তাই তো, গান শোনা হবে না আর! আসর-বন্দনাতেই আধঘণ্টা কাটবে। রোয়াকের উপর একখানা চেয়ারে ব'সে উবু হয়ে শুনছিলেন। তারপর উত্তরা এসে গলা-কাঁপিয়ে গান ধরল। ঐ ছোকরাই গোপালের কাছে একটা বিড়ি চেয়েছিল বটে, গোপাল হাঁকিয়ে দিয়েছিলেন। সে যে এমন খাসা গান গায়। গোপাল আর ওরকম ভাবে থাকতে পারলেন না, উঠোনে আসরের মধ্যে এসে চেপে বসলেন। ঘড়িতে নটা দশটা বেজেই চলল, গোপালের খেয়াল নেই।

মহেশ দারোয়ান এসে বলল,—বড়বাবু ডাকছেন।

গোপাল অন্যমনস্কভাবে জবাব দিলেন, যাচ্ছি।

আবার খানিক পরে মহেশ এসে ডাকল, —কই গো খাজাঞ্চিমশায়, বড়বাবু দাঁড়িয়ে আছেন, বড্ড দরকার, শিগগির আসুন।

গোপাল ঝাঁঝের সঙ্গে বললেন,—একশো বার এক কথা! বললাম তো যাচ্ছি। তালুক লাটে উঠেছে নাকি?

মহেশ বলল, —কথাটা কানে নেন নি, বড়বাবু ডাকছেন, কর্তামশায় নন।

কিন্তু পাণ্ডবদের তখন সঙ্কটাপন্ন অবস্থা, অভিমন্যু ব্যূহভেদের উদ্যোগে আছেন। গোপাল মহেশের কথায় কিছুমাত্র বিচলিত হলেন না। বললেন— হোক গে বড়বাবু। বড়বাবু তা ফাঁসি দেবেন না তো! বল গে যেয়ে এখন হবে না, চার্জ সকালবেলা বুঝিয়ে দেব।

মহেশ হঠাৎ ত্রস্তভাবে পাশ কাটিয়ে দাঁড়াল। গোপাল ঘাড় ফিরিয়ে দেখেন, বিমানবিহারী স্বয়ং এসে দাঁড়িয়েছেন। আসরের মধ্যে সে এসে দাঁড়াবে এটা একেবারে অভাবিত। আরও আশ্চর্য, কণ্ঠস্বর তার মোলায়েম। সে বলল,—একটুখানি না উঠলে তো হবে না খাজাঞ্চিমশায়।

—আজ্ঞে। — গোপাল তৎক্ষণাৎ উঠে বিমানের পিছু পিছু চললেন। অভিমন্যু তখন ব্যূহের সামনে খুব লম্ফঝম্প ক'রে অ্যাক্‌টো ক'রে বেড়াচ্ছে। রোয়াকে উঠে গোপাল একবার পিছন ফিরে সেদিকে তাকিয়ে নিশ্বাস ফেললেন। বিমান এ কোথায় নিয়ে যায়? এ যে উপরে চলল! সেখানে বারান্দার উপরে একখানা সোফা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

সর্বনাশ! বনমালা এসে ব'সে আছে।

গোপালের রাগ হ'ল। বললেন, —ভোট দিবি—দিস। তা এখানে আসবাব দরকারটা কি?

বিমানের মুখ হাসিতে ভ'রে গেল। বলল, —আপনি ভোট দেবেন আমাকে?

বনমালা জবাব না দিতে মুখের কথা কেড়ে নিয়ে গোপাল বলতে লাগলেন, — দেবে বইকি। আমার বাড়িতে পায়েব ধুলো দিয়েছেন, সোজা কথা। ও বলেছে, ওর ভোটটা এখানেই দেবে। আবার তাই নিয়ে আমার সঙ্গে কত ঝগড়া।

বনমালার মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি সে কথা ঘুরিয়ে নিল। বলল, — ঝগড়া হয় সাধে! ঝগড়া না ক'রে উপায় আছে তোমার সঙ্গে? রাত্তির কটা বাজল, কাকাবাবু?

গোপাল বললেন, —- বলেছি তো ফিরতে নটা হবে। তাই বুঝি ছুটে আসা হয়েছে!

বনমালা বিমানের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হেনে বলতে লাগল, —আসব না তো বুড়োবয়সে রাত জাগিয়ে বারো জনে তোমায় মেরে ফেলবে, ব'সে ব'সে তাই দেখতে হবে নাকি? বাড়ি চল কাকাবাবু, গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, কানাই গাড়িতে ব'সে—

বিমানের অপরাধ নেই, সে তো গোপালকে থাকতে বলে নি। কিন্তু সে রাগ করল না। বলল, —বাড়ি যাবেন কি রকম? ভোট দেবেন যখন বলেছেন, এইখানেই থাকতে হবে।

বনমালা হাসিমুখে বলল,—আটকে রাখবেন নাকি?

—নিশ্চয়। যত ভোটার কেউ যেতে পারবে না। সবাইকে যাত্রা শুনতে হবে। কাল ভোট দিয়ে তারপর ছুটি। তারপর হেসে উঠে বলল, —মা, জেঠাইমা, ওঁদের সঙ্গে ব'সে যাত্রা শুনুন গে, যান।

গোপাল মহানন্দে সায় দিয়ে উঠলেন। সেই ভাল, পালাটা জমেছে খুব।

কিন্তু ভবী ভুলবার নয়। সে উঠে দাড়াল , কিন্তু বিমানের নির্দেশ মত যাত্রা শুনতে না ব'সে সে গোপালের হাত ধরে বলল, —বাড়ি চলুন।

এই রকম ক্ষেত্রে গোপাল কাউকে ভয় করেন না। হেঁকে উঠলেন,— বলেছি তো রাত্তির হবে, নটার আগে ফিরব না।

—নটা বেজে গেছে দেড় ঘণ্টা আগে। বনমালা দেয়াল-ঘড়িটা আঙুল দিয়ে দেখাল।

হুঁ, বাজলেই হ'ল। এখনও ব্যূহের বাহিরে রয়েছে. ঐ ব্যূহ ভেদ হবে. তারপব অভিমন্যু বধ, তারপর জরাসন্ধ-বধ। ঘড়ি যদি লাফিয়ে লাফিয়ে চলে, আমি তার করব কি? বিমান নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে। সমর্থনের আশায় তার দিকে তাকিয়ে গোপাল বলতে লাগলেন,— যাঁদের চাকরি করি, কাল তাঁদের মহামারী কাণ্ড। তার জন্যে আধ ঘণ্টা যদি দেরিই হয়, কি করতে হবে?

—চাকরিতে ইস্তফা দিতে হবে। পঁচিশ বছর শরীরপাত করেছ, আব করতে দেব না।

গোপাল বললেন, — দেব তাই। যাত্রা ভেঙে যাক। কাল সকালে দেব।

কোন্‌দিক থেকে শ্রীনাথ সেই সময়টায় এসে পড়লেন। তিনি ব'লে উঠলেন, সেই ভাল। আমিও ইস্তফা দেব। তাবপর, বুঝলে গোপাল, দুজনে কাশী গিয়ে সেখানে পাশার ছক পেতে নেব। বলতে বলতে তিনি হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন।

বিমান বলল, — সে কি ক'রে হবে বাবা? ভেবে দেখলাম, ওঁকে ছাড়লে এস্টেট চালানো মুস্কিল হবে। আমরা আগে কাজকর্ম শিখে নিই ভাল করে। তাবপর গোপালের দিকে চেয়ে বলল, —বুঝলেন খাজাঞ্চিমশায়, চাকবি আপনি ছাড়তে পারবেন না।

— যে আজ্ঞে। —ব'লে গোপাল সসম্ভ্রমে ঘাড় নাড়লেন।

বিমান বলতে লাগল, — আর ভেবে দেখলাম, মিউনিসিপ্যালিটিতে যাওয়া আমার পোষাবে না। কিশোবী যাক। ঘবের খেয়ে কে অত বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়াবে? যত ভোটার এসেছে, যাত্রা থামিয়ে এখনই সকলকে ব'লে দিচ্ছি—

এবাব গোপালের বিশেষ আপত্তি দেখা গেল। বলল, —আজ্ঞে ব্যূহভেদটা আগে হয়ে যাক।

বিমান আপত্তি করল না, খুব হাসতে লাগল। ততক্ষণে গোপাল শ্রীনাথের সঙ্গে শশব্যস্তে নীচে নামতে লেগেছেন। চেঁচিয়ে বললেন, —ওবে মালা, তুই তবে গিন্নিমাদের সঙ্গে ব'সে শুনগে যা। ব্যূহভেদ হয়ে গেলেই মায়ে-পোয়ে বেরিয়ে পড়ব।

বিমান মৃদুকণ্ঠে বলল,—ব্যূহভেদ হয়ে গেছে ব'লে ভবসা হচ্ছে, কি বলেন?

—যান। —ব'লে বনমালা রাগ ক'রে মেয়েদেব ওদিকে চ'লে গেল।

বিমানের মা বলছিলেন, — মেয়েটি বড খাসা। যেমন পটের মত চেহারা, তেমনই, মিষ্টি কথাবার্তা।

বিমান বলল, —বড্ড ঝগড়া করে মা, তোমাদের সামনে ভিজে বেড়ালটি।

মা হেসে বললেন,—তোর সঙ্গে করেছে নাকি? তা হ'লে দেখেছিস তুই? তোর যা স্বভাব, ঝগড়াটে না হ'লে তোকে আঁটবে কে? কেমন লক্ষ্মীর মত আমার পায়ের গোড়ায় বসেছিল। ইচ্ছে হচ্ছিল, লক্ষ্মীকে ঘরে বেঁধে রাখি।

বিমানের এত পশার-প্রতিপত্তি, মায়ের কাছে কিছুই খাটে না। সে চুপ ক'রে রইল।

তারপর একটুখানি ভেবে মা বলতে লাগলেন,—তবে আমাদের গোপাল খাজাঞ্চির ভাইঝি —এই একটা কথা। কর্তার সঙ্গে যতই থাক, তবু ঘোষমশায় এখানে চাকরি করেন। তারই ভাইঝি কিনা—

এবার বিমানের কথা ফুটল,—তা যদি বল মা, তবে আমি কিছুতেই শুনব না। হাত মুখ নেড়ে সে মহাতর্ক সুরু করল। —বড়লোক, গরিবলোক, চাকর মনিব—ওসব ভগবান করেন নি, মানুষে করেছে। সমস্ত উঠে যাচ্ছে। রাশিয়া ব'লে দেশ আছে শুনেছ? সেখানে সব সমান।

অথ আয়োডিন ঘটিত

শিব্রাম চক্রবর্তী

বাঘেব সঙ্গে আত্মীয়তার কথাটাই সর্ব্ববিদিত। কিন্তু ভালুকের সঙ্গেও যে তার সম্পর্ক আছে, ক'জন জানে একথা? তা' জানবার সৌভাগ্য—অথবা হয়তো দুর্ভাগ্যই তাকে বলতে হবে—একমাত্র আমারই একবার হয়েছিল। বেড়ালকে তোমরা কেউ নাচতে দেখেছো? অবিকল ভালুকের মতই, দুই বাহু তুলে এবং লেজের উপর ভর না দিয়ে? বিশিষ্ট ঔষধ প্রয়োগে এবং বিশেষ প্রক্রিয়ার দ্বারা বেড়ালের মধ্যে সেই সুপ্ত শক্তি জাগ্রত হতে দেখা গেছে। এবং তাইতেই আমি জানতে পেরেছি যে কেবল বাঘের মাসীই নয়, ভালুকের পিসীও বলা যেতে পারে শ্রীমতী বেড়ালকে।

এবং তারপরেও তার যেসব কাণ্ড-কলাপ স্বচক্ষে দেখেছি , তাতে সিংহের মামী বলতেও তাকে আমার আপত্তি হবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু সেকথা বলব যথাসময়ে—

আমাদের বাড়ীতে একটি আদুরে বেড়াল আছেন। আমার আদরের নয়, আমাদের বিনির আদরের। তিনি নিজের খেয়াল মাফিক চলেন, তাঁকে কারো কিছু বলা বারণ! তুমি বসে আছ, তিনি তোমার গায়ে এসে তাঁর শ্রীলেজ বুলোবেন, তুমি কথাটি বলতে পাবে না। ভুলে তুমি দাঁড়িয়েছো কি তিনি তোমার দু'পায়ের গেটের ভিতর দিয়ে ল্যাজ ফুলিয়ে চলেছেন। যাবেনই তিনি, লেজের পতাকা তুলে—সব বাদ-প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে— কেউ তাঁকে থামাতে পারবে না। যেন ফার্সি-সৈন্য রোমের নগর-তোরণের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। তাঁর এই ঘনিষ্ঠতার পরেই তোমার সর্বাঙ্গে যা আবিষ্কার করবে, তা ফাসিস্তের রোম নয় — বেড়ালেব রোম। আদি ও অকৃত্রিম! আর এমনি রোমাঞ্চকর।

পায়ের ভেতর দিয়ে বেড়ালের যাতায়াত—এসব আমি একেবারে পছন্দ করিনে। এইজন্যই কি বিধাতা পায়ের ফাঁক সৃষ্টি করেছিলেন? —এ সম্বন্ধে বিনির সঙ্গে আমার মতভেদ আছে। হয়তো তাই হবে, কিন্তু ভগবানের জটিল সৃষ্টি-রহস্য অতটুকু মেয়ের সঙ্গে আলোচনা করতে আমি ভালোবাসিনে। আমার পায়ের ফাঁক আমার নিজের জন্য, কোনো বেড়াল-তনয়ের জন্য নয় , যেতে হয় আমি নিজেই যাব তার ভেতর দিয়ে—এই হচ্ছে আমার সাফ জবাব।

সেদিন সদ্য একটা দুঃস্বপ্ন দেখে বেলা আটটার সময় ঘুম থেকে উঠেছি, এমন সময়ে উনি আমার পায়ে এসে ল্যাজ বুলোতে চাইলেন। আদর জিনিসটা একেবারেই আমার ধাতে সয় না, তা' মানুষের আদরে গা জ্বালা করে আর বেড়ালের বেলায় সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠতে থাকে— দুটোই ভারি খারাপ। সুতরাং আকস্মিক উত্তেজনার বশে ওকে যদি আমি ফুটবল্ বিবেচনা করেই থাকি, তাতে বড় দোষ হয় না।

ম্যাও আর ক্যাঁও—এই দুটোর স্বরসন্ধিতে যা দাঁড়ায়, তেমনি একটা অদ্ভুত আওয়াজে জিনিষটা সাড়ে তিন হাত দূরে ছিট্‌কে পড়লো! বেড়ালের চিৎকারে বিনি দৌড়ে এল, বিনির

চেঁচামেচিতে মাকে আসতে হোলো। তারপরে তিনজনে মিলে আমাকে যা' বকতে শুরু করলো তা' আর বলে কাজ নেই।

বকুনি থামলে আমি বললাম—" বেড়ালকে শ্যূট্‌ করেছি, তাতে আর হয়েছে কি! এগজামিনে ফেল্‌ করলে অমন অনেকের মাথা বিগ্‌ড়ে যায়! হ্যাঁ, বেড়াল-হত্যা আর বেশি কি এমন, অনেকে এমন অবস্থায় আত্মহত্যাই করে ফ্যালে।"

বিনি বলে—'তুমি আবার ফেল্‌ করলে কবে? ম্যাট্রিকের রেজাল্টকি বেরিয়েছে এখনি? পরশু তো সবে পরীক্ষা দিয়েছো!"

আমি গম্ভীর হয়ে যাই—"আজ সকালেই ফেল্‌ করেছি। স্বপ্নে দেখলাম যে পাশ্‌ করতে পারিনি। ভোরের স্বপ্ন সত্য হয় কিনা তুমিই বলো না মা!"

মা গালে হাত দেন—"মা-ষষ্ঠীব বাহন, তাকে কিনা— তোমার বাপু যতো অনাছিষ্টি! ষাট্‌ ষাট্‌! আর বেলা আটটায় কি মানুষের ভোর হয় যে, ভোরেব স্বপ্ন সত্যি হতে যাবে?"

মা আবার রান্নাঘরের দিকে রওনা হন।

বিনি ঠোঁট উল্‌টে বলে—"পাশ্‌ করতে পারোনি তো আমার বেড়াল কি করবে? বেড়াল কি এগ্‌জামিনার? নম্বর বাড়িয়ে পাশ করিয়ে দেবে তোমাকে?"

"ওসব জানিটানি না, আমাব পায়ের কাছে যে আসবে তাকেই শ্যূট্‌ করবো, তা' বেড়ালই কি আর বিনিই কি!"

"বটে? করো না দেখি কেমন পার? এই ত' এসেছি?" বিনি বুক ফুলিয়ে বুকেব কাছাকাছি এসে দাঁড়ায়।

"জানিস্‌, আমি বক্সিং জানি?' আমি ভয়ে ভয়ে বলি।

"আমাকে বেড়াল পাওনি, আমিও কামড়ে দিতে পারি।" বিনি একেবারে অকুতোভয়।

ওর বেপরোয়ামি আমাকে বিচলিত করে। আম্‌তা আম্‌তা করে বলি—"তোমার বেড়াল নিয়ে থাকোগে না, আমার সঙ্গে লাগতে আসা কেন! এগজামিনে ফেল্‌ করেছি, এখন আমার মাথার ঠিক নেই!" ওকে আমি সাবধান কবে দিই—"হ্যাঁ, ক্ষেপে গেলে কি করে বসবো কেউ জানে না। গলায় দড়িও দিতে পারি, নিজের কিম্বা বেড়ালের।"

বিনি তখন তার প্রিয়পাত্রকে নিয়ে পড়ে—"আ—আমার লুটোপুটি! আমার মেনিমুখো! আমাব ভেল্‌ভেলেটা। কে মেরেছে তোমায়! দাদা কেন মারবে? দাদা কে? তুমি লক্ষ্মীসোনা! তুমি চাঁদের কণা! দাদাকে মারতে দেবো না! দাদাকে মারবো! খুব মারবো! কষে মারবো!"

বিনির বাক্যালাপে আমার হাড় জ্বলে যায়। বেড়ালকে অত লাই দেওয়া ভালো না। ওই আদর দিয়েই ওর মাথা খাওয়া হচ্ছে, ওর পরকাল ঝরঝরে হয়ে যাচ্ছে। সত্যি, ভারি খারাপ এসব!

বিনির কোলে চেপে বেড়ালটা আড়চোখে আমার দিকে তাকায়! আমি আর বিরক্তি চাপতে পারি না—"থাম্‌ থাম্‌! আর বেড়াল বখিয়ে কাজ নেই, খুব হয়েছে!"

বিনির তুব্‌ড়ি ফুটেই চলে—"আমার ভুলু ভুলু! আমার ঢুলু ঢুলু! ডাডা ডুট্টু! ডাডাকে মাল্‌বো। ভালি ডুট্টু, ভালি পাজী। ডাডা কিনা!"

ইতর জন্তুর সামনে নিজেকে অপমানিত জ্ঞান করি। টুথ্‌ব্রাশ নিয়ে সটান বাথ্‌রুমে চলে যাই।

ফিরে এসে দেখি বিনি বেড়ালের চিকিৎসায় লেগেছে। টিঞ্চার আইডিনের বোতল ফাঁক করে ইতিমধ্যেই সারাগায়ে লাগানো হয়ে গেছে ওর।

বিনি বলে—"দাদা! লক্ষ্মী দাদা! রাগ করো না!' তারপরে বেড়ালে না শুনতে পায় এম্‌নি ভাবে আমার কাছ ঘেঁসে ফিস্ ফিস্ করে—"ওসব মিছামিছি বলছিলাম। ওকে বোঝাচ্ছিলাম। ঠাণ্ডা করছিলাম কিনা। আহা, বড্ড লেগেছে বেচারার। গায় ব্যথা হলে তুমি যে খাও সেই ওষুধটা— দেবে একটু? দাও না আমায়!"

"অ্যাস্‌পিরিন্ ট্যাব্‌লেট্? সে কি হবে?"

"জলে গুলে ওকে একটু খাওয়াবো যাতে গায়ের ব্যথা মরে যায়।"

"দূর, তা কি বেড়ালকে দ্যায় কেউ? ঐ যে-আইডিন্ মাখিয়েছিস্, ওতেই হবে। ওতেই হয়েছে।"

"ওতে হয় কখনো? তুমি দাও না শিশিটা!" বিনি মুখ ভারী করে, "মানুষ খেতে পারে আর বেড়াল পারবে না? বেড়াল বলে কি মানুষ নয়?"

"ওর কি মাথা ধরেছে যে, অ্যাস্‌পিরিন্ খেতে যাবে ও।"

"মাথাই কেবল! সারা গা-ই ধরে গেছে বেচারার! শ্যূট্ একখান্ ঝেড়েছো যা! তুমি না তো গোষ্ঠ পাল!"

উপমাটা শুনে খুসী হতে হয়। অ্যাস্‌পিরিনের শিশিটা দিয়ে ফেলি—"বেশি খবচ করিস না কিন্তু! বলে চায়ের মৎলবে রান্নাঘরের দিকে পা বাড়াই।

চা দিতে দিতে মা বলে—"বেড়ালকে মেরে ভালো করিসনি বাছা। কৃষ্ণেব জীব—"

আমি বাধা দিয়ে মার ভুল শোধরাই—"উঁহু, কৃষ্ণের নয়, ষষ্ঠীর।"

"না বে, কৃষ্ণের জীব, মা ষষ্ঠীর হলো বাহন।"

"উঃ!" চায়ে চুমুক দিয়েই লাফিয়ে উঠতে হয়—"দুত্তোব কৃষ্ণেব জীব। এদিকে আমাব জিভটা গেল!"

মা আমাব আর্তনাদে আকৃষ্ট হন্—"কি হলো আবার?"

"কি আবার হবে? খেয়ে-না-খেয়ে যা গরম করেছো চা! বাব্ বাঃ! আমাব জিভ্ পুড়ে গেল!"

মা শুধু বলেন—"আহাহা!" কিন্তু কী আর করবেন, জিভে হাত বুলোনো যায় না!

"দাও, মোহনভোগ দাও, জিভ ঠাণ্ডা করি আগে। দেখো বাপু, গরম নয় তো আবাব।" এবার পরীক্ষা করে তবে মুখের মধ্যে ফেলি।

ঘরে ফিরতেই বিনি বলে—"দাদা, কই খাচ্ছে না তো। তুমি একটু ধরো তো একে, আমি মাছের ঝোল নিয়ে আসি। মাছের ঝোলে মিশিয়ে দিলেই খাবে তখন। দেখো, পালায় না যেন!"

ধরতে আর হয় না, এমনিতেই বেচারা নির্জীব হয়ে পড়েছে। পালাবারও ওব উৎসাহ নেই। সামনে একটা খোরায় অ্যাস্‌পিরিন গোলা রয়েছে, একবার করে শোঁকে, তখনি আবার মুখ বিকৃত করে গোঁফ সরিয়ে নেয়।

মিটি মিটি করে তাকায় আমার দিকে, কেমন মায়া করে। ওকে বলি—"ওষুধটা খেয়ে ফ্যালো চট্ করে লক্ষ্মীটি! সেরে উঠবে এক্ষুণি। না, তোমায় আর শ্যূট করবো না, ভয় নেই। তোমায় মারতে গিয়ে আমারো পায়ে কম লাগেনি।" বলে সাধ্যমত ওকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করি। "মিউ!" —ক্ষীণস্বরে আমাকেও ধন্যবাদ জানায়!

এর মধ্যেই বিনির চিকিৎসার বেশ ফল দেখা গিয়েছে। ওর চেহারা বদ্‌লে গেছে একেবারে। অরিজিনাল পাঁশুটের সঙ্গে টিন্‌চার আইডিন্ মিশে অদ্ভুত এক রঙের খোল্‌তাই হয়েছে। বেড়াল বলে চেনাই যায় না একেবারে!

বিনি একবাটি দুধ আর বাতাসা নিয়ে ঢোকে। —"মা বল্ল, বেড়াল মাছের ঝোল খায় না, ওরা তো বাঙালী নয়, কেবল মাছ খেতেই ভালবাসে। তাই দুধ নিয়ে এলাম।"

দুধ থেকে বাবা-জীবন চাঙ্গা হয়ে ওঠেন। ওর ল্যাজের নিশান খাড়া হয় আবার! দুধ . বাতাসা আর অ্যাকোয়া-অ্যাস্‌পিরিনের একটা মিক্‌চার বানিয়ে ওকে দেওয়া হয়। দেখতে না দেখতে চুক্‌ চুক্‌ করে সমস্তটাই ও নিঃশেষ করে আনে।

তারপর তাজা হয়ে উঠতে আর দেরি লাগে না। চার পায়ে সোজা হয়ে সে দাঁড়ায়, পৃষ্ঠদেশকে একবার ধনুকের মত করে বাঁকিয়ে আনে। আকাশে তার বিজয় নিশান (স্বভাবতঃই যেটা সর্ব্বদা পিছন দিকেই!) মহাসমারোহে দুলতে থাকে। রোগীর এমন অভাবনীয় আকস্মিক উন্নতি লক্ষ্য করলে ডাক্তার আর নার্সের মনে আনন্দ-সঞ্চার স্বাভাবিক। আমি যত খুসী হলাম, বিনি ততোধিক।

আর বেড়ালের কথা বলাই বাহুল্য, পেশেণ্ট্ থেকে তখন সে ইম্‌পেশেণ্ট্ হয়ে উঠেছে।

তারপরে যা দৃশ্য দেখি, তা আমি জীবনে ভুলবো না। বেড়ালটা তার পেছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ায়, দাঁড়িয়ে মুক্তকচ্ছ হয়ে নাচতে সুরু করে। হেলে দুলে বাহু তুলে সে কী নৃত্য তার! আমি মুগ্ধ হয়ে দেখি এবং বিনিও। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কোমর বেঁকিয়ে সে কতো রকমের নাচ যে!

সহসা বিনিকে জিজ্ঞাসা করি—"এম্পায়ারে উদয়শঙ্করের নাচ দেখতে ওকে নিয়ে গেছলি নাকি? সঙ্গে গেছলো নাকি তোর?"

"গেছলোই তো!" বিনির জবাব পাই।

"তবেই হয়েছে!" আমি আশঙ্কা প্রকাশ করি—"এইবার সেই নটরাজ নৃত্যটা না লাগিয়ে দায় আবার!"

ওই একঘেয়ে নাচটা আমার দু'চক্ষের বিষ! নটরাজ এবং ব্যাঙনৃত্য নাচতে নাচতে অনেকবার আছাড় খেয়েছি ছেলেবেলায়। তখন কম্পিটিশন করে এই নাচটা হোতো আমাদের ছেলেদের মধ্যে।

"মন্দ কি! টিকিট্ লাগছে না তো!" এই বলে বিনি আমাকে উৎসাহিত করার প্রয়াস পায়।

বেড়াল গর্ব্বে-গর্ব্বিত বিনির মুখ তখন আত্মপ্রসাদের রসে টইটুম্বুর!

একটু পরেই পটপরিবর্ত্তন। বেড়ালটা হঠাৎ ভয়ানক ছুটোছুটি আরম্ভ করে। তড়িদ্বেগে ঘরময় ঘুরে বেড়ায়—এটা ফেলে ওটা ওল্টায়, তার তীব্র গতির সামনে যে আসে তাকেই ভূমিসাৎ করে। পাছে আমার সঙ্গে কলিশন্ বাধে, সেই ভয়ে আমি টেবিলের ওপর খাড়া হই। বিনিও আমার অনুসরণ করে ; কাছাকাছি একটা তাকে গিয়ে ওঠে।

অকস্মাৎ বেড়ালটা আড়াই হাত লাফিয়ে ওঠে আকাশে। তার ব্যবহার দেখে আমার পিলে চম্‌কে যায়, টেবিলকে নিরাপদ স্থান বলে মনে করতে পারিনে আর। আল্‌মারির পাশে এক কোণে গিয়ে জড়সড় হয়ে দাঁড়াই। বিনিকে বলি—"একি কাণ্ড রে?"

"উড়বে না তো?" বলে বিনি একটু থামে, "তোমার উপর রাগ আছে দাদা! সাবধান, শোধ তুলতে পারে হয়তো।"

"উল্‌টে মোনা দত্তের মতন এক শূট্ ঝেড়ে না বসে আমায়।" আমি বলি, "সেই ভয়েই তো এসে লুকিয়েছি রে!"

"উঁহু, কথাটি নয়, তাহলেই টের পেয়ে যাবে, তাহলেই তোমার দফা—"

তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারি কত বুদ্ধিমানের কাজ করেছি! পরমুহূর্ত্তেই বেড়ালটা টেবিলের উপর লাফিয়ে ওঠে, সেখানে আমাকে না পেয়ে ফুলদানিগুলোর ঘাড়ে পড়ে। তাদের ওপর

রাগটা ঝাড়ে। ওর নিদারুণ পদাঘাতে সেগুলো ধরাশায়ী হয়ে চুরমার হয়। এ যাত্রা বড্ড বাঁচা বেঁচেছি বুঝতে বেশি দেরি লাগে না। বিনিও সেই ইঙ্গিত দ্যায়—"তোমার ভয়ানক ফাড়া কাটলো দাদা! ফুলদানির ওপর দিয়েই চোট্‌টা গেলো!"

হাঁটাহাঁটি ছেড়ে বেড়ালটা তখন লাফালাফি লাগিয়েছে। এই গেলাস-কেসের ঘাড়ে গিয়ে পড়ে, এই বুক-শেল্‌ফের বুকে গিয়ে আছাড় খায়, এই দেরাজের সঙ্গে ধাক্কা লাগায়, টিপয়কে গিয়ে জড়িয়ে ধরে,—এইভাবে একাধিকের ঘাড় ভাঙে এবং অনেকেরই দফা সারে। অবশেষে বড় আয়নাটার বিপক্ষে নিজেকে পাঠায়—ওর মধ্যেকার প্রতিচ্ছবির সঙ্গে মারামারি কিম্বা কোলাকুলি একটা কিছু বাধাবার মতলবেই। চারিদিকে তছ্‌নছ্‌—ভাঙচুব—একটা খণ্ড প্রলয়! মহামারি ব্যাপার!

বিনি তাকের মধ্যে বসে কাঁপতে থাকে। আল্‌মারিকে সবিয়ে তার বাইরে অন্তর্হিত হবার চেষ্টা করি আমি! কেবল একটা চোখ বাইরে রাখতে হয় ওর গতিবিধিকে লক্ষ্য রাখার জন্যই। ওর দিকে নজর দেয়ার দরকার, আমি দেখি কিন্তু আমাকে যেন ও না দেখতে পায়। আমার ওপবই ওর বিষদৃষ্টি তো?

আলমারির নড়চড় হতেই ওর আড়াল থেকে একপাল ইঁদুর বেরিয়ে আসে, কিন্তু বেড়ালের তখন তাদের দিকে তাকাবার ফুরসৎ নেই—

সে তখন বিশাল ভূমণ্ডলে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে বেরিয়েছে। ইঁদুরগুলোও আদৌ ভয় কবে না, বেশ কৌতূহলের সঙ্গে তাকে লক্ষ্য করতে থাকে। বিনি আমার দৃষ্টি-আকর্ষণ করে—"ইঁদুরগুলোর মজা দেখেছো দাদা!" আমি জবাব দিই—" বেড়ালের কাণ্ডটা দেখছিস্‌। জন্মে এমন বেহায়াপনা দেখিনি!" বিনি আমার কথায় সায় দ্যায়—"হুঁ, অম্‌নি অম্‌নি সার্কাস দেখে নিচ্ছে ইঁদুরগুলো! টিকিট না কেটে—বিনে পয়সায়!"

বেড়ালটা এবার হুঙ্কার ছাড়ে। উচ্ছ্বসিত আনন্দ আর ব্যক্ত না করে পারে না। এক একটা মর্মন্তুদ বাণী ছাড়ে। "মিউ-ইউ-you-you-you!" —আমাকে মীন্‌ কবেই যেন গাল দিচ্ছে বলে আমার মনে হয়।

মা ব্যস্ত হয়ে ঢোকেন। বেড়ালটা তখন ডিগ্‌বাজি লাগিয়েছে।

"কিসের এত হুলুস্থূল রে! হোলো কী এর? এমন কবছে কেন?"

"স্ফূর্ত্তি হলেই এম্‌নি করে বোধ হয়।" আমি বলি।

"বেড়ালদের খেয়াল!" বিনি যোগ দ্যায়।

"উঁহু, কোনদিন তো এরকম করে না।" মা বেড়ালকে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করেন, কিন্তু মার কোন কথায় ও কান দেয় না। চিনতেই পারে না যেন মাকে। উপায়ান্তর না দেখে অগত্যা বাংলা ছেড়ে মা বিজাতীয় ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করেন। প্রথমে মিহি আওয়াজ "দ্যান—"মিউ"। কোনো ফল হয় না। তখন ভারী গলার ভরাট্‌ ডাক ছাড়েন—"ম্যাও।"

যেমনি না মার "ম্যাও ওর কানে যাওয়া, অম্‌নি ও এক নিদারুণ লাফ মারে। সেই এক লাফেই উন্মুক্ত জানালা সবেগে অতিক্রম করে নেপথ্যে সট্‌কান্‌ দ্যায়, ফুলের টবগুলো সব যায় ওর সঙ্গে!

"এ তো ভালো কথা নয়! না, মা ষষ্ঠী তাহলে চটেছেন নিশ্চয়!"

বলতে বলতে স্বস্ত্যয়নের উদ্দেশ্যে বোধ হয় পুরুতঠাকুরের উদ্দেশেই মা বেরিয়ে পড়েন।

আমি আল্‌মারির ফাঁক থেকে বেরিয়ে আসি, বিনি তাক থেকে নামে। পরস্পরের দিকে তাকাই। দু'জনেই চুপ করে থাকি। এর প্রিয়জনের অন্তর্ধান-জনিত এমনি দারুণ শোকে কী ভাষায় ওকে সান্ত্বনা দেবো?

অনেক পরে সদর রাস্তা থেকে বীভৎস এক ঐকতানের ঝট্‌কা এসে লাগে। কোনো প্রসেশন বোধ হয়—বন্যাদায় বা বন্য আদায়ের ফিকিরে! উঁকি মেরে দেখি—উঁহু, — সেই আয়োডিন-ঘটিত বেড়াল! বেড়াল বলে চেনবারই যো নেই—তার রঙ আর চেহারার এম্‌নি খোলতাই হয়েছে। আইডিনের ওপর রোদ লেগে কালো হয়ে এমন জমকালো হয়ে উঠেছে তখন্‌!

কি রকমেব একটা বিট্‌কেল আওয়াজে তাড়া করে ছুটেছে সবাইকে—আর তার ভয়ে পাড়ার যত কুকুর (সর্ব্বসাকুল্যে ডজন দেড়েক) ল্যাজ গুটিয়ে পঁই পঁই করে পালাচ্ছে। চেঁচাচ্ছে আর ছুটছে—ডাইনে-বাঁয়ে তাকাবার অবকাশ নেই তাদেব—প্রাণভয়ে সে কী প্রাণান্ত দৌড়।

বুঝলাম বেড়াল নয়, চেহারা আর আওয়াজেই তারা ভয় খেয়েছে। ভেবেছে, বেড়ালের মত অথচ বেড়াল নয়—ধাবমান এই মারাত্মক বস্তুটি কী? ভয়ের কথাই বটে। আর সেই ডাক! মিঁউ নয়, ম্যাও নয়, ধ্রুপদী চালে টানা কিরকম একটা সতেজ 'মিঁয়া-া-া ও'!

"মিঁয়া-া-া-া-া-আও!!" ওর মানে—মিঞারা এসো। এসে লড়ো একবার।

কিন্তু আসবে কি! মিঞারা কেউ দাঁড়াচ্ছেই না।

রাম-বিভ্রাট

জরাসন্ধ

ত্রিলোচন তেওয়ারী রামজীর ভক্ত। প্রথম নাতি হতেই তার নাম দিলেন বামচন্দ্র। তার কিছুদিন পরেই তিনি মারা গেলেন। উইল করে গেলেন, তার বংশে যত ছেলে হবে, তাদের নামেব প্রথম দিকটা হবে 'রাম' আর শেষটা কোনো দেবতার নাম।

বছর দুই না যেতেই রামচন্দ্রের একটি ভাই জন্মাল। তার নাম হল রামশশী। তারপব তেওয়ারীদের ঘরে যেন ছেলের বান ডাকল—রামহরি, রামকৃষ্ণ, রামগোপাল, রামশঙ্কব।

ছেলেদের বাপ মহাদেব তেওয়ারী মহাবিপদে পড়লেন। নাম যে আব পাওয়া যায় না। অথচ ছেলেরও বিরাম নেই। একটা মেয়েও কি হতে নেই? ক্রমে মহাদেব একেবার ভেঙে পড়লেন। মনে সুখ নেই, মুখে অন্ন নেই, চোখে ঘুম নেই। এদিকে শেষের ছেলেটির বয়স ছ'মাস হয়ে গেল, নাম তো রাখতেই হবে। মহাদেব পুঁথিপত্তব নিয়ে বসে গেলেন নাম খুঁজতে। রামবরুণ, রামবায়ু, রামব্রহ্মা, রামযম—দূর ছাই, একি আব নাম হল? হতাশ হয়ে একেবারে হাল ছেড়ে দিয়েছেন, এমন সময় এক ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে নমস্কার করলে, ''বাম রাম, মহাদেববাবু!'

মহাদেব একেবারে লাফিয়ে উঠলেন, 'রাম রাম, রাম রাম— পেয়েছি। ওঃ বাঁচালেন আপনি। আর একটু হলে তো পাগলই হয়ে যেতাম।' ছেলের নাম রাখা হল 'বাম রাম'।

মহাদেব গিন্নীকে শাসিয়ে দিলেন, 'সাবধান, এবার যদি ছেলে হয় সে হতভাগার আর নাম জুটবে না, তা বলে দিচ্ছি।'

গিন্নী দিন রাত দেবতাদের ডাকতে লাগলেন, কালীঘাটে পুজো মানত করলেন-- হে মা কালী, এবাব একটি মেয়ে দিও। কিন্তু কপালের লেখা কে খণ্ডাবে বল? বামজীর দয়ায় এবারও হল ছেলে। রামশঙ্কর ছুটতে ছুটতে বাবাকে খবর দিতে গেল। মহাদেব তাব মুখে একটা চড় কষিয়ে দিলেন তারপর একটা জামা আর ছাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। ছেলেরা এসে আগলে দাঁড়াল, কেঁদে-কেটে বলল, কোথায় যাও বাবা?

মহাদেব তাদের ঠেলে ফেলে দিয়ে চলে গেলেন।

ক্রোশ দুয়েক দূরে এক সাধু থাকতেন। মস্তবড় জ্যোতিষী। ক'টা ছেলে-মেয়ে, মাথায় ক'গাছা চুল, পরীক্ষায় ক'বার ফেল করবে, সব হাত দেখে টপাটপ বলে দেন। মহাদেব সোজা এসে একেবারে তার পা জড়িয়ে ধরে বললেন, 'সাধুজী, আমাব ....'

সাধুজী বাধা দিয়ে বললেন, 'উঁহু' তোমায় কিছু বলতে হবে না, কেন এসেছ আমিই বলে দিচ্ছি। একটা ফুলের নাম কর—

মহাদেব বললেন, 'গোলাপ ফুল।'

সাধু চোখ বুজে ধ্যান করলেন, তারপর বললেন, 'তোমার খুব বিপদ যাচ্ছে।' 'বিপদ বলে বিপদ!' মহাদেব চেঁচিয়ে উঠলেন, 'তাই তো প্রভুর শরণ নিতে আসা। এবারটি উদ্ধার

না করলে যে আর রক্ষা নেই। সাধু মহারাজের সেবার জন্যে আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যতটা সম্ভব সবই করব।' এই বলে মহাদেব নিবেদন করলেন, 'একটি নাম বলে দিতে হবে, যার প্রথমটা থাকবে রাম, আর শেষদিকটা দেবতার নাম।'

সাধু বলে যেতে লাগলেন, 'রামশঙ্কর, রামকৃষ্ণ, রামগোপাল—'

মহাদেব জানালেন, 'ও সবগুলোই রয়েছে, নতুন নাম চাই।'

তারপর জ্যোতিষীর গণনা শুরু হল। ঘরের সমস্ত মেঝেটা জুড়ে খড়ি দিয়ে আঁক কাটা হল। মহাদেব তেমনি বসে রইলেন। শেষটায় সন্ধ্যা হয়-হয়। এমন সময়ে সাধুজী মুখ তুলে বললেন, 'রামসিংহ'।

'রামসিংহ।' মহাদেব মাথা চুলকে বললেন, কিন্তু প্রভু, সিংহ তো কোনো দেবতার নাম নয়।'

সাধুজী গর্জে উঠলেন, 'তুমি মূর্খ, তাই তর্ক করছ। সিংহ যে পশুরাজ একথা তো জানো।'

'জানি প্রভু।'

'শাস্ত্র বলে, রাজা দেবতা, এটা তো অজানা নেই।'

'না মহারাজ।'

'সুতরাং সিংহও দেবতা।'

মহাদেব বাড়ি এসে ছোট ছেলের নাম জানিয়ে দিলেন, কিন্তু মনে হল, ঐটা কারুর পছন্দ হল না।

ক্রমে ছেলেরা বড় হল এবং সবাই পাঠশালায় যেতে শুরু করল। গণেশ পণ্ডিত এদের নাম নিয়ে বড়ই মুস্কিলে পড়লেন। কারণ, এতগুলো রাম তাঁর কিছুতেই মনে থাকে না। তখন তিনি নামগুলো দিয়ে একটা ছড়া তৈরী করলেন—

রামচন্দ্র রামশশী রামশঙ্কর রামরাম।
রামকৃষ্ণ রামহরি রামগোপাল রামসিংহ।।

ছড়া মুখস্থ চলল। পাশার আড্ডায় গণেশ পণ্ডিতকে আর দেখা যায় না। রোজ সন্ধ্যাবেলা কেরোসিনের আলো জ্বেলে দুলে দুলে শুরু করেন, 'রামচন্দ্র রামশশী'—ঘামে যখন গা ভিজে যায়, এরারুট মেখে আবার লেগে যান। এমনি করে নাম তো মুখস্থ হল, কিন্তু গোল মিটল না। কোন্ নামটা কার, এ সমস্যা রয়ে গেল। তার ফল হল এই যে, রামকৃষ্ণ দোষ করলে রামশঙ্কর মার খায়, আর রামগোপালকে আদর করতে গিয়ে রামরামের পিঠ চাপড়ে দেন। রামকৃষ্ণ ছেলেটা বেজায় দুষ্টু, পড়াশুনার ধার দিয়েও যায় না। রামশঙ্কর আবার তেমনি ভালোমানুষ, মন দিয়ে পড়াশুনা করে। পণ্ডিতমশায় বাড়িতে আঁক কষতে দিয়েছেন। রামকৃষ্ণ একটাও করতে পারে নি, রামশঙ্কর সবগুলোই করেছে। খাতাগুলো সবই পণ্ডিত মশায়ের টেবিলের উপর জড়ো করা রয়েছে।

পণ্ডিতমশায় একটা খাতা তুলে নিয়ে হাঁকলেন, 'রামশঙ্কর।'

রামশঙ্কর কাছে এল।

'বেঞ্চির উপর দাঁড়াও। একটা আঁকও হয়নি, না?'

'না স্যার, আমি তো সবগুলোই করেছি।'

'বটে, আমার সঙ্গে চালাকি! নাড়ুগোপাল হও, হও নাড়ুগোপাল।'

বেচারি রামশঙ্কর নাড়ুগোপাল হয়ে কাঁদতে লাগল। তারপর এল রামকৃষ্ণের পালা। তাকে ডেকে নিয়ে পণ্ডিত মশায় তার পিঠ চাপড়ে আদর করলেন আর বললেন, তার আজ

এক ঘণ্টা আগে ছুটি। সবাই অবাক হয়ে গেল। কিন্তু এই কথা জানল না যে, পণ্ডিতমশায় যখন তার রোজকার দিবা-নিদ্রাটুকু সেরে নেবার জন্যে টেবিলে পা তুলে, চেয়ারের পিঠে গা এলিয়ে দিয়েছিলেন, সেই সময়ে রামকৃষ্ণ এক ফাঁকে তার নিজের খাতার নাম কেটে রামশঙ্করের নাম আর রামশঙ্করের খাতায় নিজের নাম বসিয়ে দিয়ে এসেছিল।

ঘোষেদের গাছে ভালো লিচু হয়েছে। রামকৃষ্ণ একদিন সব সাবাড় করে এল। নিতাই ঘোষ এসে নালিশ করলে মহাদেবের কাছে। মহাদেব বললেন, 'কে খেয়েছে লিচু?'

নিতাই বললেন, 'কে আর খাবে? আপনার ঐ রামরাম।'

'কিন্তু রামরাম তো নেহাৎ ছোট, সে গাছে উঠতে জানে না।'

মহাদেবের কথা শুনে নিতাই বিরক্ত হয়ে বললে, 'তা হলে ঐ রামচন্দ্র খেয়েছে।'

'রামচন্দ্র! সে তো আজ তিনদিন হল মামার বাড়ি গেছে।'

নিতাই রেগে বেরিয়ে গেল। চোর ধরা পড়ল না।

এমনি ঘটনা প্রায়ই ঘটে। তারপর একদিন এক ভীষণ গোলমাল হয়ে গেল। সেই কথাই বলব।

মহাদেবের স্ত্রী এবার বুড়ো হতে চলেছেন। রান্না-বান্না, সংসারে এত কাজ আব পেরে ওঠেন না। একদিন কর্ত্তাকে বললেন, দেখ, আমাদের রামচন্দ্র তো শত্তুরেব মুখে ছাই দিয়ে সতের-আঠার বছরের হল। এবার একটি বৌ এনে দাও।'

কর্ত্তা দেখলেন, কথাটা ঠিকই। তারপব কনে দেখা চলল। ক্রোশ দশেক দূরে মধুপুরের বৃন্দাবন মিশ্রের মেয়েটি বেশ পছন্দমত। বয়স সবে বারো। এরই মধ্যে সুর করে তুলসীদাসের রামায়ণ পড়ে, আর কাজ-কর্মে সে হীরার ধার। ঐ মেয়েই চাই। তেওয়ারী গিয়ে মেয়ে পছন্দ করে এলেন। বৃন্দাবনও কথা দিলেন, একদিন ছেলে দেখতে আসবেন। ছেলের নামটি জেনে নিলেন—রামচন্দ্র।

দিন চারেক পরের কথা। রবিবার, ইস্কুল ছিল না। তেওয়ারী কোথায় বেরিয়েছিলেন, বৃন্দাবন এসে হাঁক দিলেন, 'রাম বাড়িতে আছ? রাম!'

ডাক শুনে একসঙ্গে আট ছেলে বেরিয়ে এল।

বৃন্দাবন বললেন, 'রাম বাড়ি আছে?'

আট ছেলে একসঙ্গে বললে, 'কি বলুন, আমি রাম।'

'মানে! তোমরা তো ভারি জ্যাঠা ছেলে দেখছি। সবাই রাম! ইয়ার্কি দেবার আর জায়গা পেলে না?'

আট ছেলে মিলে বোঝাতে গেল, তারা ইয়ার্কি দিচ্ছে না, সত্যিই তারা সকলেই রাম। ফল হলো উল্টো। বৃন্দাবন মিশ্র রেগে বেরিয়ে গেলেন। প্রতিজ্ঞা করে গেল, মেয়ের গলায় কলসী বেঁধে জলে ডুবিয়ে দেবেন, সেওভি আচ্ছা, তবু এমন বাড়িতে কখনও বিয়ে দেবেন না।

চৈত্রমাস, বেলা দুপুর হয়ে গেছে। রোদ তো নয়, যেন আগুনের হল্কা। মহাদেব বাড়ি ফিরছেন। দূর থেকে দেখলেন, একজন লোক হন্‌হন্ করে চলে যাচ্ছে। একি! এ যে বৃন্দাবন। এগিয়ে গিয়ে সংবর্দ্ধনা করে বললেন, 'বেয়াই যে! আসুন, কখন এলেন?'

বৃন্দাবন আগুন হয়েই ছিলেন, ছিট্‌কে উঠে জবাব দিলেন, 'থাক আর ভদ্রতা জানাতে হবে না। এদিকে ছেলেদের তো শিখিয়ে রেখেছেন অপমান করতে।'

মহাদেব তো শুনে অবাক্। অপমান! বেয়াই বলে কি? তারপর সমস্ত ঘটনা শুনে চৈত্র মাসের মাঠের আগুন তাঁর মাথায় গিয়ে উঠল। নিঃশব্দে বাড়ি এসে শোবার ঘর থেকে একখানা খাঁড়া নিয়ে বেরিয়ে এলেন উঠানে। বললেন, 'কই কোথায় গেল পঙ্গপালের দল? সব কেটে শেষ করব।'

তাঁর অগ্নিমূর্তি দেখে যে যেদিকে পারল, পালাল। গিন্নী ছুটে এলেন। চেঁচামেচিতে পাড়ার লোক জড় হল। তেওয়ারীকে কি কেউ ধরে রাখতে পারে? ক্রমাগত বলতে লাগলেন, 'ছেড়ে দাও তোমরা, রক্তবীজের দল আমি আজই সাবাড় করব। আর সহ্য হয় না।'

তাবপর এলেন মোড়ল। মহাদেবকে বসিয়ে ঠাণ্ডা করে বললেন, 'ওদের কেটে কি হবে? তার চেয়ে ওদের 'রাম' কেটে দাও। দেখবে কোনো গোল থাকবে না।'

কথাটা সকলেরই মনে ধরল। মহাদেব তৎক্ষণাৎ রাজী হলেন।

পরদিন মস্ত যজ্ঞের আয়োজন হল। গ্রামের দশজন এসে বসলেন, পুরোহিত এসে মন্ত্র পড়ালেন, 'আজ থেকে আমার ছেলেদের 'রাম' কাটিয়া দিলাম।'

কিন্তু ছেলেদের মুখ ভার হয়ে রইল। তাদের নামগুলো যে বিশ্রী ছোট হয়ে গেল। মোড়ল বোঝালেন, 'না-না তোমাদের নামের শেষের দিকটা যে দেবতার নাম রয়ে গেল। আজ থেকে তোমরা দেবতা।'

তাই নাকি! শুনে তাদের আনন্দ আর ধরে না।

পয়লা আষাঢ়

গোপাল হালদার

আমাদের সন্ধ্যাবেলাকার আড্ডায় আমরা এই পয়লা আষাঢ়ের উৎসবটা সমাপ্ত করতুম। মন্দাক্রান্তার লীলা-চঞ্চল গতির ভিতরে। সংস্কৃতে যে আমরা সবাই খুব পটু ছিলুন তা নয়,— তরুণ হৃদয়ের অনির্দেশ আকুলি-বিকুলিটাও আমাদের অনেক আগেই গৃহ-কোণের এক-একটি অঞ্চলের প্রান্তে বাঁধা পড়ে গিয়েছিল , — তবু কত কালের মৃত কবির সেই পরম আদরের দিনটিকে আমরা শ্রদ্ধা না জানিয়ে পারতুম না। তাই, আমরা পয়লা আষাঢ়ের সন্ধ্যাটিকে 'মেঘদূতের' কবির কণ্ঠে অভিনন্দন করতুম।

ভবেশ তখন গলাটা শাণিয়ে মেঘদূতখানা নিয়ে বসেছে,—এমনি সময়ে বঙ্কিম ঘরে ঢুকেই বললে, "ওহে, দাঁড়াও।"

ভবেশ বিরক্ত হয়ে—"মাটি করলে। গোড়াতেই একটা বাধা" বলে মুখ তুলে চাইল।

"আজ আর মেঘদূত নয়, তার চেয়ে এই পয়লা আষাঢ়ের সন্ধ্যার জন্য নতুন একটা কিছু এনেছি।"

"কিন্তু মেঘদূত ছাড়া কি 'আষাঢস্য প্রথম দিবসটা' ব্যর্থ করব না কি?"

"ব্যর্থ হবে না হে। এ কাহিনীটির ভিতরে কালিদাসের কবি-কণ্ঠের সাড়া পাবে না সত্য,—কিন্তু তেমনি একটা ব্যথিতের দীর্ঘশ্বাস পাবে। তবে এটাতে শিপ্রার তীর নেই, অলকাপুরী নেই , তার কারণ, এর ঘটনাস্থল হচ্ছে কলকাতা, আর এর কাল বর্তমান।"

"সংক্ষেপে, সেই উজ্জয়িনী ও অলকা ছেড়ে আসতে বলছ কলকাতার ধূলির ও ধোঁয়ার রাজত্বে।"

"সেটা ঠিক। কিন্তু ঘটনাটা সত্য। এই আষাঢ় সন্ধ্যায় একদিন সেকাল ছেড়ে একালে ফিরে এলে, আমাদের আড্ডায় নতুনত্ব দেখা দিবে।"

সংস্কৃত আমাদের অনেকেরই বুঝতে কষ্ট হ'ত, - অনেকটা তারই জন্য, আর অনেকটা একটা সত্যিকার কাহিনী শুনবার আশায়, — আমরা বঙ্কিমের গল্প শুনতে রাজি হলুম। ভবেশ চটে গিয়ে, আমাদের মডার্ন কালের দিঙনাগাচার্য আখ্যা দিয়ে, চুপ করে গোঁ ধরে বসল।

বঙ্কিম পাঞ্জাবীর পকেট থেকে একতাড়া কাগজ বের করে বললে, "আমার বন্ধু নীরেন্দ্রকে তোমরা জানো একটা ছিট-গ্রস্ত প্রফেসর বলে। তোমরা দেখেছ, কাব্য ও কবিতার সে সমস্ত জীবনটা ধরে স্তুতি করে এল , অথচ লোক-সমাজে তার বে-রসিক নাম বেড়েই যাচ্ছে। তার কারণ, যে তরলতা আমাদের পাঁচজনার কাছে রসিকতা নামে বাহবা পায়, নীরেন্দ্রের সুগভীর সাধনার নীচে তা কবে তলিয়ে গেছে! আমাদের আড্ডায় সে একদিন এসেছিল , কিন্তু তোমরা দেখেছ, কেমন বিশ্রী ঠেকেছিল তার বোবার মত মুখ বুজে থাকাটা। তবু যে আমি তার সঙ্গ ছাড়তে পারি নি, তার কারণ, আমি তার কলেজ জীবনের বন্ধু, —আর তাই

বেশ জানতুম, আজকের এই স্বল্পভাষী গম্ভীর-প্রকৃতির কাব্যকীটটি চিরদিন এমনি ছিল না, — তার উজ্জ্বল হাসি তরঙ্গের নীচে তলিয়ে না যেত এমন লোক আমার চোখে পড়ে নি। কলেজের অধ্যাপনা তাকে গ্রাস করে ফেলেছে—এ কথা আমি অনেক দিন বলেছি, — শুনে সে মৃদু হাসত।

তার আশে-পাশে যে সব লোক ঘুরে বেড়াত, তাদেব বেশীর ভাগই তার সাহিত্যের ছাত্র। বন্ধুদের মধ্যে আমিই শেষ পর্যন্ত টিকে আছি। আমার ধৈর্য তাকে জয় করেছে; — তার আগল দেওয়া হৃদয়-দুয়ারটার ফাঁকে মাঝে মাঝে আমার দৃষ্টি-নিক্ষেপের অবসর জুটেছে,— সেও আমায় দিয়েছে।

আজ সকালে স্নান করতে যাওয়ার মুখেই একটা চিঠি এসে পৌঁছাল। নীরেন্দ্র লিখেছে, বিকালে একটু বেলা থাক্‌তেই আমি যেন তার ওখানে চা খেতে যাই। সমস্ত কাজের অন্তরালেও আমার তার কথাটা মনে জাগছিল। তাই বেশ সকাল করেই কোর্ট থেকে ফিবে তার বাড়ী গেলুম। দেখলুম, নীরেন্দ্র আমার অপেক্ষায দুযারে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হল, অনেক কাল পবে যেন তার মুখে সেই পুরোনো সরসতার অনেকটা আজ ফিরে এসেছে। তার কথা বার্তার ভিতর দিযেও যেন আজ একটা স্ফূর্তির সুব বাজছে। আমি মনে মনে বেশ একটু আবাম পেলুম।

নীরেন্দ্র আমাকে ধরেই তার পড়বার ঘবে নিযে গেল। জীবনে তার একমাত্র passion হযে উঠেছিল পড়া আব বই, তবু আমি তার বই-এর সংখ্যা দেখে চমকে গেলুম। কথাটা তুলতে না তুলতেই সে বাধা দিয়ে বলল, 'তোমাকে আমার বই দেখাবার জন্য ডাকি নি।'

'তা হয ত ডাক নি। কিন্তু বই-ই যখন দেখছি, তখন তার কথাটা বলাই স্বাভাবিক।'

'সে তুমি আব একদিন এসে বেশ ধীরে-সুস্থে বিবেচনা করে বোলো। কিন্তু আপাততঃ আমাব আব একটুকু দরকারী কাজ ঠেকেছে।' — বলে, ড্রয়াব থেকে এই কাগজের তাড়া বের করে বললে, 'শোন, এটা একটা গল্প। এ তোমার না শুনলেও চল্‌ত, কিন্তু আমার চল্‌ত না। কেন না, একজন অন্তত লোক চাই, যার কাছে হৃদয়াবেগগুলা কিছু না কিছু ঢেলে দেওয়া যায়। তুমি, ইচ্ছা হলে, এটা যাকে খুসী তাকে বল্‌তে পার; কিন্তু আমার সে সুবিধা নেই, সে সৌভাগ্যও নেই।'

এই কথা বলে নীরেন্দ্র আমাকে চা-এর পেয়ালাটা এগিয়ে দিয়ে, প্লেটে করে খানকত লুচি ও কিছু মিষ্টি সাজিযে বলল, 'তুমি খেতে থাক, —আমার চেয়ে দেখবার মত অবসর আর থাক্‌বে না'—তার পব তাব কাহিনী চলল। আমারই একজন বন্ধুব জীবনের বলে হোক্, — আব সত্যসত্যই এর অন্তরের নিজস্ব সৌন্দর্যে হোক, —এ কাহিনী আমায় এমনি মুগ্ধ করেছে যে, আজকের সন্ধ্যায় তোমাদের তা না শোনাতে পারলে আমার নিস্তার নেই।'

বঙ্কিম পড়তে লাগল, — আজ সাত বছর ধরে ক্রমাগত হানা-হানি রণারণির পরে মনে হচ্ছে, শান্তিব মোহনায় এসে পৌঁছেছি। আজ বিশ্বাস হচ্ছে, এই সাত বছর যে ছোট একটু ঘটনার জের টেনেছে, তাকে আমি সত্যিকার দৃষ্টিতে দেখতে পারব। তাই এমনি করে একটা গোপন গুহার ওপর থেকে কুয়াসার পর্দাটা সরিয়ে নিতে সাহসী হচ্ছি।

মফস্বল কলেজের চাকুরিটি ছেড়ে যে আমি কলকাতায় এলুম, তার কারণ, কলকাতায় খুঁজলে পরে মনের মত একটা মনোজগতের আবহাওয়া পাওয়া যায়, কিন্তু মফস্বলে অনেক স্থানেই তা মেলা ভার। এই মহানগরীকে আমি বারবার প্রণাম করি, আমি জানি, সে আমার শরীর-মনে কতখানি ঘূণ ধরিয়েছে; কিন্তু তার বাইরেও আমি শান্তি পাই নি।

যে বাড়ীটাতে উঠলুম, সৌভাগ্যক্রমে তার খান-তিন বাড়ী পরেই পাওয়া গেল একটি চেনা লোককে। — সে অশোক। সরকারী কাজে তার বাবা কয়েক বছর আমাদের ওই পূর্ব-

বাংলার সহরটাতে ছিলেন , এবং আমাদের পাশের বাড়ীতেই ছিলেন। অশোক পড়ত আমার দুটো ক্লাস ওপরে ; — কিন্তু তাতে আমাদের অবাধ মেলামেশার কোনো দিন অসুবিধা হয় নি। তার বাবা ভগবতীবাবু তখন পেন্‌সন্‌ নিয়ে কলকাতায় ছিলেন , আর অশোক তখন হাইকোর্টে যাওয়া-আসা করছিল, —অদূর-ভবিষ্যতে মুন্সেফ হবার আশায়।

অশোকের সাথে দেখা হতেই, সে আমায় বাড়ী নিয়ে গিয়ে, তার মা ও বাবার সামনে হাজির করলে। —এমন কি, সে ছেড়ে দেওয়ার সময় বার-বার আফশোষ করলে যে, তার স্ত্রী এখন বাপের বাড়ীতে, —নইলে সে শুভ কার্যটুকুও বাদ যেত না। পরে অবশ্য সে কর্মটুকু যত শীঘ্র সম্ভব হয়েছিল, কিন্তু তার পূর্বেই তার মা ও বাবা আমাকে একেবারে আপনার করে নিয়েছিলেন। আমি এই বিদেশে অসহায়,— কেন না আমি অবিবাহিত,— জীবনটা তাঁদের যেমনি উদ্রেক করেছিল দয়া, তেমনি উদ্রেক করেছিল স্নেহ। ও-দুটি জিনিস দিয়ে তাঁরা একেবারে আমায় টেনে নিলেন।

ভগবতী বাবুর পরিবারে বছর-দুই আগে একটা ঝড় বয়ে গিয়েছিল, — সে যখন তাঁর মেয়ে অণিমা বিধবা হয়। অণিমাকে আমরা দেখেছিলুম, বছর দশ-বারোর একটি চঞ্চল, সুন্দর, বালিকা, —চঞ্চল কিন্তু তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। আর সেদিন তাকে দেখলুম, বিশ বছরের এক শোক-তপ্ত বিধবা, —যার ফুটন্ত যৌবন বিষাদের বাতাসে ঝরে পড়ে গেছে।

অশোকের কাছে শুনলুম, অণিমা যখন স্বামী-হারা হয়ে ফিরে আসে, তখন ভগবতীবাবু তাকে আবার বিয়ে দেবার ইচ্ছা করেছিলেন। তিনি বিয়ে প্রায় ঠিক করেছিলেন-ও। সমস্ত যখন প্রায় ঠিক, তখন তিনি অণিমাকে ডাকলেন তার মতামত শুনতে। নত শিরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে, সে অশ্রু-টল-টল আঁখি দুটি তুলে শুধু দৃঢ় স্বরে বললে, 'না'। সে 'না' ফিরলো না। ভগবতীবাবু হার মান্‌লেন। তার পর থেকে অণিমা তার বাবার কাছে সংস্কৃত শিখতে সুরু করে দিলে। এখন তার কাজ হচ্ছে, দুপুরে ও রাত্রে বাবাকে গীতা ও রামায়ণ পড়ে শোনানো, আর দিনের বাকী সময়টুকু ইংরাজি শেখায় ও ধর্মগ্রন্থ পাঠে কাটানো।

অণিমার সাথে আমার কথাবার্তা চল্‌ত মন্দ নয় , কিন্তু তা একটু ঘনিয়ে উঠ্‌ল এমনি করে।—

অশোকের ঘরে বসে আমাদের তর্ক চল্‌ছিল। —এমনি সময়ে সে ঘরে ঢুকল। একটু চমকিত হয়ে সে অশোককে বল্‌লে, "আর একটা নতুন কিছু বই দাও, দাদা।"

"কি বই দোব, বল। আচ্ছা, এই যে প্রফেসর আছ, —বল ত একখানা বই-এর নাম।"

আমি বেশ একটু লজ্জিত হলুম।

"সত্যি বলছি হে, কি বই পড়তে বলব, বল।"

"তুমিই একটা ঠিক কর।"

"আমি পারলে আর তোমায় বলছি কেন?"

বেচারী অণিমা দেখছিল, মাঝখান থেকে তার কথাটা মাঠে মারা যাচ্ছে।

"যা হোক, ভালো দেখে একখানা বই ঠিক করে দিন আপনারা" বলে সে আমার দিকে তাকাল।

অগত্যা আমাকে জিজ্ঞাসা করতে হল, "আচ্ছা, আপনি Pilgrim's Progress পড়েছেন?"

"ওকে ও আপনি!" বলে অশোক সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে তাকাল। আমি অপ্রতিভ হয়ে 'হাঁ' 'না' করতে লাগলুম। এমন সময় অণিমা বল্‌লে, "না, Pilgrim's Progress আমি পড়ি নি।"

"তা' হলে ওটা পড়ুন না? কি বল অশোক?"

"নিশ্চয়ই"! বলে অশোক বললে, "সাধে কি বলেছিলুম হে প্রফেসর! ওটা তোমারই জুরিস্‌ডিক্‌সন।"

তার পর থেকে অণিমা একেবারে আমাকেই ধরে বসত। সাহিত্যে আমার যতই রুচি থাকুক, সদুপদেশভরা সাহিত্যের খোঁজ আমি কমই রাখতুম। In Imitation of Christ ও Bible এর গুটিকয় Psalm ছাড়া ইংরেজি সাহিত্যের আর কোনো গুরু-গম্ভীর কথাই আমায় বড় বেশী আনন্দ দিতে পারে নি। কাজেই অল্প ক'দিন যেতে না যেতেই আমায় মুস্কিলে পড়তে হল। নিত্য-নতুন ধর্ম-কাহিনীর খোঁজ না পেয়ে, আমি একদিন অণিমাকে Les Miserables খানা পড়তে বললুম। সে শুনেছিল, ওখানা উপন্যাস। উপন্যাস সে পড়তে চায় না জেনে আমি বললুম, "দেখ, নাটক বা নবেলের মধ্যে যে শুধুই কতকগুলো অকেজো গল্প থাকে, তা নয়। অনেক নবেল আছে, যদিও সেগুলো প্রধানত নবেলই, তবু নীতিকথায়ও তাদের জুড়ি মেলে না। Les Miserables তেমনি একখানা বই , — একটা সুন্দর অথচ বৃহৎ আদর্শের বাণী ওর বুক ছাপিয়ে উঠেছে।"

অনেক কথায় সে নবেল পড়তে স্বীকার হল। Les Miserables নিয়ে সেদিন সে প্রস্থান করলে। আজ পর্যন্ত এমন লোক আমার চোখে পড়ে নি—সংক্ষিপ্ত অনুবাদেব ভিতর দিযেও ফরাসী সাহিত্যের অমর উপন্যাসখানি যাকে মাতিয়ে না দিয়েছে। নবেল পাঠে অণিমার যতই না বিতৃষ্ণা থাক, তাকে স্বীকার করতেই হল, ভারি কথাব বহরে যে সব নীতি-কথা লোক-সমাজে আদব পায়, তাদের চেয়ে এই নবেলখানার সুব কোনো নীচু সপ্তকে বাঁধা নয়। এবাব তাকে আর একখানা বই দিলুম— বোধ হয় Quo Vadis

এই রূপে ধীরে ধীরে কখন যে সে নবেলেব একজন ভক্ত হয়ে দাঁড়াল, তা আমার-ও নজরে পড়ে নি, তাব-ও খেয়াল হয় নি। তখন নবেল আর বিশেষ একটা শ্রেণীর মধ্যে বদ্ধ বইল না, — কোনো একটা মরালের খোঁজে সে নবেলের দিকে ধেয়ে যেত না। অতীতের ও বর্তমানের, দেশী ও বিদেশী সমস্ত নবেলই তখন অণিমা একমনে পড়তে শুরু করলে।

ইতিমধ্যে আমারও কখন একটা অভ্যাস দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। বিকালের দিকে আমি প্রায় প্রতিদিনই অশোকদেব বাড়ীতে অণিমাব পড়াব অজুহাতে গিয়ে হাজিব হতুম। নবেল পড়াটা কঠিন নয়, কিন্তু বিদেশী ও স্বদেশী কবিদের কবিতা বোঝা সব সময় সহজ নয়। তাই অণিমাকে আমাব বিকালেব দিকে একটু Shakespeare, Shelley, Browning, ও ববীন্দ্রনাথ আদির চর্চায় সাহায্য কবতে হ'ত। তাই, আমাব বিকালবেলা তাদের বাড়ীতে না গেলেই চলত না। আমাদের আলোচনায় মাঝে-মাঝে অশোক এসে জুটে পড়ত,— তাতে তর্কটাব জোর বাঁধত বেশী। আমাব সহযোগী বন্ধুর দল বলত যে, বিকালেব দিকে না সিনেমায়, না ময়দানে, কোথাও আমাকে আব দেখা যায় না।

একদিন ভগবতীবাবু আমাদের বললেন, " দেখ, তোমরা কেবল বিদেশের রত্নই খুঁজলে। আমাদের দেশী সংস্কৃত জিনিসগুলো যাচাই করে দেখলে হত না?"

কলেজে সংস্কৃত সাহিত্যে আমার কম অনুরাগ ছিল না। আমি বললুম, "তা ঠিক। কিন্তু অণিমা ত শুনেছি গীতা রামায়ণ আদি অনেক সংস্কৃত বই-ই পড়েছে।"

· "তা' ছাড়াও ত ঢের সংস্কৃত বই আছে— সেগুলো তোমরা ওকে পড়তে সাহায্য করো না?"

"সংস্কৃত সাহিত্যের ধর্ম ও নীতি-কথাব আড়ম্বর আমি পড়ি নে,—পড়তে আমার ভালো লাগে না। একমাত্র কালিদাসের মত জন-কয় কবি আমায় পরিপূর্ণ আনন্দ দিতে পেরেছে। তাঁদের কিছু-কিছু পডতে আমি সাহায্য করতে পারি।"

ভগবতীবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "আচ্ছা, কালিদাস তুমি পড়াতে চাও পড়াও। আমি দেখি, দুপুরে আরগুলো নিয়ে ওকে পড়াতে পারি কি না।"

সেদিন থেকে সুরু হ'ল সংস্কৃতের পালা।

ইতিমধ্যে একদিন অশোকের স্ত্রী সরোজ এল। তার বয়স বছর আঠারো। অনেক আবেদন, নিবেদন ও সলজ্জ হাসির ভিতর দিয়ে তাব সাথে-ও আমার পরিচয় জমে উঠ্‌ল। বিকালে গৃহকর্মের অন্তরালে সময় পেলেই সে এসে আমাদের সাথে জুটত। সে সাহিত্যালোচনার বড় বেশী যে রসদ যোগাত তা নয় ; তবে সে থাক্‌লে, বহস্যালাপে, আলোচনাটি কালেজি হ'ত না, — বেশ একটু মধুর রসে ভিজে উঠ্‌ত। আমার পঁচিশ বছরের অবিবাহিত জীবনটার পিছনে যে রোমান্স কোথায় আছে, তা খুঁজে বের করতে সে যতই উদ্‌গ্রীব হ'ত, আমি ততই তাকে বিঁধে মারতুম হাসির রঙ্গে। মোটের উপব, সন্ধ্যাগুলো রাঙা হ'য়ে উঠ্‌ত।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা অণিমা শকুন্তলা পড়ছিল। আমরা দুজন ছাড়া সে ঘরে আর কেউ ছিল না। পঞ্চমাঙ্ক পড়া হচ্ছিল , আমি হঠাৎ বলে ফেললুম, "আমাব মনে হয়, মানুষেব স্বভাবই এই—প্রিয়জনকে দুদিন না দেখলেই ভুলতে চাওয়া, আবার সে ভুলেব জন্য কেঁদে খুন হওয়া।"

অণিমার সাথে যে মানুষের জীবনেব এই দিকটা নিয়ে তর্ক চলে না, তা আমি জানতুম, আর এই কথাটি যে সাক্ষাৎ-সূত্রে শকুন্তলার আখ্যায়িকার সাথে জড়িত নয়, তাও আমি স্বীকাব করি। কিন্তু মানব মন যে অদেখা অলি-গলির ভিতর দিয়ে যাতায়াত কবছে, লজিক্ তার সমস্ত বিধি-নিয়ম নিয়েও তার সন্ধান পায় না। কাজেই, কথাটা ফস কবে মুখ থেকে বেরিয়ে গেল।

অণিমা একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলে, "এই মানুষের স্বভাব?"

আমি কথা ফিরাতে পারলুম না।—"আমার ত সেইরূপই মনে হয়।"

কিছুক্ষণ মুখ নুইয়ে থেকে সে ধীরে-ধীরে বললে, "হয় ত তাই। আমাব নিজের ও একদিন মনে হয়েছিল যে, হৃদয়ের ভাবের ধারাটা এক মুখেই চলে। আজ মনে হচ্ছে, সে চলে ঘূর্ণীপাকে।"

আমি জিজ্ঞাসু ভাবে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলুম।— "আমার স্বামীব ফটোখানি আমি আগে-আগে স্নানের পর প্রতিদিনই দেখতুম। সেদিন হঠাৎ একটা কথা আমায় সে ফটোখানির বিষয়ে সচেতন করে তুললে। তোরঙ্গটা খুলতেই দেখলুম,— ক'দিন ধরে কিসেব তাড়ায় আমার তা দেখবার আগ্রহটা কমে এসেছিল,—ফটোখানি অনেকগুলো নবেলেব তলায় ঠাঁই নিয়েছে।"

অণিমার সেদিনকাব অকপট কথাগুলো আমাকে সমস্ত রাত্রি বিনিদ্র করে বাখল। সেই প্রথমবার আমি সমস্ত হৃদয় দিয়ে তার দুর্ভাগ্যের ভারটাকে একবার অনুভব করতে চাইলুম। একজন হিন্দু নারী, বিধবা, — তার সম্মুখে রযেছে তার প্রচণ্ড যৌবন, —বিশাল প্রতপ্ত মরুভূমির মত , —তার চোখের সামনে জাগছে তাবই বয়স্কা শত-শত রমণীর জীবনের বর্ণোজ্জ্বল ছবিটা,—ভগবান যার ওপর কোনো অভিশাপের মসী-রেখাই টেনে দেন নি। আর সে? তার জীবনে নেমে এসেছে এক নিষ্ঠুর অকাল-সন্ধ্যা!

বড় একটা আদর্শ মানুষকে টানতে পারে, আমি মানি , কিন্তু সে টান চিরদিন বজায় থাকে না। সে আদর্শকে সে দেখে সম্ভ্রমের চোখে,—শ্রদ্ধায় অবনত শিরে। কিন্তু প্রতিদিনকাব তুচ্ছতম জিনিসেরই প্রতি মানুষের আসল টান। তাকে দেখে সে ভালোবাসার চোখে,— বিমুগ্ধের দৃষ্টিতে। বড়কে মানুষ গ্রহণ করে বুদ্ধি দিয়ে,—আর ছোটকে প্রাণ দিয়ে।

পরদিন থেকে আমি আমার সমস্ত হৃদয় ঢেলে দিলুম, তার অশান্ত চিত্তে একটু শান্তি সেচনের আশায়। আমার সমস্ত চপলতা, সমস্ত হাসি-রঙ্গ হঠাৎ উপ্‌ছে গেল ; তার স্থলে অণিমা পেলে একটি করুণ ক্রন্দন, —একটু আন্তরিক সহমর্মিতা। আমি দেখেছি, শোকাচ্ছন্ন হৃদয় দরদী প্রাণকে চিনে ফেলে,— সে যতই মৌন হোক্ না। আমাকে অণিমা তেমনি গ্রহণ করলে। সবোজ বার-বার নাড়া দিয়ে দেখলে আমার হাসির উৎসেব মুখে কোথায় পাথর চাপা পড়েছে , অশোক বার-বার ঠোকর দিয়ে দেখলে, তা শতগুণ করে ফিরিয়ে দিতে আমার আর আগ্রহ নেই। এমন একটা জাগ্রত বেদনাতুর হৃদয়কে দেখেও যে তাবা দেখত না, এতে আমি যেমনি হতুম দুঃখিত, তেমনি হতুম রুষ্ট। একটি প্রাণের কথা ভাবতে বসে আমি ভুলে গিয়েছিলুম যে, আর দুটি প্রাণ তখনো তরুণ, তখনো সবুজ।

একদিন হঠাৎ আমার হাতে একখানা ফটো দিয়ে অণিমা বললে, "এই দেখুন, আমার স্বামীর ফটো।"

আমি দেখছিলুম, বছর বাইশেব একটি তরুণ যুবক,— বেতের চেয়ারে বসে, একটা পায়ের ওপর একটা পা তুলে , পাশেই একগাছি ছড়ি ও হাতে একখানা বই। তার গায়ে ঢোলা হাতার পাঞ্জাবী ও একখানা শাদা চাদর। বেশ দেখতে। আমি আনমনে দেখছিলুম, এমন সময অণিমা বললে, "দেখুন ত, এরূপ কোনো চেহাবা আপনার মনে আসে কি না?"

আমি আশ্চর্য হলেম, কিন্তু কিছুই মনে করতে পারলুম না।

"এর পোষাক-পরিচ্ছদেব কোনো কায়দাব সাথে-ও কি আপনাদের কাযদা মেলে না?"

আমি লক্ষ্য করে বললুম, "একমাত্র চাদর জড়ানোর ধরণটি, আব পাঞ্জাবী ও চশমা— এ তিনটিব সাথে একটু মিল দেখা যায়।"

অণিমা অন্য দিকে চোখ রেখেই বললে, "মানুষ তার নিজেব চেহাবা ঠিক্ বুঝে উঠতে পাবে না। আমার নিজের ফটো দেখলে বোধ হয় আমিও নিজেকে চিনতে পারতুম না।"

আমি তার মুখেব দিকে তাকালুম ; কিন্তু সে মুখ ফিরাল না, — দেখাল, যেন এ একটা অতি সাধারণ মন্তব্য। মাথাটা নুইয়ে আমি কিছুক্ষণ তার অর্থ উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা কবলুম। কিছুই ঠিক্ পাওয়া গেল না। চোখ তুলতেই দেখলুম, সে আমার মুখের উপর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিটি মেলে বসে আছে।

পরদিন সমস্তটা দিন আমি ভাবলুম। বিকালের দিকে একখানা চিঠি পাঠিযে দিলুম, "আমার শরীব ভালো নেই , আজ যেতে পারব না।" সন্ধ্যা যেতে না যেতেই অশোক এসে হাজির , — "কি হে, ব্যাপার কি? কি অসুখটা বল, দেখি, শুনি? বাড়ী ফিবতেই ত অণি বললে তোমার অসুখ।"

"না, তেমন কিছু নয়। এই কেমন একটু জ্বর-জ্বর।"

"তা স্নান-ও ত করেছ , আর তোমাব চাকবই ত অণির কাছে স্বীকার করেছে, তুমি আজ কলেজে গিয়েছিলে।"

"দুপুরের দিকেই শরীরটে খাবাপ বোধ হল। প্রথম দুটো ঘণ্টামাত্র আজ ক্লাস ছিল। তাতে কোনো কষ্ট হয় নি।"

অশোক আর বেশী তাড়া দিলে না। আমি বাঁচলুম। ঘণ্টা-খানেক গল্প করে সে সকাল-সকাল বিদায় নিলে। বলে গেল, কাল কেমন থাকি যেন অতি অবশ্য জানাই। অথচ, সত্য-সত্যই সে যখন আমাকে না-যাওয়ার জন্য বেশী তাড়া দিল না, তখন বুকের ভিতর কোন জায়গায় যেন কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলুম।

পরদিনই আমি অশোকদের বাসায় আবার গেলুম। প্রথম-প্রথম কেমন যেন একটু দ্বিধা নিয়ে যেতুম, কিন্তু আলাপের ভিতর দিযে তা শীঘ্রই ধুয়ে-মুছে গেল।

পয়লা আষাঢ়। সেদিনকার কথা আর আমি ভুলব না। ঘটনাক্রমে কালিদাসের মেঘদূত নিয়েই তখন আমাদের আলোচনা চল্‌ছিল। সেদিন সন্ধ্যার একটু আগে বাদল নাম্‌ল। ঘরের ভিতর কতক্ষণ বন্ধ থেকে ছট্‌ফট্ করে, আমি শেষটায় বেরিয়ে পড়লুম।

অণিমাদের বাড়ীতে তখন কেউ ছিল না। অশোক ও ভগবতীবাবু দুজনেই বেরিয়ে গিয়েছিলেন। অণিমা আমাকে ভিজে-ভিজে ঘরে ঢুকতে দেখে, চমকিত ও হৃষ্ট হয়ে উঠ্‌ল। আমি স্পষ্ট দেখলুম, তার চোখের কোণে একটা বিদ্যুতের ঝিলিক খেলে গেল। আমার নিজের চোখ-ও বোধ হয় তাতে সাড়া দিয়েছিল।

"এক পেয়ালা চা আনছি এখনি" বলে সে উঠে দাঁড়াল। আমি বাধা দিয়ে বল্‌তে গেলুম, চা আমি খেয়ে এসেছি,—তবু সে চলে গেল।

মিনিট দশ পরে সে যখন চা নিয়ে ঘরে ঢুকল, তখন আমি বেশ দেখতে পেলুম, তার সমস্ত মুখ আগুনেব আভায রাঙ্গা হয়ে উঠেছে। এই অনাবশ্যক কষ্টের জন্য আমার কেমন একটু লজ্জা হওয়া উচিত ছিল , কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, আমাব মনটা বেশ একটু আনন্দে দোলা খেলে।

চায়ের পেযালা শেষ করে আমরা মেঘদূত নিয়ে বসলুম। আমবা পড়ছিলুম, বিরহ-বিধুর অন্তরের সে আকুল ক্রন্দন, — সে উজ্জয়িনীর বাতায়নবর্তিনী পুরাঙ্গনাদের কথা, -- সে অলকাপুরীর বেদনা-মথিত হৃদয়ের বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস। আমার মানস চক্ষে ফুটে উঠ্‌ছিল, সেদিনকার ভারতবর্ষের সেই প্রসাধন,— সেই বিলাস রচনা। আমরা দেখছিলুম, সেই 'কুরুবকের মালা', সেই বঙ্কিম-চাহনি, সেই সলিল-গতি। মন্দাক্রান্তার তালে-তালে হৃদয় নেচে উঠ্‌ছিল। দুনিযার বুক থেকে সমস্ত মুছে গিয়ে শুধু ফুটে উঠ্‌ছিল সেই অনন্ত কালেব প্রেমিক-প্রেমিকার ছবি। —তাদের প্রতীক্ষার সেই দুরু-দুরু হিযা, —তাদের মিলনেব সেই থরথরি দেহলতা, — তাদের বিরহের টল্‌-টল্ আঁখি!

পড়তে-পড়তে কি একটা অস্পষ্ট অভাবে আমার বুক ছাপিযে উঠ্‌ছিল। —আমাব ব্যথাতুর স্বর কাঁদছে,—আমার কম্পমান হাত শিউরে উঠছে, —আমাব ঝাপসা চোখে সবই অস্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ছে। ওগো সেদিনকার মেঘভার! সেদিনকাব বারি-ঝর-ঝর সঙ্গীত। সেদিনকার নিষুতি সন্ধ্যা! কেন তোমরা আমায় টেনেছিলে সেদিন?--

আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছিল।

"থামো" বলে কে একটা আকুল সুরে আমার মুখের কাছ থেকে বইখানাকে টান্ মেবে ফেলে দিয়ে হাতখানা চেপে ধবলে। আমার মুখ,—আমার সেই কোন্ অদেখা যক্ষের ব্যথায় বিধুর মুখ তুলে আমি দেখলুম, অণিমা আমার হাতখানাকে সজোরে ধরেছে। তার সমস্ত শরীর আমার হাতখানার উপর ঝুঁকে পড়েছে, —তার সমস্ত দেহ কাঁপছে,— চোখ দুটি অশ্রু-সায়রে পদ্মের মত ফুটে উঠছে।

"শোন, আজকের সন্ধ্যায় তোমাকে একটা কথা না বলেই আমি সোয়াস্তি পাচ্ছি না, — খুন করে ফেললে-ও আর কোনো দিন একে আবিষ্কার করতে পারতে না, — কোথা দিয়ে তুমি আমার মনের গোপন-বেদীটি জুড়ে বসেছ। বোধ হয়, তুমি অনেকটা আমার স্বামীর মতই দেখতে বলে।"

আজ আমি ঠিক বলতে পারি, তার স্বামীর চেহারার সাথে আমার চেহারার কোথাও মিল নেই, —এক কণাও না। কিন্তু আমাব তখন এ কথা বিচার কবার মত মানসিক অবস্থা ছিল না। অপরিসীম বিস্ময়ে আমি অবাক্ হয়ে গেলুম, —একবারে স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলুম। আমার সম্বিৎ যখন ফিরে এল, তখন আমি শুধু ছোট একটি কথা বলতে পারলুম, "সে কি?"

"হাঁ, তাই," বলে সে দৃঢ় স্বরে কহিতে লাগল, "একদিন অসহ্য ঔৎসুক্যে ও-কথাটারই ইঙ্গিত করেছিলুম ; কিন্তু সেদিনই দেখেছিলুম, তোমার দুর্নিবার দ্বিধা। এ কথাটাকে আমি সে দিন থেকে শাসিয়ে, তাড়িয়ে, ঝেঁটিয়ে মনের কোণ থেকে ঝেড়ে-মুছে ফেলতে চেয়েছিলুম। কিন্তু, দেখেছি যে কথা ভুলতে চাওয়া যায়, সে কথা ভোলাই সবচেয়ে অসম্ভব। তার বদলে নিদারুণ বিধি আমার মন থেকে ধীরে-ধীরে সরিয়ে নিয়ে গেছে তারই স্মৃতির সে গন্ধটুকু, — যেটুকুকে বুকে করে আমি আমার দুস্তর যৌবনটাকেও সগর্বে পাড়ি দিতে বুক বেঁধেছিলুম।"

আমার মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরুল না। আমি যদি এব নিরপেক্ষ শ্রোতা হতুম, হয় ত গম্ভীর ভাবে বলতে পারতুম, 'খুবই স্বাভাবিক,' হয় ত মনে-মনে আমার তখনকার সৌভাগ্যকে ঈর্ষাও করতুম। আর আমি বেশ স্বাভাবিক অবস্থায় থাকতুম, হয় ত এ কাহিনী শুনে বেশ উল্লসিত হতুম,— নেচে উঠতুম,--আমার এতদিনের বন্ধ হৃদয়-কপাট খুলে দিতুম। কিন্তু আমি তখন ছিলুম স্তম্ভিত, —ইংরেজিতে যাকে বলে stunned

অণিমা আবার সুরু করলে, "তুমি ভাবছ, কি বলছে এ? দেবীর আবার মানবতার ওপর লোভ কেন?— কিন্তু জেনো, আমি তোমার কাছে কোনো কিছুর প্রার্থী নই,— কোনো কিছু চেয়ে আমি তোমায় বিব্রত করব না, —শুধু আজকের এই ক্ষণিকের জন্য চাই এইটুকু, — অনন্ত-জীবন যার স্মৃতিটুকু জাগিয়ে রাখব.—শুধু এইটুকু,—"

—ধীরে ধীরে একটু-একটু করে আমার হাতখানাকে সে তুলে নিলে,—আমি কোনো বাধা দিলুম না। তার পর অল্পে-অল্পে নুয়ে পড়ে, অতি কোমল অঙ্গুলিতে একটির পর একটি করে আমার পাঁচটি আঙ্গুল তুলে নিয়ে, অতি আদরের, অতি সঙ্কোচের, অতি মধুর পুলকভরা সুকোমল পরশটুকু বুলিয়ে দিলে। কি ব্যথাতুর, কি মদিরাময়, কি সশঙ্ক, সঙ্কোচ সুন্দর সেই স্পর্শটুকু। মনে হোলো, সে আমার শিরায় নিমেষ মধ্যে আগুন ধরিয়ে দিলে। আমার সমস্ত চিন্তা মুহূর্তের মধ্যে পুড়ে ছাই হয়ে গেল, —আমি আপাদমস্তক জ্বলে উঠলুম।

"এইটুকু" বলে সে দাঁড়িয়ে উঠল। খপ করে তার হাতখানা ধরে ফেলে, আমিও দাঁড়াতে-দাঁড়াতে বললুম, "দাঁড়াও।"

মুখ তুলে আমার চোখের উপর দৃষ্টি রেখে সে দাঁড়াল।—

"আমার কথাটা-ও তবে শুনে যাও। জানা ও অজানা ভাবে আমি তোমার চারিদিকের আবহাওয়াকে ছাড়িয়ে করে তার অন্তঃপুরের রাণীকেও যে ভালবেসে ফেলেছি, — সে কথা তেমন করে নজর করার কারণ আজকের আগে আমার ঘটে নি। কিন্তু আজ যদি হঠাৎ তোমার অন্তরের আবরণ খসে পড়ল, তবে আমারই আবরণ শুধু দম্ভ-ভরে অটুট রেখে লাভ কি?"

আমার চোখের অসম্ভব দীপ্তি বোধ হয় তার অসহ্য হয়ে উঠছিল। সে চোখ নামিয়ে নিলে। আমি দেখলুম, আবেশে তার সমস্ত মুখে একটা নিদ্রার সুশ্যাম ছায়া ঘনিয়ে উঠছে। আমি হাত ছেড়ে, গলার ওপর একখানা হাত রেখে, ধীরে-ধীরে বললুম, "শুধু চাই, একটা—"

বিদ্যুতের মত সে ত্বরিত-পদে আপনাকে ছাড়িয়ে নিয়ে ঘর ছেড়ে গেল। মুখ ফুটে বেরুল শুধু একটা আকুল মিনতি, "না, —না, —না।" আমি বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে দেখছিলুম তার শঙ্কা-জড়িত বেদনা মুখের দীপ্তিকে কণামাত্রও নিবাতে পারে নি।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আমার চেতনা হল। আমি বাড়ী যাবার জন্য সিঁড়ি দিয়ে নামলুম। নামতেই অশোকের মায়ের সাথে দেখা হল। তিনি বল্লেন, "এত সকালেই চললে আজ?"

আমি অন্যমনস্ক ভাবে শুধু বল্লুম, "হুঁ।"

"অশোক ত আজ জলের জন্য এখনো ফিরলে না। তাই তোমাদের গল্প জম্‌ল না বুঝি?"

"বাড়ীতেও একটু তাড়া আছে।"

"একটু সবুর কর, জলটা থামুক।"

"কালকের পড়াটা একটু শক্ত। আজই তৈরী করে রাখতে হবে।"

আর একটু পীড়াপীড়ির পর আমি চলে এলুম।

যদি বলি, সেদিনকার সমস্ত রাত্রি আমি ঘুমোই নি, তা হলে অল্পই বলা হবে। —আমি বিছানায় শুলুম না পর্যন্ত। টেবিলের ওপর ভর দিয়ে, হাত দুটোর ভিতর মাথাটা রেখে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা চেয়ারে বসে রইলুম। এই মাথাটার ভিতরে হাজার রকমের ভাবনা এসে উকি-ঝুঁকি মারলে , তারা সবগুলিই বিদ্রোহী, অসংযত, বিশৃঙ্খল। হঠাৎ একটা ভাবনাকে তাড়িয়ে দেবার জন্য মাথা তুলতেই নজরে পড়ল, টেবিলের ওপর ব্রাউনিংএর কবিতার বইখানা। আমার শত অবসর ও শত উৎসবের প্রিয় সাথী, ওগো কবি! আজ আমার লক্ষ ভাবনার নাগপাশ থেকে মুক্তি দাও।

পাতা উল্টাতেই চোখে পড়ল, The Statue and The Bust—পড়লুম। একবার, দুবার, তিনবার। হে নিষ্ঠুর কবি। এ কি পরিহাস আমার সাথে? তোমার কবিতামৃত উপছে গিয়ে, চিন্তার কালকূটই কি আমার ভাগ্যে জুটল? নৈরাশ্যে আমি বইখানাকে ছুঁড়ে ফেলে, স্থির হয়ে বস্‌তে চাইলুম। কিন্তু আবার ফিরে কুড়িয়ে নিয়ে, সেই কবিতাটিই পড়লুম। কখন ভোরের আকাশ রাঙা হয়ে উঠছিল, জানি নে, — পাখীর ডাকে আমার চৈতন্য হল। বাতিটা নিবিয়ে দিয়ে, আমি কাল্‌কের-পরা-জামা-গায়েই সাম্‌নের একটা স্কোয়ারে হাওয়া খেতে বেরিয়ে পড়লুম। বাসায় ফিরে এসে দেখলুম, গরম জল চাপিয়ে চাকরটা সবিস্ময়ে পথ চেয়ে দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছে। চা খেতে-খেতে বললুম, "দেখ্ আমার শরীরটা আজ ভালো নেই। কাল রাত্রিতে ঘুম হয় নি। কলেজের বেলা হলে এ চিঠিখানা কলেজে দিয়ে আসিস্। বলিস্, আমি আজ কলেজ যাব না।"

সমস্ত দিন বিছানায় শুয়ে রইলুম। যত কবির যত গল্প উপন্যাস আমার ঘরে ছিল, — একখানা-একখানা করে তুলে নিলুম, আর ফেলে দিলুম। আমার মন বসল না। আবার ব্রাউনিং খুললুম। অন্যান্য কবিতাগুলো একটির পর একটি পড়তে গেলুম , কিন্তু আজ বহুবারের-পড়া সে কবিতা আমি বুঝতে পারলুম না। বিকাল যতই এগুতে লাগল, অস্থিরতা ততই বাড়ল। একটু বেলা পড়তেই, আমি জোর করে একটা স্কোয়ারে হাওয়া খেতে যাওয়া ঠিক করলুম। দুপাক ঘুরতে-না-ঘুরতেই মনে হল, বড় বেশী লোক। কোথায় যাব, আবার ভাবতে লাগলুম। সিনেমায়? বিশ্রী সেই ছেলে-মানুষী রোমান্স। ঈডেন গার্ডেনে? — সেখানেও বড় বেশী লোক। ময়দানে?— বড় বেশী দূর এখান থেকে। কোথায় যাওয়া যায়? যে কথাটা সর্বাগ্রে জেগেছিল, তাকেই চেয়েছিলুম এড়াতে। অবশেষে সেইটেই ধীরে-ধীরে এসে উদয় হল। না, কালকের পরে আর আজকে যাওয়া চলে না। কিন্তু ... তেমন abrupt কিছু বলে ঠেক্‌বে না ত অশোক প্রভৃতির কাছে? তার চেয়ে যাওয়া যাক প্রতিদিনের মত। অবিশ্যি যত শীঘ্র পারি উঠে পড়ব।

একেবারে সরাসরি অণিমাদের পড়বার ঘরে গিয়ে ঢুকলুম। দেখলুম, অণিমা বই কোলে করে বসে আছে। একটু বিপন্ন হয়ে যতদূর সম্ভব গাম্ভীর্য বজায় রেখে বললুম, "অশোক কোথা?"

"বাড়ী নেই।"

সে কথা শুনবার আগেই কখন আমি বসে পড়েছিলুম। তখন-তখনই উঠতে কেমন বাধ বাধ ঠেকল। আমি একটা জানালা দিয়ে পথের দিকে চেয়ে রইলুম। অণিমা কিছুই বলল না, বই-এর ওপর চোখ দুটি রেখে চুপ করে বসে রইল।

দু' হাত মাত্র ব্যবধান! তবু আমরা কেউ নড়লুম না,— কেউ একটি ছোট কথাও বললুম না। দুজনে দুদিকে চেয়ে বসে রইলুম। আমাদের দৃষ্টি পর্যন্ত মিলল না। অথচ দুজনেই বুঝলুম, দৃষ্টি আমাদের যতই না পরস্পরকে এড়িয়ে চলুক, হৃদয় আমাদের সমতালে নাচছে,— দুজনেরই অস্ফুট বেদনা একই ভাষাহীন সুরে গাঁথা। কথা কইলুম না—তার নিঃশ্বাসটুকু পর্যন্ত আঘ্রাণ পেলুম না, —তবু আমার হৃদয় অপার আনন্দে ভরে উঠল। মনে হল, এই ভালো এই ভালো।

কোথা দিয়ে বিকাল নিঃশেষ হয়েছিল দেখি নি। সন্ধ্যার আঁধার জমে উঠছিল। পূবের একটা জানালা দিয়ে চাঁদের আলো এসে ঘরটাকে একটু আলোকিত করে তুলল। তবু আমাদের হুঁশ হল না। বিকালের বেড়ানোর পালা সেরে ফিরতে, হঠাৎ ভগবতীবাবুর গলা শোনা গেল, "তাই ত রে, এ ঘরটাতে আজ যে এখনো আলো দেওয়া হয় নি।"

দ্রুতপদে অণিমা ঘর ছেড়ে বাহির হয়ে গেল। সেই মুহূর্তেই ভগবতীবাবুর ডাক শোনা গেল, "কিরে, আজ যে ঘরে আলো দিস্ নি? পড়ছিস্ নে যে? নীরেন আসে নি বুঝি?"

"এখনই আলো নিয়ে আসছি, বাবা," বলে তাড়াতাড়ি আলো জ্বালাতে বেরিয়ে গেল। সে আলো নিয়ে ঘরে ফিরবার একটু পরেই, ভগবতীবাবু-ও ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, "হ্যালো, আজ যে আমায় দুপুরে গীতা পড়ে শোনালি নে? —এই যে নীরেন। কখন এলে?"

আমি হাসি টেনে বললুম,—"এই, এক মিনিটও হয় নি।"

আমার হাসি তাঁর চোখে ধরা পড়ে গেল। "সে কি। তোমার মুখ বড় শুক্‌নো-শুক্‌নো দেখাচ্ছে যে? কোনো অসুখ-বিসুখ করে নি ত?"

"সে কথা বলতেই ত আজ এসেছি। আমার শরীরটা কলকাতা এসে অবধিই ভালো নেই, —রাত্রিতে-রাত্রিতে একটু-একটু জ্বর-ও হয়। ডাক্তার বললেন, একটু চেঞ্জে যেতে। তাই এসেছি সবার সাথে দেখা করতে।"

উৎকণ্ঠিতচিত্তে বৃদ্ধ আমায় জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। আমি জানালুম, কালই যাচ্ছি, আপাতত একমাসের ছুটীতে পুরী। অণিমা আমার মুখের দিকে ত্রস্ত দৃষ্টিতে তাকাল। আমি শুধু শাদা চোখ দুটি দিয়ে অনায়াস দৃষ্টিতে তার জবাব দিলুম। একটু পরেই আমি বললুম, "তা হলে এখন আমি উঠি। কালই যাব, সমস্ত গুছিয়ে নিতে হবে।"

অণিমা বল্লে, "কিন্তু, দাদার সাথে দেখা করে গেলে না?"

"কাল তাকে আমার ওখানে যেতে বলো," বলে আমি বাড়ীর আর সবার সাথে দেখা করতে গেলুম। অশোকের মা বললেন, "কাল দুপুরের দিকে একবার না হয় এসো, বাবা।"

আমি দেখলুম, অণিমার চোখে মিনতি ফুটে উঠেছে।

"সময় পেলে আসব," বলে আমি নমস্কার করে বিদায় নিলুম। তাঁরা দুয়ার পর্যন্ত এগিয়ে এসে আমায় বিদায় দিলেন। রাস্তার একটা গ্যাস-পোস্টের অস্পষ্ট আলোকে-ও আমি দেখতে পেলুম, অণিমার চোখ দুটি তেমনি আমার ওপর তখনো বদ্ধ রয়েছে। আমি ঠিক্ জানি, সে চোখে যেমনি ছিল বেদনা, তেমনি ছিল তাকে জয় করবার একটা দৃঢ় সঙ্কল্প। একটু পরেই সে চোখের পাতা সিক্ত হয়ে উঠেছিল, হৃদয়ের কূল ছাপিয়ে বান ডেকেছিল, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস ; কেন না আমার পুরুষের দৃঢ় হৃদয়টাই তখন টলে গলে যাচ্ছিল।

কলেজে বলে-কয়ে এক মাসের ছুটী নিলুম। সন্ধ্যা-বেলা পুরী এক্সপ্রেস্ ধরবার জন্যে যখন গাড়ীতে অশোকদের বাসা পেরিয়ে যাচ্ছিলুম, তখন জানি নে, কেমন করে আমার বুভুক্ষু চোখ দুটোকে একেবারে দোতলার বারান্দায় চালিয়ে দিলুম ; —জানি নে কেন, গাড়ী থেকে মুখ বার করে গাড়োয়ান্‌কে তাড়াতাড়ি চালাবার হুকুম দিয়ে, সেই বারান্দার দিকেই একভাবে চেয়ে রইলুম। সে কি সেই ম্লান আঁধারে দণ্ডায়মানা নিভৃত নারীমূর্তিব কাছে বিদায় মেগে? —তবে বিকালে একবার সে বাড়ীতে গেলেই ত হ'ত?

এক মাসের ছুটী তিন মাসে বাড়িয়েও আর কলকাতায় ফিবলুম না। বাংলার বাহিবে একটা কলেজে আমি চাকুরী নিয়ে চলে গেলুম। কিন্তু শান্তি আমি পেলুম না। সেই পয়লা আষাঢ়ের একটা সন্ধ্যা! — তারই ছায়া আমাব পিছনে পিছনে এ ক'বছব ধবে দিবা-নিশি ঘুরছে। জীবনে আর আমি মেঘদূত ছুঁই নি। আমি হাজার বারের উপর The Statue and the Bust পড়েছি। —কিন্তু, কোনো কূল-কিনারা পাই নি। আমার জীবনেব যত কিছু অনাবশ্যক আনন্দ-উল্লাস ছিল, কবে তা ধীরে-ধীরে ঝরে গেল , আমার বিরস চিন্তাক্লিষ্ট মুখ কত বন্ধুদের ব্যথিত বিবক্ত করে তুলল ; আমার অবিবাহিত এ জীবন কত জনেব ব্যঙ্গের, সন্দেহের, কৃপার বস্তু হযে দাঁড়াল।

সাত বছরেব ভাবনার শেষে মনে হচ্ছে একটা সত্যের খোঁজ আমি পেযেছি। তাই আমি আজ এ কথা সকলকে জানাতে চাই। —আমার সন্দেহের সমাধান হয়েছে। সেদিনকাব ত্যাগের মধ্যে আমার ছিল না কিছুমাত্র দ্বিধা, কিছুমাত্র ভীরুতা, কিছুমাত্র মিথ্যাচার। আমি আজ বুঝেছি, আমি তাকে ছেড়েছি নিবিড়তর করে পাওয়ার জন্য। চিবজীবনেব জন্য আমাদের জীবন গাঁথা হলে, হয় ত কবে সংসারের ঘুর্ণী বায়ুতে পড়ে আমরা দুজন দুজনাব কাছ থেকে ছিটকে যেতুম, হয় ত তার মন্থনে আমাদের ভাগ্যে উঠত গরল , হয় ত আমাদের এই অদেখা হৃদয়ের বাঁধন হয়ে উঠত ফাঁসির দড়ি। --আজও সেদিনকার শুভমুহূর্তটিব কথা মনে পড়তেই, আমার আঙ্গুল পাঁচটি গর্বে, সোহাগে, আনন্দে নেচে ওঠে,— আমার সমস্ত বাহু স্ফুরিত হয়, আমার সমস্ত মন একটি অতি মধুর, অতি তীব্র, অথচ অতি সুন্দর আনন্দে ভিজে ওঠে। কিন্তু সেই পুণ্যক্ষণের জের টানবার লালসায় যদি আমি বসে থাকতুম, তবে সেই অতি-বাঞ্ছিত, চির-সুকুমার স্পর্শটি হযে উঠত তুচ্ছ, মামুলি, মধুহীন।

The Statue and the Bust খুব ভালো। কিন্তু তাব চেয়েও ভালো The Last Ride Together— সেই, 'জীবনে যত পূজা হল না সারা'র গান। অলকাপুরীর যক্ষকে আমি জানি নে ; হয় ত অভিশাপ-শেষে কুবেরের ধন আগলাতেই তার সময় যেত। কিন্তু শিপ্রাব তীরেব সেই বেদনাতুর হৃদয় আমার ঢের বেশী প্রিয়, আমার ঢের বেশী আপনার। তাকেই আমি করি প্রণতি।

—বঙ্কিম মুখ তুলে আমাদের দিকে চাইল।

কালনেমি

মণীশ ঘটক

জোয়ান মবদ ডাকু যখন বেলে পা কাটা প'ড়ে কাজেব বাব হ'য়ে গেল, তখন এই এত বড় দুনিয়া তাকে বেঁচে থাকবার কোনো পথই বাতলাতে পাবল না।

অনেক ঘোরা-ফেরার পর শেষকালে, সে সোমত্ত স্ত্রীকে নিয়ে পটলডাঙাব ভিখিরিপাড়ায় এসে খুঁটি গাড়ল। সেখানকার বাসিন্দারা স্থান দিতে তাকে কোনো আপত্তিই কবল না, কিন্তু ওই স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কটা ববদাস্ত করতে আদপেই রাজী হ'ল না। বলল, থাকবি থাক। কিন্তু ইস্তিরি-ফিস্তিরি ক্যানো বাবা। এখন ও-সব চলবে না, মুড়িমিছরিব একদর হেতায়!

শুনে, ডাকুর মন এই শেষ আশ্রয়ের ওপরও বিমুখ হয়ে উঠল। বলল, শুনছিস তো ময়না? এরপর—

ময়না বলল, আর কোথায় যাবি তবে? আজ দু'মাস ত' সমস্ত পিরথিমি ঘুরে বেড়ালি, ঠাঁই পেলি কোথাও? মাথা গোঁজবাব কুঁড়ে যখন মিলেচে একটা, তখন আর তোকে টো-টো করে বেড়াতে দিচ্ছিনে! আমার কত্তা? কি করবে ওরা আমার! সে জন্যে তোকে কিছু ভাবতে হবে না!

ডাকু বলল, সব বুঝলাম। কিন্তু শুনলি ত'! একে ওরা দলে ভারি, তাব ওপর—

— থাম তুই! দলে ভারি! আমার কাটাবি থাকতে ওই মড়াব দলকে ভয় করি আমি?

স্ত্রীব শ্রান্ত, অনশনক্লিষ্ট মুখেব দিকে চেয়ে, দো-মনা ভাবে ডাকু বলল, থাক তবে। কিন্তু—

—আর কিন্তু করিস্‌নে তুই—তারা থেকে গেল।

কিন্তু তেলে জলে যেমন মিশ খায় না, স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধটুকু অটুট রেখে তারাও তেমনি দলের সাথে মিশে উঠতে পারল না।

মেশবার জন্যে ব্যস্ততাও তাদের বিশেষ ছিল না। ময়না ভোরে উঠে ডাকুকে নিয়ে গিয়ে রাস্তার মোড়ে বসিয়ে দিয়ে আসত। তারপর দলের সাথে পথে বেরিয়ে পড়ত। দুপুরে স্বামীকে নিয়ে এসে খাইয়ে দাইয়ে সন্ধ্যের আগেই আবার রেখে আসত। রাত বারোটা-একটায় তাকে নিয়ে এসে দুজনে শুয়ে পড়ত। রোজকাব রোজ এমনি কাটত। কারো সাথে ঘনিষ্ঠতা করবার সুবিধেও তাদের হ'ত না, ইচ্ছেও করত না। নিজেরটা নিয়েই নিজেরা থাকত।

হরিমতির ঘরের রত্না একদিন সন্ধ্যের সময় অনেকের সামনেই ময়নাকে জড়িয়ে ধরেছিল, ও-পাড়ায় এসব নতুন ব্যাপার নয়, হামেশা হচ্ছে। কিন্তু ঠিক দু'সেকেন্ড পরে যা ঘটল, তার সাথে পরিচয় কারোই ছিল না। দু'হাতে নাক চেপে ধ'রে ভুঁয়ে প'ড়ে রতন গোঙাতে শুরু করল। ময়না কাপড়-চোপড় ঠিক ক'রে গম্ভীরভাবে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল।

রসিকতার জের স্বরূপ নাক দিয়ে পোয়াটাক রক্ত বেরিয়ে যাবার পর রতন উঠে বসল।

পটলা বলল, হয়েছিল কি রে? একটা মাগীর হাতে ম্যাড়া ব'নে গেলি?

কাৎরাতে কাৎরাতে রতন বলল, এমন আচম্কা ঘুষি চালালে মাইরি, তাল রাকতে পারলুম না! আর একেবারে নাকের ঠিক ডগাটায়—উঃ—

একটা বছর আটেকের মেয়ে বলল, থাক থাক —আর কতা ক'স নে। অমন ষাঁড়েব মতো মবদ—লজ্জা করে না!

তার দিকে একবার বিষদৃষ্টিতে তাকিয়ে রতনা বলল, আচ্ছা বাবা, এক মাগে শীত পালায় না, আমিও নেব! ও শালীর ড্যামাক না ভাঙতে পারি তো—

পটলা বলল, থাক, হয়েচে। একন ঘরে যা ত'। নাক যে রক্তারক্তি হয়ে গেচে।

তীব্রদৃষ্টিতে ময়নার ঘবেব দিকে তাকিয়ে বতন টলতে টলতে নিজের ঘরে ঢুকল।

যে যার গর্তে ডুব মারল।

এব মধ্যে ময়নার এক ছেলে হ'ল। ছেলে নিয়ে সে এমন মেতে উঠল যে, সবাবই কাছে বেজায় বেখাপ্পা ঠেকতে লাগল। দিনরাত যত্ন-আত্তি, নাওয়ানো-খাওযানো, কত কি! স্বামী স্ত্রী দু'জনেই রোজগারে বেরোনো ছেড়ে দিল। পুঁজিপাটা যা ছিল, তাই ভেঙে খাওয়া চলতে লাগল।

খেঁদি-পিসির দলে যে এটা খাপ খাবে না, তাতে আশ্চর্য হবাব কিছু নেই। সেখানে স্বামী-স্ত্রী, ছেলে-মেযে, বাপ-মা, কোনো সম্পর্কেরই অস্তিত্ব ছিল না। প্রতি সোমত্ত মেয়েরই ফি বছর ছেলে হ'ত, একটি বছবও কামাই পড়ত না। কিন্তু ওই হওযা পর্যন্তই। তাবপর, সে সব শিশুদের ধর্মেব নামে ছেড়ে দেওয়া হ'ত, দেখবাব শোনবাব কেউই থাকত না। বেশিব ভাগই মরত, যারা হঠাৎ বেঁচে যেত তারা আব দশজনের মতো বন্ধনহীনভাবে বেড়ে উঠত। বাপ-মা'র ঠিক-ঠিকানা কেউ জানত না। তাবা জানত, দলের প্রত্যেকেই যেমন একা, তারাও তেমনি।

মেয়েগুলোকে বয়স হবামাত্র নেবুতলার মতন সব জায়গায় চালান করা হ'ত! দলেব ও একটা মস্ত আয। ছেলেগুলো পকেটকাটা থেকে হাতে খড়ি পেত।

এই সেখানকার নিযম।

এ হেন জায়গায় ময়না যখন তার ছেলে নিয়ে ঢলাঢলি শুরু কবল, তখন সবাযের কাছেই সেটা বাড়াবাড়ি, আদিখ্যেতা ব'লে মনে হ'ল।

খেঁদি বলল, ঘেন্না ধরালে! একি ভদ্দরনোকের ঘর নাকি লা? সোমত্ত মাগী, কোতায দু'পয়সা রোজগারেব চেষ্টা দেকবি, তা না, সোয়ামি, সোয়ামি করেই গেল! আবাব একটা কাঁটা খসেছে ত' কি নাগিযেচে দ্যাকোনা! বলি, তু'মবলে ওকি তোর ছেরাদ্দ করবে?

ময়না শুনত সবই, কিন্তু গায়ে মাখত না।

ছেলে মাস দু'আড়াইয়ের হ'লে তারা আবার রোজগারে বেরোতে শুরু করল। বুড়ি হরিমতির ময়নার ওপর একটু টান ছিল, সেই থাকত ছেলের পাহারায়।

একদিন সন্ধ্যেবেলায় সে রাস্তাব মোড়ে ডাকুকে রেখে ফিরে আসচে। আস্তানার ভেতরে পা দিতেই রতন এসে তার পথ আটকে দাঁড়াল।

—কি বাবা, বড় যে তেজ ফলিয়েছিলে সে-দিন!

তাড়ির গন্ধে চাবিদিক ভ'রে গেল।

ময়না বলল, পথ ছাড়—

—ফোঁস কেউটের ছা, কম নয় তার হাঁ—মাইরি, ছুবলে দিয়ো না যেন! আজও কি ঘুষি চালাবে নাকি—, ব'লে সে ডাকল, পটলা—

ময়না তাকিয়ে দেখল, সামনের ঘরটা থেকে আরো দু'জন নেমে এলো। তার ভয় হ'ল। কিন্তু সে ভাব চেপে সে বলল, কি চাস তোরা, শুনি?

—হুঁ বাবা, পতে এসো! গুটিগুটি ওই ঘরটিতে ঢুকে পড়ো তো জাদু, না বেইজ্জত হবার শক আচে?

তীব্র দৃষ্টিতে তাদের দিকে চেয়ে কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব মোলায়েম ক'রে ময়না বলল, আচ্ছা, একটু সবুর কর না তোরা! ছেলেটাকে ছেড়ে এইচি এরখন, এক পাক তাকে দেকেই আমি চলে আসব।

পটলা বলল, যেতে দাও, যেতে দাও ছেলে দিয়ে কি হবে? ছেলে আর দেকতে হবে না! বেঁচে থাকলে অমন কত ছেলে হবে— ছেলের দুঃখু কি বাবা!

রতন জড়িত স্বরে ছড়া কাটল,

আমার সাগর-পারের ময়না
শিকলি বাঁধা যায় না!
দেবো চাঁদির গয়না,
যাবার কতা কয় না!

ছিঃ মানিক, অমন কতা কইতে আচে?

ময়না দেখল মহাবিপদ। একমাত্র সম্বল ছুরিখানা, তাও ঘরে রয়েছে। খালি হাতে তিনটে পশুর সাথে লড়া ত' সম্ভব নয়।

এ-ধার ও ধার তাকাতে তাকাতে হঠাৎ সে ছুট দিল। পটলা দৌড়ে গিয়ে তার কাপড় চেপে ধরল। কাপড় ছেড়ে দিয়ে সে আবার ছুটতে যেতেই রতন গিয়ে তার ওপর চেপে পড়ল।

— ভেল্কি দেখাবার আর ঠাঁই পেলে না ধন! চল দিকি একন সুড় সুড় ক'রে—কত ভেল্কি জানো ওই ভেতরে দ্যাকাবে চল—

ময়না ঝাপটা ঝাপটি কাকুতি-মিনতি অনেক করল। কিন্তু খিদে আর পশু-লালসা ছাড়া যাদের আর সমস্ত বৃত্তিই মরে গেছে, মিনতিতে তাদের মন ভিজবে কেন?

তিন জনে তাকে টেনে হিঁচড়ে ঘরে নিয়ে গেল।

রাত হয়ে গেছে। ডাকু পথের ধারে বসে হয়রান হয়ে উঠেচে। ময়নার আসতে এত দেরি ত' কোনদিনই হয় না?

আরো খানিকক্ষণ ব'সে অস্থির হয়ে শেষে সে লাঠিতে ভর ক'রে উঠে দাঁড়ালো। তারপর একাই ঢিকোতে-ঢিকোতে আস্তানার দিকে চলল।

সেখানে পৌঁছেই সে দেখল, মহা হৈ-চৈ বেধে গেছে। সামনেই একটা ঘরে অনেক লোক মিলে জটলা করছে। সে আস্তে আস্তে গিয়ে পাশে দাঁড়াল।

খেঁদি বলছিল, তা এতে আর দোষের কি হয়েচে বাছা! রত্নাকে তো ছুঁড়িরা পছন্দই করে! তোমার যেমন ছিষ্টিছাড়া স্বভাব।

ময়না এক কোণে এলিয়ে পড়েছিল। মাথায় চুল উষ্কখুষ্ক, মুখ শুকনো, চোখ দু'ইঞ্চি বসে গেছে।

খেঁদি বলল, একানে পড়ে থেকে আর কি করবে বাছা, ঘরে যাও। ডাকু কিছু অবুঝ নয়, সে এলে বুঝবে। তাও বলি, যেকানকার যা নিয়ম, তা মানতে হবে ত'? পেট চালাবার জন্যে পতেই বেরুতে হচ্ছে যকন, তকন কি আর সোয়ামি ইস্তিরি ওসব ভড়ং চলে? ভদ্দরনোকি করতে হলে তার ঠাঁই আলাদা।

ঠিক ধরতে না পারলেও ডাকু মোটামুটি ব্যাপারটা বুঝল। সে নিঃশব্দে নেমে নিজের ঘরে চলে গেল।

খানিক পরে, ময়না ঘরে আসতেই সে বলল, তু' কিছু ভাবিসনে ময়না, দোষ আমারি!

ময়না বলল, তু' একটা বিহিত করবিনে! এমনি ক'রে—

দু'হাতে মুখ ঢেকে উপুড় হয়ে পড়ে সে ফুঁপিয়ে উঠল।

ডাকু উঠে তাব কাছে এগিযে এসে বসল। একটু চুপ ক'রে থেকে তাকে বুকে সাপটে ধ'বে লালসাজড়িতস্বরে বলল, তা হোকগে—থাকতেই হবে যকন হেতায়, তকন কি হবে ঘাঁটিয়ে! —আয় তুই—

ময়না অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল।

তার মুখে মরমীর দরদের ছাপ একটুও নেই, আছে কেবল তপ্ত ভুখের জ্বালা। মত্ত পশুর মতো দু'চোখ জ্বলছে।

রত্না তো? আর কেউ ছেল'? ব'লে ডাকু তাকে কোলের ওপর টানতেই সে গা ঝাড়া দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। তাবপর একহাতে চোখের জল মুছে আবেক হাতে গাযেব কাপড়টা টেনে সে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল।

অস্ফুট শুষ্ক গলায় ডাকু বলল, কোতা চললি ময়না?

—রত্নার কাছে—

সে চলতে শুরু করল!

যেতে যেতে সে শুনতে পেল ডাকু বলচে, দোহাই তোর, একটি বার আসিস রেতে—

মেথর-ধাঙড়

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

'পরাণের হুঁকা রে,
কে রাখিল তোর নাম ডাব্বা রে—'

গলা ছেড়ে গান গাইছে গাড়োয়ান, গো-গাড়ির গাড়োয়ান। গাইছে আচ্ছন্নের মত। খড়ের গাদা নিয়ে যাচ্ছে বোঝাই করে। বাবুই ঘাসের বাঁধের সঙ্গে হুঁকোটা লটকানো। রথের ধ্বজার মত। হুঁকোটা চোখের সামনে নেই, কিন্তু মন জুড়ে রয়েছে। কতক্ষণে পথ ফুরাবে না না-জানি। গাছের ছায়ায় বসবে বন্ধুকে নিয়ে। অদিনের বন্ধু।

গাঁ ছেড়ে শহরের হদ্দার মধ্যে গাড়ি এসেছে।

'কে যায়? এই রোকো।' মওড়া নিল ধনপতি। হাঁকার দিয়ে উঠল।

ভাল গাড়ির টানে পিছের গাড়ি যায়। সবাই দাঁড়িয়ে পড়ল লাইন দিয়ে। কি ব্যাপার?

কী ব্যাপার? মুনসিপালটির ইলেকার মধ্যে এসে পড়েছ। গাড়ি পাশ করাতে হবে না?

ধনপতি মুনসিপালটির ট্যাক্সো-দারোগা। গরুর গাড়ির ট্যাক্সো আদায় করে। কোথায় গরুর গাড়ির আঁট, কোথায় গাড়ি মোড় ঘোরে—রঁদ দিয়ে বেড়ায়। দেখতে পেলেই চিলের মত ছোঁ দিয়ে পড়ে।

মুনসিপালটির রাস্তার মধ্যে এসে পড়লেই গাড়ির টিকিট কাটতে হবে, প্রতি গাড়ি বারো আনা। মাটির রাস্তা ছেড়ে সুরকির রাস্তায় এসেছ, খাজনা দিতে হবে না? গরুর গাড়ির চাকায় বাঁধা রাস্তা ধ্বসে ভেঙে যাচ্ছে না? মেরামতি-মেহনতি কে দেয়?

টিকিট নেব না কি। পাঁচ আইনে চালান হবে। আইনের আমল পরের কথা, আগে লাঠির আমলে এস। পাঁচন কেড়ে নিয়ে ধনপতি মারলে এক ঘা।

ধনপতির সে এক খাণ্ডার মূর্তি। টিকিট কেটে বেঁধে দিলে শলির মধ্যে। পাশ করিয়ে দিলে।

সব সময়েই কি ধনপতির এমন রণমুখো চেহারা? কে বলে?

মেথররা বলে ধনপত সাহেব আমাদের মাটিয়া ঠাকুর। আমাদের মরা হোড়ায় বিমারে-বোখারে তিয়াসে-উপোসে ও আমাদের বাপ-মা।

খোসামোদ করে বলে না। মনের থেকে বলে।

কেন বলে?

'যারা নরক ঘুচিয়ে বেড়ায় তাদেরই নরক ঘোচে না সংসারে।' —পাগড়ি মাথায় ধনপতি চলে আসে মেথর-পটিতে। চলে আসে খবরগিরি করতে।

তার হাত-ভরা নানান রকম কাগজ-পত্র, মুড়ি-চেক, হিসেব-কিতেব। জামার বুক-পকেটে নোটের থাক। পাগড়ির ভাঁজে পেন্সিল গোঁজা।

কার-কার টাকার দরকার?

পেরুয়ার দু'দিন ধরে ঠেঙ্গা জ্বর, কাজে বেরুতে পাচ্ছে না। এই নে এক টাকা। সোনেলাল মদ পিয়ে হাতে পয়সা সব ফুঁকে দিয়েছে, উনুন জ্বলে না। বাজার বেসাত হবে না কিছু। এই নে আট আনা। মিলিটারি হাসপাতালে কাল হয়েছে ফেকুরামের। মাটি দিতে হবে। ঢাকনের কাপড় লাগবে। এই নে দু'টাকা।

খাতার পাতায় ঘষে-ঘষে ভোঁতা পেন্সিল ধার করে হিসেব লেখে ধনপত।

আর-আর কেউ দাঁড়ায় পাশ ঘেঁষে। হাত বাড়াবার জন্যে উসখুস করে।

'হোবে, হোবে, দু-চার দিন হামাকে জিরেন লিতে দে। বেশি ঠেকাঠোকা হয যাবি আমাব সেবেস্তায়। শিলিপ দেব।'

মেথববা ঘিরে দাঁড়ায় ধনপতিকে। খুশিতে সোবগোল করে। ধরে তো ধনপত, কবে তো ধনপত—ধনপত ছাড়া আমাদের কেউ নাই তিরিসংসাবে। চেয়ারম্যান ফত্তোলবাবু, দু'আঙুলে কেবল টাক চুলকায়। ডাগদর যে একজন আছে সে তো লাট সাহেবেব ভাযবা, বলে, ইস, আমি যাব মেথর-পটিতে রুগী দেখতে? সাতগুষ্টি মরে যাবে তো ফিরেও দেখবে না। আর আছে টোপরমাথায় ওভাবসার বাবু, সে তো ঠেঁটি পবে ঘুরে বেড়ায সাইকেলে। আমাদের থাকার মধ্যে আছে এই ধনপত। ধবে তো ধনপত, কবে তো ধনপত।

'তুমি মাথায পাগড়ি পিন্দেছ কেন? কেমন পেয়াদা-পেয়াদা মনে হয।'

'আরে, এ পাগড়ি হল একঠো বাহার। মাথাব উপর বাবা বরত্‌মান। বাবা বম ভোলা।'

হেসে ওঠে সবাই।

এমনি খোসগল্প কবে ধনপতি। বলে, 'আমার বাতটা সমঝাইলে না? বাপ ছেলিযার দুখ-দরদ সামলিহে চলে তো? তেমনি এ পাগড়ি দু'-একটা লাঠির বাডি জরুর সামলাহে লিবে। তার পব ফাটলে-চোটলে বাণ্ডিজ হোবে, সাপ ছোবলালে দড়ি পাকাবে, নদী পারে কোপনি হোবে, গর্মিকালে পখা হোবে—'

বলতে বলতে হাসতে হাসতে চলে গেল ধনপতি।

আব অমনি পেরুয়া আর সোনেলাল আর ফেকুবামের ছেলে বাণ্ডারী চলল মাতালশালায়। হাতে করকবে কাঁচা পয়সা। এক গলা না খেয়ে নিলেই নয়।

জীবন-ভোব এই মদের তিযাস। মাসে তিরিশ দিন। ভাত হবে না। না-হোক। কিন্তু চাই পচুই আর রসুই। ভেতো মদ।

দিগেন সার মদের দোকান। ঠিক মেথর পটির লাগ-পাশে। পোড়া-পোড়া করে চাল সেদ্ধ করে চ্যাটাইযে মেলে দেয় বোদ্দুবে। বাখর গুঁড়ো মেশায়। আবার ভাপে সেদ্ধ কবে মদ করে।

এদেব সুখের সায়ব দৈবে শুকিয়ে গেছে, তৃষ্ণায় প্রাণ আইঢাই। আধ সের ঢেলে দাও, সরকার।

সকালবেলা ভিজে ভাত খেয়ে বেরিয়ে যায় স্ত্রী-পুরুষে। যার-যার কাজ ঠিক আছে। যার যার যজমান। মেয়েরাও বেরোয় বলে সকাল বেলা রান্না হয় না। পুরুষেরা প্রথমে যায় বাজারে—রাস্তায় গোঁজা সাফ করে, মেয়েরা যায় বরাদ্দ ধোলাইয়ের কাজে। ঘুরে-ঘুরে ধোলাইয়ের কাজ সেরে মেযেরা বাড়ি ফিরে যায় রান্নার জোগাড়ে। রাস্তা থেকে পুরুষদেব ময়লার কাজে যাবাব কথা। কেউ যায়, কেউ যায় না। খুঁজে বেড়ায কোথাও বাংলা মদের দোকান আছে কি না।

ফালতু কাজ যে-দিন পায় মন্দ রোজগার হয় না। সারা দিন খেটে-খুটে হেলন্ত বেলায় মাতালশালায় গিয়ে ঢোকে। কাতারবন্দী হযে আসে। ডোমের কর্ম, মানে যারা মুদ্দোফরাস—

তারা মেথরের চেয়ে নিচু। বসে তারা একটু তফাৎ হয়ে। হাড়িয়া সব চেয়ে উঁচু, মেথরের তারা মহাজন, মেথরকে তারা শুয়োর বেচে—তারা বসে আগ বাড়িয়ে।

যে যেখানেই বোসো, ভাঁড়ে-গেলাসে খেতে পাবে না। অশুচি এই ভাঁড় ফেলবে কোথায়? আর, বাড়ি থেকে যে আনবে তার ফুরসৎ কই? আর ঘড়াঘটি গেলাস-ফেরো আছে না কি কারুর? শুধু কেলে-হাঁড়ি মাটির কলসি। তা ছাড়া, যাবে তো পেটে, অত ঠাট-বাটে দরকার কি।

দরকার নেই। গলা উঁচু করে হাঁ করে বসে থাকো। এক ঢোঁকেই বেশি নিতে চাও কখনো, বোসো হাঁটু গেড়ে।

পাঁচ আনা করে সের। বাটখারাতে ওজন করে দেয় দিগেন সা। ছোঁয়া বাঁচিয়ে ওপর থেকে ঢেলে দেয় সরকার। ঢক-ঢক। ঢক-ঢক-ঢক।

'যারা নরক ঘুচিয়ে বেড়ায় তাদেরই নরক ঘোচে না সংসারে।'

মদ খেয়ে এই নরকের যন্ত্রণা থেকে ত্রাণ খোঁজে।

টলতে টলতে বাড়ি ফেরে। ফিরেই বলে, গরম ভাত দে। বৌরা আশা করে থাকে হয়তো তাদের জন্য নিয়ে আসবে কিছু ভাঁড়ে করে। সোয়ামীরা বলে, আমদানি কিচ্ছু নেই। আর দু'টো দিন সবুর কর—

থাবা-থাবা ভাত খেয়ে এঁটো মুখ-হাত ভাল করে ধুয়ে-না-ধুয়েই শুয়ে পড়ে তালায়ের ওপর।

স্ত্রীরা আশা করে থাকে সোয়ামীরা মাছ তরকারি চালডাল নিয়ে আসবে। কিন্তু যা নগদান রোজগার করে সব যায় মদের অন্দরে। এক পয়সাও ফেলে না। তখন ধনপতের খোঁজ পড়ে। বলে, শিলিপ দাও।

ধনপত শিলিপ কাটে। শিলিপ যায় যাদু ঘোষের মুদিখানায়। যাদু ঘোষ প্রতি টাকায় এক আনা করে মাসিক সুদ আদায় করে। নামে-নামে হিসেব রাখে। ধনপতের আট আনা বখরা।

ঘরগুষ্টি জ্বরে পড়েছে, ছেলে একটা মরেছে কি হয়েছে—নগদ টাকা দাও ধনপত পত্রপাঠ দাদন দেবে। কিন্তু টাকায় ঐ এক আনা সুদ। এক টাকায় পনেরো আনা পাবে—হাতে কেটে নিয়ে তবে দাদন। সুদের হার কে করে? এখন সমূহ বিপদ থেকে তো বাঁচাও।

ধরে তো ধনপত, করে তো ধনপত। আঁচায়-বাঁচায় ধনপত।

এক সামিলী চালানে মেথরদের মোট মাইনে ধনপতই ট্রেজারি থেকে বের করে আনে। ট্রেজারির বাইরে রাস্তার উপর গাদি মেরে বসে থাকে মেথর-মেথরানি। কাটাকুটি হয়ে কার কত মিলবে কারুরই কোনো হদিশ-নুটিশ নেই। নাম ধরে-ধরে নিখুঁত হিসেব করে রেখেছে ধনপত। তুই লালচাঁদ তেরো আনা। তুই বিলাসী সাত আনা মুঙ্গিয়া দু'টাকা, তুই ঝুলনি সাড়ে আট আনা—

ঝুলনি মুখ ম্লান করে বলে, 'মোটে সাড়ে আট আনা!'

ধনপত ঠাণ্ডা গলায় বলে, 'হিসেবে আমার কালির আঁচড়ের ভুল নেই। গত মাসে তোর বেটা-বিটি মরে গেল না জ্বর হয়ে? ওষুধ খাওয়ালি না? মাটি দিলি না?'

'অত কচাল কিসের?' বলে উঠল বিরিজলাল ঃ 'নেবেও ধনপত দেবেও ধনপত। ধনপত ছাড়া আমাদের গতিমুক্তি কই?'

ঝুলনি যত্ন করে আঁচলের গিঁটে পয়সা বাঁধে।

তনখা কত তোদের?

জিগ্‌গেস করে স্বদেশী বাবু। আমাদের মণিলাল। জমিদারের ছেলে। বেকার বসে না থেকে দেশের কাজে লেগেছে। দেশের কাজ মানেই দুঃস্থ-দুঃখীর কাজ। আর সব চেয়ে অধন-অধম, সব চেয়ে অধঃপেতে আর কে আছে এই মেথর-ধাঙড় ছাড়া?

তন্‌খা বলতে বারো-চোদ্দ, ভাতা বল্‌তে পাঁচ টাকা। এতে কী হয়? এতে তো জল গরমও হয় না।

ক'ঘর আছিস তোরা?

আগে প্রায় পঞ্চাশ ঘর ছিনু। আকালের বছর বহুৎ উজাড় হয়ে গেল। মাটি দেয়া গেল না, বাঁশে বেঁধে একে-একে নদীতে ফেলে দিয়ে এনু। এখন আছি মোটে কুড়ি-বাইশ জন—জরু-খসম নিয়ে। হাড়-জিরজিরে গা, শরীর একেবারে নাই হয়ে গেছে। জোয়ান-ভর্তি বয়সের যে কটা মেয়ে ছিল ব্যামোয়-ব্যামোয় জেরবার হবার আগেই পাঠিয়ে দিনু শহরে-বাজারে। কলকাতায়। তবু :খেয়ে-পরে থাক বেঁচে-বত্তে। এইখানে পড়ে আছি আমরা বুড়ো-হাবড়া আর ক'টা গুঁড়োগাড়া। ছেলে যে ক'টা বড় হচ্ছে বিয়ে-সাদি হতে পাচ্ছে না। বউ আনতে হয় দুমকা নয়তো ভাগলপুর থেকে, কিন্তু বউ কিনে আনি তেমন পয়সা কই? তারা আসবে কেন এই ভাগাড়ে? ~লে, খেতে খুদ নেই বসতে পিঁড়ে।

তোমাদের সর্দার কে? সর্দার বিরিজলাল। তন্তুসার চেহারা, রোগে-ভুগে ধুঁকছে, ঢকঢকে হয়ে গেছে। সমস্ত গায়ে খোস-চুলকানি। এক দণ্ড সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না, সব সময়েই খসখস ঘসঘস করছে।

শুধু একা আমার নয় হুজুর। ঘরগুষ্টি সকলের এই খুজলিপাঁচড।

দেখুন এই ঘর-দোরের অবস্থা। মাটির মেঝে, মাটির দেয়াল, খড়েব চাল। জায়গায়-জায়গায় খড় খসে পড়ছে। বাদলা হলে নালে জল পড়ে। ঐ দেখুন সব ফাঁক-ফর্সা হয়ে আছে, এখনো মেরামত হল না। মানুষের ঘর-দুয়ার? না আঁটকুড়-পাঁটকুড়?

তার পর, একেকটা ঘরে একেকটা পরিবার। এক ঘরেই শোয়া-বসা খাওয়া পরা জনম-মরণ। আড়াল-আবডাল নেই। এক কোণে ছেলে হচ্ছে, এক কোণে মরছে। বাপ-মা মেয়ে-জামাই ছেলে-বউ সব এক কামরা। ঘেরা নেই, সব এক সামিল।

শুধু কি তাই? এই দেখুন, দেয়ালে-মেঝেতে ছারপোকা থিক-থিক করছে, কেঁথা-কানি, তালাই-চাটাই এমন কি রুটি-চাপাটির মধ্যে ছারপোকা। মশা? সন্ধ্যে হবে, মনে হবে ঝম্প বাজছে। বাঁচি কি করে? ভুলি কি করে? ঘুমে অসাড় হয়ে যাই কি করে?

মানুষের অধঃপাতে যাওয়া কাকে বলে মানুষ হয়ে দেখছে তাই মণিলাল। এর প্রতিকাব কি? মেথরের দল শূন্য চোখে চেয়ে রইল।

'চেয়ারম্যানকে বলেছ?'

বলে-বলে হদ্দ। কিছু করেন না। শুধু ঠেঙা মেরে কথা বলেন, হাকিম নিম-হাকিমদের সঙ্গে খাতির-পীরিত করবাব জন্যে চেয়ারম্যান হয়েছি, চেয়ারম্যান হয়েছি কি মেথর-মুদ্দোফরাসের ঝামেলা পোহাতে?'

'ভাইস-চেয়ারম্যান?'

সে আছে তদন্ত-তদবিরে। কে নক্‌সা-মত দেয়াল তুলছে না। কার পাইখানা রাস্তার উপর উঠে আসছে তার তালাসে-নালিশে। এক কথায়, ফন্দি-ফিকিরে। আমরা কিছু বলতে গেলে বলে, খোদ থাকতে আমার কাছে কেন?

'ডাক্তার?'

গায়ে হাত ঠেকাবে না, ছোঁয়া লেগে জাত যাবে। এমন কি বুকে ব্যথা লাগলেও কম্পাস লাগিয়ে দেখবে না আমাদের বুক-পিঠ।

'আর ওভারসিয়ার বাবু?'

ও তো লাটসাহেবের ছোট নাতি। মাথায় ধুঁচনি এঁটে সাইকেল করে ঘোরে রাস্তায় রাস্তায়। আর ফন্দি খুঁজবে জরিমানা করতে পারে কি না।

'তবে তোমাদের দেখে-শোনে কে?'

'দেখে তো ধনপত, শোনে তো ধনপত। আর আমাদের কেউ নেই।

'কিন্তু, ও তো টাকায় এক আনা করে সুদ নেয়'। ঝাঁজিয়ে উঠে মণিলাল।

তা নেবে বৈ কি। নইলে ঘরের টাকা সে দাদন দেবে কেন? কম সুদ আর কে দিচ্ছে তাদেরকে? মরা-হাজায় ব্যামো-পীড়ায় মদে-ভাঙে কার কাছে গিয়ে তারা হাত পাতবে? সুদের হার চড়া রেখেছে বলেই তো রাশ রেখেছে একটা, নইলে কবে দফা নিকেশ হয়ে যেত। হাঁড়িতে আর চাল চাপত না, ঘসি-কাঠি জোগাড় হত না উনুনের। ওষুধ আসত না। যা পেতাম ত মদ খেয়েই টেঁসে দিতাম।'

'মদ রোজ চাই?'

'বারো মাস, তিরিশ দিন। নোংরা ঘেঁটে এসে— যেখানে আমরা থাকি — সে জায়গা যে আউর ভি নোংরা। যদি মদ না খাই সে নোংরা আমরা সহ্য করি কি করে? ঘর আঁধার করে দিয়ে ঘুমাই কি করে অজ্ঞানের মত?'

'আগে তোমাদের এখানে কাবলিওয়ালা আসত?'

'ও, অনেক। ও শালারা সব পালিয়ে গেছে।'

'যায়নি পালিয়ে। ধনপত সেই কাবলিওয়ালার সাকরেদ। কাবলিওলার পাকানো লাঠি এখন তার হাতে বেঁটে পেনসিল হয়েছে।'

ছি ছি ছি, এ কি কথা। এ বাত ঠিক নয়। ধনপত তাদের দেবতা। ফাগুন মাসে তারা যে সূর্যি-পূজো করে সেই সূয্যিঠাকুর।

মণিলাল এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইলো। বললে, 'মাইনের টাকা পাও কতো হাতে?'

কেউ বারো আনা, কেউ দেড় টাকা, কেউ বড় জোর ন' সিকে।

সতেরো টাকার মধ্যে? বাকি টাকা যায় কোথায়? ধনপতের পাগড়ির মধ্যে । পাগড়ি ফুঁড়ে পেটের মধ্যে।

তা ছাড়া উপায় কি। সারা মাস হাওলাত করে খেয়েছি তার উশুল নেবে না ধনপত? হাওলাত না করে উপায় কি আমাদের? বাংলা কাজ যা পাই মদ খেয়ে বাজারের জন্যে কিছুই বাঁচাতে পারি না। বালক বেলা থেকে মদ খাচ্ছি; পালে-পরবে, শ্রাদ্ধে-ভোজে তেজী হয়ে ওঠে মদের খাঁই। আমাদের মদ ছাড়তে বলাও যা, মহাজনকে সুদ ছাড়তে বলাও তাই। আর মহাজন সুদ নিলে কি হবে, তদবির তদারকও এ-ই করে। শিলিপ মিটিয়ে মুদি-দোকান থেকে চাল-ডাল তেল-নুন বাড়ি পাঠায়। উটকো ডাক্তার ডাকায়। ঘর-দোর সাফ করে।

যদি বলতে হয় চেয়ারম্যানকে গিয়ে বলুন। চেয়ারের পায়া ভেঙে দিন। ভাইস-চেয়ারম্যানের ঘুষ নেয়া বের করে দিন। ডাক্তারের হাত থেকে কেড়ে নিন কম্পাস। টুপিমাথায় ওভারসিয়ারকে নামিয়ে দিন সাইকেল থেকে। শিবিরের বন্ধু ছোট-চাকুরে এই ধনপতি— তার পিছে লাগা কেন? গরিবের তত্ত্বতালাশ করে যে, গরিবের সঙ্গে ওঠাবসা করে যে, তার যত অপরাধ। আর তোমরা যারা বড়লোক— চেয়ারম্যান আর কমিশনার— তোমাদের কোনো জবাবদিহি নেই।

'কিন্তু'। মণিলাল খুশিমুখে বলল, 'বড়লোকেরা যদি না শোনে, তা হলে?'

'তা হলে আর কি। এমন করে খসে-খসে পচে মরব।'

'তোমরা শুয়োর খাও না?'

'পাই কোথায়? দর-দাম ঠাণ্ডা নেই, আজকাল।'

'খেতে বলছি না। কিন্তু শুয়োর কী ভাবে থাকে দেখেছ তো?'

'দেখব কি। সেই ভাবেই আছি আমরা।'

'কিন্তু এ ভাবে থাকবার দিন দূর করে দিতে হবে জোর করে। তোমরা স্ট্রাইক করবে।'

'টাইট' করবে। এমন কথা শুনেছে তারা হাওয়াতে। 'টাইট'? দুর্দিনের জগদ্দল পাথর সরিয়ে দিতে পারবে তারা।

বেশি কিছু চাই না। ঘর বাড়াতে হবে, চাল ছাওয়াতে হবে, মাইনে বাড়াতে হবে পাঁচ টাকা।

'যাতে, আমদানি ভাল হলে, আমরাও একটু পিতে পারি দারু'—বললে মেথরানিরা।

জটিল মামলা সওয়াল করবার সময় দু'আঙুলে টাক চুলকোন ননী। বলেন, 'করি কী বল? মিউনিসিপ্যালিটির আয় কই? বারে-বারে জলের ট্যাঙ্ক যাচ্ছে ফুটো হয়ে। মেরামতির মাশুল নেই। কলকব্জার দাম বেড়ে গেছে দু'শো গুণ।

শুধু মানুষের কলকব্জাই জং ধরে অচল হয়ে যাক। বাকি ওয়ার্ডগুলোতে ল্যাট্রিন ট্যাক্স বসান না কেন?

টেঞ্চিং গ্রাউণ্ড কাটাতে হবে যে তার পয়সা কই?

এমনি জেনারেল রেট বাড়িয়ে দিতে বাধা কি? প্রফেসন্যাল ট্যাক্সও বসেনি এখনো।

ওরে বাবা, আবার ট্যাক্সো। তা হলে আগামী মেয়াদে আর রিটার্ন দিতে পারব না। জানো তো, দু'বছর উকিল এক বছর মোক্তার—এই প্যাক্ট হয়ে আছে এখানে। আমার আরো এক মেয়াদ বাকি।

আর কিছু না পারেন, ধনপতিকে ডিসমিস করুন। শুষে-শুষে শেষ করলে সে ধাঙড়দের। টাকায় এক আনা করে মাসে-মাসে সুদ নেবে এই আইন আবার চালু হল কবে? এক হাত ঘাড়ে এক হাত পায়ে — এরকম বদমাস আর দেখা যায় না।

তাই না কি? কই, মেথররা তো নালিশ করেনি কোনো দিন। ননী বাবু বোকা সাজলেন: 'আমরা বরং জানি ধনপতি ওদের ঝক্কি নিয়ে আছে, আপদে-বিপদে বুক দিয়ে পড়ছে। তাই না রে বিরিজলাল?'

ভেজা বেড়ালের মত চেহারা করে আছে বিরিজলাল, মোক্তারের পিছে মুহুরির মত। কী কথা বলা ঠিক হবে কে জানে।

চোখ চেয়ে তোলান দিতে লাগল মণিলাল। বিরিজলাল বললে, 'ওই তো আমাদের সব দুঃখ-ধান্দার মূল, বাবু। আমাদের মাইনের টাকা ঘরে আনতে দেয় না। কর্জ খাইয়ে নাজেহাল করে রাখে।'

প্লাস-মাইনাস চশমার কোন অংশে চোখ রেখে বিরিজলালের মুখের দিকে তাকাবেন পলকের জন্যে ননীবাবু ঠিক করতে পারলেন না।

গর্বে মণিলালের বুক ফুলে উঠল। বোবার মুখে বোল ফোটাতে পেরেছে। এখন খোঁড়াকে দিয়ে পাহাড় ডিঙোতে হবে।

ভাইস-চেয়ারম্যান কোথায়?

সে গেছে এনকোয়ারি করতে। তার বারো মাস এনকোয়ারি। কে মুনসিপালটির মাটি কাটল, নর্দমা মারল রাস্তা ঠেলল তার সরজমিন তদন্ত। তার মানে, হাতে হাতে কিছু দাও, ফর্সা রিপোর্ট যাবে। আর কমিশনর বাবুরা কোথায়? তারা সব কনট্রাক্টরের বাড়িতে। বেনামদারের মুনফা নিতে। আর, আপনি বুঝি ডাক্তার?

নামটা শুনতে অমনি জমকালো। খুদ খেয়ে দুধের ঢেঁকুর তুলছি। মাইনে মোটে কুড়ি টাকা। পোষায় না, মশায়। ওরা-আমরা সব এক দলে। যেমন কন্যা রূপবতী তেমনি পাত্র মাধা তাঁতি। স্ট্রাইক করিয়ে দিন, মশায়।

তা আর বলে দিতে হবে না আপনাকে।

ঐ, ঐ যাচ্ছে লাট সাহেবের ছোট নাতি। টোপর মাথায় ওভারসিয়র বাবু।

ওকে ধরে কী হবে? কাশতে গেলে কোপনি ছেঁড়ে ওর কী মুরোদ।

ধনপতি কোথায়?

ধনপতকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ধনপত পালিয়ে বেড়াচ্ছে। দেখ একবার মজাটা। আগে দেনদার পালিয়ে বেড়াত, এখন মহাজন পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

দরকার নেই জবাবদিহিতে, তর্কাতর্কিতে। কথা ছেড়ে কাজ করো। নিজের পায়ে দাঁড়াও।

হ্যাঁ, 'টাইট' করল মেথররা। দাবি তাদের যৎসামান্য। ঘর না বাড়াও, সারিয়ে দাও। দাও মাগনা ডাক্তারি। আর বাড়তি মাইনে পাঁচ টাকা।

'টাইট' তো করল, কিন্তু 'টাইটে'র ক' দিন খাবে কি তারা? ধনপতের কাছে তো আর যাওয়া চলবে না।

খবরদার, কখনো না। মণিলাল হুংকার দিয়ে উঠল : 'আমি তোদেরকে টাকা দেব। আমার টাকা মানে পাঁচ জনের টাকা—তোদেরই মতন পাঁচ জনের থেকে চেয়ে আনা টাকা। আজ ওরা দিচ্ছে কাল তোরা দিবি। ঐ টাকা তোদের শুধতে হবে না। ক'টা দিন শুধু থাক একটু কষ্ট করে।'

'কিন্তু এক ঢোঁক মদ না খেলে চলবে না বাবু।'

'তা খাবি বই কি। তা না খেলে চলবে কেন? কিন্তু মনে থাকে যেন, ঐ এক ঢোঁক। এক-পেট করবার জন্যে যেন যাসনে ধনপতের কাছে।'

কখনো না। অকাল-মহামারী হলেও না।

কে এক হাজরা শুয়োরের পাল নিয়ে চলেছে মেথরপটির সমুখ দিয়ে। খাসী শুয়োরও আছে দু'তিনটে। বেশ মোটা-সোটা। তেলালো শুয়োর।

বিরিজলাল বেরিয়ে এল ঘরের থেকে। বেরিয়ে এল আরো অনেকে। কত বচ্ছর শুয়োর খায়নি তারা। দেখেনি এমন চোখের সামনে।

কোথায় যাচ্ছ শুয়োর নিয়ে?

বিলে চরাতে নিয়ে যাচ্ছি।

ঐ দিকে বিল কোথায়?

ঘুর-পথে চলে এসেছি ভুল করে।

বেচবে না কি এক-আধটা?

কিনতে হলে খাসীই কিনতে হয়। দাম বলে কি না পঁচিশ টাকা। অত গরমাইয়ে দরকার নেই, ঠিক-ঠাক বলো। ঘষে-মেজে আঠারো টাকা রফা হল। কিন্তু টাকা? টাকা কে দেবে?

'টাইটে'র টাকা এক-আধটা করে এখনো আছে সবার কাছে। তাই দিয়ে চালিয়ে দাও। তিন দিন 'টাইট' হয়ে গেছে, ঢের হয়েছে। শুয়োরের কাছে আবার 'টাইট' কি। পেট পুরে মদ খাব না বুঝি, কিন্তু মাংস খাব না এমন কড়ার নেই। দিয়ে দে যার কাছে যা আছে। পথ-ভোলা শুয়োর এমন মিলবে না হামেসা।

চাঁদার টাকা চাঁদা করে দিয়ে দিল সবাই।

হা-রা-রা-রা-রা। পুরুষ মর্দ সবাই বেরিয়ে এল লাঠি নিয়ে। তাড়াতে-তাড়াতে মারতে-মারতে বাছাই শুয়োরটাকে ফেলে দিল ডোবার জলে। জলে চুবিয়ে মারলে। এদিকে শুয়োরের আর্তনাদ ওদিকে মেথরদের গাঙাড়ি।

মরা শুয়োরটাকে এবার আগুনে ঝলসাতে হবে। আগুন করবে কি দিয়ে? আর কিছু না পাও চালের থেকে খড় টেনে নাও। চাল এমনিতেও ফাঁকা অমনিতেও ফাঁকা। যে যেমন পারল টেনে আনল খড়ের গোছা। আগে একনালে জল পড়ত। এখন না হয় ঝোরে-ঝোরে পড়বে। ও প্রায় একই কথা?

লাল টকটকে করে পোড়ানো হয়েছে চামড়াশুদ্ধ। এবার বনাও, কাটো, বঁটি আনো, চাকু আনো। ভাগ-বাঁট করো। ঝামা দিয়ে ঘষে-ঘষে রোঁয়া তুলে ফেল।

মাংস হল, মদ হবে না?

ওরে বাবা, মদ না হলে তো সব মাটি। দিগেন সা মদের দাম কমিয়ে দিয়েছে এক আনা। দে, কার কাছে কি আছে বার কর এই বেলা। না থাকে তো ঘটি-বাটি বাঁধা দে। কালকের কথা কালকে, আজকে তো ফুরতি করে লি।

ঘরে-ঘরে পেঁয়াজ-রশুন ঝাঁই-মরিচের গন্ধ বেরুচ্ছে। ধিয়া তাধিন নাচছে মেথররা। মদ খেয়ে নেশায় ভোঁ হয়ে আছে কেউ। কাজিয়া-ঝগড়া করছে কেউ-কেউ। কেউ গাল-কুবাক্য করছে। বড় ফুর্তির দিন আজ।

আজ কারুর শ্রাদ্ধ-পিণ্ডি হলে হত না? কত দিন কত লোক মরেছে, কিছু খায়নি তারা শ্রাদ্ধ খায়নি তারা, শ্রাদ্ধে খায়নি এমনি মদ-মাংস। আজ কেউ মরতে পারে না তাদের জন্যে? তবে অনায়াসে ভাবতে পারে তারা শ্রাদ্ধে-ভোজে আনন্দ করছে।

কিন্তু কে মরবে? ঠসা বুড়ো ঐ সোমরা মেথর আছে। ওকে ধরে মারো। বেঁচে থেকে ওর কোনো ফয়দা নেই। বাঁশ দিয়ে বাড়ি মারতে-মারতে ওর ছাল ছাড়িয়ে দাও। তারপর ওর কলজেটা ছিঁড়ে নিয়ে খেয়ে ফেল মদের মুখে।

ঠিক। শ্রাদ্ধ করে কি হবে? তার চেয়ে বিয়ে হোক। বিয়ে হবে তো কনে কই? দুত্তোর বর-কনে। 'রাঙ্গা বর মিলে কেমন রাঙ্গা কনের সনে কনের বাবা ঢুলে পড়ে বরের মায়ের সঙ্গেত্রে।'

দূর ঝাঁটাখেকো। দূর খালভরা।

পরদিন মণিলাল তো অবাক। ঝাঁটা-বালতি হাতে নিয়ে মেথররা সব কাজে বেরিয়েছে। চালে খড় নেই, হাঁড়িতে চাল নেই, ট্যাঁকে নেই আধলা পয়সা। আবার সর্ব গায়ে সেই খসখস ঘষঘষ।

সমস্ত কিছুর মূলে ঐ ধনপতের কুচক্র। বুঝতে পেরেছিস?

হ্যাঁ, বাবু।

কী বুঝতে পেরেছিস? ওই শুয়োর নিয়ে বিশে হাড়িকে পাঠিয়েছিল ধাঙড়পটিতে। ওই দিগেন সাকে দিয়ে মদের দাম শস্তা করে দিয়েছিল। দূর বোকা, উজবুক, আহাম্মক।

হ্যাঁ বাবু।

লাঠি ধরে শুয়োর ঠ্যাঙাতে পারিস। পারিস সোমরা বুড়োর শ্রাদ্ধ করতে।

কিন্তু যার মাথার পরে লাঠি ধরা দরকার—

হ্যাঁ, বাবু। বলতে হবে না। বুঝতে পেরেছি।

রেজিস্ট্রি অফিসে গরুর গাড়ির প্রকাণ্ড আঁট হয়। সেই আঁট থেকে ফিরছিল ধনপতি। হঠাৎ তার মাথার উপরে লাঠি পড়ল একটা। সন্ধে হয়ে আসে। আর চার পাশে ঘোরালো ঝোপঝাড়। লোক দুটোকে চিনতে পারে ধনপতি। পেরুয়া আর সোনেলাল।

ধনপতি হাসল। পাগড়িটা মাথার উপরে ঠিক মত বসিয়ে বলে উঠল ঃ মাথার উপরে বাবা বরতমান। বাবা বম ভোলা। ছেলিয়াকে বাপ সামলাহে চলবে না তো কি। এক দিন মান্‌সো খেয়ে কত তোদের তাগদ হবে? সঙ্গে মদ খাচ্ছিস না? হাতের টিপ কি যাবে নেশার ঘোরে। বাবার সঙ্গে চালাকি?

কিন্তু চেয়ারম্যান অমন ঠাণ্ডা ভাব দেখাতে রাজি নয়। ঝাঁটা-বুরুশ লাঠি তুলেছে বেটারা, এবার বুঝুক লাঠির কেরামতি।

ধনপতি রাজি হয় না। না হোক। চেয়ারম্যান পুলিসে খবর দিলেন।

এই তো ঠিক কথা। মণিলাল বললে মনে মনে। যত বেশি মার তত বেশি শক্ত হবে। আর কী চাই। কথা বলতে শিখেছে, পায়ে ভর করে উঠে দাঁড়াতে শিখেছে। হাতে ধরতে শিখেছে আক্রমণের লাঠি। যে অন্ধ সে নাগাল পেল, যে খোঁড়া সে পেল পদক্ষেপ।

মেথররা আবার 'টাইট' করলে। মদ-মাংসে এবার তারা ভুলছে। তাদের পিছনে পুলিস লেগেছে যখন তখন তারাও মাটি কামড়ে মাটির সঙ্গে লেগে থাকবে। এবার চাঁদা আসবে ঝাঁকে ঝাঁকে।

ধনপতি বললে, 'এখন আমরা হেরে যাই আসুন। ওদের এক টাকা মাইনে বাড়িয়ে দি।'

চেয়ারম্যান ঢোঁক গিললেন ঃ 'তুমি মাইনে বাড়িয়ে দেবার কে?'

'আমি কেউ লয়। আপনারা কমিশনার বাবুরা মিলে মিটিং করে এক টাকা করে মাইনে বাড়ান। তাব পর আমি দেখে নেব। মুনসিপালটিরও খরচ হবে না, আমারও লোকসান কমবে না। মুনসিপালটির কাগজ-কলম আমারও হিসাব-কিতাব।' ধনপতি চোখ ছোট করল।

'যা বলেছ। আর পারি না ঝামেলা সইতে। কিন্তু মারপিটের কেস কি।'

'ও আমরা তুলে লোব। চোট-জখম লাগল না, বাবা বাঁচিয়ে দিলে আবার মোকদ্দমা কি।'

যা চিরদিন বলে এসেছে মেথররা—ধরে তো ধনপত, করে তো ধনপতি আঁচায়-বাঁচায় ধনপত।

ধনপত শুধু মাইনে বাড়িয়ে দিলে না, মামলা পর্যন্ত তুলে নিল।

মণিলাল ওদের কাছে ব্যাখ্যা করতে এল, কোথায় ওদের জোর, কোথায় ওদের জিত। আর ঘাসের রঙের সঙ্গে রঙ মিশিয়ে যে সাপ থাকে, নিজেকে যে চিনতে দেয় না, তার মত খল আর নিষ্ঠুর ঐ ধনপতি।

নেহি মাশায়। ও আমাদের মাটিয়া ঠাকুর। আমাদের বম ভোলা।

এবার মেয়েরা এল ধনপতির দরবারে।

বললে, 'মাইনে বাড়ল এক টাকা, কিন্তু আমাদের কি সুবিধে হল?'

'কেন তোদেরও তো মাইনে বেড়েছে।'

'তা বেড়েছে বৈ কি। কিন্তু বুঝতে পারছি কই?'

'কী চাস তবে?'

'ওরা বলত, আমদানি বাড়লে মদ দেবে খেতে। এক টাকা করে দু'টাকা আমদানি বাড়ল, আমরা এখনো মদ খেতে পাবো না?'

'পাবি বই কি। তোদের কথা ভেবেই তো মাইনে বাড়িয়ে নিই দিল।'

করে তো ধনপত, ধরে তো ধনপত।

'লে, এক টাকায় পনেরো আনা পয়সা লে। খা গে পেট ভরে। টসটসে হ গে। এবার তোদের জন্যে আমাকে লতুন খাতা তৈরি করতে হবে। তোদের লতুন আমদানি, আমার লতুন খাতা। এই দ্যাখ।'

মেথরানিরা হেসে উঠল। এ ওর গায়ে ঢলে-ঢলে পড়ল। ছেঁড়া-খোঁড়া ছাবা শাড়ি পরনে। অমানুষে পেয়েছে এমন চেহারা। মদের কথায় যেন তারা হারানো যৌবনের কথায় ফিরে আসে। ঝুলনি আর মুঙ্গিয়া, সুবন্ন আর বিলাসন। জ্বর-জ্বালা শোক-তাপ ভুলে যায়।

চুচ্চুরে মাতাল হয় মেয়েরা। রান্না করে না। ডাল-ভাত পুড়িয়ে ফেলে। ছেলে ঠ্যাঙায়। একে অন্যের সঙ্গে খেয়োখেয়ি করে।

তারপর পুরুষরা যখন মাতাল হয়ে ফিরে আসে, বেধে যায় মহাপ্রলয়। এ খুলে নেয় বাঁশের খুঁটি, ও খুলে নেয় বেড়ায় বাঁখারি।

কি রে, এত হুড়-ঝগড়া কিসের? মণিলাল নয় ধনপতিই ফিরে আসে মেথরপটিতে। 'যারা নরক ঘুচিয়ে বেড়ায় তাদেরই নরক ঘোচে না সংসারে।' বলে, কি রে, রান্নাবান্না হয়নি? ঘরে দেখি চাল-তেল-নুন তরি-তরকারি কিছুই নেই। এই লে, শিলিপ লিয়ে যা মুদিখানায়। লিয়ে আয় বাজার করে। আর, তুই গেরস্ত বৌ, ভাতার-পুতকে রান্না করে না দিলে চলবে কেনে? বা আখা ধরা।'

মদের পর আবার ভাত-ডালের ব্যবস্থা করে দেয় ধনপতি।

ধরে তো ধনপত, করে তো ধনপত। আঁচায়-বাঁচায় ধনপত।

গো-গাড়ির গারোয়ানের শুধু এ হুঁকা। গলা ছেড়ে গান গাইছে :

'পরাণের হুঁকা রে
কে রাখিল তোর নাম ডাব্বা রে—'

হঠাৎ মওড়া নিল ধনপতি। হাঁকার দিয়ে উঠল ঃ 'কে যায়? রোকো।'

গাড়োয়ানরা জেনে নিয়েছে, চিনে ফেলেছে। ট্যাঁক থেকে পয়সা বের করলে। টিকিটের ট্যাক্সো নয়—টিকিটের ট্যাক্সো তো অদানে অব্রাহ্মণে হবে। তার চেয়ে কম-সম করে কিছু গুঁজে দাও ধনপতির হাতে, গাড়ি এখুনি পাশ হয়ে যাবে। তোরাও বাঁচবি আমিও বাঁচব। কারু সাধ্যি নেই আর তোদের পথ আটকায়।

সে দিনের সেই খাণ্ডার-মূর্তি ধনপতি, আজকে একেবারে গোপালের মত ঠাণ্ডা।

কিন্তু পথ আটকালো মণিলাল। বললে, কেন তোরা ধনপতকে ঘুষ দিবি?

নইলে পুরোপুরি ট্যাক্সো দিয়ে টিকিট কাটতে হলে আমাদেরই লোকসান।

হোক লোকসান, তবু ঘুষ দিতে পারবিনে। জোর করে চলে আসবি ঘুষ না দিয়ে।

তার চেয়ে এ ঢের শান্তি। নিশ্চিন্ত থাকতে পারলে হুঁকোর টানে বেশি সোয়াদ পাব। ধনপতকে আমরা ঘুষ দিচ্ছি কে বলে? আমাদের দিয়ে ভালোমানুষি করে তারই বখশিশ দিচ্ছি।

কে তোদের ধনপত?

সেই মন্ত্র এত দিনে ওদেরও শেখা হয়ে গেছে। বললে, 'কাড়ে তো ধনপত, ছাড়ে তো ধনপত, আঁচায়-বাঁচায় ধনপত।'

ভাল গাড়ির টানে পিছের গাড়ি এগিয়ে যায়।

সন্ধ্যা হয়ে আসে

সরোজকুমার রায়চৌধুরী

বাংলাদেশে আমার কথা শোনাবার কি আজ লোক আছে?

চোখের সামনে দেখছি, মেয়ে-পুরুষ সবাই পাগলের মতো ছুটে বেড়াচ্ছে শুধু দুবেলা দুমুঠো ভাতের জন্যে। সকলেরই নিজের দুঃখই এককাহন। অন্যের কথা শোনার সময় কই?

তবু যে নিজের কাহিনী বলছি, সে শুধু বলার ঝোঁকে। শোনাবার জন্যে নয়। বিরল অবসরে যদি কেউ শোনে ভালোই, না শোনে তার জন্যেও দুঃখ করব না। যা দিন পড়েছে দুঃখ আজ আর কেউ কিছুরই জন্যে করে না। কারও জন্যেই না। নিজের জন্যেও না।

আমি একটি উদ্বাস্তু মেয়ে। আমার নাম করবী।

অনেকদিন আগে আরও অনেক মেয়ে-পুরুষ, বুড়ো-বুড়ি ছেলেপুলের সঙ্গে জোয়ারের জলে ভাসতে ভাসতে পশ্চিমবঙ্গের ঘাটে এসে লাগলাম। কতদূরের অখ্যাত একটি ছোট্ট গ্রাম থেকে একেবারে কলকাতার রাজধানী শহরে।

মনে কত ভয়। কত আশা।

চারিদিকে গিস গিস করছে কত লোক। ভয় করত তাদের দেখে। আশাও জাগত। এত লোকের মধ্যে এসে পড়লাম, এরা আমাদের বাঁচাবে।

শেয়ালদা ষ্টেশনে ঘর বাঁধলাম।

বরুণের বাপ-মাও আমাদের সঙ্গেই আসছিল, অথবা গ্রাম ছেড়ে আমরা সবাই একসঙ্গেই আসছিলাম। গোয়ালন্দে পৌঁছে দেখা গেল, তারা কেউ নেই। শুধু বরুণ রয়েছে। সে এক দুশ্চিন্তা।

কোথায় গেলেন তাঁরা? কোন্‌খানে পিছিয়ে পড়লেন এবং এই অবস্থায় কি অবস্থায়ই আছেন তাঁরা। বেঁচে আছেন কিনা তাই বা কে জানে!

আমাদের দুই পরিবারের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব। অনেকদিনকার বন্ধুত্ব। সেই বন্ধুত্ব আরও বেড়েছে বরুণের সঙ্গে আমার বিয়ের কথা পাকা হবার পর। বৈশাখ মাসে ঠিক হয়েছিল অঘ্রাণে বিয়ে হবে।

ইতিমধ্যে এই কাণ্ড।

দেশ বিভাগ। হিন্দুস্থান আর পাকিস্তান। দেশ ছেড়ে পালাবার হিড়িক।

গ্রাম ছেড়ে যখন বার হই তখন এই চলা আর কোনোদিন থামবে না। চলতে চলতে কোনোদিনই আর অঘ্রাণে এসে পৌছুব না। যে গাঁটছড়া মনের মধ্যে বাঁধা হয়ে গেছে, বাইরে তা বাঁধবার আর সময় পাওয়া যাবে না।

বাপ-মাকে হারিয়ে বরুণ কাঁদতে লাগল। কিন্তু কাঁদবার সময় তখন নয়। বুক বাঁধবার সময়। পিছনে চাওয়া নিষ্ফল। পিছনে শুধু অন্ধকার। মরা মানুষের হাসিতে সেই অন্ধকার পঙ্কিল হয়ে উঠেছে।

আমার বাবা-মা তাকে বোঝালেন। আমিও সান্ত্বনা দিলাম। তাঁদের খুঁজতে ফিরে যাওয়ার কোনো মনে হত না। সেই ডামাডোলে মানুষ তার নিজের হাত খুঁজে পাচ্ছে না। তার চেয়ে ভালোয় ভালোয় কলকাতা গিয়ে পৌঁছুতে পারলে তাঁদের জন্যে অপেক্ষা করা যাবে। এছাড়া উপায় নেই।

মা সান্ত্বনা দিলেন, হয়তো কোনো ট্রেন ফেল করেছে। কিংবা স্টিমার। পরের স্টিমারে ঠিক সবাই পৌঁছে যাবেন।

কাঁদতে কাঁদতে বরুণ আমাদের সঙ্গে এল।

শেয়ালদা স্টেশনই আমাদের আশ্রয় হল। আর পাঁচজনের মতো আমরাও বাক্স-বিছানা ইঁট-কাঠ দিয়ে আমাদের ঘর করে নিলাম।

বরুণ হাসল।

বললে, দেখ মানুষগুলোর কাণ্ড! সবাই ঘর-ছাড়া। স্টেশনের সরকারি প্ল্যাটফর্মে আশ্রয় যদি মিলল, সঙ্গে সঙ্গে ঘর বাঁধতে বসে গেল! ক'দিনের ঘর কেউ জানে না।

হাসির কথাই বটে। সম্পত্তিবোধ তার রক্তের মধ্যে রয়েছে। যেখানেই যে বাস করবে সেখানেই তার নিজস্ব ঘর চাই। একলা তার, —তার নিজের, তার স্ত্রী-পুত্র-কন্যার। অন্য কারও নয়।

আমরা সবাই বেড়া দিয়ে আমাদের নিজের নিজের সীমানা ঠিক করে নিলাম।

দুটি মেয়ের সঙ্গে এখানে ভাব হল। আমারই সমবয়সী। দু-এক বছরের বড় হতেও পারে। একজনের নাম করুণা, আর একজনের নাম সরমা।

আমরা সবাই উদ্বাস্তু। বাড়ি হয়তো এক জেলায় নয়। ভাষারও তফাৎ ছিল। কিন্তু সেকথা মনেই হত না। শেয়ালদা স্টেশনে বসে মনে হত, ঢাকা, বরিশাল আর কুমিল্লার সেই তিনটি গ্রাম যেন পাশাপাশি। একই অশ্রুর নদী যেন তিনখানি গাঁয়েরই পাশ দিয়ে বয়ে চলেছিল। আর আমরা তিনজনেই তা বয়ে নিয়ে এসেছি এই শেয়ালদা পর্যন্ত আমাদের চোখে করে, অবিশ্যি আরও অসংখ্য লোকের সঙ্গে। তবু তাদের সকলের চেয়ে ওই দুটি মেয়ের সঙ্গেই ভাব হয়েছিল বেশি।

এমন হয়। কেন হয় জানি না।

কাছাকাছি আমাদের ঘর। চলতে-ফিরতে দেখা তো হতই। তাছাড়া অনেক সময়। হাতে যখন কাজ থাকত না, তিনজনে একসঙ্গে বসে গল্প করতাম।

দুঃখের গল্পই বেশি।

করুণার বাবা ছোট-খাটো বুড়োমানুষ, নিঃশব্দে বসে অনর্গল তামাক খেতেন। কেমন কুঁজো হয়ে গেছলেন। করুণা বলে, কুঁজো নাকি ছিলেন না। পূর্ববঙ্গ থেকে এই পথটা আসতে কুঁজো হয়ে গেলেন! কারও সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা বলতেন না। নিজের বাড়ির লোকজনের সঙ্গেও না। ডাকলে খেতে যেতেন। না ডাকলে তাও যেতেন না, আপনমনেই তামাক খেয়ে চলতেন।

অনেক সময় দেখতাম, হুঁকো থেকে ধোঁয়া উঠত না। তবু হুঁকো টানার বিরাম নেই!

সব সময় অন্যমনস্ক। চোখ মাটির দিকে। চোখ তুলে কখনও কারও দিকে চাইতে দেখিনি।

ভারি কষ্ট হত তাঁকে দেখে।

তার চেয়েও কষ্ট হত সরমার দাদাকে দেখে। জোয়ান ছেলে। সব সময় দুটো কাঠি নিয়ে জাল বুনে চলেছে, বিনি সুতোয়।

ঠাট্টা করে জিগ্যেস করতাম, কি কর হেমন্তদা?

—জাল বুনতাছি, দেখস্ না?

কি জানি কি জাল, কিন্তু চোখে দেখা যেত না।

জিগ্যেস করতাম, কি অইব জাল বুইনা?

—মাছ দরুম। খাইতে অইব না?

—মাছ? এহানে মাছ কই?

—আছে।

হেমন্তদা আর কথা কইত না। আবার জাল-বোনায় মনঃসংযোগ করত।

স্টেশনে নিরিবিলি জায়গা ছিল না। সর্বত্র ভিড়। সর্বত্র মানুষের ছুটোছুটি হুড়োহুড়ি। কিন্তু ঘর থেকে একটু দূরে হলে সেইটেই আমরা ভাবতাম নিরিবিলি।

হয় এদিকের বেড়ার ধারে, নয় ওদিকের খোলা জায়গাটায়, কারও দিকে না চাইলেই সেই তো নিরিবিলি। তেমনি করেই নিজেদের অভ্যেস করে নিয়েছিলাম।

এর মধ্যে একদিন করুণার ছোট, সব চেয়ে ছোট ভাইটি মারা গেল। আশ্চর্য করুণার বাবা। কোলের ছেলেটার জন্যে এতটুকু কাঁদলেন না। চেয়ে দেখলেন না পর্যন্ত। যেন কিছুই হয়নি। প্রতিবেশীরা যেন তাকে কোলে করে বেড়াতে নিয়ে গেল।

বোধ হয় বুঝতে পেরেছিলেন তাঁরও গাড়ি এসে গেছে। পরের ট্রেনেই যাবেন তিনি ছেলের কাছে।

গেলেনও তাই।

করুণাদের পরিবারে সে কী দুর্দিন। আমরা তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করতাম। কিন্তু তাতে কোনো ফল হত কিনা বোঝা যেত না। সব কথা সে নিঃশব্দে শুনত শুধু।

একদিন দেখলাম, দূরে স্টেশনের ফটকের কাছ বরাবর একটি লোকের সঙ্গে কি যেন বলছে করুণা। চেনা লোক নয়, উদ্বাস্তু তো নয়ই। দিব্যি ফিটফাট একটি ছোকরা।

আর একদিন সন্ধ্যেবেলায় তাকে ডাকতে গিয়ে দেখি সে নেই। কোথায় গেছে তার মাও বলতে পারলেন না।

দেখতে দেখতে তার বেশভূষায় যেন পারিপাট্য এল। চাল-চলন, কথাবার্তা বদলে গেল।

মা আমাকে নিষেধ করে দিলে ওর সঙ্গে মিশতে। উদ্বাস্তুদের অনেক পরিবারেই কানাঘুষো চলতে লাগল ঃ বাপ মারা গেছেন। মাথার ওপর কেউ তো নেই। মেয়েটা উচ্ছন্নে যাচ্ছে।

করুণা কেমন করে যেন সেটা বুঝতে পারলে। আমাদের ঘরে সে আর আসত না। সরমাদের ঘরেও না। কিন্তু অভিভাবকদের চোখের আড়ালে আমরা মিশতাম। আগের মতো অত বেশি যদিও নয়।

দেখতে দেখতে সরমারও হালচাল বদলালো। সন্ধ্যের পর সেজে-গুজে, মুখে স্নো-পাউডার ঠোঁটে লিপস্টিক আর চোখে কাজল দিয়ে ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে করুণার মতো সেও বেরুতে লাগল।

ব্যাধিটা বোধ হয় সংক্রামক। দেখতে দেখতে অনেক মেয়েরই সাজগোজ করে সান্ধ্য-ভ্রমণে বেরুবার অভ্যাস দেখা যেতে লাগল। কোনো মেয়ে মা-বাপের সম্মতিক্রমেই বেরুতে লাগল, কেউ বা মৌন সম্মতিক্রমে. আবার কেউ বা বাপ-মার ইচ্ছের বিরুদ্ধেই উদ্ধত ভঙ্গীতে।

শেষের দল বাপ-মাকে শেয়ালদা স্টেশনে রেখে একে একে উধাও হয়ে গেল। তাই দেখে অন্য বাপ-মা, পাছে মেয়েরা চলে যায় সেই ভয়ে চুপ করে গেলেন। মেয়েদের বাধা দিতে সাহস করলেন না।

দেখা গেল, যাদের ঘরে এই বয়সের মেয়ে আছে এবং মেয়েরা সান্ধ্য-ভ্রমণে বেরোয়, স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের আশ্রয় তারা একে একে ত্যাগ করতে লাগল।

ঠোঁট বেঁকিয়ে মা বললেন, অরা বারি করছে। মুখে আগুন বারির!

এর মধ্যে একদিন করুণা আর সরমা এল বিদায় নিতে। তারাও বাড়ি করেছে আগরপাড়া না কোথায় যেন। ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে রয়েছে তাদের জন্যে।

ভগবান!

সন্ধ্যেবেলায় বরুণ ইসারায় ডাকলে।

দিনরাত্রি ঘুরছে বরুণ। এক-মুহূর্ত তাকে বিশ্রাম নিতে দেখি না। এই আসছে, তখনই আবার চলে যাচ্ছে। কিন্তু দেহপাত করা ছাড়া আর কিছু হচ্ছে বলে মনে হয় না। অন্তত মুখ দেখে তো নয়।

অনেক দিন পরে এমন করে ইসারা করলে। বলা যায় অনেক দিন পরে ওকে দেখলাম।

কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

—চল, একটু চা খাইয়া আসি। —বরুণ বললে।

—না।

—সিনেমা যাইবা?

—না।

—না ক্যান? মন হয় না?

—না

বরুণ ছাড়বে না। অবশেষে অনিচ্ছা সত্ত্বেও গভীর লজ্জায় বলতে হল, সিনেমা যাওয়ার শাড়ি কোথায়? এই ছেঁড়া শাড়িটা পরে তো সিনেমা যাওয়া যায় না। এমন কি, ওই দোকানটাতেও না।

বরুণ মাথা নিচু করলে।

সত্যি।

বললে,—কি করণ যায় কও।

কিছুই করার নেই নিঃশব্দে দিনগত পাপক্ষয় করা ছাড়া। কিন্তু সেকথা না বলে নতমুখে চুপ করে রইলাম।

বরুণও।

তখন যেকথা আমাদের দুজনের মাথার মধ্যেই টগবগ করে ফুটছিল সে এই, যে, এই কলকাতা শহরে কত আলো, কত হাসি, কত আনন্দ। কিন্তু তাতে একটা চুমুক দেবার অধিকারও কি আমাদের নেই?

অনেকক্ষণ পরে বরুণ বললে, —ওই মাইয়াটার নাম কি য্যান। করুণা না কি?

—হ। করুণা। ক্যান?

—দেখি একটা ট্যাক্সি কইরা কই য্যান ছুটতাছে।

—আইজ?

—হ।

আবার বরুণ কি যেন ভাবতে লাগল।

একটু পরে জিগ্যেস করলে,— সে বারি করছে শুনছ?

—শুনছি। মুখে আগুন বারির।

বরুণ বললে,— আর আমাগো এই শেয়ালদার ইস্টিশানটা খুব বালো, না? সগ্গো?

হঠাৎ সে বারুদের মতো ফেটে পড়ল ঃ এর মাথায় একটা বাজ পড়ে না?

বরুণ আর পারছে না। সে রেগে গেছে। ধীরে ধীরে ওর কাঁধের উপর একটা হাত রাখলাম। সঙ্গে সঙ্গে মেঘ ভেঙে বৃষ্টি নামল।

দুই হাতে মুখ ঢেকে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

এর কিছুদিন পরে।

কিছুই ভালো লাগছিল না। শরীরের গিটগুলো যেন ঢিলে হয়ে গেছে। বুকের ভিতরটা একেবারে খালি। দূরে বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। বিশেষ কিছুই নয়। অথবা সব কিছুই।

দেখছিলাম স্টেশন ভর্তি উদ্বাস্তুদেব দিকে। ওরা যেন আমি নই, অন্য। ওরা যেন কেউ নয়, কতকগুলো যন্ত্র। ঘুরছে-ফিরছে, উনোন ধরাচ্ছে, রান্নাবাড়া করছে, ঝগড়া করছে পরস্পর কিন্তু সেও যেন ওরা নয়। নাচের-পুতুল যেমন অন্যের ইঙ্গিতে ঘোরে, ফেরে, নাচে, তেমনি। তার চোখ আছে কিন্তু দেখতে পায় না, কান আছে কিন্তু শুনতে পায় না, মুখ আছে কিন্তু কথা বলে না। তার নিজের কোনো সত্ত্বা নেই। যেন ছায়া।

বরুণকে জিগোস করেছিলাম, এখানে এই নরকে আর কতদিন থাকতে হবে?

জবাব দিয়েছিল, ভগবান জানেন।

আমাদের বিয়ে হচ্ছে কবে?

তাও সে জানে না, ভগবান জানেন।

কিন্তু তিনিও জানেন কি না সন্দেহ। তাঁর রাজ্যে তো আমরা বাস করি না। জানে শয়তান, এই রাজ্য যে চালাচ্ছে।

তারপরে আর তাকে কোনো কথা জিগোস করিনি। করা নিরর্থক। কি করে বিয়ে হয়? স্টেশন প্ল্যাটফর্ম তো নব-দম্পত্তির বাসরঘর হতে পারে না!

বিয়ের কথা ভাবাই যায় না।

একা দাঁড়িয়ে সেকথাও ভাবছিলাম।

গম্ভীর শব্দে একটা ট্রেন এসে দাঁড়াল।

ট্রেন সম্বন্ধে আর কোনো আগ্রহ বোধ করি না। ট্রেন আসছে, যাচ্ছে। ক্রমাগত। সমস্ত দিন এবং সমস্ত রাত। ট্রেনের শব্দে সচকিত হওয়া দূরে থাক এখন আর কানেও যায় না। গেলেও গ্রাহ্য করি না।

এও গ্রাহ্য করলাম না।

ভাবছিলাম আর তার সঙ্গে এলোমেলো চাইছিলাম। দৃষ্টিহীন চাওয়া। কোনো বিশেষ দিকে নয়। হঠাৎ এক সময় দৃষ্টি যেন থমকে গেল।

করুণা না?

হ্যাঁ, সেই। যদিও চেনবার উপায় নেই। একটি চটকদার তরুণী। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে চারিদিকে চাইছে। কাকে খুঁজছে যেন। দৃষ্টিটা আমাদের ঘরের দিকেই।

কিন্তু কোনো উৎসাহ বোধ করলাম না। করুণার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক।

একদিন, হঠাৎ একদিন, জোয়ারে ভাসতে ভাসতে এক ঘাটে এসে ঠেকেছিলাম। দুদিনের জন্যে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল সত্যি। কিন্তু এখন সে কোথায় আর আমি কোথায়?

ঠাণ্ডা হয়ে সেইখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। সন্দেহ ছিল ও আমাকেই খুঁজছে। তাই আড়ে আড়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম, কি করে।

হ্যাঁ, আমাকেই খুঁজছে। আমাকে দেখতে পেয়েছে। আমার দিকেই দ্রুতবেগে আসছে। অন্যদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

মুহূর্ত মধ্যে ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলে ও ঃ করবী। কী হয়ে গেছিস। কি চেহারা হয়েছে। অসুখবিসুখ করেছিল নাকি?

মিথ্যে করে বললাম, —হ্যাঁ।

—দিনরাত্রি ঘরের মধ্যে, সেই আগের মতো।

— হ্যাঁ। মাঝে মাঝে এখানে এসেও দাঁড়াই, সেই আগের মতো।

—একটু বেরুস না কেন?

— কোথায়?

—সিনেমায়। কিংবা যেখানে হোক।

— কে নিয়ে যাবে?

যাবি আমার সঙ্গে?

—না।

বরুণ কখন আমাদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল টের পাইনি। আমাদের দুজনকেই চমকে দিয়ে বলে উঠল ঃ না ক্যান? যাও না, একটু গুইরা আহ।

অবাক হয়ে ওর দিকে চাইলাম।

বরুণ জানে করুণা কেমন মেয়ে। জানে কোথায় থেকে আসে তার শাড়ি ব্লাউস লিপস্টিক। সেই বরুণ বলছে যেতে। অবাক হওয়াই স্বাভাবিক।

ক্রুদ্ধ বিস্ময়ে তার দিকে চাইলাম—যাব কি করে শুনি? জামা-কাপড় কই।

বরুণের মুখ এতটুকু হয়ে গেল। আমার পরনে শতছিন্ন মলিন একখানা শাড়ি।

কিন্তু করুণা খিলখিল করে হেসে উঠল ঃ এই কথা। তার অসুবিধা হবে না। আমি এখনই আসছি।

সে হন হন করে কোথায় চলে গেল। বোধ হয় জামা-কাপড় আনতে। মুখোমুখি আমরা দুজনে দাঁড়িয়ে। কারও মুখে কথা নেই।

অনেকক্ষণ পরে আমি জিগ্যেস করলাম ঃ তুমি আমারে যাইতে কও?

—কই।

—তুমি করুণারে চেন না?

—চিনি। আমি তোমারেও চিনি। তোমারে পাইয়া বালোবাসা কারে কয় তাও চিনছি। তুমি যাও। সন্ধ্যা হয়ে আসে।

স্টেশনের আলোগুলো জ্বলে উঠলো। দিন নয় কিন্তু দিনের মতো আলো।

দূরে দেখা গেল একটা প্যাকেট হাতে করুণা হন হন করে আসছে। বোধ হয় আমার জামাকাপড়, বরুণের অনুমতি পেয়ে সে আমাকে নিয়ে যাবেই স্থির করেছে। কিন্তু এত শীঘ্র ফিরল কি করে? বোধ হয় ট্যাক্সি করে গেল-এল।

সংসার সীমান্তে

প্রেমেন্দ্র মিত্র

সত্যই এ-কাহিনী লিখিতে ইচ্ছা করে না। মনে হয় যে দুটি মানুষকে লইয়া এই গল্পের আয়োজন, তাহাদের কথা লিখিবার অধিকার আমার নাই। যাহাদের জন্য লিখিতেছি তাহারাই শুধু যে নিজেদের কঠিন ঔদাসীন্যের দ্বারা ইহাদের অপমান করিতে পারে তাহা নয়, এই দুইটি জীবনের গভীর মর্ম বুঝিবার মতো দরদ আমারও আছে কিনা সন্দেহ হয়। হৃদয়ের উদ্বৃত্ত আমাদের আর কতটুকু! নিজেকে ছড়াইয়া আশপাশের কয়েকজনকে বিলাইতেই তো তাহা ফুরাইয়া যায়। আর উদারতা? এই শব্দটিকে এ-পর্যন্ত কতভাবেই না লাঞ্ছিত করিয়া আসিয়াছি।

তবু একবার বলিবার চেষ্টা করিয়া দেখি—

বিশ্রী বাদলের রাত। সারাদিন সূর্যের দেখা পাওয়া যায় নাই, ঝুপঝুপ করিয়া বৃষ্টি পড়িয়াছে, গভীব রাত্রেও তাহার বিরাম নাই। কয়দিনে এ-বৃষ্টি থামিবে কে জানে।

শহরের এক প্রান্তের যে-রাস্তাটিতে আমাদের গল্প শুরু হইবে সাধারণ অবস্থাতেই তাহাতে চলা দায়। গোরুর গাড়ি ও মোটরলরির চাকায় তাহার যে হাল হইয়া থাকে তাহা বর্ণনা করা কঠিন। দিনরাত্রের অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে তাহার আরও শ্রী ফিরিয়াছে, পাশের নর্দমার সহিত তাহাকে আর পৃথক করিয়া চিনিবার উপায় নাই।

রাস্তাটির নাম না-ই বলিলাম—দুই পার্শ্বের যে কুৎসিত খোলা ও টিনের চালে ছাওয়া খুপরিগুলি তাহার শোভা-বর্ধন করিয়াছে, তাহাদের চেহারা হইতেই রাস্তাটির পরিচয় মিলিবে।

গভীর বাদলের রাতে রাস্তাটি একেবারে নির্জন হইয়া আসিয়াছে। আলোর ব্যবস্থা কোনোকালেই ভালো নয়। যেটুকু ছিল বৃষ্টিতে তাহাও নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

সেই অবিশ্রান্ত বর্ষণধ্বনিমুখর অন্ধকারে দেখা যায়, রাস্তার ধারে একটি চালার সামনে স্তিমিতভাবে অত গভীর রাত্রেও কেরাসিনের ডিবিয়া জ্বলিতেছে। বৃষ্টির ঝাপ্‌টা হইতে সযত্নে দুই হাতে কেরাসিনের ধূমবহুল শিখাটিকে যে আড়াল করিয়া বসিয়া আছে তাহার দুরাশার বুঝি আর অন্ত নাই। কিংবা হয়তো হতাশার শেষ সীমায় সে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহার মৃত মনের কাছে বাহিরের দুর্যোগের কোনো অর্থই আর নাই। প্রত্যহের অভ্যাসবশতই ক্লান্ত হতাশ চোখে পথের দিকে ব্যর্থ প্রতীক্ষায় সে বসিয়া আছে।

কেরাসিনের ডিবিয়ার মৃদু আলোয় তাহাকে ভালো করিয়া দেখা যায় না। হাত দিয়া শিখাটিকে আড়াল করিবার দরুন তাহার মুখে ও দেহে গাঢ় ছায়া পড়িয়াছে। সত্য কথা বলিতে কি, দেখিবার আর সেখানে কিছু নাই। কোনোদিন তাহার দেহে ও মুখে প্রাণের শিখার দ্যুতি ছিল কিনা তাহাই সন্দেহ হয়। ধূম ও কালিই এখন তাহার সর্বস্ব। নারীত্ব ও যৌবনের সে একটা কুৎসিত বিকৃতি মাত্র।

ভিতর হইতে নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে কে একবার বলিল, "হ্যাঁ লা রজনী, বারদরজা বন্ধ করতে হবে না! সমস্ত রাত ব'সে থাকবি নাকি? এ-বৃষ্টিতে যে পথে কুকুর-বেড়াল বেরোয় না।"

দরজা হইতে রজনী কর্কশকণ্ঠে কুৎসিত ভাষায় যে-উত্তর দিল অন্য সময় হইলে তাহা হইতেই একটা তুমুল ঝগড়ার সূত্রপাত হইতে পারিত। কিন্তু যাহার উদ্দেশে কথাগুলা বলা হইয়াছিল নিদ্রার ঘোরে সে বোধ হয় ভালো করিয়া শুনিতে পায় নাই। আগামীকল্যের জন্য মুখরোচক কলহটি সে মুলতুবি রাখিল এমনও হইতে পারে।

গায়ের কাপড় আরও একটু ভালো করিয়া জড়াইয়া রজনী দরজাতেই তেমনিভাবে বসিয়া রহিল। কাপড়-চোপড় তাহার ভিজিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। যেখানটায় পা রাখিয়াছিল সেখানেই কাদা হইয়াছে প্রচুর। পা দুইটা যেন ঠাণ্ডা বরফ হইয়া গিয়াছে মনে হইতেছিল। তবু ইহার মধ্যে রজনীর উঠিলে চলে না। হয়তো এই দুর্যোগের রাত্রেও মাতাল হইয়া কেহ এ-পথে আশ্রয়ের সন্ধানে আসিতে পারে। নেশার ঝোঁকে সে তো আর বাদবিচার করিবে না।

আরও ঘণ্টাখানেক এইভাবেই কাটিয়া গেল। হঠাৎ রজনী সচকিত হইয়া কান খাড়া করিয়া রহিল। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু তাহাদের রাস্তাটা যে ধারে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া ক্রমশ ভদ্র হইবার চেষ্টা করিয়াছে, খোলার চালা পরিত্যাগ করিয়া একটি-দুইটি কোঠা ও ভদ্র গৃহস্থবাড়ি দুইপাশে পাইয়াছে, সেখান হইতে যেন কাদার ভিতর কাহার পদশব্দ পাওয়া যাইতেছে। পদশব্দ ক্রমশই দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল। নাঃ, কোনো মাতালের পায়ের শব্দ এ নয়। কাদার ভিতর দিয়া দ্রুতবেগে কে যেন ছুটিয়া আসিতেছে বলিয়াই মনে হয়।

রজনী নিরাশ হইল। জলবৃষ্টির ভিতর দিয়া কেহ যে উর্ধ্বশ্বাসে তাহার ঘরে আশ্রয় লইতে আসিতেছে না, ইহা ঠিক। একলা বসিয়া থাকিতে একটু বুঝি তাহার ভয়ও করিতেছিল। ভয় অবশ্য তাহার অমূলক, মানুষের কাছ হইতে আশঙ্কা করিবার তাহার আর কিছু নাই। জীবনের চরম ক্ষতি তাহার হইয়া গিয়াছে।

রজনী জোর করিয়া বসিয়া ছিল। হঠাৎ অন্ধকারের ভিতর হইতে কৃষ্ণকায় একটি বিশাল মূর্তি বাহির হইয়া আসিল, আশ্চর্যের বিষয় রজনীর দরজার কাছে আসিয়াই সে থামিয়াছে। পিছন দিকে একবার সে ফিরিয়া চাহিল, তাহার পর রজনীকে একেবারে বিস্মিত করিয়া দিয়া তাহারই কাছে আসিয়া চাপা-গলায় তাড়াতাড়ি বলিল, 'চ, তোর ঘরে চ।"

রজনী সত্যই এই আকস্মিক সম্ভাষণে একটু বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল। প্রথমটা সে কোনো কথা বলিতেই পারিল না। স্থাণুর মতো যেখানে বসিয়া ছিল সেখানে নিশ্চল হইয়া রহিল।

কিন্তু তাহার বাকস্ফূর্তি হইবার পূর্বেই লোকটা অদ্ভুত এক কাণ্ড করিয়া বসিল। হঠাৎ নিচু হইয়া ফুঁ দিয়া তাহার কেরোসিনের আলোটি নিভাইয়া দিয়া সে বলিল, "ঢং ক'রে তবু ব'সে আছে দেখো—কই তোর ঘর?"

এই অদ্ভুত ব্যবহারে ভীত হইয়া রজনী চিৎকার করিয়া উঠিতে যাইতেছিল, কিন্তু লোকটা তাহার পূর্বেই তাহার মুখে হাত চাপা দিয়াছে। রজনীর কণ্ঠ আর শোনা গেল না।

লোকটা চুপিচুপি তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল, "ভয় নেই, চেঁচাসনি।"

রজনী ভীত ক্রুদ্ধ হইয়া লোকটার হাত ঠেলিয়া দিবার একটু চেষ্টা করিল। কিন্তু সে-চেষ্টা বৃথা। লোকটা অসুরের মতো শক্তিতে তাহার গলার কাছটা চাপিয়া ধরিয়া আছে. বেশি জোর-জবরদস্তি করিলে বুঝি টিপিয়াই মারিবে।

অগত্যা বাধ্য হইয়াই সে চুপ করিল। লোকটা নিজেই উৎসাহী হইয়া টিনের দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া আবার বলিল, "কি, এইখানেই দাঁড়িয়ে থাকব সারারাত!"

রজনী সত্যই ভয় পাইয়াছিল, বলিল, "না, তুমি যাও!"

লোকটা অন্ধকারে রজনীর কণ্ঠ খুঁজিয়া লইয়া এক হাত দিয়া তাহা জড়াইয়া ধরিয়া হাসিয়া বলিল, "দূর, কোথায় যাব এত রাতে!"....

আরও কিছু সে বলিতে যাইতেছিল, হঠাৎ বাহিরে রাস্তায় কয়েকজনের পদশব্দ শোনা গেল। সঙ্গে-সঙ্গে দেখা গেল লোকটার ভাব-ভঙ্গিও একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। সেই মুহূর্তেই রজনীর মুখে হাত ঢাকা দিয়া তীক্ষ্ণ চাপা গলায় সে বলিল, 'টুঁ শব্দটি করেছিস কি খুন করে ফেলব।"

রজনী অবশ্য চেষ্টা করিলেও শব্দ করিতে পারিত না, লোকটা যে-জোরে হাত চাপা দিয়াছে। বাহিরের পদশব্দ তাহাদের দরজার কাছে আসিয়া বুঝি খানিক থামিল। কয়েকটা লোক কি যেন বলাবলি করিতেছিল। তাহার পর আবার পদশব্দ দূরে মিলাইয়া যাইতেই লোকটা তাহার হাত তুলিয়া লইয়া হাসিয়া বলিল, "কেমন ভয় দেখিয়ে দিলাম, দেখলি?"

কিন্তু ব্যাপারটা যে ঠাট্টার নয় তাহা রজনী বুঝিয়াছিল। লোকটাকে মনে মনে অত্যন্ত ভয় করিতে আরম্ভ করিলেও সে মৃদুস্বরে একবার আপত্তি জানাইয়া বলিল, "আমি দরজা খুলে দিচ্ছি, তুমি যাও—আজ আমার শরীর খারাপ।"

লোকটা এবার জোরে হাসিয়া উঠিল, "হুঁ, শরীর তো বেজায় খারাপ, তাই বাদলা রাতে রাস্তায় হাওয়া খাচ্ছিলি—না? নে ছেনালি রাখ। কোথায় তোর ঘর?"

নিরুপায় হইয়া রজনী বলিল, "দাও, টাকা দাও তা হ'লে আগে।"

অন্ধকারে তাহার হাতের মধ্যে সত্যই একটা টাকা গুঁজিয়া দিয়া লোকটা বলিল, "নে; হ'ল তো!"

রজনী এবার ধীরে-ধীরে পাশের দাওয়ায় উঠিয়া তাহার ঘরের চাবি খুলিল। ঘর বলিলে তাহাকে অতিরিক্ত সম্মান দেওয়া হয় ; দু-ধারে দুই টিনের পার্টিশনে মধ্যবর্তী খানিকটা অপরিসর মাত্র মেঝেতে কোনোকালে বোধ হয় সিমেন্ট দেওয়া হইয়াছিল, এখন তাহার চিহ্নও নাই। নোংরা একটি বিছানা ও একটি ভাঙা তোরঙ্গই অবশ্য অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া আছে— মেঝের বাকি অংশ যেটুকু দেখা যায় তাহা বহুদিনের বহু মানুষের পদাঘাতে ক্ষত বিক্ষত।

উপরে খোলার চাল। সেখানকার একটি বাঁশ হইতে তার দিয়া টাঙানো চিমনি-ভাঙা হ্যারিকেন লণ্ঠনটি মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছিল। রজনী ঘরে ঢুকিয়া তাহার আলোটাই একটু বাড়াইয়া দিল। তাহাতে আলোকের অভাব কিন্তু দূর হইল না। শিখাটি আরও বেশি ধূমোদ্গিরণ করিতে লাগিল মাত্র।

মেঝের উপরকার ময়লা ছিন্ন বিছানায় একটা বালিশের উপর কনুই-এর ভর দিয়া লোকটা তখন বসিয়াছে।

রজনী তাহার দিকে চাহিয়া বিরক্ত হইয়া বলিল, "কি করলে বলো তো? জুতোটা বাইরে খুলে রেখে আসতে হয় না! সমস্ত ঘর যে কাদায় কাদা হ'য়ে গেল—এ মুক্ত করবে কে?"

সত্যই লোকটার ছেঁড়া জুতার সঙ্গে রাস্তায় প্রচুর কাদা ঘরে আসিয়া ঢুকিয়াছে।

ঘরে আসিয়া লোকটার চেহারা ও মেজাজ দুই-ই যেন বদলাইয়া গিয়াছে মনে হইল। রজনীর কথায় হাসিয়া জুতা-জোড়া পা হইতে খুলিতে-খুলিতে সে বলিল, 'ইস্, কি আমার রাজপ্রাসাদ রে। জুতোর কাদায় নোংরা হ'য়ে যাচ্ছে!"

কথাগুলার পিছনে কিন্তু আঘাত করিবার ইচ্ছা আছে বলিয়া মনে হইল না। গলার স্বরে ও বলিবার ভঙ্গীতে হাসিয়া ফেলিয়া রজনী বলিল, "তোমারই বা কিএমন সোনার খড়ম যে বিছানায় উঠতে চায়!"

ছেঁড়া জুতা দুইটা পা হইতে খুলিয়া উপুড় করিয়া ধরিতেই পোয়াখানেক ময়লা জল তাহা হইতে বাহির হইল। লোকটা হাসিয়া বলিল, "এমন জুতোর তুই নিন্দে করিস! দেখেছিস এ ড্যাঙ্গায় হ'ল জুতো, আর জলে নামলেই নৌকা!"

ময়লা জলে ঘরটা আরও নোংরা হইয়া যাইতেছিল, কিন্তু এবার রজনী রাগ করিতে ভুলিয়া গেল।

লোকটাকে এই সময়ের মধ্যে সে বেশ ভালো করিয়া দেখিয়া লইয়াছে। বাহিরে তাহাকে যতখানি বিশালাকার মনে হইতেছিল ততখানি জবরদস্ত চেহারা তাহার নয়। মাঝারি দোহারা গড়ন। কেমন একটু পাকাইয়া গিয়াছে। হাত-পায়ের শিরগুলো দড়ির মতো মোটা-মোটা। মুখখানা চোয়াড়ে হইলেও কেমন যেন কুৎসিত নয়। চোখে ও ঠোঁটের কোণে সর্বদাই একটু হাসির ভাব লাগিয়া আছে—নির্দোষ ব্যঙ্গের হাসি। সমস্ত মুখখানা বুঝি সেইজন্যই একেবারে আকর্ষণ-শক্তি হারায় নাই। বয়স অবশ্য তাহাকে দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই। রজনীর মনে হইল ত্রিশ হইতে চল্লিশের মধ্যে যে-কোনো বয়স তাহার হইতে পারে। কিন্তু বয়স যাহাই হউক লোকটার স্বাস্থ্য ও শক্তি অটুট আছে।

লোকটা তাহার ভিজা জামা খুলিতেছিল, বলিল, "শুকনো একটা কাপড় থাকে তো দে—পরি।"

"শুকনো কাপড় কাঁদছে। থাকলে আমি এই ভিজে কাপড়ে থাকি!" —বলিয়া রজনী হাসিল।

"ওই ভিজে কাপড়ে থাকবি নাকি সারারাত?" লোকটা অবাক হইয়া তাহার দিকে চাহিল।

"তা ছাড়া কি করব?"

লোকটা "হুঁ" বলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

বিছানার উপর ন্যাকড়ায় জড়ানো একটা কি জিনিস পড়িয়াছিল। রজনী হঠাৎ সেইদিকে হাত বাড়াইয়া বলিল, "ওতে কি আছে দেখি!"

এই সামান্য ব্যাপারে লোকটা এমন চটিয়া যাইবে কে জানিত। নিমেষের মধ্যে পুঁটুলিটাকে রজনীর নাগালের বাহিরে সরাইয়া সে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "খবরদার বলছি, ওধারে হাত বাড়ালে হাত ভেঙে দেব।"

খরখর করিয়া রজনী জবাব দিল, 'ইস্, কি আমার সাতরাজার ধন নিয়ে এসেছিস, ছুঁলে ক্ষ'য়ে যাবে!"

লোকটা এ-কথার উত্তর দিল না। পুঁটুলিটা নোংরা একটা বালিশের তলায় রাখিয়া তাহার উপর মাথা দিয়া শুইয়া পড়িল।

কথায়-বার্তায় এতক্ষণ তাহাদের পরস্পরের প্রতি সন্দিগ্ধ বিরোধের ভাব যেটুকু কাটিয়া গিয়াছিল সেটুকু আবার এখন ঘনাইয়া আসিয়াছে মনে হইল। এই লোকটাকে শেষমূহুর্তে পয়সার লোভে ও পীড়নের ভয়ে ঘরে স্থান দেওয়ার জন্য এখন রজনীর আফসোস হইতেছিল। সে তো তখন ইচ্ছা করিলে চেঁচাইয়া বাড়ির সকলকে জাগাইয়া তুলিতেও পারিত। লোকটা এক মুহূর্তেই তাহাকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিতে পারিত না। এই উগ্র প্রকৃতির অপরিচিত লোকটার সহিত সারারাত একত্র কাটাইবার চিন্তায় রজনীর ভয় করিতে লাগিল। লোকটা

খুনে-ডাকাত কি না কে জানে। সারারাত সে জাগিয়া কাটাইবে বলিয়া সংকল্প করিল। ঘরের দরজায় ভিতর হইতে চাবি দিয়া চাবিটি গোপনে আঁচলের খুঁটে বাঁধিয়া আলো নিবাইয়া যখন সে শুইয়া পড়িল তখন রাত প্রায় দুইটা।

অনেক রাত পর্যন্ত সে জোর করিয়া জাগিয়া ছিল। কিন্তু ভোরের দিকে শরীরে আর সহিল না। কখন যে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে তাহার মনে নাই।

সকালে সচকিত হইয়া চোখ খুলিবার সঙ্গে সঙ্গে রজনী টের পাইল বাড়িতে বিষম হট্টগোল বাধিয়াছে। বাড়ির অন্যান্য অধিবাসিনীরা তাহার রাত্রের অতিথির কথা জানে না। কয়েকজন তাহার ঘরে ঢুকিয়া তীব্রস্বরে ভৎর্সনাও করিতে শুরু করিয়াছে।

"হ্যাঁ লা, তোর আক্কেল কি বল দেখি! সদর-দরজা হাট ক'রে, নিজের দরজা খুলে দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমচ্ছিস!"

রজনী ধড়মড় করিয়া এবার বিছানায় উঠিয়া বসিল। সত্যই ঘরে কেহ কোথাও নাই। দরজা সত্যই খোলা!

কে আরেকজন বলিল, "আমরা সবাই তো বেহুঁশ হ'য়ে ঘুমচ্ছি, যদি সব চুরিই হ'য়ে যেত!"

কিন্তু চুরি যা হইবার রজনীরই হইয়াছে। তাহার আঁচল হইতে চাবি লইয়া সে দরজার তালা খুলিয়াছে। টাকাটি লইতে সে ভোলে নাই। রজনীর সমস্ত মুখ কঠিন হইয়া উঠিল। অশ্রুর উৎস একেবারে শুকাইয়া না গেলে সে বুঝি কাঁদিয়াই ফেলিত। কিন্তু তবু কাহাকেও সে কিছু বলিল না। এই নিদারুণ প্রবঞ্চনার কথা কাহাকেও বলিয়া সে হাস্যাস্পদ হইতে চাহে না।

তাহাদের রাস্তারই এক গৃহস্থবাড়িতে গতরাত্রে সিঁধ কাটিবার চেষ্টা কাহারা করিয়াছিল বলিয়া দুপুরবেলা যখন সংবাদ পাওয়া গেল তখনও মনের সন্দেহ সে মনেই চাপিয়া রাখিল।

বিশাল পৃথিবীর দুইটি হতভাগ্য নরনারীর প্রথম মিলনের ইতিহাস এমনি কুৎসিত, এমনি স্বার্থ ও লোভের কালিতে কলঙ্কিত।

এই মিলনই একাধারে প্রথম ও শেষ হইতে পারিত। কিন্তু ভাগ্যের ইচ্ছা অন্যরূপ।

দুপুরবেলা। রজনীর তখনও রান্নার আয়োজন চলিতেছে। সংকীর্ণ দাওয়ার উপর বসিয়া শিলে করিয়া সে বাটনা বাটিতেছিল, হঠাৎ দরজার সামনে একজনকে দেখিযা চমকাইয়া উঠিল।

লোকটা দিব্য ভোল ফিরাইয়া আসিয়াছে। ফরসা কাপড়, গায়ের জামাটাও বোধ হয় নূতন। তালিমারা জুতাটায় আর কিছু না হউক বেশ করিয়া কালি মাখাইয়া চকচকে করা হইয়াছে। মাথার ঝাকড়া চুলের মাঝখান দিয়া লম্বা টেরি কাটা।

তবু রজনী চিনিল। লোকটা দরজায় দাঁড়াইয়া তাহার দিকেই চাহিয়া দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছিল। রজনী মুখ তুলিতেই কাছে আসিয়া বলিল, "কি গো, চিনতে পারো?"

ঘৃণায় রাগে সহসা রজনীর শরীর রি রি করিয়া উঠিল। জীবনের উপর, ভাগ্যের উপর যত আক্রোশ তাহার মনের মধ্যে জমা হইয়াছিল সমস্ত যেন আজ মিলিত হইয়া পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে। কোনো জবাব না দিয়া উন্মত্তের মতো নোড়াটা তাহার দিকে ছুঁড়িয়া মারিল।

নোড়াটা লাগিলে কি হইত বলা যায় না, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় উপযুক্ত সময়ে লোকটা মাথাটা সরাইয়া লইয়াছিল। নোড়াটা প্রচণ্ড শব্দে সামনের টিনের দেয়ালে গিয়া লাগিল।

আশেপাশে যাহারা ছিল তাহারা শব্দ শুনিয়া হাঁ-হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিল। লোকটা তখনও দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া হাসিতেছে।

নোড়ার আঘাতটা ফসকাইয়া যাওয়ায় মনে-মনে আশ্বস্ত হইলেও রজনীর রাগ তখনও যায় নাই। চিৎকার করিয়া সকলকে ডাকিয়া সে জানাইতে লাগিল যে এই বদমাশ লোকটাই সেদিন তাহাদের রাস্তার গৃহস্থবাড়িতে সিঁধ কাটিয়াছে এবং তাহার আঁচল হইতে টাকা খুলিয়া পলাইয়াছে। তাহাকে ধরিয়া পুলিশে দেওয়া হউক।

চিৎকার শুনিয়া বাড়ির সমস্ত মেয়েরা এবং কয়েকটি পুরুষ তখন জড়ো হইয়াছে। লোকটা এমন কাণ্ড হইবে বোধ হয় আশা করে নাই। মুখে হাসির ভান করিলেও সে এবার পলাইবার পথ খুঁজিতেছিল।

কিন্তু এতগুলা লোক তাহাকে একা পাইয়াছে। রজনীর কথা বিশ্বাস হউক আর না হউক তাহারা এমন মজা ছাড়িবে কেন? একজন হঠাৎ সাহস করিয়া তাহার ঝাঁকড়া চুল ধরিয়া টানিয়া বলিল, "শালা চোর, আবার ভদ্রলোক সেজে এসেছে।" আর যায় কোথায়! অন্য সকলে বোধ হয় এই প্রেরণাটুকুর অপেক্ষাতেই ছিল। সকলে মিলিয়া লোকটার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। কিল, চড়, লাথি যে যাহা পারিল মারিতে কসুর করিল না। লোকটা জোয়ান, কিছুক্ষণ সে যুঝিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু মারও সে সেইজন্যই বেশি খাইল। তাহার জামা-কাপড় ছিঁড়িয়া আধমরা না করিয়া দেওয়া পর্যন্ত মেয়ে-পুরুষ কেহ নিরস্ত হইল না। বোধ হয় হ্যাঙ্গামের ভয়েই শুধু পুলিশে দিতে তাহারা বাকি রাখিল।

রজনী মারামারিতে যথাসম্ভব যোগ দিয়াছে। এখন দাওয়ার উপর দাঁড়াইয়া হাঁফাইতে-হাঁফাইতে গাল পাড়িতেছিল, "আঁচল থেকে টাকা খুলে নেবে না, পাজি বদমাশ কোথাকার!"

বাড়ির বাহিরেও তখন পথিকদের ভিড় জমিয়া গিয়াছে। অতিরঞ্জিত হইয়া ইতিমধ্যে ব্যাপারটা মুখে-মুখে ফিরিতেছে নানাজনে নানারকম মন্তব্যও করিতেছিল।

লোকটা তখন অবসন্নভাবে উঠানের উপর পড়িয়া। গায়ের মাথার অনেক জায়গা কাটিয়া রক্ত বাহির হইতেছে। কাতরভাবে সে ধুঁকিতেছিল।

কে একজন বাহির হইতে খবর দিল যে মারামারির সংবাদ শুনিয়া পুলিশ আসিতেছে।

আরেকজন বলিল, "পুলিশ এলে তো যারা মেরেছে তাদেরও ছাড়বে না বাপু। চোরকে ধরিয়ে দিতে পারো, মারবার তোমরা কে? আর মার ব'লে মার। লোকটা তো ম'রে গেছে!"

কথাটা মিথ্যা নয়, যুক্তিযুক্তও বটে। যাহারা এতক্ষণ সোৎসাহে হাত চালাইয়াছিল তাহারা যে যার সরিয়া পড়িবার চেষ্টা করিল।

জনমতের গতি ফিরিয়াছে। একজন বলিল, "চোর ব'লে যে মারলে, চোর চিনলে কে শুনি? চোর কি ওর গায়ে লেখা আছে!"

বাহির হইতে একজন আসিয়া সহানুভূতি জানাইয়া বলিল, "তুমিও তো আচ্ছা লোক হে, মার খেয়ে চুপ ক'রে প'ড়ে আছ! থানায় চলো একটা ডায়েরি ক'রে আসি, মারার মজাটা সব টের পেয়ে যাবে!"

উঠিবার শক্তি ছিল না বলিয়াই বোধ হয় লোকটা কোনো উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। যাহারা মারিয়াছিল তাহাদের অনেকেরই পুলিশের ভয়ে রাগটা তখন রজনীর উপর গিয়া পড়িয়াছে।

বাড়ির ভিতর হ্যাঙ্গামা হইবার ভয়ে বাড়ির অধিস্বামিনী ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। রজনীর কাছে আসিয়া ঝংকার দিয়া বলিল, "দোষ তো এই মাগীর। 'চোর' 'চোর' ব'লে পাড়া মাথায় ক'রে তুললে কে? এখন ঠেলা সামলাক।"

রজনীর গালাগাল খানিক আগেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সমস্ত ব্যাপারটার এই পরিণতি দেখিয়া ভয়ে সে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল।

দু-একজন প্রহৃত লোকটাকে তখনও থানায় গিয়া ডায়েরি করাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছে।

বাড়িওয়ালী আবার তীব্রস্বরে বলিল, "ঢং ক'রে দাঁড়িয়ে আছিস যে বড়ো। লোকটা ওইখানেই প'ড়ে থাকবে নাকি? থানা পুলিশ না হ'লে সুখ হচ্ছে না, —না।"

কেন বলা যায় না, প্রহৃত হইয়াও থানায় যাইবার আগ্রহ লোকটার বিশেষ নাই। বাড়িওয়ালীর ধমক খাইয়া ভয়বিহ্বল রজনী তাহাকে আসিয়া তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতে গেলে সে নিজেই কষ্ট করিয়া উঠিয়া ধীরে-ধীরে রজনীর কাঁধে ভর দিয়া তাহারই ঘরে গেল।

থানায় খবর দিয়া অন্যায়ের প্রতিকার করিবার জন্য যাহারা ব্যস্ত হইয়াছিল তাহারা ইহাতে খুশি হইতে পারিল না। বাহিরের দরজার কাছে ঘোঁট অনেকক্ষণ ধরিয়া চলিল।

লোকটা কোন প্রকার হ্যাঙ্গামা না করিয়া রজনীর ঘরে যাওয়ায় বাড়িওয়ালী অনেকটা আশ্বস্ত হইয়াছিল। রজনীর ঘরে ঢুকিয়া আহত ব্যক্তির শুশ্রূষা সম্বন্ধে অনেকক্ষণ ধরিয়া বহু মূল্যবান সদুপদেশ দিয়া যখন সে বিদায় হইল তখনও রজনী জল দিয়া তাহার ক্ষতস্থানগুলি ধোয়াইয়া দিতেছে।

বাড়িওয়ালী চলিয়া যাইবার পর লোকটা একবার উঠিবার চেষ্টা করিল। ভীত পাংশুমুখে তাহাকে শোয়াইবার চেষ্টা করিয়া রজনী বলিল, "উঠছ কেন? কোথায় যাবে?"

যন্ত্রণাবিকৃত মুখেও হাসির চেষ্টা করিয়া লোকটা বলিল, "থানায় যাব না রে, যাব না ভয় নেই। পেটটায় বড়ো বেদনা, বেটারা বড়ো জোর লাথি মেরেছে, একটু সেঁক দিতে পারিস?"

রজনী তাহার আয়োজনেই বাহিরে গেল।

নায়ক-নায়িকার দ্বিতীয় মিলন এমনি করিয়াই হইল।

লোকটা কয়দিন ধরিয়া রজনীর ঘরেই আছে। মার খাইবার দিন হইতে তাহার প্রবল জ্বর। যাইবে সে আর কোথায়? রজনীকে বাধ্য হইয়াই সেবা করিতে হইতেছে। ব্যাপারটার সমস্ত দোষ তাহার ঘাড়ে চাপাইয়া বাড়ির আর সকলে দিব্য নিশ্চিন্ত হইয়া গিয়াছে।

ঘরে বসাইয়া একটা লোকের দিনের পর দিন শুশ্রূষা করা রজনীর সাধ্য নয়। প্রথম দিন লোকটা পকেট হইতে গোটা কয়েক টাকা বাহির করিয়া দিয়াছিল বলিয়াই কোনোমতে চলিতেছে। রজনী এ-দায় হইতে কোনোরকমে নিষ্কৃতি পাইলেই বোধ হয় বাঁচে। পুলিশের ভয়েই সম্ভবত সে এ-পর্যন্ত কোনো উচ্চবাচ্য করিতে পারে নাই।

কিন্তু হপ্তা কাবার হইবার পরও লোকটার যে সরিবার কোনো লক্ষণ নাই। রজনীর ধৈর্য আর কতদিন থাকে। সকালে ঘায়ের পটি খুলিতে-খুলিতে সে মুখঝামটা দিয়া বলিয়াছে, "ভিটকেলমি ক'রে ক'দিন বিছানায় প'ড়ে থাকা হবে শুনি? আমি আর পারব না, তা যা হয় হোক।"

'যা হয় হোক'টা পুলিশের ব্যাপার সম্বন্ধে। রজনীর সে-ভয় এখনও বুঝি একটু আছে।'

লোকটাও সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দেয়, "পারবিনে কি? এতগুলো কড়কড়ে টাকা কি মাগনা দিলাম।"

"ঈস্, কত তোড়া-তোড়া টাকাই না দিয়েছিলি। আট দিন ধ'রে ওষুধ পথ্যি সব পাঁচ টাকায় হচ্ছে— কেমন?"

"নাই বা হ'ল। তুই দিবি টাকা। হাতে হাতকড়া থেকে বেঁচে গেছিস জানিস!"

রজনীর সাহস বাড়িয়াছে। রাগের মাথায় সে বলে, "হ্যাঁ হাতে হাতকড়া সবাই দিচ্ছে! যা না তুই পুলিশে। আমিও বলতে জানি, সিঁধকাঠি নিয়ে প্রথম দিনে ঘরে ঢুকেছিলি মনে নেই?"

লোকটা রাগিয়া, বলে, "তুই দেখেছিস?"

" দেখিনি আবার, সেদিন পুঁটলির ভিতর কি ছিল? তাড়া খেয়ে আমার ঘরে তো ঢুকেছিলি লুকোতে। বুঝি না আমি কিছু?"

লোকটা তাচ্ছিল্যভরে বলে, "বুঝিছিস তো বুঝিছিস! অঘোর দাস কারুকে ভয করে না।"

নীরবে খানিকক্ষণ ঘা ধোয়ানো চলে। অঘোর একসময বলে, "জ্বরে জ্বরে মুখটা বড়ো খারাপ হয়েছে। আজ একটু অম্বল রাঁধতে পারিস?"

রজনী ঝংকার দিয়া বলে, "হ্যাঁ, পারি তা, উনুনের ছাই রাঁধতে পারি! শখ কত! ঘাযে পুঁজ শুকোচ্ছে না, অম্বল খাবে!"

অঘোর সারিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এখনও এ-আশ্রয় পরিত্যাগ করে নাই। দিনে রাত্রে রজনীর সঙ্গে রোজ তাহার ঝগড়া বাধে। রজনী গালাগাল দিয়া বলে, "কাল যদি তুই বাড়ি থেকে দূর না হ'স তো মুড়ো ঝাঁটা মাবব।"

অঘোর প্রচণ্ড শপথ করিয়া জানায় যে পরদিন প্রাতঃকাল হইতে সে রজনীব আর মুখদর্শন করিবে না। কিন্তু যাই-যাই করিয়া যাওয়া আর হইয়া উঠিতেছে না। ছন্নছাড়া জীবনে, স্থান হইতে স্থানান্তবে ভাগ্যের দ্বারা চিরদিন বুঝি সে বিতাড়িত হইয়াই ফিবিয়াছে। একটুখানি নিশ্চিন্ত বিশ্রামের স্থান তাহার কখনও মিলে নাই। তাই যাইতে তাহার সহজে মন ওঠে না। রজনী অন্য সময়ে গাল পাড়িলেও সকালবেলা ঝাঁটা মারিয়া তাড়াইবার কথাটা কেমন করিয়া বিস্মৃত হইয়া যায়।

অঘোর একেবারে অবুঝ নয়। ইতিমধ্যে একদিন বাহির হইয়া সে কয়েকটা টাকা কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়া রজনীর হাতে দিয়াছে। কিন্তু সেই সঙ্গে ফরমাশ যাহা করিয়াছে তাহার বহর বড়ো কম নয়।

রজনী টাকা কয়টা রাগের মাথায় মেঝের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিয়াছে, "আমার টাকার দরকার নেই. অমন টাকা আমি ঢের দেখেছি। আমি কি তোর কেনা বাঁদি যে যা হুকুম করবি তাই করব!"

টাকা ফেলিয়া দেওয়ায় প্রথমটা মুখ গম্ভীর করিয়া অঘোর বলিয়াছে, "দেখ, লোক আমি বড়ো ভালো নয়, বেশি বাড়াবাড়ি করলে ভালো হবে না।"

কিন্তু খানিক বাদে আসিয়া তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া বলিয়াছে, "আহা, রাগ করিস কেন? তুই রাঁধিস ভালো তাই না বলছি। সাধ ক'রে কি এখানে প'ড়ে থাকি? তোর রান্না খাওয়ার পর মুখে আর কিছু রোচে না।"

"থাক, আর আদিখ্যেতায় দরকার নেই।" — বলিয়া রজনী শেষ পর্যন্ত নিজেই টাকাগুলা তুলিয়া লইয়া গিয়াছে।

কিন্তু এমন করিয়াও বেশিদিন চলিল না। একদিন টাকাকড়ির ব্যাপার লইয়াই অত্যন্ত কুৎসিতভাবে ঝগড়া করিবার পর অঘোর সত্যই সকালবেলা চলিয়া গেল।

বাড়িওয়ালী সংবাদ পাইয়া রজনীকে ভৎর্সনা করিয়া বলিল, "কি ব'লে যেতে দিলি তুই. তবু তো খরচটা চালাচ্ছিল!"

রজনী রুক্ষ কণ্ঠে বলিল, "খরচ চালাচ্ছিল না আর কিছু! খেটে-খেটে আমার হাড় কালি হ'য়ে গেল। আপদ গেছে বেঁচেছি!"

তাহার পর আপন মনেই বলিল, "এবার এলে দরজা থেকেই খ্যাংরা মেরে বিদায় ক'রে দেব।"

কিন্তু সেইদিন গভীর রাত্রে তাহাদের দরজার কড়া নড়িয়া ওঠামাত্র ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া প্রথম দরজা খুলিতে যে গেল সে রজনী। অত রাত পর্যন্ত অকারণে কেন সে জাগিয়া ছিল কে জানে!

সত্যই অঘোর ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু চেহারা কেমন যেন অদ্ভুত। জামায় কাপড়ে ধুলি-কাদা লাগিয়াছে। কপালের উপরে পূর্বের যে-ক্ষতটার দাগ এখনও মিলায় নাই তাহা হইতেই আবার রক্ত বাহির হইতেছে।

রজনী জিজ্ঞাসা করিল, 'এ কি হয়েছে?"

"ও কিছু না।"— বলিয়া পকেট হইতে অঘোর যাহা বাহির করিল তাহা দেখিয়া রজনীর বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। এত টাকা একসঙ্গে সে কবেই বা দেখিয়াছে।

অঘোর হাত বাড়াইয়া তাহাকেই সেগুলো দিতে যাইতেছিল। রজনী সভয়ে হাতটাকে সরাইয়া বলিল, "না, না, ও চাই না।"

তাহার মনের সন্দেহ দৃঢ় হইবার সঙ্গে-সঙ্গে ভয় তাহার বাড়িয়াছে। অঘোর হাসিয়া বলিল, "কেন রে, হ'ল কি?"

খানিক চুপ কবিয়া থাকিয়া ভীত অস্পষ্ট কণ্ঠে রজনী বলিল, "সত্যি বল দেখি, তুই চুরি করেছিস কি না!"

অঘোর তাহার দিকে তাকাইয়া মুচকিয়া একটু হাসিল মাত্র, উত্তর দিল না। রজনী আবার বলিল, "বল আমার গা ছুঁয়ে।"

"যদি ক'রেই থাকি।"

"যদি ক'বেই থাকি! ধরা পড়লে কি হ'ত?"

"কি আর হ'ত — জেল। আর বেশি কিছু তো নয়। সে আমার অভ্যেস আছে।"

রজনী সভয়ে খানিক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর অস্ফুটস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "পালাতে গিয়েই কপালটা কেটেছে তো?"

কপালের রক্তটা কাপড় দিয়া মুছিয়া অঘোর বলিল, "বেটারা ঢিল ছুঁড়ল যে!"

রজনী হতাশভাবে বলিল "অমনি ক'রেই তুই কোন দিন ম'রে যাবি!"

"তা গেলেই বা কার কি? অঘোর দাসের জন্যে তিনকুলে কাঁদবার কেউ নেই।"

রজনী তখন কোনো কথা আর বলিল না।

ঘণ্টাখানেক বাদে বিছানায় শুইয়া হঠাৎ অঘোরের গলায় হাত রাখিয়া রজনী বলিল, "একটা কথা বলব, রাখবি বল।"

নিদ্রাজড়িত স্বরে অঘোর বলিল, "কি?"

"তুই আর চুরি করতে পাবিনি।"

ঘুমের ঘোরে 'আচ্ছা' বলিয়া অঘোর পাশ ফিরিয়া শুইল।

রজনী কিন্তু তাহাকে নিশ্চিন্তভাবে ঘুমাইতে দিল না, হাত ধরিয়া ঝাঁকানি দিয়া বলিল, "ওরকম 'আচ্ছা' বললে হবে না, তুই দিব্যি ক'রে বল, 'কখনও আর চুরি করব না'।"

কাঁচা ঘুম ভাঙায় অঘোর চটিয়া গিয়াছিল, বলিল, "তবে কি ডাকাতি ক'রে খাব?"

"না, তুই একটা কাজকর্ম দেখ।"

"কাজকর্ম দেবে কে? তুই বাজে বকিসনি, ঘুমতে দে।"

কিন্তু রজনী ছাড়িল না। আবার তাহার হাত ঝাঁকানি দিয়া একটু কঠিন স্বরে বলিল, "না তোকে চুরি ছাড়তেই হবে; না হ'লে এখানে আর আসতে পাবি না।"

"ও, তবেই তো আমার গোকুল অন্ধকার হ'য়ে যাবে।"— বলিয়া অঘোর আবার পাশ ফিরিল। কিন্তু এবারে খানিক বাদে প্রথম কথা সেই কহিল, বলিল, "কাজকর্ম পাওয়া কি এতই সোজা রে। আর তা ছাড়া দলের লোকেরা ছাড়বে কেন? যদি-বা একটা ভালো কাজ পাই, পুলিশ আর দলের লোকেরা পিছু লেগে অস্থির ক'রে দেবে না?"

"দল তুই ছেড়ে দিবি।"

"এ-দেশে থাকতে আর তার জো নেই।"

রজনী ইহার পর অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "তবে তুই এ-দেশ ছেড়ে চ'লে যা।"

অন্ধকারের মধ্যে অঘোরের হাস্যধ্বনি শোনা গেল। বলিল, "তুই যাবি সঙ্গে?"

রজনী সত্যই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আমি যাব কি ক'রে?"

দু-জনেই তাহার পর নীরব। অঘোর একবার খানিক বাদে রজনীকে ঠেলা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ঘুমলি নাকি?"

"না।"

"তুই যেতে পারবি না কেন?"

রজনী হতাশ স্বরে বলিল, "আমার এখানে কত দেনা, বাড়িওয়ালীর কাছে, কিস্তিদারের কাছে, যেতে চাইলে তারা ছাড়বে কেন?"

হঠাৎ উৎসাহিত হইয়া অঘোর বলিল, "আমি যদি সব দেনা শোধ ক'রে দিই।"

কিন্তু রজনীর এ-কথায় বিশ্বাস নেই। বলিল, "সে অনেক টাকা তুই পারবি কেন?"

"হুঁ, অঘোর দাস ইচ্ছে করলে কি না পারে, তুই বল তা হ'লে যাবি আমার সঙ্গে? তা হ'লে তোকে সত্যি কথাটা বলি, এ-কাজে মাঝে-মাঝে মাইরি ঘেন্না ধ'রে যায়। খালি সাবধান, খালি সাবধান, শুয়ে ব'সে একটু স্বস্তি নেই। চ, একেবারে দিল্লি আগ্রাই যাব চ'লে।"

রজনী কিন্তু তাহার উৎসাহে বাধা দিয়া বলিল, "তুই কি ক'রে টাকা যোগাড় করবি, এমনি চুরি ক'রে তো? সে আমার দরকার নেই।"

হাত বাড়াইয়া রজনীকে অন্ধকারে কাছে টানিয়া অঘোর বলিল, "এই তোর গা ছুঁয়ে বলছি এই শেষবার। ব্যস, তারপর চুরি বিদ্যেয় খতম।"

পরদিন বিকালবেলা অঘোর নতুন একটা প্রকাণ্ড তোরঙ্গ ঘাড়ে করিয়া আনিয়া রজনীর ঘরে ঢুকিল।

রজনী বিস্ময়ে আনন্দে হাসিয়া বলিল, "ওমা, বাক্স আনতে বলেছিলাম ব'লে ওই অত বড়ো একটা ঢাউস জিনিস আনতে হয়? ওর ভেতর শুবি নাকি?"

অঘোর মুখ টিপিয়া হাসিতে-হাসিতে তোরঙ্গের তালা খুলিয়া ফেলিল। ভেতরের জিনিসপত্র দেখিয়া রজনী তো অবাক। অঘোর কাপড়-জামা হইতে থালা গেলাস পর্যন্ত কত জিনিসই না কিনিয়া আনিয়াছে। রজনী পরিহাস করিয়া বলিল, "ইস, করেছিস কি? এত সাজসরঞ্জাম কেন বল তো?"

"বিয়ে করতে যাচ্ছি যে!"

"মরণ আর কি! আধবুড়ো এমন চোয়াড়ের কাছে মেয়ে দেবে কে!" —বলিয়া রজনী হাসিতে লাগিল।

অঘোর গম্ভীর হইয়া বলিল, "না দেয়, চুরি ক'রে নেব।"

রজনীর হাসি তাহার পর আর থামিতে চাহে না।

গ্লানির প্রগাঢ় অন্ধকারে যাহাদের অতীত লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, বর্তমান যাহাদের ক্লেদপঙ্কিল, তাহারাও ঘর বাঁধিতে চায়, পৃথিবীর ভাগ্যবান নরনারীদের জীবনলীলার অনুকরণ করিতে তাহাদেরও সাধ যায়।

ভাবী-সংসার সম্বন্ধে দুইজনের ইতিমধ্যে অনেক মধুর আলাপ হইয়া গিয়াছে।

রজনী বলিয়াছে, "যাচ্ছি বটে তোর সঙ্গে, কিন্তু সেখানে যা খুশি করবি আর আমি মুখ বুজে তাই সইব মনে করিসনি যেন। রজনী তেমন মেয়ে নয়। অত নেশাভাং করা তোর চলবে না।"

অঘোর বলিয়াছে, "আচ্ছা, আচ্ছা, সে দেখা যাবে। কিন্তু আমিও লোক বড়ো ভালো নয়, বুঝেছিস। এখানে যা করিস করিস, সেখানে একটু বেচাল দেখলে আর আস্ত রাখব না।"

সেই রাত্রে অঘোর আবার বাহির হইল। আর কুড়িটা টাকা হইলেই রজনীর ঋণ সমস্ত শোধ হইয়া তাহাদের সব খবচ কুলাইয়া যায়। অঘোর তাহাদের বিদেশ যাওয়ার উপকরণস্বরূপ অকারণে অনেকগুলো বাজে জিনিস কিনিয়া পয়সা নষ্ট করিয়া আসিয়াছে। রজনী সেইগুলাই বেচিয়া টাকা যোগাড় করিবার কথা বলিয়াছিল। অঘোরের আর নিজেকে বিপন্ন করিয়া কাজ নাই। কিন্তু অঘোর সে-কথায় হাসিয়াছে মাত্র। বলিয়াছে, "অঘোর দাস জিনিস বিলিয়ে দেয়, বেচে না, বুঝেছিস? তুই বাঁধা-ছাদা ক'রে সব ঠিক হ'য়ে ব'সে থাক দিকি, কাল ভোরের গাড়িতেই কলকাতাকে কলা দেখিয়ে চ'লে যাব।"

.. .. ..

আদালতে কাজের চাপ সেদিন অত্যন্ত বেশি। ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে কোর্ট-ইনস্পেক্টার কোনোমতে পূজার ঠাটটুকু বজায় রাখিয়া বলির পর বলি শেষ করিয়া চলিতেছে। ছোটোখাটো অপরাধের বিচার—রায় দিতে বিলম্ব হইবারও কারণ নাই। অনেকগুলি অপরাধীর বিচার হইয়া যাইবার পর একজন আসামী হঠাৎ কাঠগড়ায় উঠিয়া বিষম গোলমাল শুরু করিয়া দিল। বুড়ো মদ্দ—ছাড়া পাইবার জন্য তাহার মিনতি ও শিশুর মতো কান্না দেখিয়া আদালতের লোকের পক্ষে হাসি সংবরণ করা কঠিন।

বিচারক নামটা ভালো শুনিতে পান নাই। জিজ্ঞাসা করিতে কোর্ট-ইনস্পেক্টার গড়গড় করিয়া যাহা বলিয়া গেল তাহার অর্থ এই যে, আসামীর নাম অঘোর দাস, লোকটা দাগী চোর, ইতিপূর্বে বার পাঁচেক জেল খাটিয়াছে এবং সেদিন আবার চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িয়াছে ইত্যাদি।

আসামী তখন কাঠগড়া হইতে দুই হাত জড়ো করিয়া কাতরভাবে কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিতেছিল — হুজুর, ধর্মাবতার তাহাকে যেন এইবারটি মাফ করেন। সে চুরি করিবার চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু কিছুই লইতে পারে নাই। সে হুজুরের পা ছুঁইয়া ও ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া শপথ করিতেছে যে সত্যই আর সে এমন কাজ করিবে না। সত্যই সে এ-পথ ছাড়িয়া দিতে চায়। এবার জেল হইলে তাহার সর্বনাশ হইয়া যাইবে।

কোর্ট-ইনস্পেক্টার তাহাকে ধমক দিলেন, পুলিশপ্রহরী একটা রুলের গুঁতা দিল, কিন্তু লোকটা নাছোড়াবান্দা, চোখের জল মুছিতে-মুছিতে একই কথা সে বারবার বলিতে লাগিল।

লোকটার কান্না একটু অসাধারণ হইলেও এই ধরনের বদমাশির সহিত বিচারকের পূর্বেই পরিচয় হইয়াছে। কোর্ট-ইনস্পেক্টারের বক্তব্য শেষ হইবার পর তিনি রায় দিলেন। ইনস্পেক্টার তাহা অনুবাদ করিয়া অঘোর দাসকে জানাইল। পাঁচ বছর তাহার জেল হইয়াছে। অঘোর দাস খানিকটা স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর সে যে-কাণ্ড করিয়া বসিল

তাহা একেবারে অদ্ভুত। দেখা গেল, হঠাৎ কাঠগড়া হইতে হুংকার দিয়া লাফ মারিয়া উঠিয়া বিচারককে সে আক্রমণ করিয়াছে।

পুলিশপ্রহরী ও কোর্ট্-ইনস্পেক্টার সেই মুহূর্তে তৎপর হইয়া তাহাকে ধরিয়া না ফেলিলে কি কেলেঙ্কারি যে হইত কে জানে। তারপর তাহারা তাহাকে পিছমোড়া করিয়া ধরিয়া রুলের গুঁতা দিয়া আবার কাঠগড়ায় আনিয়া ফেলিল। সে উন্মত্তের মতো তাহাদের হাত হইতে মুক্ত হইবার বৃথা চেষ্টা করিতে-করিতে তখনও গর্জ্জাইতেছে।

বিচারক বয়সে নবীন এবং সত্যই ভালো লোক। তাঁহার হৃদয় মন এখনও কঠিন হইয়া উঠে নাই। বিচার জিনিসটা এখনও তাঁহার কাছে শুষ্ক আইনের প্রয়োগকৌশল মাত্র নয়। আসামীর পিছনে রক্তমাংসের মানুষ আছে ইহা এখনও তাঁহার স্মরণ থাকে।

লোকটার অস্বাভাবিক কান্নার পর এই প্রকার আকস্মিক উত্তেজনায় তিনি একটু অবাক হইয়া গিয়াছিলেন। মনে হইতেছিল লোকটার এই অদ্ভুত ব্যবহারে গূঢ় কোনো অর্থ থাকিতেও পারে।

বিচারককে আক্রমণের অপরাধে আসামীর নতুন করিয়া বিচাব হইল। বিচারক মহাশয় এবারে শাস্তি যথাসম্ভব লঘু করিয়া তো দিলেনই, মনে-মনে সংকল্প করিলেন তাহার সম্বন্ধে কর্মচারীকে দিয়া ভালো করিয়া পরে খোঁজ লইবেন।

.. .. ..

বিচারক মহাশয় অবশ্য নানা কাজের চাপে সে-কথা ভুলিয়া গিযাছেন। তাঁহারই বা দোষ কি। অঘোর দাস এখনও জেলে পচিতেছে। নিরবচ্ছিন্ন বর্ষাব রাতে এখনও নিশ্চয় কলিকাতার একটি কর্দমাক্ত নোংরা ও কুৎসিত পথের ধারে কেবোসিনের ডিবিয়ার ম্লান আলো দেখা যায়। ডিবিয়ার ধূমবহুল শিখাকে শীর্ণ হাতে সযত্নে ঝাপটা হইতে আড়াল করিয়া গভীর রাত্রি পর্যন্ত এখনও নিশ্চয় বিগতযৌবনা রূপহীনা রজনী এক রাত্রের অতিথির জন্য হতাশনয়নে পথের দিকে চাহিয়া প্রতীক্ষা করে।

নেড়ে

মুজতবা আলী

পুজোর ছুটির পর কলকাতায় ফিরছিলুম। চাঁদপুর স্টেশনে আসবার একটু আগেই জিনিস পত্র গোছাতে লাগলুম। সঙ্গে ছিল শুধু একটি বেতের বাক্স আর সতরঞ্চি জড়ান বিছানা। যাদের সচল অচল অনেক লটবহর থাকে, তাদের ট্রেন ছেড়ে জাহাজে উঠতে দেরী হয়। কাজেই আমার মত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বিহীন ব্যক্তি মাত্রেই ছুটে গিয়ে জাহাজ দখল করে বসে। এ অবশ্য আমি গান্ধিক্লাসের যাত্রিদের কথা বলছি।

চাঁদপুরে গাড়ী থাম্‌ল। তাড়াতাড়ি নেবে পড়লুম। কুলী না ডেকে মোট ঘাড়ে করে ছুটে চললুম। বিস্তর যুদ্ধের পর জাহাজে উঠলুম। ভেবেছিলুম বেশ খালি পাব ; কিন্তু দেখলুম পৃথিবীতে একমাত্র হুঁসিয়ার লোক আমিই নই। অনেকেই আমার ঢের আগে এসে ভাল জায়গাগুলি দখল করে বসে আছেন। আবোও দেখলুম আমার অপেক্ষাও অল্প লট-বহর বিশিষ্ট বঙ্গসন্তান আছেন। তাদের সম্পত্তির মধ্যে একখানা খবরের কাগজখানা বিছিয়ে হাতে মাথা দিয়ে শুয়ে আছেন।

থাক্‌, অনুতাপ করে লাভ নেই। বেশ কসরত ক'রে সিঁড়ির পাশে জায়গা দখল করে বিছানা বিছিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লুম। তারপর জামার বোতাম খুলে, ডান পা খানা সোজা করে, বাঁ পা তার উপর তুলে নাচাতে শুরু করে বিজয় গর্বে চারিদিক তাকাতে লাগলুম। হঠাৎ মনে হল ব্যূহ ত তৈরী করা হয়নি! তাড়াতাড়ি উঠে বিছানার একপাশে জুতা আর একপাশে বাক্স ও মাথার দিক্‌টা রেলীংয়ের সঙ্গে ঠেকিয়ে রাখলুম। এইবার ঠিক হল। আর কোন সামন্ত-যাত্রী রাজ্য আক্রমণ করতে পারবেন না। চৌহদ্দি ঠিক করে নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে পড়ে বিজয় গর্বে আবার ঠেঙ্গ নাচাতে সুরু করলুম। চারিদিকে তখন হৈ হৈ কাণ্ড। জায়গা দখল নিয়ে ঝগড়া, কুলীর সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ। নানা প্রকারের চীংকারে চারিদিক তখন বেশ সরগরম।

জাহাজ ছাড়ে ছাড়ে—ভাবলুম যাক একটু কবিত্ব করা যাক্‌—অম্‌নি।

"হে পদ্মা আমার
তোমার আমায় দেখা—

বাকিটা আর আওড়ানো হলো না। দেখি একটা ভদ্রলোক মরিয়া হয়ে সিঁড়ি দিয়া উঠ্‌তে চেষ্ট কর্চ্ছেন। পেছনে তাঁর আবরু-অবগুণ্ঠিতা স্ত্রী—কিছুতেই তাল সাম্‌লে তাঁর সঙ্গে চল্‌তে পাচ্ছেন না। ভদ্রলোকের সে দিকে দৃষ্টি নেই।

"এগিয়ে চলার" আনন্দে তিনি তখন মশগুল। আনন্দ বললুম বটে— কিন্তু থাড্ডো কেলাসের যাত্রী মাত্রেরই এ' আনন্দের ভয়ে বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়।

যাক্‌। শেষ পর্যন্ত তিনি উপরে উঠলেনই। বাঙ্গালীর ধৈর্য নেই, যুদ্ধ করতে পারে না—

একথা ডাহা মিথ্যে। সেই ভদ্রলোককে দেখলে উপরোক্ত কুসংস্কার কারুরই থাক্‌বে না। উপরে উঠেই তিনি চারিদিকে তাকাতে লাগলেন। কিন্তু—

"স্থান নেই স্থান নেই ক্ষুদ্র সে তরী
মেড়ো, খোট্টা, বাঙ্গালীতে সব গেছে ভরি।"

ততক্ষণে তাঁর স্ত্রী এসে পেছনে দাঁড়িয়েছেন। বাবু তখন পেছনে সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ চমকে উঠলেন। বুঝতে পারলুম 'কুলী চম্পট'—বললুম "কি মশাই, কি হয়েছে"?

ভদ্রলোকটি কাঁদ কাঁদ হয়ে বললেন, "কুলী,—কুলী, কোথায় গেল, এই—"

আমি বললুম "নম্বর মনে আছে?"

আমার কথায় কান না দিয়ে বলতে লাগলেন "এ্যাঁ, তাইত, কুলী কোথায় গেল—বাক্স টাক্স সব নিয়ে—গয়নার বাক্স—হায় হায়।"

গয়নার বাক্সর কথা মনে হ'তেই তার শোক দ্বিগুণ হ'য়ে উঠল। আমি বিরক্ত হয়ে বললুম,—

"নম্বর কত ছাই বলুন না?"

"এ্যাঁ, তাইত নম্বর হাঁ নম্বর। নম্বর এই—তাইত। ভুলে গিয়েছি!"

"বেশ কোরেছেন।" এইবার তাঁর স্ত্রীর গলা থেকে গড় গড় কোরে একটা আওয়াজ বেরুল। কিন্তু, সেটা কি কোনো ভাষা না শুধু আওয়াজ মাত্র তা বোঝা গেল না।

ভদ্রলোকটি তাড়াতাড়ি সেই দিকে ঝুঁকে বললেন,

"কি, কি, মনে আছে?"

আবার একটু গড়গড়। তারপর শুনতে পেলুম "এগারো।"

আমি আর অপেক্ষা না করে এক পাটি জুতো পায়ে ঢুকিয়ে অন্যটা ঢুকাতে ঢুকাতে ছুটে চললুম। ফিতে বাঁধা ছিল না বলে ডান পায়ের জুতোর নীচে ফিতে আট্‌কে যাওয়ায় দড়াম করে সিঁড়ির উপর মুখ থুবড়ে পড়লুম। জুতোর উপর ভীষণ চটে গেলুম। কিন্তু মনকে সান্ত্বনা দিলুম "পরোপকার কি বিনা মেহনতে হয়।" যাহোক আবার উঠে ভিড় ঠেলে "গ্যার্‌হ নম্বর" কুলী চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে চললুম। কিন্তু কোথায় "গ্যার্‌হ নম্বর কুলী"। প্রত্যেক কুলীর নম্বর যদি খুঁজতে যাই তবে সে কাজটি আর সেদিন শেষ হবে না। কাজেই শুধু চেঁচিয়ে চললুম।

নদীর পারে উঠে চেঁচাতেই একটা কুলী বল্লে—"ক্যা বাবু। ক্যোঁও চিল্লাতে হো?" আমি বললুম "তুমি গ্যার্‌হ নম্বর কুলী?" সে বলল, "হাঁ, ক্যা চাহতে হো?"

আমি বললুম,—জলদি চলো—বাবুকা মাল লেকর ক্যোঁও ইতনা দেরী করতা হ্যায়?"

সে বল্ল, "ক্যা চিল্লাতে হো, মেরা পাস্‌ তো ইন্‌ সাহেবকা মাল হ্যায়। বাবুকা মাল্‌ ওঁহার রাখ ছোড়া।" দেখলুম আগে একটি সাহেব যাচ্ছে। আর বাবুর বাক্স নদীর পারে গড়াগড়ি দিচ্ছে। আমি বললুম, "চলো য়্যহ মাল লেকর — জেয়াদা পয়সা দেগা।"

কুলী কোনো কথা না বলে চলে গেলো। ভারী মুস্কিলে পড়লুম, কি করা যায়? পাশে কোনো কুলীও নেই। জাহাজও তখন ছাড়বার জন্য ফোঁস ফোঁস কোরচে। কি আর করি। নিজেই বিছানা ট্র্যাঙ্ক ঘাড়ে ও গয়নার বাক্স হাতে করে চললুম। খানিকটা যেতেই ঘাড় টন্‌টন্‌ কোরতে লাগল। মনে হল কেন এই কুবুদ্ধি চেপেছিল।

সিঁড়ির সামনে আসতেই বাবু তাড়াতাড়ি বাক্স ধরে বললেন, হাঁ হাঁ, করেন কি। আপনি কেন কষ্ট কোরছেন? কুলী বেটারা—আমি এক্ষুণি স্টেশন মাস্টারের কাছে যাচ্ছি। পাজি ব্যাটারা মাল নিয়ে শেষকালে ফেলে দেয়। আমি এক্ষুনি যাচ্ছি বলে তক্ষুণি ঝুপ করে আমার বিছানায় বসে পড়লেন। আমি শুধু—"না, না" বলে দাঁড়িয়ে রইলুম।

ভালো করে তাকিয়ে দেখি ততক্ষণে ভদ্রলোক তাঁর গিন্নী সমেত আমার বিছানায় জাঁকিয়ে বসেছেন। আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বল্লেন, "বসুন, বসুন।"

এই ত একটুক্ষণ থাকতে হবে, কোন রকমে চলে যাবে। বিছানার এক পাশে বসে পড়লুম।

বাবুটি বললেন—"কোথায় যাওয়া হবে?"

"কোলকাতা।"

"সেখানে পড়েন বুঝি?"

প্রশ্ন এড়াবার জন্য শুধু মাথা নাড়লুম। তাতে হাঁ-না দুইই বোঝাল। বাবু বললেন—না, আমার একটি ভাইপোও কলকাতায় পড়ে। ছেলেমানুষ— গেল বছর মেট্রিক পাস্ করে গিয়েছে। পড়াশুনায় বেশ ভালো। আপনার বাবা কি করেন?

"চাকরি।"

"বেশ বেশ। আমিও সরকারি চাকরি করি। মাইনে নেহাত কম। কোনো রকম কায়-ক্লেশে চলে যায়। আমার যে ভাইপোটির কথা বললুম তার বাবা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। ছ'শ টাকা পায়। তার বিয়ে হয়েছে ফেণীতে। তার শ্বশুর ... ইত্যাদি ইত্যাদি।" আচ্ছা জ্বালায় পড়লুম! কি করা যায়! ফেরীওলা যাচ্ছিল। একটা কাগজ নিয়ে মুখ ঢেকে পড়তে লাগলুম।

বাবু বোললেন—"কি পড়ছেন?" আমি শুধু মাথা নাড়লুম।

তিনি বললেন "আনন্দবাজার?" বলেই—"দেখি কাগজখানা।" ভাবলুম —বাঁচা গেল। বাবু কাগজ পড়বেন। কিন্তু ভদ্রলোক প্রথম লাইন চেঁচিয়ে পড়েই আবার বক্তৃতা জুড়ে দিলেন।

"জগৎগুরু মহাত্মা গান্ধীর কারাবাস—আজ ২২৫ দিন। তাঁহার বিদায় বাণী, খদ্দর পরিধান—ছুঁৎমার্গ পরিহার।"

দেখলেন মশাই দেখলেন। এই দুটো জিনিস বলে গেছেন—তাও হতভাগা দেশে কেউ কোরবে না। খদ্দর পরলে কি দোষ রে বাবা! টেকেও ত বেশী ; দামও কম।

আমাকে তাঁর কাপড়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে লজ্জিত হয়ে বললেন, "কি কোরব! ছাপোষা মানুষ। খদ্দর কিনে কুলিয়ে উঠতে পারিনে , আবার অফিসের সাহেব দেখলে চটে। বেটা যেন কসাই। সে কথা যাক্। কিন্তু আমি ছোঁয়াছুঁয়ি মানিনে। ওতে তো আর কোনো খরচ নেই। কেনই বা মানব? কেন মুচি মুসলমান কি মানুষ নয়? ওদের সঙ্গে ব'সে কেন খাব না? খুব খাব—আলবৎ খাব।"

তারপর এদিকে ওদিকে তাকিয়ে স্ত্রীকে বললেন—"তা হ'লে জলখাবার—"

স্ত্রী তাড়াতাড়ি বাক্স খুলতে লাগলেন। ততক্ষণে তাঁর ঘোমটা প্রায়ই আড়াই ইঞ্চি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে। একখানা প্লেটে হাঁড়ি থেকে বের করে সন্দেশ রাখতে লাগলেন। আমি তখন উঠবার বন্দোবস্ত করতে সুরু করেছি। বাবু তা দেখে বললেন, "বসুন, বসুন, জলখাবারটা এখানেই সেরে নিন।"

আমি মাথা চুলকাতে লাগলুম। তিনি থালাখানি গিন্নীর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে আমার দিকে একটু এগিয়ে 'খান' ব'লে টপ্ করে একটি রসগোল্লা আমার মুখে ফেললেন। আমিও আস্তে আস্তে খেতে লাগলুম। তিনি অনর্গল বকে যেতে লাগলেন।

খাওয়া শেষ হ'লে বল্লেন, "আমাদের ত এসে পড়ল— নেক্সট্ স্টেশন—তারপাশা। আপনার তা কোল্‌কাতা পৌঁছুতে অনেক দেরী হয়ে যাবে—তা আপনি কোথায় উঠবেন? সোজা মেসে যাবেন বুঝি?"

আমি "হুঁ" বলে উঠে পড়লুম। প্রতিজ্ঞা করলুম তারপাশা স্টেশন না আসা পর্যন্ত আর ও-মুখো হবো না।

দূর থেকে দেখলুম বাবু গিন্নীর সঙ্গে খুব আলাপ জুড়ে দিয়েছেন।

ঘণ্টাখানেক পরে তারপাশা দূরে দেখা গেল। ভাবলুম এইবার বাবুর খোঁজ নিই। গিয়ে দেখি তিনি তখন কাগজ পড়ছেন। আমাকে দেখে বললেন,— "এই যে তারপাশা।" তার-পর স্ত্রীর দিকে ফিরে বললেন, "ওগো সব গুছিয়ে নাও।"

জাহাজ থামল। তিনি পারের দিকে আধঘণ্টা ধ'রে তাকিয়ে ছিলেন। হঠাৎ একটি লোককে দেখে—যুগপৎ হাত পা নেড়ে চেঁচাতে সুরু করলেন। লোকটি কিন্তু কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। বাবু দুই হাত নেড়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কুলী ডেকে মালগুলো তুলে দিয়ে আমিও সঙ্গে সঙ্গে নাবলুম। পাড়ের লোকটি তখন জাহাজে উঠেছে। বাবুটি পাড়ে নাবতে যাবেন এমন সময় ফিরে বললেন— "চিঠিপত্র লিখ্‌বেন—আপনার ঠিকানা?" —তাই ত নামই জানা হল না। "আপনার নাম?"

"আবদুল রসুল।"

থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন—"কি?"

"আব্‌দুল রসুল।"

"তুমি মুসলমান?"

আমি বললুম, "হাঁ, কেন?"

ভদ্রলোক মুখ খিঁচিযে বললেন, "কেন? — কেন জাতটা মারলে? খাবার সময় বললে না কেন তুমি মুসলমান? উল্লুক!"

আমি অবাক হয়ে বললুম "আপনি যে বললেন, জাত মানেন না!"

তিনি তেড়ে এসে আমার নাকের কাছে হাত নেড়ে বললেন, "মানিনে, খুব মানি। আলবৎ মানি। সাত পুরুষ মেনে এসেছেন আর আমি মানিনে! আবার প্রাচ্চিত্তির ফেরে ফেললে! হতভাগা—নেড়ে!"

বরের ঘরের পিসি কনের ঘরের মাসি

অন্নদাশঙ্কর রায়

আর কেউ নয়, আমিই। আমাকেই একবার ঘটকালি করতে হয়েছিল মকরকেতুর কৌতুকে। কিন্তু প্রজাপতির নির্বন্ধ ছিল অন্যরূপ। সেই ইস্তক ওকর্মে ইস্তফা দিয়েছি।

কাজলদির সঙ্গে প্রথম দেখা এক বিয়েবাড়িতে। দূর সম্পর্কের দিদি, দূর দেশে থাকে, আর্থিক ব্যবধানটিও সুদূর। কাজেই তার আগে দেখা হয়ে ওঠেনি। দেখা যখন হল তখন আমার বয়স দশ-এগারো, দিদির বয়স বারো-তেরো। কে জানত যে পরবর্তী জীবনে দিদির বয়স আমার চেয়ে দু'এক বছর কমবে ও দুনিয়ার লোকের সামনে সে আমাকে দাদা বলে ডাকবে।

বিচিত্র জীবন। ইংলণ্ড যেদিন ছাড়ি তার একদিন আগে হঠাৎ একজন আমাকে বললেন, "ওহে তুমি তো চললে, তোমার ছোটবোনের দেখাশোনা করবে কে?"

"আমার ছোটবোন!" হতভম্ব হলুম। "আমার ছোটবোন কবে বিলেত এল!"

"সে কী! মিসেস বক্সী কি তোমার ছোটবোন নন?"

"মিসেস বক্সী! কোন মিসেস বক্সী?"

"কেন রোমা? দিল্লির রোমা?"

তখন আমার মনে পড়ল যে কাজলদির শ্বশুরকুলের পদবী বক্সী ছিল বটে। কিন্তু কাজলদির তো বিলেত আসার কথা ছিল না। থাকলে আমি জানতুম।

ঠিকানাটা জোগাড় করে সেই দিনই লণ্ডনের এক মেয়েদের হস্টেলে দিদির সঙ্গে সাক্ষাৎ করলুম। যেই ডাকব "কাজলদি" অমনি সে তার মুখে আঙুল দিয়ে ইশারায় বললে, "চুপ! চুপ!" সে বাড়িতে আরো জনকয়েক বাঙালী তরুণী ছিলেন। এবং ছিলেন ইংরেজ তরুণীরা। কাজলদি ফিসফিস করে বললে, "এই যে অনুদা, এসো। তোমার কথাই হচ্ছিল। এদের বলছিলুম এখানে আমার এক দাদা আছেন, তিনি আই সি এস।" তার পরে সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললে, "May I introduce my elder brother. "

কিন্তু বিলেতের কথা পরে। দেশের কথা চলছিল, দেশের কথাই চলুক। সেদিন সেই বিয়েবাড়িতে মল্লযুদ্ধ বেধেছিল দু'দল ছেলেতে। তাদের এক দলে ছিল কাজলদির ভাই টোগো, আরেক দলে ছিলুম আমি। কাজলদি এসে আমাদের প্রত্যেকের হাতে এক-একটা নাড়ু ধরিয়ে দেয়। তখন আমরা "আর একটা, আর একটা" বলে এক সঙ্গে আবেদন জানাই। এই একটু আগে যারা মহাশত্রু ছিল তারাই হয়ে দাঁড়াল মহামিত্র। সকলেরই আরাধ্য কাজলদি। সে যেন শ্রীকৃষ্ণের মোহিনী মূর্তি। আর আমরা যেন দেবাসুর।

বিয়েবাড়ির সেই মজা আমার অনেক দিন মনে ছিল। প্রায়ই মনে পড়ত কাজলদিকে, তার মোহিনী মূর্তিকে। যখন-তখন যাকে-তাকে কথায় কথায় বলতুম, "আমার কেমন কাজলদি আছে, কী সুন্দর দেখতে, কী রকম খাইয়েছিল আমাকে।" এটাও শোনাতে ভুলতুম

না যে কাজলদির বাবা মস্ত বড় সরকারি চাকুরে। আর সেই কাজলদি কিনা আমার আপন মামীমার পিসতুতো ভাইয়ের মেয়ে।

আমি খুব আশা করেছিলুম যে, অত বড় একটা ঐতিহাসিক ঘটনা কাজলদির স্মরণ থাকবে। কিন্তু বার বার চিঠি লিখেও তার কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে মনটা দমে গেল। তারপরে তার কথা এক রকম ভুলেই গেছলুম, অকস্মাৎ আমার নামে একফলক চকোলেট এসে পৌঁছল, তার গায়ে লেখা ছিল "এই তোমার চিঠির জবাব। স্নেহশীলা কাজলদি।"

খুব খুশি হইনি, কারণ আমি চেয়েছিলুম খবর, দিদি পাঠালে খাবার। মনের খোরাকের বদলে মুখের খোরাক। খাবার অবশ্য তুচ্ছ নয়, বিশেষত চকোলেট। কিন্তু আমার বারো-তেরো বছর বয়সেই আমি বুঝতে পেরেছিলুম যে একখানা চিঠি ওর চেয়ে আরো তৃপ্তিকর। যা হোক, চকোলেটখানা আমি তুলে রাখলুম, খেলুম না, খেতে দিলুম না। অনেক দিন পর্যন্ত অক্ষত ছিল ওটা।

তার পরে আর চিঠি লিখিনি। লিখলে হয়তো ঠাওরাত ছেলেটা কী হ্যাংলা। কবে একটা নাড়ু খাইয়েছিলুম, সেই থেকে আরো কিছু খাবার ফন্দিতে এসব চিঠি। এই তো সেদিন একটা চকোলেট আদায় করলে। তবু—

কে জানে হয়তো এও ঠাওরাবে যে বাপ-মা গরিব, কোথায় পাবে খেতে, দিই একটা কেক-টেক পাঠিয়ে।

কী লজ্জা! আমি ঐ চকোলেটখানা বাক্স থেকে বার করে পাড়ার ছেলেদের ডেকে ভাগ করে খাওয়াই ও খাই।

সে ঘটনাও ভুলে গেছলুম।

তারপরে যখন আমার বয়স ষোলো-সতেরো—উঁহু, সতেরো-আঠারো—তখন কলেজের ছুটিতে পুরী গিয়ে দেখি কাজলদি। বেচারির পোড়া কপাল। বিয়ের ক'দিন পরেই বিধবা। কী চেহারা ছিল, কি হয়েছে। চোখে জল আসে। ঝরঝর করে কেঁদে ফেললে, যেই বললুম, "কাজলদি, কবে বিয়ে করলে, খবর দিলে না কেন!" তা দেখে আমিও আমার চোখের জল ধরে রাখতে পারলুম না।

কিছুদিন আগে আমারও মাতৃবিয়োগ হয়েছিল। সহানুভূতির কাঙাল ছিলাম আমি। কাজলদিকে সে কথা বলায় সে তার হৃদয়ের সব সুধা ঢেলে দিলে। "দু'জনে মুখোমুখি, গভীর দুখে দুখী, নয়নে জল ঝরে অনিবার।"

আমি ওকে রবীন্দ্রনাথের "নৈবেদ্য", "খেয়া", "গীতাঞ্জলি" পড়ে শোনালুম। কতটুকু সান্ত্বনা পেলে জানিনে, কিন্তু আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে বললে, "অনু, তুমি আমাকে বাঁচালে।"

এর পরে আমাদের চিঠি-লেখালেখি চলেছিল দু'চার মাস। পুরী থেকে ও আরো দক্ষিণে যায় তীর্থ করতে। আমি ওর ঠিকানা হারিয়ে ফেলি কি ওই আমার চিঠি খোয়ায়। যে কারণেই হোক চিঠি-লেখালেখি আপনি বন্ধ হয়ে যায়।

বছর-দুই পরে কলকাতায় কাজলদির সঙ্গে এক ঘণ্টার জন্যে দেখা। তাঁদের ওখানেই প্রথম দেখি রাখালদাকে। আমার কাকিমার মামাতো ভাইয়ের ছেলে রাখাল চৌধুরী। অত্যন্ত ছটফটে লোক, এক মুহূর্ত চুপ করে বসে থাকার পাত্র নন। ছাদের উপর পায়চারি করতে করতে কাজলদির তৈরি আইসক্রীম খাচ্ছিলেন, আর কাজলদিকে বলছিলেন 'আপনি'। শুনলুম দিদির টিউটর। তীর্থভ্রমণের পর দিদির পড়াশুনায় মন গেছে, প্রাইভেটে ম্যাট্রিক দিচ্ছে। কলকাতায় তার বাবা, মিস্টার সরকার, সম্প্রতি বদলি হয়ে এসেছেন। দিদি এখন বাপের বাড়ি থাকে। শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সম্বন্ধ নেই। ক'টা দিনেরই বা সম্বন্ধ।

লক্ষ্য করলুম দিদির মুখখানি শরতের আকাশ। ক্ষান্তবর্ষণ। মেঘ ভাসছে, কিন্তু শাদা মেঘ। দিদি যেন একটা স্থিতি পেয়েছে। তার ফলে তার চেহারাও কতক ফিরেছে। আমাকে বললে, 'পড়াশুনায় তুমি আমার চেয়ে তিন বছর এগিয়ে গেছ। অতএব তুমি আমার দাদা।''

তখন ঠাহর হয়নি যে সেই সুবাদে কাজলদি আমাকে দাদা বলে ডাকবে। আবার যখন কলকাতায় দেখা হয় মাস ছ'য়েক বাদে তখন দাদা ডাক শুনে চমক লাগল। সেবারেও আমাব হাতে সময় ছিল না। সেবার কিন্তু রাখালদাকে দেখিনি।

তারপরে মিস্টার সরকার শিলং বদলি হয়ে যান, কাজলদিও ম্যাট্রিক পাস করে। অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি লিখেছিলুম, তার উত্তরে সে লিখেছিল, ''যেন তোমাদেব যোগ্য হতে পারি।''

আড়াই বছর পরে পাটনায় খবর পেলুম নতুন পোস্টমাস্টার জেনারেলের নাম সরকার এবং তাঁর ছেলের নাম টোগো। বাপের চেয়েও ছেলের নামডাক বেশী, ও নাকি মোহনবাগানে খেলত। টোগো একদিন আমাদের কলেজে এল, ভর্তি হল আমার নীচের ক্লাসে। আমাকে দেখে চিনতে পারলে না, কিন্তু আমার নাম শুনে বললে, ''হ্যাঁ মনে পড়ছে, ও নামে আমার এক দাদা ছিলেন বটে।'' আমি যতই বলি, ''আমি বয়সে ছোট'', সে ততই বলে, ''তা হলে আপনি অন্য লোক।'' বুঝতে সময় লাগল যে, টোগোর মানহানি হয় যদি কেউ বলে সে বয়সে বড় হয়েও নীচের ক্লাসে পড়ে। অগত্যা আমাকেই দাদা সাজতে হল। তখন টোগো আমাকে বাড়ি নিয়ে গেল।

কী আশ্চর্য, কাজলদির মা মিসেস সরকারও রায় দিলেন যে, আমি টোগোর চেয়ে তো বটেই কাজলের চেয়েও বয়সে বড়। এবং আমার মতো অবিশ্বাসীকে বিশ্বাস করানোর জন্য কাজল ও টোগো দু'জনেই দু'খানা ম্যাট্রিক সার্টিফিকেট এনে দেখালে। তাতে বয়সের ঘরে যা লেখা ছিল তা যদি সত্য হয় তবে ''স্নেহশীলা কাজলদি''র অনেকগুলি চিঠির স্বাক্ষর ঝুটো।

এবং সব চেয়ে আশ্চর্য কাজলদি অম্লানবদনে বললে, ''তুমি আমাকে দিদি সম্বোধন করে চিঠি লিখতে বলে আমার কেমন যেন একটা ধারণা জন্মায় যে আমিই বড়। কিন্তু পরে বুঝতে পেরেছি ওটা আমার ভুল। ও ভুল আমার মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিলে তুমিই, অনুদা।''

এর পরে আমি ওকে সরাসবি কাজল বলে ডাকতে শুরু করি। তা ও এত খুশি হয় যে ঠিক ছোটবোনের মতো আমাকে যত্ন করে খাওয়ায়। হস্টেলের রান্নায় আমার অরুচি ধরেছিল, আমি তো বর্তে গেলাম। বললুম, ''শুধু দাদা কেন, ঠাকুরদাদা হতেও রাজি আছি, যদি হপ্তায় একবেলা তোমার হাতে খেতে পাই।''

শনিবার বিকেলে ওদের ওখানে আমার বাঁধা নিমন্ত্রণ। ফিরতে রাত হয় বলে রাতের খাওয়াটাও সেরে আসি। ক্রমশ রবিবার বিকেলেও অনাহূত উপস্থিত হই, এবং হস্টেল থেকে বিতাড়িত হবার ভয়ে সন্ধ্যার আগেই ফিরি। কাজলদি আমাকে স্টোভে রেঁধে খাওয়াত। বিধবা বলে ও স্বপাক রেঁধে খেত। কিন্তু ওর নিরামিষের তালিকায় মাছ-মাংস ছিল। ডাক্তারের হুকুম। তাতে আমারই সুবিধে। আমিও সায় দিয়ে বলতুম, ''শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্।''

কিন্তু মাছ-মাংস খেলে হবে কী, দিন-রাত যা পড়া সে পড়ত তার ফলে তার শরীর শুকিয়ে কাঠ হয়েছিল। এমনকি রাঁধতে রাঁধতেও বইয়ের পাতা ওলটাত। আমাকে জিজ্ঞাসা করত যত সব কেতাবী প্রশ্ন। যা খাওয়াত তার দাম আদায় করে নিত আমাকে সমস্ত ক্ষণ বকিয়ে।

''আচ্ছা, কাজল,'' আমি মাঝে মাঝে রাগ করতুম, ''তুমি যে অতটুকু খেলে, ওতে কি তোমার পড়াশুনা চালিয়ে যাবার মতো সামর্থ্য হবে?''

''বিধবা মানুষের,'' সে জবাব দেয়, ''ওর বেশী খেতে নেই।''

এই নিয়ে প্রায়ই আমাদের ঝগড়া বাধত। আমি বলতুম, ''তুমি কিসের বিধবা! বিয়ের একমাসও যায়নি—''

"আমি তবে কী?"

"কুমারী।"

সে মনে মনে খুশি হত, কিন্তু বাইরে বিরাগের ভান করত। "ওমা! বিয়ে হল, সব হল, কুমারী। ছি! কী যে বল, দাদা!"

একদিন আমি তাকে গম্ভীরভাবে বললুম, "দাদা বলেছ যখন, তখন দাদার কথা শুনতে হবে।"

"কী কথা?"

"তুমি যে দিন দিন অমন করে শুকিয়ে যাচ্ছ এ আমার চোখে সয় না। আমি আর আসব না, যদি এর প্রতিবিধান না কর।"

"প্রতিবিধান।" সে একটু চিন্তিত হয়ে বলল, "তবে কি তুমি চাও আমি পড়াশুনা বন্ধ করে দিই? দিলে কী নিয়ে থাকব? বিধবা মানুষের একটা অবলম্বন চাই তো।"

"আবার বিধবা। বিধবা নয়, কুমারী।"

"বেশ বিধবা নয়, কুমারী। কিন্তু কুমারীরই বা করবার কী আছে!"

"কেন, বিয়ে?"

"বিয়ে দেবে কে? তুমি?"

"কেন, তোমার মা বাবা?"

"মা বলেন, পড়ছে পড়ুক, কিন্তু বিয়ে আমি কিছুতেই দেব না। বিদ্যাসাগরেব মুখে আগুন। আর বাবা বলেন, দিতে পারি, যদি বিনা পণে আই সি এস কি আই এম এস পাত্র পাই।"

আমি হেসে বললুমল "আর টোগো?"

"টোগো বলে. আমি ম্যাচ বলতে বুঝি ফুটবল ম্যাচ। আব কোনো ম্যাচ বুঝিনে। নিজেও বিয়ে করব না, তোমাকেও বিয়ে করতে বলব না। ভাইবোনে যেমন আছি তেমন থাকব চিরকাল।"

"কথাটা ঠিক। ম্যাচ বলতে যা বোঝায় আমিও তার বিপক্ষে। কিন্তু ভালোবেসে বিয়ে করায় আপত্তি কী?"

দিদি তা শুনে হেসে আকুল। আমি যেন কী একটা বেখাপ কথা বলেছি।

সেদিন দিদি আমার হাতে এক তাড়া কাগজ গুঁজে দিয়ে বললে, "খবরদার, কাউকে দেখিয়ো না। পড়া হয়ে গেলে লুকিয়ে ফেবৎ দিযো। লক্ষ্মীটি, আমার মুখ হাসিয়ো না।"

হস্টেলে ফিরে আলো জ্বেলে পড়তে বসি। পাঠ্যপুস্তকের ফাঁকে অপাঠ্য চিঠি। পবেব চিঠি পড়তে একটুও ভালো লাগে না, মনে হয় পাপ করছি। একবার চোখ বুলিয়ে গিযে বুঝতে পারলুম ওগুলি প্রেমপত্র। রাখালদা লিখেছেন কাজলদিকে। খুশি হলুম। কারণ রাখালদা এম এ'তে ফার্স্ট ক্লাস পেযে প্রোফেসার হয়েছেন। উপায় থাকলে বিলেত যেতেন, অক্সফোর্ড কি কেমব্রিজের ডিগ্রি নিয়ে ফিরতেন। তাঁর মতো পাত্র কিনা বিনা পণে পাওয়া দুর্লভ ভাগ্য।

পরের শনিবার কাজলদিকে বললুম, "ভাবছ কী? চোখ বুঁজে ঝুলে পড়। এমন পাত্র হাতছাড়া করতে নেই। আর এ তো শুধু পাত্র নয়, প্রেমিক।"

কাজলদি আমার গালে এক ঠোনা মেরে বলল, 'দুষ্টু!'

তারপরে আমরা দু'জনে পায়ে হেঁটে বেরিয়ে পড়লুম খিড়কি দিয়ে রাস্তায়। কাছেই রেললাইন, লাইন পেরিয়ে বন। সেদিন আমাদের কথাবার্তা কি ফুরায়। সে আমাকে সমস্ত খুলে বললে গোড়া থেকে।

সেই যে আইসক্রীম খাওয়ানো তার কয়েক মাস পরে রাখালদা বিয়ের প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবটা যেই কর্তাগিন্নীর কানে গেল অমনি তাঁরা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। কর্তা বললেন,

"যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। বামন হয়ে চাঁদে হাত!" গিন্নী বললেন, "আমি দুধকলা দিয়ে কালসাপ পুষেছিলুম গো। ছেলের মতো ভালোবেসেছিলুম। হায় হায়। কী অকৃতজ্ঞতাই করলে।" রাখালদার আসা বারণ হয়ে গেল। কাজলদিকে পড়াতে এক বাহাত্তুরে বুড়ো বহাল হবেন।

কিন্তু চিঠি লেখা বন্ধ হল না। শিলঙে রাখালদা একবার হাওয়াবদলের জন্যে গেছলেন, হোটেলে উঠেছিলেন। কথাটা পেশ করা হয় পাঁচজন ভদ্রলোকের মারফত। কর্তা তাঁদের অপমান করে তাড়িয়ে দিলেন। গিন্নী তাঁদের কাছে মাফ চেয়ে পাঠালেন, নইলে অনেক দূর গড়াত। তারপর থেকে রাখালদার চিঠি লেখায় ইতি। কাজলদি বার বার লিখে উত্তর পায়নি। শেষবার লিখেছিল পাটনা বদলির খবর দিয়ে।

কাজলদির ভীষণ ভাবনা রাখালদা হয়তো আর কাউকে বিয়ে করে শোধ তুলবেন। হয়তো এতদিনে বিয়ের কথাবার্তা বেশ কিছুদূর এগিয়েছে। কিন্তু ভেবে তো কোনো কূলকিনারা নেই। যা হবার তা হবেই। কাজলদি তাব কী করতে পাবে। শুধু শুধু মন খারাপ করার চেয়ে চব্বিশ ঘণ্টা লেখাপড়া করা ভালো। তাতে মনটাকে ভুলিয়ে রাখা যায়। তবে হাঁ, শরীরটাকে ভোলানো শক্ত। এমন তীব্র মাথা ধরে যে অ্যাস্‌পিরিন খেতে হয় হামেশা।

দু'একজন বন্ধুর সঙ্গে আইনের কথা কয়ে কাজলদিকে একদিন বললুম, " বোন আইন তোমাকে বাধা দিচ্ছে না। ধর্মেরও বাধা নেই। ইচ্ছা করলে তুমি নিজেই নিজের বিয়ে দিতে পার। লজ্জা করে তো আমায় বল আমিই তোমাব বিয়ে দেব। খামোকা কষ্ট পাচ্ছ কেন? অমন করে তুমি ক'দিন বাঁচবে। বল তো আমি চেষ্টা করি।"

"তার মানে।" সে চমকে উঠল। "কার সঙ্গে চেষ্টা করবে?"

"যার সঙ্গে তোমার প্রেম তাঁর সঙ্গে। রাখালদার উপর আমারও তো একটা দাবি আছে। আমি যদি অনুনয় করি তো তিনি আর কাউকে বিয়ে করবেন না। আমাব দাদা তিনি, আমার কথা রাখবেন।"

কাজলদি কেমন এক হেঁয়ালির মতো হেসে বলল, "আচ্ছা, তাহলে তুমি তাঁকে চিঠি লেখ। কী জবাব দেন দেখব।"

আমি অনেক খেটেখুটে একখানা ভাবী চমৎকার চিঠি খাড়া করলুম। দিদিকে দেখতে দিলুম না। যদি আমার উৎসাহের মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢালে। চিঠি তো গেল, আমি আমার ঘুম নষ্ট করে যত রকম প্ল্যান আঁটতে থাকলুম, কোথায় বিয়েটা হবে, হিন্দু মতে না তিন আইন অনুসারে, দিদিব মা-বাবার চোখে ধুলো দেওয়া যায় কী করে, শেষকালে যদি ওঁরা তাকে নজরবন্দী করেন তো কী উপায়।

যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়াপড়শীর ঘুম নেই। দেখা গেল দিদি সম্পূর্ণ উদাসীন। বলে, "আগে থাকতে অত ভেবে কী হবে। চিঠির কী জবাব আসে দেখ। হয়তো তিনি অন্যত্র এন্‌গেজড্।" মুচকি হাসে।

অবশেষে রাখালদার উত্তর এল। তিনি লিখলেন, তিনি আমার মতো সাহিত্যিক বা সাহিত্যের ছাত্র নন। অমন চমৎকার চিঠির উত্তরটা যদি চমৎকার না হয় আমি যেন তাঁকে ক্ষমা করি। তাঁর যা বলবার আছে তিনি তা মুখে মুখে বলতে চান। আমি কি তাঁর সঙ্গে কলকাতায় দেখা করতে পারি? ছোট ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে তিনি পাটনা আসতে কুণ্ঠিত।

অগত্যা আমাকেই কলকাতা যেতে হল। রাখালদা আমাকে তাঁর মেসের অতিথি করলেন। দুই ভাইয়ের মনের কথা বলাবলি হল।

"আমি জানি তুমি তোমার কাজলদির দুঃখে দুঃখী। তুমি তাব দুঃখ দূর করতে চাও। সাধু, সাধু। কিন্তু তোমার দিদির দুঃখ যাকে ভাবছ সেটা একটা প্রচ্ছন্ন সুখ। তিনি নিজেই সেটাকে পুষে রাখতে চান যে। তুমি করবে কী! আর আমিই বা তার কী করতে পারি।"

"কিন্তু বাখালদা—"

"বিশ্বাস হচ্ছে না আমার কথা। তবে শোন বলি। কাজল এখনো তার সেই স্বামীকেই ধ্যান করছে। পাচ্ছে না বলে রোখ করে বই পড়ছে। না, তার জ্ঞানপিপাসা নেই। সে জ্ঞানের জন্যে পড়ে না। এমনকি পাস করার জন্যেও না। সে পড়ে স্রেফ আত্মপীড়নের জন্যে। এ যেন নিজেকে নিজের হাতে চাবকানো। শরীর তো ভেঙে যাবেই। আর ঐ অ্যাসপিরিন হচ্ছে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে। ওতে উদ্দীপনা বাড়ে। বুঝলে ভাই, তোমার কাজলদি হচ্ছে যাকে বলে masochist অর্থাৎ মর্ষকামী।"

আমি মনোবিকলনের বিশেষ কিছু জানতুম না, তবে মোটামুটি এই বুঝতুম যে, কতক লোক আছে তারা মার খেতে ভালোবাসে। তাদের মন পেতে হলে মার লাগাতে হয়। আমার দিদি যে তাদের একজন, একথা কখনো আমার মনে উদয় হয়নি, তাই রাখালদার উপর চটে গেলুম। কোথাকার এক টুলো পণ্ডিত, একেলে টোলের বিদ্যাদিগ্‌গজ। এই পুঁথিপোড়োর সঙ্গে তর্ক করে ফল কী।

আমি ফোঁস করে উঠে বললুম, "রাখালদা, আপনি সোজা বলে দিন যে ওকে বিয়ে করবেন না, ওর চেয়ে ভালো মেয়ের সন্ধান পেয়েছেন। মিথ্যে কেন বেচারিকে অপবাদ দিচ্ছেন। আর এ কি বড় সামান্য অপবাদ। একথা শুনলে কোন মেয়ে না লজ্জায় গলায় দড়ি দেবে।"

রাখালদা অট্টহাস্য করলেন। বললেন, "বাইশ বছরে তুমি সবজান্তা হতে পারো, কিন্তু স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্—বুঝলে ভায়া—এখনো তোমার অপঠিত। এটা একটা অপবাদই নয়, বরং সুখ্যাতি। শুনলে তোমার কাজলদি গলায় দড়ি দেবেন না, গলায় আঁচল দিয়ে স্বামীর ফটোর পায়ে গড় হয়ে প্রণাম করবেন। বলবেন, এত প্রহারেও যদি তোমায় না পাই তবে, হে আমার প্রভু, মারো মারো আমায় আরো আরো। অ্যাসপিরিন দিয়ে দফা সারো।"

আমি আর শুনতে প্রস্তুত ছিলুম না। উঠতে চাইলুম। রাখালদা বললেন, "ও কী তুমি এত দূর থেকে এলে, অমনি ফিরে যাবে। না, আজ তোমার যাওয়া হতে পাবে না। তোমাকে একটা কাজ দিচ্ছি। এই যে চিঠিগুলো, এগুলো বসে বসে পড়। আমি ততক্ষণ ঘুরে আসি।"

কাজলদির চিঠি এক রাশ। উচ্ছ্বসিত প্রণয়-নিবেদন। কোনোখানেই তার ভূতপূর্ব স্বামীর নামগন্ধ নেই। যেন কুমারী মেয়ের চিঠি। তার যা-কিছু ভয়, যা-কিছু ভাবনা তার মা-বাবার জন্যে। তাঁরা যে রাজি হবেন না এটা স্বতঃসিদ্ধ। তাঁদের অবাধ্য হওয়া তার অকল্পনীয়। তার একমাত্র আশা ধীরে ধীরে তাঁদের মত বদলাবে। মেয়ের কষ্ট দেখে তাঁদের মন গলবে। একদিন তাঁরা তার বিয়ের প্রস্তাবে সায় দেবেন। ততদিন অপেক্ষা করা তার কর্তব্য এবং রাখালদা যদি তাকে ভালোবাসেন তো রাখালদারও। কিন্তু রাখালদা কি ততদিন অপেক্ষা করবেন? কী জানি! পুরুষের মন চির-চঞ্চল।

শিলঙের সেই অবমাননার পরে যেসব চিঠি লেখা হয়েছে তাতেও কাজলদি তাঁকে আশা রাখতে বলেছে, অপেক্ষা করতে বলেছে। পিতামাতার হয়ে মার্জনা ভিক্ষা করেছে। বলেছে, অপমানের আঘাত শতগুণ বেজেছে শিবের চেয়ে সতীর গায়ে। সতীর মতো সে হয়তো দেহত্যাগই করবে, কিন্তু তিলে তিলে। তবে যদি তাঁদের চৈতন্য হয়।

রাত্রে রাখালদাকে বললুম, "কই, এর মধ্যে ওর স্বামীর কথা কই? ওর যে স্বামী ছিল তার উল্লেখ পর্যন্ত নেই।"

"তুমি ছেলেমানুষ।" তিনি আমাকেই দোষ দিলেন। "চিঠি কী করে পড়তে হয় তাও শেখনি। আর কাজল এত কাঁচা মেয়ে নয় যে, সোজা ভাষায় বলবে। এসো, তোমাকে দেখাই।"

দু'একখানা চিঠি এমন সুরে এমন অর্থপূর্ণভাবে পাঠ করে শোনালেন যে, আমার মনে হতে লাগল, যার চিঠি সেই বলতে পারে ওর মধ্যে কী আছে না-আছে। রাখালদার কথাই মেনে নিলুম।

তখন তিনি আমাকে তাঁদের দু'জনের সমস্যা আনুপূর্বিক শোনালেন। তিনি বিয়ে করতে চেয়েছিলেন, এখনো চান, দিদিকে বাঁচাতে। তিনি যদি না বিয়ে করেন, কেউ যদি না বিয়ে করে, তবে দিদি বাঁচবে না। দিদির জন্যে আমার যত না মাথাব্যথা তাঁর ততোধিক। কিন্তু তিনিও কিছু করতে পারলেন না, আমিও পারব না। কারণ দিদি বাঁচতে চায় না।

"সে কী, রাখালদা। এ জগতে কে না চায় বাঁচতে। সামান্য ধূলিকণাটুকু, সেও বলে, মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে—"

"ওটা তোমার কবিত্ব। তোমার দেখছি অনেক শিক্ষা বাকি আছে। ধূলিকণা কী বলে জানিনে, কিন্তু মানুষ যা বলে তার কোন্‌টা যে সত্য কোন্‌টা যে মিথ্যা মুনিরাও বুঝতে পারেন না। কবিরা তো কপি।"

তারপর জুড়লেন, " তোমার কাজলদি কেমন অকাতরে মিথ্যা বলে তা কি তুমি জানো।"

ফিরে এলুম। কাজলদি সব শুনল। শুনে বলল, "কেমন, হল তো?"

তারপরে এক সময় মন খুলল। "আমি ওঁকে অন্তত একশোবার বুঝিয়েছি যে ওঁর ঐ সন্দেহ ভুল। পূর্ব-স্বামীর ফটোর কাছে দু'মিনিট দাঁড়ানো, এক মিনিট চোখ বুজে থাকা, দু'হাত জোড় করে একটিবার কপালে ঠেকানো—এর সঙ্গে বর্তমান স্বামীর প্রতি অনুরাগের অসামঞ্জস্য কোথায়? মৃত পত্নী থাকলে উনিও একভাবে না একভাবে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতেন। আমি কিছু মনে করতুম না।"

সেকথা ঠিক, আমি একমত হলুম।

তারপরে দিদি ফিক করে হাসল। "মৃত পত্নী না থাক, বৌদি আছেন। আমি কি কোনো দিন কিছু মনে করেছি?"

আমি বললুম, "মিথ্যা কথা।"

"মিথ্যা কথা। আচ্ছা, আমিই না হয় মিথ্যাবাদী, আসছেবার কলকাতা গেলে ওঁকেই জিজ্ঞাসা কোরো।"

"ছি। এ কি কখনো সত্যি হতে পারে!"

" কে জানে। উনি যদি নিজের থেকে না বলতেন আমি কেমন করে জানতুম। উনিই তো বলেছিলেন একদিন, কাজল, আমাকে বাঁচাও, আমাকে উদ্ধার করো, আমি যে ডুবতে বসেছি। .. আমি তো ছাড়তে চাই, কমলি নেহি ছোড়তি। ... বুঝতে পারলে, না আরো ভেঙে বলতে হবে?"

এ রাম। আমি কানে আঙুল দিলুম। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরুল।

"একটা মানুষ ডুবে মরছে দেখলে কার না ইচ্ছে যায় জলে ঝাঁপ দিতে। আমি ঠাকুরঘরে ঢুকে ঠাকুরকে বললুম, ঠাকুর আমি ঝাঁপ দিতে চললুম। ওঁকে যদি বাঁচাতে পারি তো বাঁচব। নয়তো মরব। হে ঠাকুর, বল দাও আমাকে, বল দাও ওঁকে। ... বিয়ে আমাদের হয়নি, তা তুমি জান। কেন হয়নি, তাও জান। কিন্তু প্রাণপণে তাঁকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছি, উপদেশ দিয়ে নয়, প্রেম দিয়ে। আমার ক্ষোভ শুধু এই যে, তিনিও বাঁচলেন না, আমিও মরলুম।"

এরপরে আমি আবার রাখালদাকে চিঠি লিখি। তিনি যখন বিয়ে করতে এখনো রাজি আর ইনিও ইচ্ছুক, তখন পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে ডুবে মরার কোনো মানে হয় না। বিয়ের পরে আপনি একটা বোঝাপড়া হবে, দু'জনে দু'জনকে বাঁচাবেন। সাবালক ও সাবালিকার বিবাহে গুরুজনের হস্তক্ষেপ গর্হিত। পোস্টমাস্টার জেনারেল যদি না সমঝেন তো তাঁকে সমঝানোর জন্যে উকিল নিযুক্ত করা যাবে।

কিন্তু রাখালদা কেমন করে টের পেলেন যে, কাজলদি আমাকে তাঁর বৌদির কথা বলেছেন। আমি উল্লেখ করিনি, সেটুকু সুবুদ্ধি আমার ছিল। কিন্তু কবিত্ব ফলাতে গিয়ে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে ডুবে মরা ইত্যাদি লিখেছিলুম। পরস্পরকে বাঁচানোর উল্লেখ

করেছিলুম। তার থেকে যা অনুমান করবার তা অনুমান করতে তাঁর এক মুহূর্ত লাগেনি। জবাব এল, চাচা, আপনা বাঁচা। কেউ কাউকে বাঁচাতে যাবে কেন, যে যার নিজেকে বাঁচাক। বিয়ের কোনো আবশ্যক নেই। বিয়ে না করলেও মানুষের বেশ চলে যায়, বেশ চলে যাচ্ছে।

চিঠিখানা কাজলদিকে দিলুম। তারই উদ্দেশে লেখা। সে একটা উত্তর খসড়া করে আমাকে দিলে। আমি নিজ হাতে নকল করে পাঠালুম। তাতে ছিল, তা হলে বিয়ের প্রস্তাব করেছিলেন কেন? বিয়ে কি আর কোথাও করবেন না? যদি চিরকুমার থাকাই স্থিব করে থাকেন তো সেই সুসংবাদ দিয়ে সুখী করবেন। হরিনামের গুণে গহন বনে শুষ্ক তরু মুঞ্জরে। কাজলদি আব শুকিযে যাবে না, যদি শোনে আপনি চিরকুমার থাকবেন।

এবার যে জবাব এল তা আমার জন্যে নয়, কাজলদির জন্যে। আমি ডাক-হরকরা। পরের চিঠি পড়া আমার বারণ। চিঠিখানা দিদিকে দিলুম, তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। চিঠিখানাকে বুকে চেপে ধরে সে চোখেব জল ঝরাল আর মিষ্টি মিষ্টি হাসল।

এবার আমি তারই লেখা খসড়া আমার লেখা খামে ভরে ডাকঘবে পাঠালুম, পড়ে দেখলুম না কী ছিল তাতে। জবাব এল তারই নামে, আমার কেয়ারে। এবপর খামের উপব ঠিকানা লেখা ও খাম বন্ধ করাও কাজলদি আমার হাত থেকে স্বহস্তে নিল। আমার কাজ হল চাপরাশির ও ডাক-পিয়নের কাজ বাঁচিয়ে দেওয়া। কারণ ছিল। কাজলদির মা ডাকঘবেব সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছিলেন— মেয়ের নামের চিঠি তিনিই হস্তগত করতেন। আর মেয়ে কাউকে চিঠি লিখলে চাপরাশিকে বলা ছিল তাঁকে একবার দেখিযে নিতে।

পোস্টমাস্টার জেনারেলের চোখে ধুলো দিলুম, কিন্তু পোস্টমিস্ট্রেস জেনাবেলের হাতে ধরা পড়ে গেলুম। তখন আমাকেও সম্বর্ধনা কবা হল রাখালদার মতো। সম্মার্জনী দিয়ে নয়, সেটা আজকাল উঠে গেছে। কিন্তু সেই মনোভাব দিয়ে। অপমান পরিপাক করে হস্টেলের ছেলে হস্টেলে ফিরলুম। আর ও-মুখো হইনি।

তারপর পাটনা ছাড়ি। কাজলদির সঙ্গে শেষ দেখা হল না বলে মনে আক্ষেপ ছিল, কিন্তু আনন্দও ছিল এই যে আমি ওদেব ভাঙা প্রণয় জোড়া দিয়েছি। কলকাতায় দাদার সঙ্গে দেখা করি ও দু'তিন দিন থাকি। দিদির সেই কথাটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলি। তিনি ও-কথা হেসে উড়িয়ে দেন। "হো হো। নিজে ভার্জিন নয় কিনা। তাই কল্পনা কবে আত্মপ্রসাদ পায় যে আমিও ভার্জিন নই। স্রেফ মেয়েলি কল্পনা। তোমায় ছেলেমানুষ দেখে মোয়া ধরিয়ে দিয়েছে। আমাদেব মনোবিজ্ঞানে এ-রকম কেস শত শত আছে। একটা থীসিস লিখলে হয়।"

কিছুদিন পরে আমি বিলেত চলে যাই। বলা বাহুল্য, কাজলদিদের ভুলে যাই। দু'বছব তাদের কোনো খবরাখবব পাইনে। অবশেষে যেদিন ইংলণ্ড ছাড়ব তার একদিন আগে হঠাৎ শুনলুম আমার ছোটবোন লণ্ডনে।

সেই মেয়ে-হস্টেল থেকে কাজলদিকে নিয়ে যাই দোকানে একটা উপহার কিনে দিতে। পথে জিজ্ঞাসা করি, "মিসেস চৌধুরী হতে পারলে না, মিসেস বক্সী রয়ে গেলে। কার দোষে বল তো?"

"দোষ কারো নয়। আমার নিয়তি। আমাদের নিয়তি। ... কমলির একটি ছেলে হয়েছে। অবিকল ওঁর মতো দেখতে। কমলি কেন ছাড়বে।"

আমি ভয়ানক শক্ পেলুম। বিশ্বাস করলুম না, বললুম, "তা হলে সব চুকিয়ে দিয়ে বিলেত পালিয়ে এলে?"

"না। চুকিয়ে দেব কেন? ... এই দেখ, দিন রাত বুকে বুকে রেখেছি।" যা দেখালে তা একটি লকেট। তাতে ছিল একটিমাত্র ইংরেজী হরফ। "R"। রাখালদার নামের আদ্যক্ষর।

তখন আমার খেয়াল হয়নি, হল বহুকাল পরে, কাজলদির আসল নাম রমা। ততদিনে কাজলদি স্বর্গে।

অঙ্গার

প্রবোধকুমার সান্যাল

বছর আষ্টেক হোলো দিল্লীতে আমি চাকরী করছি। কলকাতার সঙ্গে সম্পর্ক কম। কোনো কোনো বছরে কলকাতায় এক আধবার আসি, ঘুরে বেড়িয়ে সিনেমা দেখে আবার ফিরে চলে যাই। নইলে, ইদানীং আর আসা হয়ে ওঠে না।

বছর তিনেক আগে ফরিদপুর থেকে শোভনা আমাকে চিঠি লিখেছিল — ছোড়দাদা, তুমি নিশ্চয়ই শুনেছ আজ ছ'মাস হ'তে চললো আমার কপাল ভেঙেছে। ছেলেটাকে নিয়ে কিছুদিন শ্বশুববাড়ীতে ছিলুম, কিন্তু সেখানেও আর থাকা চললো না। তোমার ভগ্নিপতি এক আধশো টাকা যা রেখে গিয়েছিলেন, তাও খরচ হয়ে গেল। আর দিন চলে না। তুমি আমার মামাতো ভাই হলেও তোমাকে চিরদিন সহোদর দাদার মতন দেখে এসেছি। ছেলেটাকে যেমন ক'রে হোক মানুষ ক'রে তুলতে না পারলে আমার আর দাঁড়াবাব ঠাঁই কোথাও থাকবে না। এদিকে যুদ্ধের জন্য সব জিনিসের দাম ভীষণ বেড়ে গেছে। নুটু পাশ ক'রে চাকরি খুঁজছে, এখনও কোথাও কিছু সুবিধে হয়নি। মা ভেবে আকুল। ইস্কুলের মাইনে দিতে না পারায় হারুর পড়া বন্ধ হযে গেল। বাবার কোম্পানীর কাগজ ভেঙে সব খাওয়া হয়ে গেছে। তুমি যদি এ অবস্থায় দয়া ক'বে মাসে মাসে দশটি টাকা দাও, তাহ'লে অনেকটা সাহায্য হতে পারে। ইতি —

দিল্লীতে আমার এই চাকরীর খোঁজ প্রথম পিসেমশাই আমাকে দেন, সুতরাং শোভনার চিঠি পেয়ে স্বর্গত পিসেমশায়েব প্রতি আমার সেই আন্তরিক কৃতজ্ঞতাটা হৃদয়াবেগের সঙ্গে ঘুলিয়ে উঠলো। সেই দিনই অমি পঁচিশটি টাকা পাঠিয়ে দিলুম এবং শোভনাকে জানালুন, তোর ছেলে যতদিন না উপার্জ্জনক্ষম হয়, ততদিন প্রতি মাসে আমি তোর নামে পনেরো টাকা পাঠাবো।

সেই থেকে শোভনা, পিসিমা, নুটু, হারু — সকলের সঙ্গেই আমার চিঠিপত্রে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। পুজোর সময় এবং নতুন বছরের আরম্ভেও আমি কিছু কিছু টাকা তাদের দিতুম। তিন বছর এইভাবেই চলে এসেছে।

ইতিমধ্যে যুদ্ধের গতির সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশের কি-প্রকার অবস্থা দাঁড়িয়েছে, অথবা শোভনারা কিভাবে তাদের সংসার চালাচ্ছে, এর পুঙ্খানুপুঙ্খ খোঁজ-খবর আমি নিইনি, দরকারও হয়নি। মাঝখানে বোমার ভয়ে যখন কলকাতা থেকে বহু লোক মফঃস্বলের দিকে এখানে ওখানে পালিয়েছিল, সেই সময় শোভনার চিঠিতে কেবল জানতে পেরেছিলুম, ফরিদপুরে জিনিসপত্রের দর খুব বেড়ে গেছে। অনেক লোক এসেছে — ইত্যাদি। কিন্তু টাকা আমি নিয়মিত পাঠাই, নিয়মিত প্রাপ্তি স্বীকার এবং চিঠিপত্রও আসে। যা হোক এক রকম ক'রে শোভনাদের দিন কাটছে।

কিন্তু প্রায় ছ'মাস আগে মাসিক পনেরো টাকা পাঠাবার পর দিনকয়েক বাদে টাকাটা দিল্লীতে ফেরৎ এলো। জানতে পারলুম ফরিদপুরের ঠিকানায় পিসিমারা কেউ নেই। কোথায়

তা'রা গেছে, কোথায় আছে, কিছুই জানা যায়নি। চিঠি দিলুম, তার উত্তর পাওয়া গেল না। আর কিছুকাল পরে আবার মনি-অর্ডারে টাকা পাঠালুম, কিন্তু সে টাকাও যথাসময়ে ফেরৎ এলো। ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে না পেরে চুপ ক'রে গিয়েছিলুম। ভাবলুম, টাকার দরকার হ'লে তারা নিজেরাই লিখবে, আমার ঠিকানা ত' তাদের অজানা নয়।

কিন্তু আজ প্রায় তিন বছর পরে হঠাৎ কলকাতায় যাবার সুযোগ হোলো এই মাত্র সেদিন। আমাদের ডিপার্টমেন্টের সাহেব যাচ্ছেন কলকাতায় তদ্বির-তদন্তের কাজে। আমাকেও সঙ্গে যেতে হবে। ভাবলুম, এই একটা সুযোগ। সপ্তাহ তিনেকের মধ্যে কোনো একটা শনিবারে যাবো ফরিদপুরে, সোমবারটা নেবো ছুটি — দিন দুয়েকের মধ্যে দেখাশোনা ক'রে ফিববো। একটা কৌতূহল আমার প্রবল ছিল, যাদের বর্তমানে অথবা ভবিষ্যতে কোনো সংস্থান হবার কোন আশা নেই, সেই দরিদ্র পিসিমা আর শোভনা পনেরো টাকা মাসোহারার প্রতি এমন উদাসীন হলো কেন? শুনেছিলুম, ফরিদপুর টাউনে ইতিমধ্যে কলেরা দেখা দিয়াছিল, তবে কি তাদের একজনও বেঁচে নেই? মনে কতকটা দুর্ভাবনা ছিল বৈ কি।

সাহেবের সঙ্গে কলকাতায় এলুম এবং এসে উঠলুম পাঁচগুণ খরচ দিয়ে এক হোটেলে। এসে দেখছি এই বিরাট মহানগর একদিকে হয়ে উঠেছে কাঙ্গালীপ্রধান ও আর একদিকে চলেছে যুদ্ধ-সাফল্যের প্রবল আয়োজন। ফলে, যারা অবস্থাপন্ন ছিল তারা হয়ে উঠেছে বহু টাকার মালিক, আর যারা গরীব গৃহস্থ ছিল, তাঁরা হয়ে এসেছে সর্বস্বান্ত। দেশের সবাই বলছে, দুর্ভিক্ষ, গবর্ণমেন্ট বলেছেন, না, এ দুর্ভিক্ষ নয়, খাদ্যাভাব। দুটোর মধ্যে তফাৎ কতটুকু সে আলোচনা আপাতত স্থগিত রেখে সপ্তাহখানেক ধরে আমাব কর্তব্যস্রোতে গা ভাসিয়ে দিলুম। এর মধ্যে আর কোনোদিকে মন দিতে পারিনি। এইভাবেই চলছিল। কিন্তু ছোট পিসির মেজ ছেলে নুটুর সঙ্গে একদিন শেয়ালদার বাজারের কাছে হঠাৎ দেখা হয়ে যেতেই কথাটা আবার মনে পড়ে গেল। একটা ফুলকাটা চটের থলেতে সের পাঁচেক চাল আর বাঁহাতে ডাঁটাশাক নিয়ে সে বিকেলের দিকে পথ পেরিয়ে যাচ্ছিল। দেখা হতেই সে থমকে দাঁড়ালো। বললুম, কিরে নুটু?

চমকে সে ওঠেনি, কিছুতেই বোধ হয় সে আর চমকায় না। কেবল তার অবসন্ন চোখ দুটো তুলে সে শান্তকণ্ঠে বললে, কবে এলে ছোড়দা?

তার হাত ধরে বললুম, তোদের খবর কি রে?

খবর? — ব'লে সে পথের দিকে তাকালো। কশাইখানার মিলিটারি মৃত্যুপথযাত্রী রুগ্ন গাভীর মতো দুটো নিরীহ তার চোখ, যেন এই শতাব্দীর অপমানেব ভারে সে-চোখ আচ্ছন্ন। মুখ ফিরিয়ে বললে, খবর আর কি? কিছু না।

হাসিমুখে বললুম, এ কি তোর চেহারা হয়েছে রে? পঁচিশ বছর বয়স হয়নি, এরই মধ্যে যে বুড়ো হয়ে গেলি?

আমার মুখের দিকে চেয়ে নুটু বললে, বাংলা দেশে থাকলে তুমিও হতে ছোড়দা —

কথাটায় অভিমান ছিল, ঈর্ষা ছিল, হতাশা ছিল। বললুম, চাল কিনলি বুঝি?

নুটু বললে, না, আফিস থেকে পাই কন্ট্রোলের দামে। চারজন লোক, কিন্তু সপ্তাহে ছ'সেরের বেশী পাইনে। এই ত' যাবো, গেলে রান্না হবে। তোমার খবর ভালো, দেখতেই ত' পাচ্ছি। বেশ আছো — আচ্ছা, চলি, যুদ্ধ থামবার পর যদি বাঁচি আবার দেখা হবে।

বললুম, শোভনাদের খবর কিছু জানিস? তারা কি ফরিদপুরে নেই?

না — ব'লে একটু থেমে নুটু পুনরায় বললে, তাদের খবর আমার মুখ দিয়ে শুনতে চেয়ো না ছোড়দা!

কেন রে? তারা থাকে কোথায়?

বৌবাজারে, তিনশো তেরোর এফ্ নম্বরে। হ্যাঁ, যেতে পারো বৈ কি একবার। আসি তা হ'লে — এই ব'লে নুটু আবার চললো নির্বোধ ও ভারবাহী পশুর মতো ক্লান্ত পায়ে।

নুটুর চোখে মুখে ও কণ্ঠস্বরে যেরকম নিরুৎসাহ লক্ষ্য করলুম, তাতে শোভনাদের সঙ্গে দেখা করতে যাবার রুচি চলে যায়। কলকাতায় এসে তারা যদি শহরতলীর আনাচে কানাচে কোথাও ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতো তাহ'লে একটা কথা ছিল। কিন্তু বৌবাজার অঞ্চলের বাসাভাড়াও ত' কম নয়। একটা কথা আমার প্রথমেই মনে হলো, নুটু হয়তো ভালো চাকরি পেয়েছে। আজকাল অন্ন দুর্লভ, চাকরি দুর্লভ নয়। যারা চিরনির্বোধ ছিল, তারা হঠাৎ চতুর হয়ে উঠলো এই সম্প্রতি। একশো টাকার বেশী মাসিক মাইনে পাবার কল্পনা যাদের চিরজীবনেও ছিল না, তারা যুদ্ধ সরবরাহের কন্‌ট্রাক্টে সহসা হয়ে উঠলো লক্ষপতি এবং দুর্ভিক্ষকালে চাউলের জুয়াখেলায় কেউ কেউ হোলো সহস্রপতি। হয়ত নুটুর মতো বালকও এই যুদ্ধকালীন জুয়ায় ভাগ্য ফিরিয়ে ফেলেছে। এ যুদ্ধে না সম্ভব?

ওদের খবব নেবো কি নেবো না এই তোলাপাড়ায় আর কাজের চাপে কয়েকটা দিন আরো কেটে গেল। হঠাৎ আফিসের সাহেব জানালেন, আগামীকাল আমাদের দিল্লী রওনা হতে হবে। এখানকার কাজ ফুরিয়েছে।

আমারও এখানে থাকতে আর মন টিঁকছিল না। আমার হোটেলের নীচে সমস্ত রাত ধরে শত শত কাঙ্গালীর কান্না শুনে বিনিদ্র দুঃস্বপ্নে এই ক'টা দিন কোনমতে কাটিয়েছি — আর পারিনে। দুর্গন্ধে কলকাতা ভরা। তবু এখান থেকে যাবার আগে একবারটি পিসিমাদের খবর না নিয়ে যাওয়ার ভাবনায় মন খুঁৎ খুঁৎ করছিল। বিশেষ ক'রে যাবার আগের দিনটা ছুটি পেলুম জিনিসপত্র গুছিয়ে নেবার জন্য। একটা সুযোগও পাওয়া গেল।

বৌবাজারের ঠিকানা খুঁজে বা'র করতে আমার বিলম্ব হলো না। মনে করেছিলুম তারা যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, হঠাৎ গিয়ে দাঁড়িয়ে একটা চমক দেবো। কিন্তু বাড়ীটা দেখেই আমি দিশেহারা হয়ে গেলুম। সামনে একটা গেঞ্জি বোনার ঘর, তার পাশে লোহার কারখানা, এদিকে মনিহারী দোকান, ভিতরে ভূষিমালের আড়ৎ। নীচেকার উঠোনে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখি, নীচের তলাটায় কতকগুলি লোক শোণ দড়ির জাল বুনছে ক্ষিপ্রহস্তে। উপর তলাটায় লক্ষ্য ক'রে দেখি, বহু লোকজন। ওটা যে মেসবাসা, তা বুঝতে বিলম্ব হলো না। একবার সন্দেহক্রমে বাড়ীর নম্বরটা মিলিয়ে দেখলুম। না, ভুল আমার হয়নি — নুটুর দেওয়া এই নম্বরটা ঠিক।

এদিক ওদিকে দুচারজনকে ধরে জিজ্ঞেস-পড়া করতে গিয়ে যখন একটা গণ্ডগোল পাকিয়ে তুলেছি, দেখি সেই সময়ে বছর বাবো তেরো বয়সের একটি মেয়ে সকৌতুকে উপর তলাকার সিঁড়ি বেয়ে মেসের দিকে যাচ্ছে এবং তাকে দেখে চার পাঁচটি লোক উপর থেকে নানারঙ্গে হাতছানি দিচ্ছে। আমি তাকে দেখেই চিনলুম, সে পিসিমার মেয়ে। তৎক্ষণাৎ ডাকলুম, মিনু?

মিনু ফিরে তাকালো। বললুম, চিনতে পারিস্ আমাকে?

না।

তোর মা কোথায়?

ভেতরে।

বললুম, আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল্ দেখি? এ যে একেবারে গোলকধাঁধা! আয় নেমে আয়।

মিনু নেমে এলো। বললে, কে আপনি?

পোড়ারমুখি! ব'লে তার হাত ধরলুম, — চল্ ভেতরে, তোর মা'র কাছে গিয়ে বল্‌ব, আমি কে? মুখপুড়ি, আমাকে একেবারে ভুলেছিস্?

আমাকে দেখে উপর তলাকার লোকগুলি একটু স'রে দাঁড়ালো। বেশ বুঝতে পাচ্ছিলুম, আমার হাতের মধ্যে মিনুর ছোট্ট হাতখানা অস্বস্তিতে অধীর হয়ে উঠেছে। উপরে উঠতে গিয়ে সে বাধা পেয়েছে, এটা তার ভালো লাগেনি। তা'র দিকে একবার চেয়ে আমি নিজেই তার হাতখানা ছেড়ে দিলুম। মিনু তখন বললে, ওই যে, চৌবাচ্চার পাশে গলির ভেতর দিয়ে সোজা চ'লে যান, ওদিকে সবাই আছে।

এই বলে সে উপরে উঠে গেল। চোখে মুখে তার কেমন যেন বন্যা উদ্‌ভ্রান্ত ভাব। এই সেদিনকার মিনু — পরণে একখানা পাৎলা সস্তা ডুরে; চেহারায় দারিদ্র্যের রুক্ষ শীর্ণতা — কিন্তু এরই মধ্যে তারুণ্যের চিহ্ন এসেছে তার সর্বাঙ্গে। তার অজ্ঞান চপলতার প্রতি ভীত চক্ষে তাকিয়ে আমি একটা বিষণ্ণ নিঃশ্বাস ফেলে ভিতর দিকে পা বাড়ালুম।

বিস্ময় চমক দেবার উৎসাহ আমার আর ছিল না। সরু একটা আনাগোনার পথ পেরিয়ে আমি ভিতরে এসে দাঁড়িয়ে ডাকলুম, পিসিমা?

কে? — ভিতর থেকে নারীকণ্ঠে সাড়া এলো এবং তখনই একটি স্ত্রীলোক এসে দাঁড়ালো। বললে, কা'কে চান্?

অপরিচিত স্ত্রীলোক। রং কালো, নাকে নাকছাবি, মুখে পানের দাগ, পরণে নীল শাড়ি, আর হাতে কাঁচের চুড়ি। এই প্রকার স্ত্রীলোকের সংখ্যা বৌবাজারেই বেশী। বললুম, তুমি কে? — এই ব'লে অগ্রসর হলুম।

স্ত্রীলোকটি বললে, আমি এখানকার ভাড়াটে।

এমন সময় একটি ছেলে বেরিয়ে এলো। দেখেই চিনলুম, সে হারু। হাসিমুখে বললুম, কি হারু, চিনতে পারিস্? তোর মা কোথায়?

সে আমাকে চিনলো কিনা জানিনে, কিন্তু সহাস্যে বললে, ভেতরে আসুন। মা রাঁধছে।

অগ্রসর হয়ে বললুম, তোর দিদি কোথায়?

দিদি এখুনি আসবে, বাইবে গেছে। আসুন না আপনি?

বেলা বারোটা বেজে গেছে, কিন্তু এ বাড়ীব বাসিপাট এখনো শেষ হয়নি। দারিদ্র্যের সঙ্গে অসভ্যতা আর অশিক্ষা মিলে ঘর-দুয়ারের কেমন ইতর চেহারা দাঁড়ায়, এব আগে এমন ক'রে আর আমার চোখে পড়েনি। ছায়ামলিন দরিদ্র ঘর-দুখানার ভিজা দুর্গন্ধ নাকে এলো, — এ-পাশে নর্দমা ও-পাশে কুৎসিত কলতলা। একধারে ঝাঁটা, ভাঙা হাঁড়ি, কয়লা আর পোড়া কাঠকুটোব ভিড়! ছেঁড়া চটের থলে টাঙিয়ে পায়খানা ও কলতলার মাঝখানে একটা আবরু রক্ষার চেষ্টা হয়েছে। পিসিমাদের মতো শুদ্ধাচারিণী মহিলারা কেমন ক'রে এই নরককুণ্ডে এসে আশ্রয় নিলেন, এ আমার কাছে একেবারে অবিশ্বাস্য। একটা বিশ্রী অস্বস্তি যেন আমার ভিতর থেকে ঠেলে উপরে উঠে এলো।

রান্নার জায়গায় এসে পিসিমাকে পেলাম। সহসা সবিস্ময়ে দেখলাম, তিনি চটাওঠা একটা কলাইয়ের বাটি মুখের কাছে নিয়ে চা পান করছেন। আমাকে দেখে বললেন, একি, নলিনাক্ষ যে? কবে এলে?

কিন্তু আমি নিমেষের জন্য স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলুম, তাঁর চা খাওয়া দেখে। পিসিমা হিন্দুঘরের নিষ্ঠাবতী বিধবা, স্নান আহ্নিক পূজা গঙ্গাস্নান, দান-ধ্যান — এইসব নিয়ে চিরদিন তাঁকে একটা বড় সংসারের প্রতিপালিকার আসনে দেখে এসেছি। সদ্যস্নাতা গরদের থান পরা পিসিমাকে পূজা-অর্চনার পরিবেশের মধ্যে দেখে কতদিন মনে মনে প্রণাম ক'রে এসেছি।

কিন্তু তিন বছরে তাঁর একি পরিবর্তন! আমিষ রান্নাঘরে ব'সে ভাঙা কলাইয়ের বাটিতে চা খাচ্ছেন তিনি!

বললুম, পিসিমা প্রণাম করবো। পা ছুঁতে দেবেন?

পা বাড়িয়ে দিয়ে পিসিমা বললেন, কলকাতায় আমরা ক'মাস হোলো এসেছি, তোমাকে খবর দেওয়া হয়নি বটে। আর বাবা, আজকাল কে কা'র খবর রাখো বলো। চারিদিকে হাহাকার উঠেছে!

আমি একটু থতিয়ে বললুম, পিসিমা — আপনাদের মাসোহারার টাকা আমি নিয়মিতই পাঠাচ্ছিলুম ... কিন্তু আজ ছ'মাস হ'তে চললো আপনাদের কোনো খোঁজখবর নেই।

খবর আর আমরা কাউকে দিইনি, নলিনাক্ষ!

পিসিমার কণ্ঠস্বর কেমন যেন উদাসীন আর অবহেলায় ভরা। একদিন আমি তাঁর অতি স্নেহের পাত্র ছিলুম, কিন্তু আজ তিনি যে আমার এখানে অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে খুশী হননি, এ তাঁর মুখ চোখ দেখেই বুঝতে পারি।

হ্যাঁগা, দিদি —? বলতে বলতে সেই আগেকার স্ত্রীলোকটি হাসিমুখে চাতালের ধারে এসে দাঁড়ালো। পিসিমা মুখ তুললেন। সে পুনরায় বললে, তুমি বাজারে যাবে গা? বাজারে আজ এই এত বড় বড় টাট্‌কা তপ্‌সে মাছ এসেছে — একেবারে ধড়ফড় করছে!

তার লালাসিক্ত রসনার দিকে তাকিয়ে পিসিমার মুখখানা কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে এলো। তিনি বললেন, তুমি এখন যাও, বিনোদবালা।

এমন উৎসাহজনক সংবাদে ঔৎসুক্য না দেখে ম্লানমুখে বিনোদবালা সেখান থেকে স'রে গেল। পিসিমা বললেন, তোমার কি খুব তাড়াতাড়ি আছে, নলিনাক্ষ?

বিশেষ কিছু না! — ব'লে আমি হাসলুম — আজকের দিনটা আপনাদের এখানে থাকবো ব'লেই আমি এসেছিলম, পিসিমা।

তা বেশ ত', বেশ ত' — তবে কি জানো বাবা, খাওয়া দাওয়ার কষ্ট কিনা— বলতে বলতে পিসিমা চা খেয়ে বাটি সরিয়ে দিলেন। আমার থাকার কথায় তাঁব দিক থেকে কিছুমাত্র আনন্দ অথবা উৎসাহ দেখা গেল না।

বললুম, শোভনা কোথায়, পিসিমা?

সে আসছে এখুনি, বোধ হয ও-বাড়ি গেছে।

ঈষৎ অসন্তোষ প্রকাশ ক'রে আমি বললুম, সে কি আজকাল একলা বাসা থেকে বেরোয়?

পিসিমা বললেন, না, তেমন কই? তবে তেলটা, নুনটা, মধ্যে-মাঝে দোকান থেকে আনে বৈকি। বিনোদবালা যায় সঙ্গে।

পিসিমা তাঁর কথার দায়িত্ব কিছু নিলেন না, কিন্তু কেমন একটা মনোবিকারে আমার মাথা হেঁট হয়ে এলো। বললুম, শোভনার ছেলেটি কোথায়? কত বড়টি হয়েছে?

পিসিমা বললেন, তা'র খুড়ো-জ্যাঠা আমাদের কাছে ছেলেটাকে রাখলো না, নলিনাক্ষ। তাদের ছেলে তারা নিয়ে গেছে।

সে কি পিসিমা, অতটুকু ছেলে মা ছেড়ে থাকতে পারবে? শোভনা পারবে থাকতে?

তা পারবে না কেন বলো? এক টাকায় দুসের দুধও পাওয়া যায় না, ছেলেকে খাওয়াবে কি? নিজেদেরই হাঁড়ি চড়ে না কতদিন! অসুখ হ'লে ওষুধ নেই। শাড়ীর জোড়া বার-চোদ্দ টাকা। চা'ল পাওয়া যায় না বাজারে। আর কতদিন চোখ বুজে সহ্য করবো, নলিনাক্ষ? ভিক্ষে কি করিনি? করেছি। রাত্তিরে বেরিয়ে মান খুইয়ে হাত পেতেছি! — বলতে বলতে পিসিমা নিঃশ্বাস ফেললেন। পুনরায় বললেন, কই কেউ আমাদের চা'ল ডালের খবর নেয়নি, নলিনাক্ষ!

অনেকটা যেন আর্তকণ্ঠে বললুম, পিসিমা, নুটুদেরও এই অবস্থা। সবাই মরতে বসেছে আজ, তাই কেউ কা'রো খবর নিতে পারে না। নুটুর কাছেই আপনাদের ঠিকানা পেলুম।

পিসিমা এতক্ষণ বসেছিলেন, অতটা লক্ষ্য করিনি। তিনি এবার উঠে দাঁড়াতেই তাঁর ছিন্নভিন্ন কাপড়খানার দিকে চেয়ে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালুম। তিনি বললেন, এ বাড়ির ঠিকানা তুমি আর কাউকে দিয়ো না, বাবা।

এমন সময় মিনু এসে দরজার কাছে চঞ্চল হাসিমুখে দাঁড়ালো। বললে, মা, মা শুনছ? এই নাও একটা আধুলি ... হরিশবাবু দিল —

মিনুর মাথার চুল এলোমেলো, পরণের কাপড়খানা আলুথালু। মুখখানা রাঙা, গলার আওয়াজটা উত্তেজনায় কাঁপছে। অত্যন্ত অধীরভাবে পুনরায় সে বললে, যোগীন মাস্টার বললে কি জানো মা, আজ রাত্তিরে গেলে সেও আট আনা দিতে পারে।

পিসিমা অলক্ষ্যে আমার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে ঝঙ্কার দিয়ে বললেন, বেরো — বেরো হারামজাদি এখান থেকে। ঝেঁটিয়ে মুখ ভেঙে দেবো তোর।

মিনু যেন এক ফুৎকারে নিবে গেল। মায়ের মেজাজ দেখে মুখের কাছ থেকে স'রে গিয়ে সে অনুযোগ ক'রে কেবল বললে, তুমিই ত' বলেছিলে!

হারু ওপাশ থেকে চেঁচিয়ে উঠলো, ফের মিছে কথা বলছিস্, মিনু? এখন তোকে কে যেতে বলেছিল? মা তোকে রাত্তিরে যেতে বলেছিল না?

পিসিমা ব্যস্তভাবে বললেন, নলিনাক্ষ, তুমি বড্ড হঠাৎ এসে পড়েছ, বাবা। এখন ভারি আতান্তর, তুমি ঘরে গিয়ে বসো গে।

ধীরে ধীরে ঘরের ভিতরে এসে তক্তার মলিন বিছানাটার ওপর বসলুম। গলার ভিতর থেকে কি যেন একটা বারংবার ঠেলে উঠছিল, সেটার প্রকৃত স্বরূপটা আমি কিছুতেই বোঝাতে পারবো না। আমি এই পরিবারে মানুষ আমি এদেরই একজন, এই আত্মীয় পরিবারেই আমার জন্ম। অথচ আজ মনে হচ্ছে এখানে আমি নবাগত, অপরিচিত ও অনাহূত একটা লোক। যারা আমার পিসিমা ছিল, ভগ্নী ছিল, যাদের চিরদিন আপনার জন ব'লে জেনে এসেছি — এরা তা'রা নয়, এরা বৌবাজারের বিনোদবালাদের সহবাসী, এরা সেই আগেকার সম্ভ্রান্ত পরিজনদের প্রেতমূর্তি!

মনে ছিল না জানালাটা খোলা। বৌবাজারে পথের একটা অংশ এখান থেকে চোখে পড়ে। সেখানে অসংখ্য যানবাহনের জটলা — ট্রাম, বাস, মোটর, গরুর গাড়ি আর মিলিটারী লরির চাকার আঁচড়ানির মধ্যে শোনা যাচ্ছে অগণ্য মৃত্যুপথযাত্রী দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের আর্তরব। জঞ্জালের বাল্‌তি ঘিরে ব'সে গেছে কাঙালীরা, পরিত্যক্ত শিশুর কঙ্কাল গোঙাচ্ছে মৃত্যুর আশায়, স্ত্রীলোকদের অনাবৃত মাতৃবক্ষ অন্তিম ক্ষুধার শেষ আবেদনের মতো পথের নালার ধারে প'ড়ে রয়েছে।

জানালাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে এদিকে মুখ ফিরাবো, এমন সময় শুনি হারু আর মীনুর কান্না — পিসিমা একখানা কাঠের চেলা নিয়ে তাদের হঠাৎ প্রহার করতে আরম্ভ করেছেন। উঠে গিয়ে বলবার ইচ্ছা হলো, তাদের কোনো অপরাধ নেই — নিরপরাধকে অপরাধী করে তোলার জন্য দিকে দিকে যেসব ষড়যন্ত্রের কারখানা তৈরী করা হয়েছে, 'এরা সেই ফাঁদে পা দিয়েছে, এইমাত্র'। কিন্তু উঠে বাইরে যাবার আগেই, বাইরে শোনা গেল কলকণ্ঠের সম্মিলিত খলখলে হাসি। সেই হাসি নিকটতর হয়ে এলো।

ঘরের কাছাকাছি আসতেই দেখি, বিনোদবালার সঙ্গে শোভনা। আমি তা'কে ডাকতেই সে যেন সহসা আঁৎকে উঠলো। দরজার কাছে এসে শোভনা শিউরে উঠে বললে, একি, ছোড়দাদা? তুমি ঠিকানা পেলে কেমন ক'রে?

বললুম, এমনি এলুম সন্ধান ক'রে। কেমন আছিস্ তোরা শুনি?

নিজের চেহারা এতক্ষণে শোভনার নিজেরই চোখে পড়লো। জড়সড় হয়ে বললে, আমি আশা করিনি তুমি আমাদের ঠিকানা খুঁজে পাবে।

বললুম, কিন্তু আমাকে দেখে কই একটুও খুশী হলিনে ত?

শোভনা চুপ ক'রে রইলো। পুনরায় বললুম, এতদিন বাদে তোদের সঙ্গে দেখা। কত দেশ বেড়ালুম, দিল্লীতে কেমন ছিলুম — এইসব গল্প করার জন্যেই এলুম রে। তোর ছেলেকে পাঠিয়ে দিলি থাকতে পারবি?

না পারলে চলবে কেন ছোড়দা?

এদিক ওদিক চেয়ে আমি বললুম, কিন্তু এ-বাড়িটা তেমন ভালো নয়, তোরা এখানে আছিস্ কেন শোভা?

এখানে আমাদের ভাড়া লাগে না।

সবিস্ময়ে বললুম, ভাড়া লাগে না? এমন দয়ালু কে রে?

শোভনা বললে, যাঁর বাড়ি সে ভদ্রলোক আমাদের অবস্থা দেখে দয়া ক'রে থাকতে দিয়েছেন।

আজকালকার বাজারে এমন দয়া দুর্লভ!

শোভনা বললে, তার কেউ নেই, একলা থাকেন কিনা তাই —

বোধহয় বিনোদবালা আড়াল থেকে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল, সেই দিকে মুখ তুলে চেয়ে শোভনা সবে গেল। মিনিট পাঁচেক পরে আবার সে যখন এসে দাঁড়ালো, দেখি পাতলা জালের মতন শাড়ীখানা ছেড়ে শোভনা একখানা সরু পাড় ধুতি প'রে এসেছে।

বললুম, শোভনা, তোরা ঠিকানা বদলালি, আমাকে চিঠি দিতে পারতিস!

ঠিকানা ইচ্ছে ক'রে দিইনি ছোড়দা!

কিন্তু মাসোহারার টাকা নেওয়া বন্ধ করলি কেন বে?

একটু থতিয়ে শোভনা বললে, ছেলের জন্যেই নিতুম তোমার কাছে হাত পেতে। কিন্তু ছেলে ত' নেই, ছেলে আমার নয়, তা নেওয়া বন্ধ করেছি!

প্রশ্ন করলুম, তোদের চলছে কেমন ক'রে?

শোভনা বললে, তুমি আজ এসেছ, আজই চ'লে যাবে — তুমি সে কথা শুনতে চাও কেন ছোড়দা?

চুপ করে গেলুম। একথা শোনবার অধিকার আমার নেই, খুঁচিয়ে জানবারও দরকার নেই। বলুলম, নুটু কোথায়?

সে লোহার কারখানায় চাকরি করে, টাকা পঁচিশেক পায়। সপ্তাহে সপ্তাহে কিছু চাল-ডাল আনে। আজকাল আবাব নেশা করতে শিখেছে, সবদিন বাড়িও আসে না।

বললুম, সে কি, নুটু অমন চমৎকার ছেলে, সে এমন হয়েছে? হারুর পড়াশুনোও ত' বন্ধ। ও কি করে এখন?

শোভনা নত মুখে বললে, এই রাস্তার মোড়ে চায়ের দোকানে হারুর কাজ জুটেছিল, কিন্তু সেদিন কতকগুলো খাবার চুরি যাওয়ায় ওর কাজ গেছে। এখন ব'সেই থাকে।

স্বভাবতই এবার প্রশ্নটা এসে দাঁড়ালো শোভনার ওপর। কিন্তু আমি আড়ষ্ট হয়ে উঠলুম। কথা ঘুরিয়ে বললুম, কিন্তু একটা ব্যাপার আমার ভালো লাগেনি, শোভা। মিনুটা এখন যাই হোক একটু বড় হয়েছে, ওকে যখন তখন বাইরে যেতে দেওয়া ভালো নয়। বাড়ীটায় নানা রকম লোক থাকে, বুঝিস্ ত।

বাইরে জুতোর মস্‌মস্‌ শব্দ পাওয়া গেল। চেয়ে দেখলুম, আধ ময়লা জামাকাপড় পরা একটি লোক এক ঠোঙা খাবার হাতে নিয়ে ভিতরে এল। মাথায় অল্প টাক, খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফ — লোকটির বয়স বেশী নয়। চাতালের ওপর এসে দাঁড়িয়ে বললে, কই, বিনোদ কোথা গেলে? এক ঘটি জল দাও আমার ঘরে। আরে কপাল, খাবারের ঠোঙা হাতে দেখলে আর রক্ষে নেই। নেড়ি কুকুরের মতন পেছনে পেছনে আসে মেয়ে-পুরুষগুলো কেঁদে কেঁদে। ছোঁ মেরেই নেয় বুঝি হাত থেকে। পচা আমের খোসা নর্দমা থেকে তুলে চুষছে, দেখে এলুম গো। এই যে, এনেছ জলের ঘটি, দাও। এ-দুর্ভিক্ষে চারটি অবস্থা দেখলুম, বুঝলে বিনোদ? আগে ঝুলি নিয়ে ভিক্ষে, যদি দুটি চাল পাওয়া যায়। তারপর হোলো ভাঙা কলাইয়ের থাল, যদি চারটি ভাত কোথাও মেলে। তারপর হাতে নিল হাঁড়ি, যদি একটু ফ্যান কেউ দেয়। আর এখন, কেবল কান্না, — কোথাও কিছু পায় না! আরে পাবে কোত্থেকে — গেরস্থরা যে ভাত গুলে ফ্যান খাচ্ছে গো। যাই, দু'খানা কচুরি চিবিয়ে প'ড়ে থাকি। — বলতে বলতে লোকটি ভিতর দিকে চ'লে গেল।

আমার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি লক্ষ্য ক'রে শোভনা বললে, উনি ছিলেন এখানকার কোন ইস্কুলের মাস্টার। এখন চাকরি নেই। রান্নাঘরের পাশে ওই চালাটায় থাকেন।

একলা থাকেন, না সপরিবারে?

না। ওঁর সবাই ছিল, যখন উপার্জ্জন ছিল। তারপর বড় মেয়েটি কোথায় চলে যায়, স্ত্রী তার জন্যে আত্মহত্যা করেন। ছেলে দুটি আছে মামার বাড়ী। ছোড়দা, বলতে পারো আর কত দিন এমনি ক'রে বাঁচতে হবে? এ যুদ্ধ কি কোন দিন থামবে না?

উত্তর দেওয়া আমার সাধ্যের অতীত, সান্ত্বনা দেবারও কিছু ছিল না। চেয়ে দেখলুম শোভনাব দিকে। চোখের নীচে তার কালো কালো দাগ, মাথার চুলগুলো রুক্ষ ও বিবর্ণ, সরু সরু হাত দুখানা শির ওঠা, রক্তহীন ও স্বাস্থ্যহীন মুখখানা। যেন যুদ্ধের দাগ তার সর্ব্বাঙ্গে, যেন দেশজোড়া এই দুর্ভিক্ষের অপমানজনক চিহ্ন মুখেচোখে সে মেখে রয়েছে। তাব কথায় ও কণ্ঠস্বরে কেমন যেন আত্মদ্রোহিতার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখতে পাচ্ছিলুম। সেদিনকার শান্ত ও চরিত্রবতী শোভনা — আমাব ছোট বোন — আজ যেন অসন্তুষ্ট অগ্নিশিখার মতো লক্‌লকে হয়ে উঠেছে। আমার কোনো সান্ত্বনা, কোনো উপদেশ শোনবার জন্য সে আর প্রস্তুত নয়। কিন্তু আমার অপরিতৃপ্ত কৌতূহল আমাকে কিছুতেই চুপ ক'রে থাকতে দিল না। এক সময়ে বললুম, শোভা, এটা ত' মানিস্‌, সামনে আমাদের চবম পরীক্ষার দিন। চারিদিকে এই ধ্বংসের চক্রান্তের মধ্যে আমাদের টিঁকে থাকতেই হবে। যেমন ক'রেই হোক নিজেদের মান-সম্ভ্রম বাঁচিয়ে —

মান-সম্ভ্রম? — শোভনা যেন আর্তনাদ ক'রে উঠলো — কোথায় মান-সম্ভ্রম, ছোড়দা? আগে বুকের আগুন নিয়ে ছিলুন সবাই, এবার পেটের আগুনে সবাই খাক্‌ হয়ে গেলুম। কে বলেছে প্রাণের চেয়ে মান বড়? কোন্‌ মিথেবাদী রটিয়েছে, আমাদের বুক ফাটে ত' মুখ ফোটে না? ছোড়দা, তুমি কি বলতে চাও, যদি তিল-তিল ক'রে না খেয়ে মরি, যদি পোড়া পেটের জ্বালায় ভগবানের দিকে মুখ খিঁচিয়ে আত্মহত্যা করি, যদি তোমার মা-বোনের উপবাসী বাসি মড়া ঘর থেকে মুদ্দোফরাসে টেনে বা'র করে, সেদিন কি তোমাদেরই মান-সম্ভ্রম বাঁচবে? যারা আমাদের বাঁচতে দিলে না, যারা মুখের ভাত কেড়ে নিয়ে আমাদের মারলে, যারা আমাদের বুকের রক্ত চুষে-চুষে খেলে, তাদেরই কি মান-সম্ভ্রম পৃথিবীর ভদ্রসমাজে কোথাও বাড়লো? যাও, খোঁজ নাও, ছোড়দা, ঘরে-ঘরে গিয়ে। কাঙ্গালীদের কথা ছাড়ো, গেরস্থ বাড়ীতে ঢুকে দেখে এসো। কত মায়ের বত্রিশ নাড়ী জ্বলে-পুড়ে গেল

দুটি ভাতের জন্যে, কত দিদিমা-পিসিমা-খুড়িমা-বোন-বৌদিদিরা আড়ালে বসে চোখের জল ফেলছে একখানি কাপড়ের জন্যে। অন্ধকারে গামছা আর ছেঁড়া বিছানার চাদর জড়িয়ে কত মেয়ে-পুরুষের দিন কাটছে, জানো? বাসি আমানি নুন গুলে খেয়ে কত লাজুক মেয়ে প্রাণধারণ করছে, শুনেছ? মান-সম্ভ্রম! মান-সম্ভ্রম নিজের কাছেই কি রইলো কিছু, ছোড়দা?

সপ্রতিভ লজ্জাবতী নিরীহ শোভনাকে এতকাল দেখে এসেছি। তার এই মুখর উত্তেজনায় আমার যেন মাথা হেঁট হয়ে এলো। আমি বললুম, কিন্তু কনট্রোলের দোকানে অল্প দামে চাল-কাপড় এসব পাওয়া যাচ্ছে — তোমবা তার কোনো সুবিধে পাও না?

শোভনা আমার মুখের দিকে একবার তাকালো। দেখতে দেখতে তার গলার ভিতর থেকে পচা ভাতের ফেনার মতো একপ্রকার রুগ্ন হাসি বমির বেগে উঠে এলো। শীর্ণ মুখখানা যেন প্রবল হাসির যন্ত্রণায় সহসা ফেটে উঠলো। শোভনা হা হা হা ক'রে হাসতে লাগলো। সে-হাসি বীভৎস, উন্মত্ত, নির্লজ্জ এবং অপমানজনকও বটে। আমার নির্ব্বোধ কৌতূহল স্তব্ধ হয়ে গেল।

পিসিমার কাছে মার খেয়ে মিনু ও হারু এসে জানালাব ধারে দাঁড়িযে ডুকরে ডুকরে কাঁদছিল। হঠাৎ তাদের দিকে চেয়ে শোভনা চেঁচিযে বললে, কেন, কাঁদছিস্ কেন, শুনি? দূর হয়ে যা সামনে থেকে —

বিনোদবালা যেন কোথায় দাঁড়িয়েছিল, সেখান থেকে গলা বাড়িয়ে বললে, দিদি, মাসি মেরেছে ওদের। ও বাড়ীর হরিশবাবুর কাছ থেকে মিনু পয়সা এনেছিল কিনা — হারু কি যেন ব'লে ফেলেছিল তাই —

শোভনার মাথায় বোধ হয় আগুন ধ'রে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে ঝঙ্কার দিয়ে বললে, মা? কেন তুমি ওদেব মারলে শুনি?

পিসিমা কলতলার পাশ থেকে বললেন, মারবো না? কলঙ্কের কথা নিয়ে দুজনে বলাবলি করছিল, তাই বেদম মেরেছি। বেশ করেছি।

কিন্তু ওদের মেবে কলঙ্ক ঘোচাতে তুমি পারবে?

পিসিমা চীৎকার ক'রে উঠলেন, ভারি লম্বা লম্বা কথা হয়েছে তোর, শোভা। এত গায়ের জ্বালা তোর কিসের লা? দিনরাত কেন তোর এত ফোঁসফোঁসানি? কপাল পোড়ালি তুই, মান খোযালি, সে কি আমার দোষ? পেটের ছেলেমেয়েকে আমি মারবো, খুন করবো, যা খুশি তাই কববো — তুই বলবার কে?

শোভনা গর্জ্জন ক'রে বললে, পেটের মেয়েরা যে তোমার পেটে অন্ন জোগাচ্ছে, তাব জন্যে লজ্জা নেই তোমার? মেবে মেরে মিনুটার গাযে দাগ করলে — তোমার কী আক্কেল? একেই ত' ওর ওই চেহারা, এর পর ঘর খরচ চলবে কোত্থেকে? লজ্জা নেই তোমার?

তবে আমি হাটে হাঁড়ি ভাঙবো, শোভা — এই ব'লে পিসিমা এগিয়ে এলেন। উচ্চকণ্ঠে বললেন, নলিনাক্ষ আছে তাই চুপ করে ছিলুম। বলি, ফরিদপুরের বাড়িতে ব'সে বিনোদবালার ঠিকানা কে জোগাড় ক'রেছিল? গাড়িভাড়া কা'র কাছে নিয়েছিলি তুই?

অধিকতর উচ্চকণ্ঠে শোভনা বললে, তাহলে আমিও বলি? মাস্টারকে কে এনে ঢুকিয়েছিল এই বাসায়? হরিশ-যোগেনদের কাছে কে পাঠিয়েছিল মিনুকে? আমাকে কেবাণীবাগানের বাসায় কে পৌঁছে দিয়ে এসেছিল? উত্তর দাও? জবাব দাও? হোটেলের পাউরুটি আর হাড়ের টুকরো তুমি কুড়িয়ে আনতে বলোনি হারুকে? নুটু বাড়ি আসা ছাড়লো কার জন্যে?

মুখ সামলে কথা বলিস্, শোভা?

এমন সময়ে বিনোদবালা মাঝখানে এসে দাঁড়ালো ঝগড়া মিটাবার জন্য। মারমুখী মা ও মেয়ের এই অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য অধঃপতন দেখে আমি আর স্থির থাকতে পারলুম না। উঠে

বাইরে এসে দাঁড়ালুম। বললুম, পিসিমা, আপনি স্নান করতে যান। শোভা, তুই চুপ কর, ভাই। এরকম অবস্থার জন্যে কা'র দোষ দিবি বল্‌? তোর, আমার, পিসিমার, হারু-মিনুর, — এমন কি ওই বিনোদবালা, মাষ্টারমশাই, হরিশের দলেরও কোন দোষ নেই। কিন্তু অপরাধ যাদের তাঁরা আমাদের নাগালের বাইরে, শোভা। যাকগে আমি এখন যাই, আবার এক সময়ে আসবো।

শোভনা কেঁদে বললে, আর তুমি এসো না ছোড়দা।

আমি একবার হাসবার চেষ্টা করলুম। বলুলম, পাগল কোথাকার।

পিসিমা বললেন, এত গোলমালে তোমার কিছু খাওয়া হোল না বাবা, নলিনাক্ষ। কিছু মনে ক'রো না।

বিনোদবালা বললে, চলো, ঢের হয়েছে! এবার নেয়ে-খেয়ে তৈরি হও দিকি? গলাবাজী করলে ত' আর পেট ভরবে না। পেটটা যাতে ভরে তার চেষ্টা করো। আমি কি আগে জানতুম তোমরা ভদ্দরলোকের ঘর, তাহলে এমন ঝক্‌মারি কাজে হাত দিতুম না।

অপমানিত মুখে পলকের জন্য বিনোদবালার দিকে চোখ তুলে অগ্নিবৃষ্টি ক'রে আমি নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলুম। পাতালপুরীর সুড়ঙ্গলোকের কদর্যকলুষ রূদ্ধশ্বাস থেকে মুক্তি নিয়ে এসে দাঁড়ালুম রাজপথের ওপর দিগন্তজোড়া মুমূর্ষুর আর্তনাদের মধ্যে। এ বরং ভালো, এই অগণ্য ক্ষুধাতুরের কান্না চারিদিকে পরিব্যাপ্ত থাকলেও কেমন একটা দয়াহীন সকরুণ ঔদাসিন্যে এদের এড়ানো চলে। কিন্তু যেখানে চিত্ত-দারিদ্র্যের অশুচিতা, যেখানে দুর্ভিক্ষপীড়িত উপবাসীর মর্ম্মান্তিক অন্তর্দাহ, যেখানে কেবল নিরুপায় দুর্নীতির গুহার মধ্যে ব'সে উৎপীড়িত মানবাত্মা অবমাননার অন্ন লেহন কবছে, সেই সংহত বীভৎসতার চেহারা দেখলে আতঙ্কে গলা বুজে আসে।

কিন্তু এরা কে? সেই ফরিদপুরের ছোট্ট বাড়িটিতে ফুলের চারা আর শাকসব্জী দিয়ে ঘেরা ঘরকন্নার মধ্যে আচারশীলা·মাতৃরূপিনী পিসিমা, লাজুক একটি সদ্য-ফোটা ফুলের মতন কুমারী ভগ্নী শোভনা, চাঁপার কলির মতন নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক হারু, নুটু, মীনু, — এরা কি সেই তা'রা? কেন একটি সুখী পরিবার ধীরে ধীরে এমন সমাজ-নীতিভ্রষ্ট হোলো? কেন তাদের মৃত্যুর আগে তাদের মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু ঘটলো এমন ক'রে? কোন দয়াহীন দস্যুতা এর জন্যে দায়ী?

এই কয়মাসের মাসোহারার টাকাটা আমি অনায়াসে খরচ করতে পারি বৈকি। অন্তত দিল্লী যাবার আগে ওদের এই অবস্থায় রেখে চুপ ক'রে চলে যেতে পারিনে। সুতরাং অপরাহ্নকালটা নানা দোকানে ঘুরে-ঘুরে কিছু কিছু খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করা গেল। শতকবা দশগুণ বেশী দামে চাল এবং পাঁচগুণ বেশী দামে আর সব খাবার জিনিসপত্র এখান ওখান থেকে কিনতে লাগলুম। কিনতে কিনতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। সেটা মাত্র এই বিগত শ্রাবণের কৃষ্ণপক্ষ, টিপ টিপ ক'রে বৃষ্টি পড়ছে। স্বল্পালোক কলকাতার পথঘাট পেরিয়ে একখানা গাড়িতে জিনিসপত্র তুলে নিয়ে চললুম আবার শোভনাদের ওখানে। নিজের বদান্যতায় কোনো গৌরব বোধ করছিনে, বরং সমস্ত খাদ্যসামগ্রীগুলোকে ঘৃণ্য মনে হচ্ছে। খাদ্য আজ জীবনের সকল প্রশ্নকে ছাপিয়ে উঠেছে ব'লেই হয়ত খাদ্যের প্রতি এত ঘৃণা এসেছে। এসব পদার্থ আগে ছিল ভদ্রজীবনের নীচের তলাকার লুকানো আশ্রয়ে, সেটার কোনো আভিজাত্য ছিল না — আজ সেটা যেন মাথার ওপর চ'ড়ে বসে আপন জাতিচ্যুতির আক্রোশটা সকলের ওপর মিটিয়ে নিচ্ছে।

তবু দুর্গম পথঘাট পেরিয়ে সেগুলো নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হলুম বৌবাজারের বাড়ির দরজায়। বহু পরিশ্রম আর অধ্যবসায় ব্যয় ক'রে দু-তিনজন লোকের সাহায্যে সেগুলো নিয়ে গিয়ে রাখলুম সেই সরু আনাগোনার পথের এক ধারে। মাস তিনেকের মত খাদ্যসম্ভার কিনে এনেছিলুম। জিনিসপত্র বুঝে নিয়ে লোকগুলোকে বিদায় করলুম।

ভিতর দিকে কোথায় যেন একটা কেরোসিনের ল্যাম্প্ জ্বলছিল, তারই একটা আভা এসে পড়েছিল আমার গায়ে। কলতলার ওপাশ থেকে শোনা গেল, নারী কণ্ঠের সঙ্গে ইস্কুল-মাষ্টারের কথালাপের আওয়াজ জড়ানো। তা ছাড়া নীচের তলাটা নিঃসাড় — মৃত্যুপুরীর মতো।

আমি কয়েক পা অগ্রসর হয়ে গেলুম। ডাকলুম, মিনু? হারু?

কোনো সাড়া নেই। যে ঘরখানায় দুপুরবেলায় আমি বসেছিলুম, সে ঘরখানা ভিতর থেকে বন্ধ। বুঝতে পারা গেল, ক্লান্ত হয়ে পিসিমারা সবাই ঘুমিয়েছে। আবার আমি ডাকলুম, মিনু, ও মিনু?

বোধ করি বাইরের থেকে আমার গলার আওয়াজটা ঠিক বোধগম্য হয়নি, ঘরের ভিতর থেকে শোভনা সাড়া দিয়ে বললে, দিনরাত এত আনাগোনা কেন গা তোমার? মিনু ও-বাড়িতে গেছে, আজ তাকে পাবে না, যাও। হতভাগা, চামার!

আমি বললুম শোভা, আমি রে, আর কেউ নয়, আমি — ছোড়দা। দরজাটা খোল দেখি?

ছোড়দা? — শোভনা তৎক্ষণাৎ দরজাটা খুলে দিয়ে আমার পায়ের কাছে এসে ব'সে পড়লো। অশ্রুসজল কণ্ঠে বললে, ছোড়দা, পেটের জ্বালায় আমরা নরককুণ্ডে নেমে এসেছি! তুমি আমাকে মাপ করো, তোমার গলা আমি চিনতে পারিনি।

শোভনার হাত ধ'রে আমি তুললুম। বললুম, কাঁদিসনে, চুপ কর। তোরা ত' একা নয় ভাই, লক্ষ লক্ষ পরিবার এমনি করে মরতে বসেছে। কিন্তু ভেঙে পড়লে চলবে না, এমনি ক'রেই এই অবস্থাকে পেরিয়ে যেতে হবে, শোভা। শোন, কালকেই আমি দিল্লী যাবো, তাই তাড়াতাড়িতে তোদের জন্যে চারটি চাল-ডাল কিনে আনলুম — ওগুলো তুলে রাখ্।

চাল-ডাল এনেছ? দুর্বল শরীরের উত্তেজনায় শোভনা যেন শিউরে উঠলো। যেন ভাবী ক্ষুধাতৃপ্তির কল্পনায় কেমন একটা বিকৃত উগ্র ও অসহ্য উল্লাস তার কণ্ঠস্বরের মধ্যে কাঁপতে লাগলো। রুদ্ধশ্বাসে সে বললে, তুমি বাঁচালে — তুমি বাঁচালে, ছোড়দা! তোমার দেনা আমরা কোনোদিন শোধ করতে পারবো না! —এই ব'লে আমার বুকের মধ্যে মাথা রেখে আমার চিরদিনকার আদরের ভগ্নী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

বললাম, ওর সঙ্গে নতুন জামা-কাপড়ের একটা পুঁটলি রয়েছে, ওটা আগে তুলে রাখ্, শোভা।

শোভনা আমাকে ছেড়ে দিয়ে কেরোসিনের ডিবেটা নিয়ে এসে খাদ্যসামগ্রীর কাছে দাঁড়িয়ে একবার সব দেখলো। তারপর অসীম তৃপ্তির সঙ্গে কাপড়ের বস্তাটা তুলে নিয়ে ঘরের ভিতরে চৌকীর নীচে রেখে এলো। বললে, ছোড়দা, মনে আছে, কোরা জামা-কাপড় পরে লোকের সামনে এসে দাঁড়ানো আমাদের পক্ষে কী লজ্জার কথা ছিল? দোকান থেকে চাল-ডাল এলে লুকিয়ে সেগুলোকে সরিয়ে ফেলতুম — পাছে কেউ ভাবে, চাল কেনার আগে আমাদের বুঝি খাবার কিছু ছিল না। মনে আছে ছোড়দা?

হেসে বললাম, সব মনে আছে রে।

শোভনা করুণকণ্ঠে বললে, তুমি বলতে পারো ছোড়দা, এ দুর্ভিক্ষ কবে শেষ হবে? সবাই যে বলছে, নতুন ধান উঠলে আমাদের আর উপোস করতে হবে না?

তার আর্তকণ্ঠ শুনে আমি চুপ ক'রে রইলুম। কারণ, সরকারী চাকর হলেও ভিতরের খবর আমার কিছুই জানা ছিল না। শোভনা পুনরায় বললে, ফরিদপুরের সেই মস্ত মাঠ তোমার মনে আছে, ছোড়দা? ভাবো ত, সেই মাঠে আমনের সোনার শীষ পেকেছে, হাওয়ায় তারা ঢেউ খেলছে আনন্দে, মাঠে মাঠে চাষার দল গান গেয়ে কাটছে সেই ধান, — সেই লক্ষ্মীকে ভারে ভারে তারা ঘরে তুলে আনছে। মনে পড়ে?

শোভনার স্বপ্নময় দুটি চোখ হয়ত সেই সোনার বাঙলার মাঠে মাঠে একবার ঘুরে এলো, কিন্তু আমি কেরোসিন ডিবের আলোয় এই নরককুণ্ড ছাড়া আর কোথাও কিছু দেখতে পেলুম না। কেবল নিঃশ্বাস ফেলে বললুম, মনে পড়ে বৈকি।

কিন্তু এ কি শুনছি ছোড়দা? শোভনা আমার মুখের দিকে আবার ফিরে তাকালো। সভয় চক্ষু তুলে সে পুনরায় বললে, গোছা গোছা কাগজ বিলিয়ে আবার নাকি ওরা শুষে নিয়ে যাবে সেই আমাদের ভাঙা বুকের রক্ত? নবান্নর পর আবার নাকি ভরে যাবে আমাদের ঘর কাঙালীর কান্নায়? বলতে পারো, তুমি?

কিছু একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলুম, সহসা বাইরে কা'র পায়ের শব্দ পেয়ে শোভনা সচকিত আতঙ্কে অন্ধকারের দিকে ফিরে তাকালো। তারপর কম্পিত অধীরকণ্ঠে সে বললে, ছোড়দা, এবার তুমি যাও, তোমার অনেক রাত হয়ে গেছে। এখন নিশ্চয় ন'টা — আমার মনে ছিল না, নিশ্চয় ন'টা বেজেছে। এবার তুমি যাও ছোড়দা।

এগুলো তুলে রাখ্ আগে সবাই মিলে।

রাখবো ঠিক রাখবো — একটি একটি চাল-ডালের দানা গুনে গুনে রাখবো — কিন্তু এবার তুমি যাও, ছোড়দা। আলো ধরছি ... তুমি যাও, একটুও দেরী ক'রো না .. লক্ষ্মীটি ছোড়দা...

শোভনা চঞ্চল অস্থির উদ্দাম হয়ে এসে আমাকে যখন একপ্রকার টেনে নিয়ে যাবে, সেই সময় একটি লোক চাল-ডালের বস্তার ওপর হোঁচট খেয়ে ভিতরে এসে দাঁড়ালো। একেবারে গায়ের উপর এসে প'ড়ে বললে, ওঃ, নতুন লোক দেখছি। চাল-ডাল এনে একেবারে নগদ কারবার।

লোকটার পরণে একটা খাকি সার্ট, সর্বাঙ্গে কেমন একটা নেশার দুর্গন্ধ। আমি বললুম, কে তুমি?

আমি কারখানার ভূত, স্যার। — এই ব'লে হঠাৎ শোভনার একটা হাত ধরে ঘরেব দিকে টেনে নিয়ে বললে, এসো, কথা আছে।

কথা কিচ্ছু নেই, ছাড়ো। ব'লে শোভনা তার হাতখানা ছাড়িয়ে নিল।

বটে। — লোকটি ভুরু বাঁকিয়ে বললে, আগাম একটা টাকা দিইনি কাল?

রুদ্ধশ্বাসে শোভনা বললে, বেরিয়ে যাও বলছি ঘর থেকে?

বাঃ — বেরিয়ে যাবো ব'লে বুঝি এলুম দেড় মাইল হেঁটে? বেশ কথা বলে পাগ্‌লি।

চীৎকার ক'রে শোভনা বললে, বেরোও বলছি শিগ্‌গির? চলে যাও — দূর হয়ে যাও ঘর থেকে —

লোকটা বোধ হয় তক্তাখানার ওপর বসবার চেষ্টা করছিল। হেসে বললে, আজ বুঝি আবার খেয়াল উঠলো?

শোভনা আর্তনাদ ক'রে উঠলো — ছোড়দা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছ তুমি? এ অপমানের কি কোনো প্রতিকার নেই? ... দাঁড়াও, আজ খুন করবো — বঁটিখানা...

বলতে বলতে ছুটে সে বেরুলো — রান্নাঘরের দিকে চললো। লোকটা এবার উঠে বাইরে এলো। বললে, মশাই, এই নিয়ে মেয়েটা আমাকে অনেকবারই খুন করতে এলো,

বুঝলেন? আসলে মেয়েটা মন্দ নয়, কিন্তু ভারী খেয়ালী। তবে কি জানেন স্যার, আমরা হচ্ছি 'এসেন্‌সিয়াল্‌ সার্ভিসের' লোক, যুদ্ধের কারখানায় লোহা-লক্কড় নিয়ে কাজ করি — মেয়েমানুষের মেজাজ-টেজাজ অত বুঝিনে। এসব জানে ওই 'আই-ই' মার্কা লোকগুলো, ওরা নানারকম ভাঁড়ামি করতে পারে!

এমন সময় উন্মাদিনীর মতন একখানা বঁটি হাতে নিয়ে শোভনা ছুটে বেরিয়ে এলো। পিসিমা ধড়মড়িয়ে এলেন, হারু ছুটে এলো। লোকটি শান্তকণ্ঠে বললে, আচ্ছা, আচ্ছা, আর খুন করতে হবে না, দেখছি আজ খেয়ালের ভূত চেপেছে ঘাড়ে। আচ্ছা — এই যাচ্ছি স'রে।

বিনোদবালা আর পিসিমা দৌড়ে এসে ধরে ফেললেন শোভনাকে।

লোকটি পুনরায় নিরুদ্বেগ কণ্ঠে বললে, বেশ, সেই ভালো। বিনোদের ঘরে রইলুম এ-রাত্তিরটার মতন। কিন্তু মাঝ রাত্তিরে আমাকে নিশ্চয় ডেকে ঘরে নিয়ো, নৈলে কিছুতেই আমার ঘুম হবে না, বলে রাখলুম। — আচ্ছা, বেশ, কাল না হয় আড়াই সের চাল'ই দেওয়া যাবে। আয় বিনোদ, তোর ঘরে যাই। বলতে বলতে বিনোদের হাতখানা টেনে নিয়ে সেই কদাকার লোকটা ইস্কুল-মাস্টারের ঘরের দিকে চ'লে গেল।

শোভনা সহসা আমার পায়ের ওপর লুটিয়ে প'ড়ে হাউ হাউ ক'রে কাঁদতে লাগলো। বললে, কবে, কবে ছোড়দা, কবে এই রাক্ষুসে যুদ্ধ থামবে, তুমি ব'লে যাও। তুমি ব'লে যাও, কবে এই অপমানের শেষ হবে, আমাদের মৃত্যুর আর কতদিন বাকি?

আস্তে আস্তে আমি পা ছাড়িয়ে নিলুম। শোভনার হৃৎপিণ্ড থেকে আবার রক্ত উঠে এলো। বললে, তুমি যেখানে যাচ্ছ, সেখানে যদি কেউ মানুষ থাকে, তাদের ব'লো এ যুদ্ধ আমরা বাধাইনি, দুর্ভিক্ষ আমরা আনিনি, আমরা পাপ করিনি, আমরা মরতে চাইনি....

শোভনা কাঁদুক, সবাই কাঁদুক। আমি অসাড় ও অন্ধের মতো হাতড়ে হাতড়ে সেখান থেকে বেরিয়ে সোজা বাইরে এসে পথে নামলুম। অন্ধকারে কোথাও কিছু দেখতে পেলুম না। শুধু অন্ধকাব, অনন্ত অন্ধকার। কেবল মনে হলো, অঙ্গারের আগুন যেমন পুড়ে পুড়ে নিস্তেজ হয়ে আসে, তেমনি মহানগরের ক্ষুধাশ্রান্ত কাঙ্গালীরা চারিদিকে চোখ বুজে পথে-ঘাটে নালা-নর্দমায় শুয়ে মৃত্যুর পদধ্বনি কান পেতে শুনছে।

ধস

সতীনাথ ভাদুড়ী

ওই বুক থেকেই সেটাকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছিল পরসাদীকে নদীতে ফেলে দেবার জন্য। অমনভাবে যেটা চলে যায়, সেটাকে পুঁততে নেই — তাই নদীগর্ভে ফেলা।

বাড়ির মধ্যে থাকবার সময় পরসাদী কাঁদে নি। চোখের কোণায় জল এলে, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে লুকিয়ে মুছে নিচ্ছিল, পাছে আবার মনচনিয়া দেখে ফেলে সেই ভয়ে। মনচনিয়ার মুখের দিকে এতক্ষণের মধ্যে একবারও তাকায় নি। চোখাচোখি হলে লজ্জা পাবে। এইসব সময় কি তাকান যায় কারো দিকে। একে তো শোকে, লজ্জায় মরে রয়েছে মনচনিয়া; এখন কি তার দুঃখের বোঝা বাড়া উচিত! পরসাদী কেঁদেছিল বাড়ীর বাইরে গিয়ে।

এতকাল ধরে সবাই জানত যে তার সঙ্গীর ছেলেপিলে হবে না। কত তুকতাক, মাদুলি, মানত, ওষুধ-বিষুধ এর জন্য! মরবার পর মুখে জল পাবার আকাঙ্ক্ষা কার না থাকে। তারপর যবে থেকে জানতে পারল যে ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন, তবে থেকে অধীর হয়ে দিন গুনেছে। কী করবে ভেবে পায় না মনচনিয়াকে নিয়ে। কত জিজ্ঞাসা। কি খেতে ভালো লাগে? ছেলে হবে না মেয়ে হবে? কার মতো দেখতে হবে? নড়ছে নাকি? পোড়ামাটি চিবুতে ইচ্ছে করে? আরও কত জল্পনা-কল্পনা। চামারশীর সঙ্গেই কত কথা ফিসফিস করে। পাড়ার লোকে তার আধিকোতা দেখে হাসাহাসি করেছে।

... তারপর বুধে বুধে চৌদ্দ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি -এ সতর দিন তো হাতে স্বর্গ পেয়েছিল। সতর দিন পরে যাঁর জিনিস তিনি টেনে নিলেন কাছে। মানুষ কতটুকু কি করতে পাবে! ... যাবে না কেন — যায়। কতরকমে যায় কত লোকের ছেলে। .. গুড়ের নাগরীর মধ্যে ডুবে ছেলে যেতে শুনেছে, গরম দুধের কড়ার মধ্যে পড়ে ছেলে যেতে দেখেছে। ... কিন্তু এরকমভাবে যাওয়া: ...আহা রে ওই তো একরত্তি রক্তর দলা।.... একেবারে নীল হয়ে গিয়েছিল। নিশ্বাস নেবার প্রাণপণ চেষ্টায় চোখ দুটো বড়ো হয়ে যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিল। ... আহা রে।....

... চাটছিল বুঝি। ... ভয় পেতে শিখবার আগে, বিপদ কি তা জানবার আগে। মায়ের বুকের ধস নেমেছিল হঠাৎ। ... জগদ্দল ননীর তারের নীচে বুকচাপা আঁধার। সে আঁধারের মধ্যে দিয়ে শেষ কান্নাটুকুও বার হতে পায় নি।...

মনচনিয়া জানতে পারল অনেক পরে। কতক্ষণ কে জানে।.... ওখানটায় ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগে কেন? — কখন কখন অমন হয় ওখানটায়। ঘুমের ঘোরে কম্বলখানা গায়ের উপর ভালো করে টেনে নেবার সময়ও মনে পড়ে নি, অন্য একটা প্রাণীর কথা। এমনিই ঘুমকাতুরে সে।.... তবু ওখানটায় ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগে কেন? 'কালীস্থান'-এ ঘণ্টা বাজছে; ভোর হবার আর দেরি নেই। ধড়মড় করে উঠে বসেছিল সে।... কাঁথা ভিজলে তো এরকম ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগে না কম্বলের তলায়।...এ যেন অন্যরকম অন্যরকম লাগছে! কেঁপে উঠেছিল বুক।

চারটে দেশলাই কাঠি খরচ হল লণ্ঠনটা জ্বালতে। লণ্ঠনের শিষ বাড়িয়ে, বিছানার দিকে তাকাবার সঙ্গে সঙ্গে মনের ক্ষীণ আশাটুকু নিভে যায়। তার চীৎকারে পরসাদী ওঠে। ...কিন্তু তার কি ওই দেহটুকুতে উত্তাপ ফিরে আনা যায়! কিছুতেই কিছু হল না। সতর দিনের মাংসপিণ্ডটাকে বুকের জাঁতায় চটকে পিষে ফেলতে তার ভয় নেই মনচনিয়ার। চোখের জলে ওই বুকই ভাসে।

মনচনিয়ার বুড়ি কুকুরটা খানিক দূর পরসাদীর সঙ্গে গিয়ে ফিরে এসেছিল। এসে বসেছিল মনচনিয়ার পাশে। রঙ কালো তাই কুকুরটার নাম কারিয়া। কারিয়া তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে তার জলভরা চোখের দিকে, ছড়ান চুলের বোঝার দিকে। বুড়ি কুকুরটা অনেকদিন এদের সংসারে আছে। বোঝে সব। ঠিক বাড়ির লোকের মতো।

মনচনিয়া কুকুরটাকে নিয়ে এসেছিল বাপের বাড়ি থেকে দ্বিরাগমনের পর আসবার সময়। ঠিক নিয়ে আসে নি, আপনা থেকে চলে এসেছিল কারিয়া তার সঙ্গে। সে কি আজকের কথা। তার বিয়ে হয়েছিল চার বয়সে; দ্বিরাগমন হয় বিয়ের পনর বছর পরে। পবসাদী দ্বিরাগমনের টাকা জমিয়ে, শ্বশুরের কাছে বারবার খবর পাঠায়। শ্বশুর সাড়া দেয় না, কেবল দেরি করে। লোকে দশ কথা বলে এ নিয়ে। মনচনিয়া তখন গ্রামের তহশীলদার সাহেবের বাড়িতে ছেলেপিলে রাখবার দাই-এর কাজ করে। লোকে বলে বাপ মেয়ের রোজগার খেতে চায় — তার শুধু ঝিগিরি মাইনের রোজগার নয়। শুনে পরসাদীর রক্ত গরম হয়ে ওঠে। বয়সের গরম, তার উপর টাকার গরম। তেল দিয়ে পাকানো লাঠি নিয়ে সে যায় শ্বশুরের কাছে। ঝগড়াঝাটি, লাঠালাঠি করে তার হকের বউকে নিয়ে আসে সেখান থেকে। গাঁয়ের বাইরে এণ্ডির ক্ষেতের পাশে যখন গরুরগাড়ি পৌঁছেছে, তখন প্রথম নজরে পড়ল যে, কালো কুকুরটা সঙ্গে সঙ্গে আসছে।

"কাদের কুকুর রে?"

এই হচ্ছে প্রথম কথা পরসাদীর, মনচনিয়ার সঙ্গে।

"আমার।"

অতি ভয়ে ভয়ে বলা।

"তোর!"

মনচনিয়ার চেহারাটা বিশাল হলে কি হবে। ভয় পায়। কড়া স্বামী। লড়াই করে তাকে নিয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ ইতস্তত করে জিজ্ঞাসা করে —

"তুলে নি ওটাকে?"

"থাকতে পারবে তো?"

"তা পারবে।"

চলন্ত গাড়ি থেকে কুকুরছানাটাকে টেনে উপরে তোলবার চেষ্টা করতেই স্বামী বলে — "আহা করিস কি। তুই কি অত ঝুকতে পারিস। আর একটু সম্মুখের দিকে সরে বস।"

গায়ের কাপড় সামলে নিয়ে মনচনিয়া কুকুরটাকে টেনে তোলে গাড়িতে। দেখিয়ে দিল যে মোটা হলেও সে অকেজো নয়। কেউ তার মোটাসোটা চেহারা নিয়ে কিছু বললেই কুণ্ঠিত হয়ে সে গায়ের কাপড় সামলে নেয়, দেহভার লুকাবার জন্য। প্রথম দিনই পরসাদী এ জিনিস লক্ষ্য করেছিল।

"কত ওজন মাথায় নিয়ে ঘুরতে পারিস?"

"এক মণ তো পারবই।"

এক মণের ঝুড়ি মাথায় নিয়ে মনচনিয়া জানায় যে, সে পারবে। চোখমুখে অপ্রস্তুতের ভাব সুস্পষ্ট। কথাবার্তায় সাবধান হয়ে যায় পরাসাদী সেই থেকে। "হরদা-হাট আমাদের

ওখান থেকে তিন ক্রোশ। সেখান থেকে পাইকারি দরে তরি-তরকারী কিনে এনে শহরে বিক্রি করি আমরা।''

এই হয়েছিল প্রথম কথাবার্তা তার স্বামীর সঙ্গে। তার কুকুর, আর তার মেদবহুল দেহটাকে নিয়ে কথা। স্বামী যতই হাট-বাজার আর তরিতরকারির কথা বলুক, মনচনিয়া বুঝতে পারে কথার ইঙ্গিতটা কোনদিকে।

এখানেই শেষ হয়নি। আরও খানিক দূরে এসে দেখা হল তহশীলদার সাহেবের সেপাই দুটোর সঙ্গে। তারা অপেক্ষা করছিল পরসাদীর জন্য। মালিকের বোধহয় হুকুম ছিল মারধোর করবার। কিন্তু তারা অল্পতেই রেহাই দিল। মালিকের দুর্নাম করবার জন্য গালিগালাজ দিয়ে শেষকালে রসিকতা করে গেল — ''দু-দুটো কালো কুত্তী নিয়ে চললি এখান থেকে। আমাদেব গ্রাম যে একেবারে অন্ধকার হয়ে যাবে। মোটা কুত্তীটা কিন্তু রোগা কুত্তীটার চাইতে খাবে অনেক বেশি। দেখিস।''

হেসে গড়িয়ে পড়ে এ ওর গায়ে সেপাই দুটো। এ ঘটনা ঘটেছিল দশ বছর আগে। তারপর থেকে কুকুরটা এখানেই থাকে। সেই থেকে, মনচনিয়ার কথা মনে হলেই, তার কালো কুকুরটার কথাও সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে এখানকার লোকের। ইঁদারাতলায়, হরদাহাটে, গেরস্ত বাড়িতে যেখানে মনচনিয়া যাবে, সেখানেই কুকুরটা তার পিছনে পিছনে যাবে। শুঁটকী কারিয়া আর ধুমসী মনচনিয়ার কথা ছেলেপিলেরা এক নিশ্বাসে বলে হাসাহাসি করে। কেন যে ছেলেপিলেরা এত নিষ্করুণ হয় কে জানে। হয়ত তরকারীর ঝুড়ি মাথায় নিয়ে গলদ্‌ঘর্ম হয়ে আসছে মনচনিয়া রাস্তা দিয়ে, ছেলেদের মার্বেল খেলা বন্ধ হয়ে যায়। চোখে চোখে ইশারা খেলে গেল। একজন সুর করে চেঁচায় — 'মন-চ-নি-য়া'। আর একজন সুর মিলিয়ে বলে — 'ল-দ্‌-ব-দি-য়া'। মনচনিয়া, লদ্‌বদিয়া। মনচনিয়া, লদ্‌বদিয়া। কারিয়া লেজ নিচু করে নিয়েছে। মনচনিয়া কাছে এসে গেলে, দলের সব চেয়ে দুষ্টু ছেলেদুটো পথের দু পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। একজন মনচনিয়ার এপাশে, আর একজন ওপাশে। তার চলনের নকল করে হাঁটছে তারা। দেহভঙ্গির তালে তালে সুর ওঠে — লদর, বদর।। লদর, বদর .....লদর, বদর।.....'

মরমে মরে যায় মনচনিয়া। জিভের ধার তার কম নয়। অন্য কোনো বিষয় নিয়ে এবা তার পিছনে লাগতে এলে, সে পালটা জবাব দিতে ছাড়ত না। গালাগালি, চিৎকার করে এমন অনর্থ বাধাত যে ছেলেরা পালাবার পথ পেত না, কিন্তু এ যে তার দেহের বেঢপ গড়ন নিয়ে কথা। মুখে ফুটে ওঠে অপ্রস্তুতের হাসি। গায়েব কাপড় সামলে নেবার পর্যন্ত উপায় নেই, দু হাত দিয়ে ঝুড়িটা ধরে রয়েছে বলে। ছেলেদের হাত থেকে রেহাই পাবার পর খানিক দূর গিয়ে কারিয়ার লেজ আবার খাড়া হয়ে ওঠে। ছেলেদের দিকে মুখ ফিবিয়ে কুকুরটা দুবার ডাকে ঘেউ-ঘেউ করে। গোনা দুবার। তারপর আবার একটা অতিপরিচিত গন্ধ নাকে নিতে নিতে পথ চলতে আরম্ভ করে।

মনচনিয়ার এই কুণ্ঠিত ভাবটা খানিকটা কেটেছিল গত কয়েক মাস থেকে নতুন সম্ভাবনায় পৃথিবীর রঙ যখন বদলে যায়, তখন ভারী বোঝাও হাল্কা লাগে। বেমানান জিনিসও মানানসই হয়ে ওঠে, মনের জোর বাড়ে। তার সৌষ্ঠবহীন দেহের একটা মানে তবু সে এতদিন খুঁজে পায়।....কিন্তু এ আর ক'দিন!

সতর দিনের রাজপাট শেষ হয়ে গেল মনচনিয়ার।... যে অঙ্গ নিয়ে তার চিরকালের অস্বস্তি, যে অভিশাপের বোঝার কুণ্ঠায় সে লোকের কাছে মাথা হেঁট করে থাকে সব সময়, সেইটাই এতদিন পর তার সঙ্গে চরম শত্রুতা করেছে।...শত্রু।...শত্রু।

পা ছড়িয়ে বসেছে মনচনিয়া ঘরের দাওয়ায়। বুড়ি কুকুরটা তার পা চাটছে। কারিয়ার চোখের কোণায় ওটা জল না পিচুটি ঠিক বোঝা যায় না। নিজের অজান্তেই বুঝি মনচনিয়ার হাত চলে গিয়েছে কুকুরটার গায়ে। হাত বোলাচ্ছে পিঠে, বুকে। পিঠের খরখরে লোমগুলো আঙুলের ফাঁক দিয়ে সরে যাচ্ছে। বুকের রোঁয়া এর চেয়ে নরম। পাঁজড়ার হাড়গুলো হাতে বেঁধে। শুকনো বুকের উপর আঙুল চালাতে চালাতে সে ভালো করে সেদিকে তাকিয়ে দেখল। আঁচিলের মতো ছোট-ছোট। একটু চেষ্টা করে না দেখলে কালো লোমের মধ্যে প্রথমটায় নজরে পড়ে না। কারিয়ার কানের এঁটুলিগুলোর চাইতেও ছোট-ছোট বোঁটাগুলো! বয়স হওয়ায় গত বছর থেকে বাচ্চা হওয়া বন্ধ হয়েছে বুড়ি কুকুরটার।....কিন্তু এও ভালো।....শতগুণে ভালো।

কারিয়া তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছে — একবার মনচনিয়ার মুখের দিকে, আর একবার ঘাড় কাত করে তার হাতের আঙুলের দিকে। বোঝার চেষ্টা কবছে। ঠিক আদরের মতো লাগছে না তো, মনচনিয়ার চোখ-মুখের ভাব দেখে। তবে? বুকের বোঁটাগুলোতে সুড়সুড়ি লাগছে যে তার।

দুঃখ তো আছেই; কিন্তু এমনভাবে পেটের ছেলে যাওয়ার সে যে কী লজ্জা, বলে বোঝানো যায় না। সবাই যে তারই কথা আলোচনা করছে সরকারী ইঁদারাতলায়। কত কী যে বলছে। বাড়ি থেকে বেরুতে সাহস পায় না মনচনিয়া। তবুও কি শান্তি আছে! পাড়ার লোকে আসে তাকে সান্ত্বনা দিতে না ছাই! সব বোঝে সে। চাদর মুড়ি দিয়ে চাটাই-এর উপর শুয়ে থাকে, কেউ বেড়াতে এলে। যা ইচ্ছা বলে যাও, সে কোন কথার জবাব দেবে না। পরসাদী বাড়িতে থাকলে, প্রতিবেশিনীদের বারণ করে মনচনিয়াকে জ্বালাতন করতে। এক বুড়ি সহানুভূতি জানাতে গিয়ে মনচনিয়ার গাঢ় ঘুমের কথা তুলেছিল। তাকে তাড়া দিয়ে থামিয়ে দেয় পরসাদী। কারিয়া চাটাইখানার পাশে অষ্টপ্রহর বসে থাকে। চেনা লোককে বাড়িতে ঢুকতে দেখলেও বার দুয়েক ঘেউ-ঘেউ ডেকে নিজের বিরক্তি জানিয়ে দেয়।

স্ত্রীর মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে সঠিক আন্দাজ পেল পরসাদী, তার একটা কথা থেকে। মাটির দিকে তাকিয়ে, অতি কুণ্ঠার সঙ্গে সে স্বামীকে বলেছিল সরকারী ইঁদারা থেকে জল এনে দিতে। খাওয়ার জল? মনচনিয়া চুপ করে থাকে। স্নানের? মনচনিয়ার চোখে জল এসে গিয়েছে। স্বামীকে কখন সরকারী ইঁদারা থেকে স্নানের জল আনতে বলতে পারে মেয়েমানুষে। একে মোটা মানুষ; স্নান না করলে তার চলে না। তার উপর গায়ে দুধ-পচা গন্ধ। নিজেরই গা ঘিন-ঘিন করে। লজ্জার মাথা খেয়ে তাই সে স্বামীকে স্নানের জল আনতে বলেছিল। ইঁদারা-তলায় লোকজনের মধ্যে জল আনতে যাবার লজ্জা যে আরও অনেক বেশি। পরসাদী মাটির কলসীটা নিয়ে বেরুচ্ছিল। মনচনিয়া বালতিটা হাতের কাছে আগিয়ে দেয়। পুরুষমানুষে সরকারী ইঁদারা থেকে কলসী করে জল নিয়ে এলে পাড়ার লোকে কি বলবে!

সহজ বুদ্ধিতে পরসাদী বোঝে, স্ত্রীকে এখন একটু অন্যমনস্ক রাখবার চেষ্টা করা উচিত সব সময়। উঠনভরা শাকসব্জির গাছ — মনচনিয়ার নিজ হাতে পোঁতা, সেগুলোরও যদি একটু দেখাশোনা করে তাহলে মনটা ভালো থাকে। কিন্তু করে কই। বারান্দায় বসে বসে কি ভাবে দিনরাত্র, সে-ই জানে। ভোরে উঠে সে প্রত্যহ মাচা থেকে সীম, বরবটি পাড়ে বাজারে নিয়ে যাবার জন্য। এ তিনদিন মনচনিয়া সীম পাড়তেও ভুলে গিয়েছে।

সময় পেলেই পরসাদী স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করে তাকে একটু অন্যমনস্ক রাখতে চায়; কিন্তু আরম্ভ করবার একটু পরই আর কথা খুঁজে পাওয়া যায় না। বলতে ইচ্ছে করে, যেটা চলে গিয়েছে সেইটার কথা; কিন্তু সে কথা যে বলতে মানা। অন্য গল্প করতে গেলেও বাধা এসে পড়ে অজান্তে। তরিতরকারির বাজার দর নিয়ে গল্প আরম্ভ করাই ছিল তাদের চিরকালের

অভ্যাস। পরসাদী হয়ত আরম্ভ করল সীমের দরের কথা। "এখন দরটা যাচ্ছে ভালো। আর এক মাস পরে কে পুঁছবে কুকুরের কানের মতো শক্ত শক্ত সীম। 'সাতপুতিয়া' (সাত-পুত্তুর) সীমের গাছেই লাভ বেশি; অফুরন্ত ফলন ; থোবায় ফলে; এক-এক থোবায় থাকে সাতটা করে। উঠনের সীমগাছটা সেই দশহরার আগে থেকে ফল দিচ্ছে — মনে আছে তো সেই যেদিন খগরিয়া-হাটের দশহরার মেলা থেকে তোর জন্য দহিবড়া?..."

বলতে বলতে থেমে যায় পরসাদী। কথাটা তোলা ঠিক হয় নি। ছেলেটা তখন পেটে। স্ত্রী খেতে চেয়েছিল ওখানকার দহিবড়া।

"হ্যাঁ হ্যাঁ অসময়ের শাকসব্জিতেই লাভ। সীমগাছটা এত আগে থেকে ফলতে আরম্ভ করেছে এবার; পুরনো গাছ বলে। গত বছরের গাছ। তুই তো তুলে ফেলতেই চেয়েছিলি মড়ুঞ্চে গাছটাকে। আমার কথাতেই তো বৈশাখ মাসে জল দিতে আরম্ভ করলি। বলেছিলাম কিনা, বল?"

আবার একটা কেমন কেমন যেন ভাব মনচনিয়ার চোখমুখে দেখতে পেয়ে পরসাদীকে থামতে হয়।

...."লাউগাছটার কি তেজ হয়েছে দেখেছিস। চাল ছেয়ে গেছে। কি মোটা-মোটা ডগাগুলো — বুড়ো আঙুলের চাইতেও মোটা। রোজ ভাতের ফেন ফেলিস কিনা গাছের গোড়ায়, তাই ওটার অত জোর। অত বাড় হলে কি গাছে ফল থাকে। ওর ডাঁটা কেটে কেটে বেচে ফেলাই ভালো বোধ হয়। দেখছিস না, কেবল জালি পড়ছে আর পচে যাচ্ছে — জালি পড়ছে আর পচে যাচ্ছে।"...

কি আবার বলে ফেলল সে। স্ত্রীর মুখখানি হঠাৎ কাঁচুমাচু হয়ে গেল কেন? মাঝপথে কথা ফুরিয়ে গেল পরসাদীর। সে উঠে পড়ে। এত সামাল দিয়ে দিয়ে কি কথা বলা যায়।

সেলাই নিয়ে বসলে হয়ত একটু অন্যমনস্ক থাকবে। স্ত্রীর কুর্তার জন্য খানিকটা ছিট নিয়ে এল পরসাদী, তরকারী বেচে ফেরবার সময়। মনচনিয়া দেখে বলে, "এ কাপড়গুলো কাচলে পরে বড্ড ছোট হয়ে যায়।"

"অত আঁট-আঁট জামা পরিস কেন; একটু ঢিলে সেলাই করলেই পারিস।"

কিছু ভেবে বলা নয়। তবু মনচনিয়া নিচের দিকে চোখ নামিয়ে নেয়। কত কি গল্প করবে, ভেবে ঠিক করে এসেছিল পরসাদী। সব গুলিয়ে যায়, স্ত্রীর এ অপরাধীর ভাবটা লক্ষ্য করে।

তার চেষ্টার ত্রুটি নাই। পরের দিন সে ফিরল এক কুকুর-ছানা নিয়ে। কুকুর-ছানাটা খুবই ছোট — সবে চোখ ফুটেছে। "ও আবার কি নিয়ে এলি?"

"কারিয়াটা বুড়ি হয়েছে। কবে মরে যাবে তার ঠিক কি। এখন থেকে একটা নতুন কুকুর পোষা ভালো। পথের ধারে শীতে কুঁই-কুঁই করছিল। উঠিয়ে নিয়ে এলাম।"

মনচনিয়া সেদিন কাজে বেরুবার যোগাড় করছিল। আর কতদিন বাড়িতে বসে থাকবে। বাড়িতে বসে থাকলে কি তাদের মতো অবস্থার লোকের চলে। এরই মধ্যে স্বামী কুকুরছানা নিয়ে এসে হাজির।

...ফ্যাসাদ! এতকাল যখন কারিয়ার বছর বছর বাচ্চা হতো সাতগণ্ডা করে, তখন কুকুরের বাচ্চা পোষবার কথা খেয়াল হয় নি; কত শিয়ালে খেয়েছে, কত পাড়ার ছেলেপিলেরা নিয়েছে। যতই পাতকুড়ানো খেতে দাও, কুকুর পোষবার খরচ আছে তো। শুধু পাতকুড়ানো খেতে দিলে কি কুকুর বাড়িতে থাকে। এক গেরস্তর আস্তাকুঁড় থেকে আরএক গেরস্তর আস্তাকুঁড়ে টহল মেরে বেড়ায় অষ্টপ্রহর।

তবু স্বামী যখন নিজে হাতে করে নিয়ে এসেছে, তখন এটাকে বাড়িতে জায়গা দিতেই হয়।

ঝুড়ি নামিয়ে মনচনিয়া কুকুরছানাটাকে হাতে করে নেয়। বাড়ি থেকে বেরুতে তার লজ্জা করছিল। যাক, তবু একটু সময় পাওয়া গেল কুকুরের বাচ্চাটা আসায়। একবেলা দেরি করবার একটা অছিলা পেয়ে সে বাঁচে।

একবারে বাচ্চা, নাক বাড়িয়ে শুঁকছে ফোঁস-ফোঁস শব্দ করতে করতে। কাপড়ের মধ্যে গুঁজতে চায়। লিকলিকে জিভের ডগা দিয়ে আঙুল, তেলো, হাতের চামড়া চেটে চেটে দেখছে। মনচনিয়ার গায়ের গন্ধটা তার মনোমতো। দুধের টকটক মাতা-মাতা গন্ধটা তার চেনা। হারিয়ে যাওয়া গন্ধ আবার ফিরে পাচ্ছে কুকুরছানাটা। সহজ প্রবৃত্তিতে বুঝতে যে এই গন্ধটাই তাকে উৎস-ধারার সন্ধান দেবে।

"বাবারে বাবা! এক মিনিটও নিশ্চিন্দি নেই। চুপটি করে বস্ এখানে!"

কোল থেকে নামিয়ে মনচনিয়া বাচ্চাটাকে চেপে পাশে বসাল।

কারিয়ার গলার মধ্যে দিয়ে একটা শব্দ বার হল — ঘর্-র্-র্। নতুন আগন্তুকের কাণ্ডকারখানা তার অপছন্দ। আগাগোড়া ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কিরকম দাঁড়াল, সেটারও আন্দাজ করে নিচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। একবার কুকুরছানাটার কাছে গিয়ে সেটার গা শুঁকে নেয়। গন্ধর মধ্যে কি পেল না পেল সে-ই জানে। একটা হাই তুলে, বারান্দা থেকে নেমে গিয়ে সে ঝিমুতে বসল উঠানে। বাচ্চাটার সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ।

কুকুরছানার নরম-নরম রোঁয়াগুলো হাতের উপর লেপটে যাচ্ছে মনচনিয়ার। রেশমের মতো বেশ আরাম লাগে। ওর মধ্যে দিয়ে আঙুল চালিয়ে আরাম নিতে গেলে কি রকম যেন গা-শির-শির করে অথচ সে সিরসিরিনিটুকু খারাপ লাগে না। আঙুলের ডগায় একটা কোমল দেহের উত্তাপ একটু আনমনা করে দেয় মনচনিয়াকে।

... গেলে গেলে তো রোজ ফেলেই দিতে হয় দুধ। একটা টিনের কৌটার ঢাকনিতে দুধ গেলে বার করে সে বাচ্চাটার সম্মুখে রাখে। চুকচুক করে খাচ্ছে বাচ্চাটা। শব্দটা শুনতে ভারী মিষ্টি। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে মনচনিয়া সে দিকে।

উঠানে কারিয়ার কান খাড়া হয়ে উঠেছে। তার ঔদাসীন্য কেটেছে। ছুটে এলো বারান্দায়, ঢাকনিটার কাছে। "তুই আবার এলি কেন? পালা। যা বলছি।"

ঘ্যা-অ্যা-অ্যা করে একটা শব্দ বার করল কারিয়া গলা দিয়ে।

"এ কি তোর খাওয়ার জিনিস নাকি! রাগ দেখালেই অমনি হল। এতটুকু বাচ্চার সঙ্গে রেষারেষি! লজ্জা করে না। যা পালা!"

ঘ্-র্-র্-র।

অর্থাৎ এ ব্যবস্থা কারিয়ার অপছন্দ; কিন্তু হুকুম না মেনে উপায় কি...

বাড়ির কাজকর্ম সেরে মনচনিয়া ঝুড়ি মাথায় নিয়ে বার হল উঠান থেকে। চিরকালের অভ্যাস মতো কারিয়াও আড়মোড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

"তুই আবার উঠলি কেন? তুই থাক। আজ আর তোকে আমার সঙ্গে যেতে হবে না! আবার কথা শোনে না। যা! যা বলছি বাড়ির মধ্যে!"

দরজার ঝাঁপ বাইরে থেকে বন্ধ করে মনচনিয়া যখন চলে গেল, কারিয়া তখন ঘেউ-ঘেউ করে ডেকে পাড়া মাথায় করছে।

যার জন্য তার বাড়ির বাইরে যেতে কুণ্ঠা — ঠিক তাই হল! হাসির খোরাক পেলে ছেলেপিলেদের সত্যিই মায়া-দয়া থাকে না। আজও মনচনিয়াকে আসতে দেখে তাদের মার্বেল খেলা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।— আজ 'মুটকী-তরকারিউলিটা' একা কেন রে? শুটকী

কুকুরটা নেই কেন রে? .....আজ তারা ছড়া কেটে তার চলনভঙ্গির নকল করে নাচে নি। শুধু নিজেদের মধ্যে পুতনা-রাক্ষসীর কথা তুলে হাসাহাসি করছে। মনচনিয়ার স্বকর্ণে শোনা। চোখ-কান বুজে কোনোরকমে সে সেখান থেকে পালিয়ে বাঁচে। তারপর যে বাড়িতে তরকারি বেচতে যায়, সে বাড়ির মেয়েরা দিনকয়েক আগেকার অঘটনটার সারা বৃত্তান্ত খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করেছে। ...পুলিসে যা ভাবে নি এরা হয়ত তাই ভেবে নিয়েছে। কে জানে! নইলে কোন মা কি এসব কথা জিজ্ঞাসা করতে পারে যার কপাল এমনভাবে পুড়েছে তাকে? ... স্বামী তাকে এখন দু-তিনদিন বাড়ি-বাড়ি শাকসব্জি বেচতে যেতে বারণ করেছিল। বলেছিল, বাজারে গিয়ে বসতে তরকারি নিয়ে। ঠিকই বলেছিল। তখন বুঝতে পারে নি পরসাদীর কথা। ভেবেছিল বাড়ি-বাড়ি ঘুরতে পরিশ্রম বেশি বলেই বুঝি সে ওকথা বলেছে।....

মনচনিয়া এর পর আর কোন গেরস্ত বাড়িতে না গিয়ে সোজা চলে গিয়েছিল বাজারে।

বাড়ি ফিরল স্বামী-স্ত্রী এক সঙ্গে। ঝাঁপ খোলবার শব্দ পেয়ে কিন্তু কারিয়া লেজ নাড়তে নাড়তে এগিয়ে এল না। কোনো সাড়াশব্দ নেই। ব্যাপার কি? আলো জ্বালা হলে দেখা গেল যে, উঠানে কারিয়া শুয়ে রয়েছে, কাত হয়ে পা ছড়িয়ে, আর কুকুরছানাটা তার শুকনো বুক প্রাণপণে চাটছে। মাঝে মাঝে ঢুঁ মেরে মেরে এ বোঁটা ছেড়ে ও বোঁটা ধরছে। মনচনিয়া কাছে গিয়ে বাচ্চাটাকে হাতে করে তুলে ধরায় কারিয়া গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। ...অনেকক্ষণ আগলেছি এটাকে তোমাদের কথামতো, এখন তোমাদের জিনিস তোমরা বুঝে নাও। এক কাতে শুয়ে শুয়ে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছে গা-হাত-পা। ...কারিয়া মাটি শুঁকতে শুঁকতে চলে গেল বাড়ির বাইরে।

"এটার একটা নাম রাখতে হয় এখন থেকে। আমি তো ভেবেছি এটার নাম রাখবো বাচ্চা।"

"হ্যাঁ বাচ্চা নামটা বেশ হবে।"

"বাচ্চা। ওরে বাচ্চা! আবার তাকান হচ্ছে পুটপুট করে। আঙুল চাটিস নি বলছি। বোকা কোথাকার! ওটা কি খাওয়ার জিনিস! খিদে পেয়েছে বুঝি? তা তো পাবেই। কমক্ষণ সময় তো না। দুধের বাচ্চাদের ঘণ্টায় ঘণ্টায় খিদে পায়। আয়।"

"কুঁই-কুঁই করে যে শব্দটা করছে, ওটা হচ্ছে খিদে পাবার সময়ের ডাক, কুকুর-ছানাদের।"

"শুধু খিদে পাবার সময়ের কেন হবে; আরও কত সময় ওরা অমন করে ডাকে।"

মনচনিয়ার মুখে হাসি। ওই হাসিটুকু না থাকলে শেষের কথাটার ইঙ্গিত তাব স্বামী ধরতে পারত না। এই প্রথম হাসল সে আজ পাঁচদিন পরে।

"সে সব বুঝিস তুই ; কুকুর পুষে পুষে তোর হাড় পেকেছে।"

পরের দিন বাচ্চাটা সারাদিন ধরে কারিয়ার বুক চেটেছে। কারিয়া সারাদিন গা এলিয়ে শুয়েছিল। মনে হচ্ছিল যেন আরাম নিচ্ছে। মনচনিয়া যখন ঝুড়ি মাথায় নিয়ে বেরুল বাড়ি থেকে তখন বুড়ি কুকুরটা সঙ্গে গেল না। কিছু বলতে হয় নি তাকে — নিজে থেকেই গেল না। বাজার থেকে ফিরে এসেও দেখল, ঠিক সেই একই অবস্থাতে কারিয়াটা শুয়ে রয়েছে, তার বাচ্চাটা সেই রকম করেই ঢুঁ মেরে মেরে চুষছে। বোঁটাগুলো আর আঁচিলের মত নেই; একটু বড় হয়েছে। গোড়াটাও একটু ফোলা। একটু লালচে বেগুনী আভা লেগেছে তাতে। ছড়ে যায় নি তো? শুধু কি চাটা আর চোষা — যা আঁচড়-কামড়ের ঘটা বাচ্চাটার! বলা যায় না কিছুই। আঙুল দিয়ে দেখল মনচনিয়া। ......না। এ ছড়ে যাওয়া নয়। শিরা-উপশিরার লাল বেগুনী মিহিমিহি দাগগুলো চাড়া ঠেলে যেন উঠে আসতে চাইছে। বেশ তেলা লাগছে চামড়াটা। কারিয়ার চাউনি দেখে বোঝা যাচ্ছে যে, মনচনিয়ার এই অহেতুক কৌতূহল সে

সন্দেহের চোখে দেখছে ... এত হাঁ করে দেখবার কি আছে এর মধ্যে — এ কি আগে দেখ নি? ....

টিনের কৌটোর ঢাকনিটা হাতে নিয়ে মনচনিয়া বারান্দা থেকে ডাকল — "বাচ্চা! বাচ্চা! আ-তু-তু! কুর-কুর-কুর-কুর আয় বাচ্চা!"

বাচ্চাটা বুঝেছে কেন এ ডাক। ঘুর-ঘুর করে সেটা উঠে এল বারান্দায়। ঠেলে মনচনিয়ার গায়ের উপর উঠতে চায়। হাঁটুর কাপড়ে খরখর করে শব্দ হচ্ছে নখের আঁচড়ে।

"থাম্ থাম্! তর সইছে না! এলি কেন — যা না কারিয়ার কাছে! নতুন মা পেয়েছিস — চাটগে না তার বুক। শুঁকছিস কি আবার!"

... কী জিনিস — কী কাজে যে আসে! .... যেটা অমনভাবে চলে গেল সেটার কথা মনে পড়ে। ভোলা কি যায়! ....

কারিয়া ঘাড় তুলে দেখছে উঠান থেকে। চোখের পিচুটি তার গেল কোথায়! শুনছে মনচনিয়ার কথা। লক্ষ্য করছে তার হাবভাব প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি। টিনের ঢাকনাটি মনচনিয়া যখন নেয়, তখন তার কান খাড়া হয়ে উঠেছিল। বাচ্চাটার হাত থেকে রেহাই পেয়ে, বাইরে এক চক্কর টহল দিয়ে আসাই তার পক্ষে স্বাভাবিক হত, কিন্তু তা না করে সে গিয়ে বসল দাওয়ার নিচে লেজে ভর দিয়ে। উদগ্র উৎকণ্ঠায় সে প্রতীক্ষা করছে বাচ্চাটার ফিরে আসবার।... টিনের কৌটোর ঢাকনিটা চেটে-পুটে শেষ করবার পরও আবার সেটা ওখানে কুঁই-কুঁই করছে কেন? ওখানকার বিঁড়েটা আবার শুঁকছে কেন?

"হল তো!"

... এ তো আদর নয়। .....মনচনিয়ার এ গলাব স্বরে বিপদ আনে, সেকথা কারিয়ার জানা। টপ করে কারিয়া লাফিয়ে বারান্দায় ওঠে। বাচ্চার ঘাড়ের কাছটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে সেটাকে নামিযে নিয়ে আসে। ... চল নিজের জায়গায। সেখানে যা ইচ্ছা কর না কেন। ...ঠিক আগেকার জায়গায় নিয়ে গিয়ে, বাচ্চার ঘাড়ের কাছটা চেটে একটু আরাম করে দেয়। তারপর কাত হয়ে আবার শোয় নিজের আরাম নিতে। .... নে, এবার নে! ...এবার কি করতে হবে সেকথা আর বলে দেবার দরকাব ছিল না বাচ্চাটাকে।

বাঁশের খুঁটি ধরে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে মনচনিয়া। ... এখনও সাধ মেটে নি বুড়ি কারিয়াটার ! ...মাছিতে জ্বালাতন করছে বাচ্চাটাকে; শরীর না নাড়িয়ে শুধু মাথাটা নাড়িয়ে সেটাকে মারবার কত চেষ্টা করেছে কারিয়া। ... দেহ নাড়লে যে বাচ্চার চাটবার অসুবিধা হবে কিংবা হয়ত নিজেরই আরামের ব্যাঘাত ঘটবে গা নাড়লে। ... কে জানে! পরসাদী কি লক্ষ্য করেছে বুড়ি কুকুরের বুকের আকৃতির পরিবর্তনটা? তার ভারী ইচ্ছা করে স্বামীকে ডেকে দেখায়; কিন্তু পারে না সঙ্কোচে।

পরসাদীরও জিনিসটা নজরে পড়েছে; কিন্তু একথা কি মনচনিয়ার কাছে তোলা যায়?...

সে রাত্রিতে কতবার যে মনচনিয়ার ঘুম ভেঙেছে তার ঠিক নেই। সারারাত কারিয়া ডেকেছে শিয়ালের গন্ধ পেয়ে।

ভোরে উঠে কারিয়া আর বাচ্চাটাকে উঠোনে দেখতে পাওয়া গেল না। যাবে কোথায়! 'সাতপুতিয়া' সীমের মাচাটার নিচে সিন্দুকের মতো একটা কাঠের ঘর আছে। এক সময়ে মনচনিয়া হাঁস পুষেছিল; তাদের থাকবার জন্য এইটা তৈরি করেছিল। দেখা গেল সেই হাঁসের ঘরে কারিয়া বাচ্চাটাকে নিয়ে শুয়ে রয়েছে। ঘরটা চারিদিকে বন্ধ; শুধু একদিকে হাঁস ঢুকবার একটা ছোট দরজা মতন আছে। এত ছোট যে কারিয়াকেও তার মধ্যে দিয়ে কষ্ট করে ঢুকতে হবে।

মাথা নিচু করে দেখতে গেলে মনচনিয়া। ভিতরে অন্ধকারে ভালো করে দেখা যায় না।

ঘ-র্-র্-র্-র্। ... এখানে আবার কিসের দরকার?

"আ মরণ! চুপ কর বলছি কারিয়া!"

মনচনিয়া মাচা থেকে সীম পাড়ছে। খুট্‌খাট্ করে শব্দ হচ্ছে, আর ডেকে ডেকে উঠছে কারিয়া। পরসাদী জিজ্ঞাসা করে— "ওটা অত ডাকে কেন?"

"অপছন্দ।"

"সাতপুতিয়া সীমের মাচাটা ওর এলাকায় পড়েছে বুঝি?"

"হ্যাঁ, এই আর কি।"

"নতুন ছেলে পেয়েছে।"

"সাত জনমের ছেলে!"

এ সম্বন্ধে স্বামীকে আর বেশি কথার সুযোগ না দেবার জন্য মনচনিয়া কলসী নিয়ে চলে গেল সরকারী ইঁদারাতলায়।

পরসাদীও হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। একটা অস্বস্তিকর জায়গায় এসে পৌঁছেছিল দুজনের কথা, নিজেদের অজান্তে।

আজ তাদের যেতে হবে হরদা-হাটে তরকারি কিনতে। একটু তাড়াতাড়ি বেরুতে হবে; তাই পরসাদী উনুন ধরাতে বসল। পাটকাঠি ভাঙ্‌বার শব্দ শুনে কারিয়া ঘেউ-ঘেউ করে ডেকে ওঠে।

"বাবা রে বাবা! কুটোটি ভাঙবার জো নেই!...

সত্যই তাই। কাক মাচায় বসলে কারিয়া ঘেউঘেউ করে ডেকে উঠেছে, পরসাদী উঠোনে চলাফেরা করলে ডেকে উঠছে; বাড়ির চালে চিল বসতে দেখলে ডাকছে ; দরজার বাইরে বিড়াল দেখলে ডাকছে।... সবাই শত্রু ; সকলের কাছ থেকে বিপদ আসতে পারে; চোখে চোখে রাখ; আগলে থাক; বিপদের গন্ধ নাকে এলেই ডেকে ভয় দেখাও; চোখ কান নাক সব খুলে রাখ চব্বিশ ঘণ্টা, কাউকে বিশ্বাস নেই; শত্রু আক্রমণ করবার আগেই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়; সময় দিলেই আর পারবে না তার সঙ্গে।...

নালীর মুখে একটা বেজি দেখতে পেয়ে হাঁসের ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল কারিয়া। উনুনের পাস থেকে বেশ ভালো করে দেখল কুকুরটাকে পরসাদী। ... চোখদুটো লাল হয়ে উঠেছে কারিয়ার, নতুন বাচ্চা হবার সব লক্ষণ তার দেহে আর হাবভাবে সুস্পষ্ট। কুকুরছানাটাও তার পিছনে পিছনে হাঁস-ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বেজিটি ভয়ে পালিয়েছে। তবু কারিয়ার হাঁক-ডাক, লাফ-ঝাঁপ থামে না। ...ভারে ঝুলে পড়া বুক প্রায় মাটিতে এসে ঠেকেছে। চলন্ত অবস্থাতেও কুকুরছানাটা কারিয়ার বুক চাটা ছাড়ে নি। ... কিন্তু ওকি? ...ঠিকই তো তাই! ... কোনো ভুল নেই। ... এ কি করে সম্ভব হল! ... ওরা দুটোতে আবার ঢুকে গেল হাঁসের ঘরে। ... অবাক হয়ে গেল পরসাদী। জন্তুজানোয়ারদের যে এরকম হতে পারে, সে কথা তার জানা ছিল না। মনচনিয়া কি দেখেছে? মনচনিয়াকে খবরটা দেবে নাকি? পরসাদীর তো ইচ্ছা হচ্ছে, পাড়ার লোকদের ডেকে এনে তামাসাটা দেখায়, কিন্তু সে উপায় যে নাই। তার মুখ যে বন্ধ।...

হরদা-হাটে যাবার পথে মনচনিয়া কথা তুলেছিল কুকুর দুটোর সম্বন্ধে। খেতে ডাকলেও আজ কারিয়া হাঁস-ঘর থেকে বার হয় নি; না খেল নিজে, না খেতে দিল বাচ্চাটাকে। বাচ্চাটার জন্যই ভাবনা বেশি। ...

"আরে, না খেয়ে কি কেউ থাকতে পারে।" বলি বলি করেও এর চেয়ে পরিষ্কার করে কথাটা বলতে পারল না পরসাদী মনচনিয়াকে! কিন্তু মনচনিয়া বোঝে তবে তো। বুঝল কই!...

বাড়ি ফিরতে বিকাল হয়ে গেল। অতটুকু বাচ্চাটা সারাদিন না খেয়ে রয়েছে, এ এক দারুণ অস্বস্তি মনচনিয়ার। টিনের কৌটোর ঢাকনিটা নিয়ে সে গেল হাঁস-ঘরের দিকে।

"বাচ্চা! বাচ্চা! আ-তু-উ-উ আয়! কুর্-কুর্-কুর্-কুর্-কুর্-কুর্!"

পরসাদী ঘরের ভিতর থেকে বলে — "ও আর এসেছে!"

সত্যই বাচ্চাটা এল না।

ঘুলঘুলির মধ্যে দিয়ে মুখ বার করে ঘেউ-ঘেউ করে ডাকছে কারিয়া। দাঁত বার করে যেন কামড়াতে আসছে।

"তুই ডেকে মরছিস কেন! চুপ কর!"

হাত বাড়াতেই ক্ষেপে বেরিয়ে এল কারিয়া। চেনা কারিয়া নয়, এ একেবারে অন্য মূর্তি। ব্যাপারটা ভালোভাবে বোঝবার আগেই, শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে সে। আঁচড়ে, কামড়ে, ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতে চায় মনচনিয়াকে। মনচনিয়া ছিটকে গিয়ে পড়েছে লাউগাছটার উপর। পরনের কাপড় ছিঁড়ে কুটিকুটি হয়ে গিয়েছে; হাতের একটা জায়গা থেকে রক্তের ধারা বইছে, পরসাদী এসেছে হৈ-হৈ করে লাঠি নিয়ে; কিন্তু মনচনিয়ার এসব দিকে খেয়াল নাই। হাঁস-ঘরের ঘুলঘুলির মধ্যে ঢুকে যাবার সময় পর্যন্ত সে কারিয়ার বুকের দিক থেকে নজর ফেরায় নি। .. দুধ এসেছে কারিয়ার বুকে! ... ওই গরম, ভিজে, থলথলে মাংসপিণ্ডের ভার তার হাতের উপর পড়েছিল যখন কুকুরটা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ... হ্যাঁ ভিজে। দুধ গড়াচ্ছিল কারিয়ার বুক থেকে। ... এখনও দুধ লেগে রয়েছে হাতের সেই জায়গাটাতে।

তার নিজের অভিশাপের বোঝা জগদ্দল পাথরের চেয়েও ভারী হয়ে উঠেছে।

মা

অমরেন্দ্র ঘোষ

বর্ষা পড়তে না পড়তেই কৃষক-জীবনের আর এক অধ্যায় শুরু হয়।

— মানুষ রাখবে গো?

কি ক'রে, ধান-চালের মত খরিদ ক'রে নাকি?

দুপুর গড়িয়ে গেছে। কিন্তু কাঠ-ফাটা রোদ্দুরে চিলগুলো পর্যন্ত টা-টা করছে। রাখালী লাল আমনের ভাত মেখে নিয়েছিল বেশ লঙ্কা কটকটে ক'রে। মুখে দেবে এমন সময় শুনল শুষ্ক কণ্ঠ। নোলায় তার জল এসেছিল, তবু সে থালাখানা ঠেলে রেখে বেরিয়ে এল।

তারই প্রায় সমবয়সী একটি ছেলে।

এট্টু জল খেতে দেবে?

রাখালী ত্বরায় ভিতরে স'রে গেল, তার কাপড়-চোপড় গোছানো ছিল না। সে গলা শুনে গুছিয়ে আসবার অবকাশও পায়নি।

হাত ধুয়ে রাখালী জল নিয়ে এল।

তুমি এট্টুখানি বস, মা আসছে। — রাখালী আবার ভিতরে চ'লে গেল বটে, কিন্তু ভাত খেতে পারল না।

কি রে, অমন ক'রে চেয়ে দেখছিস কি? — খিড়কির দিক থেকে মা এসে ঢুকে অনুযোগ শুরু ক'রে দিল। এত দাম চাল এই আকালের বাজার — ভাত ফেলে —

চুপ। বেরিয়ে দেখ না, কে এসেছে যেন।

কে গা তুমি? দিব্বি ছেলেটি তো! তোমার বাড়ি কোন্ গাঁ?

তোমরা মানুষ রাখবে? বাড়ি ঘরের কথা শুনো। আমি গরু-বাছুর চরাব, ক্ষেত খামারের কাজ করব, দরকার হ'লে গরুর গাড়িও চালাতে পারব। যে ঘরে যখন থাকি তাদের মাছ-মাংসের অভাব হয় না। আমি ফাঁদ পেতে ডাহুক ধরতে জানি।

রাখালী শিউরে ওঠে — ডাহুক!

তার মা বলে, এত গুণ বাছা তোমার ঐটুকু শরীরে! কিন্তু আমাদের যে মানুষ রাখার ক্ষেমতা নেই। জন পুষতে পারে নন্দ।

তবে আমি উঠি।

তা আমি কি বলব বাছা! এই ভর-দুকুরে —

ছেলেটি চোখের আড়াল হতেই রাখালী তর্জন ক'রে উঠল, বলি তুমি ক্যামন মানুষ মা, এই অসময়ে —

ঘরে কি আছে যে, খেতে বলব?

কেন, আমি তো এখনও খাই নি — পাতিলে তো ভাত রয়েছে এক কাঁড়ি।

তুমি আবার চাইলে এক্ষুনি কোথায় পাব?

শুদ্ধু নঙ্কা বাটা দিয়ে আমার আর রোচে না, ঐ তো রয়েছে গো — আমি আর খাব নি।

অগত্যা ছেলেটিকে ডেকে আনল মানদা। বেশি পেড়াপিড়ির দরকার হ'ল না। ছেলেটি খেয়ে উঠল।

একটু আরাম কর। সন্ধ্যে নাগাত দেখা যাবে তোমার কোনও ব্যবস্থা হয় কি না। তোমার নাম কি?

হারু সদ্দার।

একখানা গামছা দোসর ক'রে হারু এখানে এসেছে। সেইখানা সিথানে দিয়ে মাটির ওপবই দিব্যি টান টান হয়ে শুয়ে পড়েছে। রাখালী কৌতূহলে মাঝে মাঝে চেয়ে দেখছে বেড়ার ফাঁক দিয়ে। হারু একটা বিড়ি বের ক'রে উশখুশ করতে লাগল।

বাঁশের চিমটে দিয়ে একটা জ্বলন্ত অঙ্গার ছুঁড়ে দিল রাখালী দাওয়ায়। ছুঁড়ে দিয়ে সে হাসতে লাগল খিল খিল ক'রে। 'ওমা, বারো হাত কাঁকুড়ের মুখে তেরো হাত বিচি।'

সত্যই বিড়িটা একটু অস্বাভাবিক রকম বড়।

শ্রমের মূল্য চিরদিনই স্বীকৃত। আজ না হয় বিকৃত হয়েছে কতিপয়ের স্বৈরাচারে, তবু হারুর একটা কাজ জুটল। ঘব-পিছু এক-এক বেলা খাবে এবং গরু চরাবে গাঁয়ের সকলের।

কি যেন কি ভেবে মানদা ওর শোয়ার ভার নিল।

হারু গরু চরায় আর হারুকে চরায় রাখালী। লজ্জা ভাঙতে কদিনই বা লাগে?

একটা মৃতা নদী বিধবার সিঁথির মত প্রকাণ্ড মাঠটাব বুক চিরে আকাশ ও প্রান্তবের সন্ধিস্থল পর্যন্ত বিস্তৃত, বিক্ত তবু অনবদ্য।

বর্ষাকালে পাঁচ বৈঠার ডিঙিও উজান ঠেলে উঠতে হিমসিম খেয়ে যায়। এখন স্রোতহীন। কেউ বলে, মরখালী — কেউ বলে, ডাঙা।

ও-সাঁকোটার ওপর উঠিস নি রাখালী। পুরানো বাঁশ ভেঙে পড়বি। ডাঙায় জল অল্প, হেঁটে পার হ।

বেশ করব। তোর তাতে কি? হাত পা ভাঙলে আমার ভাঙবে।

বলতে না বলতেই একটা শব্দ হ'ল।

হারু হেসে উঠল হোঃ-হোঃ ক'রে।

পব মুহূর্তেই তার ভয় হ'ল, অন্তর গেল শুকিয়ে। সে ছুটে এল মবখালীর পার পর্যন্ত। কি হ'ল বে বাখালী?

তোর কথাই রাখলাম ভাই, হেঁটে পার হচ্ছি ডাঙা।

কিন্তু রাখালীব ওঠার উৎসাহ নেই। সে একবুক জলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িযে আল্পনা আঁকে, ধানের শীষ, লক্ষ্মীব পা, আকাশেব তারা — তার আঙুলগুলোর গতি কখনও মন্থর, কখনও দ্রুত। যখন মনেব মত হয় না, তখন মুছে ফেলে দিয়ে ফের আঁকতে শুরু করে।

মাঠের গরু বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, তবু হারুর হুঁশ হয় না। সে রাখালীকে দেখে, না, তার রূপ দেখে — তা প্রকাশ ক'রে বলতে পারে না।

অনেক গঞ্জ মাঠ ঘাট সে পাড়ি দিয়ে এখানে এসেছে। বহু দৈন্যের কশাঘাত রয়েছে তাব বুকে। সেই সব ঘায়ের ওপব যেন প্রলেপ পড়ছে অমৃতের।

কোন সময় যেন দুজনার চোখাচোখি হয়ে যায়। দুজনেই লজ্জা পায় অত্যন্ত। রাখালী কাপড় সামলে উঠে চ'লে যায় বাড়ির দিকে। হারু খুঁজে খুঁজে একত্র করে পাল-ছাড়া গরুগুলি।

হয়তো কিছুক্ষণ বাদেই শাড়ি বদলে অথবা আধা শুকনো শাড়ি প'রেই রাখালী ফের উদয় হয়। তাবপর —

এখনও মোড়লদের বক্‌নাটা পাই নি, একটু সবুর কর্ ভাই।

রাখালী বলে, তবে আমি চললাম।

কথায় কথায় অত রাগ করলে আমি কি করতে পারি বল্? আমার চাকরি আগে, না, তুই আগে?

আমি। — ব'লে নির্লজ্জা রাখালী টেনে আনে হারুকে।

ওরা দুজনে একটা গাছতলায় ব'সে পড়ে।

তারপর?

আমি বললাম, অত মার খেয়ে আমি চাকরি করতে পারব নি। চায়ের দোকানী আমায় একটা আন্ধার ঘরে দরজায় তালা মেরে রেখে দিলে। আমি কান পেতে শুনি যে খদ্দেরদের কাছে বলছে — আমি নাকি চুরি ক'রে রোজ দুধ খাই। সর বিক্রি করি চুপে চুপে। সেই জন্যেই এই সাজা। মজা ক'রে হাসতে লাগল সব্বাই, বললে, এমন শিক্ষে দেবেন যে, ও যেন বাপের নাম ভুলে যায়।

বলিস কি হারু? মানুষের মুখ দিয়েও এমন কথা বের হয়?

আমি কাঁদলাম জোরে জোরে। খদ্দেরেরা হাসল আরও জোরে। আমি চুপ করলাম। খুঁজতে লাগলাম বেরিয়ে যাওয়ার পথ।

পেলি?

না।

রাখালী জিজ্ঞাসা করে রুদ্ধশ্বাসে, এখানে এলি কী ক'রে?

সেই তো মজার কথা, শোন্ বলি। যখন আমাকে আবার শাসাতে এল, আমি কি করলাম জানিস? দোকানীর হাতে একটা কামড় দিলাম পাগলা কুকুরের মত, ওর হাত থেকে লাঠিটা প'ড়ে গেল। অমনি জামাটা নিয়ে আমি দিলাম ছুট।

রাখালী হাততালি দিয়ে উঠল। বেশ করেছিস, বেশ করেছিস তুই দিয়েছিস উলটে শিক্ষে।

কিন্তু আমায় যে একটা ধাক্কা দিলে, সামনে গরম জল টগবগ ক'রে ফুটছে, পিছনে দোকানী।

রাখালী আবেগে তাকে জড়িয়ে ধরল, যেন উদ্ধার ক'রে দেবে পাশ কাটিয়ে।

হারু হেসে বললে, ভয় নেই রে, আমি কি মরার ছেলে?

হারুর মুখের দিকে খানিক একদৃষ্টে চেয়ে বললে রাখালী, তোর বাবাকে দেখেছিস?

না।

মাকে?

তাকেও দেখি নি রাখালী। — একটু গলাটা যেন ভিজে উঠল হারুর।

তারপর বুঝি এখানে এলি?

হারুর অনেক কিছু বলার থাকলেও শুধু চুপ ক'রে চেয়ে রইল রুদ্ধ কণ্ঠে।

এই পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালকের জন্য মমতায় দ্রবীভূত হযে গেল রাখালীর বুকখানি। বয়সে ছোট হ'লেও ওর মনে হতে লাগল, ও-ই যেন বড়। ওকেই যেন মেনে নিতে হবে হারুর যাবতীয় স্নেহের দাবি।

মনের আনন্দে গরুগুলো মাঠে চরছে। দু-একটা চোখ বুজে জাবর কাটছে। সময় গড়িয়ে যায় অনেকটা।

রাখালী উঠে দাঁড়ায়। — হারু, মাছ ধরবি নি?

হারু তড়াক ক'রে লাফিয়ে ওঠে। — সে কথা আর বলতে! কিন্তু ততক্ষণ গরুগুলো কে সামলাবে?

রাখালী পাচনবাড়ি হাতে নেয়। কেন, আমি রয়েছি, তোর ভাবনা কি? সে বিনা কারণেই একটা বাড়ি কষিয়ে দেয় একটা বলদের পিঠে। বলদটা ছুটে পালায়।

এই বুঝি গরু সামলানো হচ্ছে? শুধু শুধু বেছে বেছে মারা হচ্ছে আমার তিন কুড়ি টাকার নয়ালী বলদটাকে?

হারুর কান এসে ধরে নন্দ।

সেদিন রাত্রে রাখালী অনেক গালমন্দ শোনে তার মায়ের কাছে।

দেশের প্রধান নন্দ। সবাই তার কথা শোনে। অতএব রাখালীর মায়েরই বা না শুনে উপায় কি?

দেখ্ রাখালী, নন্দ দেখতে সুন্দর, টাকাকড়ি জমিজমা আছে বিস্তর।

তাতে আমার কি? আমায় চোখ রাঙাবে কোন্ সাহসে?

চোখ তো রাঙায় নি, দুটো ভালো কথা বলেছে। নিষেধ করেছে যার তার সঙ্গে আগানে-বাগানে ঘুরতে।

কেন ও নিষেধ করবে, কেনই বা আমি মদখোর মাতালের কথা শুনতে যাব? ইচ্ছে যায়, তুমি গিয়ে ওর পায়ে ধর।

চুপ চুপ। নন্দ শুনে ফেললে আর রক্ষে থাকবে নি। যে বদরাগী মানুষ।

তবু তো তুমি ওর ব্যাখ্যায় পঞ্চমুখ! — কি সুন্দর, কত পয়সা। তোমার ইচ্ছেটা কি বল তো মা?

মানদা জবাব দেয় না, কিন্তু রাখালী একটা কিছু অনুমান ক'রে নিয়ে চমকে ওঠে।

ঘরে একটা বউ রয়েছে — বেশ সুন্দরী, তাকে যে কি জ্বালা দেয় নন্দ! ধান চাল নিয়ে প্রায়ই শহরে যায় ব্ল্যাক করতে। রাত্রে ফিরে আসে তাড়ি নয়তো মদ্ খেয়ে। তারপর শোনা যায় বউটার আর্তনাদ।

নিষেধের বন্ধন যত দৃঢ়ই হোক না কেন, তাতে রুখতে পারে না রাখালীকে। ও ঠিক সময়মত গিয়ে হাজির হবেই হারুর কাছে। অন্তত ভর-দুপুরে তো নিশ্চয়ই।

হারু জোরে জোরে শিস টানে।

রাখালী পাগল হয়ে সাড়া দেয়।

মাছ ধরা, ডাহুকের ফাঁদ পাতা, কিছু বেতের ফল সংগ্রহ করা — বহু পরিকল্পনা ওদের মুলতুবি প'ড়ে থাকে। আকস্মিক সমস্যায় ওরা বিব্রত।

আচ্ছা ভাই, তুই তো অনেক দেশ-বিদেশ ঘুরেছিস! চল্ না আমরা পালিয়ে যাই।

তাই চল্ রাখালী। এরা লোক ভাল না।

কি ক'রে আমরা যাব? যদি কেউ দেখে ফেলে?

হুঁ, দেখে ফেললেই হ'ল আর কি! কেন, দিক্ রাত্তিরে যখন সব্বাই ঘুমিয়ে থাকবে, তখন আমি বেড়ায় টোকা মারব, তুই চুপি চুপি উঠে আসবি।

কি ক'রে আমরা খাব?

দুজনে মিলে খাটব। ইচ্ছে থাকলে কাজের অভাব হয় না।

কোথায় থাকব?

কেন, গাছতলায় হাটে গঞ্জে বন্দরে — যেখানে যখন সুবিধে হবে।

ওইটে আমি পারব নি। ভিখিরীর মত খোলা মাঠে শোয়া চলবে না। খাই না খাই, রাত্তিরটা একটু ভাল জায়গায় কাটাতে চাই।

আচ্ছা, তাই হবে রাখালী। যেখানে যখন থাকি, লতাপাতার কুড়ে তুলে নেব। আমার সাথে তুই যোগান দিলে কতক্ষণের আর কাজ? হারু প্রশ্ন করে, তোর ভারি লজ্জা, তাই বুঝি বাইরে শুতে চাস নি?

লজ্জা, না, হাতি! — রাখালী আচমকা চুমো খায়, আচমকাই উঠে পালিয়ে যায় বাড়ি।

হারুর অস্থিমজ্জা কেমন যেন ভয়ে বিস্ময়ে সঙ্কোচে কাঁপতে থাকে।

সেদিন রাত্রে হারু আর বেড়ায় টোকা দিতে সাহস পায় না।

পরদিন রাখালী বলে, এই বুঝি মদ্দানি!

না রে, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

আচ্ছা, আজ তা হ'লে দেখা যাবে।

সেদিন রাখালীর আর ঘুম ভাঙে না।

কি রে, কাল যে আমায় কত কি বললি; কিন্তু নিজে কি ক'রে ঘুমিয়ে রইলি কুম্ভকন্নের মত?

লজ্জায় শরমে রাখালী রাঙা হয়ে জবাব দেয়, আচ্ছা, তবে ভাই আজ।

এমন একটা নাটকীয় পরিকল্পনা হঠাৎ বানচাল ক'রে দেয় রাখালীর মা। হারু যখন টোকা মারতে যাবে বেড়ায়, সে দেখে যে লম্ফটা জ্বালানো রয়েছে। রাখালীও সজাগ।

মা! মা!

হারু দাওয়া ছেড়ে ভিতর ঢুকল। কি হয়েছে রে রাখালী?

রাখালী ডুকরে কেঁদে উঠল।

মানদার চোখ কপালে উঠেছিল হৃদ্‌পিণ্ডের ব্যথায়। সে হাঁপাতে হাঁপাতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করল। এ রোগটার আক্রমণে সে মাঝে মাঝেই কাবু হয়ে পড়ত, কিন্তু আজ আর রেহাই পেল না।

শব দাহ ক'রে বাড়ি ফিরে এসে হারু দেখল, তার আগেই রাখালীকে সান্ত্বনা দিতে সবাই এসেছে। আহা-উহুর অন্ত নেই। কিন্তু এখন ওর কি ক'রে চলবে — সে কথা কেউ বলছে না। শুধু খাওয়া নয়, বয়স্থা মেয়ে, একজন অভিভাবিকারও সজাগ দৃষ্টির প্রয়োজন। একটা মাস অশৌচ। তারপর পুরো একটি বছর কাল-অশৌচের ধাক্কা। মাত্র ভুঁই রয়েছে দশ কাঠা, কিন্তু যতদূর সে জানে — ঘরে চাল নেই এক ফোটা।

এমন সময় গয়লা-মাসী এল।

এই পনর সের আতপ আর ঘি এক বোতল পাঠিয়ে দিয়েছে নন্দ।

উপস্থিত সবাই বললে, একেই বলে — বড়মানুষের কলিজা, নইলে কি গরিব বাঁচে?

কেউ বললে, ঈশ্বর যে রয়েছে তা আর আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হয় না, এই দেখ না একেবারে পেত্যক্ষ।

নিধিরাম বললে, একটু নেশা-ভাঙ করলে কি হয়, লোকটার বিচার-ব্যবস্থাই আলাদা।

অবশেষে সকলে একত্র হয়ে নন্দর সদ্‌গুণের ফিরিস্তি দিতে আরম্ভ করলে।

এ সব শুনে হারুর গায়ে কে যেন বিছুটি বুলিয়ে দিতে লাগল। সে হাত কামড়াবে, না, পা কামড়াবে — কিছুই স্থির করতে পারে না। সে ভিজে কাপড়ে পায়চারি করতে লাগল উঠনময়।

এগুলো কোথায় রাখব? — প্রশ্ন করে গয়লা-মাসী।

রাখালী বলে, দাওয়ায় তুলে রাখ।

হারু আর দাঁড়াতে পারে না। সে ছুটে মাঠের দিকে যায় এবং সপাং ক'রে একটা ব্যর্থ আঘাত কষিয়ে দেয় নন্দর সেই নয়ালী গরুটাকে লক্ষ্য ক'রে।

রাত্রে শুতে এসে হারু গুম মেরে ব'সে থাকে। রাখালীর একা একা ঘরের ভিতর ভয় করছে, না, কেমন লাগছে — তা জিজ্ঞাসা করার সে প্রয়োজন বোধ করে না। বাইরে দাওয়ায় যে একজন মানুষ আছে, তাই সে জানতে দিতে রাজী নয়।

রাখালী চালের বাতার দিকে চেয়ে বলে, মানুষ বিপদে পড়লে নিতান্ত আপন জনও পর হয়।

হারুও একটা খুঁটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে বলে, তা উপায় কি! জল ঘুলিয়ে খেলে পাঁক উঠবেই।

জল ঘুলিয়ে খেলাম, না, থিতিয়ে খেলাম — তা তো দেখতে হয়।

পরোক্ষে জবাব আসে, না দেখে কি কেউ কিছু বলে?

এবার দরজা খোলে রাখালী। — তুই আমার কি দেখেছিস রে হারু? মা মরল কাল, আর আজই তুই যা-তা বলছিস?

বলব না? বলছি কি মিছিমিছি? ওই দেখ্ দূতী এয়েছেন।

গয়লা-মাসী এসে বলে, একটু দেরি হয়ে গেল মা, তা তো হারু সদ্দারই এখনও জেগে রয়েছে — ভয় কি, মা কখনও অপদেবতা হয়ে মেয়ের কাছে আসে না।

কিন্তু যারা মা মরলে অপদেবতা হয়ে আসে, তাদের চেনা বড় দায়। বলতেই বলে— মাসীর মায়া।

রাখালী জবাব দেয়, দেখ্ হারু, তুই বাউণ্ডুলে ভূত; তোর মুখে অত বড় কথা ভাল শোনায় না। এ অসময়ে যদি কেউ আঙুল তুলে দেখায়, তা অগ্রাহ্যি করা আমার সাজে নি।

মা ম'রে স্বাধীন হয়েছিস বুঝি! একদিনেই এই।

তোকে দেখে আমি পেথম দিনই বুঝেছিলাম, বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি মুখে দেখে। আজও তেমনি বড় বড় কথা বলছিস। আমার বাড়ি, আমার ঘর, আমার যা খুশি আমি তা করব, তাতে তোর মত গরুর রাখালের কি?

রাখালী সশব্দে দরজার ঝাঁপ বন্ধ করল।

হারু নিঃশব্দে উঠে গেল দাওয়া ছেড়ে।

ঘটনা আরও একটা ঘটল উপরোক্ত সমস্যাটা মীমাংসা হওয়ার আগে।

কি করব মাসী?

যখন নিয়ে এয়েছ মনের টানে, তখন পালতেই হবে। কুকুর-বেড়ালও তো কেউ ফেলে দিতে পারে না, আর এ তো মানুষ। ভগবানের লীলা বোঝাই ভার। আমি দেখছি একটু একটু ক'রে তোমার পথ খোলতাই হচ্ছে।

কি বললে মাসী?

বললাম যে — । একটা ঢোক গিলে ফের মাসী আরম্ভ করলে, কপালে রাজরাণী হওয়া লেখা থাকলে, ঘুম থেকে উঠেই তুমি দেখতে পাবে যে, তোমার কুঁড়ের দুয়ারে রাজার হাতী।

বুঝলাম না তোমার হেঁয়ালী।

বুঝেছ যা ঠিকই, তুমি অত বোকা নও। আচ্ছা, যদি না-ই বুঝে থাক, সময় ফিরলে টের পাবে, কিন্তু তখন কি এ গরিব মাসীর কথা মনে থাকবে?

মাসী হেসে বিদায় নেয়।

রাখালী কাঁদতে বসে।

এ সে কি করছে? জমি দশ কাঠা বাঁচাতে গিয়ে নন্দর সাহায্য গ্রহণ করল। তারপর নানাভাবে ক্রমে সে যে জড়িয়ে পড়ছে শয়তানের ফাঁদে। এই তো কিছুক্ষণ হ'ল সে নন্দর অনুরোধে নিয়ে এল তার সদ্যভূমিষ্ঠ হওয়া ছেলেটাকে। বউটি নাকি ভীষণ অসুস্থ। তাই নিতান্ত অনিচ্ছায় ছেলেটাকে নিয়ে এসেছে রাখালী। ছেলের ভালমন্দ কিছুই বলে নি। শুধু হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে দিয়েছে রক্তমাখা ছেলেটাকে।

কিন্তু নন্দর পাপ ও ঘাড়ে ক'রে বহন করবে কেন? সাপের বংশে বিষধর ছাড়া কিছু জন্মায়?

ছেলেটা কেঁদে ওঠে চিৎকার ক'রে। রাখালী দুম ক'রে ফেলে দেয় মাটিতে। কিন্তু তখনই কোলে তুলে নিতে হয় ওর দুর্বল অসহায় বার বার আকুতি দেখে।

যোগাড় করতে হয় সলতে দুধ মিষ্টি ইত্যাদি।

ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়ে। রাখালী ধীরে ধীরে ওকে কোল থেকে নামিযে শুইয়ে রাখে একখানা নরম কাঁথার ওপর। যেন একটা ফোটা-ফুল। ও চোখ ফেরাতে পারে না। কেমন তুলতুলে মুখখানা, কেমন নরম নরম কচি আঙুলগুলো!

দুপুরবেলা ওর মনে হয়, বউটাকে একবারটি দেখে আসা রাখালীর কর্তব্য। ছেলেটাকে কোলে তুলে নেয়। এই সুযোগে সে ফেলে দিয়ে আসবে নন্দর পাপটাকে।

রাখালী এবার তলিয়ে দেখলে, হারু যে রাগ করেছে তা একেবারে মিথ্যা নয়। তাব সঙ্গে অতটা বচসা করা তার উচিত হয় নি। কিন্তু হারুরও কি উচিত হয়েছে একেবারে বাড়ি ছেড়ে চ'লে যাওয়া?

গেল কোথায় হারু? যেখানেই যাক, রাগ পড়লে এখানে না এসে পারবে না। কি জানি, কি অধিকারে রাখালী এই প্রত্যাশায়ই বুক বাঁধে?

রাখালী দোরগোড়ায় পা দিয়েছে, এমন সময় সংবাদ এল — নন্দর স্ত্রী মারা গেছে, নন্দ ফেরার।

আমি কিন্তু আর পারব নি মা, তোমায় রোজ রাত্তিরে এসে আগলাতে।

ও মাসী, বল কি? এ ছেলে নিয়ে আমি করব কি?

যেমনি শখ ক'রে এনেছ, তেমনি সুখ ক'রে দুধ খাওয়াবে। সাপেব ছা বড় হ'লে -- বুঝতেই তো পারছ, যা করার তা করবে।

রাখালী দাওয়ায় ব'সে পড়ে। মাসী চ'লে যায় দমদম ক'রে।

প্রতিদিনের মত সন্ধ্যা হয়। ধীরে ধীরে আঁধার নামে ঝোপে-ঝাড়ে বাঁশ-তেঁতুল গাছের অন্তরালে। গোচরণ ভূমি অস্পষ্ট হয়ে আসে একটু একটু ক'রে। শেষে সর্বত্র কালি লেপটে যায় — শুধু জ্বলে জোনাকিগুলো।

হারুর কণ্ঠস্বরের জন্য প্রতি মুহূর্তে অধীর হয়ে কাটায় রাখালী। সারাদিন দেখা দেয় নি, তা কোনো রকমে সহ্য করেছে, কিন্তু এখন আর একটি মুহূর্তও ওর তর সয় না।

কি রে, তোর মাসী এল?

রাখালী থরথর ক'রে ওঠে। হারু যে আসবে — এ কথা তার কাছে চন্দ্র-সূর্যের মত সত্য, তবু সে সহসা জবাব দিতে পারে না।

হারু আবার জিজ্ঞাসা করে।

রাখালী বলে, তুই তো সবই শুনেছিস, আব জিজ্ঞেস কবিস কেন? নন্দ চরম শত্রুতা ক'রে গেছে। এখন এ পাপ নিয়ে কি করি বল্ তো?

একটা কড়া জবাব মুখে এসেছিল হারুর, সে অতি কষ্টে সামলে যায়। নিজের মাদুরখানা বিছায় অন্যমনস্কভাবে। কথা বলে না অনেকক্ষণ। তার পর বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়ে।

রাখালী ডাকে, হারু!

কোনোও জবাব নেই।

গভীর রাত্রে ছেলেটা প্রাণ-ফাটা আর্তনাদ করতে থাকে।

ও কি রে রাখালী, ঘুমুচ্ছিস নাকি?

তোর কি মনে হয়?

তা হ'লে ও কাঁদছে কেন? গলা শুকিয়ে গেছে নিশ্চিত।

পলতে ভিজিয়ে তো খাওয়ালাম, এখন তুই এসে একটু গলাটা ভিজিয়ে দিয়ে যা না।

ঠাট্টা নয় বে, অত চেঁচালে ম'রে যাবে।

হারু ঘরের ভিতর এল, কিন্তু তাতে যেন কিছু লাভ হ'ল না। ছেলেটার উদ্যম যেন উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। অবশেষে হারু কোলে নিয়ে দোলা দিতে লাগল। রাখালী যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

কিছু সময়ের মধ্যেই অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে হারু সর্দার। নে নে, ধর্ রাখালী, আমি পারব নি ভাই ওকে ঠাণ্ডা করতে।

খুব বাপের মত তো শাসাচ্ছিলি। — রাখালী বাইরে গিয়েছিল, দরজা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ কবল। — আব একটু সময় দাঁতে দাঁত চেপে থাক্।

না না, আমি এই নাক মলা, কান মলা খাচ্ছি, তুই শীগগির নে ওকে।

তা কি হয় ভাই, একটু ক'ষে-ম'ষে থাকতেই হবে কিছুক্ষণ। আমি রান্নাঘর থেকে এলাম ব'লে।

তাড়াতাড়ি রাখালী একটু কি যেন পাতার রস ক'রে নিয়ে আসে। বালককে খাইয়ে দেওয়া মাত্র সে চুপ করে।

কি আশ্চয্যি, তুই কি ধন্বন্তরি?

তুই মানিস কই, এই তো দুখ্খু! — রাখালী হাসে। — যদি ভক্তি ক'রে আমার হাতের একটা ফোঁটাও ওষুধ খেতিস তবে তোর মাথাটা কি অত গরম হতে পারত!

খুব ধীরে ধীরে হারু জবাব দেয়, এবার খাব, তোর ওষুধের জব্বর গুণ দেখলাম কিন্তু। সোয়াদ না জানি কত মধুর!

একটু মুখে দিয়ে দেখ্ না, ঐ তো ঝিনুকে রয়েছে, ঠিক করলার মত। — বাঁকা চোখে তাকায় রাখালী।

শ্রাদ্ধ অন্তে আরও দুটো মাস গত হয়ে যায়, নন্দ ফেরে না। তার মনে রয়েছে পুলিসের ভয়। গ্রামের অনেককেই সে বিশ্বাস করতে পারে না। হয়তো কেউ এজাহার দিয়েছে তার নামে। ঘটনাটা তো মিথ্যা নয়।

এখন ওরা ঐ ছেলেটাকেই কেন্দ্র ক'রে হাসে, খেলে, সময় কাটায়, হৈ-চৈ করে। ওদের উভয়ের প্রতি উভয়ের আকর্ষণ যেন চুম্বকের মত হরণ ক'রে নেয় এই সুকুমার শিশু। হারু এসে ওকে না দেখে থাকতে পারে না, রাখালীর তো হয়েছে গলার মালা। তবু মাঝে মাঝে রাখালী দাঁত-খিঁচুনি দেয়। হারু বলে, ওর দোষ কি, ও তো অবুঝ!

আর তুই বুঝি ভাবিস, তুই খুব সেয়ানা? এ কিসের ঝাড় তুই বোধ হয় ভুলে গেছিস।

ওর দুষ্টু বুদ্ধি হাড়ে হাড়ে। — রাখালী একটা সদ্য-তোলা করবী ফুল ছেলেটার মুখের কাছে ধরে। ও চোঁ-চোঁ ক'রে মধুটুকু চুষে খায়। ফুরিয়ে গেলে হাত পা ছুঁড়ে কাঁদতে থাকে।

দেখলি তো স্বচক্ষে।

দেখলাম তো রাখালী, কিন্তু জন্ম থেকে যে মাকে দেখলে না, সে মৌ খেতে শিখলে কি ক'রে?

ধেৎ ফাজিল। রাখালী নিজেকে সম্বৃত ক'রে চ'লে যায়।

দু'-একদিন হারু এসে দুপুরবেলাই হাজির হয়। — এক ঘটি জল দে রাখালী। ও-পাড়ায় আর এই রদ্দুবে যেতে ইচ্ছে করে না।

খাবি কি?

ক্ষিদে নেই।

সে কি রে? যা যা, চান ক'বে আয়। আমি এ বেলাই দু বেলার ভাত বেঁধে বেখেছি, তোব ভয় নেই।

অনেক অনুরোধের পর হারু ওঠে। তোর ভাত কই?

পুরুষ মানুষের অত হাঁড়ির খোঁজে কাজ কি, তুই আগে খেযে ওঠ্ না।

হারু কথা শোনে না। তার থালার ভাত অর্ধেক ভাগ ক'রে অন্য একটা বাসনে তুলে রাখে। রাখালী কত অনুনয়-বিনয় করে, সত্য-মিথ্যা কথা বলে, তবু হারুর বিশ্বাস জন্মাতে পারে না। প্রায়ই হারুর সঙ্গে সঙ্গে ওকেও খেতে বসতে হয়।

দুজনে মহা আনন্দেই আধ-পেটা খেয়ে ওঠে।

এখন চলবে কি ক'রে হারু? বড় জাম গাছ দুটো তো বেচলাম।

ছোটটাও বিক্রি কর্। গোপালের সাথে কথা হয়েছে — রাত্তিবে রাত্তিবে তার জমিব আল বেঁধে দেব, রাস্তাটা মেরামত ক'রে দেব, ও আমাকে রোজ এক সের চাল দেবে। এমনই চলুক না দু মাস, তাব পর তো আউশ উঠছে। ধান এবার ভালই হযেছে।

তা তোর গায়ের-রক্ত-জল করা চালে আমার কি জুড়াবে?

এ কথা তুই কি ক'রে বললি ব'লতো রাখালী? — হারু এমন করুণভাবে প্রশ্ন কবে যে, রাখালীর বুক ব্যথায় টনটনিয়ে ওঠে। সে বার বার মনে মনে ক্ষমা চায়, এমন কথা সে আব কখনও বলবে না। হিসেবের আব যেখানে প্রয়োজন হোক, ওদের ভিতব তা চলে না।

এমনিভাবে আরও বছর দেড়েকের কাছাকাছি গত হয। প্রত্যাশা ও পিপাসাব মধ্যে কেটে যায় দিনগুলি। বালকের ভারসাম্যে ওদের চঞ্চলতা প্রকাশ পায় না।

কিন্তু এক-একদিন ঘুমোতে পারে না রাখালী। সেদিন বেশ জল হচ্ছে বাইরে। দমকা শীতল হাওয়া মাঝে মাঝে ছুটে আসছে ঘরের ভিতর।

মাম্ মা, ওম্ মা। — শিশু দুলে দুলে হাততালি দেবে, নয়তো সারা ঘরময় হামা দিয়ে বেড়াবে। বাসন-কোসন জলের কলসী কোন্‌টা কখন ফেলবে ঠিক নেই।

রাখালী বলে, ডাহুকের ছা, সারা রাত কেবল ঘুট্‌খুট্। নির্নিমেষে চেয়ে থাকতে থাকতে কখন যেন তন্দ্রা আসে। তবু ও ঠায় ব'সে থাকে। বালক ছুটোছুটি করে নিজের মনে। দুধে-দাঁতে যেন চাঁদের ঝিকিমিকি।

রাখালী চোখ বোজে।

হঠাৎ তার হুঁশ হয়। প্রদীপটা কি উলটে গেছে? ঘর যে অন্ধকার? সে পাগলের মত ডাকতে থাকে শিশুকে। হাতড়াতে থাকে সারা ঘরখানা।

দেশলাই জ্বালায় হারু বিরক্ত হয়ে। — আবার কি হ'ল রে?

খোকাকে পাচ্চি নি।

বলিস কি?

হারু বাধ্য হয়ে ভিতরে আসে দ্রুত।

ঘুমন্ত অবস্থায় ছেলেটাকে পাওয়া যায় একটা ধানের ডালার পাশে।

তুই যে কেমন মেয়ে!

রাখালী জবাব দেবে কি, তার দেহের সমস্ত উত্তাপ দিয়ে বালককে উত্তপ্ত করতে চেষ্টা করে। চুমো খায় বারম্বার।

সুখে দুঃখে, আশায় দুরাশায় দিনগুলো বেশ কেটে যাচ্ছে। একদিন ধূমকেতুর মত নন্দ এসে হাজির হয়। তখন প্রহরখানেক মাত্র বেলা হয়েছে।

ছেলেটা উঠনে একা একা খেলছে। নন্দর আকৃতি দেখে সে চিৎকার ক'রে ওঠে।

রাখালী তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে। ছেলেটা তার কোলে চ'ড়ে কেবল বলে, মা, মা, ওম্‌মা —

নন্দ ততক্ষণ লোটা কম্বল চিমটে ও পরচুলা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে, না, আর পারি নে।

বাখালীর মুখ ছাইয়েব মত পাংশু হয়ে যায়।

আমার কি ওসব পোষায়? ছাই মাখা, গ্যাঁজা খাওয়া কি আমাদের মত ভদ্দরলোকের কাজ!

রাখালী কোনও জবাব দেয় না দেখে নন্দ অন্য কথায় চ'লে যায়। দু দিন ভাত খাই নি, দিতে পারিস? ভাত হয়েছে?

বাখালী ভাবে, এখন এর মন জুগিয়ে যত শীগ্‌গির বিদায় করা যায় তত ভাল। বলে, একটা ডুব দিয়ে আয়।

আমরা কি আর তোদের মত! সূয্যি ওঠার আগেই ওসব সারা, গীতাপাঠ পর্য্যন্ত।

রাখালী ঘরে গিয়ে ভাত বেড়ে দেয়। নন্দ গোগ্রাসে গিলে ওঠে। বিশ্রাম করার জন্য সটান শুয়ে পড়ে দাওয়ায় হারুর বিছানার মাদুরটা বিছিয়ে। — দেশের খবর কি? শত্তুরের ভয়ে কি সাজাটাই না ভোগ করলাম! আমার ঘরদোরের কি হাল হয়েছে বলতে পারিস?

রাখালী শুধু 'না' ব'লে চলে যায়।

দুপুরের পর ছেলেটা খেলতে খেলতে তার কচি হাতখানা দরজার ঝাঁপের ফাঁক দিয়ে একটু বের ক'রে দেয় দাওয়ার দিকে।

নন্দ যেন ওৎ পেতে ছিল। সে খপ ক'রে ধ'রে টেনে আনে বালককে। শিশু জুড়ে দেয় আর্তনাদ।

রাখালী উন্মাদিনীর মত বেরিয়ে আসে। ওকে ছাড়্, ছেড়ে দে নন্দ — তোর দুটি পায়ে পড়ি।

কেন বল্ তো, এ ছেলের বাপ কে? অভিভাবক কে? বরঞ্চ তুই যদি আইনত মা হতে চাস, চুপি চুপি আমাব পিছন পিছন চ'লে আয়। টিনের ঘর, গোলা-ভরা ধান, তোর কোনোটার অভাব হবে নি।

রাখালীর কানে কিছু যায় না। সে দেখে যে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে যেন আর কিছু নেই — শুধু দুটি দুর্বল অসহায় মুঠি তার দিকে ব্যাকুল আগ্রহে প্রসারিত।

মাগো, ওমা —

নন্দ যত সবলই হোক না কেন, রাখালী কোনো কিছুর দিকে দৃক্‌পাত না ক'রে কাটারি নিয়ে লাফিয়ে পড়ে। — দাঁড়া, তোকে আইন শেখাচ্ছি।

নন্দ ছেলেটাকে ফেলে পালায়।

সোরগোলে হারু একটা লাঠি নিয়ে ছুটে এসে বলে, বেশ করেছিস।

মহাসংগম

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

পশুপতি থুরথুরে বুড়ো হইয়া পড়িয়াছে।

এই মাঘে তাহার বয়স সাতাশী পূর্ণ হইল। দুটো একটা যুগ নয়, পশুপতি প্রাণপণ চেষ্টায় সাত যুগের বেশি পৃথিবীতে টিকিয়া আছে।

বিপুল, সুদীর্ঘ জীবন!

কিন্তু তার সামনে যে মৃত্যু, সে আরও বিপুল, আরও সুদীর্ঘ। মৃত্যুকে কে ঠেকাইয়া রাখিবে? সাতাশী বছরের আয়ু নয়, সে বরং মৃত্যুকেই কাছে ডাকিতেছে বেশি। পৃথিবীতে যে যতদিন বেশি বাঁচিবে সে তত গিয়া পড়িবে মরণের কাছাকাছি। একদিন দেখা যাইবে তার দেহে তার মনে, তার ক্ষীণ স্পন্দিত প্রাণের জগতে মরণকে যেন অনায়াসে খুঁজিয়া পাওয়া যায়। জীবনেই যেন হইয়াছে জীবনের মরণের মহাসংগম।

পশুপতি বিকল হইয়া পড়িয়াছে, অথর্ব হইয়া পড়িয়াছে। গায়ের চামড়া তাহার বিবর্ণ, লাল, সহস্র কুঞ্চনে কুঞ্চিত। মাথায় কুড়ি বছরের পুরানো চকচকে টাকটি পর্যন্ত তাহার ঢিলা নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে। কানে সে ভাল শুনিতে পায় না। একটি অলৌকিক মর্মরিত জগতে সে বাস করে। বিরাট বায়ুস্তর হইতে কোটি মিশ্রিত শব্দ অহরহ তাহার দুইকানে আঘাত করে, কাছে কলরব করে মানুষ পশু আর পাখি, সব মিলিয়া তার শুধু একটি অবিচ্ছিন্ন চাপা গুঞ্জন ধ্বনির অনুভূতি হয়। বাড়ির লোকে তার সঙ্গে কথা বলে চেঁচাইয়া।

বাড়ির লোকে তাই তার সঙ্গে কথা কয় কম। কত চেঁচাইবে!

চোখে এখনো সে অল্প অল্প দেখিতে পায়, কিন্তু চোখের পাতা দুটি সীসার মতো ভারি হইয়া সর্বদাই তাহার চোখ দুটিকে ঢাকিয়া রাখিতে চায়, টানিয়া খুলিযা রাখিতে তাহার কষ্ট হয়, পরিশ্রমও যেন হয়। ভ্রূ পাকিয়া প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। মুখে আর একটাও দাঁত নাই। চোয়ালের দুপাশ দিয়া গালের গোড়া হইতে দুটি নিস্তেজ নীল শিরা তাহার শীর্ণ গলাটি বাহিয়া নিচে নামিয়া গিয়াছে। মেরুদণ্ডটি তাহার ধনুকের মতো বাঁকা। উঠিয়া দাঁড়াইলে মাথাটি সে কোনমতে নিজের কোমরের লেভেল ছাড়াইয়া উপরে তুলিতে পারে না। দুই হাতে মোটা একটা লাঠিতে ভর দিয়া তাহাকে দাঁড়াইতে হয়। লাঠি না থাকিলে সে মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া যাইবে। দেহের ভারকেন্দ্র তাহার পায়ের আয়ত্তাধীন সীমানা ছাড়াইয়া অনেকখানি সামনে আগাইয়া গিয়াছে।

উবু হইয়া বসিলে তাহার দুই হাঁটু মাথার কাছে ঠেলিয়া ওঠে।

পশুপতি থাকে চাঁদ পুতিয়ার শ্রীমন্ত সরকারের বাড়ি।

শ্রীমন্ত তাহার কেহ নয়। দয়া করিয়া আশ্রয় দিয়াছে। পশুপতির একটি ছেলে ছিল। হয়তো এখনো আছে। কেহ তাহার খবর রাখে না। অনেককাল আগে সে পলাইয়া গিয়াছিল

সেই বর্মামুলুকে। মাঝখানে একবার সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল সেইখানেই বিবাহাদি করিয়া সে সুখে বসবাস করিতেছে। তারপর আর কোন খবর পাওয়া যায় নাই।

শ্রীমন্ত মোক্তার। মফঃস্বলে মোক্তারি করিয়াও অনেকে পাকা দালান তোলে কিন্তু শ্রীমন্ত এখনো সেটা পারিয়া ওঠে নাই। বাড়িটা তাহার বড় কিন্তু কাঁচা। সদরের ঘরটা শ্রীমন্তের মোক্তারি ব্যবসাব জন্য লাগে। অন্দরের ঘরগুলি তাহার দখল করিয়া থাকে নিকটতম আত্মীয়-স্বজন। বাড়ির একেবারে পিছন দিকে রান্নাঘরের পাশে নিচু ভিটাতে একখানা ছোট ঘর আছে। মাঝখানে বেড়া দিয়া ঘরখানাকে দুভাগে ভাগ করিয়া ফেলা হইয়াছে, তার একটা ভাগে কতকগুলি চায়ের যন্ত্রপাতিব সঙ্গে বাস করে পশুপতি।

পাশের ভাগটাতে থাকে কুন্দ, তার দুটি ছেলেকে লইয়া। ধরিলে কুন্দ হয়তো শ্রীমন্তের কেহ হয়, না ধরিলে সে পরের চেয়েও পর। কিন্তু শ্রীমন্ত বোধহয় সম্পর্কটা ধরিয়াই এই খোপটার ঘুঁটেগুলি অন্যত্র সরাইয়া তাঁহাকে থাকিতে দিয়াছে। কাবণ, পশুপতি তাহার পিতৃবন্ধু, মাননীয় ব্যক্তি। পশুপতির পাশের খোপে যাকে তাকে শ্রীমন্ত থাকিতে দিতে পারে না।

রাতটা পশুপতি তাহার ঘরে ছোট একটি চৌকিতে শুইয়া কাটায়। দিনের বেলা ঘরের সামনে সংকীর্ণ দাওয়াটির একপ্রান্তে দুপরল চটের উপর পুরু করিয়া বিছানো একটা কাঁথায় বসিয়া থাকে। পাশে একটা ওয়াড়বিহীন তেলচিটা বালিশ দেওয়া আছে। বসিয়া বসিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িলে কাত হইয়া বালিশে মাথা রাখিয়া সে শয়ন করে।

গ্রীষ্মকালে এখানে থাকে ছায়া। ঘবের ডাইনে সূর্য উঠিয়া বাঁদিকে অস্ত যায়। শীতকালে ঘরেব আড়াল হইতে সূর্য সামনে সরিয়া আসে। বড় ঘরের চাল ডিঙ্গাইয়া, রান্নাঘরের পাশে ঝাঁকালো আমগাছটার মাথার উপর দিয়া সমস্ত শীতকালটা পশুপতির বসিবার স্থানটিতে রোদ আসিয়া পড়ে।

মোটা একটা লেপ গায়ে দিয়াও সমস্ত রাত পশুপতি শীতে হি হি করিয়া কাঁপে, দেহে তাহাব উত্তাপ এত কম যে শীতে হাড়ের ভিতরে পর্যন্ত যেন একটা জ্বালা কাঁপুনি ধরাইয়া দেয়। সকালে তাহার ঘরের সম্মুখ দিয়া যে যায় তাহাকেই সে জিজ্ঞাসা করে, রোদ উঠল গা? হ্যাগো দাওয়াতে বোদ এল, আঁ?'

কাঁপানো জড়ানো গলায় সে সকলের কাছে রোদের, উত্তাপের, জীবনের আবির্ভাবের সুসংবাদটি শুনিতে চায়। কেহ সংক্ষেপে জবাব দিয়া বলে, 'এই উঠল', কেহ নিজের বিপুলতর প্রয়োজনে কিছু না বলিয়াই চলিয়া যায়, কেহ নির্বিকার চিত্তে শোনায় হতাশার বাণী। 'রোদ কি এত সকালে ওঠে? ঢের দেরি এখনও দাওয়ায় রোদ আসতে?'

কুন্দ কোন সকালে উনান ধরাইয়া ডাল চাপাইয়াছে। সে এক সময় আসিয়া বলে, 'কি হাড় কাঁপানো জাড় গো বাবা এ বছর। ছেলে-পুলে মোলো। একটু আগুন দেব গো দাদামশায়?'

আগে রাত্রে শুইতে যাওয়ার সময় উনান হইতে এক মালসা আগুন কুন্দ পশুপতির কাছে রাখিয়া যাইত। কিন্তু একবার মালসার আগুন তাহার বিছানায় লাগিয়া যাইবার উপক্রম হওয়ার পর হইতে এ ব্যবস্থা রহিত হইয়া গিয়াছে। আগুন পোহাইতে গিয়া বুড়ো কি শেষে পুড়িয়া মরিবে। সকালে চারিদিকে অনেক লোক, সে ভয় নাই।

পশুপতি সাগ্রহে বলে, 'দে দিদি, একটুকু আগুন দেত।'

কুন্দ মালসায় করিয়া একটু আগুন পশুপতির কাছে রাখিয়া যায়।

রোদ উঠিলে কুন্দ অথবা তার ছেলে কেশব পশুপতিকে ধরিয়া দাওয়ায় লইয়া যায়। কুন্দর দুবছরের ছোট ছেলেটির মতো সেও যেন অবোধ অসহায় শিশু। বার্ধক্যের গোড়াতেই পিছু চলিতে আরম্ভ করিয়া এখন সে যেন আবার তাহার সেই আদিম অথর্ব শৈশবে গিয়া পৌঁছিয়াছে।

পশুপতি দাওয়ায় বসিয়া থাকে নির্বাক নিস্পন্দ জড়পিণ্ডের মতো। তাহার ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, হৃদয়ে অনুভূতি নাই, মস্তিষ্কে চিন্তা নাই। ঠাণ্ডায় সে ভিতরে বাহিরে জমিয়া গিয়াছে। চোখ বুজিয়া সূর্যদেবতার অন্ত্যজ ভক্তের মতো সে শুধু সবিনয়ে ব্যাকুল আগ্রহে সূর্যকিরণকে সর্বাঙ্গ দিয়া শুষিয়া লইতে থাকে।

সে বাঁচিতেছে। রাত্রে সে একেবারে মরিয়া গিয়াছিল, এখন আবাব বাঁচিতেছে।

দেহে খানিকটা উত্তাপ সঞ্চিত হইলে সে ঘোলাটে চোখ মেলিয়া তাকায়।

প্রভাতে আপন আপন ক্ষুধা তৃষ্ণা হিংসা ও ভালবাসা লইয়া শ্রীমন্তের বৃহৎ পরিবারটি জাগিয়া উঠিয়াছে। মধ্যরাত্রি পর্যন্ত খেলা ও কর্তব্য পালন চলিবে। পৃথিবীর মাটিতে গাছের ডালে, আকাশে সর্বত্র বিচিত্র চঞ্চল প্রাণ। কিন্তু পশুপতির স্থান এই সজাগ উদ্বিগ্ন ব্যস্ততার বাহিরে, দাওয়ার এই কাঁথাটির উপর। তাহার স্তিমিত নিষ্প্রভ জগতে আবছা মানুষগুলি চলাফেরা করে, কেহ কাছে আসিলে মনে হয় কুয়াশার ভিতর হইতে উঠিযা আসিল। মাঝে মাঝে কারো চীৎকার করিয়া বলা কথার দুএক টুকরা কথা তাহার কাছে ভাসিযা আসে, — বহুদূর হইতে ভাসিয়া আসে। পৃথিবীর মানুষের জীবনে, পৃথিবীব আলো শব্দ ও গন্ধে পশুপতির দাবি নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে।

না থাক। পশুপতির বিশেষ কোন ক্ষোভ নাই। সংসারে নিজেকে প্রয়োজনীয় কবিযা রাখিবার উৎসাহও তাহার শেষ হইয়া আসিয়াছে। কতকগুলি অভ্যাস, কতকগুলি নিয়ম এখনো তাহাকে পালন করিয়া চলিতে হয়, সে তাহা অনেকটা যন্ত্রের মতোই কবিযা যায় — প্রায় বিগড়াইয়া আসা যন্ত্রের মতো। জীবনের অসংখ্য বন্ধন একে একে শিথিল হইয়া আসিয়াছে, জীবনের প্রতি মমতাও বুঝি তাহার গিয়াছে কমিয়া, মানুষের প্রতিও। আপনাব বয়সের দুর্বিষহ ভারটা বহিয়া বহিয়া সে বুঝি ভয়ানক স্বার্থপর হইয়া পডিয়াছে। মানুষেব, তাহাকে যে আশ্রয় দিযাছে সেই উপকারী মানুষটি ও তাহার পরিবারের দৈনন্দিন সুখদুঃখেব প্রতি তাহার আসিয়াছে উদাসীনতা।

তবু, ওর মধ্যেই শবীর একটু ভাল থাকিলে সে একটু কৌতূহল বোধ কবে, মনে মনে কি যেন সে ভাবে। ইসারায় শ্রীমন্তকে সে ডাকিয়া বলে, খেঁদির জন্য পাত্র দেখা হচ্ছে? হোক্ ভাল করে খোঁজ-খবর কর বাবা, মেয়ে বড় লক্ষ্মী।

গভীর দায়িত্ব বোধের উপযোগী মুখভঙ্গী করিয়া পশুপতি জবাবের প্রতীক্ষা কবে।

শ্রীমন্তের বয়স পঞ্চাশ পার হইয়াছে। মাথার চুল তাহারও প্রায় অর্ধেক সাদা হইযা আসিল। সে অবাক হইয়া বলে, খেঁদির পাত্র? সাতবছরে পড়ল না মেয়ে এখনি পাত্র কিসের?

কথাটা সে দুবার বলিলে পশুপতি শুনিতে পায়। তার মাথার মধ্যে কেমন একটা গোল বাধিয়া যায়। সায় দিয়া বলে, তা বটে, খেঁদি এখনো ছোট বটে খুব।

নিঝুম হইয়া একটু ভাবিয়া সে আবার বলে, খেঁদি নয় গো, বলছি মুখীর কথা। বলছি মুখীর কথা, তুমি শুনছ খেঁদি। মুখীর কি হলো — পাত্তরের?

যেমন তেমন একটা জবাব দিয়া শ্রীমন্ত তাহাকে বুঝায়। পশুপতির চোখ মিটমিট করে। ক্ষণে ক্ষণে মাথা নাড়িয়া সে শ্রীমন্তের অর্ধেক শোনা অর্ধেক না শোনা কথায় সায় দিয়া যায়।

মুখীর বিবাহের জন্য তাহার চিন্তা ও উদ্বেগের যেন সীমা নেই।

কিন্তু পশুপতির হৃদয় যন্ত্রটি একেবারে বিকল ও অসাড় হইয়া যায় নাই। কুন্দর জন্য তার বুকে মমতা আছে।

হয়তো এই মমতার মর্ম কথাটি এই যে কুন্দর সেবা তাহার প্রয়োজন হয়। কিন্তু সেটা দোষের কথা নয়। মানুষের ধর্মই এই সাতাশী বছর বয়সেও মানুষকে এই ধর্মই পালন

করিতে হয়। সেবা হোক, মমতা হোক, তোষামোদ হোক, অর্থ হোক, দুপক্ষের প্রয়োজন আছে বলিয়াই সংসারে এসবের আদান-প্রদান চলে।

শোয়ার আগে কুন্দ যখন পশুপতির খবর লইতে আসে, রাত্রি তখন অনেক। চারিদিক নিস্তব্ধ। পশুপতি এক একদিন ফিস ফিস করিয়া বলে, দরজা বন্ধ কর দিদি।

কুন্দ দরজা বন্ধ করিলে পশুপতি আরো বেশি ফিস ফিস করিয়া বলে, দেখ তো আছে কি নেই? কুন্দ হাতের ডিবরি নামাইয়া চৌকির তলে উঁকি দেয়। টিনের ছোট তোরঙ্গ চৌকির কোণের পায়ার সঙ্গে দড়ি দিয়া শক্ত করিয়া এখনও বাঁধা আছে, কেহ লইয়া যায় নাই।

পশুপতি শঙ্কিত-হৃদয়ে অপেক্ষা করে। কুন্দ সিধা হইয়া তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলে, আছে দাদামশাই যাবে কোথা? পশুপতি নিশ্চিন্ত হইয়া বলে তোকে দিয়ে যাব দিদি, তোব কেউ নেই তোকেই দিয়ে যাব।

এটা স্তোক বাক্য নয়, টিনের তোরঙ্গটি পশুপতি সত্য সত্যই তাহাকে দিয়া যাইবার কামনা পোষণ করে। কুন্দও যে লোভ না করে এমন নয়। কিন্তু বাক্সে কি আছে পশুপতি স্পষ্ট কবিয়া কিছু বলে না। তাহার ভাসা ভাসা জবাবে এইটুকু বুঝিতে পারা যায় যে, বাক্সে গহনা আছে, অনেক লোভনীয় দামী জিনিস আছে। কুন্দ এতটা বিশ্বাস করে না। কিছু টাকা আছে। দু-একশ। বাক্সটা কুন্দ একদিন সন্তপর্ণে নাড়িয়াও দেখিয়াছে। ভিতরে ঝনঝম শব্দ হয়।

কুন্দর ছোট ছেলেটিকে পশুপতি ভালবাসে।

সকালে দাওয়ায় দুটি মুড়ি ছড়াইয়া কুন্দ ছেলেটাকে তাহার কাছে বসাইয়া দিয়া যায়। খোকার দিকে তাকাইয়া ফোকলা মুখে পশুপতি একটু হাসে। দুটি শুষ্ক শীর্ণ হাত তাহার দিকে বাড়াইয়া দিযা বলে, আ আ—মণি আ—সোনা আ—

বেশ একটু সুর করিয়াই যেন বলে। দু-আঙ্গুলে একটি মুড়ি খুঁটিযা মুখে তুলিতে গিয়া তাহার কচি দাঁতকটি চিক মিক করিয়া খোকাও হাসে।

কিন্তু ওই পর্যন্তই। খোকাকে কোলে করিয়া আদর করিবার সামর্থ্য পশুপতির নাই। হাত বাড়াইয়া ওকে সে ছুঁইতে পারে, ডাকিয়া ডাকিয়া কাছে আনিতে পারে, ওর গায়ে মাথায় বুলাইতে পারে হাত! আর কিছু পারে না।

খোকা টলিতে টলিতে হাঁটিতে পাবে। একদিন সে পশুপতির গায়ের ওপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। খোকা জানিত মা-র মতো পশুপতিও এতে খুশি হইবে এবং যে ভাবেই ঝাঁপ দিবে দুহাতে তাহাকে সে তৎক্ষণাৎ ধরিয়া ফেলিবে। কিন্তু খোকাকে সামলানো দূবে থাক, পশুপতি নিজেই হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া গিয়াছিল।

দুজনেই সেদিন কাঁদিয়াছিল — জীবনের দুই প্রান্তের দুটি শিশু। খোকার কান্না বাড়ির লোকে শুনিয়াছিল আর পশুপতির কান্না দেখিয়াছিল। দন্তহীন মুখখানি হাঁ করিয়া অবলা প্রাণীর মতো সে কাঁদিয়াছিল। সামান্য ব্যথাও সে আজকাল সহিতে পারে না। দেহের কোথাও তুচ্ছ একটি আঘাত লাগিলে বহুক্ষণ অবধি তাহার সর্বাঙ্গ বেদনায় কন কন করিতে থাকে।

অথচ আঘাত মাঝে মাঝে লাগেই।

কুন্দর অনেক কাজ। সব সময় তাহাকে হাতের কাছে পাওয়া যায় না। লাঠিতে ভর দিয়া পশুপতিকে উঠিতে হয়। তিনটি পায়ের সাহায্যে কষ্টে সে নিচু দাওয়া হইতে নিচে নামে, আরো কষ্টে দাওয়ায় ওঠে। চৌকাট ডিঙ্গাইয়া ঘরে যায় এবং বাহিরে আসে। পড়িয়া যাওয়ার মতো ভয়ানক ব্যাপার কদাচিৎ ঘটে, কিন্তু প্রায়ই পায়ে হোঁচট লাগে, লাঠিটা মাথায় ঠুকিয়া

যায়, চৌকির কোণে হাঁটুর কাছে ঠোক্কর লাগে। কোন রকমে শ্বাস রোধ করিয়া ঘরের শয্যায় অথবা দাওয়ার আশ্রয়ে পৌঁছিয়া পশুপতি অনুশ্বাসীয় হা হা শব্দে কাতরতা প্রকাশ করে, তাহার স্তিমিত চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়ে।

একদিন কুন্দর বড় ছেলে কেশব তাহাকে প্রাণান্তকর আঘাত দিয়াছিল। খোকার মতো সেও একরকম পশুপতির গায়ের উপরে আছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তবে ইচ্ছা করিয়া নয়।

কেশব ষোল সতের বয়সের দুরন্ত শয়তান ছেলে। স্কুলে যায় না, লেখাপড়া করে না, একটু একটু শ্রীমন্তের মুহুরির কাজ শেখে, ফাইফরমাস খাটে, খায় আর ঘুরিয়া বেড়ায়। মাঝে মাঝে কুন্দ ও পশুপতির কাছে পয়সা আদায় করে।

যত সে শয়তান ছেলে হোক, প্রাণ যে তাহার প্রচুর তাহাতে সন্দেহ নাই। সে গাছে ওঠে, কাঠ চেলায়, মারামারি করে, আর প্রবল নিষ্ঠুর অত্যাচারীর মতো সর্বদা তাহাব চেয়ে অসহায় মানুষ ও পশুকে নির্যাতন করার সুযোগ খোঁজে।

তাহার এই অধীর চঞ্চল প্রাণাবেগের কাছেই পশুপতি বোধহয় আত্মবিক্রয় কবিয়াছে। ছেলেটাকে সে ভালবাসে, ভয় করে, পূজা করে এবং ঘৃণা করে। সামনে সজনে গাছের ডালে কবে এক অজানা পাখি বাসা করিয়াছিল, ডিম ফুটিয়া বড় হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। তবু গাছে উঠিয়া কেশবের তাহা নিজের চোখে দেখা চাই। সজনে গাছেব ডাল ভারি বিশ্বাসঘাতক। কত মোটা ডাল কত সহজে ভাঙ্গিয়া যায় — ভিতরে শাঁস নাই। কেশব টিপ করিয়া পড়িয়াছিল পশুপতির সামনে। সে আতঙ্ক উত্তেজনা পশুপতি বাকি জীবনে ভুলিবে না। আর গাছ হইতে পড়িয়া কেশবকে সঙ্গে সঙ্গে খোঁড়াইতে পালাইয়া যাইতে দেখিবার বিস্ময়। কেশব ঘরে ঢোকে উঠান হইতে একলাফে দাওয়া ডিঙ্গাইয়া এবং এক এক সময় অকারণে ঘর হইতে বাহির হইয়া দাওয়ায় একটা বাঁশের খুঁটি ধরিয়া বোঁ করিয়া এক পাক ঘুরিয়া যায়। এবং তারপর আরও অকারণে ওই উঠানের প্রান্তে শ্রীমন্তের উদাসীন ছেলে মেয়ে বৌদির দিকে আড়চোখে চাহিতে থাকে।

কিন্তু তাহার বাহাদুরিটা সম্যক বুঝিতে পারে শুধু পশুপতি। হৃদয়ের যতটুকু উষ্ণতা তাহার আজও জীবনের কামনা করে তাই দিয়া কেশবকে সে বোধহয় হিংসা করে, তাই ভালও বাসে। শিহরণ আজ পশুপতির দুর্লভ নয় কিন্তু ছেলেটার কাণ্ডে তাহার যে শিহরণ জাগে তাহা অভিনব, তাহা মৌলিক। তার ভীরু দুর্বল বুক আতঙ্কে ঢিপ ঢিপ করে, ব্যাকুল হইয়া কেশবকে মুখে এসব কাণ্ড করিতে বারণ করে, কিন্তু দুচোখ প্রাণপণে কুঁচকাইয়া এই চিত্তাকর্ষক অভিনয় দেখিতেও ছাড়ে না।

শেষে বলে, শোন কাছে আয় দিনি! আয় না দাদা, আয়। ওরে আয় না!

কেশবকে কাছে আনিয়া সে করিবে কি? কিছু না। শুধু বসাইয়া রাখিবে। নিজে তো দিবারাত্রি বসিয়াই আছে, এই উত্তাল প্রাণ-শক্তিকেও সে একটু কাছে বসাইয়া রাখিবে। হয়তো প্রাণপণে দেখিবে ও দুই হাতে স্পর্শ করিবে। কিন্তু সেটা বাহুল্য। জীবনের এই অসংযমকে নিজের কাছে সংযত করিয়া রাখাই তাহার আসল কামনা।

একদিন দুরন্তপনার মধ্যে অতবড় ছেলে পশুপতির গায়ের উপর পড়িয়া গেল। তেমন ভাবে পড়িলে পশুপতি বাঁচিত কিনা সন্দেহ, মাটিতে প্রথমে একটা হাত ফেলিয়া কেশব নিজেকে খানিকটা সামলাইয়া লইয়াছিল। তবু তাহার হাঁটুর আঘাতে পশুপতির বাঁকা কোমর যেন ভাঙ্গিয়া গেল। দুদিন তাহার উঠিবার সামর্থ্য রহিল না।

কেশব প্রায়ই নানা কারণে শাস্তি পায়। সেদিন তাহার শাস্তিটা হইল ভীষণ।

শ্রীমন্তের হাতের শেষ থাপড়টাতে সে ঘুরিয়া পড়িয়া গেল।

এবং শুধু কেশবের উপর নয়, কুন্দকেও অনেক কথার মার সহ্য করিতে হইল। ছেলেকে যদি সে শাসন না করে এবাড়িতে তবে তাহার স্থান হইবে না, এমন আশঙ্কাজনক কথাটাও যেন শোনা গেল।

কোমরের ব্যথায় সর্বাঙ্গ আড়ষ্ট হইয়া আসিলেও ওর মধ্যেই পশুপতির কি রকম একটা ব্যথিত আনন্দ হইয়াছিল। বাড়িতে যে হৈ চৈ বাধিয়াছিল, দুতিনজনে তাকে যে পাখা করিয়াছিল, কেশব যে চেঁচাইয়া কাঁদিয়াছিল, এসব দিয়া যেন এই সত্যটাই যাচাই হইয়া গিয়াছে যে জগতে আজও তাহার মূল্য আছে। তাহাকে দুবার 'আহা' শুনাইয়া কেশবকে একটু বকিয়া এ ব্যাপার তো সকলে শেষ করিয়া দিতে পারিত! তার বদলে একেবারে সমারোহ বাধিয়া গিয়াছিল!

কয়েক বছর ধরিয়া পশুপতির মনে একটা কষ্ট ছিল। তার মনে হইত, এতকাল বাঁচিয়া আছে বলিয়া সকলে বুঝি বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছে, মরণকে এভাবে ঠেকাইয়া রাখিয়া মানুষের কাছে সে বুঝি অপবাধ কবিতেছে। কবে সে মরিবে তারই প্রতীক্ষায় কারো আর ধৈর্য নাই। ব্যাপারটা চুকিয়া গেলে সকলে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে। ছেলের বর্মা পালানোর আগে বৃদ্ধবয়সে যে পরিমাণ আরাম ও সুখ পশুপতি কল্পনা করিত তাহার কিছুই সে পায় নাই। চারিদিক হইতে আসিয়াছে শুধু অবহেলা, অনাদর! সকলে তাকে যেন ছাঁটিয়া ফেলিতে চায়। দিনের পর দিন যত সে অসহায় হইয়া পড়িয়াছে, মানুষকে তার প্রয়োজন হইয়াছে যত বেশি, মানুষ তার তত দূবে সরিয়া গিয়াছে। মানুষের সুখদুঃখে পশুপতি আর ভাগ বসাইবার কামনা রাখে না, জীবনের সমারোহে তার বরং বিতৃষ্ণাই আসিয়াছে। কিন্তু মরিতে মরিতেও বাঁচিয়া আছে বলিয়া সকলে রাগ করিবে, তার অপবিহার্য সেবা ও যত্ন সে পাইবে না, জীবনের শেষ দিনগুলি কষ্ট ও অসুবিধায় ভবিয়া থাকিবে, এটা সহ্য করা একটু কঠিন। দুমাসের জন্য কেহ বিদেশে যাওয়ার আয়োজন করিলে মানুষের কাছে হঠাৎ তার দাম বাড়িয়া যায়। সে চিরকালের জন্য বিদেশের চেয়েও সুদূর বিদেশে চলিয়া যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে, অথচ মানুষের কাছে তার দাম গেল কমিয়া।

কোমরে ঘা খাইয়া সকলকে ব্যস্ত করিতে পারিয়া পশুপতির এই দুঃখটা কমিয়া আসিয়াছে। সে বুঝিতে পাবিয়াছে, মৃত্যুর সঙ্গে তাহার নিবিড় ঘনিষ্ঠতাকে মানুষ অবহেলা করে নাই, মর্যাদা দিয়াছে। জগতে সে নিরাশ্রয়, তার ছেলে থাকিয়াও নাই। তার দেহ পঙ্গু, মন কুয়াশায় আধ-অন্ধকার। তবু পথে পথে তাকে যে আজ ভিক্ষা করিতে হয় না, একটি ঘেরা আশ্রয় ও দুটি অন্ন যে তাহার জুটিতেছে, সে শুধু তাহাব বয়সের জন্য, মরিতে তাহার বেশিদিন বাবি নাই বলিয়া। বেশি কিছু হয়তো মানুষ দেয় নাই, কিন্তু যতদিন সে না মরে ততদিন তার বাঁচিয়া থাকার অধিকারকে স্বীকার করিয়াছে সকলেই।

এবং জীবনের সঙ্গে তার সম্পর্ক প্রায় চুকিয়া আসিয়াছে বলিয়াই পরের বাড়ি থাকিয়া পরান্ন ভোজনে তাহার লজ্জাও নাই।

সেদিনের ব্যাপার পশুপতিকে এই সান্ত্বনা দিয়াছে কিন্তু তাহার পর হইতে কুন্দ ও কেশব একটু বদলাইয়া গিয়াছে। কুন্দ করিয়াছে রাগ আর কেশব পাইয়াছে ভয়।

কুন্দ মুখে কিছু বলে নাই, রাগ দেখাইয়াছে কাজে। তার কাছে যে পরিমাণ সেবা পশুপতি না চাহিয়াই পাইত এখন আর সেরকম পায় না। পশুপতির টিনের তোরঙ্গটি চৌকির পায়ার সঙ্গে আজো বাঁধা আছে। তাছাড়া বুড়া অসহায় মানুষকে একেবারে ত্যাগ করিবাব ইচ্ছা কুন্দর ছিল না। সে সাহসও ছিল না। সাহস না থাকার কারণ এই। পশুপতিকে শ্রীমন্ত ও তাহার পরিবার যতই ভুলিয়া যাক কুন্দ যে তাহার সেবা করে এটা তারা জানিত এবং এই ব্যবস্থাই সকলে মানিযা লইযাছিল। রান্না করার মতো এও কুন্দর একটা কর্তব্য।

তবে ইচ্ছা করিলে আইন বাঁচাইয়া রাজার আইনও ভাঙ্গা যায়। কুন্দও তেমনিভাবে নিজেকে বাঁচাইয়া পশুপতিকে মারিতেছিল। শেষের দিকে শীত আরও তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ভোরে মৃতপ্রায় বৃদ্ধটিকে এক মালসা আগুন দেওয়ার সময় কুন্দ করিয়া উঠিতে পারে না। কোনদিন রোদ উঠিয়া পড়িলেও পশুপতিকে সেখানে পৌঁছাইয়া দিতে না আসে কুন্দ না আসে কেশব, সারারাত শীতে জমিয়া গিয়া নিজে নিজে বাহিরে যাওয়ার শক্তিও পশুপতি তখন খুঁজিয়া পায় না। কোনদিন দেখা যায় তার ছেঁড়া চট ও ছেঁড়া কাঁথা বাত্রে কেহ তুলিয়া রাখে নাই, বাড়ির লোম-ওঠা বুড়া কুকুরটা তার উপরে কুণ্ডলী পাকাইয়া শুইয়া আছে। পশুপতির ভিজানো সাগু মাঝে মাঝে শক্ত থাকিয়া যায়, তার মাছের ঝোলে মসলা বেশি হয়, তার বলক-তোলা বরাদ্দ দুধটুকু অর্ধেকের বেশি সে পায় না। রাত্রে সরাসরি কুন্দ নিজের ঘরে গিয়া দরজা দেয়।

পশুপতি মাঝের বেড়া ভেদ করিয়া ডাকে ও কুন্দ? ও দিদি, শুলে নাকি? শোন দিদি একবার।

কুন্দ ছেলেকে শিখাইয়া দেয়। কেশব হাঁকিয়া বলে, মা ঘুমিযে পড়েছে।

পশুপতি খানিক চুপ করিয়া থাকে। তারপর আবার বলে, এই তো শুলো, একবারটি ডাক না কেশব, ডাক দাদা, ডাক তোর মাকে।

কুন্দ আবার ছেলেকে শিখাইয়া দেয়। কেশব বলে, মার জ্বরগো দাদামশায়, ডাকতে মানা করে শুয়েছে।

পশুপতি তারপর চুপ করিয়া যায়। বড় শীতল পৃথিবী, বড় প্রাণহীন। হয়তো আজ রাত্রে সেও শীতল হইয়া যাইবে। এমন তো কত লোকে যায়, বিছানায় শুইয়া শীতার্ত আধ ঘুম আধ জাগরণের মধ্যে। পঞ্চাশ বছর বয়সের সময় পশুপতির ছেলে বর্মা পালাইয়াছে, সাতান্ন বছর বয়সের সময় মরিয়াছে তার বৌ। আজ ত্রিশবছর ধরিয়া এমনি নিঃসঙ্গ অন্ধকাবে পশুপতি আরও নিঃসঙ্গ আরও গাঢ় অন্ধকাবের প্রতীক্ষা করিয়াছে।

ওঘরে ছোট ছেলেটা কাঁদিয়া উঠিলে কোন জাগ্রত মাতাব আদরে হঠাৎ তাহার কান্না থামিয়া যায়, পশুপতির বুঝিতে বাকি থাকে না। কিন্তু কুন্দকে আর সে ডাকে না। বরফের মতো শীতল নির্বোধ পা দুটি হইতে দেহের দিকে জমজমাট মৃত্যুর ক্রমিক অগ্রগমনে বাধা পড়ায় কষ্টে লেপ কাঁথা সবাইযা লাঠি খুঁজিয়া সে চৌকির নিচে নামে। উবু হইযা বসিয়া লাঠিটা পাঠাইয়া দেয় চৌকির তলে সেইখানে, যেখানে তার টিনের তোরঙ্গটি আছে। লাঠি দিয়া নানা ভাবে পরীক্ষা করিযা তোরঙ্গটির অস্তিত্বে সে নিঃসন্দেহ হয়। তারপর প্রাণপণ চেষ্টায় আবার চৌকিতে ওঠে।

তখন ঈশ্বরকে পশুপতির মনে পড়ে। পৃথিবীর আর কারো ঈশ্বরের সঙ্গে পশুপতির ঈশ্বরের মিল নাই। অনাদি অনন্ত কোন কিছুকে মনে আনিবার চেষ্টা করিলে মাথা বোধ হয় তাহার ফাটিয়া যাইবে, সাধারণ মানুষ সীমাহীনকে যে অনুভূতি দিয়া যতটুকু উপলব্ধি করে ততটুকু জোরালো অনুভূতিও পশুপতির নাই। তাহার ভাবিবার শক্তি ক্ষীণ, অনুভূতি দুর্বল। তার ঈশ্বর একটা নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকাবে খানিকটা আলো মাত্র।

যে আলোকে একদিন সে দুচোখ দিয়া পৃথিবীকে ঢের বেশি উজ্জ্বল, ঢের বেশি ব্যাপক ভাবে দেখিতে পাইত। পশুপতির ঈশ্বব আলোর একটু স্মৃতি মাত্র।

কিন্তু তাহা দিয়াই সে তাহার চিরন্তন ভবিষ্যেব স্বর্গ নির্মাণ করিতে পাবে। স্বর্গেব কামনাও তাহার এতখানি নিস্তেজ হইয়া আসিয়াছে।

এ-শীতটাও কোনরকমে কাটিয়া যায়। বসন্তের আবির্ভাবে পশুপতির দেহে মনে জীবনের ক্ষীণতম জোয়ারটিও আসে না বটে, কিন্তু তাহার অবশিষ্ট ক্ষীণ জীবনীটুকুর অপচয় বন্ধ

হইয়া যায়। কুন্দর অবহেলা সহিতে না পারিয়া তাহাকে শীতের শেষে পশুপতি কয়েকটা টাকা দিয়াছে। কেশবও গোপনে একটা টাকা আদায় করিয়া লইতে ছাড়ে নাই। কুন্দর রাগ অবশ্য এমনিই কমিয়া আসিতেছিল, টাকাটা হাতে পাওয়ায় তাড়াতাড়ি কমিয়া গিয়াছে। পশুপতি ডাকিলে এখন সে মাঝে মাঝে সাড়া দেয়। পশুপতির সাগু নরম হয়, মাছের ঝোলে মসলা কম থাকে, দুধ কমে না। কেশব দাওয়ার খুঁটি ধরিয়া পাক খায়, তার কাছে বসে, দুটো একটা কাজও করিয়া দেয়।

শ্রীমন্তের মেয়ে মুখীর বিবাহ হয় ফাল্গুন মাসেব মাঝামাঝি। বিবাহের দিন বিকাল বেলা কেশবকে দিয়া টিনের তোরঙ্গটির দড়ির বাঁধন খোলাইয়া সেটি পশুপতি চৌকির তলা হইতে বাহিরে আনায়। কেশবকে ঘরের বাহির করিয়া দিয়া দরজা বন্ধ করে। বেড়ার ফাঁকে চোখ রাখিয়া কেশব কিন্তু ভিতরের ব্যাপার সব দেখিতে পায়। একটা রিপু করা ফর্সা সার্ট ও একটি কুচানো পাতলা কাপড় বাহির কবিয়া পশুপতি তোরঙ্গ বন্ধ করে এবং দরজা খোলে।

কেশবকে ডাকিয়া বলে, যেমন ছিল তেমনি আবাব পায়ার সাথে বাঁধ দি'নি দাদা, বুঝি কেমন বাহাদুর!

তোরঙ্গটি বাঁধিয়া চৌকিব তলা হইতে বাহিব হইয়া কেশব জিজ্ঞাসা করে, জামা-কাপড় কি হবে দাদা মহাশয়?

পশুপতি ফোকলা হাসি হাসে।

দেখিস কি হয়। দেখিস।

সন্ধ্যার সময় জামা-কাপড পরিয়া সে বাবু সাজে। আটবছরের পুরানো চটি জোড়াটি কিন্তু তাব চেয়েও নানা দিকে এত বেশি বাঁকিয়া দুমড়াইযা গিয়াছে যে কোন মতেই পায়ে দেওযা যায় না। না যাক। এই বয়সে এত বেশি বাবু পশুপতির না সাজিলেও চলিবে।

ঘরের বাহিবে গিযা কেশবকে দিয়া দরজায় সে পিতলের তালাটি লাগায় এবং কেশবকে নির্ভব কবিয়া হাজির হয় একেবারে বিবাহের আসরে। সকলের মাঝখানে বসিবার ইচ্ছা থাকিলেও সে সাহস পায় না। একদিকে বেড়া ঘেঁষিয়া বসিয়া থাকে!

বিবাহ-বাড়ির আলোয় পশুপতির নিবিড় অন্ধকার রাত্রি আজ একটু আলো হইয়াছে। এতগুলি মানুষের দেহের উত্তাপ সে যেন অল্প অল্প অনুভব করিতে পারিতেছে। নিজের ইন্দ্রিয়গুলিকে আজ পশুপতির একটু সজাগ মনে হয়। জীবনের ঘোলাটে অস্পষ্ট স্মৃতিগুলিও যেন খানিকটা স্পষ্ট হইযা উঠিয়াছে। মানুষেব সঙ্গে পশুপতির আলাপ করিতে ইচ্ছা হয়। তার ডাইনে যে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি নিঃশব্দে শুধু তামাক টানিতেছেন তার বুকে খোঁচা দিয়া সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিতে সাধ যায় : মহাশয়েব নাম?

তারপব একটু হাসিয়া : আমাব নাম আজ্ঞে, পশুপতি ঘোষ দস্তিদার। এখানেই ইস্কুলে মাস্টারি কবি, ভর্নাকুলার মাস্টাব আজ্ঞে আমি। মেয়ের বাপ আমার বন্ধু পুত্রও বটে ছাত্রও বটে — বড় মানে আমাকে, বড় খাতির কবে।

বসিয়া বসিয়া পশুপতি ঝিমায়। তার চোখ ঢুলিয়া ঢুলিযা আসে। একসঙ্গে অতীতে ও বর্তমানে থাকিবাব সাধ্য তাহাব নাই বলিযা, যখন সে অতীতের কথা ভাবে তখন এই বিবাহ সভা তার কাছে মুছিয়া যায়, চারিদিকে আলো ও গণ্ডগোলে সে যখন এখানে ফিরিয়া আসে তখন অতীতকে তাহার মনে থাকে না। তাই চোখে পূর্ণ দৃষ্টি, দুকানে তীক্ষ্ণ শ্রবণ-শক্তি ও মুখে সুস্পষ্ট ভাষা লইয়া একদিন এমনি সভায় সে যে অভিনয় করিত তার এতটুকু নকলও করিতে পারে না।

তারপর একসময় সে সেইখানেই ঘুমাইয়া পড়ে। কেহ অবাক হইয়া তাহার দিকে তাকায়, কেহ তার সম্বন্ধে প্রশ্ন করে, কেহ তাকাইয়াও দেখে না।

পশুপতির ঘুমের আড়ালে শ্রীমন্তের মেয়ে মুখীর বিবাহোৎসব চলিতে থাকে।

পোস্টার

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

সামনের দেয়ালে আবার একখানা পোস্টার পড়েছে।

রাস্তা দিয়ে কত লোক যায়। কেউ কেউ পড়ে দেখে। কেউ দেখেও দেখে না। কারো বা নজরে পড়ে না। তবু আমাদের এ ফ্ল্যাটবাড়িটার মুখোমুখি রাস্তার ওপারের ঐ দেয়ালের গায় দু-চারদিন পর পর পোস্টার মারে। কে বা কারা মারে জানি না। জানবার চেষ্টাও করি না। ছাপোষা কেরানী। কে যায় যত সব হাঙ্গামা হুজ্জতের নেপথ্যের কথা জানতে? যার খুশি মারুক, যার ভালো লাগে পড়ুক।

তবু না পড়ে পারি না। এত কাছে, একেবারে মুখোমুখি, তাই। আমার দোতালার শোবার ঘরের মধ্যে থেকে গোটা দেয়ালটা চোখে পড়ে। বলাবাহুল্য, রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ি না কখনো। নরম নিরীহ পোস্টার ঃ

সরবরাহ মন্ত্রী বলেন, কাপড়ের উৎপাদন বাড়িয়েছে ঃ তবে কাপড়ের দাম কমে না কেন?

কেন কমে না সে কথাই ভাবতে ভাবতে নিচে নেমে যাই। রোজ সকালে চা খাওয়ার পরে রাস্তার দিকের রকে গিয়ে বসি। পাশের বাড়ির অধ্যাপক পরেশবাবু আসেন তাঁর ইংরেজী সংবাদপত্রখানা সঙ্গে করে। আমারই পাশের ফ্ল্যাটের ইনকামট্যাক্স অফিসের ধনঞ্জয়বাবু আসেন তার বিশ বছরের-প্রিয় বাংলা খবরের কাগজখানি নিয়ে।

"দত্তমজুমদারের খাটালের দেয়ালটা দস্তুরমতো একটা সংবাদপত্র হয়ে দাঁড়াল।"

"তাই তো দেখছি।" ধনঞ্জয়বাবুর পরিহাসের জবাবে বললাম, "ইদানীং একটু বেশি রকম বাড়ছে খবরের সংখ্যা।"

সংবাদপত্র থেকে মুখ তুলে অধ্যাপক পরেশবাবু বলে উঠলেন, "এতে আশ্চর্য হবার কী আছে? হালে খবরের কাগজওয়ালারা নীতি বদলেছেন ঃ ঘটে যাহা সব সত্য নয়। তাই পছন্দসই খবর না হলে — তা সে যত বড় অঘটনই হোক না কেন — আজকাল তা সংবাদপত্র অপাঙক্তেয়। ফলে একঘরে খবরগুলো ঠাঁই নিচ্ছে দেয়ালে দেয়ালে।"

"যাই বলুন, ও-সব পোস্টার-ফোস্টার মেরে কিচ্ছু হয় না।" ধনঞ্জয়বাবু গম্ভীর হয়ে মন্তব্য করেন, "কী লাভ হয় এতে? ক-জন লোক পড়ে মশায়?"

"শত হলেও খবরের কাগজ!" বললাম, "ছাপার হরফের একটা জাদু আছে যেন।"

"হ্যাঁ, একেবারে বেদবাক্য — তা সে যত বড় মিথ্যাই ছাপা হোক না কেন।" অধ্যাপক ফোড়ন কাটেন।

শুনে খুশি হই না। অধ্যাপকের মতামত মাঝে মাঝে একটু উগ্র হয়ে ওঠে। তবু আমাদের বন্ধুত্বে কখনো টান পড়ে না। তাঁর সঙ্গে একটা জায়গায় আমাদের দুজনের স্বভাবের মিল আছে। গোলযোগের গন্ধ পেলে তিনিও দূর দূর দিয়ে গা বাঁচিয়ে চলেন।

ধনঞ্জয়বাবু না বলে পারলেন না, "আপনি তো বক্তৃতার ঝোঁকে অনেক কথাই বললেন। বিপদের কথাটা একবার ভেবে দেখেছেন?"

"এতে আমাদের ভয় পাবার কী আছে মশায়?" অধ্যাপক প্রশ্ন করেন।

"কে বলতে পারে হঠাৎ একদিন সার্চটার্চ হবে কিনা। অনর্থক হয়রানি কে চায় মশায়! আমাদের এই বাড়িটাতে ছেলেছোকরা — তা আট-দশ জন তো হবেই। ধরে নিয়ে গেলেই হলো। আজকাল কি আর আইন-টাইন আছে!"

চেয়ে দেখি মই বেয়ে উঠে পোস্টার লাগাচ্ছে দেয়ালে — সিনেমা কোম্পানির নতুন ছবির সচিত্র বিজ্ঞাপন। "কন্‌ট্রোল তুলে দেবার পর তিন মাসে কাপড়ের কলওয়ালারা একশো কোটি টাকা মুনাফা লুটেছে।" — দু-তিন দিন আগের সেই বড় বড় হরফের পোস্টারটাকে একেবারে ঢেকে দিল ভারত-বিখ্যাত চিত্রতারকার তিনরঙা আবক্ষ মূর্তি।

পরদিনই আবার একখানা। এবার পরোক্ষ কায়দার এক উপভোগ্য পোস্টার : "পুরোদমে চোরাকারবার চালাও। 'ক্ষমতা হাতে পেলেই চোরাকারবারীদের ফাঁসি দেব' — পণ্ডিত জওহরলাল। এক বছরে ক-জন ধরা পড়েছে? মাভৈঃ নিখিল চোরা কারবার সমিতি।"

যথাসময়ে রকের আড্ডায় এসে বসেছি। অধ্যাপক সহাস্যে বললেন, "পোস্টারওয়ালারা দেখছি নতুন টেকনিকের খেলা দেখাতে শুরু করল! — আর লোক টানছে মন্দ নয়।"

দেয়ালের কাছে ছোটখাটো ভিড় জমেছে। বেশিক্ষণ নয়। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে লোক থামে, দেয়ালের কাছে এগিয়ে যায়। পড়ে, হাসে, টীকা-টিপ্পনীও করে।

খানিকবাদে ধনঞ্জয়বাবু এসেই জানালেন, "শুনেছেন তো?"

"কী?"

"যা আশঙ্কা করেছিলাম তাই। এ পাড়ায় টিকটিকির আনাগোনা শুরু হয়েছে।"

"মানে?"

"কাল দুপুরের দিকে আশপাশের দোকানগুলোর লোকজনদের তারা — সি-আই-ডি-র লোকই হবে — বিস্তর জিজ্ঞাসাবাদ করে গেছে। রসুল মিঞাকে নাকি শাসিয়ে গেছে — বলে গেছে নজর রাখতে।"

আমাদের এ বাড়িরই গায়ে লাগানো রসুল মিঞার বিড়ির দোকান। হাঁক দেই। রসুল হাতের কাজ ফেলে চলে আসে।

"কাল নাকি পাড়ায় পুলিসের লোক এসেছিল?"

"মালুম নেহি।"

"তোমার দোকানে হে" — ধনঞ্জয়বাবু জোর দিয়ে বলেন।

"নেহি তো বাবু।"

এবার প্রশ্ন করেন পরেশবাবু, "ওসব পোস্টার কারা লাগায় জানো? তুমি তো সব সময় সামনেই থাকো।"

"ম্যায় তো হরবক্ত কাম পর হি রহতা হুঁ বাবু। ঔর বঙলা জবান তো মুঝে মালুম নেহি হোতে হ্যায়।"

"আরে বাংলা বাত হিন্দী বাতের কথা হচ্ছে না," ধনঞ্জয়বাবু প্রায় রুখে ওঠেন, "দিনদুপুরে ওসব কারা এসে মেরে রেখে যায় তুমি তার কিছুই জানো না বলতে চাও?"

"কুছু কুছু দেখতা হুঁ। কভি বাবুলোক লাগাতে হেঁ, কভি মজদুর লোক ভি লাগাতে হেঁ।"

রসুল চলে যেতেই অধ্যাপক বললেন, "যা-ই বলুন না, লোকে ওসব পড়তে চায়। দেখছেন তো এত পোস্টার পড়ছে, কৈ ছিঁড়ে ফেলছে না তো কেউ।"

দেয়ালের কাছে আবার একটা ছোট্ট ভিড় জমেছে।

দিন চারেক বাদে। — একখানা বড় আকারের তথ্যভারী নীরস পোস্টার ঃ

"পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রী জানাইয়াছেন, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত প্রতি মাসে তিন হাজার টাকা বেতন পান ও নয় হাজার টাকা ভাতা পান। এ ছাড়া তাঁহার মস্কোর অফিসের জন্য ব্যয় হয় বৎসরে ৫ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা। এ টাকা কার? তোমার আমার — কোটি কোটি ভারতবাসীর।"

ধনঞ্জয়বাবু দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আছেন — পড়ছেন না। পড়ছে জনকয়েক পথচারী ঃ কারখানায় যাবার পথে শশব্যস্ত শ্রমিক, রেশনের থলে হাতে চশমা-পরা কেরানী ভদ্রলোক, একরাশ্তের সংবাদপত্র বগলদাবা করে দাঁড়িয়ে এক ছোকরা বয়েসী হকার।

ধনঞ্জয়বাবু শঙ্কা প্রকাশ করেন, "এবার নিশ্চয় পুলিসের উৎপাত শুরু হবে। বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে।"

"কেন? নতুন খবর তো কিচ্ছু দিচ্ছে না। এসব ফ্যাক্টস্ ফীগারস্ তো সেদিন খবরের কাগজেই পড়েছি।"

"তা হলে কী হয়! খবরের কাগজে কি আর এসব খবব এমন করে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিযে দেয়!"

"তা বটে।"

অধ্যাপক দেয়ালের দিকে চেয়ে আছেন। বললাম, "কী ভাবছেন পরেশবাবু?"

"ভাবছি — রোলস্ রয়েস্ এ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন এ বুলক কার্ট কান্ট্রি।" একটু হেসে বললেন অধ্যাপক, "এ উক্তি করেছিলেন সেকালের এক মডারেট নেতা। তিনি আজ ফিরে এলে নিশ্চয় একস্ট্রিমিস্ট লেবাব লীডার বলে স্পেশাল পাওয়ার্স এ্যাক্টের বেড়াজালে পড়বেন।"

ধনঞ্জযবাবু এক টিপ নস্যি নিতে নিতে সেদিনের মতো আবাব জোর অভিমত জানান, "এতে কোনো লাভ হয় না। ক-জন লোক পড়ে এসব? আর পড়েই বা হচ্ছে কী?"

"কী হয় না-হয় জানি নে। তবে আপাতত আমার পনেরো বছরের ছেলেটার মগজে কিঞ্চিৎ শ্লোগানের ধোঁয়া ঢুকেছে।" পরেশবাবু হেসে বলেন।

আমার বড় ছেলেটাও ওই বয়েসী। সুতরাং উৎকর্ণ হয়ে শুনে যাই।

"গেল মাসে আমাদের ঠিকে ঝি সাতদিন কামাই করেছে। বলে, অসুখ করেছিল। আমাব তা বিশ্বাস হয নি। হিসেব করে এ মাসে সাত দিনের মাইনে কম দিয়েছি বলে আমাব পুত্র তার মাযেব কাছে নাকি মন্তব্য করেছে, বাবাব বড় পেটি বুর্জোয়া মেন্টালিটি।"

"বলবেন না আব!" বললেন এবার ধনঞ্জয়বাবু, "আমার কনিষ্ঠ সহোদরের বড় বড় কথার ঠেলায় গায় জ্বালা ধরে। ইদিকে কলেজের পড়া তা শিকেয় উঠেছে। একটা পরখ করলাম, বলতো স্টক আর শেয়ারে তফাত কী? বলে কী না, ও-সব কথা তোমরা জানবে — আমাদের জন্যে নয়। ভবিষ্যতে স্টক এক্সচেঞ্জই থাকবে না, তাব আর স্টক আর শেয়ারের তফাত।"

পরেশবাবু আর আমি একসঙ্গে হেসে উঠি। হাসেন ধনঞ্জয়বাবুও, কিন্তু পরক্ষণেই যেন একটু গম্ভীর হয়ে বলতে থাকেন, "আমরাও তো তা-ই চাই। কে না চায বলুন। তাই বলে কি আজই সব হবে, না হতে পারে? ধীরে ধীরে আসবে সব। এখনই একস্ট্রিমিস্ট হয়ে কোনো লাভ আছে? একস্ট্রিমিজম মানেই ভায়লেন্স, আর ভায়লেন্স বিগেটস ভায়লেন্স!" বলেই ধনঞ্জয়বাবু এতক্ষণে একটা উঁচুদরের কথা বলতে পেরেছেন ভেবে খুশির হাসি হাসেন।

পর পর দিন কয়েক নতুন করে পড়ল আবার পুরনো পোস্টারগুলো ঃ ছাঁটাই করা চলবে না .... জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ চাই। বিদেশী মূলধন বাজেয়াপ্ত কর। ইত্যাকার।

পড়ে — সবাই বুঝি পড়ে। অন্তত আমার গৃহিণীও যে মাঝে মাঝে পড়ে তাব প্রমাণ পেয়েছি। কালোবাজারের প্রসঙ্গে সেদিন বেশ প্রাসঙ্গিকভাবেই ঝেঁজে উঠেছিল, "গভর্নমেন্ট আমার হাতে দিক না সব ভার বুঝিয়ে। তোমাদের ওই চোরাবাজার একদিনেই ঝেঁটিয়ে বিদায় করব দেখে নিয়ো।"

আজকের আসরে নিচের তলার পেছন দিকের ফ্ল্যাটের কালীবাবুও আছেন।

বললাম, "বাড়িতে আজকাল গিন্নীরাও যে পলিটিক্স শুরু করে দিলে মশায়।"

"দেবে না!" কালীবাবু বললেন, "এতকাল পলিটিক্স ছিল বাইরে বাইরে। হাল আমলে তা ঘরে এসে ঢুকেছে — একেবারে রান্নাঘরের হাঁড়ির মধ্যে।"

"হ্যাঁ, পেটে টান পড়লে ও বস্তু আপনি আসে।" টিপ্পনী করলেন অধ্যাপক।

চেয়ে দেখি একজন আধা-বয়েসী লোক দেয়ালে একখানা পোস্টাব লাগিয়ে চলে গেল। মফঃস্বলে কোথায় এক ভুখা মিছিলের উপর পুলিস লাঠি চালিয়েছে — তারই সংক্ষিপ্ত খবব।

কালীপদবাবু বসিক লোক। তবে মাঝে মাঝে বড় মাত্রা ছাড়িয়ে যান। আরো একটা দোষ আছে। একবার একটা কথা পেলেই — বাস্। আব কাউকে কথা বলতে দেবেন না। শুরু করে দিলেন, "আজকাল ওই এক হিড়িক। কথায় কথায় মিছিল। চাল চাই, কাপড় চাই, হেন চাই, তেন চাই। — কেবল চেয়ে চেয়েই জিততে চায়। ও করে কোনোদিন কিছু হয়েছে, না হবে?"

"ও ছাড়া আর কোন পথ আছে বলুন?"

কালীপদবাবু তার কৃত্রিম ক্রোধেব ভাব এবাব দ্বিগুণ চড়িয়ে দিয়ে বলেন, "আছে মশায়। সোজা, স্পষ্ট পথ। সব দেশেব সব যুগেব যা একমাত্র পথ।"

"যথা?" প্রশ্ন করে তাঁকে উস্কে দিতে চাই।

কালীপদবাবু ফিক করে হেসে গবম সুব হঠাৎ নবম করে আনেন, "পথ মশাই যা-ই হোক না কেন, তাই বলে এমন সব ছিঁচকাঁদুনেব মিছিল! হ্যাঁ, মিছিলের মতো মিছিল বাব কর একটা, তবে না।"

"কেমন?"

"এই ধরুন ঃ ট্যাকে টাকা আছে — বাজাবে কাপড় নেই। সমস্যাটা তো এই? বেশ তো, পাঁচ টাকাব আর দশ টাকাব নোট গঁদের আঠা দিযে জুড়ে জুড়ে এক-একখানা দেড়হাতি গামছা তৈরি কবে তাই পরে যা না চলে কয়েক হাজার ছেলেমেয়ে লাটসাহেবের বাড়ির কাছে। দিগম্বব-দিগম্বরীদের সাইলেন্ট ডেমোনেস্ট্রেশান! শ্লোগানেব দবকার নেই। দেখেই বুঝবে ঃ টাকা আছে, কাপড় নেই।"

আমি আর অধ্যাপক সলজ্জ বিবক্তি গোপন করে চুপ করে থাকি। ধনঞ্জয়বাবু কিন্তু একটুখানি রসালো লেজুড় জুড়ে দিলেন, "তা করেও কোনো ফল হবে না মশায়। লাট-বেলাটের প্রাসাদে আজকাল যা কেত্তন গানের ধুম, তাতে দূব থেকে বাইনোকিউলার চোখে লাগিয়ে মনে কববে — নব ভাবঙেব নব বৃন্দাবনের যত গোপিনীরা এসেছে।

উৎসাহিত হযে কালীপদবাবু বোধ হয় আবো একটু মাত্রা ছাড়িয়ে যাবাব মতলবে ছিলেন। বাধা পেলেন।

তেতলার ফ্ল্যাটেব ধরণীবাবু আমাদেব কাছে এসে সোৎসাহে জানালেন, "শুনেছেন?"

"কী?"

"কাল সকাল সাড়ে আটটায় আমাদের এই রাস্তা দিয়ে গভর্নর যাবেন — মনোরমা প্রসূতি ভবনের নতুন ওয়ার্ডের উদ্বোধন করতে।"

আমাদের এতদিনের আশঙ্কা সত্যে পরিণত হলো।

সকালবেলা রকে বসে আমরা খবরের কাগজ পড়ছি। এক পুলিস কনস্টেবল এসে দেয়ালের পোস্টারগুলো ছিঁড়তে লেগেছে। বুঝলাম — তার উপরওয়ালার হুকুম। লাট সাহেবের গমন-পথে কোনোরূপ অবাঞ্ছিত দৃশ্য থাকলে চলবে না।

হঠাৎ রাস্তার একজন লোক কাছে গিয়ে কনস্টেবলের হাত চেপে ধরেছে — তাকে কিছুতেই পোস্টার ছিঁড়তে দেবে না। প্রথমে গালাগাল, পরক্ষণেই হাতাহাতি, তাবপর ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেল। হৈচৈ শুনে জড়ো হলো এক ছোটখাটো জনতা।

রোগাটে লোকটাকে কাবু করতে কনস্টেবলটির বেশি সময় লাগল না। হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চললো থানায়। অদূরে জনতা থ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে নিঃশব্দে।

এমন সময় মুহূর্তমধ্যে ঘটল এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপাব। জনতাব মধ্যে থেকে জন দশেক লোক বাজপাখিব মতো কনস্টেবলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। স্পষ্ট দেখলাম — তাদের মধ্যে আছে রসুল মিঞা, মোড়ের চায়ের দোকানের বয়টি, স্যাকরার দোকানের সেই কানা কর্মচারীটি, 'রমা ফার্মেসি'র বাইবের বাবান্দায় আমেবিকান লজেন্স-বিস্কুট-চকোলেট বিক্রি করে যে বেঁটে ছোকরা সে-ও এবং আরও জনকয়েক অচেনা অজানা মুখ। বাকি জনতাও টগবগ করছে উত্তেজনায়।

লোকটাকে পুলিসের কবলমুক্ত কবে তাঁবা সামনের চৌমাথাব দিকে চললো এক বিজয়ী সেনাবাহিনীর মতো।

আমাদেব চোখেব সামনে চার-পাঁচ মিনিটের মধ্যেই এমন অনর্থ ঘটবে কে ভেবেছিল।

"গতিক ভালো নয়" — বলে অধ্যাপক উঠে দাঁড়ান। আমবা যে-যার ঘবে ফিবে যাই। কেন না থানা বেশি দূরে নয়।

দোতলার ঘরের মধ্যে বসে দেখছি সব। দুই গাড়ি সঙ্গিনধাবী পুলিস এসেছে। নেমেই প্রথমে তারা দেয়ালটা একেবাবে সাফ করে দিলে — সিনেমার বিজ্ঞাপনগুলি সুদ্ধ। তারপর দু-ভাগ হয়ে একভাগ চলে গেল মোড়েব দিকে। ভাবলাম — এবার শুরু হবে ধরপাকড় আর খানাতল্লাশ।

মিনিট দশেক বাদে। রাস্তার উপর তোলপাড় কাণ্ড। লাট আসছেন। অসম্ভব ব্যস্ততার সাড়া পড়ে গেছে। ঘন ঘন হুইসিল্। হটো, হটো ঃ তফাত যাও ঃ খাড়া রহো ঃ ঠাবো উধার ঃ হটো।

বাস্তার দু-ধারে নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসের মতো থেমে গেছে সব কিছু ঃ চলন্ত গাড়ি, পথচারী, ভিখিরি, বেওয়ারিশ বেড়াল-কুকুর-ষাঁড় — সব। সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন একটি ভয়ংকর মুহূর্তের অপেক্ষায় উন্মুখ হয়ে আছে।

এক, দুই, তিন, চার......

নক্ষত্রবেগে বার হয়ে গেল গভর্নরের গাড়ি।

বিকেলে আপিস থেকে বাসায় ঢুকে সিঁড়ির মুখে প্রশ্ন করি গৃহিণীকে, "তোমার ছেলে বাসায়?"

"হ্যাঁ।"

"আজ কোথাও যায় নি তো?"

"না গো, স্কুল থেকে সোজা বাড়ি ফিরেছে।"

নিশ্চিন্ত হই।

সন্ধ্যার পর ধনঞ্জয়বাবু তাঁদের দোতলার বারান্দা থেকে ডাকলেন। আমাদের বারান্দার এক কোণে গিয়ে রেলিঙ-এ ভর করে মুখ বাড়িয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে প্রশ্ন করি, "মহীতোষ ফিরেছে?"

"না। সে জন্যেই তো ভাবনায় পড়েছি। বলে গেছে, খেলার মাঠে যাচ্ছি। হতভাগাকে এত বলি, তবু রোজ রাত করে বাসায় ফিরবে।"

ওপারে দেয়ালের কাছে একজন কনস্টেবল মোতায়েন রয়েছে সকালবেলার ঘটনাস্থলে। সারা রাত পাহারা দেবে নাকি?

তেমনি অনুচ্চ কণ্ঠে বলি, "মহীতোষকে এলে বলবেন — অবজেকশনেবল কাগজপত্তর কিছু থাকলে আজ রাত্তিরেই সব যেন সরিয়ে ফেলে।"

"না, সে ভয় নেই" — ধনঞ্জয়বাবু অভয় দেন, "যত বড় বড় কথা ওর মুখেই। — আমরাও এক কালে বলেছি মশায়। যাক, আজ থেকে পাড়াটা ঠাণ্ডা হবে আশা করা যায়। শেষপর্যন্ত কজন গ্রেপ্তার হলো জানেন?"

"সতেরো জন।"

পরদিন সকালবেলা। যথাসময়ে নিচে যেতেই পরেশবাবু অঙ্গুলি সঙ্কেত করে বললেন, "দেখছেন তো? রাতারাতি কী কাণ্ড।"

"হুঁ। ভোরবেলা বিছানায় বসে বসেই দেখেছি সব।"

আবার পোস্টারে পোস্টারে দেয়ালের গায় কোথাও একটুকু ফাঁক নেই।

'ইঁদুরের রাজত্বি শুরু হলো মশায় — ইঁদুরের রাজত্বি!" ধনঞ্জয়বাবু সভয় বিস্ময়ে বললেন, "বীজ ছড়াচ্ছে — সর্বনেশে মহামারীর বীজ!"

প্রথম ও শেষ

বুদ্ধদেব বসু

সোনাবঙ্ পোঃ
(ঢাকা)
১৬ই বৈশাখ, বিকেল

এইমাত্র বেড়াতে বেরোবার জন্য তৈরি হচ্ছিলাম, কিন্তু হঠাৎ এসে গেলো বৃষ্টি। আমার জান্‌লার পাশের পুরোনো পেঁপে গাছটার চিক্‌রি-কাটা চিকণ পাতাগুলি হাওয়ায দুলে'-দুলে' উল্‌টে যেতে লাগলো। প্রথমে হীরের কুচির মত বড় ও স্বচ্ছ বৃষ্টির ফোঁটা — যেন কতদূর থেকে ছুটে আস্‌তে-আস্‌তে পেঁপে-গাছটার ওপর মুখ থুবড়ে পড়লো; পরে এলো জাঁক-জমক হাঁকডাকে পৃথিবীকে অস্থির করে' বৃষ্টির মিছিল, সবুজ পাতাগুলো জলের ঝাপটে কালো হ'য়ে এলো, বিকেলের প্রচুর আলো কোথায় গেলো মিলিয়ে, — আকাশ থেকে নদী পর্য্যন্ত মেঘের ধূসর ছায়া শীত-সন্ধ্যার কুয়াশার মত ভারি ও ম্লান হ'য়ে নেমে এসেছে।

সুতরাং আমাদের বেড়াতে যাওয়া হ'ল না। সেই বেশেই আমার ঘরে ফিরে' এসেছি। জান্‌লার শার্সির কাঁচে বার বাব বৃষ্টির ঝাপট্ এসে আছড়ে পড়ছে, তা'র পেছনে আমাদের বিস্তৃত আম-বাগানের শ্যামল ঘনতা রঙ্গমঞ্চের কালো যবনিকার মত চোখে এসে লাগ্‌ছে। ঘরের ভেতরে আলো কম , জান্‌লার কাছে একখানা চেয়াব নিয়ে এসে বস্‌লাম। খানিকক্ষণ বই নিয়ে নাড়াচাড়া কর্‌লাম, মন বস্‌লো না। তারপর হঠাৎ মনে হ'ল, আমার প্রিয়তমা নীলার কাছে যে চিঠিটা রাত্তিরে লিখ্‌বো ভেবেছিলাম, সেটা এখনি লিখে' ফেলি না কেন?

সেই চিন্তার ফল যে কি হ'ল, তা তো তুই প্রত্যক্ষই কর্‌ছিস্। যদি এই বৃষ্টিটা না আস্‌তো, তবে এতক্ষণ পদ্মার ধার দিয়ে সরু পথ ধরে' হেঁটে বেড়াতাম — শুধু পায়ে। এখানকার লোকেরা জুতো-পরা মেয়ে দেখ্‌লে আঁৎকে উঠ্‌বে বলে' নয়, — নরম মাটির ওপর নরম পায়ের (আমার পা যে নরম, তা, তোর মুখে শুনেছি) চাপ দিয়ে-দিয়ে চল্‌তে ভারি আরাম লাগে — তাই। এই চিঠি লিখ্‌তে অন্তত আরো ছটি ঘণ্টা দেরি হ'ত, এবং ইতিমধ্যে তোর কথা একটি-বারো মনে পড়্‌তো না। এই নতুন আব্‌হাওয়ার সঙ্গে ভাব কর্‌তেই সমস্ত সময় কেটে যেতো।

তুই শুনে' হাস্‌বি, কিন্তু এখানে আস্‌তে না-আস্‌তেই আমি পাড়াগাঁয়ের প্রেমে পড়ে' গেছি। সত্যি। এ-প্রেম যা'তে ব্যর্থ না হয়, সে-জন্য আমি উঠে'-পড়ে' লেগে গেছি। একটি মুহূর্ত আমি অপব্যয় হ'তে দেবো না, এখানকার মাটিতে প্রথম পা দিয়ে আমি এই করেছি পণ।

পূর্ব্বরাগ হয় তা'রো আগে। গোয়ালন্দ থেকে আমাদের স্টীমার তখন ছাড়্‌লো, যখন সূর্য উঠেছে, অথচ ভালো করে' রোদ ফোটে নি। গাড়ি থেকে নাম্‌বার সময় অসম্পূর্ণ ঘুমের অতৃপ্তিতে আমার মেজাজ খারাপ হ'য়ে ছিলো, কিন্তু স্টীমার খানিকক্ষণ চল্‌তেই ঠাণ্ডা হাওয়ায় আমার চোখের ঘুম ও মনের ক্লান্তি ধুয়ে' গেলো। ডেক্-এর রেলিঙে ভর্ দিয়ে

দাঁড়িয়ে আমি ম্লান জলের ওপর লাল আলোর ঝিকিমিকি দেখ্‌তে লাগ্‌লাম। তখনকার মত যদি আমি ইন্দ্রের মত সহস্রাক্ষ হ'তাম, তবু বোধ হয় আমার দেখে আশ মিটতো না।

এক সময় বাবা এসে আমার পাশে দাঁড়ালেন। তাঁর স্বাভাবিক মাধুর্যের সঙ্গে বল্‌লেন, 'কিগো, আমাদের চা খাওয়া-টাওয়া হ'বে না?'

আমি তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললাম, 'আচ্ছা বাবা, এই পদ্মা নদী? রবি বাবুর পদ্মা?'

' না, রবি বাবুর পদ্মা ঠিক এ নয়, সে গেছে পাব্‌না জেলার ভেতর দিয়ে , নদী সেখানে সঙ্কীর্ণ, স্রোত প্রখর নয়। আমরা যে পথে যাচ্ছি, তাঁর বোট্‌ কখনো সে-পথে যাওয়া-আসা করেনি। এ পদ্মা অলসগমনা, ভীরু স্রোতস্বিনী নয়, এ গভীর গম্ভীর ও উদার-করুণা-বিতরণেও যেমন মুক্তহস্ত, অকল্যাণ-সাধনেও তেম্‌নি অকুণ্ঠ। তোরি মত। নদীর মধ্যে ও অভিজাত।'

'বাবা, নিজেকে এমন করে' প্রশংসা কর্‌তে তোমার লজ্জা করে না? আমি যে তোমারই মেয়ে।'

বাবা হাসলেন। 'এ-কথা বলাতেই তা'র পরিচয় পেলাম।'

চা খেতে বসে' হঠাৎ আমাব মনে এক উৎকট প্রশ্নের আবির্ভাব হ'ল। জিজ্ঞেস কবলুম, 'বাবা, যেখানে যাচ্ছি, সেখানে চা কিন্‌তে পাওয়া যায় তো?'

রুটিতে জ্যাম্‌ মাখাতে-মাখাতে বাবা বল্‌তে লাগলেন, 'এক ইংরেজ মহিলার একবার ভারতবর্ষে আস্‌বার কথা হয়। তিনি এখান্‌কার এক বন্ধুকে চিঠিতে জিজ্ঞেস্‌ করেন, "ক্যাল্‌কাটার পথে-ঘাটে কি দিনের বেলাতেও বাঘ ঘুরে বেড়ায়?"

মা আমাব পক্ষ নিয়ে বল্‌লেন, 'ওর আর দোষ কি, বলো? জন্মেও তো পাড়া-গাঁ চোখে দেখে নি।'

বাবা বল্‌লেন, 'যেন তুমিই দেখেছ! মা মেয়ে দু'জনেরই গ্রাম-সম্বন্ধে যেটুকু ধারণা, তা তো শরৎবাবুর উপন্যাস থেকে নেয়া। তা ভালোই হ'ল। তোমাকে বিয়ে করেছি পর আর তো দেশে-যাওয়া হ'যে ওঠেনি — এবার তোমাকে সুদ্ধ দেখিযে আনা যাবে। তুমি তো মুসৌরীর নামে ক্ষেপেছিলে, কিন্তু মুসৌরীতে পরেও যাওয়া যা'বে — আর, আস্‌ছে বছর বোধ হয়, যেখানে আমাদের বাড়ি ছিলো, সেখানে থাক্‌বে নদী, এবং তা'র ওপর দিয়ে চল্‌বে স্টীমার। বাড়িটে আমাদের বহুকালেব— তিরিশ বছর ওটা দেওয়ান গোমস্তার হাতে পড়ে' আছে, শেষ সময়ে আমাদের দেখে খুসিই হ'বে।'

মা জিজ্ঞেস কর্‌লেন, 'কেমন বাড়ি?'

'কেমন? দেখ্‌তে সাবেকী, কিন্তু কাজে আশ্চর্যবকম আধুনিক। ঘরগুলো অত্যন্ত প্রশস্ত এবং উঁচু, অনেক জান্‌লা আছে ও সেগুলো বেশ চওড়া। ওপরে ওঠ্‌বার সিঁড়ি কাঠের। এমন কি, মেয়েদের ও পুরুষদের আলাদা স্নানের ঘর পর্যন্ত আছে। অর্থাৎ, বাড়িটাকে চৌরঙ্গীতে তুলে' নিয়ে আস্‌তে পার্‌লে বস-বাস করা যায়। কাজেই, শ্রীমতী লীনা, তোমাব সমস্ত আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক বলে' জেনো। হ্যাঁ — বল্‌তে ভুলেছি, সিঁড়ির পেছনে ছোট্ট একটা কুঠুরি আছে —চোরা কুঠুরি। বাইরে থেকে যেটা জাপানী পর্দার মত দেখায়, সেটাই হচ্ছে দরজা — কৌশল না জান্‌লে কিছুতেই খোলার উপায় নেই। শুনেছি আমার প্রপিতামহের আমলে সেখানে মোহর রাখা হ'ত। তিনিই ঐ বাড়িটে করেন কিনা। তিনি কল্‌কাতায় এসে এক পাদ্রীর কাছে ইংরেজি শেখেন। ফলে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে তাঁর একটা বড় রকম চাক্‌রি জুটে' যায় — মাসে সত্তর টাকা বুঝি মাইনে। দশ বছরে তিনি যা উপার্জন করেন, তা দিয়ে শুধু ঐ বাড়ি নয়, একটা প্রকাণ্ড এস্‌টেট্‌ গড়ে' তোলেন। চৌধুরীরা তখন ছিলেন এ-মুল্লুকের সেরা জমিদার, কিন্তু সেই সময় থেকেই তা'দের পতন সুরু হয়। ঠাকুর্দার আমলে আমাদের প্রতিপত্তি আরো বাড়ে, চৌধুরীদের নবাবী জাঁক-জমকের অবশিষ্ট থাকে

শুধু প্রকাণ্ড চক্‌মিলান বাড়িখানা। তখন পর্যন্ত দু' বাড়িতে যথেষ্ট রেষারেষি ছিলো — থাকারই কথা।'

যেন একটা গল্প শুন্‌ছিলাম, এইভাবে আমি বলে' উঠ্‌লাম, 'তার পর?'

'তার পর বাবার আমলে সবি গেলো বদ্‌লে। বাবা ছিলেন ঠাকুর্দার ছোট ছেলে, তাই পৈতৃক সম্পত্তির ওপর বিশেষ ভর্‌সা না করে' তিনি চলে' গেলেন বিলেত—পাশ কর্‌লেন সিভিল্ সার্ভিস। ফিরে' এসে দেখ্‌লেন, তাঁর অগ্রজ সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করে' নিরুদ্দেশ হয়েছেন। পরে জানা গেলো, তিনি হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব জান্‌বার জন্য জার্মানিতে অবস্থান কর্‌ছেন। তিনি বাডেন্-বাডেন্ এ মারা যান্।

'অথচ বাবা বিদেশেই থাক্‌তেন বলে' গ্রামের বিষয়-আশয়ের অবস্থা ক্রমশই কাহিল হ'তে লাগ্‌লো। তার পর তো পদ্মাই সব নিতে সুরু কর্‌লে। ফলে চৌধুরীদের সঙ্গে মনোমালিন্যটাও মুছে' গেলো। সীতাপতি চৌধুরীর সঙ্গে বাবার যথেষ্ট বন্ধুতা ছিলো। তাঁকে আমি ছেলেবেলায় বারকয়েক দেখেছি। তিনি সমস্ত জীবন দেশেই কাটান, কিন্তু অমন প্রতিভাদীপ্ত কপাল ও চোখ আমি কোনো মানুষের দেখিনি। মিকায়েলেঞ্জেলোর মুখের অবর্ণনীয় কারুণ্য ও তেজস্বিতা ছিলো তাঁর চোখে। তিনি বাজাতেন বীণ — পুঁচকে সেতার বা এস্রাজ নয় — ও-সব তখনকার দিনে ছিলো না। অসংখ্য তারের ওপর তাঁর আঙুলগুলো যখন ঢেউয়ের মত অনায়াসে ভেসে বেড়াতো, তখন বাবার কোল ঘেঁষে বসে' মুগ্ধ হ'য়ে আমি তাকিয়ে থাক্‌তাম। মনে হ'ত, উনি যদি একবার ঐ আঙুলগুলো দিয়ে আমাকে স্পর্শ কবেন, তা হ'লে আমি আগুনের মত দাউ-দাউ করে' জ্বলে' উঠ্‌বো।'

'উনি এখন খুব বুড়ো হয়েছেন — না?'

'তখনো যুবক ছিলেন না, কিন্তু বার্ধক্যের আগেই তাঁকে ধর্‌লে মৃত্যু। আমি তাঁর স্ত্রীকে দেখিনি, তাঁর একমাত্র সন্তান — তাঁর মেয়েই তাঁর দেখাশোনা কর্‌তেন। তাঁর মৃত্যুর পর সেই মেয়ের কি হয়েছে জানিনে।'

চেয়ার ছেড়ে উঠ্‌তে উঠ্‌তে বাবা বল্‌লেন, সে যেন আর-এক জন্মের কথা, তবু সীতাপতি চৌধুরীর কপাল আর চোখ আর আঙুল আজো মনে পড়ে।'

জানিস্ নীলা, এই সীতাপতি চৌধুরীকে দেখ্‌তে পাবো না ভেবে মনে-মনে আমার ভারি অভিমান হ'ল— বাবা যেন আমাকে ফাঁকি দিয়ে মস্ত একটা লাভ করে' ফেলেছেন, সে-লাভের যোগ্যতা আমারো কম ছিল না। অপুত্রক সীতাপতি চৌধুরীর রক্তের বংশ তো শেষ হয়েই গেছে, কিন্তু বর্তমান পৃথিবী থেকে তাঁর মনের বংশও যে লোপ পেয়ে গেলো, এই আমার দুঃখ। বাবার কথা শুন্‌তে শুন্‌তে মনে হচ্ছিলো, বল্‌জাক্-এর পৃষ্ঠা থেকে কোনো চরিত্র নেমে এসে যেন আমার সাম্‌নে দাঁড়িয়েছেন — সাত শো বছর ধরে' তাঁর পূর্বপুরুষেরা রাজত্ব করেছেন, প্রজাদের সঙ্গে নিছক প্রভু-ভৃত্য-সম্বন্ধ বজায় রেখে চলেছেন, বিয়ে করেছেন ইয়োরোপের শ্রেষ্ঠ রাজ-কন্যাদের — রূপে তাঁরা নিরুপমা। তার পর এলো মানুষের সভ্যতার প্রথম শত্রু — ফরাসী বিদ্রোহ। উন্মত্ত, বর্বর জনসংঘ গিলোটিনের নীচে — শুধু ষোড়শ লুইকে নয়, মানুষের শত-শতাব্দীর দুরূহ সাধনা-লব্ধ সৌন্দর্যচর্চাকে জবাই কর্‌লো। ওরা মাটির রাজত্ব কেড়ে নিলো, কিন্তু সাত-শো বছর ধরে' আলোকে সঙ্গীতে সৌন্দর্যে আনন্দে বিলাসিতায় যে-মন বেড়ে উঠেছে, তা'র প্রসার খর্ব কর্‌বে কে? তাই সেই নায়ক গ্রহণ কর্‌লেন নির্বাসন ; রাজধানী থেকে বহুদূরে নিবিড় অরণ্যের মধ্যে এক ধ্বংসোন্মুখ প্রাসাদ, সেইখেনে আবদ্ধ হ'য়ে উৎসবের একটি রাত্রির মত দীর্ঘ জীবন কাটিয়ে দিলেন — মদের আর গানের নেশায়। সীতাপতি চৌধুরীর মনও সেই ধাতের — বহুমূল্য বিদেশী ফুলের মত কাঁচের ঘেরা টোপ্-দেয়া বাগানের ভেতর সেই মনকে অতি যত্নে লালন কর্‌তে হয়, তা'র

স্পর্শ-অসহিষ্ণু সুকোমলতা তা'কে পরমদুর্লভ করেছে। আজকালকার দিনে আর এমন মেয়ে নেই, ভাই, যে সত্যিসত্যি ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যায়, এমন পুরুষ নেই যে দুই পদক্ষেপে স্বর্গ-মর্ত্য অধিকার করে' তৃতীয় পা ফেল্‌বার যায়গা পায় না। রাশ্যা থেকে শিলাবৃষ্টির হাওয়া দিচ্ছে, — মহার্ঘ ক্রিসেন্‌থিমাম্-এর দরকার নেই আর; 'আমরা সব গাঁদা ফুল বনে' গেছি; — ঝড়-বৃষ্টি, শীত-গ্রীষ্মের যত উৎপাতই হোক্, অনাবশ্যক প্রাচুর্যে আনরা ফুটে' উঠ্‌বোই।

এতক্ষণে একেবারে অন্ধকার হ'য়ে গেছে, ভাই, — বেহারা কখন্ এসে যে লণ্ঠন জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে, টের পাই নি। ঘরের পক্ষে আলো যথেষ্ট নয়. দরজার কোণে, ভেল্‌ভেট এর ভারি পর্দার আনাচে-কানাচে, হাল্কা নীল রঙে ছোপানো দেয়ালের গায়ে-গায়ে ভূতের মত অস্পষ্ট, অদ্ভুত সব ছায়ামূর্তি এই ঝাপ্‌সা হল্‌দে আলোয় লুকোচুরি কর্‌ছে। ঘরের 'সীলিং' অনেক উঁচুতে — এই দুর্বল আলো সেখানে যেতে-যেতে হাঁপিয়ে পড়ে, সেখানে তাকালে মেঘ-মলিন আকাশেরই এক টুকরো দেখ্‌ছি বলে' ভুল হয়। ঘরের মধ্যে একমাত্র উজ্জ্বল জিনিস হচ্ছে মেঝের গালিচাখানা — সূর্যাস্তের মত ঘোলা লাল। রঙচঙে খেলো বিলিতি কার্পেট নয়, পারস্যের বিখ্যাত গালিচা— পাথরের মত ভারি, অথচ মাখনের মত নরম। দিল্লীর নবাবের বেগমরা তাঁদের পদ্ম-কলির মত পায়ের পাতা এই-সব জিনিষের ওপর ফেল্‌তেন। না— তা'র চেয়েও উজ্জ্বল জিনিষ এ-ঘরে আছে; সে আমি। আমি যেখানে বসে' আছি, তা'র উল্টো দিকের দেয়ালে এক জোড়া দীর্ঘ আয়না, — লেখ্‌বার ফাঁকে-ফাঁকে নিজকে তা'দের মধ্যে দেখে নিচ্ছি। এই ঘরের নিষ্প্রভ ম্লানতার মধ্যে আমাকে রোদের মুখে জ্বলে' ওঠা তরবারির মত স্বচ্ছ ও তীক্ষ্ণ দেখাচ্ছে, — খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাক্‌লে মনে হয়, আয়না যেন ফেটে পড়্‌বে। এই মৃদু আবছায়ায় আবৃত হ'য়ে ঝাড়-লণ্ঠনের নীচে বসে' এ-কথাই ভাবা সহজ যে আমি রাজকন্যা।

বাড়িটার বিশেষত্বই এই। তা'তে ঢুকলেই মনে হ'বে চির-গোধূলির রাজ্যে প্রবেশ করলাম। দিনেব বেলাতেও ঘরগুলো ছায়া-ঢাকা, রঙের ও রেখার কোমলতায় শান্ত ও শীতল। সেখানে রোদের আস্‌তে বারণ; রাশি রাশি পর্দাকে ফাঁকি দেয়ার জো নেই, সূর্যদেব কোনো ফাঁক দিয়ে যদি চুপি-চুপি দু'একটি ক্ষীণ রেখা পাঠিয়ে দিতে পারেন তো ঢের! ফলে, কোনো মন্দির বা গির্জার অভ্যন্তরের মত এই ঘরগুলোরও আবহাওয়ায় এমন একটি অপূর্ব্ব শুচিতা, ও মেজাজে এমন চির প্রসন্নতা আছে যে কিছুকাল এখানে বসবাস কর্‌লে যে-কোনো লোকের ইন্দ্রিয়বৃত্তি কবি-তুল্য মার্জিত সূক্ষ্মতা লাভ কর্‌তে পারে।

বিরাট বনস্পতির মত অটুট, অক্ষয় ও মহান্ এই বাড়ি; দূর থেকে প্রথম দেখেই এর গাঢ় ধূসর রঙ আর বলশালী দৃঢ়তার সুন্দর রুক্ষতা আমার ভালো লেগেছিলো। এর চারদিকে যদি খাল থাক্‌তো, আর তা'র ওপর টানা-সেতু, আর সেই সেতুর ওপর যদি সারাদিন অশ্বখুরধ্বনি শুন্‌তে পেতাম, তবেই যেন স্বাভাবিক হ'ত। এই অভাবটুকু আমাকে নিজের কল্পনা দিয়ে পূরণ করে' নিতে হচ্ছে, এবং সেই সঙ্গে আরো-একটা অভাব, সেই মানুষের অভাব, যা'কে দেখে আমার সমস্ত মন-প্রাণ একসঙ্গে কথা কয়ে' উঠ্‌বে , "সে যে আমি, সেই আমি।"

রবীন্দ্রনাথ একেবারে আমাদের মাথা খেয়েছেন — না রে? ইতি —

তোর লীনা।

সোনারঙ্

২২শে বৈশাখ

ছি-ছি—তুই নীলা, তুই? তোর মনে এ-পাপই ছিলো তো আমায় আগে বলিস্‌নি কেন? আমার কাছে লুকোবার দুর্মতিও তোর হ'ল।

কেন যে তুই আমার কাছ থেকে ব্যাপারটা আগাগোড়া গোপন করে' গেছিস্, তা-ও আমি জানি। আমি যদি এর একটু আভাসও পেতাম, তবে এই দুর্গতির পাঁক থেকে তোকে ছিনিয়ে তুলে' আন্‌তামই, কোনো লজ্জা বা ভয় আমাকে আড়ষ্ট কর্‌তো না। তোর চিঠি পাবার আগের মুহূর্তেই কেউ যদি আমাকে এসে বল্‌তো 'নীলা বিয়ে কর্‌ছে,' আমি তা'র মুখের ওপর হো-হো করে' হেসে উঠ্‌তাম। এত দেরি করে' জানালি! তা'র ওপর, কল্‌কাতার বাইরে আছি, আমার অনুপস্থিতি তুই এমন হীন প্রয়োজনে ব্যবহার কর্‌বি জান্‌লে— তা হ'লে সোনারঙের সকল সৌন্দর্য আমি না-হয় উপভোগ না ক'রেই মর্‌তাম, কিন্তু তোকে তো অকালমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পার্‌তাম!

সব চেয়ে আশ্চর্য এই যে আমাকে তুই কেমন করে' ফাঁকি দিলি! তোর মধ্যে কখনো এমন-কিছু তো লক্ষ্য করি নি, যাতে তোর সম্বন্ধে কোনো গুরুতর সন্দেহের উদয় হ'তে পারে! কিন্তু এতে আশ্চর্যই বা কী আছে? তুই কর্‌ছিস্ ব্যবসাদারি বিয়ে, বেণেরা যেমন সাত-পাঁচ, আগু-পিছু, ডান-বাঁ ভেবে-চিন্তে, সাড়ে-উনিশ জনের পরামর্শ নিয়ে চা বাগানের শেয়ার না কিনে, রেঙ্গুন্ থেকে সেগুন কাঠের চালান আনিয়ে তিনগুণ লাভের আশায় বসে' থাকে, তুইও তেম্‌নি দীর্ঘকাল চিন্তার পর কিনা বিয়ে-করাই ঠিক কর্‌লি! কারণ বিয়ে-করা নিরাপদ —জোলা বলেন, যুবতী স্ত্রীলোকের পক্ষে নানা দিক থেকেই নিরাপদ। জীবনের উচ্ছলিত গঙ্গায় যৌবনের প্রবল বাতাসের মুখে কল্পনার রঙীন পাল তুলে' দিয়ে আমরা দু'জন একসঙ্গে নাও ভাসিয়েছিলাম, তুই যে এত শীগ্‌গিরই ক্লান্ত হ'য়ে বন্দরের আশ্রয় খুঁজবি, তা ভাবি নি। এত তাড়ার কারণ কি? পাছে আইবুড়ো মর্‌তে হয়, এই ভয় নয় তো? না, জোলা-উল্লিখিত অন্য কোনো কারণে তোর সবুর সইলো না?

তোকে এই কথা লিখ্‌তে ঘৃণায় আমার নিজেরি গা কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ছে। তোর সম্বন্ধে আমার এ-কথা ভাব্‌তে হচ্ছে! তা'র আগে সারা পৃথিবী কেন রসাতলে তলিয়ে গেলো না?

মুরারি বাবুর আমি অসম্মান কর্‌ছি নে। তিনি সুদর্শন ও অমায়িক ; — তাঁর স্ত্রীত্বে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে তোর দৈহিক কোনো বিলাসিতারই হানি হবে না। কিন্তু তোর মন? তুই কি আমায় সত্যি করে' বল্‌তে পার্‌বি যে সেই ভদ্রলোকের সংস্পর্শে আসা মাত্র বিদ্যুৎ-বিদারণের মত অসহ্য আনন্দে তোর মনের আকাশ রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠেছিলো? তা-ই যদি হ'বে, তবে তোর মুখের দিকে তাকাতে আমার চোখ কি ঝল্‌সে যেতো না? তা হ'লে সেই মুহূর্তে পৃথিবী তোর কাছে নতুন করে' জন্ম নিতো ; — প্রথম সূর্যোদয়ের অপূর্ব জ্যোতির্লেখা হ'ত তোর গাত্রবাস। নিজের চেয়ে যে-প্রেমে বড়, তা'কেও কি গোপন করা সম্ভব? তন্দ্রার জড়িমায় আচ্ছন্ন হ'য়ে মন্থর গতিতে দিনের পর দিন কেটে যায় — সুখ-দুঃখের নির্দিষ্ট গণ্ডী এঁকে-এঁকে, লাভ-ক্ষতির হিসেব করে'-করে'। তারপর একদিন হয় প্রেমের আকস্মিক আবির্ভাব , টুকরো-টুকরো শান্তি নিয়ে মনের জন্যে যে-নীড় গড়েছিলাম, চক্ষের পলকে তা ছিঁড়ে' উড়ে' উনপঞ্চাশ বায়ুতে মিলিয়ে যায়, সমগ্র সত্তা সমুদ্র-মন্থনের মত দুঃসহ বেদনার আলোড়নে জেগে ওঠে, আত্মায় আগুন ধরে' যায়, তা'র দীপ্তি সর্বাঙ্গে উচ্ছলিত হ'য়ে ঝরে' পড়ে ; — দান্তের মত সকলকেই বলে' উঠ্‌তে হয় : 'সেই দেবতার দেখা পেলাম, যিনি আমার চেয়ে বলশালী; যিনি এসে আমার ওপর সম্পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার কর্‌বেন।'

সেই দেবতার দেখা তুই পাস্ নি; সেই তীব্র দীপ্তিতে জ্বলে' উঠতে তোকে দেখি নি। আমাকে ক্ষমা করিস্ নীলা, কিন্তু তোদের এ-বিয়েতে আমি আশীর্বাদ কর্‌তে পার্‌লাম না।

আর যা-ই করিস্, দয়া করে' প্রত্যুত্তরে সংসার ধর্ম-সম্বন্ধে আমাকে সারগর্ভ উপদেশ দিতে বসিস্ না। সে-গুলো আমি জানি। এবং এ-ও মানি যে পাত্রবিশেষে তা'র সার্থকতা আছে। কিন্তু জানিস্ তো, সকলের জন্য সব কর্তব্য নয়। কিন্তু আমরা যেন আমাদের

সাধ্যানুযায়ী মহত্তম কর্তব্যকেই অবলম্বন করি, বিধাতা আমাদের দিয়ে এ-ই চান্। ধর্, রবীন্দ্রনাথ যদি অধ্যাপক হ'তেন, তা হ'লে খুব উচ্চ শ্রেণীর অধ্যাপকই হ'তেন— হয়-তো বাঙ্‌লা দেশের শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক বলে' তাঁর নাম থেকে যেতো, কিন্তু পৃথিবীর পক্ষে সেটা কি খুব শুভ ঘটনা হ'ত? সংসারধর্ম যেমন, অধ্যাপনাও তো তেম্‌নি একটা গুরুতর কর্তব্য। কিন্তু বিধাতা যাঁকে বড় কবি হ'বার মাল-মশ্‌লা দিয়ে পাঠালেন, তিনি যত ভালো অধ্যাপকই হোন্ না কেন, কর্তব্য তাঁর সম্পন্ন হ'ল না , যতদিন পর্যন্ত তিনি তাঁর কবিত্বশক্তির পরিপূর্ণতম ব্যবহার না কর্‌ছেন, ততদিন তাঁর জীবন ব্যর্থই রয়ে' গেলো।

তুই কি স্বপ্নেও ভেবেছিস্, নীলা, যে বিধাতা তোর এ আচরণ ক্ষমা কর্‌বেন? আমার সাম্‌নে এই কাগজের টুক্‌রোর মত স্পষ্ট করে' দেখ্‌তে পাচ্ছি যে নিজহাতে তুই তোর জীবনের সব চেয়ে বড় সর্বনাশ কর্‌লি। 'মাটি কাটি' যে-কোহিনূর লাভ করা যায়, তা দিয়ে কাগজ-চাপার কাজ দিব্যি চলে, কিন্তু কাগজ চাপার ব্রতে কোহিনূব যদি তা'র জীবন উৎসর্গ করে তো তুই কি তা'কে প্রশংসা কর্‌বি? তোকে দিযে বিবাহিত জীবনের সকল দায়িত্ব উৎকৃষ্ট রূপে সম্পন্ন হ'তে পারে — তা আমি অস্বীকার কর্‌ছিনে, কিন্তু সাধারণ স্ত্রীত্ব ও মাতৃত্বের চেয়ে অনেক বড় ও সুন্দরতরো কর্তব্যের উপযুক্ত তুই , — তুই মহামূল্য বিরলজ্যোতি হীবকখণ্ড, কাগজ-চাপাদের দলে ফার্স্ট ক্লাস্ ফার্স্ট হ'লেও নিজকে তুই অপমান বই কিছু কর্‌লি নে।

দ্যাখ্, কাঁসাব গেলাশে অমৃত-পান করা চলে না, তা'র জন্য চাই লক্ষদ্যুতি স্বচ্ছগাত্র স্ফটিক-ভাণ্ড। তেম্‌নি বড় প্রেম অনুভব কর্‌বার যোগ্যতা সকলের থাকে না, সে সৌভাগ্য যা'দের হ'বে, বিধাতা তা'দের প্রকৃতিকে দুর্লভ ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ করে' দেন , নিথর বায়ুমণ্ডলে অগ্নিময় পক্ষ-সঞ্চালন করে' তিনি যেখানে অবতরণ কর্‌বেন, সেই হৃদয়ে তাঁকে উপযুক্ত অভ্যর্থনা কর্‌বার মত সৌন্দর্য ও প্রসার চাই , — তা কি সকলের থাকে, ভাই? যা'দের তা নেই, তা'দের জীবনে কোনো সংঘাতেরও স্থান নেই , তা'রা বিয়ে করুক্, ঘর-সংসার দেখুক, মোটর-চাপা পড়ার জন্য জীবসৃষ্টি করুক্, তা'দের জন্য কেউ যেন কোনো দুর্ভাবনা না করে। কিন্তু তুই যে আলাদা জাতের লোক, সেই মহান্ অতিথি হয তো একদিন তোর দুয়ারে আস্‌তেন, 'যিনি তোর চেয়ে বলশালী'। কেন তুই তাঁর জন্যে অপেক্ষা কর্‌লি না?

তুই তো জানিস্, সে-অতিথির পদক্ষেপে আমার হৃদয়াঙ্গন এখনো মুখরিত হ'য়ে ওঠে নি, কিন্তু যেদিন থেকে বুঝতে শিখেছি, সেইদিন থেকে তাঁর আগমনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা ভিন্ন আমি অন্য-কোনো কর্তব্য জানি নি। তিনি যখন আমাতে অবতীর্ণ হ'বেন, কোনো দিক দিয়েই যেন হতাশ না হন্, সেই জন্য আমাকে দেহে ও মনে, বাক্যে, বুদ্ধিতে ও আচরণে অপরূপ সুন্দর হওয়া দর্‌কার। আমার সেই তপস্যায় তোকে পেয়েছিলাম সঙ্গী। তুই আমাকে মুগ্ধ করেছিলি, তার পর যেদিন দুই আমার হাতের ওপর পায়রার বুকের মত নরম তোর হাতখানা এনে রাখ্‌লি, ভাব্‌লাম, দেবতা প্রসন্ন হ'লেন — আমার সাধনার প্রথম সিদ্ধি-রূপে লাভ কর্‌লাম তোকে।

দু'টি বটগাছের চারা পাশাপাশি রোপণ কর্‌লে, তা'রা বেড়ে ওঠ্‌বার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ডালে ডালে, পাতায়-পাতায় যেমন অবিচ্ছেদ্য কোলাকুলি হ'তে থাকে — তেমনি এই ছ'বছর ধরে' তুই আর আমি পরস্পরের সঙ্গে নিবিড় অন্তরঙ্গতায় জড়িত হ'য়ে বড় হ'য়ে উঠেছি। আকাশেতে বাষ্পকণা আর সূর্যালোক দুই-ই তো থাকে, কিন্তু দুয়ের যখন মিলন হয় তখনই দেখা দেয় ইন্দ্রধনু। তুই আর আমি মিলে' সেই মনোহরণ ইন্দ্রধনু সৃষ্টি করেছিলাম, — তারি অন্তরালে ছিলো আমাদের মনের সীমাহীন রূঢ়ত্ব — এক মুঠো নীল কাপড়ের মত কুলহীন, ক্ষয়হীন, মৃত্যুহীন আকাশ।

আমাদের এই বন্ধুতাই কি এবারের এ-জন্মের পক্ষে যথেষ্ট ছিলো না, নীলা? আমরা দু'জনা না হয় চিরন্তন নেপথ্যে জীবন কাটিয়ে দিতাম — না হয় চল্‌তো শুধু আয়োজন, শুধু সজ্জা — রঙ্গমঞ্চে নায়িকাদের আবির্ভাব না হয় না-ই হ'ত। যা'কে আমরা বাস্তব বলি, সেখানে যদি শাদা খাতায় ধুলো জমে ওঠে তো উঠুক, আমাদের মনের যিনি কবি, তিনি তো নদীর জলে ভাঙা চাঁদের টুক্‌রোর মত শত-শত গীতি-কবিতার জাল বুনে যাচ্ছিলেন। সেই জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আস্‌বার কি প্রয়োজন ছিলো তোর? হৃদয়ের রক্তে যাঁকে অনুভব করেছিস্‌, একদিন তাঁকে প্রত্যক্ষ কর্‌বিই, এইটুকু আশা কর্‌বার সাহস তোর হ'ল না? আশা পরিপূর্ণ না হ'লেই যে তা ব্যর্থ হ'য়ে যায়, এমন তো নয়। কেরোসিন্‌ লণ্ঠনের অতি সত্য বাস্তবের চাইতে সূর্যোদয়ের অন্তহীন প্রতীক্ষাই কি বরেণ্য নয়? সূর্য যদি কখনো দেখা না-ও দেন্‌, তবু সেই ব্যর্থতা নেপোলিয়ন্‌-এর জীবনের ব্যর্থতার মতই মহান্‌। এই ব্যর্থতার মূল্য তুই দিতে পার্‌বি নে, এ আমি আশা করি নি।

কল্‌কাতায় আমি যত ছেলের সঙ্গে মিশেছি, তা'দের অনেকের চোখের দৃষ্টিই আমার কাছে অনেক অনুক্ত কাহিনী উদ্‌ঘাটন করেছে। রূপে ও বিদ্যায়, বংশ-গৌরবে ও পদমর্যাদায় তা'রা নিকৃষ্ট নয়। কিন্তু আমার সব সময় মনে হ্যেছে কোথায় যেন কি অভাব রয়ে গেছে, আমাকে দেখাবার জন্যে এরা একটি বিশেষ ভঙ্গী অর্জন করেছে, সেই ভঙ্গীটিই মনোরম, আদৎ লোকটি নয়। এরা যা'কেই বিয়ে করুক্‌, বিয়ের পর সেই ভঙ্গীটি যা'বে খসে', এবং তখন হরিমতির স্বামী আর তা'দের মধ্যে বিশেষ-কোনো পার্থক্য থাক্‌বে না।

তোর মত আমি কোনো ভুল কর্‌বো না। স্বর্গে যাঁর সঙ্গে আমার বিয়ে হ'যে গেছে, পৃথিবীতে তা'র দেখা পাওয়া মাত্র আমি চিনে নিতে পার্‌বো। এক এক সময় ইচ্ছে করে, মাদ্‌মোয়াজেল্‌ মোপ্যাঁর মত ছদ্মবেশে বেরিয়ে পড়ি — তাঁর অন্বেষণে। কিন্তু মন করে বারণ। ফুলের বুকে গন্ধের মত যাঁর অনুভূতি সমস্ত অন্তরাত্মা জুড়ে আছে, বাইরে তাঁকে কোথায় খুঁজবো? শুভলগ্ন যেদিন আস্‌বে, দুয়ারে করাঘাত পড়্‌বেই — বিজয়ী রাজার মত এসে তিনি আমাকে অধিকার ক'র্‌বেন। আর, যদি তিনি না-ই আসেন — না-ই বা এলেন! তবু তাঁর প্রতীক্ষায় মুহূর্ত-জপ করে' আমরণ আমি জেগে বসে' রইবো — তুই দেখিস্‌।

তোব পূর্বজন্মেব বন্ধু,
লীনা

—নং বীডন্‌ স্ট্রীট্‌
কলিকাতা
১৮ই জ্যৈষ্ঠ
চির-প্রিয়তমা লীনা,

ওপরের ঠিকানা দেখেই বুঝ্‌বি যে ইতিমধ্যে গোত্রের সঙ্গে-সঙ্গে আমার গৃহও বদল হ'য়ে গেছে। এবং সেই জন্যই তোকে চিঠি লিখ্‌তে এত দেরি হ'ল। তামাসা মন্দ হ'ল না, কিন্তু তোকে নেমন্তন্ন কর্‌লেও তো তুই আস্‌তিস না!

প্রথমেই তোকে জানানো দরকার যে বিয়ে করে' আমি মোটেও অসুখী হই নি। আমি জানি, সুখের নামে তুই নাসিকা কুঞ্চিত কর্‌বি। তোর মতে ও জিনিষটা পশুদের উপভোগ্য। কিন্তু সত্যি কি তাই, ভাই? কল্পনার আগুনের মেঘ তোকে ঘিরে' আছে বলে' শান্তদীপালোকিত গৃহকোণের স্নিগ্ধ মাধুর্য তোর চোখেই পড়্‌লো না। সেখানে উন্মাদনা না থাক্‌, শান্তি তো আছে; উচ্ছলতা না থাক্‌, অস্বাস্থ্যও নেই। প্রতিদিনকার সুখদুঃখের অজস্র রেখা-সম্পাত এই গৃহকে বিচিত্র করেছে; স্বর্গের অনিন্দ্য জ্যোতি সেখানে পড়ে না, কিন্তু এই পৃথিবীরই ফসলের

ক্ষেত থেকে, গোধূলির আকাশ থেকে সোনার আলো সেখানে ঝরে' পড়ে, — অতসীর হাসির মত তা চির-পরিচিত হ'লেও চির-সুন্দর।

বিয়ে-করার জন্য কারো কাছে কোনো অপরাধ করেছি বলে' যদি আমার মনে হ'য়ে থাকে, সে তোরই কাছে। কিন্তু আমি তো যেমন ছিলাম, তেম্‌নিই আছি, তেম্‌নিই থাক্‌বো। পরিবর্তন যা-কিছু হয়েছে বা হ'বে, তা এত বাহ্যিক ও এত সামান্য যে সেই উপলক্ষ্যেই যদি তোর সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ হ'তে হয়, তবে স্বামী একদিন গোঁফ কামিয়ে বাড়ি এলে স্ত্রীব উচিত তা'কে চিন্‌তে না পারা। তুই যেটাকে প্রকাণ্ড-তম সর্বনাশ বলে' ভাবছিস্‌, তা'র চেয়েও বড সর্বনাশ আমার হ'তে পাব্‌তো — বসন্ত হ'য়ে আমার মুখ কুৎসিত হ'য়ে যেতে পাব্‌তো। কিন্তু সেই আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলে কি আমি তোর কাছ থেকে একটুও দূরে সরে' যেতাম? এই ঘটনাটাকেই বা অত বেশি প্রাধান্য দিচ্ছিস্‌ কেন? তোর বন্ধু এখনো তোব — সর্বান্তঃকরণে তোর, চিরকাল তোর।

তুই যদি আমার অবস্থাটা একটু পরিষ্কার করে' ভেবে দেখতিস্‌ তবে তোর চিঠির উগ্রতা নিশ্চয়ই অনেক কমে' আস্‌তো। এ-কথা তুই ভুলে' গিয়েছিলি যে তোর মত মা-বাবার আশ্রয় আমার নেই, পরিজন বল্‌তে আমাব এক মামা, তা তিনিই বা কতকাল আমার ভার বইবেন? বি-এ পাশ করার পর আমার পক্ষে দুটি পথ খোলা ছিলো— ইস্কুলটিচারি আর বিয়ে। দুই-ই সমান। জলের কুমীরকে এড়িয়ে ডাঙার বাঘের মুখেই যদি আত্ম-সমর্পণ করে' থাকি তো এমন কি অপরাধ করেছি, বল্‌?

অবিশ্যি বিয়েটা তেমন-কিছু ভযঙ্কর ব্যাপাবও নয়। সত্যি ভাই, হাওয়ায় উড়তে-উড়তে আমার ডানা বুজে' এসেছিলো, একদিন সুদূরস্পর্শী ভবিষ্যতের বন্ধ অনিশ্চয়তার দিকে তাকিয়ে ক্লান্তিতে আমার দুই চোখ আচ্ছন্ন হ'য়ে এলো, ব্যাকুলভাবে হাত বাড়াতে প্রথম যাঁর হাতের সঙ্গে হাত ঠেক্‌লো, তিনিই মুরারিবাবু। ভাবলাম, মুরারিবাবু হ'লেই বা দোষ কি?

এখন ভেবে দেখ্‌ছি, মোটের ওপর ভালোই করেছি। মুরারিবাবুকে ভালোবাস্‌তে না পারি, তাঁর প্রতি মধুব মমতা জন্মেছে — এবং এই মমতাই হয়তো কোনোকালে আমাকে প্রেমের অমরাবতীতে পৌঁছিয়ে দেবে। তিনি আমাকে ভালোবাস্‌তে না পেরে থাকেন, অপবিসীম স্নেহ কবেন — এবং মা-কে হারিয়েছি পব থেকে এই স্নেহ জিনিষটির ওপর আমার লোভ সব চেয়ে বেশি। তা-ই পেয়ে আমি তৃপ্ত। সে-প্রেম আমাদের মধ্যে নেই, যা'তে প্রিয়র পায়েব শব্দ শুন্‌লে বুক টিপ্‌টিপ্‌ করে' ওঠে, তার একটুখানি হাতের লেখা দেখলে শরীবের সমস্ত রক্ত উঠে আসে মুখে। এখানে প্রবল আবেগ-ঝঞ্ঝার, দুরন্ত মাতামাতি নেই, এখানকার কুঞ্জ কুটীরে মৃদু মমতার কোমল-মলয় সমীরেব নিত্য-সঞ্চালন। মুরারিবাবু লোক ভালো, শিষ্টতায় মিষ্ট-আচরণে বিনয়-বচনে তিনি বাস্তবিক ভদ্রলোক-আখ্যার উপযুক্ত। তাঁর প্রকৃতি কুয়োর জলের মত, কালভেদে উষ্ণতা ও শৈত্য দুই-ই তা'র গুণ। চাকর-বাকবদের আদেশ কর্‌বাব সময় তাঁর কণ্ঠস্ববে রুক্ষতা আসে না, এবং নাটুকেপনা না কবে'ও তিনি স্নেহশীল হ'তে জানেন। এই ধরণের লোকের সঙ্গে তাল রেখে চলা খুব সহজ। স্বীয় ব্যক্তিত্বের লেশমাত্র হানি না কবে'ও তাঁর সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়া যায়। এইভাবে জীবন তো বয়ে' চলুক : — স্বপ্ন যদি কিছু থেকে থাকে, সে তো আমার আছেই।

শুনে' খুসি হ'বি, এ-বাড়িতে একটা পিয়ানো আছে। মুরাবিবাবু শুধু যে বাজাতে জানেন তা নয়, ইয়োরোপীয় সঙ্গীত-সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানও প্রখর। তা ছাড়া, লাইব্রেরিঘরে ঢের বই আছে, এবং তা'র বেশির ভাগই কবিতা। এবং সেই বইগুলির পৃষ্ঠা ময়লা।

আমার সম্বন্ধে যা কিছু জান্‌বার মত, তা তোকে জানালাম। তোর এই এক মাসের সব খবর জান্‌তে উৎসুক,

নীলা

সোনারঙ
২০শে জ্যৈষ্ঠ
নীলবাণী,

সর্বগুণসম্পন্না বন্ধু আমার — দোষের মধ্যে শুধু এই যে তোর চিঠিগুলো বড্ড ছোট হয়। এ-হিসেবে তুই একেবারে বৌদ্ধ ; হিন্দুধর্মের চমৎকার আড়ম্বর, বর্ণ ও ধ্বনির অপূর্ব প্রাচুর্য তোর মধ্যে নেই; কথার ভেতর দিয়ে নিজেকে তুই যতটা প্রকাশ করিস্, নীরবতার মধ্যে নিজেকে আড়াল করিস্ তা'র চেয়ে বেশি। মনে করিস্ নি যে তোর বিবাহিত জীবনের আরো বৃত্তান্ত জান্‌তে আমার কৌতূহল হচ্ছে, কারণ সে-বিষয়ে এমন-কিছু তুই বল্‌তে পার্‌বি নে নিশ্চয়ই, যা আমি জানি নে বা ভাব্‌তে পারি নে। আর, যদি বা কিছু থাকে, তা তোর মুখেই শোনা যা'বে; চিঠির মস্ত একটা অসুবিধে এই যে পত্র লেখক প্রতিটি কথার সঙ্গে সঙ্গে তদনুযায়ী মুখভঙ্গী খামে পুরে' পাঠাতে পারে না ; কণ্ঠস্বরেই ওঠা-নামা কম্পন বিকৃতি ইত্যাদি আছে, হাতের লেখার ও-সব বালাই নেই। মুখের চেহারা, গলার স্বর ও বক্তব্য বিষয় — এই তিনে মিলে' হয় গল্প-বলা; চিঠিতে গল্পটি আসে সেজে-গুজে ভদ্রলোক হ'য়ে, কিন্তু হারাই বলা-কে। প্রেমের কবিতা-পড়া ও প্রেমে-পড়ায় যেমন পার্থক্য, চিঠি ও মুখের কথাতেও তেম্‌নি। তোর মুখামৃত পান কর্‌বার জন্য না-হয় একদিন তোর বীডন্ স্ট্রীটের বাড়িতেই যাওয়া যাবে — কি বলিস্?

কারণ আমাদের শীগ্‌গিরই কল্‌কাতায় ফিরে' যাবার কথা হচ্ছে। পুজো অবধি এখানে থাক্‌বার কথা ছিলো — বাবা বল্‌ছিলেন, এই যখন শেষ, তখন দেখা শোনা আলাপ-পরিচয় শুধু চোখ-কানের নয়, মনেরও হোক্। কিন্তু ইতিমধ্যে খবর এলো যে এক মাম্‌লাব তদ্বির কর্‌তে বাবার যেতে হ'বে বিলেত। মধ্যপ্রদেশের এক রাজার সম্প্রতি মৃত্যু হয়েছে, তাঁর ছেলে নেই , কাজেই সিংহাসনপ্রাপ্তি নিয়ে তাঁর অনুজ আর খুল্লতাতে ঘটেছে বিরোধ। ব্যাপার জটিল , —পার্লিমেন্ট-এও এ-নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, এবং ইণ্ডিয়া অফিসের পরামর্শ নিতে অনুজের পক্ষ হ'য়ে বাবা জুলাইর মাঝামাঝি পাড়ি দিচ্ছেন। তাই বড় জোর আর মাসখানেক আমরা এখানে আছি।

ঐ যাঃ — আসল খবর দিতেই ভুলে' গেছি। বাবার সঙ্গে আমিও বিলেত যাচ্ছি। বাবা নিজে থেকেই বলেছেন। দিন তিন-চার আগে এক সকালবেলায় তিনি এসে আমার ঘরে উপস্থিত। বিশেষ-কোনো কাজের কথা না থাক্‌লে সকালবেলাতে তিনি বাড়ির কারু সঙ্গে দেখা করেন না, তাই জিজ্ঞেস কর্‌লাম, 'কি খবর, বাবা?'

প্রত্যুত্তরে বাবা তাঁর আসন্ন বিলেত-যাত্রার কথা বল্‌লেন। অথচ এই সংবাদের সঙ্গে আমার কোনো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আবিষ্কার কর্‌তে না পেরে আমি বল্‌বার জন্য কথা খুঁজছিলাম, এমন সময় তিনি আবার বল্‌লেন, 'তুইও আমার সঙ্গে চল্ না!'

তখন এ-ই ভেবেই আমার আশ্চর্য লাগ্‌লো যে এ কথা আমার মনে কেন আগে উদয় হয় নি? বললাম, 'বেশ তো। বোসো না।'

বাবা একটা নীচু কাউচ্-এব মাঝখানে বসে' পড়্‌লেন। আমি তাঁর কাছে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমি যাবো? কেন?'

'প্রধানত বেড়াতে। গৌণত আমার সঙ্গী হ'য়ে। যে উপলক্ষ্যে যাচ্ছি, তা'তে কাজ স্বল্প, অবসরই প্রচুর। তা ছাড়া, যাওয়া-আসাব দেড় মাস একেবারে ফাঁকা। এবং সে-বয়েস এখন আর আমাব নেই, যা'তে নতুন লোকের সঙ্গে চট্ করে' আলাপ করে' নে'য়া যায়। সে প্রবৃত্তিও নেই। কাজেই তোকে নিতে চাচ্ছি। মাস তিনেকের ব্যাপার, — এ ক'টা দিন তোর

মা হায়দ্রাবাদে তাঁর ভায়ের কাছে বা কল্‌কাতায় আমাদের বাড়ীতে থাক্‌তে পারেন — যেমন তাঁর খুসি। আমার অভিপ্রায় এইটুকুই ; তোর যদি আরো কোনো থাকে, আমায় জানাতে পারিস্।'

'আমার যাওয়াই যদি ঠিক হ'ল, তবে মাস-তিনেকের মধ্যেই ফিরে' আস্‌তে হবে, এমন-কোনো প্রয়োজন বা আকর্ষণ তো আমার দেশে নেই।'

বাবা হেসে বল্‌লেন 'আচ্ছা বেশ অক্‌স্‌ফোর্ড-এ তা হ'লে তোর ভর্তির ব্যবস্থা করি। সময়টা ঠিক পড়েছে। না প্যারিস্?'

'বাবা তুমি আমার মনের কথা কি করে' হুবহু বুঝ্‌তে পারো, বলো তো? আমি যে অক্‌স্‌ফোর্ড-এর কথাই ভাবছিলাম!'

এমন সময় গোলাপী এলো আমার কোকো-র পেয়ালা নিয়ে। জিজ্ঞেস করলাম, 'এক পেয়ালা খা'বে, বাবা?'

'আন্‌তে বল্।'

কোকো খেতে খেতে বাবার সঙ্গে অনেক বিষয়েই আলাপ হ'ল। বহুকাল কথা বলে' ও শুনে' অমন সুখ পাই নি। অমন প্রাণ-খোলা সরল, অথচ স্বচ্ছ ও পরিষ্কার কথা বাবার মুখেও কম শুনেছি। তিনি আমাকে যা বল্‌লেন, তা'র সারসঙ্কলন কর্‌লে মোটামুটি এইরকম দাঁড়ায়।

'দেখতে তো পাচ্ছিস্, মনুষ্যজাতি ক্রমেই অবনতির পথে অগ্রসর হচ্ছে। তা'ব কারণ শুধু এই যে মানুষে মানুষে প্রভেদ লোপ পেয়ে যাচ্ছে। রাজা ও প্রজায় আস্‌মান-জমীন্ ফারাক্ আর নেই, সমাজপতিদের দিন গেছে, সমাজচালনায় আজকাল সবারি সমান দাবী। গৃহেও তেম্‌নি পিতা তা'র অবিসম্বাদিত কর্তৃত্ব হারিয়েছে। একজন বাদ্‌শাহকে ইন্দ্রতুল্য ঐশ্বর্যের অধিকারী কর্‌বার জন্য জন-গণ আর পশুতুল্য জীবন-যাপন কর্‌তে রাজি নয় ; — সবাই মোটামুটি সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ কর্‌বে, বর্তমান যুগের এই হয়েছে লক্ষ্য। ফলে হয়েছে কি, উৎকৃষ্ট বলে কোনো জিনিষ আর থাক্‌ছে না — সবই মাঝারি। আশী টাকা তোলার আতর আজকালকার বাজারে বিকোয় না, কারণ তা কেন্‌বার মত সঙ্গতি কারুরই নেই; ন' আনা দামের অগুরুর খুব চল্ — যা রাণী থেকে কেরাণী পর্যন্ত সবাই কিন্‌তে পারে।

'এই উৎকর্ষের অভাব দেখ্‌বি সবখানেই। পাঁচ টাকা দিয়ে বই কিনে' দু'দিন বসে, বিরাট উপন্যাস পড়্‌বার সময় ও সামর্থ্য নেই কারো, আট আনা পয়সা খরচ করে' দু'ঘণ্টায় সেই বইখানা ফিল্‌ম্-এ দেখে আস্‌বে। এমন দিন হয়-তো আস্‌বে, যখন কেউ আর বই লিখ্‌বে না; জনমণ্ডলীর শিক্ষাও আমাদের ভার ন্যস্ত হ'বে ফিল্‌মওয়ালাদের ওপর; তাঁরা অবিশ্রান্ত খেলো রসিকতা আব শস্তা ন্যাকামির পসরা বহন করে' জনগণের সঘন করতালি লাভ কর্‌বেন। কবিতা পৃথিবী থেকে উঠে যা'বে, কারণ সবাই তা বোঝে না, গান আর ছবি একেবারে লুপ্ত হ'বে, কাবণ ও-সব বোঝবার মত কান বা চোখ যাঁদের আছে, তাদের সংখ্যা হাজারকরা একও নয়। সেই বৈচিত্র্যহীন জগতে মানুষের স্থূলতম প্রবৃত্তিগুলি ছাড়া সব যাবে মবে'; ফলে সব মানুষই এক রকম হ'যে যাবে — অর্থাৎ, মানুষে আর কলে খুব বেশি তফাৎ থাক্‌বে না।

'সুলভতার এই নব্যতন্ত্রে আমাদের কোনো স্থান নেই — তোর আর আমার। আশা করি নিজের সম্বন্ধে তুই সম্পূর্ণ সচেতন। তোর রক্তের মধ্যে যে-শ্রেষ্ঠতার বীজ আছে, এবং এতদিনকার শিক্ষা ও অনুশীলন যা'র বিকাশের সহায়তা করেছে, আশা করি তুই তার অমর্যাদা কর্‌বি নে। আত্ম-সমর্পণের একটা প্রবল মোহ আছে —সেটাও সুলভ। তোর পক্ষে তার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারা উচিত। বিশেষত আমাদের দেশে এ ভয় খুব বেশি। আমরা পরাধীন ও সেন্টিমেন্টাল জাত; একটু কিছু হ'লেই 'জয় মা' বলে' বন্যায় গা ঢেলে দিতে

পার্‌লেই আমরা খুসি। তুই আর আমি সব ক্ষণিকের উত্তেজনার ওপরে, জীবনে ও আচরণে, বুদ্ধিতে ও চিন্তায় আমরা মহার্ঘ সৌন্দর্যের উপাসক; বাঙলা দেশ আমাদের মনের মাতৃভূমি নয়, এবং দৈবাৎ আমরা দু'শতাব্দী পরে জন্মগ্রহণ করে ফেলেছি!'

বাবার কথা শেষ পর্যন্ত শুনে' আমি বললাম, 'বৃথাই আমাকে এত কথা বল্‌লে বাবা। বিয়ের চিন্তা এখনো আমাব মন থেকে ঢের দূরে। এবং যদি কখনো সে-চিন্তার উদয় হয় তো যথাসময়ে তোমাকে তা জ্ঞাপন কর্‌তে ভুল্‌বো না।'

'সে আমি জানতাম। কিন্তু তুই যখন বিলেতে পড়্‌তে যাওয়া ঠিক কর্‌লি, তখন তোকে এ-কথা না বলেও পার্‌লাম না। — বুঝলি তো?'

'বুঝেছি বই কি। কিন্তু আজকাল যে বাঙালী ছেলেরাও মেম বিয়ে করে' আসে না, বাবা!'

বাবা শুধু বল্‌লেন, 'বুদ্ধিমতী মেয়ে আমার!'

কাজেই দেখতে পাচ্ছিস, জুলাইর মাঝামাঝি আমবা দেশ ছাড়ছি, তাই মাসখানেকেব মধ্যেই কল্‌কাতায় ফেরা দরকার। জাহাজে ওঠবার আগে তোর সঙ্গে অল্প কয়েক দিনেব জন্যে দেখা হবে, এবং সেই ক'টি দিনের প্রতি আমি উৎসুক হৃদয়ে তাকিয়ে আছি। তিন চার বছরের মত তোর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হ'বে এবার — ফিরে এসে তোকে একেবারে গৃহলক্ষ্মীরূপে না দেখি, তা হ'লেই বাঁচি। এ ক'টা বছর আমি আর যা-ই করি, হৃদয়বৃত্তি চর্চা করবার অবকাশ পাবো না — যদি অবিশ্যি কোনো ইংরেজ ছোক্‌রার প্রেমে না পড়ে' যাই।

ঠিক ঐ কাজটিই যেন আমি না কবি, বাবা সেদিন স্পষ্ট কবে' তো এ-কথাই বলে গেলেন। আমাব মনের কথা যদি জিজ্ঞেস্ করিস্ তো বল্‌তে পারি, সে-ভয় আদৌ নেই। জানি, তিনি সর্বক্ষণ আমার কাছে-কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তবু তাঁকে দেখতে পাই নে কেন? আমরা, দু'জন অন্ধকার রাত্রিতে মশাল হাতে নিয়ে অসংখ্য নর-নারীর মধ্যে পবস্পবকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, — কতবার হয় তো পরস্পরকে পাশ কাটিয়ে গিয়েছি, অন্ধকাবে চিনতে পারি নি। কিন্তু যে-মুহূর্তে মশালের আলোকে তাঁর মুখ তারার মত জ্বলে উঠবে, অম্‌নি সব সংশয় দূর হবে; সকল অন্বেষণেব হ'বে পরিসমাপ্তি।

বাবা আমার ঘব থেকে চলে যাওযার পর সেদিন অনেকক্ষণ চুপ করে' শুয়েছিলাম, হঠাৎ কি মনে হ'ল, জানিস্? মনে হল, আর দেবি নেই — সে শুভ-মুহূর্ত সমাগতপ্রায়, আমাব এই বিলেত যাত্রাব প্রস্তাবনা যেন তাবি দূত রূপে এসেছে। এই যে আমি তিন-চাব বছরের মত তাঁকে পাবার সম্ভাবনা অতিক্রম কব্‌তে উদ্যত হয়েছি —-এত বিলম্ব কি তিনি সইবেন? কলম্বাস্-এর সেই অকস্মাৎ আবির্ভূত বিহঙ্গশ্রেণীর মত আমার এই প্রবাস-যাত্রাব সঙ্কল্প যেন পরম-আকাঙ্ক্ষিত উপকূলের নিকটবর্তিতা নির্দেশ কর্‌ছে, নিজের তপোবলে তাঁকে আবিষ্কার কর্‌বার আনন্দ আমাকে দান কর্‌বেন বলে'ই সেই স্বয়ম্প্রকাশ আত্ম গোপন করে' আছেন।

এখানকার এই নির্জনতায় নিজেকে বড বেশি প্রাধান্য না দিয়ে উপায় নেই। এখানে আমিই আমার একমাত্র সঙ্গী। নিজের মনেব এই-সব চঞ্চলতা নিয়ে বিলাস কর্‌তে-কব্‌তে সন্দেহ হয় যে আমি এদের প্রতি যতটা মূল্য আবোপ কব্‌ছি, সে মূল্য অন্য লোকেও দিতে প্রস্তুত কি-না। কল্‌কাতায ফিবে যেতে ইচ্ছে কব্‌ছে, আমাব মনেব এই অস্পষ্টতম গতিবিধিগুলো তুই একাই বুঝতে পার্‌তিস্। নিজেব ওপব বিশ্বাস যখন টল্‌মল কবে' উঠ্‌ছে, তখন তোব চোখেব প্রশান্ত নির্মলতার দিকে তাকিয়ে হয় তো আশ্বাস পেতাম। আকাশ আর পদ্মানদী'কে নিয়ে দিন কাটাতে কাটাতে মন এখন হাঁপিয়ে উঠেছে।

এই কথা লিখতেই মনে পড়্লো যে কাল্কে বেশ মজার একটা ব্যাপার হ'য়ে গেছে। সকাল থেকেই হাওয়ার তাড়া খেয়ে আকাশে মেঘগুলো ছুটোছুটি করে' বেড়াচ্ছিলো। দুপুরটি ছিলো ছায়া-ঢাকা স্নিগ্ধ। বৃষ্টি নেই, অথচ বাতাস বেশ জোরে বইছে। ধূসর আকাশ আর সজল বায়ুতে মিলে মনের ওপর যে একটি কোমল আবেশের সঞ্চার করে, তা কাটিয়ে ওঠ্‌বার জন্য আমি টমাস্ ব্রাউন-এর 'রিলিগিয়ো মেডিচি' পড়্‌তে বস্‌লাম। কিন্তু প্রথম কয়েক লাইন পড়ার পর মন ও চোখ দুই-ই ক্লান্ত হ'য়ে এলো। দূর ছাই—বরঞ্চ বাইরে থেকে খানিকক্ষণ ঘুরে আসি। 'আমাদের বড় দীঘিটার জল মেঘের ছায়ায় কালো হ'য়ে নিশ্চয়ই কূলে-কূলে টল্‌মল্ করে উঠ্‌ছে! —বইখানা হাতে করে'ই বেরিয়ে পড়্‌লাম।

দীঘিটা আমাদের বাড়ি থেকে বেশ খানিকটা দূরে। তিনটে বড়-বড় আঙিনা পেরিয়ে সুবৃহৎ দুর্গা-মণ্ডপ — বহু কালের অব্যবহারে ম্লান। তার পর কয়েক ঘর মালী-বাড়ি — আমাদেরই রায়ৎ। সেই বাড়িগুলো পেরিয়ে খানিকটা ফাঁকা জায়গা, — বিকেলে মালীর ছেলেরা ওখানে হা-ডু-ডু খেলে। তার পর দীঘি — মস্ত দীঘি, ওপারে পানের বরজ্ একটা.— একধারে বাঁধানো ঘাট। সারা গ্রামের পানীয় জল এই দীঘি থেকে সরবরাহ হয়। ঐ ঘাটে দাঁড়িয়ে পদ্মার রূপালি ঝিকিমিকি চোখে পড়ে। লোকে বলে, মাটির তলা দিয়ে পদ্মার সঙ্গে এই দীঘির গোপন যোগাযোগ আছে, তাই এর জল অত মিষ্টি।

সকাল-সন্ধ্যায় এই দীঘিতে লোক-চলাচলের অভাব হয় না, কিন্তু এই ভব্-দুপুরবেলা চার্‌দিক শূন্যতায় ঝাঁ-ঝাঁ কর্‌ছে ; এত নীরব যে চড়ুই পাখীদের ডানাব ঝাপটানিও শুন্‌তে পাওয়া যায়। বাঁধানো ঘাটের নীচের দিকটাব একটা সিঁড়িতে বসে' আমি হাতের বইখানা খুল্‌লাম।

হাওয়ার দাপটে দীঘির জল ছোট-ছোট ঢেউ তুলে আমার পায়েব কাছে লুটিয়ে পড়ছিলো , তাদের ছলছলানি শুন্‌তে-শুন্‌তে কি আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম, না আমার মন বইয়ের মধ্যেই ডুবে গিয়েছিলো, তা এখন বল্‌তে পারবো না। কিন্তু হঠাৎ জলের মধ্যে ভয়ানক একটা তোলপাড়ের শব্দ শুনে' আমি চম্‌কে উঠলাম। তাকিয়ে যা দেখ্‌লাম. তা এই ঃ

আমি যেখানে বসেছিলাম, তা'র একটু দূবে একটা জামরুল-গাছ, তা'র কয়েকটা পত্রঘন শাখা সাম্‌নের দিকে ঝুঁকে পড়ে দীঘিব জল-স্পর্শ কর্‌তে উদ্যত হয়েছে, — মাঝে-মাঝে দু'একটা শুকনো পাতা টুপ্‌টাপ্ করে' খসে' পড়্‌ছে। সেই গাছের আড়ালে লুকিয়ে একটা লোক বসে' ছিপ্ দিয়ে মাছ ধরছে — এতক্ষণে আমাব চোখে পড়্‌লো। এইমাত্র বোধ হয় বেশ বড় রকমের একটা মাছ টোপ্ গিলেছে। এদিকে লোকটা প্রায় মাটিতে শুয়ে পড়ে' মাছটাকে ডাঙায় তুলে' আন্‌বার চেষ্টা করছে, ওদিকে আবার মাছটাও এই মর্মান্তিক বন্ধন থেকে ছাড়া পাবার জন্য নিদারুণ ছট্‌ফটানি সুরু করে' দিয়েছে। তারি ফলে ঐ তোলপাড়।

আমি যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছলাম, ততক্ষণে আমাদের মৎস-শিকারীর হয়েছে জয়. মস্ত একটা রুই মাছ ডাঙায় পড়ে হাঁপাচ্ছে এবং লোকটা উবু হ'য়ে তা'র মুখ থেকে বঁড়শির টোপটা খসাচ্ছে। মুহূর্তে আমার অধিকার-বৃত্তি সজাগ হ'য়ে উঠলো, লোকটার কাছে এগিয়ে এসে আমি রুক্ষ-স্বরে বল্‌লাম. 'এই তুমি এ দীঘি থেকে মাছ ধর্‌ছো যে বড়? জানো —'

কিন্তু সেই মুহূর্তে লোকটা আমার দিকে মুখ ফেরালো, এবং সঙ্গে-সঙ্গে আমি চুপ করে' যেতে বাধ্য হলাম। আশ্চর্য রকম বড় ও পরিষ্কার দুই চোখ মেলে সে একবার আমার দিকে তাকালো; — সে-দৃষ্টিতে তিবস্কারের তীব্রতা ও করুণা-ভিক্ষার নম্রতা দুই-ই দেখ্‌তে পেয়েছিলাম। তার পর চোখ নত করে' মৃদু মেঘ গর্জনের মত গম্ভীব কোমল স্বরে সে বল্‌লে, 'আমার মতন দুর্ভাগ্যকে অপমান করা আপনার সাজে না।' 'আপনার' কথাটির ওপর জোর দিয়ে বল্‌লে।

আমি একটু অপ্রস্তুতই হ'য়ে গেলাম। লোকটা ততক্ষণে ছিপটা সম্পূর্ণ খসিয়ে নিয়ে আবার বল্‌লে, 'এ দীঘি আপনাদের, এ-মাছের ওপরও আপনারই অধিকার। আপনার যদি দরকার থাকে তো বলুন্‌, নইলে মাছটাকে ফেরৎ পাঠিয়ে দি।'

আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, 'তা'র মানে?'

'আমি মাছ খাই নে।'

না জিজ্ঞেস করে' পার্‌লাম না, 'তবে — তবে ধবেন কেন?'

'এম্‌নি। সময় কাটাতে। — আপনি তা হ'লে চান্‌ না মাছটা?' বলে' তিনি সেটাকে পা দিয়ে আস্তে একটু ঠেলে দিলেন। অর্ধ-মৃত রুই গড়াতে-গড়াতে জলে গিয়ে পড়লো। মাছটা পারের কাছে অগভীর জলে খানিকক্ষণ ছট্‌ফট্‌ করে' তলাকার সমস্ত কাদা ওপরে পাঠিয়ে দিলে; তার পর যেই একবার গভীর জলের আশ্রয় পেলে, অমনি সব গেলো শান্ত হ'য়ে।

ভদ্রলোকের আচরণে ও কথাবার্তায় আমি ক্রমাগতই আশ্চর্য হচ্ছিলাম, কিন্তু সব চেয়ে বড় বিস্ময় পেলাম তখন, যখন তিনি উঠে দাঁড়ালেন। পুরুষ জাতকে যদি সুন্দর ও কুৎসিত এই দুই দলে বিভক্ত করতে হয়, তবে তাঁকে কুৎসিত না বলে' উপায় নেই। কিন্তু তিনি খর্বাকৃতি হ'লেও ক্ষুদ্র দেহ নন্‌। প্রশস্ত, বলিষ্ঠ কাঁধের ওপর সিংহের মত প্রকাণ্ড, তেজব্যঞ্জক মাথা, দীর্ঘ বাহু কঠিন সরলতায় পৌরুষের রুক্ষতা, কিন্তু হাত দু'খানা নারী সুলভ, মুখের চেয়ে তা'দের রঙ্‌ ফর্সা। পরিচ্ছন্ন নখগুলিতে রক্ত যেন ফেটে পড়্‌ছে।

সিংহের মত সেই মাথায় শিশুর মত স্বচ্ছ ও করুণ চোখ; আমার দিকে একবার পরিপূর্ণ দৃষ্টি ফেলে নত-মস্তকে যেন আমার কথা-বলার অপেক্ষা করতে লাগ্‌লেন। বল্‌লাম, 'এক মাসের ওপরে আমি এখানে আছি, কিন্তু আপনাকে কখনো দেখেছি বলে' তো মনে পড়্‌ছে না।'

'আমার এ অনিচ্ছাকৃত অপরাধ মার্জনা করবেন, কারণ আমি কাল মাত্র এখানে এসেছি।'

কথাটা আমার কানে ব্যঙ্গের মত শোনালে। হেসে বল্‌লাম, 'আপনার স্পর্ধা আছে। আমার কথাটা অভিযোগ নয়।'

ভেবেছিলাম, আমার এ-কথা শুনে' ভদ্রলোক যা'বেন চটে,' কিন্তু চটা দূরে থাক্‌, তিনি তাঁর স্বভাবত মৃদু কণ্ঠস্বর আরো নামিয়ে বল্‌তে লাগলেন, 'কাল এখানে এসেই শুন্‌লাম, আপনারা এসেছেন। আপনারা সমাজের শীর্ষতুল্য, আমার উচিত ছিলো কাল্‌কেই এসে আমাব অভিবাদন জানিয়ে-যাওযা, কিন্তু তিন দিন রেলে-জাহাজে কাটিয়ে আমি পথশ্রমে ক্লান্ত ছিলাম। আমার এই আপাত-অবহেলার জন্য আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি।' বলে' ঈষন্নত মস্তক তিনি আরো অবনত কর্‌লেন।

মুখের এই অতিরিক্ত বিনয়ের অন্তরালে মনের যে অসম্ভব অহঙ্কার প্রচ্ছন্ন ছিলো, তা আমার আত্ম-সম্মানে ঘা দিলে। অসহিষ্ণুভাবে বলে' উঠলাম, 'তা ব কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিলো না।'

বলে'ই দ্রুত পদক্ষেপে সেখান থেকে চলে' আস্‌ছিলাম, কিন্তু অল্প একটু যেতেই সেই ভদ্রলোক এসে আমাব পাশে দাঁড়ালেন। না থেমে বল্‌লাম, 'বলুন।'

চল্‌তে-চল্‌তে তিনি বল্‌লেন, 'অপরাধ গ্রহণ কর্‌বেন না, কিন্তু আপনার হাতের বইখানা যদি একদিনের জন্য আমাকে ধার দেন, তবে কাল্‌কে আর আমাকে আপনাদের দীঘিতে অনধিকার-চর্চা করতে আস্‌তে হয় না।'

তাচ্ছিল্যভরে বললাম, 'কিন্তু ও তো গল্পের বই নয়!'

ভদ্রলোক উৎফুল্লস্বরে বললেন, 'না, নয়। কিন্তু গল্পের মত সুখপাঠ্য ও কবিতার মত ছন্দশীল। আপনার হাতে যে-বইখানা দেখ্‌ছি, তা'র চেয়ে তাঁর 'Urn Burial' আরো চমৎকার। পড়েছেন নিশ্চয়ই?'

হঠাৎ থেমে গেলাম। তার পর ফিরে তাঁর মুখোমুখী হ'য়ে দাঁড়াতেই তাঁর মুখের এক আশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষ্য কর্‌লাম। এইমাত্র যা উৎসাহে ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় উজ্জ্বল ছিলো, আমার দৃষ্টি তা'র ওপর পড়তেই লজ্জায় ও আশঙ্কায় তা মলিন হ'য়ে এলো। বল্‌লাম, 'এই নিন্।'

বইখানা নেবার জন্য তিনি যে-হাতখানা বাড়ালেন, তা'র আঙুলের ডগাগুলো একটু একটু কাঁপছিলো। বইখানা তাঁর হাতে দিয়ে আমি আমার মধুরতম হাসি হেসে বললাম, 'আচ্ছা, নমস্কার।' বলে' দু'হাত একত্র করে' কপালে ঠেকালাম।

প্রতি নমস্কার করে' তিনি বললেন, "আমার সৌভাগ্য!' কিন্তু ও দু'টি কথা তিনি যে গাম্ভীর্যের সহিত উচ্চারণ কর্‌লেন, তা'তে আমার মনে হ'ল, তিনি ধ্বনিবহুল সংস্কৃত ভাষায় বল্‌লেন, 'কৃতার্থোঽহং দেবি।'

বাড়ি ফিরে' এসে মনে হ'ল যে ভদ্রলোকের সম্বন্ধে অনেক জরুরি কথাই জানা হয় নি। নাম জিজ্ঞেস করাটা অবিশ্যি আধুনিক আদব-কায়দাব অনুযায়ী নয়; — কিন্তু তিনি নিশ্চয়ই এ-গ্রামেরই লোক, নইলে আমাদের সম্বন্ধে অমন সম্ভ্রম-সহকারে কথা বল্‌বেন কেন? আর অত জানবেনই বা কি কবে'? ওদিকে আবার তিন দিন রেলে-জাহাজে কাটিযে এলেন, — অত দূরে কোন্ দেশ? বোম্বে? পণ্ডিচেরী? রেঙ্গুন? অত দূর দেশে কি করেন তিনি? অরবিন্দর শিষ্য বা সব্যসাচীর পকেট্-সংস্করণ নন্ তো? অথচ টমাস্ ব্রাউন-ও পড়া আছে! আধুনিক যুগের কোনো সাহিত্য-সম্রাট হ'লে একটুও আশ্চর্য হ'তাম না; কিন্তু এই সেকেলে লেখকের অদ্ভুত ভাষা ও তা'র চেয়েও অদ্ভুত চিন্তার রসোপভোগ কর্‌তে পারে, এমন লোকও আজকালকার দিনে আছে?

আসল কথা এই যে এই মৎস্য শিকারীর সম্বন্ধে আমি বিষম কৌতূহল অনুভব কর্‌ছি। তাঁর বাড়ি কোন্ দিকে, জিজ্ঞেস কর্‌তে ভুল হ'য়ে গেছে, আশা কর্‌ছি, শীগ্‌গিরই একদিন এসে তিনি বইখানা ফেবৎ দিযে যা'বেন।

তুই তো মানব-চরিত্রের একজন মস্ত বড় সমঝদার , -- আমার চিঠি পড়ে' এই ভদ্রলোকেব একটা চরিত্র চিত্রণ লিখে' পাঠাতে পার্‌বি? যদি সুযোগ হয়, আসলটিব সঙ্গে মিলিযে দেখ্‌বো। ইতি —

তোর লীনা।

সোনারঙ

২২শে জ্যৈষ্ঠ

নীলা,

বইখানা দিতে তিনি নিজে আসেন নি, আজ সকালে একটা চাকরকে দিযে সেখানা ফেরৎ পাঠিয়েছেন। কিন্তু অনামনস্কভাবে বইখানা একবার খুল্‌তেই তা'র মধ্যে আবিষ্কাব করলাম ডাকঘরের ছাপ-আঁকা খালি একটা খাম—ওপরে নাম লেখা 'শ্রীবিদ্যাপতি বন্দোপাধ্যায়' — এবং ঠিকানা কলম্বোব। খামখানা বোধ হয় পেইজ্ মার্ক্ হিসেবে ব্যবহাব করা হযেছিলো, তাব পর আব স্থানান্তরিত করতে মনে ছিলো না।

কোনো অপরিচিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'লে তা'র নাম-ধাম-বিবরণ জান্‌বার প্রথা আমাদেব দেশে আছে। প্রথম দুটি দৈবাৎ জান্‌তে পেরে তৃতীয়টি জানবার জন্য আমার কৌতূহল আরো বেড়েই গেলো। কলম্বোটা অবিশ্যি দুর্বোধ্য নয় — অন্ন-অন্বেষণে আজকাল মানুষ কোথায় না যেতে পারে? কিন্তু তাঁর ঐ নাম—মধুসূদনের কোনো পদের অংশ বিশেষের মত গুরুগম্ভীর তাঁর ঐ নাম আমাকে চঞ্চল করে' তুল্‌লো।

মনে হ'ল, ও-নাম যেন আমাব অচেনা নয় এক কালে যে ঐ নামেব সঙ্গে আমাব খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিলো, এখন তা ভুলে গেছি। অথচ, ও-নামের কাউকে কখনো চিনতাম কিনা, না

কারো মুখে শুনেছি বা কোনো বইতে পড়েছি— হাজার চেষ্টা করেও তা মনে কর্‌তে পারলাম না। জানিস্ তো, আমাদের স্মরণ-শক্তি কি অদ্ভুতরকম খামখেয়ালী; সাধারণ অবস্থায় তা'র মধ্যে সামান্য একটু শ্লথতা খুঁজে পাবি নে; দশ বছর আগেকার কোনো ঘটনাও অনায়াসে বিবৃত করে যাওয়া যায়; কিন্তু যদি কেউ হঠাৎ 'নির্নিমেষ' বানান জিজ্ঞেস করে' বসে, বা 'Sorrows of Satan'-এর লেখিকার নাম জান্‌তে চায় — তা হ'লেই হয় মুস্কিল। এবং যে-হেতু 'বিদ্যাপতি'-নামের ইতিহাস জান্‌তে আমার মন উন্মুখ হ'য়ে উঠেছে, সেই জন্যই সুযোগ বুঝে' আমার স্মৃতি-শক্তি দিতে সুরু কর্‌লেন ফাঁকি, এবং দুপুর পর্যন্ত আমি অসহ্য যন্ত্রণায় কাটালাম। সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে ঐ নামের বৈষ্ণব কবির কথাও আমার একটিবার মনে পড়্‌লো না। কিন্তু তা'র পরেই আমার প্রশ্নের উত্তর মিললো। আমার তখনকার বিস্ময়টা তুই সহজেই অনুমান করতে পার্‌বি, দুপুরে খেতে বসে বাবা যখন বল্‌লেন ঃ

'লীনা, পরশু বড় দীঘির ধারে তোর যার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো, তিনি সীতাপতি চৌধুরীর দৌহিত্র।'

এতক্ষণ যে-নামরহস্য আমাকে পীড়া দিচ্ছিলো, বাবার কথা শোনামাত্র তা জলের মত পরিষ্কার হ'য়ে গেলো। মনের দরজায় কোথায় যেন একটা খিল পড়ে গিয়েছিলো, তা চট করে খুলে গেলো — এবং সঙ্গে সঙ্গে এখানে আসবার দিন স্টীমারে বাবার মুখে যে-সব কথা শুনেছিলাম, তা'রা হৈ-চৈ করে' ফিরে আস্‌তে লাগলো। 'সীতাপতি'-নামের সঙ্গে সাদৃশ্যের জন্যই যে ঐ ভদ্রলোকের নাম আমার চেনা চেনা ঠেকছিলো, তা এতক্ষণে বুঝলাম।

'কি করে' জানলে, বাবা? মানে, আমার সঙ্গে যে দেখা হয়েছিলো, সে খবর?'

'তাঁরই মুখে শুনলাম। আজ সকালবেলা ডাকঘরে দেখা। আমি চিন্‌তে পারি নি। উনিই প্রথমে নমস্কার করে' বল্‌লেন, "ভালো আছেন তো?"

"তা আছি। কিন্তু আপনাকে তো —"

"আমাকে চিন্‌তে পারছেন না? পার্‌বার কথাও নয়। কিন্তু আপনার সঙ্গে ইতিপূর্বে আমার দু'বার দেখা হয়েছে।"

'আপাদমস্তক তাঁকে নিরীক্ষণ করলাম। আশা করেছিলাম, মুখের কোনো রেখায় বা দেহের কোনো ভঙ্গীতে বহুদিনের বিস্মৃত কোনো ক্ষণিক পরিচয়ের আলো জ্বলে উঠবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হতাশ হ'তে হ'ল। ভদ্রলোকে আমার অকৃতকার্যতা লক্ষ্য করে' বললেন ঃ

"আপনার লজ্জিত হ'বার দরকার নেই, কেননা, প্রথম বার দেখা হয় মাদুরা রেলোয়ে স্টেশনে — নিশাকালে। আপনি যে গাড়ি থেকে নাবছিলেন, আমি সেই গাড়িতে উঠছিলাম। দ্বিতীয়বার আপনাকে দেখি কল্‌কাতায় রামমোহন লাইব্রেরিতে — স্টেলা ক্রাম্‌রিশ-এর বক্তৃতা হচ্ছিলো।"

'আমি হেসে উঠ্‌তে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তিনি বল্‌তে লাগলেন, "আর পরশু দিন আপনার মেয়ের সঙ্গে — হ্যাঁ, এক রকম পরিচয়ই হয়েছে।"

'আমি কিছুই বুঝতে না পেরে ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তখন তিনি তাঁর মাছ-ধরা থেকে বই ধার নেয়া পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন।

'আদ্যোপান্ত শুনে' আমি বললাম, "সত্যি? কিন্তু লীনার দোষ কি, বলুন? ও তো আপনাকে চেনে না! ঐ দেখুন — আপনার পরিচয় জিজ্ঞেস করতে আমিও ভুলে' গেছি।"

'পোস্টমাস্টার বাবু এতক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে আমাদের কথাবার্তা শুন্‌ছিলেন; এইবার তিনি আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার কর্‌বার জন্য এগিয়ে এলেন। তাঁর মুখ থেকেই আমি বিদ্যাপতি বাবুর পরিচয় শুন্‌লাম।

'বিস্মিত হ'তে হ'ল। কিন্তু পরমুহূর্তে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে মনে হ'ল যে তাঁর মুখের ওপর সীতাপতি চৌধুরীর সেই আশ্চর্য চোখ দুটি আমি প্রথম দেখেই কেন চিন্‌তে পারি নি? বাল্যকালে আমার কল্পনায় যিনি শুধু ঈশ্বরের চেয়ে ছোট ছিলেন, সেই সীতাপতি চৌধুরীর একমাত্র রক্ত সম্পর্কিত ও উত্তরাধিকারীকে দেখলাম, — মনে হ'ল, এ যেন আমার কত বড় সৌভাগ্য।'

এইখানে বাধা দিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তখন আমার হ'য়ে তুমি খুব ক্ষমা চাইলে তো?'

বাবা হেসে বল্‌লেন, 'ও সব লৌকিকতার কোনো প্রয়োজন তাঁর কাছে ছিলো না। তাঁকে বললাম, ''আপনাকে দেখে আমার মন আজ আনন্দিত হ'য়ে উঠ্‌ছে, কারণ আপনার সঙ্গে এমন - একজনের স্মৃতি বিজড়িত, যিনি আমার সমগ্র জীবনের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছেন।''

'ঐ কেতাবী ভাষায় তুমি কথা কইলে বাবা?'

'বক্তব্য বিষয়টা যখন বইয়ে লেখবার মত হয়, তখন ভাষাটাও সেই অনুসারে তৈরি হয়ে ওঠে বই কি।'

'তাই নাকি? যাক্‌ — তার পর?'

'তার পর আমরা দু'জন ডাকঘর থেকে বেরিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগলাম। অনেক আলাপ হ'ল। সাংসারিক ব্যাপারে সীতাপতি চৌধুরীর ঔদাসীন্য সব চেয়ে মারাত্মক হয় তাঁর মেয়ের পক্ষে। একমাত্র মেয়ের প্রতি অত্যধিক স্নেহবশত তিনি তাঁর বিয়ে দিতেই ভুলে যান। পিতার মৃত্যুর পর এই চতুর্বিংশতিবর্ষীয়া কন্যা আবিষ্কার করলেন যে পৃথিবীতে এখন তিনি সম্পূর্ণ নিরাশ্রয়।'

এইখানে মা বলে' উঠ্‌লেন, 'কী সর্বনাশ।'

'কিন্তু সৌভাগ্যবশত সীতাপতি চৌধুরী তাঁর সঙ্গীত-দক্ষতা মেয়েকে দিয়ে গিয়েছিলেন; ফলে তিনি কল্‌কাতায় এক গানের ইস্কুলে' —

মা বল্‌লেন, 'কিন্তু দেশের বিষয়-সম্পত্তি?'

'জানোই তো, তোমার শ্বশুরের পূর্বপুরুষদের কল্যাণে তাঁর নামে মাত্র অস্তিত্ব ছিলো। তাছাড়া, শুধু অর্থ হ'লেই মেয়েদের চলে না। তদ্ব্যতীত যা প্রয়োজন, তা তাঁর ভাগ্যাকাশে অনতিবিলম্বেই উদিত হ'ল।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কে সেই ভাগ্যবান?'

'এক দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট সাহিত্যিক। বিয়ে করে' তাঁর অর্থকষ্ট ঘুচলো। কিন্তু সে-সুখ তাঁর কপালে বেশিদিন সইলো না। বছর তিনেক পর তিনি গেলেন মারা। বিদ্যাপতি বাঁড়ুয্যে তখন এক বছরের শিশু।'

মা রুদ্ধস্বরে বলে' উঠলেন, 'তার পর কি হ'ল?'

'হ'বে আবার কি? সেই সাহিত্যিকজায়া কত কষ্ট করে' যে ছেলেটিকে মানুষ করে' তুল্‌তে লাগলেন, তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু বিদ্যাপতিবাবু ও-প্রসঙ্গ যেন এড়িয়ে গেলেন মনে হ'ল — সম্প্রতি তাঁর মাতৃ-বিয়োগও হয়েছে কিনা। মা-র অবিশ্যি যথেষ্ট বয়স হয়েছিলো, কিন্তু বিদ্যাপতিবাবু বোধ হয় এই অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনাকে এখন পর্যন্ত ক্ষমা করে' উঠতে পার্‌ছেন না।'

মা ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বল্‌লেন, 'কী যে বলো। আর-কেউ নেই যা'র —'

'হ্যাঁ, সত্যি। একান্ত স্বজনহীনতা যে কত বড় দুর্ভাগ্য, তা আমাদের বুঝতে পারার কথা নয়।'

'তা এই বিদ্যাপতিবাবু কি কর্‌ছেন এখন?' মা শুধোলেন।

'কলম্বোর এক বৌদ্ধ মিশনারী কলেজে ইংরেজি সাহিত্য পড়ান্ ও মাঝে মাঝে ছুটি পেলে এইখেনে আসেন। জানো তো, আমাদের জন্যই আজ তাঁর এই দুরবস্থা। তাঁর কথা শুন্‌তে শুন্‌তে আমি লজ্জিত হ'য়ে উঠ্‌ছিলাম ; আমার পূর্বপুরুষেরা আমার ঘাড়ে যত অন্যায়ের ঋণ চাপিয়ে গেছেন — মনে হচ্ছিলো, তা যেন আমার শোধ করা উচিত।'

মা হাস্‌তে-হাস্‌তে বল্‌লেন, 'সে-উদ্দেশ্যে কি কর্‌লে তুমি?'

'চল্‌তে চল্‌তে যখন আমাদের দুজনের দুদিকে যাবার সময় হ'ল, আমি একটু থেমে বললাম, ''যদ্দিন এখানে আছি, আপনার সঙ্গলাভের জন্য নিশ্চয়ই আশা করতে পারি?''

'তিনি অল্প একটু হেসে বল্‌লেন, ''আপনাদের যদি তাই অভিরুচি হয়, আমার কোনো মতান্তর নেই, জান্‌বেন।''

'ফলে আমি তাঁকে নিমন্ত্রণ করে' এসেছি। আজকে রাত্তিরে।'

আমি বলে উঠলাম, 'আজকেই?'

'হ্যাঁ, আজকেই। তোর মত জিজ্ঞেস্ করবার সময় ছিলো না, কিন্তু তোর কোনো আপত্তি নেই নিশ্চয়ই?'

'না, না — আপত্তি কিসের?' সংক্ষেপে উত্তর দিয়ে আমি ভাবতে লাগলাম, বিদ্যাপতিবাবু ঐ কথাটা অমন করে বল্‌লেন কেন? 'আপনাদের যদি তাই অভিরুচি হয়, আমার কোনো মতান্তর নেই, জানবেন' 'আপনাদের' কেন? আর, 'আমার কোনো মতান্তব নেই জানবেন,' এ-কথার মানে তো শুধু সম্মতি নয়, বরং সাধারণ ভাষায় তর্জমা কর্‌লে তা অনেকটা এইরকম দাঁড়ায় ঃ 'যা অনিবার্য, তা'র সঙ্গে সংগ্রাম করা চলে না, বিনা দ্বিধায় তা'র হাতে আত্ম-সমর্পণ করা ভিন্ন উপায় নেই।'

সে যাই হোক্, আর ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে বিদ্যাপতিবাবু স্বয়ং আর্বিভূত হ'বেন, আপাতত এই আশা করা যাচ্ছে। এবং এইমাত্র খেয়াল হ'ল যে এখনো আমার সাজসজ্জা বাকি। সুতবাং — যদিও তোকে আরো অনেক কথা বল্‌বাব ছিলো। আজকেব মত এইখানেই ইতি।

তোর লীনা।

— নং বীডন স্ট্রীট

২৩ শে জ্যৈষ্ঠ

লীনা,

আজকেই তোকে চিঠি লিখতাম না, কিন্তু পর পর তোর দুখানা দীর্ঘ চিঠি পেয়ে তোব সম্বন্ধে আমি এতদূর উৎকণ্ঠিত হয়েছি যে বিস্তর কাজেব মধ্যেও তোকে দু'চার কথা লেখবাব সময় করে নিতে হচ্ছে।

আমি তোকে সাবধান করে' দিতে চাই, লীনা — তোর ঐ নব পরিচিত বিদ্যাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্বন্ধে। তোর চিঠি দু'খানা পড়ে' তাঁকে আমি যেমন চিনেছি, আমি তাঁর আজন্ম-পরিচিত হ'লেও তার চেয়ে ভালো চিন্‌তাম না। যে-দুর্ভাগ্য তাঁর মাকে ক্ষমায়, নম্রতায়, সহনশীলতায় মধুর করে তুলেছিলো, সেই দুর্ভাগ্যই তাঁকে হিংস্র, স্বার্থপর ও প্রতিহিংসা-পরায়ণ করে' তুলেছে। এটা অবিশ্যি তাঁর অপরাধ নয়, নারী ও পুরুষের প্রকৃতিগত পার্থক্যই এখানে। দৈব-দোষে বিদ্যাপতিবাবু যে-সব দুঃখ-কষ্ট পেয়েছেন বা পাচ্ছেন, সেগুলো মেনে নেবার মত উদারতা বা কাটিয়ে ওঠার মত শক্তি তাঁর নেই; খাঁচায় অবরুদ্ধ চিতাবাঘের মত তিনি ছট্‌ফট্ করে বেড়াচ্ছেন ; — এবং ভাবছেন, অন্য কাউকে অসুখী কর্‌তে পার্‌লে বুঝি তাঁরো শান্তি হ'বে। তাঁর যে-প্রচণ্ড অহঙ্কারের ফলে তাঁর মুখের প্রায় প্রত্যেকটি কথা বিদ্রূপের মত শোনায়, সে ই তাঁর চরিত্রের কলঙ্ক, কারণ অতখানি অহঙ্কারের যোগ্যতা তাঁর

নেই। এবং তিনি তা জানেন। জানেন বলে'ই প্রকাণ্ড অভিমানের ভান করে' লোকচক্ষে তিনি সেই অভাব পূরণ কর্‌তে চান্‌। যেটা অহঙ্কার বলে মনে হয়, আসলে সেটা তাঁর ইন্‌ফিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্স।

এ-কথা অবিশ্যি ঠিক যে প্রথম-দর্শনে এই ধরণের লোকের মস্ত একটা আকর্ষণী শক্তি আছে, এবং বিপদ সেই কারণেই সমূহ। শোনা যায়, বায়রনকে প্রথম দেখে ইংল্যাণ্ড-এর সুন্দরীবৃন্দ সবাই মনে-মনে বলে' উঠ্‌তেন, 'That pale face is my fate'। তুই কি অস্বীকার কর্‌তে পার্‌বি যে এ-ক'দিন ধরে তেম্‌নি একটা চিন্তা তোর মনে আনাগোনা করছে? কিন্তু ঐ কথাটা বাঙ্‌লায় বলতে গেলে কি হয়, জানিস্‌? ঐ মুখই আমার কাল হ'বে।' কারণ সেই মহিলাদের পক্ষে বায়রন যে কালই হ'তেন, সে-বিষয়ে সন্দেহ কি? বায়রন-এর জাতের লোকেরা উগ্র, দয়াহীন, বে-পরোয়া—এঁরা না কর্‌তে পারেন, এমন কাজ নেই। তাই তাঁদের সংস্রব বর্জনীয়। সাপের মত এঁরা আকর্ষণ করেন — তা'র ফল হয় মর্মান্তিক। বিদ্যাপতিবাবু ঐ শ্রেণীর মানুষ; প্রতিকূল অদৃষ্ট ও নির্বান্ধবতা তাঁকে রুক্ষতরো করেছে। আমার মনে হয় — মনে হয় কী? নিশ্চয়ই — তিনি এরি মধ্যে তোর ওপর অনেকখানি মোহ বিস্তার করেছেন; কিন্তু তোর মনের স্বাভাবিক মোহ-বিমুখতা ও বুদ্ধির অত্যুজ্জ্বল তীক্ষ্ণতা শেষ পর্যন্ত তোকে রক্ষা কর্‌বেই, এই বিশ্বাসে নির্ভরশীল, তবু তোর জন্য উদ্বিগ্ন ও তোর চির-কল্যাণকামী বন্ধু,

নীলা।

সোনারঙ্‌
২৫শে জ্যৈষ্ঠ
প্রাণাধিক নীলা,

তোর সংক্ষিপ্ত—অর্থাৎ সম্যকরূপে ক্ষিপ্ত — চিঠিখানা পেয়ে আমি কিন্তু মোটেও বিচলিত হই নি। তোর কল্যাণ-কামনার জন্য ধন্যবাদ, কিন্তু আমার দিক থেকে এটুকু বল্‌তে পারি যে বিপদ এখনো ততটা ঘনিয়ে আসে নি। সুতরাং তোর মহামূল্য উৎকণ্ঠার বাজে খরচ কর্‌তে নিষেধ কর্‌ছি। জমিয়ে রেখে দে — কোনোকালে কাজে লাগ্‌তে পারে।

অথচ ইচ্ছে কব্‌লে তোর কথারও যে উত্তর না দিতে পারি, এমন নয়। প্রথমেই একটা পুরোনো নীতিবাক্য উচ্চারণ কর্‌তে হচ্ছে। সে হচ্ছে এই যে শয়তানকে (এবং বায়রনকে) যত কালো করে' আঁকা হয়, তত কালো সে নয়। তুই যদি বলিস্‌ যে ও-কথা বলার কোনো মানে হয় না, তা হলে আমি বল্‌তে বাধ্য হ'ব যে বিদ্যাপতিবাবুর সঙ্গে ঐ দুই মহাপুরুষের চরিত্রগত কোনো সাদৃশ্যই নেই। ডন্‌ জুয়ান্‌ বা মেফিস্‌টোফিলিস্‌-এর অংশ নিয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন নি। উপন্যাসের নায়কের যে-কয়েকটি বড় বড় ছাঁচ আমাদের চোখের সাম্‌নে আছে, তাঁর কোনোটির মধ্যেই তিনি পড়েন না। বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুনের চোখ ঝল্‌সানো প্রখরদীপ্তিত্ব বা কবি-রামচন্দ্রের মর্মস্পর্শী কারুণ্যের মন ভোলানো মধুরতা — কোনোটিই তাঁর নেই। তাঁর মধ্যে সে মদিরতার অভাব, যাতে তাঁকে দেখামাত্র মনের নেশা ধ'রে যেতে পারে।

তার পর অহঙ্কার। বিদ্যাপতিবাবু অহঙ্কারী বটে, কিন্তু কে বল্‌বে সে-অহঙ্কারের যোগ্যতা তাঁর নেই? মানুষের মর্যাদা-নির্ধারণের সত্য উপায় যা-হয়েছে নয়, যা-হ'তে পারতো। তিনি দরিদ্র, এ হচ্ছে সাংসারিক সত্য, কিন্তু তা'র চেয়ে বড় সত্য হচ্ছে এই যে দারিদ্র্য তাঁকে মানায় না। সেই জন্যেই তাঁর মন বাস্তব অবস্থাকে অতিক্রম করে' যায়। অদৃষ্টের বিরুদ্ধে নিষ্ফল অভিযোগ কর্‌তে তিনি অভ্যস্ত নন্‌, কিন্তু তা'র প্রতিকূলতাকে স্বীকার করে' নিয়ে

মনের জন্মগত উদারতাকে খর্ব কর্‌তে তিনি নারাজ। ভাই, স্বভাব যাঁকে বড় করেছে, তাঁর জাত মার্‌বে কে?

এই আত্ম-শ্লাঘা যদি তাঁর সর্বস্ব হ'ত, তা হ'লেও তোর ব্যাখ্যা মেনে নিতে আমার কোনো আপত্তি ছিলো না। উগ্র লাল রঙয়ের গোলাপ দৃষ্টিকে পীড়া দিত, যদি না তা'র আশে-পাশে শ্যাম-পত্রগুচ্ছের ম্লানিমা দেখ্‌তাম। তেম্‌নি একটি স্বভাবজাত বিনয়ের কোমলতা তাঁর গর্বকে সুদৃশ্য করেছে। এবং ঐ দুটি জিনিষ তাঁর মধ্যে এমন ভাবে জড়িয়ে আছে যে, তা'দেরকে বিচ্ছিন্ন করে' দেখবার উপায় নেই। ইলেক্‌ট্রিক-এর কোন্‌ তারে নেগেটিভ, আর কোন্‌ তারে পজিটিভ শক্তি যাতায়াত কর্‌ছে জানি নে, কিন্তু এটুকু নিঃসন্দেহে বল্‌তে পারি যে দু'য়ের সম্মিলনেই পরমবাঞ্ছিত আলোর উৎপত্তি।

বলাই বাহুল্য, ইতিমধ্যে বিদ্যাপতিবাবুর সঙ্গে আরো দেখা হয়েছে, এবং আমার কাছে তিনি যেমন মনে হয়েছেন, তা'র সঙ্গে মিলিয়ে তোর বর্ণনা পড়েছি। যে-সব অসামঞ্জস্য চোখে পড়্‌লো, তা তোকে জানালাম।

সে-রাত্রে নিমন্ত্রণ-রক্ষা কর্‌তে তিনি এসেছিলেন — আস্‌বেনই বা না কেন? আহারান্তে নীচের হল্‌-ঘরটিতে আমরা সমবেত হ'লাম। বাবা আমার বেহালাটার প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বল্‌লেন, 'আপনাকে এর চেয়ে উচ্চশ্রেণীর কোনো যন্ত্র দিতে পার্‌ছি না বলে' ক্ষমা কর্‌বেন।'

বিদ্যাপতিবাবু তাঁর অভ্যাস মত একবার বাবার মুখে তাকিয়ে, তার পর নিজের প্রসারিত করতলে দৃষ্টি সংবদ্ধ করে' বল্‌লেন 'দুর্ভাগ্যবশত, আমি বাজাতে জানি নে।'

বাবা বললেন, 'একেবারেই নয়? আশ্চর্য!'

'হ্যাঁ, আশ্চর্যই। আমার মাতামহ তাঁর কন্যাকে যে-অদ্ভুত শক্তির অধিকারিণী করে যান, তা তাঁর — অর্থাৎ সেই কন্যার — সঙ্গে সঙ্গেই লুপ্ত হ'ল। সেই প্রতিভার উত্তরাধিকারী হ'বার মত সৌভাগ্য নিয়ে তার পুত্রের জন্ম হয় নি।'

বাবা বললেন 'বাস্তবিক। আপনার মা-র কথা আমার স্মরণ হয় না, কিন্তু চৌধুরী মশায়ের আত্ম-বিস্মৃত মুখের লাবণ্যচ্ছটা আর কারো মুখে দেখ্‌বো না ভাব্‌লে দুঃখ হয়।'

মা জিজ্ঞেস কর্‌লেন, 'কিন্তু আপনি গান গাইতে পারেন নিশ্চয়? গায়কদের মতই তো মার্জিত ও মসৃণ আপনার কণ্ঠস্বর।'

বিদ্যাপতিবাবু আবার দৃষ্টি আনত করে' বল্‌লেন, 'দুর্ভাগ্যবশত, আমার সম্বন্ধে আপনার এই অনুমান সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।'

তার পর তাঁর সেই আশ্চর্য, উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি বাবাকে, মা কে পরিভ্রমণ করে' অবশেষে আমার ওপর এসে নিবদ্ধ হ'ল। আমার দিকে তাকিয়েই বল্‌তে লাগলেন :

'দেখুন, প্রতিভাসম্পন্ন হ'বার প্রচুর সম্ভাবনা আমার ছিলো, কিন্তু গ্রহবৈগুণ্যের ফলে সব গেলো ব্যর্থ হ'য়ে। পিতৃগণের পুণ্যফলের কিছুই আমাতে এসে বর্তালো না। আমার বাবা ছিলেন লেখক; — কেমন লিখ্‌তেন, সে বিষয়ে আলোচনা করা আমার মানায় না, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখের অনেক ওপরে তিনি তাঁর সাহিত্যকে স্থান দিয়াছিলেন, একথা সগর্বে বল্‌তে পারি। আমার এক কাকা ছিলেন — তাঁকে আমি কখনো দেখি নি। সতেরো বছর বয়সে তিনি পালিয়ে প্যারিসে চ'লে যান্‌ — ছবি আঁকা শিখ্‌তে। কালে চিত্রকর ও ভাস্কর-হিসেবে ও-দেশেও সুনাম অর্জন করতে তিনি সক্ষম হন্‌। বছর দুই পূর্বে তাঁর মৃত্যু হ'লে প্যারিসে যে শোকসভা আহুত হয়, তা'র সভাপতি ছিলেন রোদ্যাঁ।

'আমারো গীতি-কুশল, কবি বা চিত্রকর হওয়া উচিত ছিলো, কিন্তু হ'তে পারিনি বলে'ই আমার হয়েছে মুস্কিল। তাঁদের কাছ থেকে আমি তদুপযোগী প্রাণ ও কল্পনাশক্তি পেয়েছি,

কিন্তু পাই নি প্রকাশের ক্ষমতা। প্রতিভাশালী স্রষ্টাদের জ্যোতির্মণ্ডল বেষ্টন করে' যে-সব অপেক্ষাকৃত নিষ্প্রভ ও নিকৃষ্ট লোক বিরাজ করে, আমি তা'দের একজন। এরা নিজেরা স্রষ্টা না হ'লেও স্রষ্টার ঠিক নীচেই এদের আসন, কারণ সৃষ্টির সৌন্দর্য পরিপূর্ণতম-রূপে উপভোগ করার ক্ষমতা এদেরই আছে। যেমন আমি। আমার নিজের অযোগ্যতা দেখ্‌লেন তো, কিন্তু ছবি, কবিতা বা গান আমার চাইতে বেশি ভালোবাসে, এমন লোক নেই।'

এই দীর্ঘ বক্তৃতার আসল উদ্দেশ্য যে কি তা এতক্ষণে বোঝা গেলো। এবং তা'র ফল যে কি হ'ল, তা বুঝতেই পার্‌ছিস; — বেহালাটা আমাকেই হ'ল বাজাতে।

যতক্ষণ বাজাচ্ছিলাম, বিদ্যাপতিবাবুর সেই আশ্চর্য, উজ্জ্বল চোখ ধারালো তীরের ফলকের মত আমার মুখের ওপর বিদ্ধ হ'য়ে ছিলো। সে-দিকে না তাকিয়েও আমি তা বুঝতে পার্‌ছিলাম। মানুষের অমন চোখ হয় ভাই? — যে-চোখে কখনো পলক পড়ে না, প্রশান্ত গভীরতায় যা পাষাণের মত স্থির হ'য়ে গেছে! আমার সমস্ত মুখ যেন জ্বালা করে উঠ্‌লো; স্পষ্ট অনুভব করলাম, আমার হৃৎপিণ্ড অত্যন্ত দ্রুত স্পন্দিত হ'য়ে বুক থেকে সমস্ত রক্ত মুখে পাঠিয়ে দিচ্ছে।

হঠাৎ বাজ্‌না থামিয়ে আমি উঠে' দাঁড়ালাম। কিন্তু বিদ্যাপতিবাবুর সঙ্গে চোখাচোখি হওয়ামাত্র তাঁর কঠিন দৃষ্টিতে অমন তরল চঞ্চলতা এলো কি করে'? দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনিও উঠে দাঁড়ালেন।

নীলা, আমার এই বিবরণ পড়ে' তুই যা ইচ্ছে তা ভাব্‌তে পারিস্‌, কিন্তু আমার সম্বন্ধে কোনো দুশ্চিন্তা করিস্‌নে, এইমাত্র অনুরোধ। শ্যালট্‌-বাসিনীর মত বাস্তবের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে মায়া-মুকুরের ভেতর দিয়ে, আমি পৃথিবীটাকে দেখি নি, একদিন বিষণ্ণ-সুরে বলে'ও 'উঠবো না, I'm half-sick of shadows' আমার ল্যান্সলট্‌কে যদি আমি দেখে থাকি, দিনের আলোয় শাদা চোখেই দেখেছি। প্রত্যূষের অস্পষ্ট আলোয় জ্বরের ঘোরে-দেখা-স্বপ্নের কুহেলি-আবরণে ক্ষণবিহারী ছায়ার মত দেখা দিয়েই তিনি অপসৃত হ'বেন না; তাঁর আবির্ভাব হ'বে সূর্যোদয়ের মত মহিমান্বিত, মৃত্যুর মত সংশয়াতীত ও সুনিশ্চিত। সেই মোহ তিনি বিস্তার করবেন না, বুদ্ধি যা'তে ঘোরালো হ'য়ে আসে। অন্ধকার নিরবয়ব ও অস্পষ্ট বলে'ই কুৎসিত, কালো বলে' তো নয়। সূর্য উঠ্‌লে তা'র আলোয় যেমন পৃথিবীর সুগঠিত ও সুসমঞ্জস সৌন্দর্য্য আত্ম-প্রকাশ করে, তেম্‌নি তাঁর স্পর্শে আমার দেহ মন ও আত্মা থেকে ঘুমের যবনিকা উঠে' যা'বে; শুধু ইন্দ্রিয়ের চেতনায় বা হৃদয়ের অনুভূতিতেই নয়, বুদ্ধির মমতাহীন প্রখর উজ্জ্বলতাতেও তাঁকে লাভ কর্‌বো — কোথাও কোনো ফাঁকি থাক্‌বে না। এর নাম তো মোহ নয় ভাই , বরঞ্চ তাঁর প্রেম যখন মর্মান্তিক যন্ত্রণার মত বুকে এসে বাজবে, তখনই সকল মোহ থেকে মুক্তি লাভ কর্‌বো। লাভ কর্‌বো নব-জন্ম।

লীনা।

সোনারঙ

৩২শে জ্যৈষ্ঠ

নীলা,

কাল রাত্তিরে পৃথিবীর সব চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপাব হ'য়ে গেছে; তাই মনের মধ্যে তা একটুও ঝাপসা হ'য়ে যাবার আগেই তোকে লিখ্‌তে বসেছি। নিছক ঘটনা-হিসেবে দেখ্‌তে গেলে তা তেমন বিস্ময়কর মনে হ'বার কথা নয়, কিন্তু তা'র ফলে আমাণ মধ্যে যে পরিবর্তন এসেছে আশ্চর্য সেইটি। এতদিন যে-যবনিকা মৃদু হাওয়ায় থেকে-থেকে কাঁপছিলো মাত্র, কাল আমার চোখের সাম্‌না থেকে তা উঠে' গেছে, এবং রঙ্গমঞ্চের ওপর আমারই জীবননাট্য অভিনীত হচ্ছে, দেখ্‌লাম। সেই দিকে তাকিয়ে নিজকে আবিষ্কার করলাম, ও অভিনন্দন জানালাম। কারণ সেই আমি সব চেয়ে আশ্চর্য।

এখানে যখন আমাদের খাওয়া-দাওয়া শেষ হ'য়ে যায়, কল্‌কাতায় লোকে তখন বেড়াতে বেরোয়। আহার ও নিদ্রার মাঝখানে সময়ের সুবৃহৎ ফাঁকাটা আমরা তিনটি প্রাণীতে মিলে' গল্প-গুজব করে' ভরে' তুলি। কিন্তু কাল মা-র শরীর অসুস্থ ছিলো, তাই আমাদের সভাটি বসে নি। বাধ্য হ'য়ে ওপরে নিজের ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিতে হ'ল। ঝাড়লণ্ঠনের যতই চাক্‌চিক্য থাক্‌, সে-আলো বৈঠকখানারই উপযোগী, শোবার বা পড়্‌বার ঘরের নয়। জানালার ধারের টেবিলে বসে' মোমের আলোয় আমি বই পড়্‌তে লাগলাম। সমস্ত পল্লী ঘুমিয়েছে।

কতক্ষণ পড়েছিলাম, ঠিক বল্‌তে পারবো না; কিন্তু মনে আছে, একটা মোমের আধ-খানার বেশি পুড়ে গিয়েছিলো। কাজেই অনুমান কর্‌ছি, তখন রাত বারোটার কম হ'বে না। বুঝ্‌তে পার্‌লাম, এখন শয্যাগ্রহণ করলে সঙ্গে-সঙ্গেই নিদ্রাকর্ষণ হ'বে; তাই গল্পের বহু-পরিচিত নায়ক-নায়িকাদের সঙ্গত্যাগ কর্‌তে কষ্ট হ'লেও বইখানা মুড়ে আমি চেয়ার ছেড়ে উঠলাম।

খোঁপার কাঁটাগুলো খুল্‌তে-খুল্‌তে আমি জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। খানিকক্ষণ আগে এক পশ্‌লা বৃষ্টি হ'য়ে গিয়েছিলো, এখন আকাশের মেঘ কেটে চাঁদের মুখ দেখা দিয়েছে। দশমী বা একাদশীর চাঁদ রয়েছে আমার মাথার ওপরে — জানালা থেকে তাঁকে দেখ্‌তে পাচ্ছি না, কিন্তু তার নীল আলোয় আমাদের আম্র-কানন চুপচাপ দাঁড়িয়ে স্নান কর্‌ছে, কাছের গাছগুলোব ভিজে পাতারা ঝির্‌ঝিরে হাওয়ায় সঞ্চালিত হ'য়ে ঝিকিবমিকিব করে' উঠ্‌ছে। আমার জানালার নীচে আলো-ছায়ায় মিশে' অদ্ভুত আব্‌ছায়ার জাল বুনে' চলেছে, পেঁপে-গাছটার পাশে এক টুকরো ছায়া এইমাত্র নড়ে উঠ্‌লো।

কিন্তু ঐ ছায়াটাই কি সোজা হ'য়ে উঠে দাঁড়িয়েছে? তা'র ফাঁকে-ফাঁকে শাদা কাপড়ের মত ও কী দেখা যাচ্ছে? যাক্‌ — এতদিনে বোধ হয় একটা আসল ভূতের দেখা পাওয়া গেলো? হাওয়ায় দু'একটা এলোচুল উড়ে এসে আমার চোখে-মুখে পড়্‌ছিলো, হাত দিয়ে তা'দেরকে সরিয়ে আমি মুখ বাড়িয়ে নীচের দিকে তাকালাম।

বিদ্যাপতিবাবু ফির্‌ছিলেন বোধ হয় — আমার দিকে দৃষ্টি পড়্‌তেই থম্‌কে দাঁড়ালেন।

বিস্ময়ের প্রথম আঘাত কাটিয়ে উঠ্‌তে-না-উঠ্‌তেই অসংখ্য প্রশ্ন একসঙ্গে আমাব মনকে আক্রমণ কর্‌লে ঃ এর মানে কি? গোলাপীকে তুল্‌বো? উনি কি এ-পথ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন? বাবাকে ডাক্‌বো? এত রাত্তিরে কোথায়ই বা যাবেন? আলো নিবিয়ে দিয়ে শুয়ে' পড়বো? কিন্তু—

এতক্ষণে এই অতি সরল সত্যটা আমার মনে উদয় হ'ল যে বিদ্যাপতিবাবু আমাকে দেখ্‌বার জন্যই ঐখেনে এসে দাঁড়িয়েছেন, এবং সম্ভবত বহুক্ষণ যাবৎই দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু কেন? নিশ্চয়ই আমাকে এমন কোনো কথা তাঁর বলার ছিলো, জ্যোছনার নেশায় সারা পৃথিবী ঝিমিয়ে না এলে যা বলা যায় না — আমার প্রতিটি হৃৎ-স্পন্দন চীৎকার করে' এই কথা বলে' উঠলো। সেই কথা আমার শোনা চাই। ভাব্‌বার সময় নেই ; যে-কোনো মুহূর্তে তিনি ঐ পথের মোড়ে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারেন। মনে হ'ল, সেই কথাটি না শুন্‌তে পারলে আমার পৃথিবী চিরকালের মত বন্ধ্যা হয় যাবে। সেই শুভ-লগ্ন বুঝি এলো, যা'র জন্য এতকাল অপেক্ষা করেছি; এ যদি বৃথা হয়ে' যায়, তবে এ জন্মের মত আমার বৈধব্য ঘুচবে না।

এখন বুঝতে পারছি, নীলা, যে বাইরে উপস্থিত হ'তে পারার আগে আমি অন্ধকারে সিঁড়ি বেয়ে নেবে, মাঝের হলটা পেরিয়ে নিজ হাতে পেছন দিককার প্রকাণ্ড ভারি দরজাটা খুলেছিলাম। কিন্তু তখন মনে হয়েছিলো যেন ইচ্ছে করা মাত্র আমি হাওয়ায় উড়ে এসে সেখানে পড়লাম।

দরজার ঠিক বাইরে সিঁড়ির ওপর আমি দাঁড়ালাম। বিদ্যাপতিবাবু যন্ত্র-চালিতের মত আমার দিকে এগিয়ে আস্‌তে লাগলেন। সিঁড়ির গোড়ায় এসে কি ভেবে যেন একটু অপেক্ষা করলেন — তার পর আমার ঠিক নীচের সিঁড়িতে এসে দাঁড়ালেন।

অস্ফুটস্বরে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি? এ-সময়ে? কেন?'

মৃদু অথচ স্পষ্ট কণ্ঠের উত্তর শুনলাম, 'কাল চলে' যাচ্ছি। তাই আপনাকে দেখ্‌তে এসেছিলাম।

কি বল্‌ছি নিজে তা বুঝ্‌তে পারার আগেই আমি বলে' উঠলাম, 'কাল যাচ্ছেন? অসম্ভব।' কথাটা নিজের কানেই বিসদৃশ শোনালো। একটু অপ্রতিভ হ'য়ে হাস্‌বার চেষ্টা করে তাড়াতাড়ি বলে' ফেললাম, 'কিন্তু সময়টা কি খুব সুনির্বাচিত হয়েছে, বিদ্যাপতিবাবু? আপনার বিবেচনাকে ধন্যবাদ!'

'আমি তো আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌তে আসি নি, আপনাকে দেখ্‌তে এসেছিলাম শুধু। দূর থেকে দেখে চলে গেলেই আমার তৃপ্তির সীমা থাক্‌তো না, আপনার সঙ্গে যে কথা বল্‌তে পার্‌ছি, এ আমার আশাতীত সৌভাগ্য।'

'দুঃখের বিষয়, এ-সৌভাগ্য আমার পক্ষেও সমান উপভোগ্য হচ্ছে না। পাশের ঘরে চাকর-বাকরেরা শুয়ে' আছে, — তা'রা যদি কেউ —'

'নিরর্থক আপনি আশঙ্কা কর্‌ছেন। আমি তো চলেই যাচ্ছিলাম — কেন আপনি এলেন?'

বলে' তিনি যাবার জন্য পা বাড়ালেন, কিন্তু সেই মুহূর্তে হাওয়ার মত স্বরহীন অথচ তীব্রস্বরে আমি ডাকলাম, 'শুনুন।'

বিদ্যাপতিবাবু আমার দিকে যে মুখ ফেরালেন, তা ভূতের চেয়ে ম্লান। নীচের সিঁড়িতে না নেবে যতটা সম্ভব তাঁর কাছে সরে' এসে আমি বললাম, — না, বলি নি, কারণ আমার গলা দিয়ে কোনো আওয়াজ বেরোয় নি; — আমার নিশ্বাস-পাতের সঙ্গে এই কথা উচ্চারিত হ'ল: 'কাল্‌কেই যাচ্ছেন? সত্যি?'

বিদ্যাপতিবাবুর বিবর্ণ মুখ মুহূর্তের জন্য উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো, দেখলাম। ভীরু একটি হাসি লাজুক আলোকরেখার মত তাঁর ঠোঁটের কিনারে একটু খেলা কর্‌লে, তার পর তাঁর দুই চোখের শ্যামল গভীরতায় ঝাঁপ দিয়ে খানিকক্ষণ ঝল্‌মল্‌ করে' নিজেকে হারিয়ে ফেল্‌লে। অত্যন্ত সহজভাবে, প্রায় লঘুকণ্ঠেই তিনি বল্‌লেন, 'এ-কথা আমাকে কেন জিজ্ঞেস করছেন? জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে যাঁর নির্দেশ মেনে-চলায় আমার জীবনের একমাত্র চরিতার্থতা, একটু আগেই তিনি নিজমুখে বলেছেন যে কাল আমার যাওয়া অসম্ভব।'

'তাঁর ওপর আপনার বিশ্বাস যদি এমনি অন্ধ, তবে যাবার সংকল্প করার আগে তাঁর পরামর্শ নেন্‌ নি কেন?'

'বিশ্বাস অন্ধ বলে'ই কোনো প্রশ্ন করবার প্রয়োজন হয়নি। জানতাম, তাঁর যা অভিপ্রেত, তা হ'বেই, আমার কোনো চেষ্টার অপেক্ষা তিনি রাখবেন না। হ'লও তা-ই।'

'তবে জান্‌বেন, তিনি এই মুহূর্ত থেকে আপনার সমস্ত জীবন দাবী কর্‌ছেন।'

হঠাৎ বিদ্যাপতিবাবু নতজানু হ'য়ে আমার সাম্‌নে বসে' পড়্‌লেন। তাঁর উত্তোলিত, উদ্‌গ্রীব বাহু এড়াবার জন্য আমি বিদ্যুৎ-গতিতে সরে' যেতেই আমার শাড়ির আঁচলটা পড়্‌লো লুটিয়ে। বিদ্যাপতিবাবু দুই হাতে সেই আঁচল কুড়িয়ে নিয়ে তা'তে মুখ ঢাক্‌লেন।

ঈষৎ অবনত হ'য়ে আমি তাঁর চুলের ওপর হাত রাখলাম। ধীরে-ধীরে তিনি মুখ তুল্‌লেন — সিংহের মত প্রকাণ্ড মাথায় হরিণের চোখ — আশ্চর্য উজ্জ্বল চোখ — জোছ্‌না আর অশ্রুজল একত্র হ'য়েও সেই দু'টি চোখকে উজ্জ্বলতর করতে পারে নি। দু'খানা আয়না মুখোমুখী রাখ্‌লে যেমন তা'রা পরস্পরের সংখ্যাহীন ছায়া সৃষ্টি করে, তেম্‌নি আমাদের দৃষ্টি

পরস্পরের সঙ্গে সম্মিলিত হ'তেই তা'র ভেতর দিয়ে আমরা নিজেদের অনাদিবিস্তৃত অগণন মূর্তি প্রত্যক্ষ করলাম ; — সময় যখন শিশু, তখন থেকে আরম্ভ করে' আজ পর্যন্ত আমাদের জন্ম-জন্মান্তরের কাহিনী। এক মুহূর্ত কেটে গেলো — শত সহস্র শতাব্দী। বিদ্যাপতিবাবু আবার আমার আঁচলে মুখ ঢাক্‌লেন। সেইন্ট্‌ ভেরনিকার রুমালে যীশুর মুখের ছাপের মত আমার ঐ বস্ত্রাঞ্চলে যদি আজ তাঁর মুখচ্ছবি দেখ্‌তে পেতাম, তা হ'লে আমি একটুও বিস্মিত হ'তাম না।

পনেরো মিনিট আগে অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে যে নেমে এসেছিলো, সে আর ফিরে এলো না, তা'র শূন্য স্থান যে অধিকার করেছে, শেলির মত সে সুন্দর ভাই, দেবতার মত সে অনির্ব্বচনীয়। বিশ্বের সকল কবিদের অপরূপ আনন্দ ও বেদনা, কল্পনা ও অনুভূতি আমার মনে নেবুর রসে লেখা ছিলো, এতদিন তা পড়্‌তে পারি নি, কিন্তু যে-মুহূর্তে প্রেমের আলো জ্বলেছে, তা'র উত্তাপে সেই লেখা উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে ফুটে উঠেছে। নিজেকে আবিষ্কার করলাম, ভাই , — এর চেয়ে রোমাঞ্চকর ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে লেখে নি।

আমাদের এই বিবাহকে আশীর্বাদ করবার জন্যই বিধাতা সেই অল্প একটু সময়ের জন্য আকাশ থেকে করেছিলেন জ্যোছ্‌নার পুষ্পবর্ষণ ; —নইলে ওপরে এসে আমি বিছানায় শোবামাত্র আকাশ ভেঙে কেন নাব্‌বে বৃষ্টি? জলের ধারা যে গান কর্‌তে-কর্‌তে পৃথিবীতে নামে, আমার আগে কেউ কি তা জেনেছে? দুপুর রাতে অন্ধকার ঘরে একা শুয়ে'-শুয়ে' কিছুতেই ঘুমুতে-না-পারাটি যে কত মিষ্টি, কাল তা প্রথম উপলব্ধি করলাম।

আজ সকালবেলা চোখ মেল্‌তেই পৃথিবীর সঙ্গে আমার প্রথম শুভ-দৃষ্টি হ'ল। পুকুরের নীচের পাঁক থেকে আরম্ভ করে' আকাশের স্ফটিকাভ নীলিমা পর্যন্ত এমন-কিছু নেই, যা আমার ভালো না লাগ্‌ছে। এমন কি, গোলাপীর উঁচু দাঁতও আজ ক্ষমা কর্‌তে পার্‌ছি।

এই পর্যন্ত লিখেছি, এমন সময় লেখায় বাধা পড়লো। বাবা পাশের বারান্দা দিয়ে তাঁর নিজের ঘরে যাচ্ছিলেন; আমার দরজার কাছে এসে কি মনে করে' থেমে দাঁড়ালেন। উৎফুল্লকণ্ঠে ডাক্‌লাম, 'এসো, বাবা।'

বাবা এলেন। তার পর তাঁর মুখে যা শুনলাম, তা এই ঃ

এইমাত্র তিনি বিদ্যাপতিবাবুর বাড়ি থেকে ফির্‌ছেন। দেওয়ানজীর সঙ্গে মহালের দেখাশোনা কর্‌তে বেরিয়েছিলেন, ফের্‌বার পথে পড়লো সেই বাড়ি। ভাবলেন, বিদ্যাপতিবাবু অনেকদিন আসেন না, একবার খোঁজ নিয়ে যাওয়া যাক। গিয়ে দেখলেন, বিদ্যাপতিবাবু জ্বরে অচেতন হ'য়ে পড়ে আছেন, তাঁকে দেখে চোখ মেল্‌লেন, কিন্তু চিন্‌তে পার্‌লেন বলে মনে হ'ল না। চাকরের মুখে শুন্‌লেন যে তিনি কাল সন্ধ্যের একটু পরেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান্‌। যখন ফিরেছেন, রাত তখন আর বেশি নেই, এবং জামা-কাপড় সব বৃষ্টিতে এমন ভিজেছে যে মনে হয়, এইমাত্র তিনি নদীতে ডুব দিয়ে এসেছেন। কাপড় বদ্‌লাতে-বদ্‌লাতে চাকরকে বল্‌লেন, 'আমার বোধ হয় জ্বর হ'ল রে।' তার পর সেই যে বিছানায় পড়লেন, এ পর্যন্ত আর একটি শব্দও উচ্চারণ করেন নি। বাবা কপালে হাত রেখে বুঝলেন, জ্বর খুব বেশি, এবং সম্ভবত চেতনাও ঘোলাটে হ'য়ে গেছে। বাবা তৎক্ষণাৎ নিজের হাতে লেখা চিঠি দিয়ে একটা লোককে পাঠিয়ে, দিয়েছেন তারপাশায় — সরকারী ডাক্তারকে ধ'রে আনতে। অবিশ্যি নৌকোই যখন এ অঞ্চলের একমাত্র যান, তখন ডাক্তারবাবুর আস্‌তে-আস্‌তে বিকেল। বাবা কিংকর্তব্যবিমূঢ় চাকরটাকে যথাসাধ্য সাহস ও ভরসা দিয়ে মনুষ্যত্বে পুনর্প্রতিষ্ঠিত ক'রে এসেছেন, কিন্তু দুপুরবেলায় তাঁকে আর-একবার যেতে হবে, কারণ তিনি — হ্যাঁ, তিনি একটু শঙ্কিত হ'য়ে পড়েছেন বই কি।

পরে বাবা বল্‌লেন, 'বিদ্যাপতিবাবু কাল সারা-রাত কোথায় যে ছিলেন, এবং কি ক'রেই বা বৃষ্টিতে ভিজলেন, সে এক রহস্য। বোধ হয় কাছের কোনো গ্রামে গিয়েছিলেন নেমন্তন্নে — বা কোনো কাজে — ফেরবার পথে মাঠের ওপর পান্ বৃষ্টি — সেখান থেকে নিকটতম আশ্রয়ও হয় তো মাইল-খানেক দূরে। আর ঐ শেষ-রাত্তিরে কাছাকাছি বাড়ি-ঘর থাক্‌লেই বা কি? স্বগৃহে উপস্থিত হ'তে-না পারা পর্যন্ত কোনো আশ্রয়ের আশা নেই।— অথচ, আজ নাকি তাঁর এখান থেকে চলে যাবার কথা ছিলো।'

বাবার কথা শুনতে-শুনতে আমি মনে মনে কি ভাবছিলাম, জানিস্? আমাদের এখান থেকে তাঁর বাড়িতে পৌঁছতে কোনো মতেই আধ ঘণ্টার বেশি সময় লাগবার কথা নয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথও বোধ হয় আধ ঘণ্টা ধরে' 'নব-ধারা-জলে' স্নান করতে বারণ করবেন। তা'র ফলেই এই জ্বর। প্রভুর অনুপস্থিতিতে ভৃত্য সন্ধ্যা থেকেই সুখ-নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন, তাই রাত-একটাকে নিশান্ত বলে' তিনি স্বচ্ছন্দে ভুল করেছিলেন।

বললাম, 'আমাকেও নিয়ে চলো না, বাবা — তাঁকে দেখে আসি।'

'তুই যাবি?' এই দু'টি কথায় বাবা অনেক প্রশ্নই জিজ্ঞেস করলেন। অসঙ্কোচে উত্তর দিলাম, 'হ্যাঁ, যাবো। কারণ আজকে যে তাঁর এখান থেকে যাওয়া হ'ল না, সে-জন্য আমিই দায়ী।'

বাবার চোখ সংশয়ের মেঘে মলিন হ'য়ে এলো — কিন্তু মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণেই দেখলাম, সেই দৃষ্টি সত্যবোধের পরিচ্ছন্ন দীপ্তিতে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে!

'তোমার কাছে একটা অনুরোধ আছে, বাবা।'

'কি, লীনা?'

'তোমার বিলেত-যাত্রার সঙ্গী-রূপে আর-একজনকেও নাও না।'

বাবা হাসিমুখে বল্‌লেন, 'বনবাসে যাওয়া তত দুঃখের নয়, লীনা, সমাজের মাঝখানে একঘরে হ'য়ে-থাকা যত। দু'টি লোক যখন পরস্পরের কাছে সমস্ত পৃথিবীর চেয়ে বড় হ'য়ে ওঠে, তখন তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি যে কতখানি বাহুল্য, তা আমি জানি। সেই তৃতীয় ব্যক্তির স্থান অধিকার করে, নিজেকে লজ্জা দিতে আমি রাজি নই। তোরা পরের জাহাজে আসিস্, আমি বরঞ্চ এই সুযোগে তোদের রবিঠাকুরের বইগুলো পড়ে' ফেল্‌বো। হ্যাঁরে, রবিবাবুর বইয়ের ইংরেজি অনুবাদ পড়া যায় তো?'

'কিন্তু বাবা, আমার প্রতি তুমি বড্ড অবিচার কবছ।'

'কেননা, নিজের প্রতি সুবিচার করতে হচ্ছে। ''তৃতীয় ব্যক্তি''র দুর্ভাগ্য জানি বলে'ই আমার এত ভয়। আমার কথায় বিশ্বেস না হয়. তোর মা-কে জিজ্ঞেস্ করে দেখিস্।'

আমিও হেসে ফেল্‌লাম। —'তোমার সঙ্গে তর্কে কে কবে জিতেছে, বাবা?'

'কিন্তু এ-ক্ষেত্রে তর্কটা যে আদৌ আমার সঙ্গে হচ্ছিলো না। তুই তর্ক করছিলি নিজের সঙ্গে, এবং এই আত্মবিরোধে মানুষ সর্বদা হারতেই চায়।'

বলে. বাবা আমার ললাট চুম্বন করলেন।

জানিস্ লীনা. বিদ্যাপতিবাবুর এই অসুখের খবর শুনে' আমার একটুও দুশ্চিন্তা বা উৎকণ্ঠা হচ্ছে না। এখানেও আমি বিধাতার অঙ্গুলি-নির্দেশ দেখতে পাচ্ছি। এই রোগ মুহূর্তমধ্যে তাঁকে আমার একান্ত নিকটে এনে দিয়েছে; সাধারণভাবে দিন কাট্‌লে এই প্রকাশ্য অন্তরঙ্গতায় উপনীত হ'তে বহুদিন কাট্‌তো। সেই দীর্ঘকালের ব্যবধান বিধাতা নিজ হাতে দিলেন সরিয়ে, কাল রাত্রে যিনি ঐটুকু সময়ের জন্য আকাশ ভরে' পাঠিয়েছিলেন জ্যোছ্‌না, এই রোগও তাঁরি দান, মিলনতীর্থের দীর্ঘপথকে সংক্ষিপ্ত করার জন্যে তাঁরি একটা কৌশল। যা-কিছু হচ্ছে, তা'র মধ্যে সেই চিব-মঙ্গলেব পরম শুভেচ্ছা দেখতে পাচ্ছি।

আজ আর আমার মনে কোনো বিরোধ, কোনো সংশয় নেই; সুদৃঢ় বিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতার পরিপূর্ণ শান্তিতে তা শরতের আকাশের মত স্তব্ধ ও সমাহিত। এমন কি, বিদ্যাপতিবাবুকে দেখতে যাবার জন্য কোনো অধীর উৎসুকতা নেই পর্যন্ত। কেননা, যা অবশ্যম্ভাবী, তা তো ঘটেছে, আমার আজন্ম-তপস্যার ফল-লাভ আমি করেছি; — দেবতা দিয়েছেন বর। এই বর আমি যখনি ব্যবহার করি নে কেন, একবার যা পেয়েছি, চিরকালের মত তা পেয়েছি; তা ফিরিয়ে-নেয়া—যিনি বর দিয়েছেন, তাঁরো অসাধ্য।

লীনা।

সোনারঙ্

১লা আষাঢ়

নীলা,

তারপাশা থেকে যে ডাক্তার এসেছিলেন, তিনি বল্‌লেন যে বিদ্যাপতিবাবুর চিকিৎসার ভার-নে'য়া তাঁর সাহসে কুলোয় না, বিদ্যাতেও নয় বোধ হয়। বল্‌লেন—বুকে সর্দি বসে' গেছে, নিউমোনিয়ায় দাঁড়াতে পারে, তাই কল্‌কাতা নিয়ে-যাওয়াই বাঞ্ছনীয়।

সুতরাং কাল আমরা সবাই কল্‌কাতা রওনা হচ্ছি — এবং এই খবর দিতেই তোকে এ-কার্ড্‌খানা লিখ্‌লাম। বুঝ্‌তে তো পার্‌ছিস, আমার পক্ষে বাড়ি থেকে বেরোনো সম্ভবপর হ'বে না— তুই-ই আসিস্, পরশু সকালেই আসিস্। সোনাবঙ্ বছর-খানেকের মধ্যে নাকি পদ্মার জলে তলিয়ে যা'বে, ইহজীবনে তা'কে আর দেখবো না, কিন্তু আমার স্মৃতির পৃথিবীতে তা আনন্দ-উজ্জ্বল ক্ষয়-হীন আয়ু-লাভ কর্‌লো।

লীনা।

লীনার জীবনের যে-অংশের অভিব্যক্তি আনন্দে সৌন্দর্যে করুণতায় উজ্জ্বলতম, তা'র পরিচয় এই চিঠিগুলোতে আপনারা, আশা করি, যথেষ্ট নিবিড় করে'ই পেয়েছেন। কিন্তু তা'র জীবনের চরম পরিপূর্ণতার কাহিনী আপনাবা এখনো শোনেন নি। সে-কথা বল্‌বার ভার আমার নিজেরই নিতে হচ্ছে বলে' আপনারা অপরাধ গ্রহণ কর্‌বেন না।

দশুই আষাঢ় ভোরবেলা টেলিফোন্-এর আওয়াজে নীলার ঘুম ভেঙে গেলো। বিছানা থেকে হাত বাড়িয়ে সে সেটা তুলে' নিলে। তার পব নিম্নলিখিত-রূপ কথাবার্তা হল ঃ

'কে? কে আপনি?'

'আমি।'

'ও, লীনা? কি খবর সব? ডাক্তার-নীলরতন কাল বিকেলেও এসেছিলেন তো?'

'হ্যাঁ।'

'নার্স্-দু'জন কাল্‌কেও সারা-রাত ছিলো?'

'দু'জন নয়, চারজন।'

'নতুন আরো আনানো হয়েছিলো? কেন? তোর মা-র শরীর ভালো আছে তো?'

'মা ভালোই আছেন।'

'কাল সারাদিনেও আমি একবার যাবার ফুর্‌সৎ করে' উঠতে পারলাম না , — হঠাৎ আমার এক দেওর সস্ত্রীক এসে উপস্থিত হয়েছেন — তাঁদের নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। আজ যাবো। দশটা-নাগাদ তোর গাড়িটা একবার পাঠাতে পার্‌বি?'

'তোর আস্‌বার দরকার নেই।'

'কেন?'

'বিদ্যাপতিবাবু এইমাত্র মারা গেলেন। না, তোর আস্‌বার দরকার নেই।'

আমার চারদিকে সহস্র কৌতূহলী কণ্ঠের প্রশ্ন শুনতে পাচ্ছি; 'তার পর কি হ'ল? তার পর?'

কিন্তু তার পর আবার কি? লীনাকে আপনারা যতটুকু দেখেছেন, তা'তে তা'র ঐ মর্ত্যাতীত জ্যোতির্ময়ী মূর্তিকেই দেখেছেন, এবং সেই অতি-দুর্লভ আভাই যেন আপনাদের মনের চোখে নেশার মত লেগে থাকে। লীনা আপনাদের চোখে দীর্ঘজীবী নয়, উজ্জ্বলজীবী হোক, এই আমার আন্তরিক কামনা। অনুরাগবতী উষসীর লাজরক্ত মহিমার অন্তে গোধূলির বিষণ্ন, ধূসর ম্লানতা তো আছেই; কিন্তু আমরা — আমি ও আপনারা — আমাদের সমস্ত মনপ্রাণ ভবে' উষসীকে পান করলাম, আমাদের কাছে তার পর আর-কিছু নেই।

তবু কোনো পাঠিকা জিজ্ঞেস করতে পারেন — লীনা কি তা'র বাবার সঙ্গে বিলেত গিয়েছিলো? না, বিলেতে সে যায় নি, অক্স্ফোর্ড-এ ভর্তি হওয়াও তা'র কপালে আর হ'ল না। তবে? তবে আবার কি? জলপাইগুড়ির একটা মেয়ে-ইস্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রীর পদ খালি ছিলো, সে সেটা নিয়ে নিলে। শিক্ষয়িত্রী? কেন? টাকার অভাব তো তা'র —। না, টাকাব জন্যে নয়, বাঁচবার আশায়। তা টাকার জন্যেও খানিকটা বটে, — কারণ সে মনে করতো যে তা'র বিয়ে হ'য়ে গেছে, এবং বিয়ের পর পিতৃগৃহের ওপর মেয়েদের যখন আর অধিকার নেই, তখন নিজের সংস্থান সে নিজেই করতে চায়। কিন্তু সত্যি-সত্যি সে কি আর বিয়ে করে নি? তা করেছিলো বই কি — বিয়ে না করে' কোনো মেয়ে সারা জীবন কাটাতে পারে? কিন্তু অনেকদিন পর — পুরো একটি বছর। পরের বছর দশুই আষাঢ় তারিখে তা'র বিয়ে হয। কা'ব সঙ্গে আবার? ঐ ওখানকারই — অর্থাৎ জলপাইগুড়িব — এক উকিল, নাম রসময় ঘোষাল। লীনার বাবা প্রতিজ্ঞা করেছেন বটে যে জীবনে আব তিনি মেয়ের মুখ দেখবেন না, কিন্তু তা'র মা বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন। নীলারও নেমন্তন্ন হয়েছিলো, কিন্তু সে আস্তে পারে নি, কারণ তখন তা'র প্রথম সন্তান অত্যাসন্ন।

জ্যোতিষী

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

লম্বা একহারা চেহারা, খাঁড়ার মত নাক, প্রশস্ত; এমনকি টাক বার করাও বলা চলে, এমন উঁচু কপাল আর তার মধ্যে ছোট ছোট উজ্জ্বল চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, সবটা জড়িয়ে বরদাচরণ জ্যোতির্বিনোদ মশাইয়ের চেহারাটা সুশ্রী না হলেও অসাধারণ ছিল বৈকি! তেমনি কি তাঁর কণ্ঠস্বর! মক্কেলদের সঙ্গে কথা কইতে কইতে যখন তাঁর চড়া এবং তীব্র কণ্ঠস্বর বিদ্রূপের হাসিতে ফেটে পড়ত, তখন মনে হত যেন তা একটা শান্ত, স্নিগ্ধ স্তব্ধতাকে কেটে কেটে নিজের প্রচণ্ডতার বেগে কোন্ সুদূরে পৌঁছে গেল নিমেষে। সুতরাং প্রথম যারা আসত তাঁর কাছে, তারা তাঁর চেহারা, চাহনি, বুদ্ধি ও কণ্ঠস্বরের এই উজ্জ্বল তীক্ষ্ণতায় অভিভূত হয়ে পড়ত। সে মোহের সঙ্গে ভয় মিশানো থাকলেও পরিণামে শ্রদ্ধারই সঞ্চার করত মনে মনে।

এই অসাধারণ এবং তীক্ষ্ণ হবারই চেষ্টা কবেছেন তিনি আজীবন। সে চেষ্টাকে তপস্যা বলাই উচিত।

প্রথমেই তিনি সাবধান করে দিতেন মক্কেলদের 'ঐ যারা মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে — একেবারে চাঁদ হাতে তুলে দেয়, আমি তাদের দলে নই। মিছে করে বানিয়ে বলতে পারব না যে, পরের সম্পত্তি হঠাৎ হাতে পড়বে কিম্বা অপুত্রকের ছেলে হবে। ওতে আমাব ঘৃণা বোধ হয়।'

তারপর মুহূর্ত কয়েক মাত্র থেমে, স্তম্ভিত মক্কেলকে একটুও সামলাবার অবকাশ না দিয়ে তিনি আবার বলে উঠতেন, 'বুঝেছেন? গোঁজামিল দিতে আমি পারব না। হাতে যদি খারাপ লেখা থাকে ত মুখের ওপরই বলে দেব। সেটা সইতে পারবেন? অপ্রিয় সত্য? তা যদি না পারেন, তবে সরে পড়ুন।'

তারপর বাকি সকলের দিকে স্থির সুতীব্র কণ্ঠস্বরকে আরও চড়িয়ে বলতেন, 'সেই জ্যোতিষীর গল্প জানেন ত, একজনের হাত দেখে বলে দিয়েছিল যে, তোমাব একটা বড় রকমের লাভ হবে আর সামান্য কিছু লোকসান। তারপর সে লোকটা কী লাভ হবে ভাবতে ভাবতে পথ হাঁটছে, পড়ে গেল এক খানায়। হাত বাড়িয়ে যেমন নিজেকে সামলাতে যাবে, মুঠো করে ধরলে এক ব্যাঙ, এধারে পা'টি গেল ভেঙে। সে ত কোনমতে বাড়ি ফিরে এল, তারপর জ্যোতিষীকে ডেকে বলল, দৈবজ্ঞিঠাকুর, এ কি? লাভের মধ্যে ব্যাঙ, আর অপচয়ের মধ্যে একেবারে পা'টা! এই কি আপনার মোটা লাভ আর সামান্য লোকসান?.... জ্যোতিষী তখন তাকে বুঝিয়ে দিলে যে, তা কেন? খানায় যখন পড়েছ, তখন মাথাটাও তো কাটতে পারত, তাহলে মারাই যেতে একেবারে। এ তবু পা ভেঙেছে, খুঁড়িয়ে চলতে পাববে অন্তত। জীবনটা যে বেঁচে গেল — এ কি কম লাভ?'

এই বলে প্রচণ্ডভাবে আর একবার হেসে উঠতেন। সে হাসিব সামনে বিহ্বল, ভযচকিত মক্কেলদের মাথা আপনিই নুয়ে আসত।

তারপর হয়ত খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই মক্কেলের শিথিল ও ঘর্মসিক্ত হাতখানা টেনে নিয়ে নিজের চোখের সামনে মেলে ধরতেন। মিনিট খানেক ধারালো ছুরির মত তাঁর চোখের চাহনি সেই হতভাগ্যের কররেখাব ওপর বুলিয়ে শুধু একবার বলতেন, 'হুঁ', কিম্বা একটা অস্পষ্ট এবং অস্ফুট শব্দ করতেন, তারপর হঠাৎ গম্ভীর মুখে বাঁ-হাতে পাশ থেকে লেন্সটা নিয়ে ভাল করে হাতখানা দেখতেন পুঙ্খানুপুঙ্খ করে। এ সবটাই তাঁর চিরন্তন অভ্যাস — বরং স্বভাব বলাই উচিত।

এটা প্রথমে তিনি হিসেব করেই করতেন, মক্কেলকে অভিভূত করবার জন্যই। এখন আর চেষ্টা করতে হয় না, অভ্যাস তার নিজের কাজ করে যায়।

তিনি জানতেন যে, এই আকস্মিক গাম্ভীর্যে মক্কেলদের বুকের স্পন্দন প্রায় থেমে আসে। তাঁব পবেব নির্ঘাত কোনো বাণীর জন্য সে মনে মনে প্রস্তুত হয।

এর পর হাতখানা নামিয়ে রেখে গম্ভীর স্থিব দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ মক্কেলের মুখের দিকে চেয়ে বলতেন, 'শুনবেন আপনাব ভাগ্যের কথা? ঠিক ঠিক শুনতে চান?'

সম্মতি যে আসত, তা বলাই বাহুল্য। তখন তিনি গলা নামিয়ে বলতেন, 'আমার এমনি অদৃষ্ট, ভাল হাত কি একটাও আসে না। শনি বিরূপ আপনার ওপর — আমি কি কবব বলুন!' এই সামনের এক বছরের মধ্যে আপনার অনেকগুলি দুর্ঘটনা ঘটবে, একান্ত প্রিয়জনের মৃত্যু, অর্থনাশ, স্বাস্থ্যহানি। আর কত বলব বলুন।'

তারপরও যদি সেই মাটিব-সঙ্গে-মিশে-যাওয়া মক্কেলের কথা কইবার মত কোনো শক্তি থাকত, তবে অনুবোধ করত, 'তা এর কোনো প্রতিকার নেই? গ্রহপূজা বা শান্তি-স্বস্ত্যয়ন-টস্ত্যয়ন।'

আবাব চড়া সুরে বেজে উঠত বরদা জ্যোতির্বীব গলা! — 'না মশাই, ওসব কথা আমাব কাছে বলবেন না। তাহলে যান ঐসব বুজরুকদের কাছে, যারা বোকা বুঝিয়ে আপনাকে আড়াই শ' টাকার নবগ্রহ কবচ গছাবে কিম্বা যজ্ঞ করাব জন্যে দেড়শ টাকাব ফর্দ দেবে। ওটি আমার দ্বারা হবে না। কত হাজার মাইল দূরে বসে যেসব গ্রহ এমন করে মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছেন, যার সুস্পষ্ট নির্দেশ আপনাব হাতের চামড়ায আঁকা রয়েছে, তাঁদেব হাবিয়ে দেবেন কবচ পরে কিম্বা আগুনে একটু ভেজাল ঘি ঢেলে। অতই সহজ? আপনারা ত লেখাপড়া শিখেছেন, আপনাদের কমনসেনস্ কি বলে?'

'তা হলে কি উপায নেই?' ভগ্ন. স্খলিত কণ্ঠস্বরে নিরুপায়ের একান্ত কাতরোক্তি ফুটে ওঠে।

'ঈশ্বরকে ডাকুন। যদি দীক্ষা হয়ে থাকে ত ইষ্টদেবকে ধ্যান করে প্রত্যহ একমনে দশ হাজার কিংবা লক্ষ নাম জপ করুন। জপাৎ সিদ্ধ, জপাৎ সিদ্ধ, জপাৎ সিদ্ধির্নসংশয়! . দীক্ষা না হয়ে থাকলে তাঁব যে নাম আপনার প্রিয মনে হয় সেই নাম জপ করে যান। জপতে জপতে ইচ্ছাশক্তি জাগবে — একমাত্র সেই ইচ্ছাশক্তি বা পুরুষকারই দৈবকে লঙ্ঘন করতে পারে। হয় বৈকি, কত স্বল্পায়ু লোককে দীর্ঘদিন বাঁচতে দেখলুম। নিজের কর্মফলে দৈবকেও প্রতিহত করা যায়।'

কিন্তু এ ব্যবস্থায় অধিকাংশ মক্কেলেরই মন উঠত না। অনেকেই বুঝত না [illegible] কথা। কোনোমতে ওঁর দক্ষিণাটা দিয়ে সরে পড়ত। তাদেব সে অপস্রিয়মাণ [illegible] চেয়ে বরদার কণ্ঠস্বর আবার তীক্ষ্ণ হাসিতে চারিদিক আচ্ছন্ন করে ফেলত। তি[illegible] সকলকে শুনিয়ে বলতেন, 'চলল আহাম্মকটা ছুটে .. এখনই কোনো বুজরুককে দু[illegible] আড়াই শ' টাকা না দেওয়া পর্যন্ত ওর শান্তি নেই।'

দু একজন, যাঁরা ওঁর অপেক্ষাকৃত অন্তরঙ্গ তাঁরা হয়ত বলতেন 'তা আপনি [illegible] জেনেশুনে এ টাকাটা হাতছাড়া করলেন কেন? ওঁরা যখন খবচ করবেই

'না না,' যেন শিউরে উঠে বলতেন জ্যোতিষী, 'ওতে আমার সত্যিই ঘৃণাবোধ হয়। জানি যা দুর্লঙ্ঘ্য যা কিছুতে নিবারণ করতে পারব না — তার জন্য হাত পেতে টাকা নেব, প্রবঞ্চনা করে — সে আমার সইবে না। .... তা ছাড়া ভগবানের ইচ্ছেয় আমার ত ঠিক চলে যাচ্ছে।' এখানে তাঁর কণ্ঠস্বরে আবার বিদ্রূপের আভাস জাগত, 'মজা হচ্ছে এই — যেখানে যত বুজরুকের কাছেই যাক — একবার করে আমার কাছেও আসবে ঠিক, জানে যে এখানে সত্যি কথা পাবে। যা কিছু অমঙ্গল, যা কিছু আশঙ্কার, যা কিছু ভয়াবহ — ওরা জানে যে আমার চোখেই পড়বে ঠিক!'

বলতে বলতে তাঁর উজ্জ্বল চোখ আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠত — অজানা কী একটা উত্তেজনায় যেন হাঁপাতে থাকতেন। তারপর হয়ত উঠে খড়ম পায়ে দিয়ে সংকীর্ণপরিসর ঘরের মেঝেতে পায়চারি শুরু করতেন — সে সময় তাঁর চোখ দুটো হয়ে উঠত লাল। খানিকটা পরে কেমন যেন চাপা হিংস্র গলায় বলে উঠতেন, 'জানি অথচ প্রতিকার করতে পারি না — দেখতে পাই, তবু ঠেকাতে পারি না, এই জন্যই ত ওকে বলে নিয়তি!.. .. তার চেয়ে অদৃষ্ট অ-দৃষ্ট থাকাই বোধ হয় ভাল ছিল।'

যাঁরা তাঁর পরিচিত, তাঁরা ওঁর এই ভাবটা জানতেন, আর বোধহয় কারণটাও — তাই আর ঘাঁটাতে সাহস করতেন না, কথাটা চেপে যেতেন।

হ্যাঁ, কারণটাও অনেকেই জানতেন বৈ কি!

বরদা জ্যোতিষীর ইতিহাস এ অঞ্চলে অনেকেই জানেন।

জ্যোতিষী উনি ছিলেন না। — প্রথম বয়সে বি-এ ফেল করে এক ইস্কুলে ঢুকেছিলেন অঙ্কের মাস্টার হয়ে। ছোট সংসার, মা আর ছেলে — ছোট্ট একটু বাড়িও ছিল মাথা গোঁজবার মত। তাই অভাব হয়নি, পঁয়ত্রিশ টাকা মাইনেতে সংসাব চালিয়েও অনেক শখ মেটাতে পারতেন। এই সব শখের মধ্যে প্রধান ছিল পুরোনো বই কেনা। বেশী দামের পুরোনো বই কেনা সম্ভব নয়, তাই সারা বিকেল আর সন্ধ্যেটা ঘুরতেন পুরোনো বইয়ের বাজারে, হাঁটতে হাঁটতে একটা দুটো ছেঁড়া, জীর্ণ কীটদষ্ট বই সংগ্রহ করে আনতেন। নিরীহ রোগা চেহারার এই ছোকরাটিকে বইওয়ালারা কৃপার দৃষ্টিতেই দেখত, তাই তারা সারাক্ষণ ধরে বই ঘাঁটলেও কিছু বলত না। তা ছাড়া লোকটি কিনতেন যত বাজে আর অকেজো বই (তাদের মতে) — তাই তারা সস্তা করেও দিত অনেক সময়ে। মা অনুযোগ করতেন, বন্ধুবা ঠাট্টা-তামাসা করত, কিন্তু এ নেশা তাঁর কাটত না কিছুতেই — বিয়ে থা করে সংসারী হওয়া কিংবা আর একবার চেষ্টা কবে বি এ পাস করার সম্ভাবনা হয়ে পড়তে লাগল সুদূরপবাহত।

এমনি করে বই ঘাঁটতে ঘাঁটতেই হঠাৎ বরদা পেয়ে যান খানদুই ফলিত জ্যোতিষের বই — প্রাচীন পুঁথি, খবর নিয়ে জানলেন যে, এ বই দুটি খুব বিখ্যাত এবং অধুনা দুষ্প্রাপ্য। পুঁথির আকারে ছিল বই দুখানা, বিবর্ণ নাগরী লিপিতে ছাপা — একেবারেই বাজে বই মনে করে দোকানদার মাত্র আনা ছয়েক পয়সাতে বই দুখানা দিয়েছিল।

ব্যস্, এইবাব লাগল তাঁর নতুন এক নেশা। প্রায় গলে-যাওয়া পুঁথির পাতা থেকে অতিকষ্টে উদ্ধার করে করে তিনি লিপিগুলো আর একটা খাতায় নকল করলেন। অর্থ বোঝবার অসুবিধে হচ্ছে দেখে আবার সংস্কৃত পড়তে শুরু কবলেন নতুন করে; নতুন করে ব্যাকরণ ও অভিধান খুলে বসলেন। যেমন করে হোক এর পাঠ উদ্ধার করতে হবেই — এর সম্পূর্ণ অর্থ উদ্ধার করা চাই-ই।

ক্রমে ক্রমে আয়ত্ত করেও ফেললেন সবটা। এ যেন এক নতুন দৃষ্টি খুলে গেল ওঁর। পুঁথির শ্লোকের বর্ণনার সঙ্গে নিজের ও মায়ের কররেখা মিলিয়ে মিলিয়ে চিনতে শিখলেন, কোন রেখার কি অমোঘ নির্দেশ তাও ধীরে ধীরে বুঝতে পারলেন।

কিন্তু তবু ঠিক বিশ্বাস হয়নি। ছেলেবেলা থেকে অনেককে তিনিও হাত দেখিয়েছেন। তার কোনোটা মিলেছে, কোনোটা মেলেনি। ওঁর বিশ্বাস ছিল এগুলো অল্পবিস্তর আঁধারেই ঢিল ছোঁড়া হয় — যেটা লাগে দৈবাৎ। কিন্তু এবার শুরু করলেন নিজেই বন্ধুবান্ধবদেব হাত দেখতে। একে একে বহুলোকের হাত দেখলেন তিনি, বিনা পয়সায় সেধে সেধেই। আর সেই তাঁর প্রথম চমক লাগল। জ্যোতিষশাস্ত্র এমন শক্তিশালী — হিসাব এমন নির্ভুল তাঁর! যা বলেন তাই যেন মিলে যায়, দৈববাণীর মত তাঁর কররেখাবিচার সত্য হয়, যেন নির্ভুল অঙ্কের মত হিসাব করা সব ব্যাপারটা।

ফলে নেশা আরও বাড়ল। এদিক-ওদিক খুঁজে আরও দু-একটা বই বার করলেন। ছুটলেন কাশীতে — গুধুড়ি বাজার থেকে পুরোনো জ্যোতিষের বই সংগ্রহ করলেন. লুধিয়ানাতে গেলেন মাসিক শতকরা দু টাকা সুদে টাকা ধার করে। সেখানে কোন পাঞ্জাবী জ্যোতিষীর কাছে ভৃগুসংহিতার সম্পূর্ণ পুঁথি আছে, তাই দেখবাব জন্য। দুশোটি টাকা প্রণামী দিয়ে তবে তা একবার নাড়াচাড়া করবার অধিকার পেয়েছিলেন।

এইসব করার ফলে ইস্কুলের চাকরিও বোঁটা শুকিয়ে খসে পডবার মত হয়েছিল, তিনি নিজেই এবার সেই সামান্য যোগসূত্রটি ছিঁড়ে দিলেন, এই বাড়িরই বাইরে সাইনবোর্ড লাগিয়ে বসে গেলেন পেশাদার জ্যোতিষী রূপে। নবদ্বীপে পাঁচটি টাকা দিয়ে জ্যোতির্বিনোদ উপাধি তার আগেই আনানো ছিল।

কিন্তু শখ করে হাত দেখানো এক জিনিস আর টাকা খরচ করে দেখানো আর এক। যে-সব বন্ধুবান্ধবরা এতদিন উৎসাহসহকারে ঘিরে থাকত তারা সরে পডল। তা ছাড়া তাদের বাক্স ত হয়েই গিয়েছিল। এখন মক্কেল আর আসে না। দিনের পব দিন কাটে — রাত্রির পর রাত্রি। পাশে লেন্সখানা রেখে টেবিল ল্যাম্পেব আলোকে ঝুঁকে পড়ে দীর্ঘ রাত্রি পর্যন্ত বরদা জ্যোতিষী পডাশুনা করেন। সে পড়াশুনোয় ব্যাঘাত ঘটে না একটুও। এধারে বাড়িটিও বাঁধা পডল। মা অনুযোগ করে করে হাল ছেড়ে দিলেন — 'এ আবার কি শখ বাপু! যা হয় একটা চাকবি বাকবি দেখে নে। মাথা গোঁজবাব এ স্থানটুকুও গেলে দাঁড়াবি কোথায়?'

কিন্তু বরদা জ্যোতিষী তাঁর নিজের ভাগ্য তখন দেখে নিয়েছেন।

এই ই তাঁব বৃত্তি। এই বৃত্তিতেই তাঁর জীবনধারণ করতে হবে। অর্থ ও যশও কিছু কিছু পাবেন তিনি।

বহুদিন ধৈর্য ধারণ কবে থাকার পর একটি দুটি করে মক্কেল আসতে লাগল।

ক্ষুধার্ত বাঘ যেমন করে ঝাঁপিয়ে পডে তার খাদ্যের ওপর তেমনি করেই বরদা ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এরাই তাঁর বঁড়শিতে গাঁথা টোপ. যেমন করে হোক এই টোপে মাছ ধরতে হবে।

ইতিমধ্যে বহু রাত্রি জেগে বরদা জ্যোতিষেব একটা বিশেষ দিক আয়ত্ত করেছিলেন ইচ্ছে করেই। মিছে করে ভাল-ভাল কথা-সাজিয়ে সাজিয়ে বলে আর পাঁচজন জ্যোতিষী যেমন করে হাত দেখে তেমন করে দেখতে গেলে পসার জমাতে বহু বিলম্ব — বুদ্ধিমান বরদা তা বুঝেছিলেন। তিনি সে চেষ্টা করেন নি। তিনি বিশেষ করে চিনতে শিখেছিলেন দুর্ভাগ্যের রেখাগুলি — জন্মকুণ্ডলীর অমঙ্গলকর অবস্থানগুলির অব্যর্থ ফলাফল আয়ত্ত করেছিলেন। তিনি জানতেন অধিকাংশ হাতেই ভালর চেয়ে খারাপ বেশি। খারাপ ফলই সত্য হয় এবং এগুলো অন্য জ্যোতিষী বলে না। তিনি এই অস্ত্রে মক্কেলদের ধরাশায়ী করবেন — অমঙ্গলের মন্ত্রে নিজের মঙ্গল ডেকে আনবেন।

আর করলেনও তাই।

তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অভ্যাগতদের বুকের মধ্যে কেটে কেটে বসতে লাগল, তীক্ষ্ণতর কণ্ঠের অশুভকারী ভবিষ্যদ্বাণী কানের মধ্যে আগুনের মত জ্বলতে লাগল। কিন্তু তবু তারা আসতে লাগল। মক্কেলের সংখ্যা বাড়তেই লাগল দিন দিন। তার কারণ বরদার কথা কখনও মিথ্যা হয় না। দৈবের মত অমোঘ, মৃত্যুর মত ধ্রুব। প্রত্যেক মানুষের মনে একটা অদ্ভুত আকর্ষণ আছে নিষ্ঠুর সত্য সম্বন্ধে। যাতে সে যন্ত্রণা পায়, তাই সেই আঘাত পেতেই বার বার এগিয়ে আসে। মুখে বলে, 'আগে জানতে পারলে তবু সাবধান হওয়া যায় — এ এক রকম ভালই।' যদিচ কোন সতর্কতাই কাজে আসে না। বরদার ভবিষ্যদ্বাণীকে কোনো গ্রহযজ্ঞে বা কোনো শান্তি-স্বস্ত্যয়নে এড়ানো যায় না। তবে নাকি মানুষ ঠিক নিজের অমঙ্গলে বিশ্বাস করে না, আশা করে শেষ মুহূর্তে কোনো-না-কোনো উপায়ে সেটা খণ্ডিত হয়ে যাবে। তাই তারা শুনে মূর্ছিত হয়ে পড়ে না, কিংবা আত্মহত্যা করে না। কারণ বরদার দয়ামায়া নেই — কোনো সাংঘাতিক কথাই তাঁর মুখে এড়ায় না। মায়ের মুখের ওপর তার একমাত্র সন্তানের মৃত্যুর সম্ভাবনাটা তিনি অকম্পিত কণ্ঠেই শুনিয়ে দিতে পারেন।

কিন্তু অমঙ্গলটা নির্ভুলভাবে দেখা বরদা জ্যোতিষীর পেশা থেকে নেশায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তাই পরের কররেখার ফলাফলের সঙ্গে নিজেরটাও দেখে নিয়েছিলেন আগেই।

দুটি সাংঘাতিক ফল। কঠিন, মৃত্যুঘাতী সে কথা।

কয়বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিচার করেছেন বরদা। কররেখায় বিশ্বাস হয়নি — জন্মকুণ্ডলী খুলে বসেছেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। জন্ম সময় সম্বন্ধে সংশয় হয়েছে, গণনা করে বার করেছেন নিজের জন্মতারিখ ও ঘণ্টা। ছুটে গিয়েছেন কাশীতে, গিয়েছেন কাশ্মীরে - ভৃগুসংহিতার সঙ্গে মিলিয়েছেন।

না, ভুল কোথাও নেই।

মাতৃঘাতী যোগ আছে তাঁর হাতে। আর যখন কোনমতেই এটাকে উড়িয়ে দেওয়া গেল না — তখন তিনি মনস্থির করে ফেললেন। শাস্ত্রমতে যা সবচেয়ে কঠিন যজ্ঞ — তাই তিনি করবেন প্রথমটা এড়াবার জন্যে। আর দ্বিতীয়টা খুব সোজা, তিনি বিয়েই করবেন না। ইতিমধ্যে বয়েসও ত হয়ে গেছে প্রায় পঁয়ত্রিশ, কি দরকার ও ঝামেলা জুড়াবার?

তিনি তন্ত্রের পুঁথি খুলে বসলেন নিজেই। আছে স্ত্রীর কুলত্যাগিনী হওয়ার সংবাদ। ছুটে গেলেন বড় বড় পণ্ডিতদের কাছে, সব শ্লোকের সম্পূর্ণ অর্থ তাঁর ঠিক বোধগম্য হচ্ছে কিনা সেইটে মিলিয়ে নিতে। মন্ত্রের ঠিক ঠিক উচ্চারণ আয়ত্ত করার জন্য হিন্দুস্থানী পণ্ডিতদের কাছে গেলেন। কিন্তু তার আগে আর একটা উপায় চিন্তা করে মায়ের কাছে কথাটা পাড়লেন, মা তুমি তীর্থবাস করতে চেয়েছিলে, এখন যাবে? এখন ত যাহোক একটু সচ্ছল অবস্থা হয়েছে, কাশীতে গিয়ে থাকো না।'

মা আমতা-আমতা করে বললেন, 'তা বটে — তীর্থে থাকতে কার না সাধ! তবে তোর একটা দেখা-শোনার লোক হল না। ঘর-সংসারই বা দেখে কে? তোকে ভাত-জল দেওয়া—'

একটু অসহিষ্ণুভাবেই বলেন বরদা, 'সে ভাবনা আর কতকাল ভাববে মা? তুমি মরে গেলে কে আমাকে দেখবে?'

'সে তখন আলাদা কথা। বেঁচে থাকতে না ভেবে কি করি বল?'

'তাহলে তুমি যাবে না?'

'তুই একটা বিয়ে কর তবে যাই।'

'সে আমি পারব না।' দৃঢ়কণ্ঠে বললেন বরদা।

'তাহলে আমিও যাব না।'

আরও পীড়াপীড়িতে আসল কথাটা বলে ফেলেন, 'এই বুড়ো বয়সে শরীর ভেঙে আসছে, এখন একা কোন্ নির্বান্ধব পুরীতে থাকব বল দেখি? বড় ভয় করে যে!'

'বেশ সঙ্গে যদি লোক দিই?' বরদা প্রশ্ন করেন।

'কেন বল দেখি আমাকে তাড়াবার এত তাগিদ? আমি না বিদেয় হলে বুঝি বিয়ে করবিনি?' লোকই না-হয় দিলি! হঠাৎ যদি মরে যাই, এক ছেলে, একটু জলও পাব না?'

অগত্যা সে প্রস্তাব বন্ধ করতে হয়।

এই একমাত্র ক্ষেত্র, যেখানে আসল কথাটা বলা চলে না। বললেও মা বিশ্বাস করবেন না। ছেলের অসাধারণ মাতৃভক্তির কথা তিনি সকলকে গর্ব করে বলে বেড়ান।

সুতরাং শেষ পর্যন্ত যজ্ঞেই বসতে হয়। নিজে নিষ্ঠাপূর্বক সমস্ত আয়োজন করেন। ঘি তৈরি হয় গোরুর দুধ থেকে, সর জ্বাল দিয়ে। এতটুকু ত্রুটি কোথাও না থাকে এই প্রতিজ্ঞা। আগের দিন উপবাস করে থাকেন। পাঁজি দেখে সময় ঠিক করে যজ্ঞে বসেন। জ্ঞানত কোথাও কোনো খুঁত রইল না। যজ্ঞের শেষে বিধিপূর্বক কবচ বেঁধে দিলেন মায়ের হাতে, কারণ বললেন, 'তোমার একটা বড় ফাঁড়া আছে মা, শিগগিরই।'

মা বিস্মিত হয়ে বললেন, 'এই এত বড় যাগটা করলি কি তুই আমার জন্যে? হ্যাঁ? বলিস কি রে — কী পাগল রে তুই!'

'কেন, পাগল কেন?'

'আমি ত বুড়ো হয়েছি, না হয় মলুমই। তার জন্যে এত?'

'সে তুমি বুঝবে না।'

কথাটা সেদিন এইখানেই চাপা পডল বটে, কিন্তু শেষ হল না।

মুখে ব্যাপারটা যতই তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দিল, মায়ের মনের মধ্যে সেটা বহুদূরপ্রসারী হয়ে আশ্রয় নিলে। কয়েকদিন ধরেই কথাটা মনে মনে নাড়াচাড়া করে একদিন এসে বললেন, 'বাবা, একটা কথা বলব তোকে, রাখবি?'

বরদা বললেন, 'বিয়ের কথা ছাড়া যা বলবে তুমি, রাখব।'

মা বললেন, 'এই ত? কথা দিচ্ছিস?'

বরদা ঘাড় নাড়লেন।

মা বললেন, 'ফাঁড়ার কথা ত বাবা কিছু বলা যায় না — তাছাড়া এমনিই ত প্রায় ষাট বছর বয়স হল — কবে আছি, কবে নেই। তুই আমাকে নিয়ে একটু তীর্থ করিয়ে দে। তাছাড়া শুনেছি তীর্থস্নানে অনেক সময় গ্রহ-ফাঁড়া কাটে।'

জ্যোতিষী বিস্মিত হলেও মুখে সেটা প্রকাশ করলেন না। সময় নিকট হয়ে আসছে, এ কি তারই পূর্বাভাস?

খানিকটা চুপ করে থেকে বললেন, 'যদি লোক দিই সঙ্গে?'

'না সে হয় না। মরণের সময় তুমি কাছে থাকবে না এ হতে পারে না। তোমাকে ছাড়া আর আমি থাকব না।'

'বেশ তাই হবে।'

. দেনার শেষ হাজার টাকা শোধ করবেন বলে জ্যোতিষী তৈরি হচ্ছিলেন, সেই টাকা সম্বল করেই দোরে তালা দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। ভারতভূমিকে বামাবর্তে পরিক্রমা করলেন তিনি। কলকাতা থেকে পুরী, সেখান থেকে সিংহাচল, গোদাবরী, পক্ষীতীর্থ, শ্রীরঙ্গম, রামেশ্বর হয়ে বোম্বের পথে নাসিক, পঞ্চবটী, প্রবাস, দ্বারকা, পুষ্কর সেরে মথুরা বৃন্দাবন হয়ে সোজা চলে গেলেন হরিদ্বার, সেখান থেকে কুরুক্ষেত্র, প্রয়াগ হয়ে কাশী এসে নামলেন। মাকে

বললেন, 'মোটামুটি তোমার সব সারা হয়ে গেল মা, বাকী শুধু রইল গয়া — যাবার পথে বাবার পিণ্ডটা দিয়ে ফিরব।'

'তা যা হয় করিস বাবা। এখন কাশীতে দুদিন বিশ্রাম কর। বাবা, হাঁপিয়ে উঠেছি।'

বরদাও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। প্রস্তাবটা তাঁর ভাল লাগল। তাই, ধর্মশালাতে তিন দিনের বেশি থাকতে দেয় না বলে পাণ্ডার সহায়তায় গণেশমহল্লায় একটা বাড়িতে দৈনিক চার আনা ভাড়ায় ঘর ঠিক করলেন। বাঙালী ব্রাহ্মণ স্ত্রী-পুত্র নিয়ে থাকেন সে বাড়িতে — তিনিই ঘর ভাড়া দেন। সংসার চালাবার এই-ই একমাত্র অবলম্বন, তাঁব নিজের দুর্দান্ত হাঁপানি, কাজকর্ম কিছুই করতে পারেন না। এ-আয়েই বা কি হয়, শুধু কাশী জায়গা বলেই চলছে। ওধারে মেয়ে বিবাহযোগ্যা হয়েছে, আঠারো পেরিয়ে যায়-যায় — বিয়ে দেবার কোনো উপায় নেই, তিনি দেখতে পাচ্ছেন না! পয়সা নেই, কে আর নেবে তাঁর মেয়েকে? ইত্যাদি অনেক দুঃখের কথাই বললেন বাড়ি ভাড়া দেবার সময় ভদ্রলোক। বরদা কৌতূহলী হয়ে মেয়েটিব দিকে তাকালেন, বেশ সুশ্রী মেয়েটি — যৌবনে ও স্বাস্থ্যে টলোমলো। ময়লা কাপড়ে ও নিবাভরণ অবস্থাতেও সে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মনে মনে স্থির করলেন বরদা, অবসর সময়ে মেয়েটির হাত দেখবেন।

কিন্তু সে অবসর আর মিলল না।

সেইদিনই মা গেলেন কেদারনাথ দর্শনে। কী মনে হল — বললেন, 'এখানে স্নান করব বাবা একটু।'

'সে কি মা, এমন অসময়ে, সকালে ত স্নান করেছ।'

'তা হোক বাবা, এসেছি — এখানে স্নান কবব না!'

তিনি নামলেন জলে। দু-পা নেমেই কিন্তু বলে উঠলেন, 'এ যে বড্ড পেছল রে, ও বাবা, ধর ধর আমাকে —'

তখন স্নানার্থী কম। অপরে কেউ হাত ধরবে, সে সম্ভাবনাও নেই। বরদা ব্যস্ত হয়ে জামা-কাপড়সুদ্ধ নেমে এলেন, কিন্তু তাড়াতাড়িতে তিনি সাবধান হননি। — তাঁরও পা গেল পিছলে — সেই অবস্থাতে সামলাবার আগেই তিনি গিয়ে পড়লেন মার ওপর। হাত ধবার আর অবসর হল না, চোখ মেলবার আগেই মা কোথায় তলিয়ে গেলেন।

তারপর চেঁচামেচি, হৈ-চৈ, যা হবার সবই হল। অনেক কষ্টে, বহু চেষ্টায় দেহ খুঁজে পাওয়া গেল, কিন্তু সে মৃতদেহ।

বরদা কথা কইলেন না, কাঁদলেন না — চুপ করে একদিকে চেয়ে বসে রইলেন। শুধু দৃষ্টিটা তাঁর যেন আরও উগ্র, আরও ভয়ানক হয়ে উঠল।

যাই হোক — লোকজন ততক্ষণে বিস্তর এসে জড়ো হয়েছিল। খবর পেয়ে ওঁব নতুন বাড়িওয়ালাও এলেন, সঙ্গে তাঁর মেয়ে সরমা। সরমাই সাহস করে এগিযে এসে বললে, 'উঠুন — এমন করে বসে থাকলে ত চলবে না — মায়ের শেষ কাজ, আপনাকেই ত করতে হবে। মায়ের ঋণ শোধ করুন।'

'তা বটে।'

এতক্ষণে বরদা বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকালেন চারিদিকে। উঠে দাঁড়াতে গেলেন, মাথাটা কেমন টলে উঠল — সরমা ভাগ্যে ওঁকে লক্ষ্য করছিল, তাড়াতাড়ি হাতটা ধবে ফেলাতে সে যাত্রা সামলে নিতে পারলেন। সরমাই হাত ধরে ওঁকে টেনে নিয়ে গেল মায়ের মৃতদেহের কাছে।

স্থানীয় লোকেদের সহৃদয়তায় পুলিশ-হাঙ্গামা আর হল না। শব দাহ করার অনুমতি পাওয়া গেল সহজেই। মণিকর্ণিকায় নিয়ে যাওয়ারও লোক মিলল। শেষ কাজ ভালভাবেই সুসম্পন্ন হয়ে গেল।

কিন্তু দাহ সেরে বাড়ি ফিরে বরদা যেন একেবারে ভেঙে পড়লেন। হাত-পা যেন তাঁর নয় — নিজের কোনো ইচ্ছাশক্তিও নেই। বিহ্বল, জড় হয়ে পড়েছেন। সেই তীক্ষ্ণধী, কটুভাষী ভয়ঙ্কর জ্যোতিষীকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না তাঁর মধ্যে। তিনি শিশুর মত অসহায়, বৃদ্ধের মত পরনির্ভরশীল হয়ে উঠলেন।

এই সংকটমুহূর্তে সরমা তাঁর যা সেবা করলে — অসাধারণ। দেখা গেল, মেয়েটির শুধু রূপই নেই, গুণও আছে। সে একেবারে নিকট আত্মীয়ার মতই বরদার সব ভার নিজের হাতে তুলে নিলে। যেন বহুকালের পরিচয়, এইভাবে সে সমস্ত লজ্জা ও সঙ্কোচ কাটিয়ে ওঁব কাছে এসে দাঁড়াল। নিপুণা গৃহিণীর মতই সব দিকে তার নজর — জননীর মতই অতন্দ্র ও অস্খলিত তার সেবা। বরদা মুগ্ধ, কৃতজ্ঞ না হয়ে পারেন না — সব ভারই তিনি এই মেয়েটির ওপর তুলে দিয়ে যেন বাঁচলেন। দুপুরের হবিষ্যের যোগাড় করা, রাত্রের জলখাবার — শ্রাদ্ধেব তিল বাছা, সব কাজই সহজে সরমার ওপর এসে পড়ল। বরদা নির্লিপ্ত উদাসীনতার সঙ্গে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলেন শুধু।

শ্রাদ্ধশান্তির পর বরদা বাড়ি ফেরবার জন্য প্রস্তুত হলেন। বিদায়ের পূর্বে সবমার বাবাকে প্রণাম করতে গিয়ে কথায় কথায় বললেন, 'আপনাদের ঋণ আমার শোধ করার উপায় নেই — তবু যদি কিছু করবার থাকে ত বলুন। আপনাদের সামান্য কিছু উপকার কবতে পারলে খুশি হব।'

ব্রাহ্মণ খানিকটা চুপ করে থেকে বললেন, 'সত্যি সত্যিই উপকার করতে চান? করবেন?

'নিশ্চয়ই করব — অবশ্য সাধ্যে কুলোলে।'

'কথা দিচ্ছেন?'

'হ্যাঁ!'

'তাহলে আমার কন্যাটিকে আপনি গ্রহণ করুন — ও আপনার খুব অনুপযুক্ত হবে না।'

'সে কি!' শিউরে চমকে ওঠেন বরদা।

'ব্রাহ্মণেব কন্যাদায়ের কাছে আর কি আছে বলুন! আপনিও ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণই গতি!'

'কিন্তু বিবাহ আমি যে কখনই করব না স্থির করেছি।'

'ও, স্থির করেছেন। সেটা কোনো বাধা নয়। আপনি আমাকে কথা দিয়েছেন যে সম্ভব হলেই আপনি আমার অনুরোধ রাখবেন। এক্ষেত্রে অসম্ভব কোনো বাধা নেই।'

'আপনি সেসব কথা বুঝতে পারছেন না — সে হবাব নয় কার্তিকবাবু।' ব্যাকুল হয়ে বলেন বরদা জ্যোতিষী।

মধু-তিক্ত কণ্ঠে কার্তিকবাবু বললেন, 'হবার নয় যে তা ত জানিই। তাই ত চুপ করেই ছিলাম। দরিদ্র্যের কন্যাকে কে আর নিতে চাইবে বলুন। নেহাত আপনি কথাটা তুললেন বলেই তাই —'

অভিমানের সুরই তাঁর কণ্ঠে।

বরদা একবার চোখ বুজে মাকে স্মবণ করার চেষ্টা করলেন। তাঁর মানসচক্ষুতে ফুটে উঠল নিজের কররেখার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত — কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য সেসব ছবি মিলিয়ে একাকার হয়ে জ্বলজ্বল করতে লাগল, একটি যৌবনবিকশিত মুখের সরস পরিপূর্ণ ওষ্ঠাধর। বিচিত্র এক লাস্যভরা হাসি — এবং দীর্ঘ পক্ষ্মবেষ্টিত চোখের আবেশ-ভরা মদির চাহনি। সরমা। তাই ত বটে।

'অস্ফুট কণ্ঠে বরদা জ্যোতিষী বললেন, 'নিয়তি!'

কার্তিকবাবু ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করলেন, 'কী বললেন।'

বরদা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে জবাব দিলেন, 'তাই হবে। আপনাকে আমি কথাই দিলাম। তবে মাস ছয়েক অপেক্ষা করতে হবে। মাস ছয়েক পরে কাশীতে এসেই মায়ের সপিণ্ডকরণ সেরে নেব — সেই সময়েই বিবাহ হবে।

'আমার কিন্তু কিছু দেবার সম্পত্তি নেই — এক ভরি সোনাও বোধ হয় দিতে পারব না।'

'দরকার নেই, আপনি রুলি দিয়েই বিয়ে দেবেন।'

বরদা জ্যোতিষীর মত চেহারার এবং বয়সের পাত্রকে সরমার মত মেয়ের হয়ত পছন্দ হবার কথা নয়, কিন্তু সরমা তবু আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের মতই স্বামীকে একান্ত মনে অবলম্বন করতে, ভালবাসতে চেয়েছিল। আশ্চর্য এই যে, বাধা এল বরদার কাছ থেকেই। কিসের সে বাধা — এর এই আবেগময় আত্মনিবেদন গ্রহণ করতে কোথায় বরদার সঙ্কোচ, তা সরমা বুঝতে পাবে না। ব্যথিত হয়, বিস্মিত হয়।

তবু বাধা আছে একটা কোথাও এটা ঠিক। আদালতে প্রমাণ করার মত তার কোনো প্রত্যক্ষ তথ্য না থাকলেও সরমা সমস্ত অন্তর দিয়ে সেটা অনুভব করে। কোথায় একটা প্রাচীর আছে দুজনের মধ্যে, আর সে প্রাচীর দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে।

সরমা যখন আবেশে, আনন্দে, অত্যুগ্র কামনায় ওঁকে জড়িয়ে ধরতে যায়, তখন বেশ অনুভব করে যে, বরদা কেমন যেন শিটিয়ে ওঠেন, কঠিন হয়ে যান। ওর যৌবনপুষ্ট কমনীয় বাহু দিয়ে স্বামীর গলা জড়িয়ে নিজের ওষ্ঠাধর এগিয়ে নিয়ে গেলেও তাঁর চুম্বন করতে মনে থাকে না — বরং কেমন একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন ওর মুখের দিকে। নিজের বাসনা ধিক্কৃত হয়ে ফিরে আসে। রাত্রের রসালাপ জমে না — কথা কইলে উত্তর মেলে না, আপনমনেই কি ভাবতে থাকেন বরদা।

ক্রমশ সরমা অনুভব করে যে, তার সম্বন্ধে একটি সন্দিগ্ধ ভাব আছে বরদার মনে। যখন যেখানে যে কাজই থাক না কেন, মনে হয়, তাঁর একটা সজাগ চোখ আর কান ওকে অনুসরণ করছে সর্বদা। সোজাসুজি যখন তাকিয়ে থাকেন, তখনও সে দৃষ্টিতে রূপযৌবনের প্রশংসা ফুটে ওঠে না, ফোটে না তাতে লালসা — শুধু একটা সন্দেহ, একটা অবিশ্বাস, নির্ভরশীলতার অভাবই দেখতে পায়!

তবু সরমা বোঝে যে এটা স্ত্রী সম্বন্ধে স্বামীর ঠিক সাধারণ অবিশ্বাস বা সন্দেহ নয় — তাছাড়াও কিছু একটা। কী যেন ভাবেন ইনি সদাসর্বদা, আর সে তাকে কেন্দ্র করেই।

কিন্তু রাগ হয় ওর এইজন্য যে, এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেও বরদার কাছ থেকে কোনো জবাব পাওয়া যায় না। কী ভাবেন, উনি কেন ভাবেন। কি মনে করেন ওকে — ওকে কি তাঁর বিশ্বাস হয় না? কেন হয় না? আরও কি চান উনি ওর কাছ থেকে?

এসব প্রশ্নের কোনো জবাবই মেলে না, শুধু সেই বিচিত্র চাহনি মেলে স্থির হয়ে থাকেন বরদা। ওর অন্তরের সমস্ত আকুলতা যেন এক পাষাণপ্রাচীরে ঠেকে বৃথাই মাথা কুটে ফিরে আসে।

তবু কিছুদিন সে তাঁর সান্নিধ্য পেয়েছিল। আদর না হোক, আদরের অভিনয়ও করেছিলেন। ক্রমশ সে সুখও চলে গেল — বরদার পসার বেড়েছে, বাইরের ডাক ও কাজ — দুই-ই বেশি। লোক যখন থাকে না, তখন থাকে ঠিকুজী বা কুষ্ঠী করার কাজ, তাও যখন থাকে না তখন টেবিল ল্যাম্পের আলোতে ঝুঁকে পড়ে পুঁথি আর খাতার পাতা ওল্টান; মাঝে মাঝে নিজের কররেখার দিকে তাকিয়ে থাকেন একদৃষ্টে। সরমার যৌবনের সুরা যত তাঁকে মাতাল করতে চায়, ওর রূপের আগুন তাঁর দেহের পতঙ্গটাকে যত আকর্ষণ করে, ততই তিনি কঠিন হয়ে থাকতে চেষ্টা করেন, আর বার বার ব্যর্থ আগ্রহে পুঁথির পাতার মধ্যে সান্ত্বনা

খুঁজতে চেষ্টা করেন — যদি এখনও কোথাও তাঁর হিসাবের ভুল বার হয়, যদি এখনও মিথ্যা প্রতিপন্ন হয় তাঁর আশঙ্কা।

এমনি করে ভুল বোঝবার পাঁচিল ধীরে ধীরে দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে ওঠে।

আশংকা ও সংশয় থেকে বীতরাগ, বীতরাগ থেকে বিদ্বেষ জন্মায় সরমার মনে। ও বিদ্রোহ করে স্বামীর এই অকারণ সন্দিগ্ধতার বিরুদ্ধে। ওর পরিপূর্ণ যৌবনের ডালি স্বামী ত দু'পায়ে করে সরিয়ে দিয়েছেন, যাতে তাঁর প্রয়োজন নেই, লোভ নেই — তার সম্বন্ধে এত সতর্কতা কেন, এত আগলাবার চেষ্টা কেন? সে কি করেছে? কার সঙ্গে মিশেছে, মিশবার লোকই বা কৈ? তবে এত সন্দেহ, এত আশঙ্কা কেন?

ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে সরমা এক সময়ে। সে এর শোধ নেবেই। ঐ ত চেহারা ওঁর, যৌবনে ভাঁটা পড়েছে কবে, শীর্ণ, রুক্ষ, বৃদ্ধ — ওঁর এত অহঙ্কার। ওঁকে বাড়িতে এনে এমন করে অবহেলা করবে?

সে অকস্মাৎ শুরু করলে স্বামীকেই সম্পূর্ণ অবহেলা করতে। তাঁর খাওয়া-দাওয়ার খবর নেওয়া হয় না — দিনরাত নিজের প্রসাধন ও বেশভূষা নিয়েই থাকে। বাড়ির ছাদ থেকে ডেকে ডেকে আশে-পাশের বাড়ির সঙ্গে আলাপ জমায় — ফলে মধুলোভী ভৃঙ্গও দু-একজন পাড়ার চঞ্চল হয়ে ওঠে বৈকি!

নিয়তির এই ইঙ্গিত ক্রমে বরদাও দেখতে পান। তিনি আর একবার প্রস্তুত হন সংগ্রামের জন্য। কবচ দৈবি করে ধারণ করেন, স্ত্রীর বাহুমূলে বেঁধে দেন। নানা পাথরের আংটিতে তার হাত ভবে যায়।

এধারেও সতর্কতার শেষ নেই। ছাদে উঁচু করে পাঁচিল তুলে দিলেন। বাইরের লোকজনের সঙ্গে মেশা নিষিদ্ধ হল, কড়া পাহারা দিতে লাগলেন সর্বদা নিজেই। একদিন ঝিকে পাড়ায় একটি ছোকরার সঙ্গে গল্প করতে দেখে তাকে জবাব দিয়ে দিলেন তখনই। খুঁজে নিয়ে এলেন পুরোনো এক চাকরের সুপারিশে এক চাকরকে। নেহাতই বালক সে — সতেরো-আঠারো বছর বয়স হবে বড়জোর! তাকে নিভৃতে ডেকে বুঝিয়ে দেন যে, কড়া নজর রাখাই তার সর্বপ্রধান কর্তব্য।

নীরবে সব লক্ষ্য করে সরমা। কিন্তু কিছু বলে না, শুধু ওর চোখ দুটো হিংস্র হয়ে ওঠে। সাপের মত তা ক্রুর এবং অব্যর্থ। প্রতিহিংসার জন্য সেও প্রস্তুত হল। না, অপমানের উপযুক্ত জবাব সে দেবেই।

মনে মনে হেসে সে মনোযোগ দিলে চাকরটির ওপরেই। আঠারো বছরের ছেলে, সে রূপের আগুনে নিমেষে ঝাঁপিয়ে পড়ল, সামান্যতম প্রয়াসের অপেক্ষামাত্র। কিন্তু এ প্রতিশোধেও মন উঠল না সরমার। যখন বিশ্বাস রইল না, রইল না ভালবাসা — কোনো আশা নেই, আনন্দ নেই, তখন এ-খাঁচায় বন্ধ থাকবে কেন?.... সে জানে, বিশাল পৃথিবীতে তার অন্তত অর্থের এবং সম্ভোগের বস্তুর অভাব হবে না — শুধু যা নেমে যাবার অপেক্ষা।....

ভাবার যা অপেক্ষা। প্রথম যেদিন অবসর মিলল, মানে যে সন্ধ্যায় মক্কেলের ভিড় বেশি দেখলে — ইঙ্গিতে চাকর খগেনকে ডেকে নিয়ে গেল ওপরের ঘরে, ওর নিকষ কৃষ্ণদেহ নিজের সুগৌর বাহুবেষ্টনে জড়িয়ে একেবারে বুকের কাছে টেনে নিয়ে এল, তারপর কাজলটানা চোখের মধ্য দিয়ে প্রবৃত্তি-মদির দৃষ্টি ওর দৃষ্টির ওপর নিবদ্ধ করে বললে, 'এই, আমাকে নিয়ে পালিয়ে যাবি?'

আবেগে উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে খগেন। সে শুধু, বললে, 'কোথায়?'

'যেখানে হোক — খুব দূরদেশে কোথাও — এখানে আর থাকব না, শুধু তুই আর আমি কোথাও ঘর করব।'

এ যে অপ্রত্যাশিত সুখ আর সৌভাগ্য! খগেন ঠিক নিজের অদৃষ্টকে বিশ্বাস করতে পারে না। বলে 'কিন্তু বাবু যদি পুলিশে দেয়?'

'আমি বলব, নিজের ইচ্ছায় চলে এসেছি। পুলিশ কি করবে?'

'খাবে কি? আমার আয় ত এই, অন্য জায়গায় গেলে কি আয় বেশি হবে?'

'এই ত গয়না রয়েছে আমার এত। কোথাও গিয়ে মুড়ি-বেগুনির দোকান দেব। আমি ভাজব, আর তুই বেচবি? কেমন?'

খগেনের চক্ষু লুব্ধ হয়ে ওঠে ভবিষ্যতের এ-ছবিতে। তবু বলে, 'সে কষ্ট কি তুমি সইতে পারবে?'

'খুব।'

'বেশ চলো। কিন্তু আমার বড় ভয় করে।'

সাপের মত হিসহিস করে ওঠে সরমার কণ্ঠস্বর। সে বলে, 'কিছু ভয় নেই— আমি আছি।'

'বেশ, কবে যাবে বলো?'

'কবে কি রে, এখনই।'

'এখনই?'

'হ্যাঁ — ও বাইরে ব্যস্ত আছে, চুপি চুপি এধারের দোর দিয়ে, ও গলি দিয়ে বেরিয়ে যাব —'

'কিন্তু জিনিসপত্র? কাপড়-চোপড়?'

'কিছু দরকার নেই, তাতে দেরি হয়ে যাবে। লোকে সন্দেহ করবে। কিছু নগদ টাকা আছে আমার হাতে। সব কিনে নেব।'

মূঢ় পতঙ্গের বাধা দেবার আর শক্তি ছিল না। নিয়তির মত নিষ্ঠুর ঐ মেয়েটির ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করে সে সহজেই।

সরমারও আর তর সইছে না। খগেনকে ওর প্রয়োজন ছিল না, প্রয়োজন থাকবেও না দুদিনের বেশি — এটা শুধু চরম প্রতিশোধ নেওয়া ওর স্বামীর ওপর।

ওর চোখ অদ্ভুত একটা আনন্দে জ্বলতে থাকে।

তখনই একবস্ত্রে খগেনের সঙ্গে সে গৃহত্যাগ করলে, ফেলে রেখে গেল শুধু বাঁ হাতে বাঁধা কবচখানা —

মক্কেলদের সঙ্গে কথা কইবার ফাঁকে ফাঁকে বরদা একটা কান পেতে রাখতেন ভেতর দিকে সর্বদাই। আজ যেন বড় বেশি নিস্তব্ধ ঠেকল। কোনোমতে সবাইকে বিদায় করে ভেতরে উঠে এলেন এক সময়ে।....

বাড়ির মধ্যে ঢুকতেই প্রথমে নজরে পড়ল সদর দোরটা খোলা হা-হা করছে। ছুটে ভেতরের উঠানে এসে দাঁড়ালেন। সারা বাড়িটা নিস্তব্ধ। চেঁচিয়ে ডাকলেন, 'খগেন!'

সাড়া নেই।

ডাকতে গেলেন, 'সরমা!' গলা কেঁপে কেমন একটা বিকৃত স্বর বেরোল। ছুটে ওপরে এলেন, সব ঘর খোলা, সব খালি। কেউ নেই। কোথাও কেউ নেই।

একটা ঘর থেকে আর একটায়, ওপর থেকে নীচে বারকতক ছুটে বেড়ালেন — এক সময়ে পায়ে ঠেকল, কী একটা জিনিস। কুড়িয়ে নিয়ে দেখলেন কবচটা।

এইবার হা-হা ক'রে হেসে উঠলেন। অট্টহাসি। শূন্য বাড়ির দেওয়ালে দেওয়ালে সে হাসি ঘুরে বেড়াতে লাগল।

সে হাসি পাগলের হাসি ঠিক নয়। কেমন যেন পৈশাচিক হাসি।

খুব খানিকটা হেসে নেবার পর বরদা নিজের হাতের কবচখানা টান মেরে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। আংটিগুলো খুলে নিয়ে নিজে হাতে, ড্রেনের মধ্যে ফেলে দিলেন। তারপর আবার একচোট হেসে উঠলেন হা-হা, হা-হা!

এর পর বরদা আব একবার বিবাহ করেছেন। এও তাঁর কোষ্ঠীতে ছিল। এ স্ত্রীকে কারণে অকারণে নানারকম নির্যাতন করেন। জানেন যে এ কোথাও যাবে না। এবার তিনি নিশ্চিন্ত।

কিন্তু এর পর থেকেই মানুষের ভাগ্যের অন্ধকার দিক দেখার নেশা যেন তাঁর আরও বেড়ে গিয়েছে, সে ক্ষমতাও যেন দিন দিন মানুষের সাধারণ ক্ষমতাকে ছাড়িয়ে চলেছে। তীক্ষ্ণ কণ্ঠকে তীক্ষ্ণতর করে নির্মম ও অব্যর্থ নিয়মিত অমোঘ নির্দেশকে তিনি অনায়াসে উদ্‌ঘাটিত করেন। হতচকিত, ভাগ্যতাড়িত হতভাগ্যদের পাংশু বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে তিনি যেন কী অপূর্ব আনন্দ পান, কেমন এক রকম প্রতিহিংসার আনন্দ।

আর মাঝে মাঝে হেসে ওঠেন অস্বাভাবিক রকমের তীক্ষ্ণ আর তীব্র বিদ্রূপের হাসি, সে হাসি যেন চারিদিকের স্তব্ধতাকে কেটে কেটে দূর থেকে দূরান্তরে বিস্তৃত হয়ে পড়ে।

পাড়ার মধ্যে

লীলা মজুমদার

যারা খালপাড়ে থাকত তাদের মধ্যে ভারি একটা অন্তরঙ্গতা ছিল। তার মানে নয় যে তাদের পরস্পরের মধ্যে কোনো গভীর প্রীতি বিরাজ করত; সত্যি কথা বলতে কি এক বছর ওখানে বাস করার পরও পাড়ার অনেককেই তপতী চোখেও দেখে নি। তবে সকলের ঘরের কথা সবারই জানা ছিল।

হাটুরেরা রোজ সকালে সবার বাড়িতে মাছ তরকারি বেচতে আসত; রুটিওয়ালার লোক রুটি মাখন ডিম দিয়ে যেত; গোরুগাড়ি নিয়ে কয়লাওয়ালা আসত; মোড়ের মাথায় মুদীর দোকান; দোরগোড়ায় গোয়ালার আস্তানা; থাকে কখনো কোনো গোপন কথা? একই ধোপা, একই নাপিত যেখানে?

নেপালবাবুর স্ত্রী প্রায় রোজ সন্ধ্যে করে তপতীদের বাড়ি আসতেন। মোটাসোটা কইয়েবলিয়ে মানুষটি, বছর পঞ্চাশেক বয়স তো বটেই, সামনের দিককার চুলগুলি একটু পাতলা হয়ে এসেছে, কানের পাশে পাক ধরেছে। এই এতখানি চওড়া লাল কস্তাপেড়ে কাপড় পরে, সিঁথি ভরা সিঁদুর আর এক গা গয়না নিয়ে তপতীকে বলতেন,

— গেল সে অপিসে এতক্ষণ? আর তুমি দিব্বি নিশ্চিন্তে বসে রয়েছ? জানো না একবার সুয্যি ডুবলে পুরুষমানুষেরা অন্য রকম হয়ে যায়?

দোতলার ফালি বারান্দায় ছোট্ট বেতের চেয়ারে নেপালবাবুর স্ত্রীকে বসিয়ে, তপতী হেসে বলত, কি করব মাসিমা, খবরের কাগজের আপিসের যে ঐ নিয়ম। ফিরতে রাত দেড়টা, সকালে, দশটার আগে ঘুম ভাঙে না।

নেপালবাবুর স্ত্রী বলতেন,— আমাকে রাঙাদি বলে ডেকো ভাই। মাসিমা বলে একেবারে বুড়ো বানিয়ে দিও না। আমার নতুন বাউটি জোড়া কেমন হয়েছে দেখ; বারো ভরি লাগল। — আচ্ছা, ওদের আপিসে মেয়েরাও কাজ করে, না?

তপতী মাথা নাড়ে, নাতো। সেইজন্য ওদের ভারি দুঃখ।

নেপালবাবুর স্ত্রী বলেন, — তুমি তাই নিয়ে হাসছ, তপতী? ওদের আপিসে না হয় মেয়েরা কাজ না করল, পাশের আপিসে তো করতে পারে? দালালি করতে আসতে পারে তো? মেয়েদের তা আর সেখানে প্রবেশ নিষেধ নেই। মেয়ে দালাল দেখেছ কখনো?

এমনি করে ঘুরে ফিরে নেপালবাবুর স্ত্রী ঐ একটা বিষয়ে শেষ পর্যন্ত পৌঁছন। তাড়াতাড়ি তপতী বলে, — একটু চা খান রাঙাদি?

চা আমি খেয়ে এসেছি।

তবে একটা পান সেজে দিই?

নেপালবাবুর স্ত্রী ছাঁচি পানে ভরা রুপোর কৌটো এগিয়ে দেন। পান আমার সঙ্গে থাকে, তপতী, সে কি তুমি জান না?

তপতী তখন নিরুপায় হয়ে বসে পড়ে আর নেপালবাবুর স্ত্রী বলতে থাকেন,

— মুস্কিল হয়েছে কি জানো? পুরুষমানুষরা কোনোদিনও সাবালক হয় না। মনটাই ওদের হ্যাংলা, তাই চিরটাকাল চোখে চোখে রাখতে হয়। যতই না খাওয়াও পরাও আদর যত্নে রাখো, চোখ ওদের কোথায় বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াবে। আচ্ছা, যে মেয়েরা চাকরি বাকরি করে তারা কেমন ধারা হয় বলতে পার?

নরম গলায় তপতী বলে, — কেন, রাঙ্গাদি, বিয়ের আগে আমিও আপিসে চাকরি করতাম — আমার বাপের বাড়ির অবস্থা ভালো ছিল না রাঙ্গাদি — যে মেয়েরা বাইরে কাজ করে তারাও আমারি মতন হয়; আবার কি রকম হবে?

নেপালবাবুর স্ত্রী মাথা নাড়েন, — না, তপতী, সবাই তোমার মতন হয় না। তুমি তো আটপৌরে মেয়ে, রাঁধোবাড়ো, স্বামীর দেখাশুনো কর, ছেলে আগলাও। তাদের স্বামীও থাকে না, ছেলে থাকে না। তোমরা যাদের আদর যত্ন দিয়ে ঘরে বেঁধে রাখতে চাও, চোখ কিন্তু তাদের ফিরে থাকে ঐ মেয়েদের দিকে। ওরা দেখতে ভারি চিক্কণ হয়; কি সরু কোমর হয় ওদের তুমি ভাবতে পার না। উঠি তপতী, পুজোয় বসি গিয়ে।

মোড়ের পরেই নেপালবাবুদের বাড়ি; নিজেদের বাড়ি, আগাগোড়া শ্বেতপাথরের মেঝে, লম্বা লম্বা নীল রঙা আলো, সামনের ফালি জমিটুকুতে রঙ্গন আর গন্ধরাজের ঝাড়। তার ওপর গ্যাস বাতির আলো চিকচিক করে।

কিন্তু নেপালবাবুর নাকি সেখানে মন বসে না। মোড় ছাড়িয়ে খানিকটা গেলেই, একেবারে খালের ধারে নেপালবাবুর লোহার কারখানা। দশ টাকা মূলধন থেকে নাকি নিজের হাতে গড়ে তুলেছেন। উনত্রিশ মজুর খাটে ওখানে, দুটো লরি ওঁর নিজের, দেদার লাভের ব্যবসা। কিন্তু খাটতেও হয় দারুণ। পিটোন তামার মতো চেহারা হয়ে গেছে নেপালবাবুর, এক মাথা কালো কোঁকড়া চুল, তার একটিও পেকেছে বলে মনে হয় না, প্রদীপের মতো উজ্জ্বল নেপালবাবুর চোখ, লোহার মতো শক্ত শরীর, ক্লান্তির চিহ্ন কোথাও নেই।

যারা জানে না তারা জিজ্ঞেস করে, কার জন্য প্রাণপাত করে এত বড় ব্যবসা গড়ে তুলছেন নেপালবাবু?

নিন্দুকরা যা তা বলে। বড় রাস্তায় বেরুবার একটু আগে একটি ছোট দোতলা বাড়ি আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। সেখানে নেলি মুখার্জি বলে একটি মেয়ে থাকে, ঝি-চাকর নিয়ে। আগে নাকি জমিজমার দালালি করত, কি একটা কোম্পানির হয়ে। এখন আর তার দরকার করে না, নেপালবাবুই নাকি সব খরচ-পত্র যোগান। বাড়িখানাও নাকি তাঁর, বেনামায় কেনা। সেই কোম্পানি থেকেই।

ভারি সুন্দরী মেয়ে ঐ নেলি, ভারি গুমোর তার। পাড়ার কারো সঙ্গে মেশে না, ফুটপাথে নেমে কখনো দাঁড়ায় না। বেরোয় ট্যাক্সি করে, চাকর সঙ্গে নিয়ে। বছর ত্রিশ বয়স হবে; কার মেয়ে কেউ জানে না।

নেপালবাবুর স্ত্রী এক গা গয়না পরে, পায়ে হেঁটে পাড়া বেড়ান। দোতলা বাড়িটার সামনে দিয়েও যাওয়া আসা করেন। নেলিকে যদি একবার দেখতে পান। কিন্তু নেলির বাড়িখানা সদাই চোখ বুঁজে থাকে।

পাড়ার সবার রাঙ্গাদির ওপর ভারি সহানুভূতি। নেপালবাবু যেন একটা কি, ভদ্রসমাজে ওঁর বাস করাই উচিত নয়। অথচ এদিকে লোকের দুঃখে কষ্টে দেনও অকাতরে। কিন্তু পুজোর সময় নাকি দোকান থেকে এ বাড়িতেও যেমন জিনিস আসে, ও বাড়িতেও তেমনি। তাছাড়া সত্যি কি আর রোজ অত রাত পর্যন্ত কারখানায় থাকেন নেপালবাবু? রোজ একবারটি তিন নম্বরে যাওয়া চাই-ই। একটা চক্ষুলজ্জাও নেই। তিপ্পান্ন চুয়ান্ন বছর বয়স হল, অথচ না চেহারায় না আচরণে তার ছাপ দেখা যায়। খুর খুর করে ঘুরে বেড়ান যেন পঁয়ত্রিশ বছরের

যুবক। এদিকে ঐ কাঞ্জিলালের দাদা সারা জীবন ধর্মকর্ম করে, ঐ একই বয়সে একেবারে পঙ্গু হয়ে পড়েছে। ভগবানের বিচারটা দেখলেন তো?

নেপালবাবুর স্ত্রী এ সব নিয়ে বাড়িতেও অশান্তি করেন না, বাইরেও কিছু বলেন না। শুধু অবান্তর কথার ঝুড়ি নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ান আর নেপালবাবুর সঙ্গে অতি প্রয়োজন না হলে কথা বলেন না। তপতীকে বলেন, — বাবা, ছেলেপুলে না হয়ে বেঁচে গেছি! দিব্যি সুস্থ শরীরে, মনের শান্তিতে আছি। কারো জন্য ভাবনা চিন্তাও নেই, জ্বলুনি পুড়ুনিও নেই। সংসারে সেরকম আসক্তিও নেই, ধর্মের দিকে একটু মন দিতে পারি। বলে নতুন গয়না দেখান।

তপতীরা ভেতরের সব কথাই শুনেছে। শুনেই গেছে শুধু, পরচর্চা মিলন পছন্দ করে না। তবে তাই নিয়ে দুজনার মধ্যে একটু কথা কাটাকাটিও হয়ে গেছে। তপতীর মনে হয়েছে পুরুষমানুষদের দুর্বলতার প্রতি মিলন যে শুধু ক্ষমাশীল তাই নয়, দস্তুর মতো প্রশ্রয় দিয়ে থাকে। বলেছে, — রাঙ্গাদিকে দেখলে কষ্ট হয়, টাকা পয়সা অঢেল দেন নেপালবাবু, ওঁদের গোটা বাড়িটা রাঙ্গাদির ইচ্ছে মতন চলে। সব দেন, সব দেন, তবে আবার কি?

সব দেন, কিন্তু নিজে থাকেন বাইরে। মিলন হেসে বলে, — নিজেকে আবার দিতে হয় নাকি? একি ভিকিরিকে পয়সা দেওয়ার মতো সহজ ভেবেছ? নিজেকে যে দেবে, তা নেবার লোক কোথায়? তোমার রাঙ্গাদি?

তপতী রেগে যায়। নেবার লোকটিকে পাড়ার মধ্যে না রেখে একটু তফাতে রাখলে তো খানিকটা সুরুচির পরিচয় পাওয়া যেত। মিলন বুঝিয়ে বলে, — আহা দূরে যাতায়াত করবার ওঁর সময় কোথায়? আর তোমার রাঙ্গাদিটিও তো আচ্ছা মেয়ে। যা দিয়ে ওর কোনো প্রয়োজন নেই, এমন কি যার অভাবে ওঁর কোনোই অসুবিধে হচ্ছে না, তাও ঐ মেয়েটাকে দিতে পারেন? পাঁচ জায়গায় কাঁদুনি গেয়ে বেড়ান!

কাঁদুনি গান না রাঙ্গাদি, কিছুই বলেন না। বলবার মতো কথা থাকলেও, শোনবার লোক নেই ওঁর।

রাগ কোরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে, তপতী ভাবে এক আধটা ছেলেপুলে থাকলে, এতদিনে ঘরে নাতি নাতনী এসে যেত রাঙ্গাদির আর কোন দুঃখ থাকতো না। অমন করে স্বাধীন মেয়েদের নাম শুনলেই জ্বলে উঠতেন না।

পরদিন বিকেলে এলেন রাঙ্গাদি, একটু যেন খুশি খুশি মনে হোল। চেয়ারে বসেই বললেন, — একটা মোড়া দে না তপতী, পা-দুটি তুলি। চা করিস তো আজ দিস আমাকেও এক পেয়ালা। নেপালবাবুর স্ত্রীকে এত হাসিখুশি দেখে তপতী অবাক হয়। চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে রাঙ্গাদি বললেন, নেলি মুখার্জিকে চিনিস? বড় রাস্তার কাছে তিন নম্বরের ঐ দোতলা বাড়ির নেলি মুখার্জিকে?

তপতী বলে, তাকে না চিনলেও দেখেছে কয়েকবার। গত বছর পুজোর সময় গাড়ি জ্যাম হয়েছিল, কাছাকাছি অনেকক্ষণ ধরে দেখেছে তখন।

কেমন দেখতে বল দিকিনি?

কি বলবে তপতী? বলে, — বেশ দেখতে।

না, ওতে হবে না, খুঁটিয়ে বল। আমার চাইতে ফর্সা? আমার চাইতে ভালো মুখচোখ? তপতী রাঙ্গাদির গৌরবর্ণ মুখের দিকে, তিলফুল নাসার দিকে, টানা চোখের দিকে চেয়ে মাথা নাড়ে।

না, রাঙ্গাদি, ফর্সা নয়, উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণ বলা যায়। এমন কিছু সুন্দরীও নয় সে, তবু কি যেন একটা আছে চেহারার মধ্যে, পাতলা ছিপছিপে, হাত পাগুলো ফুলের মতন। একটা ঘন নীল সুতির শাড়ি পরেছিল, সোনালী পাড়, গলায় একছড়া ছোট ছোট মুক্তোর মালা ছিল, দু

হাতে দুগাছি মোটা সোনার বালা মাথায় কাপড় ছিল না, কানে সোনার মাকড়ি, কোঁকড়া চুলগুলো দিয়ে হাতে জড়িয়ে খোঁপা বাঁধা। ভারি ভালো লেগেছিল তপতীর।

ভয়ে ভয়ে তাকায় রাঙ্গাদির দিকে। রাঙ্গাদি খুশি হয়ে বলেন, — ছিপছিপে আর নেই সে, তপতী, তার ছেলে হবে। নেলি মুখার্জি বাঁচে কি না সন্দেহ, জানিস, অমন সরু যাদেব কোমর হয় তারা ছেলে হতে অনেক সময় মরেই যায়। কাল রাত থেকে তো শুনছি টানাটানি চলছে।

চমকে তপতী রাঙ্গাদির মুখের দিকে চায়। রাঙ্গাদি উঠে পড়েন, যাই, আজ পায়েস পিঠে করব বলে, বেশি কবে দুধ রেখেছি। তপতীর মন খারাপ হয়ে যায়। নিজের ছেলেব সর্দি কাশি, কি জানি কেমন ভয ভয় করে, বারে বারে থার্মোমিটার দিয়ে জ্বর দেখে, ছেলে বেগে ওঠে। সন্ধ্যেটা যেন আর কাটতে চায় না। বুধবার মিলন একটু সকাল সকাল বাড়ি আসে, দশটাব সময় জামা খুলতে খুলতে বলে ঃ

মোড়ের কাছে ঐ দোতলা বাড়ির মেয়েটি বাঁচল না, তপতী, মেলা লোকজন দেখলাম সেখানে। এতক্ষণে নিয়েও গেছে।

তপতী বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে। দুজনার কারো খাওয়াতে রুচি থাকে না, যা হয় চারটি মুখে দিয়ে, তপতীর হাত থেকে পান নিয়ে মিলন বলে, — কাঞ্জিলালের সঙ্গে ঐখানেই দেখা। বড্ড কথা বলে, কাঞ্জিলাল। নাকি নেপালবাবু সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, তবে সঙ্গে যান নি। আর নেপালবাবুর স্ত্রী নাকি বারে বারে চাকর পাঠিয়ে ওঁকে ডাকাডাকি করিয়েছেন।

শুকনো গলায় তপতী বলে, — আর ছেলেটা? সেও বাঁচল না? তপতীর গলার স্বরটা অস্বাভাবিক শোনায়, মিলন আস্তে ওর কাঁধে হাতখানি রেখে বলে, — নেবে তুমি ঐ ছেলেটাকে? আছে সাহস? কণ্ঠ রোধ হয়ে আসে তপতীর, শুধু বলে 'আছে'।

সেই রাত্রেই যায় দুজনায় তিন নম্বরে বাড়িতে। অন্ধকার নিঝুম পুরী, অনেকক্ষণ কড়া নাড়ার পর চাকব এসে দরজা খুলে দেয়। বলে পাড়ার কে গিন্নীমা এসে নাকি ছেলে নিয়ে গেছেন। ঝি সঙ্গে গেছে।

তপতীর বুক থেকে একটা বোঝা নেমে যায, হঠাৎ মনটা হাসিখুশিতে ভরে যায়। বলে, বড্ড খিদে পাচ্ছে, পানুর দোকান থেকে কচুরি আলুর দম নিয়ে যাই চল। পানুব দোকান সিনেমা বন্ধ অবধি খোলা থাকে।

কাঞ্জিলাল নেপালবাবুব কারখানাতেই কাজ করে, ছিল সে ওখানে অনেক রাত অবধি, দেখেছিল সবই। পর দিন তার বৌ এসে তপতীব কাছে বাঁধাকপি প্যাটার্ন শিখতে শিখতে বলে, আশ্চর্য না, বৌদি? সারাটি বিকেল রাঙ্গাদি কমপক্ষে দশবার দানুকে পাঠিয়ে ছিলেন ও বাড়ি থেকে নেপালবাবুকে ডাকতে। দানু দেখে দেখে ফিবে গেছে, ডাকতে সাহস পায নি। বাতে সব চুকেবুকে গেলে পর, নেপালবাবু তখনো তক্তোপোসের কিনারায থুম হয়ে বসে আছেন, কচি ছেলেটা পাশেব ঘরে খালি কাঁদছে, গলা দিয়ে স্বর বেরোয় না, তবু চ্যাঁচাচ্ছে। এমনি সময় ঝড়ের মতো মুখ করে রাঙ্গাদি নিজে গিয়ে উপস্থিত। সবাই মনে কবল এবাব একটা খণ্ডপ্রলয় না হয়ে যায না। রাঙ্গাদি এক দণ্ড দাঁড়িয়ে দেখলেন। তারপব পাশের ঘরে গিয়ে ছেলেটাকে টপ করে বুকে উঠিয়ে নিয়ে, নেপালবাবুকে হাত ধরে তুলে বাড়ি নিয়ে গেলেন, মজার খবর না?

তপতী অন্যমনস্ক হয়ে যায়, প্যাটার্ন ভুল হয়, দিনেব আলোটাকে ভালো লাগে। কাঞ্জিলালের বৌ বলে,

গেছিলাম সকালে একবার মজা দেখতে। ছেলেটি ঘুমুচ্ছে আব রাঙ্গাদিতে আর ঝিতে মিলে কাঁথা সেলাই হচ্ছে। কত দেখব দুনিয়াতে, ভাই। আচ্ছা, এ জাযগাটা এরকম হযে গেল কেন, ভুল হয়নি তো?

সীমারেখার সীমা

আশাপূর্ণা দেবী

সবাই হেরে ফিরে গেছে।

শেষ পর্যন্ত সতীনাথ নিজেই তিনতলায় উঠে এলেন। তীব্রস্বরে বললেন, 'অসভ্যতারও একটা সীমা থাকে ছবি, থাকা উচিত। কিন্তু এই বিয়েবাড়ি-ভর্তি লোকের সামনে যে অসভ্যতা করলে তুমি, তার সীমা নেই! আমাকে তো এতগুলো আত্মীয়-কুটুম্বের সামনে ধুলোর অধম করলে, নিজের মুখও কম হাসালে না! এখন চলো দয়া করে!'

তিনতলার ছাতে ঘরের স্যাংশান ছিল না, তবু ছবির জন্যেই ঘরটা বানানো হয়েছিল টালীর ছাত দিয়ে। ছবির এই টালীর ছাত ঘরটার মধ্যে আলো জ্বলছিল না। শুধু নিচের তলার প্যাণ্ডেলের অগুন্তি আলোর তির্যক এক-একটা রেখা কীভাবে যেন এসে পড়ে ঘরের দরজাটা সামান্য আলোকিত করেছিল।

সেই দরজার ধারে হাত রেখে দাঁড়িয়ে ছিল ছবি, হাতের সেই আঙুল ক'টা আর গালের একটা পাশ দেখা যাচ্ছিল শুধু তার। কিন্তু সেই দেখাটুকুতে ছবির মুখের ভাব ধরা পড়ছিল না।

ধরা পড়ছিল না, — এখনো আগের মতোই অনমনীয়, না নরম হয়ে এসেছে।

সতীনাথ ডাকতে আসার পরও যদি পূর্ব অবস্থাই থাকে, ধরে নিতে হবে, ছবিও তার বরের মতো পাগল হয়ে গেছে।

কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন বোঝা গেল না। ছবি অদ্ভুত শুকনো গলায় বলল, 'তুমি আবার কেন কষ্ট করতে এলে দাদা, আমি তো বলেই দিয়েছি —'

'হ্যাঁ জানি —' সতীনাথ ক্ষুব্ধ এবং ক্রুদ্ধস্বরের সংমিশ্রণে বলেন, 'জানি একে-একে বাড়িশুদ্ধ লোক তোমাকে খোশামোদ করতে এসেছে, আর তুমি সবাইকে হট্-আউট করে দিয়েছ 'খাব না, নিচে নামব না' বলে। তোমার বৌদি তো শুনলাম হাত জোড় করে ফিরে গেছে। তাতেও — তোমার —'

ছবির মুখ এখনো দেখা যাচ্ছে না।

ছবি যদি ঘরের মধ্যে থেকে একটু বেরিয়ে আসতো, হয়তো দেখা যেত, কিন্তু বেরিয়ে আসছে না ছবি। যেন ঘরের দরজায় কে তাকে গণ্ডি কেটে দিয়ে আটকে রেখে গেছে সীতার মতো। এই চৌকাঠ ডিঙোলেই রাবণের হাতে পড়ে যাবে ও!

কিন্তু দরজাটা বন্ধ করে ফেলে নিজেকে যে ছবি একবার বিছানায় ফেলবে সে অবকাশ মিলছে না। সেই সন্ধ্যা থেকে কেবল লোকের পর লোক আসছে ছবিকে ডাকতে।

'অ ছবি, পাঁচশো লোক এসেছে নিচে, কতক্ষন খোঁজ করছে 'ছবি ছবি' করে, আয় একবার।... 'অ ছবি, কী রূপের জামাই হয়েছে তোর দাদার, দেখবি না একবার?' .... 'পিসিমা, সম্প্রদানের ঘরে কী সব তুমি করে আস নি, বাবা রেগে আগুন হয়ে গেছে, এসো শিগ্গির!.

কিন্তু ছবি অটল।

ছবির দুর্জয় মান ভাঙছে না।
ছবি বলছে, 'মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে!'

অথচ সারাদিন কিছুই না।

কোনদিনই কিছু না। গোড়া থেকে বিয়ের সব কাজই ছবি সামলাচ্ছে।.... রান্নাঘর ভাঁড়ার ঘর খাবারঘর পুজোর ঘর চরকি ঘুরে বেড়াচ্ছে ছবি. এর মাঝখানে ঠিক এই বিয়ের সন্ধ্যায় কোন্ ফাঁকে যে সেই তুচ্ছ ঘটনাটুকু ঘটে গেছে, আর কোন্ ফাঁকে ছবি সেই ঘটনাকেই উচ্চ করে তুলে অভিমানে শয্যা নিতে গেছে, তা কেউ খেয়াল করে নি। খোঁজ পড়েছিল সম্প্রদানের সময়।

ছবি কোথায়? ছবি?

গাঁটছড়ার হলুদকড়ি কোথায় রেখে গেল ছবি? কনের লজ্জাবস্ত্র? পাওয়া যাচ্ছে না দরকারের সময়।

পাওয়া অবিশ্যি গেলই তখুনি, পাশেই ছিল। কিন্তু কেউ পাশে বসে হাতে হাতে জুগিয়ে না দিলে অসুবিধে নেই? আর শুধু গাঁটছড়ার হলুদকড়ি আর কনের লজ্জাবস্ত্রই তো নয়, নিয়মকর্মের সব কিছুই তো ছবির এক্তিয়ারে। কনের মা কত দিকে তাল দেবে? অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা করতে হবে না তাকে।

কিন্তু সব জেনেও সবচেয়ে মোক্ষম সময় হাওয়া হয়ে গেল ছবি? ছি ছি! ধমক খাওয়া বরকে সোহাগ করতে গেল আর কি। কিন্তু এইটা কি তার সময়? পাগল-ছাগল মানুষ, আবার কী করতে কী করবে, তাকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে রেখে নিশ্চিন্দি হয়ে নেমে আয়? বর-কনে বাসরে বসলে তখন বরং গুছিয়ে ভোজের রান্না সাজিয়ে নিয়ে তিনতলায় বসে বরকে ঘুম থেকে তুলে খাইয়ে সোহাগ করিস।

এ কী!

এ যে বরদাস্ত করা কঠিন!

এই বাড়িভর্তি লোকের সামনে তুই তেজ করে বর নিয়ে ঘরে বসে আছিস? বলছিস 'ও খাবে না, আমি খাবো না।' ছি ছি। অমন যে জামাই হল, দাদার কত আমোদ-আহ্লাদ হল, বিয়ের সময়, স্ত্রী-আচারের সময় দেখলি না একবার? এমন কি খাওয়ায় পর্যন্ত তেজ দেখাচ্ছিস? এই উৎসব, এই কাণ্ডর রান্না-বান্না, মাছ-মিষ্টি হেন-তেন তার কিছু দাঁতে কাটবি না দুটো মানুষে? উপোস করে পড়ে থাকবি?

ভাইঝির কল্যাণ-অকল্যাণ দেখবি না? ভাই-ভাজের মাথা হেঁট করবি? ইতরতার কি মাত্রা নেই?

দাদা, তোর চাইতে কুড়ি বছরের বড়ো দাদা, বাপের মতো বললেই হয়, বাপের মতোই মানুষ করেছে তোকে, বিয়েও দিয়েছে। আর তারপর বারোমাস তিরিশদিন তোকে আর তোর পাগল বরকে পুষেছে, ঘর বানিয়ে দিয়েছে তোর জন্যে। সেই দাদা পাগলাটাকে একটা ধমকেই থাকে, কি একটা ধাক্কাই দিয়ে থাকে, এই ব্যবহারটা করবি তুই? কৃতজ্ঞতার বালাই নেই শরীরে?

এত বড়ো অকৃতজ্ঞতা করে কেমন যেন দেখাচ্ছে ছবিকে, সেই দৃশ্য দেখতেই বোধ করি ছবির এই টালিছাত ঘরের দরজায় রথ-দোলের ভিড় হয়েছে তখন থেকে।

অনেকে আবার সহানুভূতিও দেখাচ্ছে!

চুপি চুপি অবশ্য।

কারণ যার বাড়ি তার বিপক্ষে দলের হয়ে কথা বলতে চুপিচুপিই ভালো। চুপিচুপি বলা যায়, 'আহা!' বলা যায় — 'মরে যাই, ছোট ভগ্নীপতিটা পাগল মানুষ, বোঝে না বলেই না অমন কাজটা করে ফেলেছিল, তারজন্যে তুমি একটা বিজ্ঞ বিচক্ষণ ব্যক্তি, তোমারই মেয়ের বিয়ে দিতে বসেছ, সেই শুভদিনে তাকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে? বোনটা 'কারে' পড়ে তোমার কাছে পড়ে আছে বলেই না এমনটা পারলে? পয়সাওয়ালা ভাগ্যিমানী বোন হলে পারতে?

কিন্তু নিচে নেমে গিয়ে তারাই আবার রেগে আটখানা হয়ে উল্‌টো গাইতে বসেছে!

না বসবে কেন?

তারা কি খৃস্ট, না শ্রীচৈতন্য যে, রাগ নেই শরীরে? ওই সহানুভূতির উত্তরে ছবি যদি চোখের জল না ফেলে, যদি বলে, 'এসব কথা আমার ভালো লাগছে না, আপনারা নিচে যান —'

তাহলে?

খৃস্ট-চৈতন্যেরও রাগ হতো এতে।

কিন্তু এসব তো সান্ধ্য লীলা!

রাত্রে, অনেকটা রাত্রে, যখন বাইরের লোক বিদায় নিয়েছে, বাড়ির লোকেরা শুধু খেতে বাকী, যখন সতীনাথ তাঁর জামাইয়ের রূপে-গুণে মোহিত, এবং নিজের ক্যাপাসিটির আহ্লাদে ভরপুর, তখন হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, 'ক্ষিতীশ খেয়েছে?'

তখনই বোধ করি মনে পড়ল, অসভ্যের মতো একটা ঝাড়নের ওপর একরাশ লুচি মিষ্টি চপ ফ্রাই নিয়ে আসরের মাঝখানে খেতে বসেছে দেখে ক্ষিতীশকে তিনি প্রচণ্ড একটা ধমক দিয়ে ঘাড় ধরে বার করে দিয়েছিলেন আসর থেকে।

কাজটা একটু গর্হিত হয়েছিল, অস্বীকার করছেন না সতীনাথ, কিন্তু তাঁরও তো রক্তমাংসের শরীর?

সেই মাত্র বরযাত্রীর দল এসে আসরে বসেছে, এবং সতীনাথ কন্যাদান করবেন বলে তখনো অভুক্ত রয়েছেন, সেই উদ্বেগে অধীর, উৎকণ্ঠায় চঞ্চল, আর আশঙ্কায় থরথর সঙ্গীন সময়ে ওই কুৎসিত বীভৎস দৃশ্য সহ্য করা কি সহজ?

সহ্য করতে পারেন নি সতীনাথ।

কিন্তু পাগলটা যে তাতে অপমানে খান্‌খান্ হবে, তাও আশঙ্কা করেন নি। ঘুরে গিয়ে আবার হালুইকরদের কাছে গিয়ে বসবে, এই রকমই একটা আন্দাজ ছিল। জানতে পারলেন ছবির অনুপস্থিতিতে। ছবি বিহনে শুধু তো তিনিই অসুবিধেয় পড়েন নি, সারা বাড়িতেই নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে, আর 'ছবি ছবি' রব পড়ে গেছে।

সেই সময় বড়ো শালী ওই 'দানের' আসরেই কারণটা উদ্‌ঘাটিত করে ফেললেন।

'কি জানি ভাই, শুনছি তুমি নাকি কখন তোমার বোনাইকে যাচ্ছেতাই করেছ, ঘাড়ে ধাক্কা দিয়েছ, তাই বোন তোমার মনের দুঃখে বর নিয়ে নিজের কুঠুরিতে গিয়ে বসে আছে। সেই অবধি নামে নি। বোনাইটি বুঝি হালুইকরদের কাছে তম্বিগম্বি করে এক পোঁটলা খাবার জোগাড় করেছিল, সে-সব উঠোনে দালানে সিঁড়িতে ছড়াছড়ি কাণ্ড! রাগ করে ছুঁড়ে ছড়িয়ে ফেলে দিয়ে গেছে! তা না হয় পাগল, বোন তো তোমার পাগল নয়?'

এই যুক্তিপূর্ণ প্রশ্নে তখন সতীনাথও রাগে পাগল হয়ে উঠেছিলেন, নেহাৎ দানের আসনে বসে, তাই উচিত ব্যবস্থা করতে পারেন নি, কিন্তু এখন মনের মধ্যে উদারতার সুর বাজছে, এখন প্রশ্ন করা যায় 'ক্ষিতীশ খেয়েছে?'

অনুকূল, সন্ধ্যা থেকে, না হয় পঞ্চাশজন গিয়ে সেধেছে ছবিকে বিয়ে দেখতে, পাঁচজনেব কাছে এসে বসতে, পঙ্‌ক্তিতে বসে খেতে। পাহাড়ের মতো অচল হয়ে বসে আছে ছবি, নামানো যায় নি তাকে।

এ হেন অসভ্যতার কাহিনীটা আবার সবটাই শুনলেন স্ত্রীর মুখে। তার পরেও তাব মনের মধ্যে উদার রাগিনী বাজতে থাকবে, এ আশা কবা চলে না।

তেড়ে উঠে গেলেন তিনতলায়।

বললেন, 'না হয় হাতজোড়ই কবছি, একবার আমাদেব সঙ্গে খেতে বসবি চল।'

ছবির কি গলা কাঁপলো?

না সতীনাথের মনের ভ্রম?

বোধহয় ভ্রমই। ছবি তো খুব পরিষ্কাব গলায় বলছে, 'এসব কেন বলছো দাদা, আমি তো বলছি আমার খাবার ক্ষমতা নেই, খেতে পাববো না। মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে!'

সতীনাথের সেই এক পোঁটলা খাবারেব বীভৎস দৃশ্যেব কথা স্মরণে এল। সঙ্গে সঙ্গে তার একটা কথা। . . .পাগল হোক ছাগল হোক, স্বামী।

নবম গলায বললেন, 'বেশ তো, পারিস না পারিস বসবি আয় একবাব। ক্ষিতীশের খাবারটা ওপরে পাঠিযে দিতে বলছি, ওকে খাইয়ে চলে আয়।'

ছবি তেমনি নিষ্কম্প দাঁড়িয়েই বলল, 'ও খাবে না দাদা।'

আবার ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো।

আব সেই আশ্চর্যও নয়।

সতীনাথ নেমে এলেন, শুধু কড়া গলায একটি মন্তব্য করে, 'বেইমান হলে এই বকমই হয বটে।'

আব তার সঙ্গে সঙ্গেই অমল উঠে এল।

শেষ পবিবেশনের দায়িত্ব নিয়েছে সে, অথচ সামান্য একটা মেয়ের ধনুক ভাঙা পণে পকাবণ ঘড়ির কাঁটা বারোটাব ঘর থেকে ফের একটায় গিযে পড়ল।

সে এদের আত্মীয নয় কিছু নয, পাড়ার লোক মাত্র, তাব এত দায়িত্ব মাথায় নেবাব কাবণ নেই, তবু নিয়েছে। স্বভাবে নিয়েছে। কিন্তু আর রাত হলে তাব নিজেব বাড়ির লোক কি বলবে?

সিঁড়িতে সতীনাথেব সঙ্গে প্রায় ধাক্কা।

সতীনাথ একবাব তাকিয়ে দেখলেন, ক্ষুব্ধ ব্যঙ্গে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলেন, 'ও তুমি বুঝি বাকী ছিলে?'

নেমে গেলেন।

পাড়াব ছেলে, চিরকালের চেনা জানা, অবাক কিছু হলেন না। তবে আশাও রাখলেন না।

অমলও রাখে নি।

অমলের কিছুই শুনতে বাকী নেই।

ঘটনা থেকে মন্তব্য।

তাই অমলের ভয় । নিজের উপর। তবু তার একবার দেখবার কৌতূহল হচ্ছিল। অতখানি অনমনী. হলে দেখতে কেমন লাগে ছবিকে, বোধ করি দেখতে ইচ্ছে হচ্ছিল অমলের!

ছবি তখন আস্তে দরজাটা বন্ধ করছিল। হয়তো ভাবছিল এইবার একটু শুযে পড়তে পাবি।

অমলকে দেখে হাতটা থামালো। দরজা আধখানা বন্ধই বইল।

অমল ভাবল, ফস্ করে কি একটা দেশলাই কাঠি জ্বালাবো? দেখবো মুখটা কেমন দেখাচ্ছে ওর?

তা জ্বালল না।

বলল, 'আলোটা জ্বালো না।'

ছবি আগের মতোই শুকনো গলায় বললে, 'কী দরকার?'

'দরকার অবশ্যই নেই, কিন্তু তোমাকে কেমন যেন ভৌতিক-ভৌতিক লাগছে, তাই —'

ছবি প্রতিবাদ করল না, চাঞ্চল্য প্রকাশ করল না, কৈশোর স্মৃতির মর্যাদা রক্ষা করতে এই কৌতুক-কথায় হেসেও উঠল না। ছবি শুধু ছবির মতোই দাঁড়িয়ে রইল সেই ছায়া-ছায়া অন্ধকারে।

অমল ছবির ঘরের ভিতরটা দেখতে পাচ্ছিল না, আধভেজানো দরজায় হাত রেখে দাঁড়িয়ে ছিল ছবি। তাই অমল ঘরের মধ্যেটায় একবার চোখ ফেলবার বৃথা চেষ্টা করে বলল, 'ক্ষিতীশবাবু ঘুমোচ্ছেন?'

এখন ছবি অকারণ যেন একটু হাসলো। বললো, 'হ্যাঁ!'

'শুনলাম সতীনাথদা ওঁকে 'ইয়ে' করছেন, কিন্তু ছবি, তবু এতটা না করলেও পারতে তুমি! শুনে শুনে এত লজ্জা করছিল —

ছবি এবার স্পষ্টই হেসে উঠল।

আর-আরও একবার মনে হল অমলের, সত্যিই ছবিকে যেন ভৌতিক-ভৌতিক দেখাচ্ছে। হাসিটা পর্যন্ত। হাসির সঙ্গে বলল ছবি, 'আমার নির্লজ্জতায় তুমি হঠাৎ লজ্জা পেতে গেলে কেন অমল?'

অমল কি সত্যি দেশলাই কাঠি জ্বালাবে? দেখবে শুধু নির্লজ্জই নয়, নিতান্ত নিষ্ঠুর এই ছবির মুখটা কেমন দেখতে লাগছে?

অন্ধকারের ছায়ায় ঢাকা ছবিকে চিনতে কষ্টই হচ্ছে।

ছবির দাদা ঠকেছিল, না বুঝে ছবিকে একটা মাথাখারাপ ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল, তবু ছবি কোনো দিন দাদার নামে অভিযোগ করেনি। ছবির ভাসুর পাগল-ভাই আর ভাদ্রবৌকে এখানে চালান করে দিয়েছিল, তার জন্যেও ছবি গাল দেয় নি তাদের।

ছবি অমলের কাপুরুষতাকে ধিক্কার দেয় নি কোনো দিন। সহজ স্বাভাবিকভাবে ছবি কাজকর্ম করেছে, কুমারীকালে যে ভাবে এ সংসারের দায়িত্ব নিত, তাই নিয়েছে, বেশির মধ্যে পাগলকে সামলেছে।

কিন্তু সব কিছুর উপর চমৎকার একটা কৌতুকের বর্ম পরিয়ে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে ছবি। অমল কী না জানে, অমল সর্বদা আসে!

ক্ষিতীশকে অনেকক্ষণ না দেখলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ছবি, সেও হাসির ছলে। গল্প করতে করতে সহসা উঠে পড়ে বলেছে, 'এই সেরেছে, অনেকক্ষণ যেন আমার নিধিটিকে দেখি নি মনে হচ্ছে, যাই দেখি আবার বৈরাগী হয়ে চলে গেল কি না!' ... বলেছে, 'কটা বাজলো? ওমা তা তো মেঘে মেঘে বেশ বেলা হয়ে গেছে! দেখি আবার প্রভু নিজেই রান্নাঘরে ঢুকে হাঁড়ি খাচ্ছেন কি না!' বলেছে, 'ওই দেখ মুখ কালি করে হঠাৎ চলে গেলেন দয়াময়, আমরা জমিয়ে গল্প করছি, প্রাণে সহ্য হল না। চললাম বাবা। নচেৎ ভোলানাথ রুদ্র হয়ে বসে থাকবেন!'

পাগলের পাগলজনোচিত আচরণে যদি কেউ ঠাট্টা বা বিরক্তি প্রকাশ করেছে, কোনো দিন রাগ করতে দেখা যায় নি ছবিকে। তাদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলেছে, 'বল বাবা, তোমরা

সবাই মিলে একটু বল! আমার কিছু কাজ কমুক! জামাইবাবু বলে সমীহ না করে 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়' করলে উপকার হয় ওর!'

হেসে হেসেই বলেছে।

অথচ আজ বরের ওইটুকু সত্যিকার অপমানেই ভোল বদলে গেল ছবির?

সতীনাথের স্ত্রীর কথাই তা হলে সত্যি বলে ধরতে হবে? ভাবতে হবে হিংসের জ্বালায় সামান্য একটু ছুতো পেয়েই এমনটা করেছে ছবি? দাদার মেয়ের এত ভালো বিয়ে হলো, অমন সুন্দর বর হলো, এতে বুক ফেটে যাচ্ছে তার!

ছবির সম্পর্কে অমন কথা ভাবা যায় না।

কিন্তু নিজেই ভাবাচ্ছে ছবি।

এই অশোভন আচরণ আর বিসদৃশ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ভাবিয়ে ছাড়ছে।

ঈর্ষাই!

নইলে কবে এমন পতিভক্তি ছিল ছবির? বরং তার বৌদি বলেছেন, 'স্বামী পাগল বলে এতটুকু দুঃখু আছে ছবির, তা বোঝাও যায় না! কি অদ্ভুত অটুট মন বাবা!'

ছবির সেই অটুট মন টুটোফুটো হয়ে গেছে অতএব হিংসের জ্বালাতেই!

কিন্তু অমল এ-সব চিন্তার ওঠাপড়া প্রকাশ করল না! শুধু বলল, 'তুমি বড়ো নিষ্ঠুর ছবি!'

ছবি বলল, 'আজ জানলে?' তারপর বলল, 'কিন্তু তুমি শুদ্ধ কেন এলে বল দেখি? খাওয়ার জন্য ডাকতে নাকি?'

অমল আহত দৃষ্টি তুলে আর একবার চেষ্টা করল ছবিকে দেখতে। তারপর বলল, 'না, তোমাকে ডাকতে আসি এত দুঃসাহস নেই। ভাবছিলাম — ক্ষিতীশবাবুকে খেতে না দিয়ে আটক রেখে দাদাকে আর কতটুকু শাস্তি দিতে পারলে? শুধু এই বেচারী ভদ্রলোককেই জব্দ করলে। খুব উৎসাহ করে আমায় বলেছিলেন, তুমি আমায় পরিবেশন করে খাওয়াবে, বুঝলে? এরা ভালো করে দেবে না!'

কথা শেষ করে হাসল একটু অমল। বললো, 'অবশ্য 'এরা' বলেন নি' বলেছিলেন 'শালারা'!

ছবির কি এতক্ষণ উপোস করে থেকে গলাটা অত বেশি শুকিয়ে গেছে? না কি এতক্ষণকার অশোভন আচরণের অনুতাপে? নইলে গলাটা তো বেশ সুরেলাই ছিল ছবির!

ছিল, এখন নেই। এখন সেই শুকনো গলাতেই বলে ছবি, 'তা তোমার পরিবেশনের অপেক্ষা তো রাখে নি, নিজেই তো —'

'থাক্ ছবি, সে সব কথায়....তুমি খাও না খাও, ওঁকে একটু তুলে দাও, আমার সত্য রক্ষা করি।'

ছবি তার কৈশোর স্মৃতির মর্যাদাকে একবারে ধূলিসাৎ করলো। ছবি তেমনি স্থির দাঁড়িয়ে থেকে বললো, 'ও খাবে না!'

'ছবি! বাস্তবিকই তুমি যারপরনাস্তি অসভ্যতা করছো! সবেরই সীমা থাকা দরকার। আজ রাগ করে খেতে দেবে না তুমি ওঁকে, কাল তো দিতে হবে? তখন?'

ছবি এবার হেসে উঠল।

সত্যিকার হেসে উঠল। শব্দ করে।

বললো, 'কালও খাবে না অমল, কাল না পরশু না, কোনোদিন না!'

অমল এই সাধারণ রাগের কথাটায় এমন ভয় পেল কেন? ছবিকে কি সত্যি ভৌতিক মনে হল অমলের, ওই হাসি শুনে?

তাই অমল হঠাৎ 'ছবি' বলে অমন আর্তনাদ করে উঠল।

ছবি এ ডাকেব উত্তর দিল না। ছবি নড়লও না।

আর ছবির সেই অনড় মূর্তিটার দিকে চেয়ে অমল হঠাৎ বহুকালের ভুলে যাওয়া একটা বোকামি কবে বসলো। একেবাবে কাছে সরে এসে কপাট ধরে থাকা হাতটা চেপে ধবলো জোরে। বললো. 'ছবি. আলো জ্বালাও!'

ছবি আস্তে হাতটা ছাড়িযে নিল।

বললো, 'কী হবে?'

'আমি দেখবো!'

'দেখবার কিছু নেই অমল!'

'ছবি নিজেকে এতো নির্ভুল মনে করো না, দবজা ছাড়ো. আমায দেখতে দাও!'

ছবি তবু সরে গেল না।

শুধু স্বরটা দৃঢ় করলো, 'সত্যিই দেখবাব কিছু নেই অমল।'

অমলও কি ভৌতিক হয়ে গেছে?

অমলকেই বা অমন দেখাচ্ছে কেন?

অমল কি ভুলে গেছে তার এই দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে নিচেব লোকেরা কী ভাবছে? ওদের কৈশোরের ইতিহাস কি তাদের কারুব মনে নেই?

অনেকক্ষণ পরে বোধহয় অমলের মনে পড়লো নিচেব তলায় একটা জগৎ আছে। তাকে নামতে হবে। তাই বললো, 'ছবি এটা কি! 'শালা আমায় খেতে দিল না' বলে নিজেব মাথাতেই কিল বসাতে বসলো — '

'ছবি, তুমি কি পাথরেব?'

'হয়তো তাই!'

ছবি. নিচে গিযে ওদেব কী বলবো?'

'কিচ্ছু না অমল, দোহাই তোমার। বব কনে বাসরে বসেছে, ওদের এই রাতটাকে ধ্বংস কবে দিও না।'

'ছবি, কী করে পারছো?'

'পাবতে তো হবেই অমল! সীমারেখাটা ভুললে চলবে কেন? ওদের এই আহ্লাদেব সময কি আমি আমার —'

'সারারাত এইভাবে থাকবে তুমি?'

'না, শোবো। বড্ড ঘুম পেয়েছে, মনে হচ্ছে পড়ে যাবো।'

অভদ্র আর অসভ্য ছবি হঠাৎ অমলের মুখের সামনেই দরজাটা বন্ধ করে দিল।

খুট করে একটা শব্দ হল। ছিটকিনির শব্দ।

হ্যাঁ, দরজাটা বন্ধ না করে আর পারছে না ছবি। সতীনাথের কথাটাই এখন ঠিক মনে হচ্ছে ওর, সব কিছুরই মাত্রা থাকে, থাকা উচিত।

কয়েক ঘণ্টা ওই ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা অন্ধকারটার মধ্যে ডুবে থাকতে পেলে আবার ছবি শক্তি সংগ্রহ করতে পারবে। আবার কাল সকালে স্বাভাবিক ছন্দে নিচে নেমে গিয়ে সহজ গলায় বলতে পারবে, 'কাল বিয়ের গোলমালের মধ্যে তোমাদের আর ব্যস্ত করি নি, কিন্তু আর বোধ হয় না করলে চলবে না। এসে দেখ এবার! যা করবার তোমাদেরই তো করতে হবে।'

১৯৪৩

সোমনাথ লাহিড়ী

চটকলের ব্যাচিং অ্যাণ্ড সাইনিং ডিপার্টমেন্ট। মজুরেরা বলে মাগী-কল। কারণ যারা কাজ করে তাব বেশির ভাগই মেয়ে।

প্রকাণ্ড ঘর। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত ঘরটার সারা আবহাওয়ায় ভাসছে পাটের ফেঁসো আর পাট ছাড়ানো ধুলো। যেন খুব পাতলা শাদাটে কুয়াশা। এ কুয়াশা শুধু যে নজরেই ধবা পড়ে তা নয়। মজুরনীদের প্রত্যেক নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা ধুলো আর খানিকটা ফেঁসো ঢুকবেই। প্রথম প্রথম দম আটকে আসে। তবে কালে কালে সবই সযে যায়। নইলে আর শবীরের নাম মহা শয় হবে কেন?

রানী যেখানে কাজ করে সেখান থেকে কাছাকাছি মেয়েগুলোকে বেশ স্পষ্টই চেনা যায। অনেকটা দূরে তাকালে তখন ধুলোর কুয়াশায মানুষগুলোকে আর তেমন পরিষ্কার চেনা যায না। মাঝে মাঝে বিজলীর জোর আলো। সেখানে কুয়াশাটা যেন ভেঙে ভেঙে পড়ে। ধুলোর গুঁড়ো আলোয চিকচিক করে। তার মধ্যে শাদা শাদা ফেঁসোগুলো পবিষ্কার ভাসছে দেখা যায়।

দূরে কুয়াশার মধ্যে একটা অস্পষ্ট দেহ ঘবে ঢুকল। দেহটা এগিয়ে চলেছে। একটু ভেতরে আসতেই বোঝা যায় পুরুষ মানুষ। ক্রমশ দেখা যায় মাগী-কলের সর্দার উমেদি। রানীর দিকেই আসছে।

রানীব বুকটা ছাঁৎ কবে ওঠে। মিন্‌সে আজও আবার সেই কথাটাই পাডবে নাকি? সর্দারের পীরিত ঠেকিয়ে কি মজুরি রাখা যায়? কিন্তু তার যে ঘর আছে, সোয়ামি আছে, বছর দুয়েকের খোকা আছে। সর্দার মুখপোড়া কি ধম্মের দোহাইও মানবে না? হায় ভগবান!

উমেদি সর্দার রানীর কাছে এসে দাঁড়াল। চিবুকটা একটু টেনে দাঁত কটা বার করে হাসল। সামনের দুটো দাঁত সোনা বাঁধানো। পান আর খৈনির ছোপ ছাপিয়ে সোনাটা চিকচিক করে উঠে।

বলল, "কি গো রানী, এখুন কি করা হোবে? এই চটকলসে দানাপানি তো এবার উঠল — অব ক্যা করোগী?"

· রানীর বুক ধড়াস ক'রে যেন কারখানার গর্জনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছোটে। সত্যিই কি সর্দার কাজ ছাড়িয়ে দেবে? তা হলে খোকা খাবে কি? সোয়ামিকে কি বলব? সর্দার সব্বনাশ করতে চায় তা কি সোয়ামিকে বলা যায়? আর বললেই কি সে পেত্যয় করবে?.....নাঃ, ছোট সাহেবকে গিয়ে পা জড়িয়ে ধরব — যখন সায়েব বিকেল বেলা মেমকে নিয়ে গঙ্গার ধারে বেড়াতে যায়। মেমসায়েব মেয়ে মানুষ, তারও কি দযা হবে না?......কি বলা যায়! সর্দারের কথার ওপর সামান্য মজুরনীর কথা বিশ্বেস করবে কি?

এক নিঃশ্বাসের মধ্যে কত ভাবনা কত দিগ্বিদিকে ছোটে। সর্দার কি বলে যাচ্ছে শুনতেও পায় না। সর্দার যখন চারিদিক তাকিয়ে চোরের মতো একবার তার কাঁধের ওপর হাতটা রাখল তখন চমকে উঠে শোনে সর্দার বলছে ঃ

"মিলিটরি তো এ চটকল লিয়ে লিল, তাদের লড়ায়ের সামান তৈয়াব হোবে। চট আর এখানে বন্‌বে না — সব মজুর-মজুরনীর কাজ জবাব। তুহার মরদেরও কাম খতম। মালিকের কি, সে তো সরকাব থেকে হরজানা (ক্ষতিপূরণ) পাবে। লেকিন হামলোগ মিল থেকে সস্তা চাউল-আটা পেতম, সে ভি বন্দ হোলো। এখুন খাবি কি?"

দারুণ দুঃসংবাদ। কিন্তু সমস্ত ভবিষ্যৎটা তখন মাথায় ঢোকে না। বরং অন্য সব ভাবনা ছাপিয়ে বেরিয়ে আসে সোয়াস্তির একটা লম্বা নিঃশ্বাস। যাক, বাঁচা গেছে! সর্দাব আব কাজ কেড়ে নেবার ভয় দেখা'তে পারবে না। কেন কাজ গেল সে কৈফিয়তও আর সোয়ামিকে দিতে হবে না। সবারই কাজ যাবে, সবাই এক গোয়ালে। বাঁচলাম, বাঁচলাম, সর্দারেব আপদ থেকে তো বাঁচলাম!

দূরে ছোটো সাযেব ঢুকেছে ঠাওর করে সর্দার এগিয়ে গেল।

ইস্তিরি রানী আব সোয়ামি বিষ্টু। এক সময় তারা গাঁয়ে ছিল। বিষ্টুব ছোটো ভাই কেষ্টও ছিল। বিঘে তিন-চার ধান-জমি, একখানা খোড়ো ঘর — তাও ছিল।

কি হয় তিন-চার বিঘে জমিতে? সম্বচ্ছরের খোরাকও হয় না। বাঁড়ুজ্যে ঠাকুবেব কাছে কর্জ বেড়েই চলে। ধান-জমিটা তো বাঁধা ছিলই, কুঁড়ে আর ভিটের জমিটুকুও বাঁধা পড়ল। ফসলের বেশির ভাগটা যায় বাঁড়ুজ্যে ঠাকুরের গবেব। তিনটে কেন একটা প্রাণীরও পেট চলে না।

জমিটুকু যা পারে কেষ্টই দেখাশোনা করুক। বিষ্টু আর তার বৌ এল শহরে। অনেক খুঁজে পেতে গাঁয়ের একজন চেনা মিস্ত্রির মারফৎ বড়ো সর্দারকে ঘুষ দিয়ে বিষ্টু চটকলের মজুরি জোগাড় করল। তাও পাকা নয়, বদলি — মাঝে মাঝে বেকার বসতে হয়।

তা হোক। হপ্তায় তিন-চার টাকা ঘরে আসে তো! একেবারে উপোস দিতে হয় না। কিন্তু যত গোল বাধাল বৌটা — মাগী আবার একটা বাচ্চা বিয়োলো! দুটো মুখ কায়ক্লেশে চলছিল, এখন আর একটা মুখ বাড়ল। ছেলেপিলে জন্মায় তো শুধু গিলবার জন্যেই।

তবে বৌটা মজবুত আছে।

ওর গা-গতরে ক্ষ্যামতাও আছে। দিলে হয় চটকলের কাজে ঢুকিয়ে। ওকে দেখলে সর্দাব কাজ দিয়ে দিতেও পারে। বৌয়ের মজুরিতে আরও দু-পাঁচ টাকা আসবে, বৌ মজুরি করে জানলে গাঁয়ের লোক নিন্দে করবে? হ্যাঁঃ, জানতে পারলে তো। এই এত বড়ো শহরে কে কার খবর রাখে? আর জানলেই বা কি এমন ভাগবৎ অশুদ্ধ হয়েছে। ঐ তো আরও কত মাগী মাগীকলে কাজ করে।

রানীও চটকলে কাজে ঢুকলে। দু-তিন টাকা হপ্তা পায়। সোয়ামী আর ইস্তিরি দু'জনে মিলে যা রোজগার হয় তাতে পাঁচ টাকা ঘর ভাড়া আর সংসারের খরচ চলেই যায়। যুদ্ধের বাজারে চলত না। তবে অনেক হৈচৈ-এর পর কল থেকে যখন সস্তা দরে চাল-আটা দিতে রাজি হল তখন থেকে চলে যাচ্ছে। মাসে বরং দু-একটা টাকা বাঁচে। এই তো পাঁচ-সাত মাস আগে মিস্ত্রির হাত দিয়ে বারোটা টাকা দেশে পাঠানো গেল। ধান-জমিটার না হোক, ভিটের দেনার সুদটা তাতে মিটবে। আস্তে আস্তে সবটা জমিই খালাস করা যাবে।

এম্‌নি ধারাই বিষ্টু ভেবে আসছিল। কল বন্ধের হুকুমের সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ একদিনে সব ওলট পালট হয়ে গেল।

কলের ফটকে নোটিশ পড়েছে। বড়ো সায়েব লিখে দিয়েছে ঃ আমাদের এই এক নম্বর কল সরকার যুদ্ধের কাজে নিয়ে নেওয়ায় আমরা সমস্ত মজুর-মজুরনীকে জবাব দিতে বাধ্য হলাম। সস্তা দরে চাল-আটা দেওয়া আব আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে এখানকার কিছু লোককে দু নম্বর মিলে বদলি হিসাবে কাজ দেওয়া যেতে পারে। যারা বদলি কাজ চায় তারা যেন এই হপ্তার মধ্যে দু-নম্বর মিলে গিয়ে নাম লেখায়।

বিষ্টু পড়তে জানে না। বেশিব ভাগ মজুরই জানে না। কিন্তু খবর এর মধ্যে কারখানার সমস্ত মজুরের ভেতরে ছড়িয়ে পড়েছে। যেন জরুরি টেলিগেরাপ। বিষ্টু যখন কাজ সেরে সন্ধেবেলা কল থেকে বের হল তখন কোনো খবরই তার জানতে বাকি নেই। তবু ফটকেব নোটিশের হিজিবিজি লেখার দিকে অনেকক্ষণ হাঁ কবে তাকিয়ে থাকে। যেন মন দিয়ে ওর ভেতব থেকে নতুন মানে টেনে বের করবে। হতে পারে না, হতে পারে না, এক কথায় জবাব — তা কখনো হতে পারে না।

ফটক থেকে একটু দূরে কারা ঢোল পিটছে। মিটিং হবে — গোল তালাও ময়দানে। আজই, এখুনি। চটকল বন্দী কে বাবে মে। বড়ে বড়ে লীডার লোগ আয়ে হেঁ। অভি চলো, সব মজদুর অভি চলো.....

একজন সর্দার গোছের মুরুব্বি মজুরকে বিষ্টু চলতে চলতে জিজ্ঞেস করে, "কাদের মিটিং গো? লাল ঝাণ্ডার নাকি?"

"আরে থুঃ" বলে খৈনির থুতু ফেলতে ফেলতে মুরুব্বি জবাব দেয়, "লাল ঝাণ্ডা কি আর এখানে মু' দেখাতে পারবে? শালা লোগ বলে, দো নম্বর মিলমে বদলি কামই করো — লড়াই খাতির চট বেশি বানাও — তাতে নাকি হামাদের বোটি ভি মিলবে। অভি মিললো? লড়াই জন্যে হামাদের রোটি ভি গেলো। লাল ঝাণ্ডাওয়ালা ইধর ফির আনেসে মার ভাগাযেঙ্গে।"

বিষ্টু আর চটকলে কয়দিন কাজ করেছে? খুব বেশি কিছু বোঝে না। জিজ্ঞেস করে, "এ তবে কাদেব মিটিং, কে লীডার আসবে —"

"খুব ভারী লীডর আসবে। সদাকৎ হোসেন কা নাম শুনা? ঐ আসবে। খুব বড়া আদমি। লাট কৌঁসিলের মিম্বর, বহুৎ জবরদস্ত। হামাদের জন্যে এক কলম লিখে দিবে তো লাট সাব কো ভি মানতে হোবে। বুঝ?"

কথা বলতে বলতে মিটিংয়ে পৌঁছল। তখন মিটিং আরম্ভ হয়ে গেছে। সদাকৎ হোসেন বলছেন ঃ

"খবরদার, কেউ লাল ঝাণ্ডাওয়ালাদের চালে ফেঁসো না। ওরা বলছে দু নম্বর মিলে কাজ করো, আর সবাই মিলে কাজ জবাবের ক্ষতিপূরণ দাবি করো। আরে, একবার বদলিতে ঢুকলে কি আর সরকার ক্ষতিপূরণ দেবে? বলবে — কাজ তো পেয়েছ, আবাব কি?"

মুরুব্বি মজুরটি বিষ্টুর গায়ে কনুইয়ের ঠেলা দিয়ে বলল, "শুনা? বদলি কাজে লেগে হরজনা পাওয়া যাবে না। আজ বন্দ করে পায়ের উপর পা দিয়ে বসে থাকো, ঘরে বসে সরকারের টাকা মিলবে।"

সদাকৎ হোসেন চোখ পাকিয়ে বলছেন ঃ "লাল ঝাণ্ডারা সরকারের দালাল তাই বলছে বদলি কাজ করো। যাতে সরকারের টাকাটা বেঁচে যায়। ওরা বলে, লড়াই জেতায় আমাদেরও স্বার্থ। আরে আজ যে আমাদের এক নম্বর মিল থেকে রুটি উঠল সে কিসের জন্য? এই লড়াইয়ের জন্যে — এই জন্যেই সরকার মিল নিয়ে নিল, আমাদের রুজি মারা গেল। এই লড়াই-ই আমাদের সর্বনাশ করেছে।"

বক্তার চেয়ারের কাছে কয়েকজন জোর হাততালি দিয়ে উঠল। বিষ্টু অত সব লড়াই টড়াই বুঝল না। তার মনে শুধু একটা কথা। হাততালির ফাঁকে পাশের মুরব্বিকে জিজ্ঞেস করল, "খেতিপূরণের টাকা কতদিনে পাওয়া যাবে? যদি সরকার না দেয়?"

মুরুব্বি তখন মন দিয়ে বক্তৃতা শুনছে। বলল, "শুন-না ঐ হোসেন সাব কি বলছে!"

সদাকৎ হোসেন বলছেন ঃ

"ক্ষতিপূরণ না দিয়ে সরকার যাবে কোথায়? আইন আছে, পাকা আইন আছে — সরকার কারখানা নিলে এক বছরের পুরো মাইনে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। লাট সাহেবকেও সে আইন মানতে হয়। গতবার লড়াইয়ের সময় দিতে হয় নি? কয়লার অভাবে যখন কল বন্ধ হল তখন ভাতা আর রসদ দিতে হয় নি? এবারও না দিয়ে পার পাবে কি করে? ঘরে বসে আমরা টাকা কামাব।"

এবার খুব জোর হাততালি পড়ল, চারিদিকে। গরম হয়ে সদাকৎ হোসেন বললেন, "সাতদিনের মধ্যে সরকারের কাছ থেকে টাকা আদায় হবেই। দরকার হলে লাল কাউন্সিল পর্যন্ত মামলা নিয়ে যাব। তোমরা শুধু সবাই এক হয়ে থাকো, কেউ বদলিতে কাজে যেও না। আর সবাই চাঁদা দিয়ে ফণ্ড জমা করো — জোর মামলা, অনেক টাকা লাগবে। এককাট্টা হয়ে বসে থাকো, আইন আছে, টাকা আদায় করে ছাড়বই।"

তুমুল হাততালি। মিটিং শেষ। উঠতে উঠতে মুরুব্বি বিষ্টুকে বলে, "শুনা? আইন আছে, কানুন! লাট সাবের বাপও রুকনে পারবে না। চল্ চল্, চাঁদা জমা করে দিয়ে আসি।"

হোসেন সাযেবের সাকরেদের ঝুলিতে দলে দলে মজুর এসে আনি, সিকি, টাকা পর্যন্ত ফেলে যায়। বিষ্টুও ঠাকুরের নামে একটা দু'আনি কপালে ঠেকিয়ে ঝুলিতে ফেলে দিল।

পথ চলে আর ভাবে ঃ 'আইন আছে, আইন। রাস্তায় পেচ্ছাব করে পর্যন্ত পার পাবার জো নেই, আইনে ধরে! শুনেছি বৌকে খুন করেছিল বলে কোন্ জজ সাহেবেরও ফাঁসি হয়েছিল — এমনি আইন। দোহাই ঠাকুর, একটু তাড়াতাড়ি কোরো। সাতদিনের মধ্যে যেন ফয়সালা হয়ে যায়।'

'অধম্ম হয়, অধম্ম। পর পুরুষের সঙ্গে ধম্ম নষ্ট করলে নরকেও ঠাঁই হবে না। পতির জন্যে সতী পরাণ তেজেছিলেন, আর মিনসে বলে কিনা —। রাম, রাম, ও কথা মুখে আনলেও পাপ।'

রানী মনে মনে রাগে জাবর কাটছিল। সকাল বেলা সেই উমেদি সর্দার মুখপোড়া আবার এসেছিল। বলেছিল, পনের দিন তো হয়ে গেল কাজ নেই। রসদ বন্ধ। সরকার তো এক পয়সাও দিল না। চাল ফুরিয়েছে কবে? আর ক'দিন উপোস দিবি?...মর্ মুখপোড়া, আমরা উপোস দিই তাতে তোর কি! কত লোকই তো শুকোচ্ছে। ....তা কি শোনে? বলে, চলো আমার সঙ্গে দূরে বজবজ টজবজ কোথাও গিয়ে একটা কাজ জুটিয়ে নেব। আমি সর্দার, আমার কাজের ভাবনা কি? হাতেও তো কিছু আছে। ....দূর হ' হতচ্ছাড়া!

তবুও মনের ভেতর কোন্খানটায় যেন খুঁতখুঁত করে। রানী আবার জোর দিয়ে ভাবে ঃ উঃ, মিন্সের কি আস্পদ্দা। বলে কিনা, খোকাকে ঘরে ফেলে রেখে এই বেলা চল্, আমার সঙ্গে বেরিয়ে পড়্! আমার খোকাকে ফেলে যাব ঐ আবাগীর পুতের সঙ্গে। দূর হ' নচ্ছার বেটা পাজী কোথাকার।

উঠে গিয়ে ছেঁড়া কাঁথা থেকে খোকাকে তুলে নিল আদর করে, "আমার খোকন, আমার খোকন, বাপ আমার।" আবার ভাবে ঃ জমা চাল তো পাঁচ দিন আগেই শেষ হয়েছে। তারপর এক টাকা দিয়ে এক সের চাল কিনে এনেছিল, তাও কি সহজে পাওয়া

যায়? মাগো, এক সের চালের দাম এক টাকা, এ তো জন্মেও শুনি নি। একবেলা করে আধপেটা খেলাম, তবু সে চালও ফুরিয়ে গেছে পরশুদিন। কাল তো হরিমটর গেল। এক মুঠো বাসি ভাত খোকাটা পেয়েছিল, আজ তাও জোটেনি। বাপ্‌রে কি হবে!

সাত দিনের উপোস আর অর্ধাহার এখনই ছেলেটার মুখের ওপর ছাপ বসিয়ে দিয়েছে। পেটটা শুকিয়ে কোথায় যেন ডুব মেরেছে। ঘ্যান ঘ্যান করে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "খিদে পেচে, মা ভা দে।"

"ধন আমার, মানিক আমার, কাঁদে না। একটু সবুর কর্‌। এই বাপ এলো চাল নিয়ে। গরম ভাত দেব যাদু আমার।"

"দবম ভা খাব না, মুক পুলে দায়। থান্দা ভা খাব।"

"আচ্ছা আচ্ছা, ঠাণ্ডা ভাতই দেব। একটু দাঁড়া, বাপ এলো বলে।"

ঠাণ্ডা ভাত পাবার আশায় কি যেন ভেবে খোকা চুপ করে।

বিষ্টু এসে ঘরে ঢুকল।

শুকনো মুখ দেখে শুধোতে সাহস হয় না। তবু আমতা আমতা করে রানী জিজ্ঞেস করল, "কি হল, কিছু হল?"

"হবে আবার কি আমার মাথা মুণ্ড" — খেঁকিয়ে জবাব দেয় বিষ্টু। বলে "কাজ নিয়ে কি লোকে আমার জন্যে বসে আছে?"

রানী কি বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে বিষ্টু বলল, "শুধু আমি নয়, সবারই এক দশা। যত বাছাধন ঘরে বসে খেতিপূরণ খাবেন ভাবছিলেন, সব এখন দু নম্বর মিলের দরজায় ঘুর ঘুর করছেন।"

অন্য সকলেই তার মতো বোকা বনেছে ভেবে দুঃখের মধ্যেও একটু আনন্দ হয়। তার পরই মনে পড়ে অন্ধকার ভবিষ্যৎ। ম্যানেজার সায়েব ও তার বাপ সম্বন্ধে খুব একটা খারাপ গাল দিয়ে বলে, "উঃ শালা কি খচ্চর। কাউকে নেয় না। বলে সাতদিনের মধ্যে যারা এসেছিল তাদের কাজ দিয়েছি, এখন আর বদলির দরকার নেই।"

রানী একটু ভয়ে ভয়ে বলে, "চালও আনোনি? পরশু রাত থেকে তো উপোস চলেছে। আমরা না হয় সইলাম। কিন্তু খোকা বেচারা সইতে পারবে কি?"

"খোকা, খোকা, খোকা, তোর কেবল ঐ খোকা", বিষ্টু একেবারে ফেটে পড়ে। "বিইয়েছিলি কেন ওকে মাগী? নুন টিপে মারতে পারিস নি? আপদ আসে যত গিলবার জন্যে।"

গামছায় বাঁধা ছোট্ট চালের পুঁটুলিটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে, "ঐ নে, পিণ্ডি রাঁধ্‌, গেল্‌!"

রানী কতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। সময় যায়। রাগটা একটু শান্ত হলে বিষ্টু বলে, "দেখ্‌ ঐ আধ সের চাল, অনেক খুঁজে পেতে সাড়ে ছ' আনায় জোগাড় করেছি। এত বললাম তা মুদি বেটা কিছুতেই আধ সেরের বেশি দিল না। খুব সাবধানে টিপে টিপে খরচ করবি, বুঝলি। পুঁজি তো ফুরিয়ে এল, ওতেই ক'দিন চালাতে হবে।"

অনর্থক হায়রানি। গঙ্গার এপার ওপার দশ কোশের মধ্যে যত চটকল আছে ঘুরে ঘুরে পায়ের সুতো ছিঁড়ল। কে কাজ দেবে? এমনিতেই লোক নেয় না। তার ওপর কয়লা নেই বলে কতকগুলো কল বন্ধ। মালিকরা এখন মজুর তাড়াতে পারলে বাঁচে, সস্তা চাল-আটায় টাকা খরচ হয় না।

বিষ্টু ঘুরে ঘুরে মরে হায়রান হয়ে ফিরে আসে। এক পো চালে দু জন, তার উপর খোকা — পেটের কোণাও ভরে না। বিষ্টু বলে, "দুজনের এই কটা ভাত? দেখি, হাঁড়ি দেখি। ওই যে হাঁড়িতে এক মুঠো রয়েছে। নিয়ে আয়, রেখেছিস্ কার জন্যে মাগী?"

রানী আকুল হয়ে বলে, "না না, ও ক'টা নিয়ো না, কাল খোকা খাবে। বাছা একেবারে হাড়গোড় সার হয়ে গেছে, সকালে এক মুঠো না পেলে বাঁচবে না।"

"ওঃ ভারী আমার নবাবপুত্তুর। সব পিণ্ডিই বুঝি ছেলের গব্বে ঢালিস্। আর আমাদের শরীর দিয়ে একেবারে কাত্তিকের ছিরি বেরুচ্ছে, না? ভাত নয়, ফেন খাওয়ানি, বুঝলি ফেন! বাচ্চার ওপর আর ভাত খরচ করতে হবে না।"

ব'লে হাঁড়িটা উল্টে পাতের ওপর ঢেলে নেয়।

নিজের দেড় মুঠো ভাত থেকে রানী আধ মুঠো চুপি চুপি ছেলের জন্যে হাঁড়িতে জল দিয়ে রাখে।

আবার সকাল হয়। ছেলেটা তখনো ঘুমচ্ছে। বিষ্টু বাইরে থেকে এসে বলল, "আজ শেষ চেষ্টা দেখতে হবে। ঐ পাঁচটা ইষ্টিশন পেরিয়ে যে-কলটা সেটা আজ খুলবে। দেখি যদি কিছু হয়।"

ততক্ষণে ছেলেটা উঠে "মা খিদে, মা খিদে" বলে ঘ্যান ঘ্যান শুরু করেছে। বিষ্টু এক চড় কষিয়ে দিয়ে বলে, "শালার ছেলে, পেটে যেন রাবণের চিতে জ্বলছে।"

ছেলেটা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। রানী তাকে বুকের মধ্যে নিয়ে থামাবার নানা চেষ্টা করে।

কিন্তু বিষ্টু তখনি বের হয় না। একটা আড়ামুড়ি ছেড়ে বলে, "উঃ, অনেকটা পথ হাঁটতে হবে, তার ওপর এই রোদ। ফিরতে তো সন্ধে হয়ে আসবে। পেটে এখনি আগুন জ্বলছে, খালি পেটে এত পথ চলব কি ক'রে? ঘরে কিছু আছে নাকি রে?"

বলে আর হেঁসেলের দিকে চলে। ছেলে কোলে রানী ছুটতে ছুটতে এসে বলল, "এ ক'টা ভাত নিয়ো না গো, নিয়ো না। ছেলেটা একেবারে মরে যাবে।"

ছেলে শুদ্ধ রানীকে এক ঠেলা দিয়ে বিষ্টু বলল, "থাম্ হারামজাদি।" হাঁড়ির ঢাকা উঠিয়ে ভাত ক'টা বার করে নিল। ভাত চিবোতে চিবোতে বলল, "ছেলের জন্যে ভাত লুকিয়ে রেখেছে, আবাগীর বেটি! ছেলেকে নুন দিতে পারিস্ নি, এখন ঐ ভাতের জল খাওয়াবি। ভাত আর খাওয়াতে হবে না, বুঝলি?"

মুঠোখানেক ভাতে কি বা হয়। তার ওপর ঢক ঢক ক'রে এক ঘটি জল খেয়ে বেরিয়ে পড়ে। বাপ্‌কে ভাত নিয়ে বসতে দেখে ছেলেটা চুপ ক'রে চেয়েছিল। যখন দেখল সব ভাত ক'টা খেয়ে ফেলেছে তখন ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠল। রানীর চোখেও জল।

রোদ বাড়ে। ছেলেটা কাঁদতে কাঁদতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমের ঘোরেও থেকে থেকে কান্নার হেঁচকি উঠছে।

রান্নাবান্না ঘরকন্না — করবার কিছুই নেই। বাড়িওয়ালা সেদিন স্পষ্ট বলে গেছে আজকের মধ্যে ঘরভাড়া মিটিয়ে না দিলে কাল ঘর থেকে বার করে দেবে।

রানী বসে বসে ভাবে। কাল আবার উমেদি এসেছিল। এই শেষবার। বলেছিল, দক্ষিণের এক মিলে কাজ পেয়েছি, সেখানে কাল চলে যাব। চল্ রানী, আমার সঙ্গে চল্। মরদ আর বেটা নিয়ে কি করবি। ওরা খেতে দেবে? আপনি বাঁচলে বাপের নাম! ছেলেটাকে ফেলে রেখে চল্ আমার সঙ্গে।"

কাল আব তাকে তেমন কড়া কথা শোনাতে পারেনি রানী। মনে কেমন যেন জোর পায় রানি। যাবার সময় উমেদি শেষ ডাক দিয়ে গেছে ঃ "আসবি তো, কাল দুপুরে আমার ঘরে আসিস। ঐ সময়ে আমি টিরেন ধরব।"

সেই 'কাল দুপুর' আজ এসেছে।

রানী বসে বসে ঘুমন্ত ছেলেটার মাথায় হাত বুলোয়। পাঁজরার হাড়গুলো বেবিয়ে এসে যেন প্যাঁট প্যাঁট করে তাকাচ্ছে। বুকের হাড়গুলোও শীর্গ্গির জিরজির কববে।

মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে রানী মনে মনে বলে ঃ "ধন আমার, মানিক আমার, সোনা আমার।" বার বার বলে।

বাইরে আওয়াজ হয় ঃ 'বল হরি, হরিবোল'। আস্তে আস্তে উঠে এসে রানী দেখল। রাস্তা দিয়ে কোন ভাগ্যিমানের মড়া যাচ্ছে। সঙ্গে কত লোক। খোল বাজে, কবতাল বাজে। খাটের সামনে খৈ ছিটোচ্ছে। একটু আগে গিয়ে দেখে শুধু খৈ নয়, তার সঙ্গে পয়সাও।

বানী হন্ হন্ কবে এগিযে যায। পযসা নয, ডবল পয়সা আর আনি। তাও তো বটে, পযসা আজকেব দিনে কোথায় পাবে?

কি ভিড! পযসা কুড়োবার জন্যে কি মাবামাবি! বানী কিছু দূর খাটেব সঙ্গে সঙ্গেই চলল। কিন্তু সেই ভিড়ের থেকে পয়সা কুড়োনো কি মেয়েলোকেব সাধ্যি!

বানী একটু দমে যায়। তাবপব যে বাবু পযসা ছিটোচ্ছিল তার কাছে এগিয়ে গেল। কাতরভাবে বলল, "বাবু, আমাকে একটা পযসা দাও না।"

বাবু মুখ না তুলেই বলে, 'দূব মাগী, সবাই যেখানে কুড়োচ্ছে সেখান থেকে নে না।" তাবপব মুখ তুলে চায। বানীব সঙ্গে চোখাচোখি হয। চোখ থেকে নজব নামে মুখে, বুকে সর্বাঙ্গে। একটু ঢোক গিলে বাবু বলে ঃ "আচ্ছা, এই নাও।" ওব হাতে একটা আনি ফেলে দেয।

দু'পযসা করে ছোট্ট দু' ঠোঙা মুড়ি কিনে নিয়ে রানী ঘবে ফিবল। ছেলেটা তখন ঘুম ভেঙে উঠে কাঁদছে। একটা ঠোঙা ছেলেব সামনে ধবে দিল।

আব একটা ঠোঙা তুলে বেখে দিযে বানী আবাব ভাবতে বসে।

উমেদি দক্ষিণেব কোন্ মিল ছেলে সোযামি উপোস। ধম্ম অধম্ম ভাত নেই। কেন ভাত নেই? গাঁয়ের মাঠে কত ফসল ফলে। গাঁযেব মন্দিবে কত ধম্ম আছে। ভাতও আছে নিশ্চয .

বিষ্টু ফিবল বেলা পড়লে। শুকনো মুখে মেঝের ওপবেই চিত হয়ে গা এলিযে দিল। দেখলেই বোঝা যায় কাজ পায় নি।

খানিকক্ষণ কথা নেই। একটু পবে মুড়ির ঠোঙা আব জলের ঘটিটা এনে বিষ্টুর হাতেব কাছে রেখে রানী বলল, "ওঠো, একটু জল খেযে নাও।"

"মুড়ি? মুড়ি কিনবাব পয়সা কোথায পেলি?" সন্দেহে বিষ্টু চঞ্চল হযে ওঠে। কাঠেব বাক্সের সামান্য পুঁজিটা মাগী ভাঙছে না তো? মুড়িব ব্যাপার রানী বলে যাচ্ছে তবু বিশ্বাস হয় না। কোমবে হাত দিয়ে দেখে চাবিটা -- ঠিক আছে। হাত বাড়িযে বাক্সের তালাটা নেড়ে দেখে — ঠিক আছে। আশ্বস্ত হয়। উঠে বসে মুড়ি চিবোতে আরম্ভ কবে। মনটা একটু গলে। বলে, "তুই খাবি নে?"

"আমি খেয়েছি" ব'লে রানী ওব কাছে এসে গা ঘেঁসে বসে। পিঠেব ওপর হাত বুলোতে বুলোতে বলে, "দেখ্ চল্ আমরা গাঁয়ে ফিরে যাই।"

"গাঁয়ে? সেখানেও তো শুনেছি ভাতের আকাল। সেদিন কে যেন বলছিলো।"

"তা হোক, এখানকাব মতো এক সের চাল কখনো এক টাকা হবে না। আমাদেব

জমিতে না হয় আউস হয় না, কিন্তু লোকের ঘরে তো এবার শুনেছি ভালো ফসলই উঠেছে। বাড়ি বাড়ি খাটলে দু'মুঠো ভাত কি আর পাওয়া যাবে না?"

"তা যা বলেছিস। পাঁচ-সাত মাস কেষ্টরও কোনো খবর পাই নি। আমনের চাষ কেমন হল, বাঁড়ুজ্যে ঠাকুরের সঙ্গে ভাগের কি ব্যবস্থা হল কিছুই বুঝলাম না।"

"ঠাকুরপো তো আর নেকাপড়া জানে না যে চিঠি দেবে। নিশ্চয়ই সব ঠিক আছে। খারাপ হলে খবর পাওয়া যেতই, অমঙ্গলের খবর বাতাসের আগে যায়!"

বিষ্টুও একটু দোমনা হয়ে বলে, "তার চেয়ে কলকাতা গিয়ে কাজের চেষ্টা দেখলে হয় না? সেখানে শুনেছি কন্‌ট্রোলের দোকানে ছ' আনা সের চাল পাওয়া যায়। ভিক্ষেসিক্ষেও বোধ হয় মেলে।"

"দূর আমরা কি ভিখিরি? আর কলকাতায় চালের কন্‌ট্রোলের কথা আর বোলো না। ঐ রামপীরিতের বুড়ি একদিন গিইছিল। সারা রাত সারা দিন ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে যদি বরাত ভালো হয় তো এক-আধ সের চাল মেলে। লাইনেই দাঁড়াব তো কাজ খুঁজবে কখন। থাকবে কোথায়? ফুটো পুঁজিতে ক'দিন চলবে?"

"তা বটে।" একটু ভেবে নিয়ে বিষ্টু আবার বলে, "হ্যাঁ, তা এই এখন হল তোর গিয়ে আশ্বিনের শেষ। অঘ্রাণ মাস পর্যন্ত মাস-দেড়েক কোনোরকমে কাটিয়ে দিতে পারলে তারপর আমাদের জমির ধানই উঠবে। তখন শুধব ব'লে চাইলে বাঁড়ুজ্যে ঠাকুর কি আর এ ক'দিনের ধান কর্জ দেবে না?"

"হ্যাঁ। না হয় কিছু কমই দেবে। আধপেটা খেয়েই থাকা। তাও তো এখানকার চেয়ে ভালো।"

বিষ্টু মনে মনে হিসেব করে। কাঠের বাক্সয় গেঁজের ভেতর অতিকষ্টে জমানো সম্বল আছে ন' টাকা সাড়ে ছ'আনা। দুজনের টিকিট লাগবে বারো আনা দেড় টাকা। না, বৌয়ের টিকিটটা ফাঁকি দেওয়া যাবে, মেয়ে গাড়িতে বসিয়ে দিলেই হবে।

"আচ্ছা চলো যাওযাই যাক। এ ঘর তো কাল এমনিই ছাড়তে হবে।"

।। ২ ।।

তারা যখন গাড়ি থেকে ইস্টিশনে নামল তখন এগারোটা হবে।

ইস্টিশন থেকে আরও সাত কোশ পথ। মধ্যে চার-পাঁচটা গাঁ, তারপর ওদের গাঁ,— বাজিপুর।

বিষ্টু জোয়ান মরদ, হন্ হন্ ক'রে এগিয়ে চলে। ছেলে কোলে নিয়ে রানী পারে না, পেছিয়ে পড়ে। বিষ্টু দূর থেকে খেঁকিয়ে ওঠে, "কিরে লবাবের বেটি, হাঁটতে পারিসনে?"

"ছেলে কোলে নিয়ে কি তাড়াতাড়ি হাঁটা যায়, একটু আস্তে চলো," রানী বলে।

"ঐ ছেলে নিয়েই তুই মরবি", ব'লে বিষ্টু আবার এগিয়ে যায়। রানী হাঁপাতে হাঁপাতে কোনো রকমে তাল রাখে।

সুয্যি ছিল ঠিক মাথার ওপর, এখন নামছে। আশ্বিন মাসের ওমসো গরম, তার ওপর মেঘ নেই। রোদগুলো যেন সোজাসুজি বেঁধে। সারা গা চিড়বিড় করে। শুকনো পথ আর দুনিয়ার ধুলো। জল পিপাসা লাগে।

পথের সাথী আর কেউ নেই। ইস্টিশন থেকে বেরিয়ে পর্যন্ত তারা একাই চলেছে। উল্টো দিক থেকে লোক আসতে দেখা যায়। কিন্তু আশ্চর্য, পুরুষ মানুষ নজরেই পড়ে না। যারা

আসে তারা মেয়ে। কারও কোলে বাচ্চা। কেউ-বা ছেলেপিলেকে হাত ধরে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে নিয়ে চলেছে। একলা যায় না। দু জন, তিন জন, কি তারও বেশি এক সঙ্গে চলেছে।

তারা পা টেনে টেনে আসে। কোথাও পৌঁছবার যেন তাড়া নেই। কিংবা বহুদূর যাবে। দেখলে মনে হয় খুব ক্লান্ত। ওরা যদি একটু ঠাওর করে দেখার সুযোগ পেত তাহলে বুঝতে পারত এ ক্লান্তি তাদের অনেক দিনের অনেক পথ-হাঁটার নয়, অনেক উপোসের। কিন্তু রাস্তার মধ্যে কয়েক লহমার দেখা, ওরা নতুন মানুষ — বুঝবে কি করে? তারা হেঁচড়ে হেঁচড়ে আসে কিন্তু থামে না। যেন থামলে আর চলতে পারবে না।

বিষ্টু আগে, রানী খানিকটা পেছনে। অনেকক্ষণ পরে খালি দুজন মেয়েলোককে একা আসতে দেখে বিষ্টু শুধোল, "হ্যাঁগা বাছা, তোমরা কোথায় যাবে?"

মেয়ে দুটি প্রথমে একটু উৎসুকভাবে দাঁড়াল। বলল, "কলকাতা যাব গো, কলকাতা।"

"কলকাতা? সেখানে তোমাদের আপনার লোক আছে বুঝি?" বিষ্টু জিজ্ঞেস করল।

বিষ্টুর গরিব হাল আর রুক্ষ চেহারা ততক্ষণে মেয়ে দুটির ভিক্ষা চাইবার আশা ভেঙে দিয়েছে। নিরাশ হয়ে পা বাড়াতে বাড়াতে তারা বলে গেল : "না, কলকাতায় নাকি খিচুড়ির নঙ্গর খুলেছে। তাই যাচ্ছি।"

বিষ্টু আবার কি শুধাতে যাচ্ছিল, কিন্তু তারা তখন এগিয়ে গেছে।

রানী দেখছিল ধানের খেত। পথের নীচে কতগুলো শণ গাছ, মাথায় শাদা শাদা ফুল। তারপরেই খেত। খেতের পর খেত, ঐ দূ উ-রে একেবারে আকাশ পর্যন্ত। ভাগাভাগির আলগুলো কবে চাপা পড়ে সব একাকার হয়ে গেছে। আকাশ পর্যন্ত সবুজ লক্‌লক্ করে।

আমন ধান। চারাগুলো কত বড়ো হবে? হাঁটু পর্যন্ত? না, উরুত ছাড়িয়ে উঠেছে। ঐ তো মাঝে মাঝে দু-একটা গাছে শীষও বেরিয়েছে। তবে এখনো সবুজ। খাওয়া যায় না।

ওঃ এত ধান! কত, কত চাল হয়। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কেবলি খাওয়া যায়। খেয়ে ফুরোনো যায় না। . উঃ কি খিদে! পরশু রাত্তিরের পর আর পেটে কিছু পড়েনি। তার ওপর পিপাসা। ছেলেকে ধরা বাঁ হাতটা ঝিন্ ঝিন্ করছে। রোদের তেজ কি আর আজ কমবে না? একটু জল পেলে বাচতাম। হাতটাও জিরিয়ে নিতাম।

হঠাৎ বিষ্টুর ডাকে চমক ভাঙল। বিষ্টু শুধোচ্ছে, "হ্যা রে, নঙ্গর কাকে বলে জানিস, খিচুড়ির নঙ্গর?"

"খিচুড়ির আবার নঙ্গর হয় নাকি? নঙ্গর নয়, বোধ হয় নোঙর — নৌকোর নোঙর।"

"আরে দূর, তা হলে তো বুঝতামই। .....মরুক গে যাক। চল্, এখন পা চালিয়ে চল্।"

"একটু জল পাওয়া যায় না? বড্ড তেষ্টা লেগেছে।"

"এই মরেছে। মেয়ে-মানুষ নিয়ে পথ চলাই ওখুরি। এইটুকু চলেই জল চাই। তারপর বলবে খাওয়া চাই, শোওয়া চাই। কত শখ! চল্ চল্, একেবারে ঘরে গিয়ে জল খাবি।"

কিন্তু খানিক দূর অন্তর অন্তর রানী আবার জলের জন্য ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে। বারবার এড়াতে না পেরে বিষ্টু বলল, "আচ্ছা ঐ সামনের গেরামের ভেতর দিয়ে যাব খুনি। ওখানে জল পাবি।"

অল্প দূরে একটা গাঁ। গাঁয়ের সবটা দেখা যায় না। তবে পথ থেকে নেমে মাঠের ঐ বাঁ দিকে বাঁশ ঝাড়ের ওপাশ দিয়ে খানকয়েক কুঁড়ে ঘর চোখে পড়ে।

..... আরও কাছে। একই হাতার মধ্যে তিন-চারটি কুঁড়ে। এককালে বোধ হয় বাঁশের বেড়া দিয়ে তফাৎ করা ছিল। এখন শুধু দু-চারটে খুঁটি দাঁড়িয়ে আছে।

হাতার সামনে বাঁশ ঝাড়ের তলায় এসে বিষ্টু বলল, "তুই এখেনে একটু দাঁড়া। আমি দেখি ডাক দিয়ে।"

রানী খোকাকে মাটিতে নামিয়ে ছায়ার নীচে ধুপ করে বসে পড়ল।

এগিয়ে গিয়ে বিষ্টু ডাকল, "কে আছেন গো মশাই। একটু শোনো-না।" জবাব নেই। তিন-চার বার ডাকল। কোনো জবাব নেই। হয়তো ঘুমচ্ছে ভেবে বিষ্টু গলা খাঁকারি দিতে দিতে এগিয়ে গিয়ে প্রথম কুঁড়েটার দাওয়ার ওপর উঠে এসে দাঁড়াল। দাওযা থেকে হাট-খোলা দরজা দিয়ে ঘরের ভেতরটা বেশ দেখা যায়।

এ ঘরের ভেতর অনেক দিন মানুষ আছে বলে মনে হয় না। ঠিক দরজার মাথায় চালে বোধ হয় ফুটো। ফুটো দিয়ে বিষ্টির জল পড়ে পড়ে দরজার কাছে মেঝেতে একটা গর্ত হয়ে গেছে। বিষ্টি তো ক'দিন হয় নি, তাও গর্তে খানিকটা জল দাঁড়িয়ে আছে। ফুটো দিয়ে একটা রোদের টুকরো পড়ে জলটা চিকচিক করছে।

সে জন্যেই ঘরের ভেতরটা প্রথমে ঝাপসা দেখায়। চোখটা একবার বন্ধ করে নিয়ে আবার খুলে খানিক্ষণ তাকিয়ে থেকে বিষ্টু দেখল ঘর খালি। মেঝেতে এক পুরু ধুলো। এক পাশে একটা কলসি উল্টোনো পড়ে আছে। চাল থেকে ঝোলানো কয়েকটা কালিমাখা দড়ির শিকের নীচের ভাগটা দেখা যায়। কিন্তু খালি শিকে।

এ ঘরে মানুষ থাকে না বুঝে বিষ্টু পাশের কুঁড়েটার দরজার সামনে গিয়ে আওয়াজ দিল।

সাড়াশব্দ নেই। ঠিক আগের কুঁড়ের মতোই হতচ্ছিরি অবস্থা।

সে কুঁড়েও ছাড়িয়ে বিষ্টু আস্তে আস্তে এগোয়। পড়ন্ত দুপুরেব রোদে সারা হাতাটা খাঁ খাঁ করছে। কোথাও কোনো শব্দ নেই। কেমন ভুতুড়ে থমথমে ভাব।

বিষ্টুর বুকটা একটু টিপটিপ করে। কিবে বাবা, ঐ গাঁয়েব লোক সব মবেছে নাকি? সামনে তাকিয়ে দেখে একটু দূবে আর একখানা ঘর। অন্যগুলোব চেযে বেশ বড়ো। দাওয়ার ওপরে ঘবেব দুটো দরজা। চালটাও খড়েব নয। কেবোসিন তেলের কেনেস্তারা কেটে কেটে জোড়া দেওযা টিনেব ছাত। দাওয়াটাতেও। ওখানে নিশ্চযই লোক আছে। বিষ্টু এগিয়ে গেল।

টিনেব ওপব জং ধরে গেছে। তার মধ্যে মাঝে মাঝে হাতি মার্কা ছাপ বোঝা যায়। দাওয়ার টিনের এক পাশটা বোধ হয কম পড়েছিল, সেখানটা খড় দিয়ে ছাওযা। খড সরে সরে ফাঁক হয়ে গেছে, কিন্তু কেউ আর নজব করে নি।

দাওয়ার সামনে এসে বিষ্টু উঠবে কিনা ভাবছে। একবাব জোর গলা খাঁকারি দিল। হুড়মুড় কবে ঘরের দরজা দিয়ে কি যেন একটা বেরিয়ে শাঁৎ কবে ছুটে গেল। কুকুব? না শেযাল।

বিষ্টু একটু থতমত খেযে গেল। তাব পর কি ভেবে দাওযায় উঠে দরজার ভেতব মাথা ঢুকিযে উঁকি দিল।

চক্ষুস্থিব। প্রথমেই নজরে পড়ে ঘরেব ভেতর বাঁশেব মাচা। মাচার ওপর ময়লা চিট কাঁথায় শুয়ে — একটা মানুষ।

কি দুর্গন্ধ! ভক্ করে নাকে লাগে। মাথাটা বাইরে ফিবিয়ে এনে নিঃশ্বাস বন্ধ কবে বিষ্টু আবার চাইল।

মরে গেছে। মরে গেছে। .....মানুষ নয়, ওটা মড়া। মুখের ওপর মাছি ভনভন করছে। একটা ঠ্যাং মাচা থেকে নীচে ঝুলছে। কিসে যেন খুবলিয়ে খেয়েছে। ....

দমকা হাওয়ায় কোথায় দূরে একটা দরজা না জানালা ঘটাং করে বন্ধ হয। হাওযায় টক্কর লেগে বাঁশ গাছগুলো কটকট কটকট শব্দ করে ওঠে।

বিষ্টুর সারা গায় কাঁটা দিল। আর চাইল না। রাম, বাম, রাম, বাম। হন হন কবতে করতে একেবারে বাঁশতলায়।

"চল্ চল্ ওঠ্, শীগ্গির চল্!"

"কতক্ষণ গিয়েছ। জল কি হল গো?

"চল্ চল্ পালা। এ গাঁয়ে মড়ক লেগেছে। জনপ্রাণী নেই। শুধু বাসি মড়া পড়ে আছে। রাম, রাম, রাম। ওঠ্, শীগ্গির চল্, একেবারে ঘরে গিয়ে জল খাস।"

উঠে আবার পথে।

বাজিপুর নিজেদের ঘরের সামনে যখন পৌঁছল তখন সন্ধে। খিদে আর তেষ্টায় কাতর তারা। কোথাও আর দাঁড়ায় নি। গাঁয়ের মধ্যে ঢুকে আর কারো খোঁজও করে নি। গাঁয়ের টেরেই তাদের ঘর, সোজা চলে এসেছে।

সন্ধে, কিন্তু শাঁখ বাজে না।

"কেষ্ট, কেষ্ট" ডাকতে ডাকতে বিষ্টু কুঁড়ের উঠোনে ঢুকল। ও মা, উঠোনের এ কি ছিরি! এখানে-ওখানে আগাছা উঠেছে। দাওয়ায় পর্যন্ত দুব্বো গজিয়েছে!

রানী বলে, "ও কপাল, সজনে গাছ দুটোকে এমন ন্যাড়া কবে মুড়ালো কে? একটা পাতাও নেই!

কেষ্টর কোনো পাত্তা নেই। বিষ্টু বুকটা হঠাৎ টিপটিপ ক'রে ওঠে। মনে পড়ে যে-গাঁ পার হয়ে এসেছে। মানুষ নয়, মড়া।....দাওয়ায় দাঁড়িয়ে রানীর জন্যে অপেক্ষা করে। সাহস হয় না একলা ঢুকতে।

দু জনে মিলে ঘরেব ভেতর ঢুকল। ভেতরটা তখন অন্ধকাব। একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে ভালো কবে দেখল, পাশেব হেঁসেলটাতেও একবার চোখ বুলিয়ে নিল। হঠাৎ আলো দেখে একটা চামচিকে খানিকক্ষণ ঝটপট ক'রে উড়ে পালাল।

ঘরেব ভেতর সেই একই ইতিহাস — যা আগেব গাঁয়ে দেখে এসেছে। ধুলো, ময়লা আব ভাঙা হাঁড়িকুড়ি। মানুষ নেই।

রানী বলিল, "কি গো, ঠাকুবপো এখনো ঘরে আসে নি? কিন্তু ঘরেব এ ছিরি কে করল? কিছু নেই, যেন কোনো লোক থাকে না!"

"মড়ক বে, এখানেও মড়ক," হতভম্বেব মতো বলল বিষ্টু।

গাঁ যে একেবাবে খালি তা নয়! এমন-কি তাদেব মতো গবিব পাড়ায়ও খুঁজলে দু-একজন পাওয়া যায়। তাদেব এখনো মরবার সৌভাগ্য হয় নি। কিংবা হয়তো একটু বেশী পুঁজি ছিল।

অনেক তল্লাস করে মোক্ষদা পিসিকে পাওয়া গেল। অল্প অল্প জ্বরে ধুঁকছে। গায়ে একখানা কাঁথা জড়ানো।

পিসির কাছে সব খবর পাওয়া গেল ঃ কেষ্ট? সে তো আজ মাসখানেক হল ঘর ছেড়েছে। এ তল্লাটের সবাই পালিয়েছে। মড়ক? না..হ্যাঁ তা মড়কই বটে! ভাতের মড়ক। লোকে আর গাঁয়ে বসে কদ্দিন শুকোবে। ভাতেব বদলে কচু পাতা, সজনে পাতা। তাও তো ফুরিয়ে গেল! জোয়ান মরদ, বেটা ছেলে, তাবা সব একে একে সরে পড়ল। কোথায় গেল? কে জানে? হয়তো শহরে ভিক্কে করছে। নয়তো কোন্ ভিন দেশে পথের ধারে মরছে। এখন আবার মাগীরাও সব যাচ্ছে — কলকাতা। সেখানে নাকি খিচুড়ির নঙ্গর খুলেছে। সত্যি নাকি? জানিস?

তোদেব কেষ্ট? হ্যাঁ খুব জানি। দাঁড়া মনে করি। ও হ্যাঁ, সে তো বরং পরেই গেল। ঐ যে বাঁড়ুজ্যে ঠাকুর। আমন ফসলের সবটা তেনাকে নিকে দিয়ে কিছু চাল ধাব পেয়েছিল, তাইতে ক'দিন চালাল। কিন্তু সে আর ক'দিন। আর ঠাকুরও এমন! একবার নেকানেকি হয়ে

গেলে তারপর আর এক মুঠো ভিক্কেও দিল না। আমন যখন উঠবে সবটাই তো তেনার ভাগে যাবে। তা দিলো না গো। সাত দিন ধরে কেষ্টোটা ঠায় শুকোলো, কিছুতেই ঠাকুরের দয়া হল না। সাত দিন পরে দেখি কেষ্টও দিয়েছে বওনা। কোথায়, কে জানে? হয়তো তোদের খুঁজতেই গিয়েছে।

বাঁড়ুজ্যে ঠাকুর? ও হরি, তেনারা পালাবে কেন? তেনাদের তো পোয়া বারো। গোলায় গোলায ধান। এখন আবার কি পুলিশ টুলিশ এল বলে সব আপনার লোকেদেব ঘরে ঘরে লুকিয়ে রেখেছেন। তেনারা ঠিকই আছেন, দু হাতে টাকা কামাচ্ছেন। ঐ তো আমার শুধু সোনার নোয়াটা বাকি ছিল, সোয়ামির অকল্যাণ হবে বলে ছুঁই নি। তা পোড়া কপালে ওটাও সেদিন বাঁড়ুজ্যে ঠাকুরকে দিয়ে ধান আনতে হল। এর পরে যে কি হবে!

পেটের ভেতর হাত-পা সেঁধিয়ে যায়। বিষ্টুব পা-টা কাঁপে।

রানী ফ্যাল ফ্যাল করে চায়। কে যেন মাথায় বাড়ি দিয়ে সমস্ত গুঁড়িযে দিয়েছে। ছেলেটা কাঁদে, খেয়ালও কবে না।

নিজেদেব ঘরেব দাওয়ায় দুজনেই অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল। মাথার মধ্যে অগুনতি ভাবনা বিড়বিড় করে। কিন্তু শেষ হয় না, কোথাও পৌঁছয না। ঘুরে ফিরে পাগল কবতে থাকে। মনে হয নেই, নেই, নেই! একমাত্র রোজগেরে ছেলে হঠাৎ মরলে যেমন মনে হয়।

অন্ধকারেব মধ্যে একটা লম্বা নিঃশ্বাস ছেড়ে শেষকালে বিষ্টু বলল, "আচ্ছা তোরা থাক্। আমি একবার বাঁড়ুজ্যে ঠাকুরের ওখেনে ধন্না দিযে আসি। কিছুই হবে না, তা কখনো হয়।"

রানীব মনে হঠাৎ একটা ভয় জাগে। কিসেব ভয তখনি ঠিক বুঝতে পারে না। কিন্তু খুব ভয়। মনে হয় একা, একেবারে একা। তাড়াতাড়ি মুখ দিযে বেরিয়ে যায়, "না, না, আমাকে একা ফেলে যেও না। আমিও তোমাব সঙ্গে যাব।"

খোকাটা আবার ঘ্যান ঘ্যান কান্না শুরু কবে।

বিষ্টুর মনেও ভয হয়। আর এক ধবনেব। মনে হয় বোঝা, প্রকাণ্ড ভারী বোঝা। না নামলে দম আটকে যাবে। খেঁকিয়ে উঠে বলে, "মর্ মাগী, তুই আবার কোথায় যাবি? বসে থাক্, আমি এখ্খুনি ঘুবে আসব।"

কিন্তু রানী নাছোড়বান্দা — সঙ্গে সঙ্গে চলল।

...বাঁড়ুজ্যে ঠাকুব বিপত্নীক। তাই ধর্মে খুব মতি। সুব করে করে মোহমুদগব পডছিলেন ঃ

কে তোমার স্ত্রী আর কে-ই বা পুত্র,
এই সংসার হায়, বড়ই বিচিত্র।

ওদের ডাকে উঠে এলেন। বললেন, "কে রে? ও বিষ্টু, তা এখন মরতে গাঁয়ে এলি কেন? কাজ গেছে বলে অম্নি চলে এলি? দূর গাধা, ওখানে থেকেই আর একটা কাজের চেষ্টা করতে হয়।"

চটকলে তো শুনেছি আজকাল খুব রোজগার। তা কিছু এনেছিস টেনেছিস? সেই কত মাস আগে ক'টা টাকা পাঠিয়েছিলি, তারপর আর এক পয়সাও ঠেকাস নি। এ মাগ্‌গি-গণ্ডার বাজারে আমাদেরও তো চালাতে হবে!"

"পাগল নাকি, বলে চাল দেন! চাল কি কারও কাছে থাকবার জো আছে? পুলিশ এসে ঘরে ঘরে হামলা দিয়ে সব কেড়ে নিয়ে গেল না?"

দূরে তাকিয়ে আবার বাঁড়ুজ্যে ঠাকুর বলেন, "তোর সঙ্গে আবাব কে রে? ও, তোর পরিবার! একেবারে জোড়ে আগমন, এবার গাঁয়ে কোঠা বানাবি নাকি?

নিজের রসিকতায় খুশি হয়ে বাঁড়ুজ্যে আর একবার রানীর দিকে চান। পাতলা অন্ধকার, তার মধ্যে ঘর থেকে দু-একটা আলোর ফালি এসে পড়েছে। ছোট্ট কাপড়ে ঘোমটা টানতে গিয়ে বুকের কাপড়টায় টান ধরেছে। তার ওপরে অল্প আলো আর বেশি ছায়ায় বুকের খাঁজগুলো আরও গভীর দেখায়। মনে হয় বেশ পুরন্ত। অনাহারে গালের মাংস যেখানটায় শুকিয়ে এসেছে অন্ধকার সেখানটা ভরিয়ে দেয়। মনে হয় বেশ গোলগাল।

আনমনে বাঁড়ুজ্যে বললেন, "আচ্ছা, আসিস কাল দিনের বেলায়। দেখব কি করা যায়।"

পরদিন সকালে আবার বাঁড়ুজ্যের ওখানে। এবার বিষ্টু একা।

বাঁড়ুজ্যে একেবারে কট্টর কাটখোট্টা। "ধান টান দিতে পারব না বাপু, এক মুঠোও না। জমিটাতে আমন উঠলে তোর কি? সে সব কেষ্টর সঙ্গে লেখাপড়া হয়ে গেছে। নইলে খেত কি? ঘরের যা কিছু সব তো আগেই গব্বে ঢেলে বসেছিল। তারপর পাক্কা দুটি মাস খাওয়ালাম। এই বাজারে বেচলে কত টাকা হত! তা ছোঁড়াটা এমন নেমকহারাম, যাবার সময় একটা পেন্নামও করে গেল না।"

অনুনয়, বিনয়, পা ধরে কান্নাকাটি। কিছুতে কিছু না। একটু ভেবে নেহাত অনুগ্রহ করবার জন্যেই বাঁড়ুজ্যে বললেন, "ধান দিতে পারব না বাপু, পষ্ট কথা। তবে তুই হলি পুরনো খাতক, একটা রাস্তা বাতলে দিই। জমি তো তুই আর জন্মেও ছাড়াতে পারবি নে। তার চেয়ে জমিটা একেবারে আমার নামে লেখা পড়া করে দে। নগদ দশটা টাকা পাবি।"

"টাকা নিয়ে কি করবি? একেই বলে মুখ্যু চাষা। আরে তুই হলি ব্যাটা ছেলে, জোয়ান মরদ। টাকা নিয়ে কলকাতা চলে যা, যাহোক একটা কিছু জুটিয়ে নিতে পারবিই। কত বড়ো শহর, সেখেনে কত কাজ। কাগজে লিখেছে সেখেনে নাকি আবার লঙ্গর খুলেছে, বিনি পয়সায় খিচুড়ি খেতে দেয়। কিছু না পাস তাও তো পাবি?"

বিষ্টু বৌ-ছেলের কথা ভেবে দোমনা করে। তাদের তো আর নিয়ে যাওয়া যায় না। কোথায় রাখবে? কি খাওয়াবে?

বাঁড়ুজ্যে উৎসাহ দিয়ে বলেন, "মেয়েমানুষের কথা কেন ভাবিস? বেঁচে থাকলে ইস্তিরির কি আর অভাব হবে? গাঁয়ের সব পুরুষই তো পালাল, একটা বেটাছেলে দেখেছিস তোদের পাড়ায়? তাদের ভাবনা হল না, আর তোরই যত ভাবনা।"

বিষ্টুর মনটা ভিজে আসছে দেখে বাঁড়ুজ্যে তাড়াতাড়ি বললেন, "আচ্ছা নে বারোটা টাকাই দেব। চল্ চল্ ওঠ, শুভস্য শীঘ্রম। একেবারে বেলায় বেলায় গিয়ে আজই লেখাপড়াটা রেজিস্টারি করিয়ে নেওয়া যাক। পাঁচখানা গাঁ পার হয়ে রেজিস্টারি আপিস, ওঠ্, এইবেলা যাত্রা করি।"

দু'জনে মিলে রওনা হলেন।

রাত্তিরেও বিষ্টু ঘর ফেরে নি। রানীও ঘুমোয় নি। একবার করে উঠেছে, বাইরে এসে দেখেছে বিষ্টু ফিরছে কিনা, আবার ঘরে গিয়ে খোকার পাশে জেগে কাটিয়েছে। ক দিন যে কিছু খাওয়া হয় নি সে কথা পর্যন্ত একবারও মনে পড়ে নি। শুধু উৎকণ্ঠা আর ভয়। সত্যিই কি বিষ্টু ফেলে পালাল?

সকাল হতে না হতেই ছুটলো বাঁড়ুজ্যে ঠাকুরের বাড়ীর দিকে। পথে মানুষ আসে, দূর থেকে মনে হয় ঐ বুঝি বিষ্টু। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে সামনে যায়। আবার কাছে এলে ভুল ভাঙে।

.... বাঁড়ুজ্যে ঠাকুর বললেন, "আমি কি করব। আমি তো বরং মানা করলাম। বললাম বৌ-ছেলে ফেলে কোথায় যাবি? তা কি হতভাগা শুনল। কোথায় রওনা দিল — বলল, আর গাঁয়ে ফিরছি না।"

একটু থেমে বললে, "তা বিষ্টুটার স্বভাব-চরিত্রই ঐ রকম।"

রানীর মনে হল যে, হঠাৎ কিসের সঙ্গে ভীষণ জোরে ঠোক্কর খেয়েছে, সমস্ত মাথাটার ভেতর ঝিমঝিম করছে। পা দুটো আর শরীরের ভার বইতে পারছে না। কখন, কি ক'রে বাঁড়ুজ্যের বাড়ি থেকে পথে এসে দাঁড়াল তা ঠাওরই হয় না।

অন্ধকার, সমস্ত অন্ধকার। একটু আশা, একটু সান্ত্বনাও কোথাও নেই। মোক্ষদা পিসি শুনে বললেন, "ও আমি তখনই জানতাম। একটা ছেলে ঘরে রইল না। দেখে নিস, বিষ্টু আর ফিরছে না।" বলেই পিসি তাড়াতাড়ি দোর এঁটে দিলেন, পাছে রানী হয়তো দুটি চাল চেয়ে বসে।

আশা নেই, তবুও রানী সারা গাঁ বার-দুই ঘুরে এল। যদি বিষ্টু এমনি কোথাও বসে থাকে।

দিন যায়, রাত আসে। আবার সকাল হয়। ভাবনা তো আছেই, কিন্তু সে সমস্ত ছাপিয়ে পেটের ভেতর খিদের জ্বালা। ক'দিন ঠায় উপোস। ছেলেটার বুকের হাড় আব পাঁজবেব হাড় এখন সমান জিরজির করছে। নিজের পেটেও কেমন যেন একটা অদ্ভুত যন্ত্রণা। মনে হয় পিঠ আর পেট এক হয়ে গেছে। মুখের ভেতবটা বিশ্রী ভিজে, ক্রমাগত লালা ঝবে।

বাঁড়ুজ্যে ঠাকুরের ওখেনে একদিন এক মুঠো চাল চাইতে গিয়েছিল। তা তিনি সোজা হাঁকিয়ে দিলেন। বললেন, "খবরদার এ বাড়িতে আসিস নে। এখেনে কি মচ্ছব পেয়েছিস? বিষ্টু হারামজাদা জমিটুকুর জন্যে কড়কড়ে অতগুলো টাকা গুনে নিয়ে গেল, পেন্নামী বলেও একটা টাকা ফেরত দিল না। আব এখন তাঁব ইস্তিবি এসেছেন — চাল দাও! যা মাগী, অন্য জায়গায় ভিক্ষে করগে যা।"

ভিক্ষের জন্যেই কি কম ঘুরেছে? নিজের গাঁ তো বটেই, আশেপাশের ক'খানা গাঁয়ে দোরে দোবে হাত পেতেছে। মাগো! হাড় জিরজিরে ছেলেটাকে দেখেও কেউ এক মুঠো ভাত দিল না।

মেইতে একটুও দুধ নেই। তবুও তাই বারবাব ছেলেটার মুখের মধ্যে চেপে ধবে। ছেলেটা শান্ত হয় না। খুব চেঁচিয়ে কাঁদার ক্ষমতা আর নেই। অল্প অল্প আওয়াজে কাঁদে, দাঁত দিয়ে মেই কেটে কেটে ধরে। ভযানক লাগে।

কিছুক্ষণ থামাবার জন্যে খালি জল খানিকটা জোর ক'রে ছেলেটাকে খাইয়ে দিয়েছিল। খালি পেটে সইবে কেন? একটু পরেই হড়াৎ ক'রে সব বমি হয়ে গেল।

তবু ভিক্ষের জন্য পথে পথে ঘোরে। আব ভাবে .... বিষ্টু তো চলে গেল.. উমেদি হলে সেও কি এম্‌নি ফেলে পালাত? হয়তো পালাত না। কোথায় গেল, দক্ষিণের কোন্ মিলে? তখন যদি জেনে নিতাম। দুটি ভাতের ভাবনা ভাবতে হত না।

পথে পথে ভিক্ষে চায়। প্রায়ই কিছু মেলে না। বেশীর ভাগ লোক তো তাকিয়েও দেখে না। কদাচিৎ এক-আধজন একটা ডবল পয়সা ফেলে দেয়। কিন্তু ভাত কেউ দেয় না। মাগো! ডবল পয়সায় কি হয়, তাতে তো কেউ এক মুঠো চালও বিক্রি করে না।

কখনো কখনো দু-একজন লোক কি রকম এদিক-ওদিক দেখতে দেখতে ফিসফিস করে বলে, "আমার সঙ্গে চল্, অনেক ভাত খেতে দেব।" কিন্তু বিশ্বাস হয় না। সাহসও বোধ হয় পুরোপুরি হয় না।

...ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে রানী ঘরে ফিরে এল। খিদের চোটে কেঁদে কেঁদে খোকা ঘুমিয়ে পড়েছিল। তাকে ঘরের ভেতর শুইয়ে রেখে দাওয়ার খুঁটিটায় হেলান দিয়ে অবশভাবে বসল।

আকাশে রঙের ছটা। রাঙা আর বেগুনি আর আরও কতো মেশানো রঙের মধ্যে দিন তখন ফুরোচ্ছে। ওর মনের মধ্যেও কি যেন ফুরিয়ে আসে।

খালি মনে হয় নেই, নেই, নেই। কিছু নেই, কেউ নেই। আশা নেই, ভরসা নেই। . ছেলেটা বাঁচবে কি ক'রে?

নেই, নেই। গাঁয়ে ভাত নেই, গাঁয়ে ধম্ম নেই। ধম্মের বাঁধন, তাও ছিঁড়ে পালাল!

খিদেটা মাঝে মাঝে মোচড় দেয়, ভোলা যায় না। কিন্তু তার চেয়ে বেশি হয় ভয়। সামনের ভবিষ্যৎটা সম্বন্ধে কোনো ধারণাও করা যায় না, তাই মনে হয় আরও বেশি ভয়ঙ্কর। একদম শূন্য, খালি। ঠিক যেন পেটের ভিতরটা। তারই আতঙ্ক।

অন্ধকার ঘন হয়। ভাবতে ভাবতে কেমন একটা নির্লিপ্ত অবসাদ আসে। খোকাটা ঘরের ভেতর চেঁচাচ্ছে, উঠে গিয়ে দেখতেও ইচ্ছা করে না। শরীর মন সমস্ত অবশ।

জোনাকি জ্বলে। আবার পেটের ভেতর, মাথার ভেতরও জোনাকি জ্বলে। জ্বলছে, নিভছে। ভবা পেট আর খালি পেট। কত তফাৎ।

আস্তে আস্তে বাঁড়ুজ্যে ঠাকুর এলেন,। "কে গা, বিষ্টুর বৌ নাকি?"

রানীর ভাবান্তর হয় না। ঠাকুর মশাই এলেন, উঠে বস্, আসন দে, ঘোমটা টান্! না তার কিচ্ছু না। অবশভাবে মনে মনে আওড়ায়, 'ভাত। ছেলেটা খাবে কি? বাঁচবে কি করে?'

ঠাকুর দাওযাব কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই খুব দুঃখু করলেন ঃ

"বিষ্টুটা — সত্যিই পালাল! বৌ-ছেলেকেও দেখল না। হতভাগা, বদমায়েস।"

বাঁড়ুজ্যে ঠাকুরের পুরুষ্টু ভুঁড়িটা এগিয়ে আসে। দেখে রানীব মনে হয় — ভাত। থালার ওপব গোল ক'রে, চুড়ো ক'রে সাজানো ভাত। হঠাৎ খানিকটা অবসাদ কাটে। একটু আশা হয।

বলল, "ঠাকুরমশাই গো — বড় খিদে। ছেলেটা খিদেয় কালই মরে যাবে। দুটিখানি চাল দেন না। আপনার বাড়িতে দাসীব কাজ করব। দুটি চাল কি দেবেন না?

ঠাকুব হো হো করে হেসে বললেন, "চাল কি অত সস্তা নাকি রে! তা হলে তো গাঁ সুদ্ধু মেয়েকে দাসী রাখা যায়।"

রানীর চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসে। দাওয়া থেকে হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে ঠাকুরের পা জড়িযে ধরে। পিঠঠা যে একেবারে খালি, ডান দিকের বুকের কাপড়টা যে অর্ধেক খুলে গেল তা খেয়ালও করে না। পায়ে মাথা ঠেকিযে বার বার বলে, "দুটি চাল দাও ঠাকুর।"

মেয়েমানুষের দেহ। হাঁটু গেড়ে পায়ে মাথা ঠেকাতে গিয়ে আধখানা ধনুকের মত বেঁকে পড়েছে। অন্ধকারের আবছায়ায় বাঁড়ুজ্যের চোখে আরও লোভ জাগায়।

"আরে কি করিস্, কি করিস্" বলতে বলতে বাঁড়ুজ্যে ওর দুই গালে হাত দিয়ে মুখটা তুলে ধরেন। তারপর একটু মোলায়েম সুরে বললেন, "ছাড় ছাড়, উঠে বোস্!" বলে ওর বগলের নীচে চেপে ধরে আস্তে আস্তে উঠিয়ে বসিয়ে দেন। বেশ একটু সময় লাগে।

রানীর কাঁধের ওপর একটা হাত রেখে মাথাটা নামিয়ে নিচু সুরে বাঁড়ুজ্যে বললেন, "চাল যে নিবি তার দাম দিতে পারবি? দাসীগিরিতে চালের দাম হয় না, বুঝলি?"

তারপর ওর কানের কাছে আরও ফিস ফিস করে ঠাকুর বললেন, "চাল চাস তো রাত দশটা-এগারোটার সময় আমার ঘরে আসিস। ওই পেছন দিকে গিয়ে বৈঠকখানা ঘরের পেছনের দরজায় আস্তে আস্তে টোকা দিবি। খুব সাবধান, কেউ যেন টের না পায়। বুঝলি?" বলে ওর গালটা একবার হঠাৎ টিপে দিয়ে বাঁড়ুজ্যে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন। দূর থেকে আর একবার বললেন, "বুঝেছিস তো?

রানী বোঝে। মাথার মধ্যে আবার যেন জোনাকি পোকার মেলা? জ্বলছে, নিভছে। একটু পরে ঘরের ভেতর উঠে গিয়ে খোকাকে জড়িয়ে ধ'রে কাঠ হয়ে বসে থাকে।

বাঁড়ুজ্যে ওখান থেকে রানী যখন ফিরল তখন গভীররাত। বাঁড়ুজ্যে বলেছিলেন, "একেবারে ভোরে গেলেই হত। গাঁয়ে তো লোক নেই বললেই হয়, কে আর দেখবে?" তা রানী শোনে নি।

ঘরে একটু চাঁদের আলো। ছেলেটা এক পাশ হয়ে ঘুমোচ্ছে। হয়তো কতবার চেঁচিয়েছে। কত কেঁদেছে। গাল দিয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়েছে, তার দাগ এখনো শুকোয় নি।

রানীর বুকটা ছাঁৎ ক'রে ওঠে। মাগো, যদি কোনো রকমে শেয়াল ঢুকত। ছেলেকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে প্রায়-শুকনো মেইটা মুখে গুঁজে দেয়। আস্তে আস্তে বার বার বলে, "ধন আমার, জাদু আমার, মানিক আমার।"

॥ ৩ ॥

চাল যখন সোনা, আর সেই চালের বদলেই মেয়েমানুষ, তখন একটার শখ আব ক'দিন থাকে!

বাঁড়ুজ্যের শখও ক'দিনেই মিটল। রানীকে বলে দিলেন, "আর আসিস নে। আমি আর চাল দিতে পারব না।"

তবু রানী রাত্তিরে যায়। দরজায় টোকা মারে, শেষ পর্যন্ত ধাক্কাও দেয়। বাঁড়ুজ্যের সাড়া নেই।

কতটুকুই বা চাল পেত ছেলেকে নিয়ে দুজনের এক বেলাও ভরপেট হয না। তবু তাই স্বগ্‌গো। তার জন্যে সব খোয়াতে পারে।

রানী বাঁড়ুজ্যের জন্যে ওৎ পেতে থাকে। পথে পেলেই বলে, "দোহাই ঠাকুর, দুটি চাল দাও। একেবাবে পথে ফেলে দিও না।"

অনেক দিনের আধপেটা খাওয়ায় দেহের লাবণ্য একেবাবে শুকিয়ে গেছে। বাঁড়ুজ্যে অবাক হয়ে নিজের মনে ভাবেন, এই কুচ্ছিতটাকে কি করে ভালো লেগেছিল। চেঁচিয়ে গাঁ মাথায় করে হাঁকেন, "দূর হ মাগী, নচ্ছার কোথাকার। তোদের মতো আবাগীব জন্যে লোকে চাল নিয়ে বসে আছে? বেরো বলছি মাগী, বেরো — নইলে পুলিসে ধরিয়ে দেব।"

......তারপর? তারপর এ-হাত সে-হাত। কোথাও এক রাত্তিরের বদলে এক মুঠো খেতে পেল। আবার ক'দিন হয়তো পেল না।

মানুষ শুকিয়ে জানোয়ার।

আর ভাবে না। মাথায় কোনো চিন্তা ঢোকে না। শুধু — ভাত, ফেন, কি খাব?

ঘর নয়, এখন পথে পথে। দিনে রাতে সাতটা গাঁ পাক দিয়ে আসে। হন্যে কুকুরেব মতো। যদি কেউ দুটি ভাত ফেলে দেয়, একটু ফেন দেয়।

মিঠাইয়ের দোকানের সামনে শুয়ে শুয়ে জুলজুল করে চেয়ে থাকে। শুধু দেখে। চাইবারও সাহস হয় না।

ছেলেটা ধুঁকছে। মাগো, জ্যান্ত ছেলের গায়ে এত হাড় থাকে তা কে জানত! শুয়ে থাকলে মনে হয় অনেক দিন আগে মরে গেছে। কবর খুঁড়ে কে যেন তুলে রেখে গেছে।

কিন্তু খায়। এখন আর দাঁড়াতে পারে না। তবু বসে বসে, গড়িয়ে গড়িয়ে হাতের কাছে যা পায় মুখে তোলে।

ঐ শুঁটকো-হাড় ছেলেটাকে ধরেই চড়াচ্চড় চড়ায়। মনে হয় — কি কড়া জান, মরেও না!

.... সেদিন সকালে মোক্ষদা পিসির দোরে এসে রানী নাছোড়বান্দা। পিসি গো, একটু ফেন দেও। তরকারির খোসাগুলো দেও। যা হোক কিছু দেও। ক'দিন এক দানাও পেটে পড়ে নি।

"কিচ্ছু নেই রে, কিচ্ছু নেই। ফেন গেলে ভাত খাওয়ার দিন কবে ফুরিয়েছে।"

কিছুতেই এড়াতে না পেরে ছোট্ট এক মুঠো কাঁচা ছোলা এনে ছেলেটার হাতে দেন। ওমা, কি ছেলে রে বাবা! সবগুলো অম্‌নি তখুনি এক গব্বায় মুখে পুরে দিল।

রানীর চোখে জল আসে। একটা ছোলাও খেতে দিল না! ভয়ানক রাগ হয়। ধপ ক'রে মাটিতে বসিয়ে দেয় ছেলেটাকে। মুখের ভেতর আঙুল দিয়ে দু-একটা ছোলা বের ক'রে আনতে চেষ্টা করে।

ছেলেটা গড়িয়ে পড়ল। কিন্তু কাঁদে না। দাঁতে দাঁত দিয়ে ছোলা আটকে রাখে ক্ষীণ জীবনের সমস্ত শক্তি দিয়ে।

পিসি বলেন, "তা মৌ-গেরামে যাস নে কেন? সেখানে তো শুনছি এখন নঙ্গর খুলেছে। বিনি পয়সায় এক বেলা খিচুড়ি খেতে দেয়।"

"সত্যি?" আগ্রহে রানী লাফিয়ে ওঠে। "কোন্ দিকে মৌ গেরাম? বলো-না, এখুনি যাব।"

"অনেকটা দূর বটে। পাঁচ-সাতখান গাঁ পেরিয়ে। তা এখন গেলে বেলায় বেলায় পৌঁছতে পারবি।" পিসি তাকে মৌ-গ্রামের পথ বলে দিলেন।

ছেলেটার ওপর রাগ পড়ে না। ওকে ফেলে-থুয়েই চলে যায়। অনেকটা দূর গিয়ে আবার মন-কেমন করে। ফিরে এসে হ্যাঁচকা দিয়ে ছেলেটাকে কোলে তুলে নেয়। ফের চলে।

ঘুরে ঘুরে, লোকের কাছে পথ জিজ্ঞেস ক'রে যখন মৌ-গ্রামের লঙ্গরখানায় পৌঁছল তখন বেলা তিনটে-চারটে হবে। পথের লোকগুলো কি. মা গো। একটা ডবল পয়সাও কেউ ভিক্ষে দিল না।

লঙ্গরখানার সামনে কি ভিড়! চারদিক থেকে অনাহারী মানুষ এসে জুটেছে। মেয়ে. পুরুষ, কাচ্চা-বাচ্চা।

কিন্তু কাউকে ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছে না। আজ নাকি সরকার থেকে চাল আসে নি, তাই আজ লঙ্গর বন্ধ।

উঃ, কি যন্ত্রণা! এত পথ হেঁটে এত আশা করে এসে শুধু ফিরে যেতে হবে। কাঙালিরা বলে, "মিথ্যে কথা। চাল নেই, তা কখনো হতে পারে না। আমাদের ফাঁকি দিচ্ছে।" নিজেদের মধ্যে ঠেলাঠেলি করে।

কিন্তু কেউ সামনে যায় না। সেখেনে সেপাইরা পাহারা দিচ্ছে। গোঁফওয়ালা, জোয়ান সেপাই। পুরু মুখ দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ছে। দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রানী চেয়ে থাকে। ওদের পুরুষ্টু চেহারা দেখে দেখে মনে হয়, মনে হয় — রুটি আর ডাল। পুরু, মোটা মোটা রুটি। অনেক রুটি, গোছা গোছা রুটি। তার সঙ্গে ডাল। যত ইচ্ছে খাও।

ওরা পুরুষদের ধাক্কা মেরে হটিয়ে দেয। মেয়েদের আর একটু আস্তে। বলে, 'হট্ যা, এই মাগী।' মাঝে মাঝে চোখও মারে।

....নিরাশ ধুঁকতে ধুঁকতে আবার ফেরা। এবার আর পা চলতে চায় না। কেনই বা চলা? কোথায়ই বা যাওয়া?

কিছুদূর গিয়ে একটা পোড়ো বাড়ির রকের উপর ছেলেটাকে বসিয়ে নিজেও বসল। উঃ, পেটের কি জ্বালা! মাথা পর্যন্ত ঝিমঝিম করে। একবার গড়িয়ে শুয়ে পড়লো। তাতে যেন জ্বালা আরও বাড়ে। আবার উঠে কুঁকড়ি শুঁকড়ি হয়ে বসল।

মনে আর কিছু আসে না। ভাবে শুধু — ভাত, রুটি, ডাল, ছোলা.....

ছেলেটা রকের উপর শুয়ে শুয়েই হাগল। ফিন্‌কি দিয়ে পাতলা জলের মতো দাস্ত। অনেকটা দূর পর্যন্ত গড়িয়ে যায়। তার মধ্যে ছোলা — আস্ত আস্ত। ঠিক যেমন খেয়েছিল তেমন। দু-একটা আধখান হয়ে গেছে। নইলে খোসা-সুদ্ধু ঠিক যেমন ছিল তেমনি আছে।

আস্ত ছোলা.....খাবার জিনিস!......কনুয়ের ওপর ভর দিয়ে উঠে রানী যেন ভূতে পাওয়ার মতো কতক্ষণ সেই দিকে চেয়ে চেয়ে বসে থাকে। তারপর উঠল। সামনেব ডোবা থেকে জল নিয়ে এল আঁজলা করে। ময়লা ধুয়ে ছোলাগুলোকে আস্তে আস্তে আলাদা করল। আবার জল এনে গভীর মনোযোগের সঙ্গে ছোলাগুলোকে আবার ধুলো। অতি যত্নে, যেন খুব দামী জিনিস।

তারপর একটি একটি করে খুটে খুটে খেল। একবারে একটা নেয়, কতক্ষণ ধরে দেখে। দেখা হলে মুখে ফেলে আস্তে আস্তে সারা মুখময় ছড়িয়ে ছড়িয়ে চিবোয়। যতক্ষণ না একটা একেবারে শেষ হয় ততক্ষণ আব একটা হাতে তোলে না।

খেয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকল। পেটের জ্বালা তো কমল না!

ছেলেটা আবার হাগল। কিন্তু এবার আর ছোলা নেই, শুধু জল আব সামান্য একটু ছিবড়ে। উপুড় হয়ে শুয়ে শুয়ে রানী দেখল। কিন্তু নড়ল না।

কতক্ষণ পরে আবার। ফিনকি দিয়ে শুধু জল। রানী তাও উঠল না। ছেলেটাকে ধুইয়েও দিল না। ছেলেটার হাড়ের ওপর চামড়া, তাও যেন যন্ত্রণায় কুঁচকে আসে। রানী অবাক চেয়ে থাকে। সন্ধের অন্ধকার নামে। শীত করে। মাথায় ঘোরে — ভাত, রুটি, ডাল, ছোলা...

পথ দিয়ে যেতে যেতে সেপাইটা ওদের সামনে থেমে ডাকল, "এই মাগী, রুটি লিবি?" এদেশে থেকে থেকে সেপাই বাংলা শিখেছে।

রানী ধড়মড় করে উঠে বসে। "কই গো, কোথায় গো, দাও দাও।"

"আরে এখানে নাই। হামার সঙ্গে আয়! রুটি মিলবে।"

ছেলেটা বোধ হয় এব মধ্যে আব একবার দাস্ত কবেছে। সেই আ ধোয়া ছেলেকেই কোনোরকমে হেঁচকে টেনে নিয়ে রানী ছুটল সেপাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে।

অঘ্রানের সন্ধে। বেশ শীত শীত করে। সেপাইয়ের গায়ে ভারী গরম ওভার-কোট।

ঝোপের মধ্যে সেপাই-ই ওদের টেনে আনল। তারপর জাপটে ধরল। বলল, "রোটি দেগা, পয়সা দেগা, লেকিন পরে।"

রানী ছেলেটাকে শুইয়ে দিল মাটির ওপর। তারপর নিজেও তার পাশে শুয়ে পড়ল। পিঠে ঠাণ্ডা লাগে। ঝোপের মাথা দিয়ে আকাশ দেখা যায়।

গরম কোটটা খুলে ফেলে রানীকে জড়িয়ে ধরতে ধরতে সেপাই আবার বিরক্ত হয়ে ওঠে। বলে, "দূর মাগী, তোর লড়কাটার মু দেখলে সব খুশি দূর যায়।"

ব্যস্ত হয়ে রানী শুয়ে শুয়েই হাতড়াতে হাতড়াতে সেপাইয়ের কোটটা কোনোরকমে তুলে আন্দাজে ছেলেটার মুখের ওপর চাপা দিল। কোটটা কি ভারী, তোলাই যায় না।

মনে ভাবে — ভাত, রুটি, ভাত, পয়সা। ভয়ানক লাগে। সেপাইয়ের বুকের নীচে দম আটকে আসে। দাঁতে দাঁত চেপে পড়ে থাকে।

.... সেপাই উঠে দাঁড়িয়ে যখন আবার কোট পরছে তখন যেন ওঠাই যায় না। মাথা ঝিম ঝিম করে। বুকটা যেন গুঁড়িয়ে গেছে।

পাশ ফিরে খোকার গায়ে হাত দেয়। একেবারে ঠাণ্ডা, হিম। ব্যস্ত হয়ে উঠে বসে সজোরে নাড়া দেয়। সাড়া নেই। চোখটা উল্টে গেছে — মরবার সময় ওর পিসতুত ভায়ের চোখটা যেমন উল্টে গিয়েছিল। আকুল হয়ে ছেলেটার দেহ কোলের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে।

সামনের দিকে নজর যায়। আরে, কোট পরে সেপাই যে চলে যাচ্ছে! রুটি তো দিল না! পয়সাও না! ছেলের দেহ মাটিতে ফেলে রেখে রানী ছুটল। সেপাইয়ের পিছু পিছু।

ঢেউ

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

সত্যভামা যে কোনো দিন সহরে আসিয়া আর গ্রামে ফিরিবে না সে-কথাটা হয়ত বিধাতারও অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু বিধাতার অজ্ঞাত থাকিলে কি হইবে, বিবাহের পর সত্যভামা আর গ্রামে যায় নাই। পঁচিশটা বছর আর তা'র শ্বাস ফেলিবার অবসর ছিল না; স্বামী উকীল হইতে সব্ জজ হইয়া গেলেন, ছেলেপুলেতে ছোট মেয়ে টুনীরও ঘর ভরিয়া উঠিল, — ঘর ভাঙিয়া দালান হইল — উৎসব-নিমন্ত্রণ হাঁক-ডাক হৈ-চৈ বাড়ীতে লাগিয়াই আছে — তার কি শ্বাস ফেলিলে চলে? তার বাবা মাধব শিরোমণি মরিলেন পঞ্চাশ গাঁয়ে সাড়া তুলিয়া — এত বড় নৈয়ায়িক এ অঞ্চলে ক'টাই বা আর ছিল, — কিন্তু তখনো সত্যভামার উপায় ছিল না সংসার ফেলিয়া নড়িবার। বড় মেয়ে আসন্ন-প্রসবা, তার ছেলের কালাজ্বর — এখন-তখন অবস্থা। শিরোমণি মশাই দূর হইতেই মেয়েকে আশীর্বাদ করিয়া গেলেন। ছেলে-মেয়ে স্বামী-সংসার লইয়া এমন ব্যস্ত ক'জন সৌভাগ্যবতী থাকিতে পারে? গাঁয়ের লোকেরা মানিল না। বৃন্দাবন চক্রবর্তী ত' সশব্দেই বলিয়া ফেলিলেন, "সহরে ভূতে ধরেছে আর কি। যাঁর নাভি-গঙ্গা দেখতে দশ গাঁয়ের লোক পড়ল ভেঙে, তাঁরই মেয়ে না কি আসে না তাঁর শেষ সময়!" কিন্তু বৃন্দাবন চক্রবর্তী যত বড় সত্যবাদীই হোন, সত্যভামাকে সহরের ভূতে পায় নাই। সত্যভামা মাধব শিরোমণিরই মেয়ে, কোনো দিন তা'কে দেখিবার সুযোগ হইলে, চক্রবর্তী মহাশয় বুঝিয়া আসিবেন।

পঁচিশ বছর অনবচ্ছিন্ন গিন্নিপনা করিয়া যখন সত্যভামা অবসর গ্রহণ করিয়াছে, তখন বাপের বাড়ী তা'র পরিষ্কার। মা-বাবার ভিটায় বাতি দিবার জন্য যা-ও একটা ভাই ছিল, গ্রামে সে বছর কলেরার মড়ক আসিল তা'কেই উপলক্ষ্য করিয়া। সত্যভামা অনেকবারের মত এই শেষবার, বুঝিল ছেলেবেলাকার সেই গ্রাম আর তা'র জন্য ভাত মাপে নাই।

অবসর গ্রহণের নির্জনতা সত্যভামাকে বড় বেশি করিয়া বাজিল। মনটা যেন তা'র বাপের পোড়ো ভিটার মতই শূন্য, ফাঁকা হইয়া গিয়াছে। সেখানকার রূঢ়, স্তিমিত বিষণ্ণতাই তা'র মনে ছোঁয়াচে ধরাইল না কি। সত্যভামা বসিয়া ভাবিত। এত দিন ধরিয়া কর্মের যে বিরাট স্তূপ সে জড় করিয়াছে — তা'তে যেন তা'র আত্মাকে মিশাইয়া দিতে পারে নাই, কোন্ উগ্র অনিবার্য অস্বস্তিকর উন্মাদনা তা'কে চালিত করিয়া লইয়াছে। প্রবাল-কীটের মত জীবন-শেষে আপন কার্যের বিরাটত্বে অবাক হইয়া সত্যভামাও ভাবিল, এত বড় সংসার কোন্ অসম্ভব উপায়ে সে অজ্ঞাতে ধীরে ধীরে গড়িয়া তুলিয়াছে! দিনের পর দিন আপন সত্তাকে লঙ্ঘন করিয়া, উৎপীড়িত করিয়া আজ সে যেখানে আসিয়া দাঁড়াইল, সেখান হইতে আর নিজেকে চেনা যায় না। কোথায় গিয়াছে তার সেই বাল্য-পরিচিতেরা, যাদের সান্নিধ্য ছাড়া আপন অস্তিত্ব সে কোন দিন কল্পনা করিতে পারিত না — তাদের সেই তক্‌তকে উঠান, রান্নাঘরের পেছনে বড় বড় নারকেল গাছ দুইটা, উঠানের সঙ্গেই একফালি আবাদের জমি, তার পাশেই খাল — যাদের স্পর্শ পাইয়া জীবনের চৌদ্দটা বছর তাহার

কাটিয়াছে — কোথায় গেল সেই সব। এই কোলাহলহীন স্বচ্ছমুহূর্তে ভীড় করিয়া তারা আসিয়া দাঁড়ায় ; — সত্যভামা চিনিতে চায় সমস্ত চেতনা দিয়া — হয়ত চিনিতে পারেও, কিন্তু অস্পষ্ট, — কালের অপরিচ্ছিন্ন যবনিকায় দৃষ্টি তার বাধিয়া যায়।

ভোর-বেলা ঘুম হইতে জাগিয়াই সে-দিন সত্যভামা শুনিল নীচে তার ঝি-চাকর নাতি-নাত্‌নিরা মহা সোরগোল তুলিয়াছে। কান ঝালাপালা হইবার যোগাড়। ব্যাপারটা দেখিতে হয়। সত্যভামা নীচে নামিয়া আসিল। সিঁড়িতেই নীচেকার কথার কয়েকটা টুকরা তার কানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। "চোর না হলে অমন করে চায় কেউ?" "ওকে পুলিশে দেবার আগে কয়েক ঘা লাগিয়ে দে না অতুল।" "কি ছাই চ্যাঁচাচ্ছিস্, দে না শুন্‌তে, শুনেই দেখি মহাপ্রভুর আগমন কেন!" সত্যভামা নামিয়া দেখিল, মহাপ্রভুটি হয়ত একটি ভিখারীবই ছেলে—-বয়স চৌদ্দর বেশি হইবে না। শতছিন্ন ময়লা কাপড়ের আবরণে সে অতি কষ্টে আপনার সম্ভ্রম রক্ষা করিতেছে। বড় বড় নির্বোধ চোখ দুইটা মেলিয়া এই একদল অপরিচিতের রূঢ় কথাবার্তা শুনিয়া যাইতেছে।

মাকে আসিতে দেখিয়া টুনী যেন জটলা হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া সরিয়া আসিতে আসিতে বলিল, "চোর।"

একসঙ্গে অনেকগুলি কণ্ঠ প্রাণপণে চীৎকার করিতে লাগিল, "দিদিমা, চুরি করতে এসেছিল ও।"

মন্টু বলিল, "আমি দেখেছি প্রথম...."

মাণিক তার প্রথম জন্মগ্রহণ করিবার দাবী অবমানিত হইতে দিতে পারে না, সে দিদিমার কাছে আগাইয়া আসিয়া হাত পা নাড়িয়া বলিল, "সুট্ করে কলতলায় ঢুকে পড়েই চারদিকে চাইছিল — ভাগিস রবার কিন্‌তে আমি বাইরে যাচ্ছিলাম তখন; আমাকে দেখেই পালাই-পালাই কর্‌ছে, অতুল এসে ধরে ফেল্ল।"

মন্টু বাধা দিতে চাহিল, "না দিদিমা —" মাণিকের রোষ-কষায়িত চোখের দিকে চোখ পড়িতেই বাকি কথাটা তার গলায় আট্‌কাইয়া গেল।

মৃণাল — সত্যভামার বড় মেয়ের ছেলে , ফার্স্টক্লাশে পড়িবার দাবীতে সে এই দুই অপোগণ্ডকে ধমক দিয়া উপরে পাঠাইয়া বলিল, "একে যা কর্‌তে হয় কর দিদিমা, অতুল ত তক্ষুণি থানায় নিয়ে যায়; আমি বলি, দিদিমা এসে নিক।"

সত্যভামা অনেকক্ষণ 'চোর' ছেলেটির চোখের দিকে চাহিয়া ছিল। মনে পড়িল, মাধব শিরোমণি স্থান দিয়া রাখিয়াছিলেন দুই ঘর প্রজা। সদানন্দ—সদানন্দই হয়ত তাদের ছেলেটির নাম ছিল। তাঁ'র যম-পুকুরের ব্রতের ত্রিশটা দিন পরম উৎসাহে সদানন্দ রায়দের দীঘি হইতে পানা আনিয়া দিত, 'চোখ-পানি' মাছ ধরিয়া দিত। বিবাহের সময় সত্যভামা দেখিয়া আসিয়াছিল — সদানন্দ প্লীহাজ্বরে ভুগিতেছে; দিনকতক পরেই হয়ত সে মরিয়াছে; — বাঁচিয়া থাকিলেও, সে আজ কোথায়, সত্যভামা সে খবর পায় নাই। নিজের কণ্ঠে নিজেই চম্‌কাইয়া সত্যভামা জিজ্ঞাসা করিল, "তোর নাম কি রে?"

ছেলেটির সমস্ত চেতনা যেন এতক্ষণে ফিরিয়া আসিয়াছে। সে হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল, "আজ্ঞে উমেশ। আমি চোর নই মা-ঠাকুরণ। বাবুদের বল আমি চোর নই!" ঝি-চাকরের ব্যবধান ঠেলিয়া সে সত্যভামার পা দুইটা জড়াইয়া ধরিল।

"এখানে কেন এসেছিলি?" কণ্ঠে সত্যভামার অভয় গলিয়া পড়িতেছিল। উমেশ শীর্ণ হাত দিয়া চোখের জল মুছিয়া বলিল, "মা-বাবা, জায়গা-জমি কিছু নেই, মা, আমার। হেঁটে রতনপুর থেকে এসেছি — পথে কিছুই খাইনি — খেয়ার মাঝিও পয়সা নেয়নি। শুনেছি সহরে খাওয়া মেলে!"

আস্ফালন আর কাজ হইবে না বুঝিয়া মৃণাল সরিয়া পড়িল। টুনীর কাছে ব্যাপারটা কেমন নতুন ঠেকিতেছে। অনুরূপ ঘটনা ছেলেবেলায় সে অনেক দেখিয়াছে। মা আসিয়া কোনো দিন আগন্তুকদের থানার পথে বাধা হন নাই। আজ অকস্মাৎ মায়ের মধ্যস্থতা টুনীর ভাল লাগিল না।

"ওকে তুমি ভালমানুষ ভেবেছ না কি মা? থানায় নিয়ে গেলেই জেনে আস্‌বে অতুল, ও দাগি-চোর না হয়েই যায় না।"

কলতলায় কুঁজোতে জল ধরিতে ধরিতে অতুল উদ্‌গ্রীব হইয়া চাহিল। কথাটাতে তার সম্পূর্ণ সমর্থন আছে।

সত্যভামা উপরে উঠিয়া গেল, বলিয়া গেল, "ও এখানেই খাবে আজ।"

মৃণাল সত্যভামাকে পাইয়া বসিয়াছে। "দিদিমা, উমেশ তাহলে আমাদের কী হ'ল, — তোমার ছেলে — আমাদের মামা নয়?" টুনী এসব পরিহাসকেও আমল দিতে চায় না; "কি সব নোংরামি করিস্ মৃণাল, যা পড়্‌তে যা। মা, আজ ডলির জন্মদিন, তোমাকে বলে পাঠিয়েছে — দুপুর বেলায়ই যেতে হবে কিন্তু।"

সত্যভামা ছোট করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "তা যাস্ তোরা।"

"বাঃ! তুমি যাবে না? বাবাও যাবেন বল্লেন। আমি মোটর সাফ কর্‌তে বলে দিয়েছি রামসদয়কে।"

সত্যভামা বলিল, "যা, যাব'খন।"

মাসীর ধমকে মৃণাল একটুও স্থানচ্যুত হয় নাই। দিদিমার কাছে সরিয়া আসিয়া সে চুপি চুপি বলিতে চাহিল, "উমেশও যাবে ত?"

সত্যভামা এইবার রাগিয়া উঠিয়াছে। "তোরা আমায় পেয়েছিস কি — বল্ তো? দেবো আমি এক্ষুণি দূর করে ওকে। সব সময় ঠাট্টা-ইয়ারকি আমার ভাল লাগে না বাপু।"

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর সত্যভামা নীচে নামিয়া আসিয়াছে। উমেশ পবিতৃপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া, অতুলের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া, একথাল ভাত লইয়া বসিয়াছে। সত্যভামাকে দেখিয়া উমেশ এতটুকু হইয়া বলিল, "চার দিন পরে ভাত পেলাম, মা, যা খেয়ে পেট ভর্‌বে।" সত্যভামা একটু হাসিয়া চৌকাঠের উপর বসিয়া পড়িল। বলিল, "ওকে মুড়িঘণ্টটা দেওয়াস্ কিন্তু অতুল , খা'ক্. খুব ভাল হয়েছে।"

"না, মুড়িঘণ্ট আমার লাগ্‌বে না, এম্‌নিতেই পেট ভরে যাবে।" ভাতের প্রথম গ্রাসটাতেই উমেশের কেমন যেন আমেজ আসিয়াছে।

"লাগ্‌বে না কেন? ভালবাসিস্ নে? নিশ্চয় নিমন্ত্রণে খাস্‌নি কোনো দিন? তোদের গাঁ ত নদীর কাছেই, খুব মাছ পাওয়া যাবার কথা।"

নদী ত আছেই, তা ছাড়া হালদারের দীঘিতে রুই কাত্‌লা কিল্‌বিল্ করিতেছে। দশ-পাঁচটা গাঁয়ের নিমন্ত্রণের মাছ ওখান হইতেই হইতে পারে। সে কথাটা উমেশ অনেক কষ্টে, অনেক বকিয়া, অস্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিল।

"তোদের গাঁয়ে বাঁশ-ঝাড় নেইরে, উমেশ, নিচ দিয়ে সরু পথ। ভাঁটাফুল ফুটে থাকে না পথের পাশে? ষষ্ঠীপুজোয় ছেলেমেয়েরা আসে না দল বেঁধে বাঁশের ডগার পাতা ছিঁড়ে নিতে?"

"হ্যাঁ আসে। গেলো বছর বোসদের বুড়িকে ত ওখানেই সাপে কাট্‌ল। সনাতন ওঝা এসে কত ঝাড়্‌-ফুঁক্‌! কিছুতেই বুড়ি আর চোখ মেলে চাইল না। সনাতন বলে গেল, কাল-সাপ; ও-বিষ কিছুতেই নাম্‌বে না।"

"তোদের ওখানে মনসাপূজো হয় না বুঝি? সাপে কাটে যে লোকদের? সারা শ্রাবণ মাসটা আমার বাবা পদ্মপুরাণ পড়্‌তেন। গাঁয়ের সব লোক এসে জড় হ'ত ধূয়া গাইবার জন্য!" সত্যভামা দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া অতীতের দিনগুলিকে চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে চাহিল। তার পর ছোট একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল : "পদ্মপুরাণ পড়্‌লে বংশ থাকে না। বাবার বংশও থাকবে না জান্‌তাম।" উমেশের দিকে ফিরিয়া তার চোখে পড়িল, ছেলেটা ভাত অর্ধেকটাকও খাইতে পারে নাই। একটু ব্যস্ত হইয়া সত্যভামা বলিল, "এ কি, ও ভাতকয়টাও খেতে পার্‌লিনে। শুধু জলই খাচ্ছিস্‌! আর যা গরম পড়েছে এ ক'দিন! পুড়ে গেলুম। মেঘের ফোঁটাও দেখা যায় না আকশে। নে, দই দিয়ে খেয়ে ফেল ও-কটা ভাত। হ্যাঁ চল্‌বে, মাত্র ত দুটো ভাত।"

উমেশ উঁকি দিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল, "বিষ্টি হ'বে। দেখে এসেছি কেদারঠাকুর নারায়ণশিলা জলে ডুবিয়ে রেখেছেন। সাত দিনের দিন এক ফোঁটা হলেও পড়্‌বে।"

সত্যভামার মনে পড়িয়া গেল এমনি অনাবৃষ্টিতে 'মেঘ-মাগন'-এর কথা। "আচ্ছা উমেশ, তোদের গাঁয়ে মেঘ-মাগ্‌তে যায় না বামুনের ছোট ছোট মেয়েরা —স্নান করে, এলোচুলে; এখনো আমার মনে আছে ছড়াগানের দু'একটা পদ : 'মেঘ রাজারে মেঘ রাজা, তুই না সোদর ভাই —' কেমন, বেরুবে না এখন মেয়েরা মেঘ-মাগ্‌তে?"

এমন কোনো ঘটনা উমেশের মনে পড়িল না। ভাতের থালায় সে নিবিষ্ট হইয়া রহিল।

"ও, আজকাল কেউ করে না বুঝি? ছোট ছোট মেয়েরা জাল দিয়ে চুলও বাঁধে না, কেমন? ছোট বেলায় আমরা বেঁধেছি। সার করে চুলের কাঁটা গুঁজে দিতাম, মাথায় চিনেমাটির পক্ষী দেওয়া চুলের কাঁটা, — দূর থেকে বেলফুলের কুঁড়িব মালার মত দেখ্‌তে হ'ত। আজকাল ও-সব আর নেই, না রে?"

উমেশের ত স্পষ্টই মনে আছে তার ছোট বোনটা যেবার মরিয়া গেল সে বছর তার বাবা ওর জন্য চুলের জাল, চুলের কাঁটা কিনিয়া আনিয়াছিল। কাজেই এইবার উৎসাহিত হইয়াই সে বলিল, "হাঁ, আজকালও পরে।"

সত্যভামা দেখিতেছে নন্দীবাড়ীর ছোট মেয়ে ষোড়শীর সঙ্গে সে বাহির হইয়া পড়িয়াছে খালের বাঁধে মাছধরা দেখিবার জন্য। বাগ্দীদের জোয়ান-জোয়ান ছেলেগুলির পোলো লইয়া সে কি হুল্লোড়! ওদিকে কার পুকুরের বুঝি পাড় ভাঙিয়াছে — উঠিতেছে শোল আর মৃগেল মাছই বেশি। সত্যভামা ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়াইয়া মাছ ধরা দেখিত, যতক্ষণ না শিরোমণি আসিয়া আড়-কোল করিয়া তাকে বাড়ীতে লইয়া যাইতেন। হয়ত এখনো খালে তেমনি মাছ ধরা হয়, তেমনি বামুন-কায়েতের ছোট ছোট মেয়েরা খুসীর দৃষ্টিতে চাহিয়া তা' দেখে! হয়ত সেই মেয়েদেরই অনেকের বিবাহ হইয়া যাইবে এত দূরে, যেখানে গাঁয়ের কাক-চিলও যাইতে পারে না; সত্যভামার মত হয়ত তারাও ভাবিবে গ্রাম্যপরিবেশে স্নিগ্ধ শৈশবের কথা।

পেছনে টুনী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ঃ "এ কি — তুমি যাবে না কি মা?"

উমেশ লজ্জায় ছোট হইয়া গিয়া খালি থালের উপর আঙুল ঘষিতে লাগিল। তার জন্যই মা ঠাকরুণ এত কাজ ফেলিয়া এতক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।

সত্যভামা সশব্দে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া উপরে উঠিয়া গেল। ডলির জন্মদিন, তাকে যাইতে হইবে বই কি। গিয়া অনর্থক কথায় হাসিতে হইবে, আগন্তুকদের শাড়ীর ঝলমলানি,

মার্জিত অনুচ্চ কণ্ঠস্বর, ডলির দু'একটা সেতারের গদ, একটা গানও হয়ত, উপভোগ না করিলে চলিবে কেন?

উমেশ কিন্তু এ বাড়ীতেই থাকিয়া গেল। অতুলের শুইবাব ঘরের পাশেই কোঠার মত একটু জায়গা ছিল, এত দিন সেখানে কয়লা রাখা হইত, উমেশই বন্দোবস্ত করিয়া ওটাকে চমৎকার শুইবার ঘর করিয়া লইয়াছে। একটা ভাঙা তক্তপোষে গোটা দুই পেরেক ঠুকিয়া সত্যভামাকে ডাকিয়া আনিয়া বলিল, "দিব্যি হয়ে গেছে, মা, শোবার বন্দোবস্ত!"

সত্যভামা বলিল, "খালি কাঠে কি করে শুবি বল্, গায়ে লাগ্‌বে না? একটা কাঁথাও আনিস্ নি বাড়ী থেকে!"

"খুকুমণিদের ছেঁড়া কাঁথা নাই দু'একটা? আমি শেলাই করে নিতুম।"

"নাঃ ওদের কাঁথা নেই। আমারি আছে একটা। বিয়েব আগে আমায় শেলাই কবে দিয়েছিলেন মা ; — পাড়ের কাঁথা, কাপড়ের পাড় জোড়া দিয়ে দিয়ে তৈরী। মায়ের চিহ্ন, ওটা দিতে পারি নে। তুই বরং এক কাজ কর। টুনীর কাছ থেকে কয়েকখান ছেঁড়া কাপড় চেয়ে নিয়ে শেলাই করে নিস কাঁথা।"

"হ্যাঁ, দুটো কাপড় জোড়া নিয়ে নিলেই আমার ঢের হবে।"

সত্যভামা চলিয়া গেল। মেলা কাজ পড়িয়া আছে। টেলি আসিয়াছে। সবজজ নিকুঞ্জ চ্যাটার্জি এবাব বায় সাহেব উপাধি পাইলেন। উৎসবেব ভূমিকা স্বরূপ তাই একটা টি-পার্টি হইবে। সত্যভামা পুরাতন উৎসাহ সঞ্চয় কবিযা রান্না-বান্নাব যোগাড-যন্ত্র করিতে চাহিতেছে। অথচ কাজ যে বেশি আগাইযাছে তা নয়। ঘুরিতেছে বাড়ীময় , অলস মন্থর পদক্ষেপে কোথাও একটু কর্ম-ব্যস্ততা জাগে নাই। নিকুঞ্জ চ্যাটার্জিই যখন উকিল হইতে মুন্সেফ হইয়া গেলেন, তখন ত আব এমন ছোটখাট টি-পার্টি নয়, দেড়শ' লোকের পাত পড়িয়াছিল — খাইয়া তারা তৃপ্তি পাইয়াছিল তাবই কর্মকুশলতায। বযস? এখনও ত এমন অথর্ব হইযা সে পড়ে নাই যে এই হ্রস্ব উৎসবেব আয়োজন একা করিতে পাবে না। আর একাও ত সে নয, টুনী আছে -- তাছাড়া হাতেব পাঁচ আছে একটা ঠাকুব। তবু, তবু যেন সত্যভামার সম্মুখে কি একটা ফাঁক পড়িয়া গিয়াছে, তা উত্তীর্ণ হইবাব সামর্থ্য তাব নাই। হলঘরে ঢুকিয়া চেয়ারগুলিতে দুই একটা টানও সে দিল, আলমাবীর কাচগুলি ধূলায় ময়লা হইয়া আছে, কাপড়ের আঁচলটা সেগুলিব উপব একবার বুলাইয়া আনিল, কিন্তু তার বেশি দূর নয, যেমন ঘরে ঢুকিযাছিল, সন্তর্পণে তেমনি বাহির হইযা আসিল। ওধারেই উমেশের ঘুমাইবার খুপরীটি। নিজের অজ্ঞাতেই সত্যভামা সেখানে ঢুকিয়া পডিযাছে।

উপরেব তলা হইতে একটা সোরগোল উঠিল। সত্যভামার বুকে সে কি ধড়ফড়ানি। মাণিক মন্টু যা হইয়াছে, কি জানি, স্টোভেই পুড়িয়া গেল না কি! একটা চীৎকাব উন্মুখ করিয়া সত্যভামা উপবে আসিযা উপস্থিত। ছোটখাট একটা জটলা। জটলাব ভিতর হইতে ভীতু উৎসুক একজোড়া চোখ কা'কে যেন খুঁজিতেছে। উমেশ! উমেশ সত্যভামাকে দেখিতে পাইয়া একরকম আছাড় খাইয়াই তার পায়ের উপর আসিযা পড়িল। একটা কান্নাই যেন ছিট্‌কাইয়া আসিল, "তুমি বল, মা, ওদের, আমি চোর নই। আমি না কি চুবি কব্‌তে উপরে এসেছি মা।"

মৃণাল ভ্যাঙচাইয়া উঠিল : "না চুরি কর্‌তে আস্‌বেন কেন, হাওযা খেতে উপরে এসেছেন! বুঝেছ দিদিমা, আমাদের পড়ার ঘরে ঢুকে দেখি, এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে — ভাগ্যিস আমি এসে পড়েছিলাম —"

টুনী শুষ্ক গলায় বলিল . "চুবি করবার মতলব ছিল আব কি! ওদিন মাকে বল্লাম—"

সত্যভামার পায়ের তলা হইতে একটা ভিজা শব্দ আসিল, "মাকে জিজ্ঞাসা কর দিদিমণি, তোমাকে খুঁজতে এসেছিলাম আমি, একটা ছেঁড়া কাপড়ের জন্যে—"

মাণিক নাক-মুখ সিঁটকাইয়া উঠিল : "হিঁঃ, তবে তুই আমাকে দেখে পালাচ্ছিলি কেন?"

টুনী সিঁড়ির মুখে অতুলকে দেখিয়া আশ্বস্ত হইল। নিতান্ত উদাস এবং নিস্পৃহ কণ্ঠ হইতে কথাটা আসিল। "ওকে কি কর্‌তে হবে করে আয় অতুল।"

সত্যভামা তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ সিদ্ধান্তশীল কথাবার্তায় তপ্ত হইবার কথাই ত। উমেশ চোর, কেন না একদিন সে কদর্য পোশাকে তাদের বাড়ীতে ঢুকিয়াছে , কেন না আজ তার উপরে উঠিবার সাহস পর্যন্ত হইয়াছে। যে-হেতু চোর হইতে পারিত, সে-হেতু সে চোর। সত্যভামা উত্তেজনায় ফাটিয়া পড়িল : 'দিচ্ছি আমি আজই ওকে তাড়িয়ে। তোমাদের কাউকে আর চোর পাহারা দিতে হবে না। এই উমেশ, আজই তুই চলে যা — জেলখানায় পচ্‌তে ত আর সহরে আসিস্‌নি। না—না, আমার পা জড়িয়ে থাক্‌লে কি হবে— ওঠ্‌ শীগ্‌গির।"

উমেশ পা ছাড়িয়া উঠিল। ধারে কাছে কেউ নাই। যারা ছিল চলিয়া গিয়াছে যার যার কাজে।

সত্যভামা মুখ ফিরাইয়া বলিল : "হাঁ চলে যা —"

উমেশ আসিয়া সিঁড়ির কাছে দাঁড়াইয়াছে, সত্যভামা ডাকিল "দাঁড়া —" হাতে লাল-নীল রঙের একটা পুটুলির মত : "শীত আসছে সামনে; নিয়ে যা কাঁথাটা! কীই বা কর্‌ব ওটা দিয়ে আর। গাঁয়ে ফিরে গেলে গায়ে দিস।"

সিঁড়িতে উমেশের পায়ের শব্দ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া গেল। সত্যভামা তার সমস্ত ইন্দ্রিয় শ্রুতিমান করিয়া সেই শব্দ শুনিতে লাগিল — সেই শব্দ বাজিয়া চলিয়াছে আঁকা-বাঁকা খালের ধারে ধারে সাদামাটির সরু একটি পথ দিয়া — দেখিতে সব গাঁয়েরই মত একটি অখ্যাত গাঁয়ের ভিতর।

তপ্ত ঘিয়ের একটা উগ্র গন্ধের সহিত টুনীর কণ্ঠ ভাসিয়া আসিল : "সব চপ পুড়ে গেল ছাই — মা তুমি আস্‌বে, না কি?"

সত্যভামা চপ না ভাজিলে পার্টিতে আজ একটা কেলেঙ্কারীই হইবে।

অপমান

সুমথনাথ ঘোষ

থার্ড ক্লাস কামরায় যতই ভিড় থাক্, জগদীশ ওরই মধ্যে নিজের বসবার একটু জায়গা ক'রে নেবেই। কোনো রকমে একবার দেহটা গলাতে পারলে হ'ল, তারপব আর তাকে ধ'রে বাখে কে! যেন যাদুমন্ত্র জানে। এব পিছন দিয়ে, ওর বগলের তলা গ'লে, মালপত্রের স্তূপ সরিয়ে, মাড়িয়ে, ডিঙিয়ে, কেমন ক'রে যে একটা স্থান দখল ক'বে বসে তা সত্যিই ধারণার অতীত। এ বিষয়ে ওর কৃতিত্ব অসাধারণ তাতে সন্দেহ নেই। সবাই ওকে বাহবা দেয়।

তবে এই সাফল্যের মূলে ওর ঈশ্বরদত্ত চেহারাটা যে অনেকখানি কাজ করে, একবার যে তাকে চোখে দেখেছে কিছুতেই সে স্বীকার না ক'রে পারবে না। শুধু ফরসা রঙ ব'লে নয়, ওব লম্বা চওড়া চেহারার সঙ্গে এমন একটা আভিজাত্যেব দম্ভ চোখে মুখে যে, কোনো তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী কল্পনাই করতে পাবে না সে ব'সে যাবে আর তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকবে জগদীশ — ধবধবে প্যান্টেব ওপব যাব ক্রিমকলার রঙ বুশশার্ট, মুখে একটা জ্বলন্ত সিগারেট এবং হাতে সিগারেট-ভর্তি চক্‌চকে সুদৃশ্য একটি টিন।

বিদেশভ্রমণের সময় জগদীশ একটা নিয়ম বিশেষভাবে মেনে চলে। সাহেবী পোশাক না প'রে কখনও বেরোয় না। তার ধারণা, দেশ স্বাধীন হয়েছে বটে, কিন্তু এতকালের গোলামি করার অভ্যাসটা এখনও লোকের রক্তে মিশে আছে, তাই যাদের দাসত্ব দীর্ঘদিন ধ'রে করেছে তাদের পরিত্যক্ত পোশাকটা দেখলেও আপনি মাথা হেঁট হয়ে যায়। জগদীশের এই থিওরি যে বর্ণে বর্ণে সত্য, তার প্রমাণ সে হাতে হাতে পেয়েছে — একবার নয়, বহুবার।

কিন্তু সেদিন কি হ'ল কে জানে! একদল দেহাতী একেবারে বেঁকে বসল, কিছুতেই তাকে জায়গা ছাড়তে রাজী হ'ল না। তাবা কালো রঙের হাঁড়িকুঁড়ি, ছেঁড়া মাদুর, ময়লা কাঁথা, টোল খাওয়া টিনের সুটকেশ, দড়িজড়ানো শিশি-বোতল, ভাঙা হ্যারিকেন লণ্ঠন প্রভৃতি নিয়ে ছড়িয়ে মেলিয়ে এমনভাবে কোণের দুখানা লম্বা বেঞ্চি ও তার ওপরের দু'টো মাল রাখবার তাক বোঝাই ক'রে নিয়ে বসেছিল যেন সেদিকটা তাদের রিজার্ভ-করা — অন্য কোন প্রদেশের প্রবেশ নিষিদ্ধ। তারা যে দরিদ্র তা তাদের চেহারায় প্রকাশ। ছেঁড়া ময়লা গেঞ্জি কারও গায়ে আছে, কারুর তাও নেই। কারুর পরনে খাটো ধুতি, কারুর বা একখানা গামছা মাত্র সম্বল। পানের বটুয়া খুলে চুন-খয়েরের সঙ্গে গুণ্ডি দিয়ে পান সাজতে সাজতে তারা নিজেদের ভাষায় সুর ক'রে আপোসে কি সব আলাপ-আলোচনা করছিল।

জগদীশের সুটকেস ও বিছানাটা জোর ক'রে হিন্দুস্থানী কুলিটি বাঙ্কের ওপর এক জায়গায় গুঁজে দিয়ে ব'লে উঠল, আরে, ঠিকসে বইঠো ভেইয়া, বাবুকো জেরা জ্যায়গা তো ছোড়্ দেও।

যেন তার কথা ওরা কেউ শুনতেই পায় নি, এমনিভাবে তখনও পান সাজছিল। এবার কুলিটি এক পর্দা গলা চড়িয়ে দিলে, ই লোখ এইসা ব্রেয়াকুব — আরে, হট্ যাও না জেরাসে —

এ কথায় চ'টে উঠল একজন। তারপর বিড়বিড় ক'রে যা বললে তার অর্থ হচ্ছে, আমরা কি টিকিট কাটি নি, না বিনা পয়সায় যাচ্ছি?

এর জবাব দিলে জগদীশ গম্ভীর কণ্ঠে। এতবড় অপমান তাকে কেউ কোনোদিন করতে সাহস করে নি। তাই বললে, টিকিট তোমার মত সকলেই কেটেছে, ভুলে যেয়ো না। সকলের বসবার জায়গাও সরকার এর মধ্যে ক'রে দিয়েছে। স'রে ব'স ঠিক হয়ে।

সাজা পানটা গালের মধ্যে পুরে, বটুয়াটার দড়ি টেনে কোমরে গুঁজতে গুঁজতে সে বললে, কিন্তু জায়গা কোথায বাবু যে বসতে দেব?

দেখবে জায়গা কোথায়? দেখিয়ে দেব? — জগদীশ যেই ব'লে উঠল অমনি তার মুখের কথাটা যেন কেড়ে নিয়ে সেই দেহাতীটি বললে, তা আপনি এত চটছেন কেন? আপনি ভদ্দরলোক —

বলতে বলতে সহসা তার গলার স্বর যেন খাদে নেমে এল এবং নিজেকে এমনভাবে সঙ্কুচিত ক'রে নিলে যে, তার পাশেই জগদীশের বেশ একটা বসবার জায়গা হয়ে গেল।

জগদীশ বসল বটে, কিন্তু সারাক্ষণ তার মনটা সিঁটিয়ে বইল। এই লোকগুলোর মধ্যে ব'সে এতটা পথ কি ক'রে যাবে ভাবতে না পেরে একটা সিগারেট ধরিয়ে আগাথা ক্রিস্টির একখানা নভেল খুলে পড়তে শুরু ক'রে দিলে। নিমেষে তার মন চ'লে গেল ঈজিপ্টের এক অজ্ঞাত মরুভূমিতে। রুদ্ধ নিশ্বাসে পাতার পর পাতা সে উল্টে যায়। কাহিনীব জটিলতা যত বাড়ে, রহস্যও যেন ঘনীভূত হতে থাকে।

হঠাৎ একটা গণ্ডগোল শুনে মুখ তুলতেই জগদীশ দেখে, ঝগড়া লেগেছে সেই দেহাতীটিব সঙ্গে এক ফেরিওলার। সে বেচারী গাড়ির মধ্যে পাকা কলা বেচতে এসেছিল। তাব কাছ থেকে দরদাম ক'রে কলা নিয়ে তারপর পয়সা দেবার সময় কম দিতে গেলে সে তার হাত থেকে কলাগুলো কেড়ে নিয়ে তাকে যাচ্ছেতাই ক'রে গালাগাল দিচ্ছে, জন্তু-জানোয়ার থেকে শুরু ক'রে যত রকমের বাছা বাছা শব্দ হিন্দী ও বাংলায় প্রচলিত আছে তার কোনটাই যখন বলতে বাকি রাখলে না তখন সে শুধু প্রতিবাদ কবলে এই ব'লে — এত গালাগাল দিচ্ছ কেন?

দেব না! তোকে না আগে বললুম যে পাঁচ আনার কম ডজন হবে না! তবে ভাঙবাব পর এখন আবার চার আনা দিচ্ছিস যে?

এত ছোট ছোট কলা, আর এত দাম —!

ছোট কলারই তো দাম হয়েছিল, বড় কলা তো আমার নেই। জংলী ভূত কোথাকার! — বলতে বলতে ঝুড়িটা কাঁধে তুলে নিয়ে সে হাঁকতে শুরু করলে, এই যে বাবু চন্দননগরেব চিনির্চাপা — পাঁচ আনায ডজন — ফুরিয়ে গেলে আর পাবেন না।

পরের স্টেশনে গাড়ি থামতে ফেরিওলাটি নেমে গেলে সেই লোকটি এমন মুখেব ভাব ক'রে সকলের দিকে তাকাতে লাগল যেন কিছুই হয় নি, কেউ তাকে কোনোদিন কোনো অপমান করে নি। ওদিকে বাংলা নাটকে করুণ দৃশ্যের পরই যেমন অবান্তর হলেও হাস্যরসের কিছু চুট্‌কিচাটকা থাকবেই, তেমনই ঘুঙুর পায়ে, কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে সঙ্গে সঙ্গে উঠল আর একজন ফেরিওলা। এই যে বাবু হরিদাসের বুলবুল ভাজা, যে বয়েসে খাবেন সেই বয়েসে থাকবেন! এক প্যাকেট এক আনা, তিন প্যাকেট দশ পয়সা।

অমনি একজন দেহাতী তিনটে প্যাকেটের সঙ্গে আরও একটা তার হাত থেকে তুলে নিয়ে বললে, এই চারটে দশ পয়সায় দেবে?

রাখ্, এ তোরা খেতে পারবি না। দাঁত প'ড়ে যাবে। — ব'লে অবজ্ঞার সঙ্গে প্যাকেটগুলো তার হাত থেকে টান মেরে কেড়ে নিয়ে আবার সুর ধরলে, 'আমার এ হরিদাসের বুলবুল-বুলবুল-বুলবুল ভাজা'।

এই সুরকে ছিন্নভিন্ন ক'রে পরের স্টেশনে উঠল যেন একজন জল্লাদ। তার মুখে কালো দাড়ি, কালো রঙের একটা আলখাল্লা গায়ে, হাতে উন্মুক্তফলক কতকগুলো ছুরি ও কাঁচি। 'এই যে আসল কাঞ্চননগরের ছুরি কাঁচি বাবু।' — ব'লে প্যাসেঞ্জারদের মুখের সামনে তুলে ধরলে।

আশ্চর্য! এ খাবার জিনিস নয়, তবু একে ডাকলে ওদের একজন। তারপর শুরু হ'ল আবার দরদস্তুর। হাতে ক'রে এটা ওটা সেটা নাড়াচাড়া ক'রে এক টাকার কাঁচিটার দাম পাঁচ আনা এবং দশ আনার ছুরিটার দাম সাড়ে তিন আনায় অনেক টানাটানি কষাকষির পর যখন ফেরিওলাটা দিতে রাজী হ'ল তখন সে পিছিয়ে গেল। দেশওয়ালী ভাইদের মুখের দিকে এমনভাবে তাকালে যেন অন্যায়ভাবে তাকে ঠকিয়ে নিচ্ছে গাঁইয়া পেয়ে।

আরে স্টেশন এসে গেল, আমি এখুনি নেমে যাব, পয়সা বার কর। — ব'লে সেই কাঁচি ও ছুরিটা যেমন তার দিকে এগিয়ে দিলে অমনি সে ঘাড় নেড়ে জবাব দিলে, এ নেব না, এ ভাল জিনিস নয়।

যদি ভাল নয় তো, এতক্ষণ ধ'রে দিল্লাগি করছিলি কেন? সাড়ে তিন আনার ছুরি আর পাঁচ আনার কাঁচি কি সোনা দিয়ে তৈরি হবে, না, তা দিয়ে তোর মত লোকের গলাকাটা যাবে। — ব'লে শুধু তার নয়, তার ঊর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষের মুণ্ডপাত করতে করতে নেমে গেল।

এ অপমান কার বুকে কতখানি আগুন জ্বালাল কে জানে। তবে কিছুক্ষণের জন্যে তাদের কারও মুখ দিয়ে আর কোনো কথা বেরুল না। সারা কামরাটা যেন থমথম করতে লাগল। সহসা সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হ'ল আর একজন ফেরিওলার কণ্ঠস্বরে। — এই যে প্রলেপ দিন আপনাদের জ্বালা যন্ত্রণা ব্যথায়, যার যা আছে সব ভাল হয়ে যাবে আমার এই 'সর্বহরি মলমে,' বুকে ব্যথা, গাঁটে ব্যথা, আধকপালে ব্যথা, দাঁতে ব্যথা, মাথা ব্যথা — যাবতীয় ব্যথায় এ বন্ধু। পয়সা লাগে না, বিনামূল্যে নমুনা নিয়ে এখনি গাড়ির মধ্যে পরীক্ষা ক'রে দেখুন। তা ছাড়াও কুকুর বেড়াল ছাগল গরুদেরও যদি পায়ে চোট লেগে ব্যথা হয় বা ফোলে — লাগাবামাত্র পনেরো মিনিটের মধ্যে ভাল না হ'লে দাম ফেরত দেব।

দেহাতীদের কাছে এগিয়ে যেতেই প্রথমে একজন, তারপর আর একজন তাদের মাথাটা দেখিয়ে বললে, খুব দবদ হয়েছে। একটু নমুনা দেখি। ফেরিওলাটি সঙ্গে সঙ্গে আঙুলে ক'রে মলম নিয়ে তাদের কপালে ঘ'ষে দিতে দিতে বললে, এক শিশি পাঁচ আনা। তবে বেশি প্রচারের জন্যে কোম্পানি স্যাম্পেল ফাইল বার করেছেন মাত্র দু আনায়। কার চাই বলবেন — আমি পরের স্টেশনে নেমে যাব।

এমনি ক'রে তিনজনের কপালে মলম ঘষা শেষ হতেই আরও দুজন যেই চাইল অমনি মুখটা বিকৃত ক'রে সে ব'লে উঠল, বিনা পয়সায় পেলে তোরা বিষ খেতেও রাজী — অত সস্তা নয় আমার মলম। তোরা তো জন্মে এ কিনবি না। যা ভাগ, আর হবে না!

গুলি — গুলি খান, সকালে গুলি, দুপুরে গুলি, বিকেলে গুলি, রাত্রে গুলি — সব সময় কেবল এই গুলি খান। এই যে দাদু, আমার কাছে আছে পঞ্জাবের তানসেন গুলি। কার চাই বলবেন। তেষ্টা পেয়েছে, দুটো গুলি মুখে রাখুন পিপাসা আপনার সঙ্গে সঙ্গে দূর হয়ে যাবে। এ ছাড়া বদহজম, গলাজ্বালা, বুকজ্বালা, ক্ষিধে নেই, পেট মোচড় দিচ্ছে — দুটি বড়ি খেয়ে নিন, দেখবেন আগুনে যেন জল পড়ল। বেশি বলার প্রয়োজন নেই। আজ পনেরো বছর ধ'রে এই গাড়িতে সমান গৌরবে এই তানসেন গুলি চলছে। এ গুলি খায় নি এমন লোক

দেশে বোধ হয় খুব কম আছে। যাঁরা এখনও খান নি, তাঁরা খেয়ে দেখুন, আমার কথা সত্যি কিনা।

গাড়ির অন্যান্য যাত্রীদের হাতে সেধে সেধে বড়ি দিতে গেলে সেই লোকগুলি সবাই একসঙ্গে হাত বাড়াল। প্রত্যেকের হাতে অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে একটা দুটো দিয়ে সে বললে, এ খেলে তোদের পেট কামড়াবে। — ব'লে এগিয়ে যেতেই তিন-চারজন কিনলেন পয়সা বার ক'রে — কেউ বড় শিশি, কেউ ছোট।

এর পর উঠল বেরিলির সুরমা বেচতে এক পশ্চিমী মুসলমান। কাঠিতে ক'রে সুরমা লাগিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখবার জন্যে যাত্রীদের দিকে অগ্রসর হতেই এগিয়ে এল সেই দেহাতিরা। চোখে সুরমা লাগিয়ে দিয়ে তার গুণাগুণ অনেকক্ষণ ধ'রে বর্ণনা ক'রেও তাদের কাছে এক শিশিও বিক্রি করতে না পেরে সে হতাশ হয়ে নেমে গেল বটে, কিন্তু অনেকক্ষণ অবধি তাদের সুরমা-পরা চোখ দিয়ে জল ঝরতে লাগল — বোধহয় জ্বালা করছিল। চোখের ভিতরটা ঈষৎ রক্তাক্ত হয়ে উঠেছিল, তাই হাত দিয়ে রগড়ানো মাত্র জল গড়িয়ে পড়ছিল দু গাল বেয়ে।

বেশ হয়েছে। বিনা পয়সায় সুরমা পরার সুখ এখন বোঝ! — ব'লে গাড়ির এক কোণ থেকে কে একজন যেন মন্তব্য ক'রে উঠল।

কিন্তু ব'লে কি হবে। এতগুলো লোকের সামনে বারে বারে অপমানিত হওয়ার পরও কি কেউ আবার ফেরিওলাদের ডাকে, না, তাদের জিনিসে হাত দেয়, ওরা সর্বভুক, না, দুনিয়ার তাবৎ জিনিসে এদের কৌতূহল! বুঝতে না পেরে বারে বারে জগদীশ তাদের মুখের দিকে তাকাচ্ছিল কটমট ক'রে। তাকে যে প্রথমে ওরা অপমান করেছিল সে কথাটা সে তখনও ভুলতে পারে নি, তাই ফেরিওলারা এমনই ক'রে যখন তাদের অপমান ক'রে যাচ্ছিল যেন তখন সে মনে মনে একপ্রকার প্রতিশোধের আনন্দ উপভোগ করছিল। পড়ায় ব্যাঘাত ঘটলেও জগদীশ মধ্যে মধ্যে আড়চোখে চেয়ে চেয়ে দেখছিল সেই জীবগুলির মুখের দিকে।

গাড়ি যত এগোয়, ফেরিওয়ালার সংখ্যাও যেন তত বৃদ্ধি পায়। এক এক কামরায় তিন-চারজনও একসঙ্গে ওঠে। এ যেন অফুরন্ত ভাণ্ডার। কি না পাওয়া যায় গাড়ির মধ্যে।

বই পড়তে পড়তে বিরক্তি ধরে জগদীশের। যখনই গোয়েন্দার হাতে আসামী ধরা পড়োপড়ো, অমনি নতুন ফেরিওয়ালার উৎপাত। মনে হয়, সারা বড়বাজারের ফুটপাতটা যেন একজোটে ফেউ লাগার মত থার্ড ক্লাসের যাত্রীদের পিছনে তাড়া করেছে। কম ভাড়া দেবে, আবার মনের শান্তিতে ভ্রমণ করবে — এটা যে রেল কোম্পানি চায় না তার প্রমাণ এই ফেরিওয়ালারাই যথেষ্ট। ছারপোকার দংশন বোধ হয় এর চেয়ে সহস্রগুণ ভাল।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। এর ওপর যখন উঠল একজন নীলামওয়ালা, তখন জগদীশের সর্বাঙ্গ জ্বালা ক'রে উঠল। গায়ের জামা, টর্চলাইট, তালাচাবি, আয়না, ফাউনটেনপেন, চশমা প্রভৃতি হরেক জিনিস সে নীলাম ক'রে বিক্রি করতে লাগল। তবে তার এই নীলামের একটু বিশেষত্ব ছিল।

ডাক উঠলেই কিন্তু সে জিনিস দিতে বাধ্য থাকবে না। ডাক যদি জিনিসের ন্যায্য মূল্য, মানে — কেনা দামে পৌঁছয় তবেই দেবে। নচেৎ যারা সর্বোচ্চ ডাক তুলবে তাদের ক্ষতিপূরণস্বরূপ সে বিনামূল্যে কোনো কিছু উপহার দেবে। প্রথমেই একটা সাদা কাপড়ের প্রমাণ পাঞ্জাবি সে ডাক তুললে। এতেও কিন্তু সেই দেহাতীদের কেউ কেউ অংশ গ্রহণ করলে। তবে দাম দু টাকার বেশি আর উঠল না দেখে ক্ষতিপূরণস্বরূপ সে কাউকে একখানা চার পয়সার খাতা, কাউকে বা একটা চার পয়সার আয়না উপহার দিলে। লোকটি কিন্তু

এখানেই ক্ষান্ত হ'ল না। আবার সেই পাঞ্জাবির সঙ্গে একটা ছোট টর্চ, একটা পিতলের হার আর একটা চশমা একসঙ্গে নীলামে তুললে। বলা বাহুল্য ডাকটা দেখতে দেখতে একেবারে উঠে গেল পাঁচ টাকায়। পাঁচ এক — পাঁচ দুই — পাঁচ তিন — ক'রে সেই জিনিসগুলি তখন নীলামওয়ালা একটি দেহাতীর গায়ের ওপর ফেলে দিয়ে বললে, দাও, টাকা দাও।

এটি একটি অল্প বয়সের ছোকরা। বাক্সের ওপর মালপত্রের সঙ্গে ব'সে ছিল খালি গায়ে। সে তার গোঁজ খুলে আনি, দুয়ানি ও পয়সায় মিলিয়ে চার টাকা চার আনা গুনে গুনে দিলে তার হাতে, তারপর তার দলেব অপব একজনের কাছ থেকে আরও বারো আনা ধার ক'রে বাকিটা চুকিয়ে দিলে।

পবেব স্টেশনে লোকটি নেমে যেতে অপর যাত্রীরা অনেকেই ধিক্কাব দিলে সেই ছোকবাটিকে। বললে, একেবারে তোকে সোজা পেয়ে ঠকিয়ে গেল। কি আছে এই জিনিসগুলোয়। কলকাতায় রাস্তার ধাবে এই টর্চ, চশমা, আব পিতলেব হাবগুলো চার চাব আনা ক'রে বিক্রি হয়। আর এই পাঞ্জাবিটার দামও খুব বেশি হ'লে তিন টাকা। বড়বাজারের রাস্তায় হবদম বিক্রি হচ্ছে! সেই দলের সকলেই তখন এক-একবাব ক'বে সেই জিনিসগুলো হাতে নিয়ে বিজ্ঞের মত পরীক্ষা ক'রে দেখে আবার ফিরিয়ে দিলে যাব জিনিস তাকে। জগদীশবাবু মনে মনে অত্যন্ত খুশি হলেন। বেশ হয়েছে। উপযুক্ত শাস্তি, যেমন সব জিনিস ডেকে দাম কবতে যাওয়া। সত্যি, এ একেবারে দিনে ডাকাতি যাকে বলে। জিনিসগুলো এত খেলো যে সব মিলিয়ে সাড়ে তিন টাকাও দাম হবে কি না সন্দেহ।

কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা এই, যে কিনলে সে একেবারে নির্বিকার, তাব মুখের কোথাও একটি বেখাবও পরিবর্তন ঘটল না। টিনেব তোবড়ানো একটা স্যুটকেস খুলে তাব মধ্যে জামা টর্চটা সে ভবে রেখে ছোট একটা আয়না বাব ক'রে সকলের চোখেব ওপর টেবি কাটতে লাগল।

জগদীশ এই পর্যন্ত দেখে নিজের রহস্যরোমাঞ্চ কাহিনীতে আবার মন দিলে।

এ ট্রেনটা বর্ধমানের পর থেকে মেল হয়ে যায়। সব স্টেশনে থামে না। ছুটে চলে হু-হু ক'রে দিগ্বিদিক কাঁপিয়ে।

দুপুবের দিকে গাড়ির একটানা শব্দে যখন সকলের চোখে বেশ একটা ঘুমের আমেজ লেগেছে তখন হঠাৎ গানের সুর কানে আসতে জগদীশ বই থেকে মুখ তুলে দেখে, সেই ছোকরাটি চোখে সেই চশমাটা লাগিয়ে, পেতলের সেই হাবটা গলায় প'বে, ছোট আয়নাটা মুখেব কাছে তুলে ধ'রে গুনগুন ক'বে গান গাইছে আর নিজেকে নিরীক্ষণ করছে।

আশ্চর্য, লজ্জার বালাই কি নেই এদের। এখনও এক ঘণ্টাও হয নি, এতগুলো পয়সা যার গালে বলতে গেলে চড় মেরে ঠকিয়ে নিয়ে গেল, তাব মনে এ উল্লাস আসে কোথা থেকে! যুবকটিকে অনেকক্ষণ তেমনি তন্ময় হয়ে থাকতে দেখে জগদীশ মনে মনে ব'লে ওঠে, এত অপমানেও যাদের চৈতন্য হয না, তাবা কি মানুষ! ঠিক হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আবাব দ্বিগুণ প্রতিহিংসার আনন্দে তাব মন পূর্ণ হয়ে যায়।

পাকুড় স্টেশনে গাড়ি এসে থামতেই জগদীশ নেমে পড়ল বটে, কিন্তু তার ঠিক পেছনে হৈ চৈ চেঁচামেচি ও গোলমাল করতে করতে সেই দেহাতীর দলটি মালপত্রের বোঝা নামাতে লাগল, তারা যে ওইখানেরই কোন পাথরের কোয়েরিতে কাজ করে, ছুটি নিয়ে দেশে ধান কাটতে গিয়েছিল, তা জগদীশ জানত না।

জগদীশের ওখানে এই প্রথম আসা। তার এক বন্ধু পাথরের ব্যবসা ক'রে অল্প দিনের মধ্যেই বেশ গুছিয়ে নিয়েছিল। পাহাড়ের কোলে বাংলো, ফুলবাগান, মোটর গাড়ি, মুরগীর পাল। তারই আমন্ত্রণে কয়েকটা দিন সে বিশ্রাম নিতে এসেছিল।

পরদিন বন্ধুর সঙ্গে কোয়েরিটার মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে সহসা একটি কুলি-যুবতীকে দেখে সে থমকে দাঁড়াল। মাথায় পাথরের ঝুড়ি নিয়ে সে নেমে আসছিল পাহাড়ের ঘোরানো পথ দিয়ে এঁকেবেঁকে। বোধ হয় হো কি মুণ্ডা জাতীয়া হবে। কিন্তু অপূর্ব লাবণ্যময়ী, যেন কষ্টিপাথরে খোদাই করা ভেনাস্ মূর্তি।

সিগারেটের ধোঁয়া ঠোঁটের কোণে বাঁকিয়ে ছাড়তে ছাড়তে জগদীশ বললে, তোদের কোনো বিউটির সেন্স নেই — নইলে এই দুর্লভ রত্নকে কেউ এইভাবে নষ্ট হতে দেয়!

তুই কি মীন করছিস, জানি। কিন্তু সাবধান ভাই, ওদিকে নজর দিতে যেন যাস নি। ও একেবারে সাক্ষাৎ কালনাগিনী। ওর কাছে ঘেঁসে কার সাধ্য! ব'লে চুপি চুপি যা বললে, তার অর্থ এই যে অনেক খুনোখুনি, মারামারি, পুলিসকেস হয়ে গিয়েছে ওকে নিয়ে। পয়সার লোভ দেখিয়ে বা অন্য কিছু দিয়েই কেউ আজ পর্যন্ত ওর মনোহরণ করতে পারে নি। তা ছাড়া কোনো কোনো ধনী মহাজনের শিক্ষিত শালা, ভাইপো মোটরে ক'রে কলকাতা থেকে এসে ওর ওপর লোভ দিতে গিয়ে কি ভাবে অপমানিত হয়ে ফিরে গেছে সে-সব কাহিনী বলতে বলতে জগদীশকে নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে এল বন্ধুটি। কিন্তু তবু জগদীশ ভুলতে পারে না সেই মেয়েটিকে। সব সময় তার চোখের ওপর যেন ভাসে সেই মূর্তিটি! বিশেষ ক'রে বিকেলে বেড়াতে বেরুবার সময় বন্ধুর দেওয়াল-জোড়া আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে নিজের সুগঠিত সুন্দর চেহারাটার দিকে তাকিয়ে সহসা যেন ক্ষুধার্ত সিংহের মত জ্ব'লে ওঠে তার চোখ দুটো।

বেড়াবার ছল ক'রে জগদীশ খোঁজে সেই দুর্লভ রত্নটিকে। কোন্ পাহাড়ের বুকে কোথায় তার ঘর অনুসন্ধান করে গোপনে। ভোর হতে তর সয় না, ও ভাল পোশাক এঁটে প্রাতঃভ্রমণের নাম ক'রে বেরিয়ে পড়ে। ওদিকে তেমনি সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে যাবার অনেক পরে বাড়ি ফেরে।

সেদিন তখনও ভাল ক'রে ফরসা হয় নি, জগদীশ শালবনের মধ্যে দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে অনেক দূরে গিয়ে পড়েছিল। ক্লান্ত হয়ে একটা পাথরের ওপর ব'সে বিশ্রাম নিচ্ছে, এমন সময় হঠাৎ একটা হাসির তরঙ্গে সে সচকিত হয়ে উঠল। পিছনে ছিল একটা মহুয়ার জঙ্গল, তাড়াতাড়ি সেদিকে তাকাতেই তার চোখ দুটো যেন জ্বালা ক'রে উঠল। দেখে, ছোট্ট একটা কুঁড়েঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে সেই দেহাতী যুবকটি, তার গায়ে সেই নীলামে কেনা পাঞ্জাবি, চোখে সেই চশমা, হাতে সেই টর্চলাইটটি — আর তার কাঁধের ওপর হাত রেখে হাসছে সেই কষ্টিপাথরে খোদিত ভেনাস্ মূর্তি — তার গলায় সেই পিতলের হার।

জগদীশ সে দৃশ্য আর সহ্য করতে পারলে না। চোখটা বুজে ফেললে। তার পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত যেন তখন জ্বলছে, কালনাগিনীর বিষে, না, অপমানে, সেই জানে।

ঠগিনী

সুবোধ ঘোষ

সনাতন আর সনাতনের মেয়ে সুধা। যেমন বাপ তেমন মেয়ে।

একের পর এক অদ্ভুত এক-একটা ঘটনা ঘটে, আর সেই ঘটনায় বাপ যেমন বেদনায় একেবারে ভেঙে পড়ে ও ডুকরে কাঁদে, তেমনি মেয়েও ব্যথাব ভারে মুখ তুলে তাকাতেও পাবে না, চোখে আঁচল চেপে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। যারা কাছে দাঁড়িযে সে দৃশ্য দেখে, তাদেরও চোখে জল আর বুকে দীর্ঘশ্বাস দেখা দেয়। -- আহা কি কষ্টের কথা। একটিমাত্র মেয়ে ছাড়া সংসারে আর কেউ নেই যার, সে মানুষের বুক তো ভেঙেই পড়বে মেয়েকে পরের ঘরে পাঠাতে গিয়ে।

সুধার বিয়েব পরদিন যখন সুধাকে নিয়ে বিদায় নেবার জন্য তৈরি হয় বর আর বরযাত্রী এবং আবও দু-চারজন, তখন ডুকরে কেঁদে ওঠে সনাতন, আব ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে সুধা।

কিন্তু একমাস যেতে না যেতে পাড়াব এইসব মানুষ, এবং ওই বর ও আরও অনেকে বেশ ভালো করে বুঝতে পারে, হ্যাঁ ঠিক, একেবারে বর্ণে বর্ণে ঠিক, যেমন বাপ তেমনি মেয়ে। যেমন ধড়িবাজ সনাতন তেমনই ধড়িবাজ তার মেয়ে। মানুষকে ঠকাবার কাযদা আব কীর্তিতে দুজনেই সমান চৌকস। কেউ কারও চেয়ে কম নয়। যেমন বাপ তেমনই মেয়ে।

পুলিস বলে, যেমন মেয়ে তেমনই বাপ। এই নিয়ে তিনবার হলো। একবার তারকেশ্বরে আব একবার বসিরহাটে এই রকম জোচ্চুবিব দুটো কেস হয়েছে। মাত্র দুমাসের মধ্যে দুটো কেস। এটা হলো থার্ড কেস। তিনটে ঘটনা এই একই বাপ এবং একই মেয়ের কাণ্ড বলে মনে হচ্ছে। এই রকম করে মানুষ ঠকানো এ দুজনের পেশা।

ভাটপাড়ার বাজারের কাছে পাড়ার একটি গলির মধ্যে একটা ছোট ঘরের দরজার বন্ধ তালা ভেঙে তল্লাসী করে পুলিস। কিন্তু একটা কুটোও পড়ে নেই সেই শূন্য-ঘরের কোনো কোণে। সনাতন আর সুধা, সেই বাপ আর মেয়ে যেন এক অদ্ভুত ভোজবাজির খেলা দেখিয়ে নিজেদের একেবারে হাওয়াতে মিশিয়ে দিয়েছে। কখন পালিয়ে গেল, কেউ বলতে পারে না। পাড়ার লোক যারা একমাস আগে সেই বাপ ও মেয়ের চোখের জল দেখে নিজেরাও কাঁদ-কাঁদ হয়েছিল, লজ্জা পায় তারা এবং আক্ষেপ করে। — বাস্তবিক এই সংসারই একটা চিড়িয়াখানা, কি না কাণ্ড হয় এখানে।

কেউ কেউ বলেন — চিড়িয়াখানাতে এ রকম কুৎসিত কাণ্ড হয় না মশাই, মানুষের সংসারেই হয়।

আর একজন বলেন — লজ্জার ব্যাপার এই যে, আমাদের পাড়াতেই আমাদের চোখের উপর দিয়ে এ-রকম একটা কাণ্ড হয়ে গেল! কোথাকার একটা লোক আর একটা মেয়ে এসে ক'দিনের মধ্যে পাড়াশুদ্ধ লোককে একেবারে বোকা বানিয়ে দিয়ে কেটে পড়লো মশাই। কেউ ওদের একটু সন্দেহ করতে পারলো না।

হ্যাঁ, কেউ সন্দেহ করতে পারে নি। ঐ ডুকরে কাঁদা আর ফুঁপিয়ে কাঁদা দৃশ্যটার মধ্যে যে অতি চমৎকার একটা জোচ্চুরি হাসছে, সেটা পাড়ার লোকের চোখে আর বর ও বরযাত্রীদের চোখে ধরা পড়ে নি। ধরা পড়বেই বা কেমন করে? বাপ ও মেয়ের সেই করুণ কান্নার ছবি এখনও স্মরণ করলে মনে হয়, না, জোচ্চুরির ব্যাপার নয়, অন্য কোনো ব্যাপার আছে।

পুলিস বলে — অন্য কোন ব্যাপার নয়। ওরা বাপ ও মেয়ে ঠিকই। এক-একটা নতুন জায়গায় গিয়ে নতুন নাম নিয়ে আর নতুন জাতের নাম নিয়ে বাপেতে মেয়েতে কিছুদিন থাকে। তারপরেই এই রকম একটা কাণ্ড করে সরে পড়ে।

পাড়ার লোকও দুঃখে ও লজ্জায়, এবং যেন অপরাধীর মতো মুখের ভাব করে তাকিয়ে থাকে সেই ভদ্রলোকের মুখের দিকে, যিনি মাত্র একমাস আগে টোপর মাথায় দিয়ে এক সন্ধ্যায় এই পাড়াতে আবির্ভূত হয়েছিলেন, আজকের ঐ শূন্য-ঘরের এক গরীব পিতাকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধাব করার জন্য। পাড়ার কয়েকটা ছোকরা মুখ টিপে হাসতেও থাকে।

ভদ্রলোক একটু বয়স্ক, বয়স পঁয়তাল্লিশেরও বেশি হবে, প্রায় পঞ্চাশেব কাছাকাছি। নৈহাটিতে কাপড়ের দোকান আছে ভদ্রলোকের। বিপত্নীক ও নিঃসন্তান এক ব্যবসায়ী মানুষ। আবার বিয়ে কববার জন্যে প্রস্তুতও ছিলেন না, ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু সনাতনবাবুর সঙ্গে পরিচয় হবার পর এবং সনাতনবাবুর দারিদ্র্যের পরিচয় পাওয়ার পর তাঁর এই বয়সের মনও সংসারেব কাছ থেকে একটা মিষ্টি হাসি পাওয়ার জন্য বড়োই বিচলিত হয়ে উঠলো। এই গলির ঐ ঘরেতে সনাতনবাবুর আমন্ত্রণে একদিন একটু পিঠে আর পায়েস খেতে এসে মনে মনে ঠিক কবে ফেললেন তিনি। সনাতনবাবুকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করতেই হবে। স্বজাতের এক গরীবেব এত সুন্দবী একটি মেয়ে এইভাবে পড়ে আছে এই গলির অন্ধকাবে, ভাবতেও কষ্ট হয়েছিল নৈহাটির সেই কাপড়-বেচা আর বেশ কিছু টাকা-পয়সাঅলা মানুষটিব মনে। মেয়ের বাপ সনাতনকে নগদ পাঁচশো টাকা দিয়ে এবং দানসামগ্রীর জন্য আব কিছু দিয়ে, আব মেয়েব জন্য দশভবি সোনার অলঙ্কার দিয়ে সনাতনের সম্মতি ও একটা শুভদিন স্থির করে ফেললেন নৈহাটির গণেশ বস্ত্রালয়ের এই মালিক। বেচারা! সুন্দরী সুধার ঘোমটা ঢাকা মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে ধন্য হয়ে এবং সুধাকে নিয়ে এক সকালে এই গলির ঐ ঘর থেকে বিদায় নিলেন যে মানুষটি, তিনিই আজ পুলিসের সঙ্গে এসে দাঁড়িয়ে আছেন এ ঘরের দবজাব কাছে! বিয়েব দিন সাতেক পরে সনাতন নিজে নৈহাটিতে গিয়ে সুধাকে নিয়ে ফিরে এসেছিল এই বাসাতেই। তারপর আর ক'দিন যে এখানে ওবা ছিল, তা ঠিক কেউ বলতে পারে না! চিঠি দিয়েও কোনো খবর না পেয়ে, এবং নিজে এসে ঘরের দরজা বন্ধ দেখতে পেয়ে একদিন চমকে উঠলেন গণেশ বস্ত্রালয়ের মালিক। পুলিশে খবর দেওয়া হলো, এবং পুলিশ এখন বলছে, হ্যাঁ, এই নিয়ে তৃতীয়বার, এইভাবেই আরও দুবার ঐ বাপ তার ঐ মেয়ের বিয়ে দিয়েছে, আর বিয়ের ক'দিন পরেই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে বাপ ও মেয়ে দুজনেই। ওদের আসল নামও জানে না পুলিস।

তারকেশ্বরে ওরা ছিল ব্রাহ্মণ এবং বসিরহাটে কায়স্থ। ভাটপাড়ায় এসে হয়েছে বৈদ্য। তারকেশ্বরের কেসটা হলো, প্রসন্ন চক্রবর্তী নামে এক বাপ এবং সুনয়না নামে তাঁর এক মেয়ের জোচ্চুরি। বসিরহাটের কেসটা হলো, সদানন্দ ঘোষ নামে এক বাপ আর মাধবী নামে এক মেয়ের জোচ্চুরির কেস। আর এখন ভাটপাড়ার এই গলিতে তারাই সনাতন সেন আর সুধা সেন নামে অদ্ভুত এক বাপ এবং অদ্ভুত এক মেয়ের এক জোচ্চুরির স্মৃতিটুকু শুধু রেখে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। তিনজন নিরীহ ও বিশ্বাসী মানুষের জীবনকে মিথ্যা বাসরঘর আর ভুয়া ফুলশয্যা দিয়ে নির্মমভাবে ঠকিয়ে এই পৃথিবীর জনতার ভিড়ের মধ্যে এখন কে

জানে কোথায় লুকিয়ে পড়েছে এক অদ্ভুত ঠগ আর এক অদ্ভুত ঠগিনী মেয়ে। যেমন বাপ তার তেমনই মেয়ে। এবং যেমন মেয়ে তেমনই তার বাপ।

ভাটপাড়ার গলি থেকে চিন্তা করতে করতে ফিরে যায় পুলিস। পাড়ার লোকেরা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকে। আর, গণেশ বস্ত্রালয়ের মালিক একটা হাসি-হাসি শান্ত ও সুন্দর মুখ কল্পনায় দেখতে পেয়ে দুঃখে ও বিস্ময়ে শিউরে ওঠেন। — উঃ, এরকম করেও মানুষ ঠকাতে পারে মানুষকে!

ভাটপাড়ার গলি জানে না, পুলিসও অনুমান করতে পারে না, আর গণেশ বস্ত্রালয়ের মালিকের মনও কল্পনা করতে পাবে না যে, ঠিক সেই মুহূর্তে রানাঘাটের এক পল্লীর এক ক্ষুদ্র গৃহের জানালার দিকে তাকিয়ে এইভাবে নিজের ভাগ্যকে এক নিষ্ঠুর ছলনাব জালে সমর্পণ করবার জন্য হাসছে আব একটা মানুষের চোখ! বিজয়বাবু নামে এক ভদ্রলোকের করবী নামে এক তরুণী কন্যা কথা বলছে বমেশ নামে এক যুবকেব সঙ্গে।

জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ঘরেব ভিতর থেকে করবী অভিমানের সুরে আস্তে আস্তে বলে আপনি কেন বারবার আসেন?

রমেশ উৎফুল্লভাবে হাসতে থাকে। এক জ্যোতিষী আমার হাত দেখে কি বলেছে জান? যে মেয়ে আমার বউ হবে, তাব নামের প্রথম অক্ষব হলো 'ক'।

কববীও হাসে—কিন্তু বুঝতে পারেন না কেন, এরকম কবে শুধু রোজই এসে জানালার কাছে দাড়িযে থাকলে আমাব শুধু দুর্নাম হবে, আর কিছুই হবে না।

সাইকেলের গায়ে হেলান দিয়ে পথের উপর দাঁড়িয়ে বমেশ বলে — আমি যে না এসে পাবছি না করবী। যেদিন তুমি প্রথম তাকিয়েছ আমার দিকে, সেদিনই বুঝেছি যে তুমিই আমার শান্তি আব সুখ।

কববী— এ আপনাব বড়োলোকী খেযাল। এখন আসতে ভালো লাগছে, কিন্তু আর ক'দিন পরে এদিকের কথা ভুলেও মনে পড়বে না, আসতে ভালোও লাগবে না, আর আসবেনও তবে কেন মিছামিছি..।

বমেশ বলে — আমি বড়োলোক নই, বড়োলোকী খেয়ালও আমাব নেই। আমি তোমাকে দেখতে আসি প্রাণের দাযে। এটা আমার খেয়াল নয় কববী।

কববী — আপনি মোটেই না।

বমেশ — মোটেই না।

করবী — কি করেন আপনি?

রমেশ — আমি আর্টিস্ট।

করবী — তার মানে?

রমেশ — কলকাতায় তুমি ছিলেন কখনো?

করবী — হ্যাঁ, ছিলাম কিছুদিন।

রমেশ — সিনেমা ছবি দেখেছ কখনো?

করবী — দু-একটা দেখেছি।

রমেশ — সিনেমা হাউসের দেয়ালে আঁকা বড়ো বড়ো রঙীন ছবিগুলি চোখে পড়েছে কখনো?

করবী — হ্যাঁ।

রমেশ — ঐ ছবি আমি আঁকি।

করবী — তার জন্য কি টাকা-পয়সা পান?

রমেশ — নিশ্চয়। ঐ তো আমার রোজগার। আর ভগবানের আশীর্বাদে একরকম মন্দ নয় আমার রোজগার।

করবী — মাসে পঞ্চাশ টাকা হয়?

রমেশ হাসে — তা হয় বৈকি।

করবী — ঠিক কত হয় বলুন না?

রমেশ — যাই হোক না কেন, তাতে তোমাকে সুখে রাখতে পারবো।

করবী মুখ ভার করে বলে — হ্যাঁ, কাঙালের মেয়েকে সুখী করতে বছরে একজোড়া শাড়ি আর রোজ একবেলা দুমুঠো ভাত দরকার, তার বেশি আর কিছু দরকার হয় না।

রমেশ বিব্রতভাবে বলে — তা কেন হবে? আমি কি বছরে একজোড়া ধুতি পরি, না রোজ একবেলা দুমুঠো ভাত খাই?

করবী হাসে — তাহলে বলুন, আপনার টাকা আছে।

রমেশ — তোমাকে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখবার মতো, তোমাকে কষ্ট না দেবার মতো টাকা আছে বৈকি। তবে .... ঐ ওরকম নয়।

দূরে এক মারোয়াড়ী ধনিকের প্রকাণ্ড একটা বাড়ির দিকে হাত তুলে রমেশ বলে — ওরকম বড়োলোক আমি নই, তুমিও নও করবী; কাজেই........।

করবী — বিয়ের খরচ আসবে কোথা থেকে?

রমেশ কিছুক্ষণ চুপ করে কি ভাবে। তারপর একটু হতাশ ভাবে বলে, বিজয়বাবুর কি একেবারে কিছুই নেই?

ছলছল করে করবীর দুই চোখ। থাকলে কি আর... ...।

রমেশ — কত টাকা লাগতে পারে?

করবী — আমি তো জানি, ভদ্রলোকের মেয়ের বিয়ে নমো নমো করেও সারতে হলে অন্তত দু হাজার টাকা লাগে।

রমেশ বিস্মিত হয়। — দু হাজার!

করবীর চোখের কোণে একটা সন্দেহভরা বিরক্তিব ভাব তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে — কি ভাবছেন? পারবেন না এই সামান্য দু হাজার টাকা যোগাড় করতে?

রমেশ বিষণ্ণভাবে বলে — পারি, তবে তাড়াতাড়ি যোগাড় কবতে হলে নানা জায়গা থেকে দুশো-একশো করে ধার করা ছাড়া উপায় নেই।

করবী — তাহলে ধার করুন। ধার একদিন শোধ কবতেও পারবেন। কিন্তু দেরি করলে......।

বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে যায় করবী। আবার ছলছল করে দুই চোখ।

রমেশ বলে — কি হলো?

করবী — সত্যিই কি ভালোবাস আমাকে?

রমেশ — হ্যাঁ করবী।

করবী — তবে একটু তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা কর, যদি না কর তবে বোধহয় আমাকে মরতেই হবে।

বিচলিত হয় রমেশ — এ কি কথা বলছো?

করবী — হ্যাঁ, বদ্যিবাটির এক দোজবরে বুড়োর সঙ্গে আমার বিয়ের কথা প্রায় ঠিক হয়ে গিয়েছে। বিয়ের খরচের জন্য তিন হাজার টাকা বাবাকে দিতে চেয়েছেন বদ্যিবাটির ভদ্রলোক।

রমেশ তার সাইকেলের হ্যাণ্ডেল শক্ত করে ধরে। চোখ আর মুখ যেন হঠাৎ এক প্রতিজ্ঞায় শক্ত হয়ে ওঠে। করবীর মুখের দিকে তাকিয়ে রমেশ বলে — কখনো হতে দেব না করবী। বিজয়াবাবুকে তুমি বারণ করে দাও, যেন বুড়োর টাকা স্পর্শ না করেন।

সাইকেলের প্যাডেলে পা দিয়ে রমেশ প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে — আমি কথা দিচ্ছি করবী। বিয়ের সব খরচ আমার। দশ দিনের মধ্যে তোমাকে বিয়ে করে আমার কাছে নিয়ে যাব।

চলে যায় রমেশ।

ছোট একটি উৎসব হয়ে গেল রানাঘাটের সেই পাড়ার সেই ক্ষুদ্র গৃহের আঙ্গিনায়। পাড়ার লোক তো এই ক' দিনের মধ্যে মুগ্ধ হয়েই গিয়েছিল বিজয়বাবু নামে নবাগন্তুক এই গরীব ভদ্রলোক আর করবী নামে তাঁর শান্ত ও সুন্দর মেয়েটির ব্যবহারে। খাওয়া দাওয়ার সামান্য একটু ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন বিজয়বাবু, কিন্তু পাড়ার ভদ্রলোকেরা বাধা দিয়েছেন বিজয়বাবুকে। — মিথ্যে এসব বাজে খরচ করার কোনো দরকার নেই মশাই। আপনার মতো অবস্থার লোকের পক্ষে এসব খরচ একেবারে একটা অন্যায় খরচ।

শুধু দেড়হাজাব টাকাব অলঙ্কারে মেয়েকে সাজিয়ে দিয়ে এবং অন্য খরচের কাজ নমো নমো কবে সেরে দিয়ে শুভকাজ সম্পূর্ণ করলেন বিজয়বাবু। পাড়ার লোক জানলো. ভদ্রলোকের জীবনেব যা-কিছু পুঁজি জমানো ছিল সব খরচ কবে মেয়েকে সোনাব অলঙ্কারে সাজিয়ে দিয়েছেন। এতটা কববার কোনো দরকার ছিল না, কারণ পাত্রপক্ষ থেকে এতটা দাবিও ছিল না। যাই হোক, একটি মাত্র সন্তান, ঐ এক মেয়ে, এবং এই তো ভদ্রলোকেব জীবনের একটি মাত্র দায তাই সেই দায় পালন করতে গিয়ে ভদ্রলোক নিজেকে ভিখিবী কবে দিলেন। মেয়েকে বড়ো ভালোবাসেন বিজয়বাবু।

বমেশের দেওযা টাকা দিয়ে কেনা অলঙ্কারে সেজে নিয়ে রমেশেব সঙ্গে চললো রমেশেব পরিণীতা করবী। মেয়ে বিদায়ের সময় সেই রকমই করুণ হয়ে জেগে উঠলো সেই দৃশ্য, যে দৃশ্য একবাব তারকেশ্বর, একবার বসিরহাট আব একবাব ভাটপাড়ার এক-একটি পাড়াব চোখ করুণ করে দিয়েছে। ডুকবে কেঁদে ওঠেন বিজয়বাবু এবং ফুঁপিযে কাঁদে কববী।

রানাঘাটের একটি পাড়ার অনেক মানুষের চোখ করুণ কবে দিয়ে স্বামীব সঙ্গে স্বামীব ঘরেব উদ্দেশে বওনা হযে গেল কববী। আর সেইদিনই সন্ধ্যায় কলকাতাব বাগবাজারেব এক গলিতে একটি এক-ঘবে বাসার ভিতরে এসে দাঁড়ালো রমেশের নববিবাহিত বধূ।

তার দুদিন পরেই বাগবাজাবের গলিতে ক্ষুদ্র সেই বাসার বক্ষে উৎসবের বাতি জ্বলে সারারাত। বউভাত আর ফুলশয্যা। উৎসবে সমারোহ নেই, কিন্তু হাসি আর কলরবের সমারোহ আছে। রমেশের আপন বলতে এই পৃথিবীতে যারা আছে, তাদেরই কয়েকজন এসে রমেশের জীবনের এই উৎসবের সকল কাজের ভার নিয়েছে। এসেছেন এক মাসী এবং তাঁর তিন মেয়ে। এলেন এক খুড়ো তাঁর দশটি ছেলে-মেয়ে নিয়ে। রমেশের দুই বন্ধুর মা আর এক বন্ধুর স্ত্রীও এলেন। বউ দেখে খুশি হলেন সবাই। একটি রাত ও একটি সকাল-বেলাকে ব্যস্ততায়, মুখরতায় এবং হাসাহাসি ও হাঁকডাকে ভরে দিয়ে যখন চলে গেলেন সকলে, তখন বিকালের রোদ ঘরের জানালায় এসে লুটিয়ে পড়েছে। ঘরের মধ্যে নববধূ এতক্ষণে জোরে একটা হাঁফ ছাড়ে; মাথার কাপড় নামিয়ে দিয়ে তার বড়ো বড়ো কাজল-পরা চোখ ঘুরিয়ে ঘরের চারদিকে তাকায়, আর রমেশ তাকিয়ে থাকে তার করবীর মুখের দিকে।

রমেশ বলে — আমি পটের ওপর তোমার একটা ছবি আঁকবো করবী। দুদিনেই শেষ করে ফেলবো, তারপর স্বচক্ষে দেখে বুঝবে, আমার এই হাতে আমি কি করতে পারি।

করবী উৎসুক ভাবে তাকায়। — বুঝতে পারছি না, কি বলছো।

রমেশ — তোমার চোখ দুটিকে একেবারে জীবন্ত করে তুলবো ছবিতে।

করবী — করে রাখ, আমি ফিরে এসে দেখবো।

রমেশ আশ্চর্য হয় — কোথায় যাবে তুমি?

করবী — বাবার কাছে।

রমেশ — তা তো যাবেই, কিন্তু আজ-কালের মধ্যে তো যাচ্ছ না।

করবী — যেতে চাই না, তবে বাবা যদি এসে পড়েন, না যেয়ে পাববো না।

রমেশ — তোমার বাবার আসবার কথা আছে নাকি?

করবী — আমার মনে হয়, কাল সকালেই এসে পড়বেন।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে করবী —। তারপর হঠাৎ যেন একটা দুঃসহ বেদনায় ছটফট কবে ওঠে। — উঃ বাবার কথা মনে পড়লে আর কিছু ভালো লাগে না। বোধহয় এখনো কাঁদছেন।

সান্ত্বনার সুরে রমেশ বলে — আশ্চর্য নয়, তুমিই তো তাঁর একমাত্র সন্তান। তোমার বাবার কষ্ট আমি বুঝতে পারি করবী। কিন্তু.... দেখা যাক্, আসুন তো তোমার বাবা, তাবপর আমিই তাঁকে বুঝিয়ে বলবো।

করবী — কি বলবে তুমি?

রমেশ — মাস খানেক পবে তুমি যাবে, তার আগে যেন তোমাকে নিয়ে যাবার পীড়াপীড়ি না করেন।

করবী — বাবা বোধহয় রাজি হবেন না। আর আমিও বলি, তুমি আপত্তি করো না, বাবার মনে দুঃখু দিও না।

রমেশ বিষণ্ণভাবে হাসে — কিন্তু আমার মনের দুঃখ কি উনি বুঝবেন না?

করবী — তোমার মনে আবার কিসের দুঃখ?

রমেশ — তোমার বাবা যদি কাল আসেন, আব তুমি যদি তাঁব সঙ্গে চলে যাও, তবে আমার....আমার যে বড্ড খারাপ লাগবে করবী।

রমেশের মুখের দিকে কাজল-পরা বড়ো বড়ো চোখের দৃষ্টি একটু তীব্র করে দেখতে থাকে করবী।

রমেশ বলে — যদি তুমি যাও, তবে আমিও তো তোমার সঙ্গে যাব। রানাঘাটে কদিন থেকে তারপর আবার তোমাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসবো।

করবী বলে — ছিঃ, তোমার একটুও মান-সম্মান জ্ঞান নেই? যেতে না বললে শ্বশুর-বাড়িতে কখনো যায় মানুষ?

রমেশ — তোমার বাবা কি আমাকেও সঙ্গে যেতে বলবেন না?

করবী — না।

রমেশ — কেন?

করবী আমতা-আমতা করে। — কে জানে কেন?

রমেশ— কিন্তু, তুমিই তো বাবাকে বলতে পার।

করবী — কী বলবো?

রমেশ — আমাকেও যেন সঙ্গে যেতে বলেন।

করবী — ছিঃ, আমাকে কি একেবারে একটা বেহায়া মনে করেছ? মেয়ে হয়ে বাপকে ও-কথা বলা যায়? কী বিচ্ছিরি লজ্জার কথা।

চুপ করে থাকে রমেশ। করবী বলে — তুমি গম্ভীর হলে কেন? কোনো সন্দেহ হচ্ছে নাকি?

রমেশ — সন্দেহ? সন্দেহ আবার কিসের?

করবী — বোধহয় সন্দেহ হচ্ছে যে তোমার জন্য আমাব মনে কোনো টান নেই।

রমেশ — আমার জন্য তোমার মনের কোন টান নেই, এ-সন্দেহ হবার আগে আমি মরেই যাব।

করবীর চোখ দুটো হঠাৎ কেঁপে ওঠে, বোধহয় ওর বুকের ভিতরে অদ্ভুত একটা ভয় ছটফট করে উঠেছে। আস্তে আস্তে, যেন একটু হাঁসফাঁস করে বলতে থাকে কববী — তুমি মরবে কেন? তার চেয়ে বরং আমিই মরে যাব, আর তুমি এই ঘরে নতুন বউ নিয়ে একদিন আমার কথা গল্প করবে আর হাসবে।

রমেশ — এ রকম ভয়ানক কথা ঠাট্টা করেও বলতে নেই করবী।

করবী হাসে — ভাগ্যমানের বউ মরে।

রমেশ — মিথ্যে কথা।

বমেশও হাসতে-হাসতে কাছে এগিয়ে এসে করবীর হাত ধরে — এরকম বউ কারও হয় না।

চমকে ওঠে করবী। রমেশ হাসতে-হাসতে বলে — এরকম বউ যদি মরে যায়, তবে সে অভাগা স্বামীরও বেঁচে থেকে লাভ নেই।

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে অন্যদিকে তাকায় করবী। তারপব উঠে গিয়ে খাটের এক কোণে জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকে। যেন রমেশের মুখের দিকে তাকাতে চায় না, আর রমেশের ঐ চোখের কাছে নিজের মুখটাকেও আর দেখাতে চায় না করবী।

সন্ধ্যা হয়ে আসে। করবী হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে বলে — তুমি কি আজ খাবে না, আর আমাকেও খেতে দেবে না বলে ঠিক করেছ?

বমেশ — তাব মানে?

করবী — বাইরে থেকে খাবার টাবাব কিনে আনবার গরজ দেখছি না, অথচ আমাকে রান্না-বান্না করতেও বলছো না।

উত্তর দিতে গিয়ে রমেশের গলাব স্বরে একটা আনন্দ যেন লাফ দিয়ে ওঠে — তুমি রাঁধবে?

করবী — হ্যাঁ, এই একটা রাত্রি তো। একটু খেটে যাই তোমাব ঘরে।

হাসতে থাকে করবী। বমেশ হেসে হেসে বলে — এতক্ষণ ধরে এই কথাটা বলবার জন্য আমার মনটা ছটফট করছিল।

করবী — কি কথা?

রমেশ — এতদিন ধবে হোটেলের বান্না খেয়ে আসছি, কিন্তু আজ তুমি ঘরে থাকতে হোটেলের থেকে খাবার আনতে একটুও ইচ্ছে হচ্ছিল না।

করবী — আমার হাতের রান্না খাবার জন্য এতই লোভ হয়েছে তোমার?

রমেশ — হয়েছে বৈকি।

করবী যেন অন্যমনস্কের মতো অন্যদিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলে ফেলে — কিন্তু এ-বকম লোভ না করলেই ভালো করতে।

রমেশ — চিরকাল এই লোভ করবো।

তারপর আর দেরি হয় না। বাগবাজারের গলিতে ক্ষুদ্র এক ঘরের ভিতর থেকে কয়লা-পোড়া ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে সন্ধ্যার বাতাসে। এক নববধূর হাতে ঐ ঘরের ভিতরে নতুন এক গেরস্থালীর আনন্দ খুট-খাট আর টুং-টাং শব্দ করে বাজতে থাকে থালা-বাসনের আর হাতা-খুন্তি ও হাঁড়ি-কুঁড়ির গায়ে গায়ে। নতুন শাড়ির আঁচল কোমরে জড়ায়, হলুদ-

মাখা হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের উপর থেকে এলো-মেলো ও ফুর্‌ফুরে চুলের উপদ্রব ঠেলে সিঁথির দুপাশে সরিয়ে দেয়, কাজ করে এক নতুন গৃহিণী।

রান্না শেষ হয়ে গেল। ঘরের মেজেতে আসন পাতে করবী। খেতে বসে রমেশ।

আসনের উপর বসে করবীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে রমেশ। কি যেন বলতে চায় রমেশ। কি-কথা যেন তৃষ্ণার্ত হয়ে ছটফট করছে রমেশের মনের মধ্যে।

করবী বলে — খেতে বসে আবার এত গম্ভীর হয়ে গেলে কেন?

রমেশ বলে — একটি কথা বলবো?

করবী — বল।

রমেশ — একা খেতে ইচ্ছে করছে না।

করবী — তার মানে?

রমেশ — তুমিও এস, এক-থালাতে দুজনে এক সঙ্গে খাই। আবার চমকে ওঠে করবী, কিন্তু কোনো কথা বলতে না পেরে শুধু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

রমেশই উঠে দাঁড়ায়। হেসে-হেসে অথচ বেশ শক্ত করে করবীর হাত ধরে করবীকে আসনের কাছে বসিয়ে দিয়ে রমেশ বলে — এরপর তো কাজের তাড়ায় কত সুযোগ নষ্ট হয়ে যাবে, তোমার সঙ্গে বসে এক থালাতে এভাবে খাওয়ার আনন্দ জীবনে আর কদিন পাব কে জানে?

খেতে বসে করবী। রমেশ ও করবী এক সঙ্গে থালার উপর হাত চালিয়ে গরম ভাতেব ছোট একটি স্তবক ভাঙে। যেন জীবনেব নতুন একটা ব্রত খেলছে রমেশ ও তাব ভালোবেসে বিয়ে-করা সঙ্গিনী।

খেতে-খেতে কেমন যেন কান্না-ধবা গলায় প্রশ্ন করে করবী — তোমাকে খুব খাটতে হয় বুঝি?

রমেশ — নিশ্চয়। কাজ তো কাউকে দয়ামায়া করে না। জ্বর গায়ে কতদিন কাজ করতে ছুটেছি।

করবী — এত খাটতে হয় কেন?

রমেশ — পেটের জন্য।

কববী — কত রোজগার কর?

রমেশ — কোনো মাসে পঞ্চাশ, কোনো মাসে একশো, কোনো মাসে কিছুই নয়।

করবী — তার উপর আমি এক নতুন দায় জুটেছি, এবার তাহলে তুমি খেটে-খেটে পাগল হয়ে যাবে বোধহয়।

রমেশ — মোটেই না, এবার থেকে মনের সুখে আরও বেশি খাটতে পারবো।

করবী — তুমি অনেক টাকা ধারও তো করেছ?

রমেশ হেসে-হেসে সেই ধারের ভার যেন তুচ্ছ করে উড়িয়ে দিতে চায়। দুটি বছর জোর খেটে সে ধার শোধ করে দেব। তারজন্য কোনো পরোয়া করি না।

করবীর মাথাটা হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে। হাত থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে করবী। রমেশ প্রশ্ন করে। — কি হলো, তুমি খাচ্ছ না যে?

করবীর স্তব্ধ হাতটার দিকে তাকিয়ে থাকে রমেশ। তারপরে অদ্ভুত এক ব্যাপার দেখে আর্তনাদ করে ওঠে। — এ কি করবী?

টপ্ করে এক ফোঁটা জল ঝরে পড়েছে করবীর হেঁট মাথায় ছায়ায় লুকানো দুটি চোখ থেকে, করবীরই হাতের উপর।

হাত ধুয়ে উঠে দাঁড়ায় করবী। কোমরে জড়ানো আঁচল আলগা করে নিয়ে চোখ মোছে। তারপরেই বলে — শোন।

রমেশ — বল।
করবী — তুমি বাঁচতে চাও?
রমেশ — এ-কথার মানে কি করবী?
করবী — যদি বাঁচতে চাও তবে এখুনি পুলিশ ডেকে আমাকে ধরিয়ে দাও।
রমেশের চোখ থরথর করে কাঁপে — এ-কথারই বা মানে কি করবী?
করবী — আমি তোমাকে ঠকাতে এসেছি। আমি তোমার স্ব-জাত নই, আমি করবী নই, আমি কুমারী নই। .....আমি হলাম....।
চেঁচিয়ে ওঠে করবী। — আমি এক ভয়ঙ্কর বাপের ভয়ঙ্কর মেয়ে। আমি তোমার ঘর করতে তোমার কাছে আসি নি, পালিয়ে যাবার জন্যই এসেছি।
যেন থিয়েটারের একটা মেয়ে, মিথ্যে একটা ঢং ধরেছে। মজা করার জন্য আর ঠাট্টা করে মিছামিছি রমেশকে ভয় পাইয়ে দিতে চাইছে। রাজকুমারীর সাজ সেজে এক মায়াবিনী ডাকিনী একটা রাজাকে ঠিক এই রকমই ঢং ধরে বেহায়ার মতো কতগুলি ভয়ঙ্কর কথা বলে পালিয়ে গেল, কি-যেন সেই হতভাগা রাজাটার নামটা মনে করতে পারে না রমেশ, থিয়েটারের সেই নাটকটার নামও মনে পড়ে না।
তবু ভয় পায় রমেশ। চুপ করে যেন মৃত্যুর বার্তা শুনছে রমেশ। করবীর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করে রমেশ, সত্যই এই মুখ কি এক ভয়ঙ্কর ঠগিনীর মুখ হতে পাবে।
করবী বলে — আমি জানি, তুমি পুলিস ডেকে আমাকে ধরিয়ে দিতে পারবে না। তুমি এত বোকা আর এত দুর্বল।
গায়ের সব গহনা এক-এক করে খুলে মেজেব উপর রাখে করবী।
— এই নাও, তোমার অন্তত দেড় হাজার টাকা বাঁচলো। এইবার আমাকে চুপচাপ চলে যেতে দাও।
বমেশ — কোথায় যাবে তুমি?
উত্তর দেয় না করবী।
রমেশ কঠোর-স্বরে চিৎকার করে। — ভযঙ্কর বাপের কাছেই ফিরে যেতে চাও?
উত্তর দেয় না কববী।
রমেশ প্রশ্ন করে — আমার কথার উত্তর দাও করবী।
চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠে করবী — তুমি বলো, তুমি আমাকে যেতে দিতে চাও না।
শান্ত হয়ে কিছুক্ষণ ভাবতে থাকে রমেশ। তারপর ছলছল চোখ নিয়ে করবীর হাত ধরে। —যেতে দিতে ইচ্ছে করে না।
করবী — তবে শোন।
রমেশ — কোথায় যাবে?
করবী — তুমি যেখানে নিয়ে যাবে আর যেখানে রাখবে।
আর দেরি করে না রমেশ। সেই রাত্রেই শূন্য হয়ে গেল বাগবাজারের গলির ক্ষুদ্র একটি বাসা। ঠগের মেয়ে ঠগিনী জীবনে শেষবারের মতো পৃথিবীর একটি পাড়াকে শুধু ভাবিয়ে দিয়ে সরে পড়লো তার স্বামীর সঙ্গে।
ঠকিয়ে গেল শুধু একজনকে। রানাঘাট থেকে এক বিজয়বাবু এসে পরদিন সকালে যখন বাগবাজারের গলিতে এসে দাঁড়ালেন, তখন দেখে অবাক হয়ে গেলেন, সেই ঘরের দরজায় তালা ঝুলছে। নিরেট কঠিন ও নিষ্ঠুর একটা তালা। দরজার ফাঁকে উঁকি দিয়ে দেখলেন বিজয়বাবু ঘরের ভিতরটাও শূন্য। কি ভয়ানক একটা শূন্যতা!
কিন্তু বেশিক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে হয় নি। পুলিস এসে হাত চেপে ধরতেই চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলো বিজয়বাবু নামে লোকটা। — ইস্, মেয়ে হয়ে বাপকে কি এমন করে ঠকাতে হয় রে ঠগিনী।

সুরের মায়া

আশালতা সিংহ

মাঘ মাসের শেষে যে এমন সৃষ্টিছাড়া বৃষ্টি হয়, তাহা কস্মিন্‌কালেও জানা ছিল না। বরদাসুন্দরী দেবী আজ তিন চারি দিন কোথাও বাহির হইতে পান নাই। তাঁহার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া উঠিয়াছে। শেষে আর থাকিতে পারিলেন না, ড্রাইভারকে ডাকিয়া গাড়ীখানা বাহির করিতে আদেশ দিয়া ফেলিলেন। বেশী দূর না হয়, একবার মালতীর ওখান হইতে ঘুরিয়া আসিবেন। সন্ধ্যার দিকে তখন সামান্য ক্ষণের জন্য বৃষ্টিটা ধরিয়াছিল। আকাশ কিন্তু মেঘাবৃত হইয়াই ছিল, থাকিয়া থাকিয়া দম্‌কা বাতাস দিতেছিল। দামী গাড়ী লেশমাত্র শব্দ না করিয়া নিস্তরঙ্গ অবাধগতিতে পথে যাইতেছিল, বরদাসুন্দবী উৎসুক হইয়া ভাবিতেছিলেন, আজ মালতীর কাছ হইতে কৌশলে জানিয়া লইবেন, তাহার মেয়ে অশোকার কোর্টশীপ্ কত দূব। পরের হাঁড়ীব খবর লইবার কল্পনামাত্রই তাঁহার অবসাদগ্রস্ত মনকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিল। মালতীদের বাড়ীব গেটের সম্মুখে গাড়ী থামিল। বাগানের আইভিলতা ও রজনীগন্ধা গাছগুলির উপর বৃষ্টিবিন্দু ঝলমল করিতেছে। একটি সজল সুঘ্রাণ উঠিতেছে। গেটেব কাছে খুব উজ্জ্বল একটা বিজলীবাতি জ্বলিতেছে। মোটর হইতে নামিযা ববদাসুন্দরী ভিতবে প্রবেশ করিলেন। সম্মুখের হলঘরে পর্দা ফেলা। নেটের পর্দাব স্বচ্ছ আববণ ভেদ করিয়া ভিতরেব নীলাভ আলো বিচ্ছুরিত হইতেছে। এস্রাজের সুরের সহিত সুব মিলাইয়া কে গাহিতেছে —

"আবার শ্রাবণ হয়ে এলে ফিবে
মেঘ-আঁচলে নিলে ঘিবে।"

বরদাসুন্দরী যদিও কোনো কালে সুর-রসিক নহেন, তথাপি মেঘাবৃত আকাশ এবং সজল বাতাসের সহিত মিশ্রিত হইয়া মেঘ-মল্লাবেব করুণ সুব তাঁহাব মন্দ লাগিল না। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে তিনি মনে মনে কহিলেন "না, অশোকা মেয়েটা গান বেশ গায়। গলাটা মিষ্টি।"

মালতী — তাঁহার সখী এবং এ বাড়ীর গৃহিণী তখন জানালার কাছে একটা চেযারে বসিযা উলের সোয়েটার বুনিতেছিলেন।

পরস্পরের স্বাগত সম্ভাষণ শেষ হইবার পর বরদাসুন্দরী কহিলেন, "তোমার ভাই অধ্যবসায় খুব। আমি তো মোটে উল কাঁটা নিয়ে অতক্ষণ বস্‌তে পারিনে। সেদিন অনাথসদন থেকে দিতে এসেছিল। তারা বলে, আপনার অবসর সময়ে সোযেটার, জাম্পার, স্কার্ফ এই সব বুনে দিন আমরা বিক্রি করে লাভটা অনাথসদনে দিই। তা আমার ভাই অত ধৈর্য্য নেই। বসে বসে এক-মনে ঘর গুনে গুনে বুনে যাও, অত পারিনে।"

মালতী ক্ষীণ হাস্যে কহিলেন, "এগুলো অনাথসদনেরই বুনছি। কি কববো, মানুষে যখন চিন্তা করে, তখন হাতে একটা লোকদেখানো কাজ চাই। সেটার আড়ালে আত্মগোপন কবা যায়।"

বরদাসুন্দরী চাপিয়া বসিলেন, "কিসের এত চিন্তা, ভাই তোমার? একটি তো মোটে মেয়ে। মেয়ে সুন্দরী, গুণবতী। অমন গলা — অমন লেখাপড়া!"

প্রত্যুত্তরে মালতী কিছু বলিলেন না। শুধু একটুখানি ম্লান হাস্যে তাঁহার নিঃশব্দ অধরোষ্ঠ রঞ্জিত হইল। আঙ্গুলগুলি নিপুণতায় উল এবং কাঁটা লইয়া যেন খেলা করিয়া গেল। খোলা জানালা দিয়া অশোকার গানের কথাগুলি সুরসহযোগে ভাসিয়া আসিতেছিল —

"আবার শ্রাবণ হয়ে এলে ফিরে
মেঘ-আঁচল নিলে ঘিরে।
সূর্য্য হারায় হারায় তারা।
আঁধারে পথ হয় যে হারা।
ঢেউ দিয়েছে নদীর নীরে" ....

সহসা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া মালতী কহিলেন, 'না এর চেয়ে সেকেলে হিঁদু-বাড়ীর যে প্রথা— ঘটক এলো, বরের সন্ধান দিলে, সব দিক দেখে-শুনে ভালো দেখে মা একটা বেছে বিয়ে দিয়ে দিলে নিশ্চিন্দি। সে ঢের ভাল। আর আমাদের যেন হয়েছে সংশয়ের বেড়াবন্ধনের মধ্যে বাস। বুঝবার অহঙ্কার করি, অথচ কিছুই বুঝে উঠতে পারিনে।"

বরদাসুন্দরী জিজ্ঞাসুভাবে তাহার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া ব্যাপারটা নিজে সম্যকরূপে বুঝিবার চেষ্টা করিয়া অবশেষে বলিলেন, "কেন কি হয়েছে? অজিতকে কি অশোকার পছন্দ হয়নি? আমরা তো প্রতিদিন আশা করছি কবে অজিত আর অশোকার বাক্‌দান উৎসবে যোগ দেব।"

মালতীর ইচ্ছা ছিল না বরদাসুন্দরীর কাছে কোনো কথা বলেন। কারণ, তাহার কাছে কোনো কথা বলা মানেই গোটা সহরটিতে অচিরাৎ সে খবর রাষ্ট্র হওয়া। কিন্তু ঝোঁকের মাথায় একবার যখন বলিতে শুরু করিয়াছেন, থামিতে পারিলেন না। বলিলেন, "সেই তো ঠিক হয়ে আছে। কিন্তু সভ্য সমাজের অতিসভ্য বিধান — ছেলে মেয়েরা পরস্পরের মত জানাবে। ওরা কিন্তু হাঁ বলে না, না-ও বলে না। একটা অনিশ্চিত উদ্বেগের মধ্যে দিনগুলো কেটে যাচ্ছে। কিছুই ধরা-ছোঁওয়া যাচ্ছে না। ভারি অশান্তিতে আছি।"

বরদাসুন্দরী একাধারে ভরসা ও আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "ও ঠিক হয়ে যাবে। যত দিন যাচ্ছে, মানুষের বুদ্ধি ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হচ্ছে কিনা। এই দেখ না, আমাদের সময়ে আমরা মোটামুটি যা বুঝতাম – যা ভাবতাম — যে কথার যে মানে ধরতাম, আমাদের ছেলেমেয়েরা তার চেয়ে অনেক বেশী বোঝে, অনেক ভাবে এবং অনেক রকম মানে বার করে। তা ভাবনা কিছু নেই। অশোকার যেমন সুন্দর এস্রাজে হাত আর যা মিষ্টি গলা, শীগ্‌গীর সব ঠিক হয়ে যাবে। অজিতের সামনে গান-টান করে তো?"

মালতী হাসিয়া বলিলেন, "তা করে বই কি। গান মাঝে মাঝে করে।"

অতঃপর আরও কিছুক্ষণ বসিয়া বরদাসুন্দরী বিদায় লইলেন। আজ যখন বাহির হইয়াছেন, আরও দুই-এক বাড়ী বেড়াইয়া খবরাখবর লইয়া ফিরিবেন। তিনি চলিয়া গেলেন, কিন্তু মালতী বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। বরদাসুন্দরী-কথিত স্থূল ও সূক্ষ্মের উপমাটি তাঁহার ভাবি মনে লাগিয়াছিল। মনে মনে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেন, ঐ কথাটার ভিতরেই সমস্ত সমস্যাটা নিহিত রহিয়াছে। আধুনিক ছেলেমেয়েরা একটা কথার এত রকম মানে বাহির করে এবং প্রত্যেকটি কথা চিরিয়া চুনিয়া বিশ্লেষণ করিয়া এমন একটা ব্যাপার করিয়া তুলে যে, নিজেদের মনের ভাব নিজেদের পক্ষে সঠিক করিয়া জানাও একটা বৃহৎ কাণ্ড হইয়া দাঁড়ায়।

তারপর ঐ গানের কথা। বরদাসুন্দরী তাড়াতাড়ি করিয়া যে প্রশ্ন করিলেন, অশোকা

অজিতের সামনে গান-টান গায় তো? ঐ প্রশ্নটা শুনিয়া প্রথমে হাসি পাইয়াছিল বটে, কিন্তু যখন নিজেরই অতীত জীবনের বিস্মৃত দিনগুলির কথা মনে পড়িয়া গেল, তখন হাসির পরিবর্ত্তে মুখে একটা গাঢ় তন্ময়তার ভাব ফুটিয়া উঠিল। খোলা জানালা দিয়া ঝড়ের রাতের এলোমেলো বাতাস আসিতেছে। বাতাসে আসন্ন বৃষ্টির আহ্বান-ধ্বনি। অলসশিথিল অঙ্গুলী হইতে উল এবং কাঁটাগুলি কখন স্খলিত হইয়া পড়িয়া গিয়াছে।

মালতীর নয়ন সম্মুখে তাঁহার অতীত দিনগুলি কত বৎসরের উজান ঠেলিয়া বাস্তব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ যেমন তাঁহার মেয়ে অশোকার মনের কথা জানিতে না পারিয়া তিনি ব্যাকুল হইয়াছেন, তেমনই এক দিন তাঁহার তরুণ মনেব রহস্যঘন আলো-ছায়ার খেলা বুঝিয়া উঠিতে না পারিয়া তাঁহার নিকটতম আত্মীয়-জনরা উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিল।

অশোকার বাবা কমলকৃষ্ণ চ্যাটার্জ্জি আজ যিনি রিটায়ার্ড সিভিলিয়ান, আপন লাইব্রেরীর কোণে এবং ক্লাবে বিলিয়ার্ড খেলিয়া দিনের অধিকাংশ সময় কাটান — এক দিন তিনি অভিমানী ভীরু লাজুক যুবক ছিলেন। তন্বী তরুণী মালতীকে দেখিয়া তাহার দিকে সমস্ত অস্তিত্ব তাঁহার প্রবল আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু লাজুক ভীরু প্রকৃতি। মনের কথা মুখে আনিতে দেয় না। অভিমান আসিয়া বাধা দেয় প্রতি পদে। যাহাকে জানাইবেন মনের কথা — সে যদি জানিতে না চায়, যদি তাহারও মনে অনুরূপ তরঙ্গ না উঠে, তবে সে লজ্জা রাখিবার যে জায়গা হইবে না। কথা বলিতে বলিতে চোখে জল আসিয়া পড়ে, সামান্য কিছু জিজ্ঞাসা করিতে হইলে গলার সুর কাঁপিয়া যায়, বিহ্বল মনেব অনেক ভাষা দুটি চোখের তারা ব্যক্ত করিয়া দেয়; কিন্তু তবু মুখ ফুটিয়া কিছু বলেন না, দু'জনে দেখা হয় চায়ের নিমন্ত্রণে। দেখা হয় সন্ধ্যার স্নিগ্ধতায় বাড়ীর বাগানে — যেখানে গ্রীষ্মের দিবাবসানে পারিবারিক মজলিস বসে। দেখা হয় টেনিস খেলার সঙ্গিরূপে। দেখা হয় আরও ছোট-খাট নানা ছলছুতায়। কিন্তু দু'জনেই দু'জনের সম্বন্ধে সমান আশঙ্কাধর্মী — সমান ভীরু। এদিকে আত্মীয়জনরা ক্রমে অধীর হইয়া উঠিতেছেন। ব্যবহারিক দিক দিয়া এ সম্বন্ধ তাঁহাদের কাছে একান্ত বাঞ্ছনীয় মনে হয়। তাই তাঁহারা নানা প্রকারে সুবিধা করিয়া দেন — দু'জনের একত্র নিভৃত আলাপনেব। তবু যদি তাহারা স্পষ্ট করিয়া কিছু বলে!

সে দিনটা এমনই মেঘাচ্ছন্ন দিন ছিল। মালতী একা ঘরে বসিয়া আনমনে একটা বইয়ের পাতা উল্‌টাইয়া যাইতেছিল. কমলকৃষ্ণ ঘরে ঢুকিলেন, ঢুকিয়া বাহিব হইয়া যাইতেছিলেন; — 'আপনি! আপনার দাদার সঙ্গে একটু দরকার ছিল।'

'তিনি তো নেই, বাইরে বেরিয়েছেন। বসুন না। বোধ হয় এখনই বৃষ্টি আস্‌বে।'

কমলবাবু বসিলেন। দু'জনেই নিঃশব্দ। নিকটেই একখানা বই ছিল, কমলবাবু দ্রুত তাহার পাতা উল্‌টাইয়া যাইতেছিলেন। একটু লক্ষ্য করিলেই বোঝা যাইত, তাঁহার হাত কাঁপিতেছে। মনে মনে বারংবার একটা কথার পুনরাবৃত্তি করিতেছিলেন — 'নিষ্ঠুর, আর কত দিন এমন অবরুদ্ধ প্রতীক্ষায় কাটান যায়। যে কথা আমার মনে রাত্রিদিন তরঙ্গ তুলিতেছে, সে কথার একটুখানি আভাস তোমার চোখের দৃষ্টিতেও ঘনাইয়া নাই?'

কিন্তু সকলের চেয়ে আশ্চর্য্য। মুখে কমলবাবু বলিতেছিলেন, 'আপনি আজকের কাগজটা দেখেন নি? ইউরোপের রাজনীতি আজ প্রকাণ্ড একটা ধাপ্পাবাজী হয়ে দাঁড়িয়েছে মাত্র। স্পেনে—'

কিন্তু ইউরোপের রাজনীতির বিষয়ে সম্পূর্ণ উপেক্ষা দেখাইয়া, মালতী ছল ছল চোখে 'মেঘের অন্তরাল ছিন্ন করিয়া, আকাশে যে একটা উজ্জ্বল তারা ক্রমশ আত্মপ্রকাশ করিতেছে, সেই দিকে চাহিয়াছিল। আজ তাহার মন এত ভারাক্রান্ত হইয়াছিল, তাহার একটা কারণ ছিল। কাল রাত্রিতে মা বলিতেছিলেন তাহার বাবাকে —'কমল তো পষ্টাপষ্টি কিছু ব'লছে

না। আমার কেমন যেন মনে হয়, মেয়েরও এতে বেশ ইচ্ছে নেই। কমলের চেয়ে ঐ যে জিতেন ছেলেটি আজকাল খুব আসা যাওয়া করে, আমেরিকা থেকে পাশ ক'রে এসেছে — ডেন্টাল ডাক্তার — ঐ তাকেই হয় তো ....' লজ্জায় মালতী বিবর্ণ হইয়া উঠিল শুনিতে শুনিতে। সারাদিন সে যাহার কথা ভাবে, যাহাকে কল্পনার রঙে রাঙাইয়া কত ভাবে নিত্যনূতন সাজে সাজায়, তাঁহার কথা সে নিষ্করুণ বহির্জগতে কেমন করিয়া প্রকাশ করিবে? কেমন করিয়া বলিবে, তিনি ছাড়া আর কাহাকেও জীবনে সে আসনে বসানো যায় না। উপযাচিকা হইয়া এমন কথা তো সে প্রাণ গেলেও বলিতে পারিবে না। ইহাতে তাহার ভাগ্যে যাহাই ঘটুক!

কমলবাবু উঠিলেন, একবার বন্ধ কাচের শার্সীর নিকট গেলেন। একবার মালতীর অতি নিকটে দাঁড়াইলেন। তাঁহার সমস্ত অস্তিত্ব যেন উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে, কি একটা কথা বলিবার জন্য। এমন সময় মালতীর হাত হইতে বইটা সশব্দে মাটিতে পড়িয়া গেল। ঐটুকু শব্দে একটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সম্ভাবনার বুদ্‌বুদ্ ফাটিয়া গেল।

কমলবাবু হঠাৎ চমকিত হইয়া উঠিলেন। আবার ফিরিয়া নিজের আসনে আসিয়া বসিলেন। তারপর মনে হইল, বইটা তাঁহার তুলিয়া দেওয়া উচিত। আবার আসন হইতে উঠিয়া আসিয়া ভূমিতে পতিত বইখানা তুলিয়া টেবিলের উপর রাখিলেন। ঝুঁকিয়া পড়িয়া বই তুলিবার সময় মালতীর চুল বাতাসে উড়িয়া হয় তো তাঁহার কপাল স্পর্শ করিয়াছিল

হয় তো কেশের মৃদু সুগন্ধের মাদকতা তাঁহার মনকে ছুঁইয়াছিল — কিছুই নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না কিন্তু কমলবাবু হঠাৎ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। বাহির হইয়া বারান্দার রেলিংয়ে ভর দিয়া দাঁড়াইলেন। কতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিলেন – দশ মিনিট পনেরো মিনিট দু'ঘণ্টা কিছুই তাঁহার স্মরণ নাই।

ঘরের ভিতর হইতে গানের সুর ভাসিয়া আসিতেছিল। মনে হয় মালতী বই রাখিয়া দিয়া বারান্দায় আসিয়া বসিয়াছিল। গানের শেষ চারি লাইন সে ঘুরাইয়া ফিরিয়া বার বার গাহিতেছিল —

'ফুল হয়ে ছিনু যবে নিলে না চয়ন করি
ও চরণ পাব বলে মলিন হইয়া ঝরি।
তোমার আকাশ মাঝে চাঁদ হতে চাহি না যে
শুকতারা হয়ে আমি দিগন্তে ঠাঁই লব।'

আজ মালতীর মনে যে কথা এবং যে ভাব ক্রমাগত আনাগোনা করিতেছিল, তাহারই সহিত গানের ঐ চারি লাইনের যেন অর্থসঙ্গতি ছিল। তাই তাহার মনের সমস্ত নিরুদ্ধ আবেগকে সে ঐ সুরের ভাষায় মুক্তি দিয়াছিল। শুধু রাত্রিতে মাতা-পিতার কথোপকথনের যে অংশটুকু সে শুনিয়াছিল সে কথা বার বার মনে পড়িয়া যাইতেছিল। বাড়ীর আত্মীয় স্বজনরা আর তো অপেক্ষা করিবে না। কিন্তু সে তাঁহাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করিবে না, করিতে চায়ও না। সে শুধু এক জনকে তাহার অভিযোগের ডালি -- অভিমানের ডালি উজাড় করিয়া দিয়া বারংবার বলিবে—

'ফুল হয়েছিনু যবে নিলে না চয়ন করি।'

কখন গান থামিয়া গিয়াছে। কিন্তু গানের সুর কমলকে সাহসী করিয়া তুলিয়াছে। সমস্ত সঙ্কোচ আপনা আপনি তখন শ্লথ হইয়া ঝরিয়া গিয়াছে। মালতীর পিছনে আসিয়া তিনি দাঁড়াইয়াছিলেন।

কহিলেন, 'মালতী, রবীন্দ্রনাথের 'রাত্রে ও প্রভাতে' কবিতা পড়োনি। সারা রাত্রির মিলন-পূর্ণিমার মাদকতা ভোর বেলায় স্বচ্ছ শান্ত শুকতারার পুণ্য দীপ্তিতে মিশে যায়। একটাকে বাদ দিয়ে আর একটা পাওয়া যায় কি? আমি কিন্তু.....'

মালতী কম্পিত স্বরে বাধা দিয়াছিল, 'তুমি কিন্তু কি.....'

'কিছু না। কিন্তু চাঁদ না উঠ্‌লে যে সমস্ত রাত্রি আকাশ অন্ধকার থাকে। আমার সারা জীবন কি তেমনই অন্ধকারে প্রতীক্ষা ক'রেই কাটবে?'

ইহার পর দু'জনে দু'জনকে নিবিড়ভাবে জানিয়াছিল। বৃথা সরম-সঙ্কোচের ব্যবধান-ছায়া ফেলে নাই। কিন্তু সেই সঙ্কোচটুকু — যাহা এত স্বচ্ছ অথচ এত অলঙ্ঘনীয় — সেটুকু ঐ গানের সুরের মধ্যবর্ত্তিতা ছাড়া কাটিত কি?

অতীত দিনের সে সমস্ত কথা মনে পড়িতে মালতীর মুখে এখনও সলজ্জ আভা ছায়া ফেলিল। ঈষৎ হাসিয়া তিনি নিজেকে অপরাধী করিয়া মনে মনে বলিলেন, "নিজেদের কথাগুলো ভুলে বসে থাকি। যখন মনে পড়ে যায়, তখন বুঝ্‌তে পারি, অশোকা ও অজিতকে তাড়া দিয়ে লাভ নেই। ওদের ব্যবহারে অধৈর্য্য দেখানোও ভুল।"

এমন সময় জানালা দিয়া দেখা গেল, অজিতের ছোট মোটরখানা গেট দিয়া ঢুকিল। ঈষৎ উদ্বিগ্ন হইয়া সেলাই রাখিয়া মালতী উঠিলেন। নীচে নামিয়া অজিতের চা-জলখাবারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। নীচের হলঘরে অশোকা তখনও গান করিতেছিল —

"সূর্য্য হারায় হারায় তারা,
আঁধারে দিক্ হয় যে হারা।"

অজিত বিশেষ শব্দ না করিয়া গায়িকার একান্ত নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। দ্বারের বাহিরে মালতী রুদ্ধনিঃশ্বাসে অল্পক্ষণের জন্য দাঁড়াইলেন। হঠাৎ গান থামিয়া গেল। অজিত রুদ্ধস্বরে কহিল, "অশোকা, অন্ধকারে আমারও যে সমস্ত একাকার হয়ে গেছে। তুমি কি আলো দেখাবে না? যে কথা কতবার মুখে এসেছে, কিন্তু ব'ল্‌তে পারিনি, আজ তাদের তোমার কাছেই নিবেদন করে দিলাম সব সঙ্কোচ ছেড়ে।"

অশোকার ভীরু কম্পিত হাতখানি তাহার হাতে আসিয়া মিলিল। মালতী একটা শান্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া দ্বারের নিকট হইতে সরিয়া গেলেন। সুরের মায়া অশোকার জীবনের সন্ধিস্থলেও কার্য করিয়াছে।

পদ্মদহের পিশাচ

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

উঃ সে রাত্রে কী দুর্যোগ।

আকাশ ভেঙে মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে, মাঝে মাঝে সোনালি আলো চকিতে জেগে মিলিয়ে যাচ্ছে।

সোঁ-সোঁ সন্ সন্ করে ঝোড়ো হাওয়া ঝাপটা দিয়ে যায়।

এমনি এক ঝড়-জলের রাত্রে একখানি প্রকাণ্ড জুড়ি গাড়ি শহরের কাঁচা-পাকা পথ দিয়ে কোনোমতে এগিয়ে চলেছে।

থেকে থেকে হাওয়া ও জলের ঝাপটা লেগে গাড়ির কাঁচের শার্সি কেঁপে কেঁপে উঠছে। গাড়ির মধ্যে যাত্রী মাত্র তিনজন।

শিতাংশু পদ্মদহের তরুণ জমিদার, স্ত্রী কমলা ও সাত বৎসরের শিশুপুত্র চম্পক। গাড়িটা চলেছে পদ্মদহের দিকেই।

শিতাংশুর মাথায় কেন যে এ খেয়াল চাপল তা সেই জানে। অবিশ্যি চিরদিনই সে একটু অদ্ভুত প্রকৃতির।

শ্রীপুর স্টেশনে নেমে ক্রোশ-চারেক দূরে দিগন্তপ্রসারী এক বিল তারই নাম পদ্মদহ।

কি গ্রীষ্ম, কি বর্ষা চিরকালই যেদিকে চাও শুধু থৈ থৈ করছে কালো জল। এপার ওপার নজর চলে না।

মাঝে মাঝে হাওয়া উঠলে পদ্মদহের বুকে যখন বড় বড় ঢেউ জাগে, সে যেন তার এক রুদ্র রূপ!

দিনের বেলায় এর বুকে জাগা লক্ষ কোটি ঢেউয়ের মাথায় মাথায় সূর্যের আলোয় চোখ যেন ঝলসে দেয়।

জ্যোৎস্না রাতে চাঁদ এর বুকের মাঝে শত কোটি হয়ে যেন হেসে গড়িয়ে পড়ে। এই পদ্মদহেরই পার দিয়ে চক্রাকারে ছোটখাটো একখানি গ্রাম। এবং এরই এক পাশে প্রকাণ্ড কালো পাথর দিয়ে তৈরী সৌরাংশু চৌধুরীর তেতলা বাড়ি। সৌরাংশু চৌধুরী এখানকার চিরকালের জমিদার নয়, রায়েরা এখানকার পুরুষানুক্রমিক জমিদার।

চামড়ার ব্যবসা করে সৌরাংশু চৌধুরী প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছিলেন, এবং তিনি যখন স্ত্রী ও একমাত্র পুত্র অরুণকে নিয়ে কলকাতায় জায়গা-জমি কিনে বসবাস করবেন বলে স্থির করেছেন এমন সময় সহসা মাত্র তিন দিনের জ্বরে অরুণের মা মারা গেলেন। স্ত্রীর আকস্মিক মৃত্যুতে সৌরাংশু চৌধুরী অত্যন্ত আঘাত পেলেন। কিছুকাল তিনি পুত্রকে নিয়ে নানা দেশে দেশে ঘুরে বেড়ালেন। ইদানীং শহরের হট্টগোল, লোকজনের গোলমাল যেন তাঁকে একেবারে অস্থির করে তুলত। অরুণের মা ছিলেন পল্লীগ্রামের মেয়ে তাই তাঁর মন প্রায়ই ছায়াঘেরা পল্লীমায়ের স্বপ্নে বিভোর হয়ে উঠত। কিন্তু সৌরাংশু চৌধুরী শহরই

ভালবাসতেন, বাড়ি করবার সময়ও যখন অরুণের মা পল্লীগ্রামের কথাই বলতে লাগলেন, সৌরাংশু হেসেই সব উড়িয়ে দিলেন।

আজ অরুণের মার অবর্তমানে কেন যেন বার-বারই সৌরাংশু চৌধুরীর মনে স্ত্রীর সেই শেষ ইচ্ছাটুকু দোলা দিয়ে যেতে লাগল। এবং সত্য-সত্যই একদিন দেখা গেল সৌরাংশু চৌধুরী বাঙলাদেশের গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এমন সময় তাঁর এক বন্ধুর মারফত খবর পেলেন — পদ্মদহের জমিদার দীননাথ রায়; অবস্থার দুর্বিপাকে আজ তাঁর জমিদারির অর্ধেকটারও বেশি নিলামে উঠেছে। সৌরাংশু চৌধুরী সেইদিনই বন্ধুকে নিয়ে পদ্মদহে গেলেন, এবং দিগন্তপ্রসারী পদ্মদহের অপরূপ শোভা দেখে তাঁর মন আনন্দে যেন নেচে উঠল। আর দেরী না করে দীননাথের সঙ্গে আবশ্যকীয় কথাবার্তা কয়ে সব ঠিক করে এলেন।

শুভদিনে, শুভক্ষণে সৌরাংশু চৌধুরীর মর্মর আবাস 'নীলাচল' তৈরী হল, এগারো বছরের মাতৃহারা বালক অরুণকে নিয়ে সৌরাংশু বাবু নীলাচলে এসে উঠলেন।

দীননাথ রায়ের দুই ছেলে, সমর রায় ও যতীন রায়, সমর বড় ও যতীন ছোট।

যতীন চিরকাল একটু ডানপিটে ধরনের, লেখাপড়ার ধার দিয়েও যেত না। বড়টি ছিল অন্য রকমের। হঠাৎ একদিন শোনা গেল সে সরকারি একটা বৃত্তি জোগাড় করে সাগরপাবে পাড়ি জমিয়েছে। আর সে ফিরে আসেনি।

যথাসময়ে দীননাথ রায়ের মৃত্যুর পর যতীনই গ্রামের জমিদাব হল।

শিতাংশু চৌধুরী যখন কলকাতার কলেজে বি.এ. পড়ছে সেই সময় হঠাৎ একদিন তার যোগে পিতা অরুণ চৌধুরীর মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে পদ্মদহে ছুটে এল।

মৃতদেহ তখন সংকার করা হয়নি।

পদ্মদহের পাড়ে যেখানে লম্বা লম্বা বুনো ঘাস একেবারে আচ্ছন্ন করে রেখেছে সেইখানে একদিন ভোরবেলা একদল চাষী অরুণ চৌধুরীর মৃতদেহ আবিষ্কাব করে। মুখের দিকে চাইলেই বোঝা যায়, নিদারুণ ভয় পেয়ে আতঙ্কে মৃত্যু হয়েছে। চোখদুটো বিস্ফারিত, যেন একেবারে ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। দেহে অন্য ক্ষতের চিহ্নমাত্র নেই। যা হোক চোখেব জলের ভিতর দিয়ে পিতার শেষ কাজ করে শিতাংশু কলকাতায ফিরে এল। আসবার সময় যতীনের সঙ্গে দেখা করে এল।

যতীন রায় বললে, আর কলকাতায় ফিরে কী করবে শিতাংশু, পডাশুনো ছেড়ে এবাব জমিদারিতেই এসে বস।

শিতাংশু চৌধুরী অশ্রুঝরা সুরে বললে, 'বাবার স্মৃতি যেন আমায় পাগল কবে দেয়। এখানে কিছুকাল পরে আসব, নায়েব নরেনবাবু রইলেন, তিনিই সব দেখাশুনো করবেন'।

তারপর দীর্ঘ কয় বৎসর পরে শিতাংশু পদ্মদহে ফিরে এল। এতকাল নবেনবাবু জমিদাবির সবকিছু দেখাশুনো করেছেন। আদায়পত্রও জমিদারির তেমন হচ্ছিল না, ওদিকে ওকালতিতেও শিতাংশু চৌধুরীর কোর্টে যাতায়াতই শুধু হচ্ছিল। পকেট আর ভরতে চায় না। অগত্যা পদ্মদহে ফিরে আসা ঠিক হল।

স্ত্রী রমলা ও ছয় বছরের শিশুপুত্র চম্পককে নিয়ে একদিন শিতাংশু চৌধুবী পদ্মদহে রওনা হল।

রাত্রি তখন বারোটা কি সাড়ে বারোটা জমিদার—বাড়ির গেটে এসে গাড়ি থামল। বৃষ্টিটা তখন প্রায় ধরে এসেছে, শুধু মাঝে মাঝে জোলো হাওয়ার ঝাপটা এসে চোখে-মুখে লাগে।

নায়েব নরেনবাবু, ও বহুদিনকার বাপের আমলের পুরানো চাকর জগা গাড়িবারান্দায় অপেক্ষা করছিল।

প্রকাণ্ড একটা টানা বারান্দা, ঝোলানো বাতির স্বল্পালোকে আবছা আলো ও আঁধারে সমগ্র বারান্দাটি কেমন থম্‌থমে ও নিঃসঙ্গ মনে হয়।

নরেনবাবুর বয়েস যথেষ্টই হয়েছে। একদা তিনি যুদ্ধে গিয়ে বাঁ হাতটা হারান, ও বিষাক্ত গ্যাসে বাঁদিককার গালটা একদম পুড়ে কুঁচকে একেবারে বিশ্রী হয়ে যায়।

অস্পষ্ট আলোয় লোকটার মুখের দিকে তাকালে বুকের মধ্যে যেন ছাঁৎ করে ওঠে। রবারের একটা বাঁ হাত লাগানো, দেখলে প্রথমটা বোঝা যায় না।

শিতাংশু গাড়ি হতে নামলে নরেনবাবু এসে নমস্কার করল। জগা গাড়ির সঙ্গে স্টেশনেই গেছল।

সহসা এমন সময় রাত্রির তাণ্ডবতাকে ছাপিয়ে একটা আকাশ-পাতাল ফাটানো বীভৎস চিৎকার জেগে উঠল।

শিতাংশু চমকে উঠল।

চম্পকও এতক্ষণ মা-র কোলের একটি পাশ ঘেঁসে চুপটি করে দাঁড়িয়ে ছিল। সেও চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করল, 'ও কী বাবা'?

বারান্দায় অস্পষ্ট আলোয় স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে শিতাংশু দেখলে, সেখানে রক্তের যেন লেশমাত্রও আব অবশিষ্ট নেই।

করুণ নিঃসঙ্গ রাত্রি। ....টিপ্‌টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে। .... থেকে থেকে কালো আকাশের বুকখানা চিরে বিদ্যুতের সোনালি চাবুক লক-লকিয়ে উঠছে। .. .. মেঘের গুরু-গুরু গর্জন। ব্যাঙ ও ঝিঁ ঝিঁ পোকার অশ্রান্ত একঘেয়ে ডাক! ....চারিদিকে সে কী ভযাবহ নিঃসঙ্গতা।

নরেনবাবু বললেন, 'গভীর রাত্রে মাঝে মাঝে পদ্মদহ হতে ঐ রকম বিশ্রী বীভৎস চিৎকার শোনা যায। ....এখানকার লোকদের মধ্যে বিশ্বাস, পদ্মদহের জলের মধ্যে নাকি দৈত্য বাস করে, সে মাঝে মাঝে গর্জন করে ওঠে।'........

নরেনবাবুর কথার মাঝখানে সহসা শিতাংশু হা হা করে হেসে ওঠে. 'Idiots! fools! (বোকা, গাধার দল) বিংশ শতাব্দীতে এখনও এসব গাঁজাখুরি গল্প চলে নাকি?'

যা হোক সে রাত্রের মত তাড়াতাড়ি কোনোমতে খাওযা-দাওয়া সেরে যে যার ঘরে গিয়ে শয্যায় আশ্রয় নিল।

ভোরবেলা যখন শিতাংশুর ঘুম ভাঙল, খোলা জানালা দিয়ে সির সির করে কেমন একটা ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে।

শিতাংশু এসে খোলা জানলাটার কাছে দাঁড়ালো। সারারাত বৃষ্টিধৌত প্রকৃতি প্রভাতের সোনালি আলোয় শুচিস্নিগ্ধ। দিগন্ত প্রসারী পদ্মদহের বুকে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঢেউ ঝিক্‌মিক্ করছে।... অপরূপ নয়নাভিরাম সে দৃশ্য। কখন এক সময় রমলা এসে পাশে দাঁড়িয়েছে....সত্যি ভারি চমৎকার দৃশ্য কিন্তু! শিতাংশু হাসতে হাসতে বললে, 'সেইজন্যই বোধ হয় ঠাকুর্দা এই মায়ার ফাঁদে ধরা দিয়েছিলেন'।

সমস্ত সকাল ও দুপুরটা শিতাংশুর জমিদারি ও তৎসংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার ঘুরে ফিরে দেখতে দেখতেই কেটে গেল।

গভীর রাত্রে আবার সহসা সেই আকাশ-ফাটানো বীভৎস চিৎকার শিতাংশুর ঘুমটা ভেঙে গেল।....শিতাংশু ধড়-ফড় করে শয্যার পর উঠে বসল।......ঘরের মধ্যে দেওয়াল ঘড়ির আলোটা পিট-পিট করে জ্বলছে.......।

চেয়ে দেখে, রমলাও শয্যার উপর উঠে বসেছে। .....সমস্ত মুখখানি জুড়ে তার সেই গত রাত্রের আতঙ্ক।

শিতাংশু শয্যা হতে নেমে খোলা জানালাটার কাছে এসে দাঁড়ালো।

বাইরে অস্পষ্ট চাঁদের আলো।

সেই আবছা চাঁদের আলো পদ্মদহের বুকে কেমন যেন একটা ভয়াবহ নিঃসঙ্গতার সৃষ্টি করেছে।

সহসা এমন সময় —ওকী। ..... অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় ও কী দেখা যায়? কী? ওটা কী? শিতাংশু হাতের পাতা দিয়ে চোখদুটো ভাল করে একবার রগড়ে নেয়।.....না! স্বপ্ন নয়!......

প্রকাণ্ড বারো তেরো হাত লম্বা আগাগোড়া সাদা কাপড়ে ঢাকা একটা মানুষের মত মূর্তি পদ্মদহের ধার দিয়ে হেলে দুলে হেঁটে হেঁটে বেড়ায় লম্বা লম্বা পা ফেলে ফেলে। মানুষ কখনও এত লম্বা আর এত চওড়া হয়? ....এক-একটা পা ফেলছে বোধহয় হাত পাঁচ ছয় দূরে!...........

সহসা এমন সময় অবার সেই আকাশ-পাতাল ফাটানো অদ্ভুত চিৎকাব! চম্পক চম্‌কে চোখ বুজল ......যখন সে আবার চোখ মেলে চাইল....... সেই অদ্ভুত মূর্তি আর দেখা যাচ্ছে না, চাঁদ মেঘে ঢাকা পড়েছে।

এখানে আসবার দিন-দুই পরের কথা।

দোতালার খোলা বারান্দায় দু-খানা বেতের ডেক চেয়ারে বসে শিতাংশু বমলা ও যতীন গল্প করছিল, তাদের গল্পের বিষয় ছিল রাত্রের সেই পদ্মদহের ধারে হেঁটে বেড়ানো অদ্ভুত মূর্তি ও সেই অদ্ভুত চিৎকার!

যতীন বলছিল, 'পদ্মদহের ধারে অমন একটা মূর্তি আমারও চোখে পড়েছে এর আগে দু-একবার, আর চিৎকার — সেও গ্রামের সকলেই শুনেছে! .. উঃ, সে কী নিদারুণ শব্দ! ভাবতেই আমার বুকের মধ্যে কেঁপে ওঠে।...

সহসা এমন সময চম্পকের ডাকে সকলে ফিরে তাকালো। একজন সুন্দরমত লম্বা তরুণের হাত ধরে ঝুলতে ঝুলতে চম্পক এই দিকেই আসছে। মা! মা! এই দেখ কে এসেছে। শিতাংশু চিৎকার কবে উঠল আনন্দে 'হ্যালো!...... কিরীটি কখন এলে?' হঠাৎ এখানে কী মনে করে?.

কিরীটি রমলার মুখের দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসতে থাকে। রমলাবও যেন মুখে হাসিব চাপা ইশারা।

'ব্যাপার কী বল তো'!....

'এমনি বেড়াতে এলাম।...... কেন, আসতে নেই নাকি?'

'বিলক্ষণ! একবার কেন? একশোবার আসবে, হাজার বার আসবে!......তা যাক, এস যতীনের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই!. ...ইনি শ্রীকিরীটি রায়, একজন সৌখীন গোয়েন্দা, যদিও নিজেকে পরিচয় দেন রহস্যভেদী কিরীটি, আর ইনি শ্রীযতীন বায, এখানকার দশ-আনি জমিদার।'

উভয়ে উভয়কে নমস্কার জানালো।

যতীন হাসতে হাসতে বললে, 'হ্যাঁ, ওঁর কথা শুনেছি। উনিই বোধ হয় বিখ্যাত দস্যু কালো ভ্রমরের রহস্য ভেদ করেছিলেন?'

শিতাংশু বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ। ইনিই সেই কিরীটি রায়।'

'কিন্তু এঁর সঙ্গে তোমাদের পরিচয়?' .....যতীন শুধালো।

'ওঃ তা জান না বুঝি? ইনি আমার খোকা চম্পকের মামা। স্ত্রী রমলা দেবীর সাক্ষাৎ মায়ের পেটের ভাই!'

'হঠাৎ এখানে এলেন যে?' যতীন হাসতে হাসতে শুধোলো।

'হাতে কোন কাজকর্ম নেই; ঘুমিয়ে আর বসে থাকতে থাকতে একেবারে কোমরে বাত ধরে যাওয়ার জোগাড় হয়েছিল, তাই এখানে চলে এলাম।'

'বেশ বেশ, শুনে সুখী হলাম। তা এখানেও বোধহয় আপনার রহস্যের কিছু খোরাক জুটতে পারে।'

কিরীটি যেন বেশ একটু উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়ে — 'কী রকম? এই গ্রামেও রহস্য আছে নাকি?'

' তা আপনি কি মনে করেন, যত রহস্য সব আপনাদের শহরেই লুকিয়ে আছে? .....এখানে ঠিক রহস্য লুকিয়ে না থাকলেও এমন একটা ব্যাপার ঘটছে কয়েক বছর হতে যাকে ভৌতিক বলা ছাড়া উপায় নেই, আবাব বিংশ শতাব্দীতে ভৌতিক ব্যাপার যেন একেবারে গাঁজাখুরি বলে মনে হয়।'

Really। সত্যি আশ্চর্য তো? ব্যাপারটা খুলে বলুন তো?

'সে আজ বছর কয় আগেকার কথা হবে, হঠাৎ একদিন শিতাংশুর বাবা অরুণবাবুর মৃতদেহ পদ্মদহের ধারে পাওয়া যায়। একজন চাষী পদ্মদহের ধারে ঘাস কাটতে গিয়ে দেখে একটা বাবলা গাছের তলায় অরুণবাবুর মৃতদেহ পড়ে আছে। শরীরের কোথাও কোনো ক্ষত বা আঘাতের চিহ্ন পর্যন্ত নেই, বিশেষত্বের মধ্যে চোখের মণিদুটো যেন ঠিকরে কোটর হতে বের হয়ে আসছে, খুব বেশী ভয় পেলে মানুষের যে অবস্থা হয় অনেকটা সেইরকম। .... আর তাঁর মৃতদেহের পাশেই পদ্মদহের পাড়ে জলা-মাটির উপর গোটাকতক পায়ের চিহ্ন পাওয়া যায়, অমন বড় বড় পায়ের দাগ মানুষের যে হতে পারে না এ বিষয়ে আমি স্থির নিশ্চিত। .....স্বাভাবিক মানুষের পায়ের দাগের চাইতে প্রায় দেড় গুণ বড। ......আরো আশ্চর্য, সেই পায়ের দাগগুলি ক্রমেই গিয়ে পদ্মদহের জলের কোল ঘেঁষে শেষ হয়ে গেছে।.... আমরা খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম অরুণবাবু মৃত্যুর আগের দিন রাত্রি প্রায় দেড়টা পর্যন্ত জেগে জমিদারি-সংক্রান্ত কাজকর্ম করেছিলেন, তারপর নাকি শুতে যান। ..রাত্রি তখন দুটো কি আড়াইটে হবে, গ্রামের দু-একজন নাকি একটা বীভৎস আকাশ-ফাটানো চিৎকার শুনেছিল! অরুণবাবুর মৃত্যুব পর হতে প্রায়ই রাত্রে পদ্মদহের দিক হতে সেই বীভৎস চিৎকার শোনা যায়। এখনও মাঝে মাঝে একটা প্রকাণ্ড বারো-তেরো হাত লম্বা মূর্তিকে — আগাগোড়া সাদা কাপড়ে মুড়ি দেওয়া — পদ্মদহের ধার দিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়।

সকলে নিশ্বাস একেবাবে যেন রুদ্ধ করে যতীনের কথাগুলি শুনছিল। গল্প শেষ হলে কিরীটি শুধু বললে, সত্যি, অদ্ভুত ব্যাপারই বটে। .... কিন্তু শিতাংশু, তুমি একথা তো আমায় কোনোদিন আগে বলনি?

শিতাংশু বললে, 'এত ব্যাপার তো আমিও জানতাম না কিরীটি! ..... আর তখন আমার মনের অবস্থা যা এসব দিকে চাওয়ারও সময় ছিল না!'

যা-হোক সেদিনকার মত যতীন সকলকে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিল।

রমলা তখন ভাইয়ের জন্য খাবার আনতে উঠে গেছে।

কিরীটি বললে, রমা আমায় তার করে এনেছে, এখানে নাকি তোমরা খুব বিপদে পড়েছ? .... ভৌতিক ব্যাপার-ট্যাপার ওসব স্রেফ বাজে ও বোগাস। ....ওটা দশজনের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য শয়তানের কারসাজি মাত্র।

* * *

বেলা তখন দ্বিতীয় প্রহর হবে। .....

কিরীটির ঘরে কিরীটি ও চম্পক। চম্পক আবোল-তাবোল একমনে বকে চলেছে আর কিরীটি শুনছে আর মাঝে-মাঝে দু-একটা প্রশ্ন করছে।

চম্পক বলছিল, 'গরুড় পাখির মত সরু বাঁকানো নাক....প্যাঁচার মত বড় বড় চোখ।.... গাধার মত লম্বা লম্বা কান। বুঝলে মামা, রোজ রাত্রে আমার ঘরের ঐ খোলা জানলা দিয়ে এসে আমার দিকে চেয়ে থাকে।'

'তোর ভয় করে না?'

'দ্যুৎ, ভয় আবার কী? ভয় পায় বোকারা। আর সেটা তো কিছু বলে না, শুধু আমার দিকে চেয়েই থাকে। বাবা বলেছেন, ভয় পায় তো গাধা ছেলে যারা, কানাইলালের গল্প শুনেছ, একা একা সে অমাবস্যার রাত্রে শ্মশানে গেছল, আমিও যাব। বাবা বলে আমি রূপকথার রাজপুত্র। তুমি জান মামা সেই কবিতাটা?

— রূপকথাটির মত;
রাজপুত্তব ঘর ছেড়ে যায়
পেরিয়ে রাজ্য কত;
সেই আমারে বলে যেত
কোথায় আলোক লতা,
সাগর-পারের দৈত্য-পুরের
রাজকন্যার কথা,
দেখতে পেতাম দুয়োবানীর
চক্ষু ভরো-ভরো,
শিউরে উঠে পাতা আমাব
কাঁপত থর-থর। —

আমি যাব সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে, জানো মামা, 'বাবা আমাকে একটা উড়োজাহাজ কিনে দেবে!'

কিরীটির কিন্তু সেদিকে মন নেই, ভাবছে চম্পকের দেখা রাত্রের সেই অদ্ভুত জীবটির কথাই।

'এই ঘরটাতেই শ্বশুরমশায় শুতেন।' রমলা কিরীটিকে বললে। বেশ মাঝারি গোছের একখানি ঘর। গরাদহীন বড় বড় জানালা। ঘরের দক্ষিণ দিকেই সেই পদ্মদহ। দিবারাত্র হু-হু শব্দে হাওয়া এসে ঘরে ঢোকে। ঘরখানি দোতলায়, ঠিক তার নিচেই একটা ফুলের বাগান। বাগানটা পার হলেই একটা মাঠের মত। সেই মাঠ পদ্মদহের পাড় পর্যন্ত গেছে।

কিরীটি ঘুরে ঘুরে সব ঘরের জানলা দরজা দেওয়াল দেখছিল হঠাৎ-এক সময় তার বাগানের দিককার জানালার কাঠের পাল্লার উপর নজর পড়ল। পাল্লার উপর পাঁচটি আঙুলের দাগ শুকিয়ে আছে। দাগগুলি এমনভাবে বসেছে, যেন বাহির হতে কেউ আঙুলের চাপ দিয়ে জানালার বন্ধ পাল্লা ঠেলে খুলেছে।

কিরীটি রমলার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললে, 'শেষ তোদের এ বাড়িতে কবে রঙ দেওয়া হয়েছে বলতে পারিস, রমা?'

'তা তো জানি না দাদা। তবে নায়েবমশাই হয়ত বলতে পারেন।' রমলা জবাব দিল।

'তোর নায়েব মশাইকে একটিবার ডাক তো।'

ভৃত্য নরেনবাবুকে ডেকে আনল। কিরীটি লোকটির দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে প্রশ্ন করল, 'নমস্কার! আপনার নামই নরেনবাবু? এদের ষ্টেটের নায়েব?' —

'আজ্ঞে।'

'আচ্ছা নরেনবাবু, last এ বাড়িতে কবে রঙ দেওয়া হয় বলতে পারেন?'

'হ্যাঁ, বছর দুই আগে, কর্তার মৃত্যুর কয়েকদিন আগে সমস্ত বাড়ি রঙ করা হয়েছিল।'

'এর মধ্যে আর রঙ দেওয়া হয়নি?'

'হয়েছে, এদিককার মহলগুলিতে আর রঙ দেওয়া হযনি; শুধু ওদিককার মহলে রঙ দেওয়া হয়।'

গভীর রাত্রে কিরীটির ঘুমটা ভেঙে গেল।

একটা অস্পষ্ট খট্-খট্ শব্দ! কার যেন চাপা শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ঘরে-বাতাসে ভেসে ভেসে বেড়ায়। আকাশের এক কোণে ত্রয়োদশীর ক্ষীণ চাঁদ তখন যাই-যাই করছে।

অস্পষ্ট চাঁদের আলো খানিকটা খোলা জানালা পথে ঘরের মেঝেয় এসে লুটিয়ে পড়েছে।

কিরীটি চোখ মেলে যতদূর সম্ভব ঘরের মধ্যে চারিদিকে শুয়ে শুয়েই দেখতে লাগল।

আচম্‌কা একটা বিরাট বীভৎস আকাশ-পাতাল কাঁপানো চিৎকার রাত্রির নিস্তব্ধতাকে ছিন্নভিন্ন করে পৈশাচিক বিভীষিকায় প্রেতায়িত হয়ে উঠল।

রাত্রির আঁধার তখনও ভাল করে কেটে যায়নি। অস্পষ্ট আলোয় চারিদিক সবে ফিকে হয়ে উঠেছে। কিরীটি পদ্মদহের ধার দিয়ে চাবিদিকে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। সহসা ওর নজরে পড়ল জোলো ভিজে মাটির 'পরে পর-পর অনেকগুলি সাধারণ মানুষের পায়ের দাগ হতে অনেক বড়। পায়ের পাতা যেমনি বড, পায়ের আঙুল তেমনি লম্বা লম্বা। পায়ের নখগুলি নবম মাটিব বুকে দেবে দেবে বসে গেছে। কিরীটি ভাল করে লক্ষ্য কবতে লাগল। মানুষের পায়ের দাগ যেমন খানিকটা পড়ে না — আঙুলের মাথাগুলোর গোল গোল দাগ পড়ে মাত্র, এ পায়েব দাগ মোটেই সে রকমের নয়, পায়ের পাতায় সমস্ত দাগটুকু তো পড়েছেই, লম্বা লম্বা আঙুলের দাগও পড়েছে। দাগগুলো ক্রমে জলের দিকে নেবে গেছে।

কিবীটি চিন্তিত মনে বাড়ির দিকে ফিরল।

বিকালের দিকে সকলে খোলা বারান্দায় বসে চা পান করছে। শিতাংশু, রমলা, যতীন ও কিরীটি। এবং নানা বকমের গল্প হচ্ছে।

সহসা এমন সময় জগা একখানা চিঠি নিয়ে এল, — বললে, 'একজন লোক যতীনবাবুকে এই চিঠিখানা দিতে বলে গেল।' একখানা সাদা খামের চিঠি। যতীন হাত বাড়িয়ে জগার হাত হতে চিঠিখানা নিয়ে খামের উপরে নাম পড়ে বললে, 'কই না, এ তো আমার চিঠি নয়., মিঃ কিরীটি রায় লেখা।' বলে চিঠিটা টেবিলের পরে রেখে দিল।

'সেকি, এখানে আবার আমাকে কে চিঠি দিল?' কিরীটি চিঠিখানা আলগোছে টেবিলের 'পর হতে তুলে নিয়ে চলে গেল।

সোজা সে নিজের ঘরে চলে এল।

সুটকেশের ভিতর হতে একটা ব্রাউন রঙের ছোট শিশি বের করলে, তার গায়ে লেখা osmic acid। একটা কাঁচের পাত্রের মধ্যে সেই খামখানা রেখে শিশিটার ছিপি খুলে খানিকটা osmic acid খামটার গায়ে ঢেলে দিল। দেখতে দেখতে খামটার গায়ে কালো আঙুলের ছাপ ফুটে উঠছে দেখা গেল।

কিরীটি গভীর আগ্রহে দাগটার দিকে চেয়ে দেখতে লাগল।

পরের দিনের কথা বলছি, শিতাংশু কি একটা জমিদারির কাজে সেই ভোরে উঠে বেরিয়ে গেছে। কিরীটি বাগানের ভিতরটা ঘুরে ঘুরে দেখছিল, সহসা এক সময় নরেনের ঘরের জানালার নিচে আসতে একটা কোঁকড়ানো কাগজের প্রতি তার নজর পড়ল।

কিরীটি কাগজটা হাত দিয়ে তুলে নিয়ে চোখের সামনে মেলে ধরল, তাতে এই কটা অক্ষর পর-পর সাজানো —

'ন'
জ আ
ত রা
য় টা র বা
কে ক স্প চ
ই ই চা
'য'

কিরীটি অবাক হয়ে কাগজটা দেখতে লাগল — 'এ আবার কী?' সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে কিরীটি কাগজটা হাতে করে নিজের ঘরের দিকে চলল। শিতাংশু বাড়ি ছিল না বলে কিরীটি রমলাকে সেদিন সন্ধ্যায় তার ঘরে চম্পককে নিয়ে রাত্রে শুতে বললে। রমলা বললে, 'আচ্ছা' ...রমলারও একলা শুতে ভয় করছিল।

রাত্রি তখন ঠিক কত বলা যায় না। আকাশে মাটিতে কালো আঁধাব যেন জমাট বেঁধে উঠেছে।

ঘরের বাইরে বারান্দা দিয়ে কে যেন নিঃশব্দে হেঁটে গেল। কিরীটি তাডাতাড়ি শয্যা ছেড়ে টর্চটা হাতে নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালো।

এরপর আবছা আঁধারে কিরীটি দেখল, বাগানের মধ্য দিয়ে পা ফেলে এগিয়ে আসছে তের হাত লম্বা একটা মূর্তি। মূর্তিটা এসে রমলার ঘরের জানালার সামনে দাঁড়ালো। — মূর্তিটা দোতলার সমান লম্বা। হাত দিয়ে জানালার কবাটটা ঈষৎ একটু টান দিতেই খুলে গেল — এবং সেই মূর্তিটা জানালার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। এক-মিনিট দু-মিনিট করে প্রায় দশ মিনিট পরে দেখা গেল মূর্তিটা আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে জানালা ছেডে এগিয়ে আসছে। আর দেরি নয়। কিরীটি হাতের দড়িটা বিদ্যুৎবেগে মূর্তিটাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিল। কিরীটির অব্যর্থ দড়ির ফাঁস মূর্তিটার মাথা দিয়ে গলে কোমর পর্যন্ত নামতেই সে দিল এক টান, এবং মূর্তিটা তালগোল পাকিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। আঁধারে একটা ছটফটানিব শব্দ জাগল। কিরীটি ছুটে গেল, কিন্তু কিরীটি সেখানে গিয়ে প্রকাণ্ড সাদা চাদরের জামা ও মস্ত মস্ত দুটো বাঁশের 'রণ-পা' ছাড়া কিছু পেল না। কিরীটি 'রণ-পা' দুটো নিয়ে ফিরল।

ঠিক সেই মুহূর্তে কে যেন বাঘের মতই তার উপরে লাফিয়ে পড়ল পিছন হতে এবং তার হাতের তীক্ষ্ণ ছোরাখানা তাড়াতাড়ি বসাতে গিয়ে ফস্কে বাঁ হাতের কনুইয়ে গিয়ে বিঁধল। কিরীটি বিদ্যুৎগতিতে ফিরে যুযুৎসুর প্যাঁচ দিয়ে লোকটাকে মাটিতে ফেলে দিল এবং তাকে ঠেসে ধরল। হাতের ক্ষতস্থান দিয়ে তখন অজস্র ধারে রক্ত ঝরছে। বাঁ হাত দিয়ে কোমরে ঝোলানো টর্চটা টেনে লোকটার মুখের উপর ফেলতেই কিরীটি হেসে বলল, 'সত্যিই, তবে নরেন, তুমিই? হিসাবে আমার ভুল হয়নি তবে?.....

সেদিনকার মত আজও দ্বিপ্রহরে শিতাংশুর ঘরে বসে গল্প করছিল শিতাংশু, যতীন, কিরীটি ও রমলা। নরেনকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে; গত রাত্রের গল্পই হচ্ছিল।

যতীন বললে, 'অদ্ভুত সাহস কিন্তু আপনার মিঃ রায়! শেষ পর্যন্ত দেখলেন তো, এটা আসলে একটা শয়তানের শয়তানি!' এ আমি আগেই জানতাম। কিন্তু উঃ, নরেন লোকটা যে এত বড় নীচ ও শয়তান, তা কিন্তু আমার মোটেই ধারণা হয় নি। নিমকহারাম।

কিরীটি বললে, 'ব্যাপারটা তাহলে খুলেই বলি। এবং দুই বছর আগেকার ঘটনা হতেই শুরু করা যাক। অরুণবাবু একরাত্রে হঠাৎ তাঁর জানালার উপর অদ্ভুত এক মূর্তি দেখে ভয় পেয়ে মারা যান। মূর্তির নাকটা ছিল গরুড় পাখির মত সরু, বাঁকানো; প্যাঁচার মত বড়-বড় গোল চোখ, গাধার মত লম্বা লম্বা কান। — মূর্তি যখন দেখলে অরুণবাবু ভয় পেয়ে মারা গেছেন তখন সে তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়ে পদ্মদহের কাছে ফেলে আসে এবং গ্রামবাসীর মনে একটা ভৌতিক ত্রাসের সঞ্চার করবার জন্য নিজে 'রণ-পা' পরে হাঁটে ও হাঁড়ির মধ্যে মুখ গুঁজে বীভৎস চিৎকার করে। গ্রামবাসীর মনে ধারণা হয়, পদ্মদহের পিশাচের হাতেই অরুণবাবু মারা গেছেন। কিন্তু খুনী তার হত্যার নিদর্শন রেখে গেল আঙুলের ছাপের মধ্য দিয়ে — জানালা দরজায় নূতন রঙ দেওয়া হয়েছিল, খুনী যখন বাহির হতে জানলার পাল্লা টেনে খোলে, হাতের ছাপ তাতে পড়ে যায়! কিন্তু আরো একজনের চোখে ব্যাপারটা ধরা পড়ে। তার মুখ বন্ধ করবার জন্য খুনী তার হাতে টাকা দেয় ও ভয় দেখায়। লোকটা চুপ করে থাকে। দীর্ঘকাল পরে শিতাংশু যখন ফিরে এল, খুনী এবারেও এদের ভয় দেখিয়ে এখান হতে সরাবার চেষ্টা করলে, ... কিন্তু শতাংশু ভয় পেল না! তখন সে চম্পককে ভয় দেখিয়ে মারবার চেষ্টা করল। কিন্তু সে চেষ্টাও নিষ্ফল হয়ে গেল! তখন খুনী সেই লোকটার কাছে চিঠি দিয়ে একদিন চম্পকের ঘরের জানালা খুলে রেখে চুরির মতলব করলে. . এই সেই চিঠি ঃ........

"ন" ০ ০ ০
জ আ ০ ০
ত রা ০ ০
য় টা র বা
কে ক ম্প চ
০ ই ই চা
০ ০ ০ "য"

চিঠিটার অর্থ এই — "ন" একজনের নাম নিশ্চয়ই। চিঠিটা উল্টোদিক হতে পড়লে এই দাঁড়ায় —

'ন, আজ, রাত, বারটায়, চম্পককে, চাই-ই 'য' ;

কিন্তু সে রাত্রেও খুনী সফল হল না, কেননা রমলাকে আমার ঘরে শুতে বলেছিলাম।

তারপরের ঘটনা তোমরা সব জান ও শুনেছ। "য" এবং "ন" কে তাও বুঝেছ? "ন" হচ্ছে তোমাদের নায়েব নরেনবাবু ....আর "য" হচ্ছে তোমাদের সামনে বসে বন্ধুবেশী শয়তান, তোমার পিতার হত্যাকারী ঐ যতীন।

যতীন উঠতে যাচ্ছিল, তার সমস্ত মুখ তখন মড়ার মতই সাদা হয়ে গেছে। পকেট হতে রিভলবার বের করে যতীনের মুখের সামনে ধরে কিরীটি বললে, 'এক-পা নড়েছ কি কুকুরের মত গুলি করে মারব।'

'যতীন যে হত্যাকারী সে আমি অনেক আগেই টের পাই, আঙ্গুলের ছাপ হতে। জানালার গায়ে যে দাগ দেখেছিলাম তার একটা ফটো নিই, তারপর সেদিন জগার হাত দিয়ে কৌশলে এক পত্র পাঠাই। যতীন সেই পত্র হাতে নিয়ে "ওর না বলে ফেরত দেয়, কিন্তু ওতেই আমার কাজ হয়ে যায়। মানুষের চামড়া দিয়ে সর্বদাই একটা তেলের মত জিনিস বের হয়। হাত দিয়ে যখন যতীন চিঠিটা চেপে নিয়ে দেখে, সেই চিঠির গায়ে ওর বুড়ো আঙ্গুলের ছাপ পড়ে যায়। আমি সেই চিঠির গায়ে osmic acid দিয়ে হাতের ছাপ ফুটিয়ে তুলে ফটো

নিই...এই দেখ দুটো ফটোই প্রমাণ করেছে যে দুই ছাপই একই লোকের আঙ্গুলের। তারপর পদ্মদহের পাড়ের পায়ের দাগ যে মানুষের পায়ের নয়' তাও ছাপ দেখলেই বোঝা যায়; মানুষের পায়ের দাগ ও যে ছাপ সেখানে পেয়েছি তারও ফটো নিয়েছি। এই দেখ পার্থক্য কোথায়। একটা ছবিতে সমস্ত পায়ের দাগই পড়েছে, অন্যটায় সেটা সত্যি অপরের পায়ের দাগ তার আঙ্গুলগুলো মাত্র গোল দাগ ফেলেছে। সম্পূর্ণ আঙ্গুলের ছাপ পড়েনি বা পড়তে পারে না — পায়ের পাতার মাঝখানের উঁচু জায়গা হাঁটার সময় উঁচুতেই থাকে, সেইজন্য মাটিতে ছাপ পড়ে না। সমস্ত পায়ের পাতার ছাপ পড়া অসম্ভব। বুড়ো আঙ্গুলেব দিক হতে গোড়ালি পর্যন্ত ধনুকের বাঁকানো মত জায়গাও হাঁটার সময় মাটিতে পড়ে না; অতএব সেখানকার ছাপও পড়তে পারে না। এর থেকেই বুঝেছিলাম। এ পা মানুষের নয়, কাঠের পা লাগিয়ে কেউ হেঁটে গেছে। কাঠের পায়ের পাতা বড় করা হয়েছিল যাতে লোকের মনে আতঙ্ক জাগে। আর একটা কথা, মানুষ অত লম্বা হতে পারে না। আগেকার দিনে ডাকাতরা বাঁশের পায়ের দুটো কাঠি লাগিয়ে ক্রোশেব পর ক্রোশ দ্রুত হেঁটে যেত, একে বলা হত 'রণ-পা'। আমার সন্দেহ হল এই মূর্তিও 'বণ-পা' ব্যবহার করত, তা না হলে অত লম্বা লম্বা পা ফেলা যায় না।

'এখন কথা হচ্ছে, যতীনকে কেন সন্দেহ করলাম। যতীন জানত অরুণবাবুব একমাত্র পুত্র ছাড়া ত্রিসংসারে আপনার বলতে আর কেউ নেই। কোনো উপায়ে ওকে যদি সরানো যায় তবে অনায়াসেই সম্পত্তিটা বাগিয়ে নিতে পারে, কেননা বাঙলার এই নির্জন গাঁয়ে কে আবার সম্পত্তির দাবি জানাতে আসবে! তাই সে অরুণবাবুকে মাবেব ভয় দেখায়। তোমরা যখন এখানে এলে তখন সে এক ঢিলে দুই পাখি মারার চেষ্টা কবল। চম্পককে যদি ভয় দেখিয়ে অরুণবাবুর মত মারতে পাবে তবে তোমরা আর নিশ্চয়ই এখানে থাকবে না। চম্পক কিন্তু ভয় পেল না। তখন ওরা ঠিক করলে, কোনোমতে চম্পকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলবে। তোমাদের নাযেব ছিল ওর সঙ্গী, তাকেও টাকা দিয়ে চুপ করিয়ে রেখেছিল।'

শিতাংশু গর্জন করে উঠল, 'শয়তান, খুনী।' কিরীটি বাধা দিল 'আমরা এখন ওকে পুলিশের হাতে জমা দিয়ে খালাস, পুলিশই ওর ব্যবস্থা করবে! মদনবাবু, আসুন!'

ইনস্পেক্টর মদনবাবু হাতকড়ি নিয়ে হাসতে হাসতে পাশের ঘর হতে বের হয়ে এলেন। কিরীটি আগে হতেই তাঁর কাছে লোক পাঠিয়ে খবর দিয়ে রেখেছিল।

মরু-তৃষা

হাসিরাশি দেবী

যন্ত্র-দানবের বিরাট্ দেহ প্রায় একযুগ ধ'রে ব'সে আছে শহরের অর্দ্ধেকের অধিকারী হ'য়ে—আর বাকী অর্দ্ধেক ভরিয়ে রেখেছে ওরই সেবাইতের দল। ঘড়ির কাঁটায় সকাল দুটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে সকলের কাণে গিয়ে পৌঁছায় ওর আহ্বান, কর্ম্ম-যুদ্ধ আরম্ভ হবার আগে ঐ গুরু-গম্ভীর তূর্য্যধ্বনি সকলকে জানায় নিজের অস্তিত্ব, শক্তির সাফল্যে যার প্রতিষ্ঠা, আর ঐ প্রতিষ্ঠার পাদমূলে মাথা নত ক'রে ফেলে ওর সেবাইতেরা—বিরাট লৌহ ফটক খুলে যায়, আবার বন্ধ হয় সকলের প্রবেশ শেষে; ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে মিল রেখেই ওরা যেন কাজ ক'রে যায়, কোনও ক্ষণেই ভুল হবার উপায় নাই—যেন অভ্রান্ত।

দূর গ্রামে—ভাঙ্গা কোঠার দালানে ব'সে তামাক টানিতে টানিতে কারখানার কালো চিমনীটার অবিশ্রান্ত ধূমোদগার দেখে—আর জগু ভাবে ওকেও একদিন এই ঘরের মায়া কাটিয়ে —ঐ দূর শহরে - ঐ চিমনীর তলায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে চাকরীর চেষ্টায়, নইলে দিন আর চলে না! যদিও আত্মীয় আত্মীয়ার বালাই নেই, তবু নিজেকে নিয়েও তো ভাবতে হয়। গাঁয়ে থেকে, তাস পাশা খেলে, আড্ডা দিয়ে আর উপার্জ্জনের অভাবে আধ-পেটা খেয়ে আর কতদিন কাটবে।

জগু ভাবে— আর ছিলিমের পর ছিলিম নিঃশেষ ক'রে ঝাড়ে, আবার সাজে, কিন্তু কোনও কাজেই এগোয় না, বড় জোর থাকোহরির সঙ্গে এ বিষয় নিয়ে মাঝে মাঝে সমালোচনা করে, কারণ -সেও আসে শুধু দুঃখ জানাতেই। কেউ কিছু না জানতে চাইলেও সহানুভূতির শুধু "আহা" টুকুই ও শুনতে ভালবাসে, তাই উৎসাহিত হ'য়ে ব'লতে শুরু করে—

"তুমি তো আর আমার পর নও হে, বরঞ্চ আপনার আপনি সম্বন্ধ, তাই তোমায় ব'লতে আমার এক ফোঁটাও লজ্জা নেই—ভাবি কি হবে তোমায় লুকিয়ে, তুমি তো আর কাউকে ব'লতে যাচ্ছ না, এঃ হেঃ হেঃ হেঃ--"

টেনে টেনে হাসা ওর স্বভাব। সেই সঙ্গে সঙ্গে "তুমি" শব্দ ক্রমে "তুই" হ'য়ে দাঁড়ায় কালো, শিরওঠা সরু হাত দুখানা নেড়ে চোখ দুটো বিস্ফারিত করে' বলে—

"তারপরে জানিস, এই সংসারের দায়ে আমি সব খুইয়েছি মাইরি! আর পরের উপকার করা! ও, সে জানে দশখানা গাঁয়ের লোক; এই থাকোহরির মত আর একটি লোক কেউ এ পিরথিবীতে খুঁজে বের ক'রতে পারে? ফেলুক বাজী! বুকের পাটা থাকে, চলে আসুক থাকোহরির সঙ্গে বাজী জিততে, তবে বুঝবো মরদ!—"

হাতের চেটোয় একটা ছোট রকম কিল মেরে, সকলের মুখের দিকে একবার তাকায়, তারপরে গলার স্বরটা একটু কোমল করে, একটু হেসে বলে—

"হুঁ, মোড়লী করে সবাই—কিন্তু কাজে করুক দেখি? সে-টি হবার উপায় নেই। এখনও ব'লবে ও-পাড়ার হারু বোস আর হাটখোলার পেঁচোময়রা। সেই যেবার হারুর ছেলেটাকে সাপে কামড়ায়, সেবারে কেউ গেল না ওঝা ডাকতে, শেষে গেল এই থাকোহরি। আর

পেঁচোর দোকানে যেদিন চোরে সিঁদ কাটে, সেদিন কোথায় ছিল পেঁচো, আর কোথায় ছিল পেঁচোর ইয়ারের দল? হুঁঃ, সে এই থাকোহরি ভাগ্যিস আসছিল, তারিণীর বাড়ী থেকে তাস খেলে, তাই—"

এই পর্যন্ত ব'লে—সকলের মুখের দিকে তাকায়, হয়তো দুই একটা বাহবা-শব্দের আশা করে, কিম্বা আর কিছুর।

কিন্তু এ গেল তার বীরত্বের পরিচয়। দুঃখের পরিচয়ে গোটা দুই দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—

"সেই যেবারে—আশ্বিনে বড় ঝড় হয়, জানো! যেবারে রায়বাবুর বাড়ীর পিরতিমে গেল চুরমার হয়ে, আর সেই পাপে বাবুরা সবংশে নিধন হ'লো! সেইবারেই আমার বড় ভাই মারা যায় গাছ চাপা পড়ে, বড় ভাই ব'লে বড় ভাই! আমাব চেয়ে সাত বছরের বড়, আর উপার্জ্জনকারী ভাই। সে থাকলে আজ আমার ভাবনা কিসের? পায়ের ওপর পা রেখে জুড়ী হাঁকিয়ে বেড়াতাম; কিন্তু কপালে নেই, তাই তিনি স্বগো গেলেন, আর সব ভার পড়লো আমার ঘাড়ে। কি আর করি' বল, নিজেও যদি একমুঠো খেতে পাই, তবে ওবাই বা পাবে না কেন ভেবেই সবাইকে এক জায়গায় ক'রে রেখেছি। কিন্তু রাখলেই কি নিস্তার আছে—একে এই দিন-কাল, তাতে আয় নেই, তাই ভুব্‌না শালার দোকানেব দেনা দিন দিন বেড়েই চ'লেছে; জানিস তো সব, শেষ সম্বল বো'র কাঁখের রেট ছড়াও গেল মার অসুখে—ঐ আশু কবরেজের খপ্পরে, আর ছাড়াতে পারলাম না।

নৈরাশ্যের কাতরতায় ভরা একটা সঘন নিঃশ্বাস ওব বুকের পাঁজর কযটা কাঁপিয়ে এসে বাইরের আবহাওয়াটা ভারী ক'রে তোলে, উপস্থিত সকলেই সকলেব মুখের দিকে তাকায়, কিন্তু কেউই উত্তর দেয না। কিছুক্ষণ নীরবে কেটে যায়, আবার যেন একবার হাঁপ নিয়ে থাকোহবি বলে "এখন কোলের মেয়েটাকে দুধের বদলে ফ্যান খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখতে হয়েছে, দুধ কেনবার পযসা কোথায? বলে, নিজেদের পেটেই দুবেলায ভাত জোটে না, তার দুধ! আব কীই বা আছে, যা বেচে দুধ খাওয়াব! বাকী শুধু ভিটেটুকু। এঃ হেঃ হেঃ হেঃ!...."

আবার সেই টেনে হাসি! ও হাসির শব্দ কান্নাব মত করুণ, তবু ও হাসে।

জগু দাওয়ায় ব'সে তামাক খেতে খেতে ভাবছিল, ঘরের ছাদটা মেরামত করাতে না পারলে এবারের বর্ষায় হয়তো সব সমেত একদিন পাতাল-প্রবেশ ক'রতে হবে, কিন্তু উপায়ই বা কি, তাতে তেমন পয়সাই বা কোথায় যা এই বেকার অবস্থায় কিছু খাওয়া খরচের জন্যে রেখে বাকী সে ঘর মেরামতে লাগাবে। তা ছাড়াও মার রেখে যাওয়া গয়নাগুলো, যা এই কয় বছব মহাজনেব কাছে থেকে সুদে আসলে সমান হ'তে চ'লেছে, তাও উদ্ধার করা খুব দরকার—নইলে আর চলে না।

এতগুলো ভাবনা যখন অসংলগ্নভাবে জগুর মগজে পবস্পব পরস্পরের সঙ্গে তাল ঠোকাঠুকি করছিল, তখন ধীরে ধীরে বাখারীর দবোজা ঠেলে এলো থাকোহরি; থাকোহরির দৃষ্টি লোলুপ, জগুর সযত্ন-রোপিত পুঁই মাচা, লঙ্কা গাছ থেকে আরম্ভ করে হাত দেড়েক চারা শাকের ক্ষেত পর্য্যন্ত এক নজরে দেখে নিয়ে দাওয়ায় উঠে এলো। মৃদু তিরস্কারের সঙ্গে ব'ললে—"লালশাকেব ক্ষেত শুকিয়ে উঠেছে কেন? রোজ জল না দিলে গাছ বাঁচে? তোর যেমন কাণ্ড!—"

জগু মুখ থেকে হুঁকা সরিয়ে ব'ললে—"বোস।"

থাকোহরি ব'স্‌লো দুই হাঁটু জড়ো ক'রে, উবু হ'য়ে; চারিদিকে আর একবার অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি বুলিয়ে ব'ললে—

"খাওয়া-দাওয়ার পাট মিটিয়ে দিয়েছিস্ বুঝি? তা বেশ। বেশ। একদিক দিয়ে, মাইরি ব'লছি জগু, তোর মত কাজের লোক আর আমি একটি খুঁজে পাই নে। এমন তোর ..."

জগু ওর উচ্ছ্বাসে বাধা দিলে; ব'ললে—

"এখনও চানই হয়নি তার খাওয়া!"

পরে থাকোহরির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন ক'রলে—

"তোমার?"

থাকোহরি যেন এই প্রশ্নটার জন্যই তৈরী হ'য়েছিল, কপালে একবার করাঘাত ক'রে উত্তর দিলে—

"আমার খাওয়ার কথাও আবার লোকে জিজ্ঞেস করে! বলে কোথায় চাল আর কোথায় হাঁড়ি!"

এ প্রসঙ্গটার ইতি ক'রতেই বোধহয় জগু এই সময় হুঁকোটা থাকোহরির হাতে দিলে, থাকোহরি নির্ব্বাকে সেটায় পর পর টান দিতে লাগলো, ক'লকের আগুন শেষ হ'তে মুখ তুলে দেখলে জগু উঠবার উপক্রম ক'রছে।

হুঁকোটায় শেষবার টান দিয়ে থাকোহরি মুখের ধোঁয়া ছেড়ে ব'ললে—"গোটাকয়েক টাকা ধার দিতে পারিস্ জগু? টাকা আষ্টেক, নেহাৎ কম করে পাঁচটা টাকা দে, দেখ্ আমার বড় টানাটানি—মানে বড় অসময় প'ড়েছে মাইরি, দে ভাই! কেনা গোলাম হ'য়ে থাকবো তোর। নইলে পাওনা টাকার জন্যে ভুব্‌না শালা ."

জগুর বড় বড় চোখ দুটো বিস্ময়ে আরো বড় হ'য়ে উঠলো, ব'ললে "আমি দেব তোকে টাকা ধার? পাগল হ'য়েছিস। পাবো কোথায়?"

থাকোহরি যেন অনেকটা আশা নিয়েই এসেছিল, তাই হতাশায় নুয়ে প'ড়লো, উত্তর দেবার মত ওর ক্ষমতা রইল না। কিছুক্ষণ পরে, শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলবার সঙ্গে সঙ্গে যেন উচ্চারণ ক'রলে—

"পারবি নে?"

জগু নির্ব্বাকে মাথা নাড়লে; থাকোহরিও হাতের হুঁকোটায় টান দেওয়া ভুলে নতমুখে ব'সে রইল।

কিছুক্ষণ এমনিভাবে কেটে যাবার পরে জগু মুখ তুলে ডাকলে—"থাকোহরি! ওরে থাকো!"

থাকোহরি মুখ তুলে তাকাতে প্রশ্ন ক'রলে—

"খুব বেশী দরকার!"

থাকোহরি জানালে হ্যাঁ।

জগু কিছুক্ষণ কি ভেবে উঠে ঘরে গেল, যখন ফিরে এলো তখন তার হাতে সোণার একটা শিলে আংটি ঝক্ ঝক্ ক'রছে।

বার কয়েক সেটার দিকে তাকিয়ে ব'ললে—

"আমার অবস্থার কথাও তো জানিস, দিন তিনেক একবেলা খাচ্ছি, কিন্তু তবু...."

একটু চুপ ক'রে থেকে যেন স্বগত ব'ললে —

"আর শুধু এইটুকুই বাকী ছিল, বাপের দেওয়া সখের আংটি! আজ তোর হাতেই দিই, নিয়ে যা থাকোহরি। কিন্তু ..."

থাকোহরির দিকে তাকাতেই কৃতজ্ঞতায় সে কেঁদে ফেলার উপক্রম ক'রলো।

বাধা দিয়ে জগু ব'ললে—

"কিন্তু এক কথা—এটা ভুবনাকে দিয়ে ব'লবে এক কুড়ির একটাকা কমে আমি বেচবো

না; সোজা কথা, আর যে টাকা পাবে তার অর্দ্ধেক আমার। তবে আমার নাম করিস না। সোজা ব'লবি অমুক লোকের আংটি, কারণ ওর সঙ্গে আমার রাগারাগি কি না।—নইলে আমিই যেতুম...।"

থাকোহরি আংটি নিয়ে পেছন ফিরে নামতেই জগু ফিরতি ডাকলে—"শোন্—"

থাকোহরি ফিরলো।

রুক্ষস্বরে যথাসম্ভব চাপা দেবার চেষ্টা ক'রে জগু ব'ললে—"মনে রেখো আমি শুধু হাতেও তোমায় বিশ্বাস ক'রে টাকা দিচ্ছি, কিন্তু তিন মাসের মধ্যে শোধ করা চাই; নইলে. "

থাকোহরি জগুর সে রুক্ষতা গায়েও মাখলো না, এক মুখ দাত বের করে ব'ললে, "তুই আমায় তেমনি পেলি জগু। এতদিন দেখেও তুই আমায় চিনলি নে?"

জগু কি একটা জবাব দিতে গিয়ে চুপ ক'রে গেল।

এক হাতের তালুতে অন্য হাত ঠুকে, মুখখানা অসম্ভব রকম ভারি ক'রে থাকোহরি ব'ললে—"এটা জেনে রাখিস জগু, মরদ্‌কা বাত, আর হাতিকা দাঁত। এর নড়চড় হবার জো-টি নেই, মানে পির্বাথিবী উল্টে গেলেও একথা মিথ্যে হবার উপায় নেই। তেমনি মরদ এই থাকোহরি! কাউকে সে পরোয়া করে না, তা সে হোকনা কেন ভুবনা আর হোকনা কেন লাট বেলাট। ও সব আমার কাছে নেই! সোজা মানুষ আমি, ওসব বেঁকা চোরার ধার ধারিনে। জানিস জগু, এই তোর কাছ থেকে আংটি বেচার টাকা যেমন হাত পেতে নিচ্ছি, তেমনি, তিনমাস কেন —আসছে মাসে যদি না হাত উপুড় ক'রে ফেরৎ দিয়ে যাই তো —আমার নামে খেঁকি কুকুর পুষিস্।"

জগু নীরবে ব'সে রইল উত্তর দিলে না।

থাকোহরি যেতে যেতে জগুর সযত্নরোপিত পুঁই শাকের গোটা কয়েক ডাঁটা মুচড়ে ভেঙ্গে নিয়ে,—জগুর বাড়ীর পুঁইডাঁটা চচ্চড়ি খেতে যে অন্য পুঁইডাঁটার চেয়ে সুস্বাদু এই কথাটাই সবিস্তারে প্রকাশ ক'রতে ক'রতে বার হয়ে গেল। জগু ক'লকের ওপোরে হাত রেখে দেখলে তাতে আগুন আছে কিনা, তার পরে বোধ হয় আগুন না থাকাতেই সেটাকে দেয়ালে হেলান দিয়ে রেখে ব'সে রইল পথের দিকে তাকিয়ে, থাকোহরি এখনি টাকা নিয়ে ফিরবে ব'লে।

রাত্রে, ঘুমিয়ে লোকে যা স্বপ্ন দেখে তা ভোলাই স্বাভাবিক, আর মনে থেকেও কোন লাভ নেই, কারণ কালের স্রোতে ছেঁড়া সুতোর মত এক এক ক'রে ভেসে যায়। কিন্তু, যার সৃষ্টি হয় জাগরণে, দিনের আলোয়, অফুরন্ত অবসরে যার পুষ্টি, তাকে ভোলা যদিও সহজ নয়, তবু অবস্থা বিপর্য্যয়ে মানুষই মানুষকে উপদেশ দেয় এই ব'লে যে —ও তোমার নয়, তোমার সাজে না। তেমনি অবস্থায় প'ড়েছে জগুও।

বাপ যদুনাথ যখন ওর জগন্নাথ নাম উচ্চারণ ক'রতে ক'রতে প্রাণ ত্যাগ করে তখন ওর বয়েস আঠারো, তার পরে আজ কয়বছর ধীরে ধীরে কেটে গেছে, বাপের অভাবে, যদুর যা কিছু জমা ছিল ভাঙ্গিয়ে, আর হাত পুড়িয়ে রেঁধে খেয়েও বেশ স'য়ে এসেছিল, কিন্তু মুস্কিল ক'রলে অর্থের অভাব। বাপের আশা ছিল ছেলে হাকিম হ'য়ে হুকুম ক'রতে না পারলেও ফাঁড়িদার হ'তে পারে এবং সেই আশায় গ্রাম থেকে তিন মাইল দূরের প্রাইমারী স্কুলে ছেলেকে ভর্ত্তি ক'রেও দিয়েছিল, কিন্তু ছেলের লক্ষ্য ছিল বোধ হয় অন্য রকম, তাই পথেই শ্লেট বই রেখে সোজা চম্পট দিতে ইতঃস্তত ক'রতো না। কিন্তু আজ সে দিনের সঙ্গে আর ওর অবস্থার সঙ্গে অনেক পার্থক্য ব'লেই বোধ হয় জগুর মনে দুঃখ হয়, সময়ে অসময়ে তাই কুলুঙ্গীতে তোলা সেই পুরোনো বই শ্লেটগুলো নাড়াচাড়া করে, আবার গুছিয়ে রাখেও। বটতলার ছাপা, রংদার দুই একখানা নভেল হাতে এলেও ফিরাতে পারে না, ছেঁড়া টোঙ্গা

কবা খবরের কাগজও প'ড়তে সাধ হয়। বিস্মৃত সুখস্বপ্নের রেশের মত হঠাৎ যদুর আশার কথা মনে পড়ে, হয়তো নিজেরও কোন সুপ্ত বাসনা ওর সঙ্গে জড়ানো ছিল—তারা আজ জেগে ওঠে বেদনার রাজ্যে, নিরাশার শয্যায়।

দুঃখ হয়, মায়া হয় ওদের দেখে; কিন্তু দেখেই বা লাভ কি? আর লাভ-লোকসান খতিয়ে দেখার ধৈর্য্যও তো ফুরিয়ে এসেছে, তবু বেশ আছে সে। মাঝে মাঝে বিরক্ত করে শুধু ঐ থাকোহরিটা এসে; হয়তো বা ওর তাসের আড্ডায় টেনেও নিয়ে যায়।

আংটি সে নিয়ে গেল, কিন্তু আর ফিরে এলো না।

কিছুক্ষণ অপেক্ষার পরে জগু স্থির ক'রলে থাকোহরি হয়তো এবেলায় টাকা পায়নি, ওবেলা এসে দিয়ে যাবে।

কিন্তু, পরপর কয়দিন কেটে যাবার পরও যখন থাকোহবির দেখা পাওয়া গেল না, তখন ও সত্যই চিন্তিত হ'য়ে পড়লো।

প্রতিদিন দূরের ঐ কারখানার বাঁশী ডাক দেয়—হারানো স্বপ্নের এতটুকু সুর যেন ওব কঠোর স্বরে মিশান আছে!

গ্রামের এই সংক্ষিপ্ত জীবন, এই একটানা সুর—এই একতালে পা ফেলে চলার ওপরে একটা বিতৃষ্ণা এসে গেছে, সব একঘেয়ে, কিন্তু এরই বাধা কাটিয়ে সে চায় বৈচিত্র্যের মাধুরী।

কিন্তু তার উপায়? সব গেছে, শেষ সম্বল ঐ আংটিটা! . . .

মনে মনেই সে গর্জ্জে উঠল—

দাঁড়া হতভাগা!

* * * * * *

রাত্রি গভীর, ঘুম ভেঙ্গে জগু শুনলে দূরে, কিছুদূরে বাঁশী বাজছে।

ও সুর সাধা যে কাব হাতের, ও বাঁশী যে কে বাজায় তা বুঝতে দেরী হ'লো না, কাবণ ও বড় পরিচিত।

জগু উঠে ব'সলো, বালিশের তলা থেকে দেয়াশালাই বের ক'রে আলো জ্বাললে, তামাক খেলে, তারপরে ঘরেব দরোজায় তালা দিয়ে বার হ'লো বংশীবাদকের উদ্দেশ্যে।

নেশাখোর, ধাপ্পাবাজ হ'লেও থাকোহরির বাঁশী বাজানোর হাত আছে; ছোকরা উচ্ছন্নে গেল শুধু সঙ্গীর পাল্লায় পড়ে।

কিন্তু, তাতে জগুর কি? চুলোয় যাক্ ওর সঙ্গী, আর চুলোয় যাক ও, জগুর চাই নিজের জিনিস, হয় আংটি, নয় টাকা।

থাকোহরি পরম নিশ্চিন্তে নদীর বালুচড়ায় ব'সে বোধহয় চোখ বুজিয়েই বাঁশীতে ফুঁ দিচ্ছিল; পেছনে, জগুর পায়ের শব্দে খেয়াল হ'লো না। খপ্ ক'রে ওর চুলের মুঠি ধরেই জগু গর্জ্জে উঠলো—

"তবে রে শালা—"

থাকোহরি শীর্ণকায়, জগুর তুলনায় দুর্ব্বল; তাই বোধহয় লাগবার ভয়ে মাথাটাতে ঝাঁকানি পর্য্যন্ত দিলে না। কাতর স্বরে ব'ললে—

"ছাড় ভাই জগু, লাগছে মাইরি।"

জগু চুলের মুঠি ছাড়লে বটে, কিন্তু ওর একখানা হাত শক্ত করে চেপে ধরে। পাশে বসে প'ড়ে কঠোর স্বরে ব'ললে—

"আংটি দে, নইলে এক চাপড়ে আজ যদি তোর জান না নিই তো—"

জগুর মুঠোর মধ্যে থেকেই থাকোহরির হাতখানা একটু কেঁপে উঠলো ব'লে মনে হ'লো, কিন্তু সে ক্ষণিকের, চটে উঠে থাকোহরি জবাব দিলে—

"আংটি আমি সঙ্গে নিয়ে ঘুরছি নাকি যে চাইবা মাত্তর ফেলে দেব! চল আমার সঙ্গে বাড়ীতে, ফেলে দিচ্ছি তোর আংটি। আমি খেয়ে ফেলি নি তোর জিনিস।"—

জগু উত্তর দিলে না, কিন্তু হাতের মুঠোটায় যেন আরও একটু জোর দিলে ব'লে মনে হ'লো।

উঠে দাঁড়িয়ে থাকোহরি ব'ললে—

"অত ছোট মন নিযে থাকোহরি বাস করে না, মনে রাখিস্ জগু। চল্ আমার বাড়ী—তোর আংটি যদি এখনি না ফেলে দিই তো আমার নামই থাকোহরি নয়; চল—"

জগু ওব পাশাপাশি চ'ললো। হাত অনেক আগেই ছেড়েছিল, তবু পাশে পাশে যাওয়াই ভালো; কারণ ওকে বিশ্বাস কি! ও নেশাখোর, ধাপ্পাবাজ! ...

মাটির দেওয়াল ঘেবা ও গোলপাতার ছাউনী দেওয়া মুখোমুখি কযখানা ঘর, হাত তিনেক চওড়া হাতনে, আর তার কোলেব কাছের ছোট উঠোনখানি বেশ পরিষ্কাব, চাঁদেব আলোয় যেন ধুযে যাচ্ছে।

প্রভুব পায়ের শব্দে জেগে বোধহয পোষা কুকুরটা বার দুই ডেকে উঠলো, তারপর লুটিয়ে প'ড়লো পায়ের কাছে।

অন্ধকাব দাওয়াব ওপাশ থেকে থাকোহবির মাযের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো -"থাকো এলি বাবা?"

থাকোহবি সে কথাব কোনও উত্তব দিল না, হাতনেব একখানা ছেড়া চাটাই পেতে জগুব উদ্দেশে ব'ললে--

"বোসো।"

জগু বসলো।

এক ক'লকে তামাক সেজে এনে থাকোহবি জগুর হাতে দিয়ে ব'ললে--"ব্যাপাব কি জানো।"

জগুব তখন ব্যাপার জানার মত সদিচ্ছা না থাকলেও হুঁকোব মাযাটাও ত্যাগ ক'বতে পারলো না—নির্ব্বাকে তামাক টানতে লাগলো।

থাকোহবি ব'ললে—

"হুঁঃ! তারপর, ভুব্‌নাকে ব'ললাম তোমার কথা, আংটিটাও দেখালাম, শেষে ও শালা বলে কি জানো? বলে ও সোনা পাকা নয, খাদ মিশেল, --এই কুড়ি সে কিছুতেই দেবে না, আমিও সহজে ছাড়বার পাত্তব নই, বললাম, সে হবে না, জগু আমার বন্ধু লোক, আর বিশ্বাস করে আমার হাতে যেখানে সোণাব জিনিষ ছেড়ে দিযেছে, সেখানে কেটে ফেললেও আমি তার নেমক হারামি করতে পারবো না। এত কথা ব'লতে তবে ভুব্‌না এলো সোজাপথে! তাও পনেরোব বেশী কিছুতেই উঠলো না—"

ব'লে দুটো টাকা ট্যাঁক থেকে বের ক'রে জগুব হাতে দেবাব সঙ্গে সঙ্গে আর বাকী তের টাকার হিসেব মুখোমুখি চট্‌পট্ দাখিল করে ফেললো। জগু কোনও কথা বলতে পারলে না, টাকা দুটোর দিকে তাকিযে থাকতে চোখ দুটো যেন জ্বালা ক'রতে লাগলো— সেই সঙ্গে ডান হাতখানাও মুষ্টিবদ্ধ হ'যে উঠে এলো থাকোহরিব কাঁধ লক্ষ্য করে। কিন্তু কাঁধের ওপরে পড়লো না, পেছন থেকে বাধা দিল' থাকোহরিব মাব কণ্ঠস্বব।

জগু ফিরে দেখলে কম্পিত হাতের প্রদীপ নিয়ে থাকোহরির মা ধীরে ধীরে এই দিকে আসতে আসতে স্নেহকাতব স্ববে ব'লছে--

"ভাত খাবি নে থাকো? একে বৌমানুষ, তাতে কচি ছেলের মা, আর কত রাত তোর ভাত আগলে রান্নাঘরে ব'সে থাকবে, বল্‌তো বাবা?"

জগুর মুষ্টিবদ্ধ হাতখানা অজ্ঞাতেই যথাস্থানে ফিরে এলো। থাকোহরির মা এগিয়ে এসেছিল, হাতের প্রদীপটা তুলে ধরে দৃষ্টির ক্ষীণতা দূর করার চেষ্টায় দুই চোখ বিস্ফারিত করে কিছুক্ষণ নির্বাকে জগুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপরে ব'ললে—

"ও, তুমি জগন্নাথ! ও পাড়ার যোদোর বেটা! আমি বলি বুঝি আর কেউ ..."

জগু নির্ব্বাকে বিদায় নিলে।

নির্জ্জন পথ চ'লতে চ'লতে হাওয়ায় তাল পাতা পড়ার মড় মড় শব্দে ও একবার শিউরে উঠলো, তারপরেই মনে হ'লো হাতের তলায় থেকেও টাকা দুটো যেন বুকের মধ্যে আগুনের সেঁক দিচ্ছে।

*   *   *   *

যন্ত্রদানবেরও দয়া আছে, তাই বোধ হয় তার লক্ষ লক্ষ সেবাইতের নামের খাতায় একদিন জগুর নামটাও লেখা হয়ে গেল—

"শ্রীজগন্নাথ কাহার।"

মনের আনন্দে পিতৃ-পুরুষের ভিটেয় পুরাতন মরিচা ধরা তালায় চাবি লাগিয়ে জগু শহরের পথ ধ'রলো, লাল ধুলোয় ভরা সোজা, বেঁকা, উঁচু-নীচু পথ, প্রায় ক্রোশ তিনেক গেলে তবে শহর।

তা হোক, তবু ওকে আজ এবেলার মধ্যে পৌঁছাতেই হবে, কারণ কাল সকাল থেকে কাজ আরম্ভ, আজ তার যোগাড় ক'রতেই হবে, নইলে উপায় নেই। আর কি দরকার উপায়ের? এতদিন নিরবিচ্ছিন্ন অবসাদের মধ্যে থেকে থেকে অবসরের ওপরে ওর একটা গভীর অবসাদ এসে গেছে, তাকে দূর করতে হবে নূতন জীবনের প্রারম্ভে, নব কাজের প্রেরণায়। তাই চাই আজ ঐ একটানা ব্লকের একখানা ঘর, নিজের নামের ঘরখানাকে মনের মত সাজাতে, গোছাতে, যাতে সামনের কাজের সাতটা দিন কোনও রকমে পার হয়ে যায়, তারপর আবার দেড়দিন ছুটি, শনি রবিবার।

এ ছুটি অবসাদ ভরা নয়, জীবনের চাঞ্চল্যে ভ'রপুর,—আনন্দে উজ্জ্বল।

সত্যিই জগু একসঙ্গে পেল অনেকগুলো জিনিষ,—ঘর, কাজ ও সঙ্গী। কাজ সে নিয়মমতই করে, ঘরখানাও যাহোক কিছু দিয়ে সাজিয়ে ফেলেছে, আর সঙ্গী অর্থাৎ সুধুয়ার গল্প, রাইচাঁদের দেশের কাহিনী আর ফকিরের ভাঙ্গা বেসুরো হারমোনিয়মের সঙ্গে তেমনি বেয়াড়া গলার গান শুনে শুনে মনটা অনেকটা হাল্কা হ'য়ে এসেছে।

তবু হঠাৎ মনে প'ড়ে যায়, থাকোহরির শুক্‌নো মুখ আর ভুবনার তাগাদা। ও-গুলো জীবন থেকে নিশ্চিহ্নে মুছবার জন্যেই ও রোজ সঙ্গীদের সঙ্গে মিশে সিদ্ধি খায়,—হারমোনিয়মের পর্দায় পর্দায় সুর তুলে চীৎকার করে—

"যতদিন দেহে প্রাণ রহিবে .."

তাসের আড্ডা আজও জ'মে ওঠে, কিন্তু থাকোহরির দাওয়ায় নয়, ফকিরের ঘরে, সেখানে প্রদীপের বদলে কোনও দিন বা হ্যারিকেন, কোনও দিন বা কেরোসিনের ডিবে জ্ব'লে জ্ব'লে অনবরত ধূমোদগার করে, আর ঐ আলোয় চেষ্টা ক'রে দেখা যায়—ঘরের দেয়ালে আঁটা বিড়ির বিজ্ঞাপন, কালীঘাটের কালীর পট কিম্বা শ্রীকৃষ্ণের লীলার দুই একখানা ছবি; হয়তো বা রেশমী চুড়ীর শিকল, আর ধূলি-মলিন কাপড়-জামা।

দড়ির খাটিয়ায় ব'সে ওরা তামাক নয় বিড়ির বাণ্ডিল মিনিটে মিনিটে ধ্বংস করে, সেই সঙ্গে চলে গান, গল্প আর খেলা, রাত দশটা পর্য্যন্ত।

প্রায় বছরখানেক পরের কথা।

ছুটির দিন; দরোজার ফাঁক দিয়ে চোখে সকালের আলো এসে লাগলেও জগু বিছানা ছাড়ে নি—ওঠেনি, দরোজাও খোলেনি।

হঠাৎ বাইরে থেকে বন্ধ দরোজার ওপোরে কে আঘাত ক'রে ডাকলে "জগু"।

এ কণ্ঠস্বর সুধুয়া, ফক্‌রে কিম্বা রাইচাঁদের নয়—তাই উঠে দরোজা খুলেই চ'মকে উঠলো—দেখলে সামনেই থাকোহরি দাঁড়িয়ে—

থাকোহরিও যেন জগুকে দেখে চিনতে পারছে না, তাই যেন নিস্পলকে, বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে; ওর বুকের সব কয়খানা পাঁজরা গুণে নেওয়া যায়, চোখ প্রায় আধ ইঞ্চি ব'সে গেছে; মাথার চুল বড়, রুক্ষ, হাওয়ায় উড়ছে।

এ যেন এক বছর আগের সে থাকোহরি নয়, তার কঙ্কাল।

জগুর জিহ্বা যেন অজ্ঞাতে উচ্চারণ ক'রলে।

"থাকোহরি!"

থাকোহরি তাকিয়েইছিল, শান্ত, অথচ কাঁচের মত উজ্জ্বল সে চোখ। ধীরস্বরে উত্তর দিলে,

"হ্যাঁ আমি। টাকা চাইতে এসেছি জগু, এই শেষবার, আর কখোনো চাইবো না, মাত্তর দশটা টাকা ধার দে জগু—"

জগু বিস্ময়ে নির্ব্বাক হ'য়ে গেল।

থাকোহরি অন্য কোনও দিনের মত এগিয়ে এসে জগুর পা জড়িয়ে ধ'রলে না, কাঁদলেও না; যেমন শান্ত ধীরস্বরে আগে কথা ব'লেছিল ঠিক তেমনি স্বরেই ব'ললে—

"ভুবনা টাকার জন্য আমার মাকে মেরেছে; বৌকে ..."

ওর গলার আর স্বর বার হ'লো না। কিন্তু জগুর মন তখন পাথরের মত শক্ত, থাকোহরির পূর্ব্ব অপরাধের অধ্যায় পর পর ওর মনে ভেসে উঠলো; মনে হ'লো ওকে বিশ্বাস করা উচিত নয়, কারণ ও মাতাল, বিশ্বাসঘাতক, ধাপ্পাবাজ!

অসহ্য রাগে কাঁপতে কাঁপতে জগু কয়েকপা এগিয়ে এলো, থাকোহরির জীর্ণ-শীর্ণ দেহে একটা ঠেলা দিয়ে চীৎকার ক'রে উঠলো—

"কিছু শুনতে চাইনে, বেরো তুই এখান থেকে, বেরো ব'লছি, নইলে ঠেঙিয়ে পা ভাঙবো তোর ..."

মুখ থুবড়ে প'ড়তে পড়তে থাকোহরি কোনও রকমে নিজেকে সামলে নিলে; তারপর একবার মাত্র জগুর আরক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে চ'লে গেল।

সারাদিন মনটা বড় খারাপ, কিছুই ভালো লাগছে না; সুধুয়ার রসিকতা, রাইচাঁদের দেশের কাহিনী আর ফক্‌রের গান, সবই যেন কেমন একঘেয়ে লাগছে।

ভালো নয়, দুনিয়ার কিছু ভালো নেই, কেউ কারো ভালোও করে না, সব স্বার্থপর, ধাপ্পাবাজ, জুয়াচোর; একা থাকোহরিই নয়।

থাকোহরি নীরবে চ'লে গেল, কিন্তু কেন?—ব'লবার মত কিম্বা জগুর কাজের প্রতিবাদ করার মত ক্ষমতাও কি তার ছিল না? কিম্বা ব'লতে এসেছিল—'ভুবনা, পাওনা টাকার জ'ন্যে বাড়ী এসে ওর বুড়ী মাকে মেরেছে, আর বউকে ..." কথাটা ভালো ক'রে শোনাও হয় নি; কিন্তু এতক্ষণ পরে মনের একটা অজ্ঞাত স্থান যেন বেদনায় পূর্ণ হ'য়ে উঠলো, সেই সঙ্গে চোখের সামনে ভেসে উঠলো থাকোহরির মায়ের মুখের সঙ্গে তারও মরা মা-বাপের ছবি, এমনি কাতর এমনি অসহায়তার সাদৃশ্য। আজও সেখানে সাত পুরুষের ভিটের গাঁথুনি মাটির মধ্যে মিশে যায় নি—তাই আজও সেই দূরের পানাপুকুর, উঁচু-নীচু গ্রাম্য পথ, বন-

জঙ্গলের সঙ্গে দুর্ব্বল, স্নেহকম্পিত হাত বাড়িয়ে ক্ষীণস্বরে মনের একপাশ থেকে ডাক দিচ্ছে। সেখানে আজও নদীর বালুচড়ায় থাকোহরির বাঁশী বাজে, বন-বীথির মধ্যে থেকেও নিরাশ অবসরে পাখীর কূজন কাণে আসে।

জগু চঞ্চল হ'য়ে উঠলো—

নাঃ, থাকোহরিকে অমন ক'রে তাড়ানো ভালো হয় নি।

* * * * *

ঘরের দরোজায় তালা এঁটে, ফকরে, সুধুয়া, রাইচাঁদকে ব'লে পরদিনই সকালে জগু বাব হয়ে প'ড়লো, সোজা গ্রামের পথ ধ'রে।

কত'দিন ... কতদিন গ্রামে যায়নি, এপথেও হাঁটেনি, গ্রামবাসীদের চেনা মুখগুলোও ভু'ল হ'য়ে এসেছে বোধহয়—কিন্তু ..

ভাবতে ভাবতে সমস্ত পথটা এসে থাকোহরির বাড়ীর কাছে ও থ'মকে দাঁড়ালো, থাকোহরিব বাড়ী পুলিশে ভর্ত্তি, পথের ধুলোয় প'ড়ে ওর মা কাঁদছে, বৌ ব'সে আছে নিস্তব্ধভাবে, কোলের মেয়েটা বোধহয় কেঁদে কেঁদে কোলের ওপরেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

জগু এগিয়ে এলো।

রুদ্ধশ্বাসে ও যে খবরটার প্রতীক্ষা করছিল, তাই পেলে গ্রামবাসীর একজনের মুখ থেকে, কাণের কাছে মুখ এনে সে ফিস্ ফিস্ করে শুনিয়ে দিলে।

'ভুবনাকে খুন ক'রে থাকোহরি কাল রাত্তিরেই পালিয়েছে। ”

নির্ব্বাক দাঁড়িয়ে জগু অনুভব ক'বলে পৃথিবী যেন পায়ের তলার থেকে ধীরে ধীরে স'বে যাচ্ছে, মৃদু থেকে মৃদুতর হয়ে কাণে আসছে থাকোহরির মায়ের করুণ ক্রন্দন।

এজাহারে জগু ব'ললে—

"ও কাজ ও করেনি হুজুর, করেছি আমি।"

ওব কণ্ঠস্বরে দুর্ব্বলতা নাই, চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল।

থাকোহরি যেন জগুর কথার ক্ষীণ প্রতিবাদ ক'রতে গেল, কিন্তু পারলে না,—বিবর্ণ ঠোঁট দুটো একবার মাত্র কেঁপে উঠেই স্থির হ'য়ে গেল।

চারিদিকের লোকজনের বিস্মিত দৃষ্টির সঙ্গে—জগুর উদ্দেশ্যে আর দুটি নারীর সজল চোখেব কাতর দৃষ্টি ভেসে এলো, কৃতজ্ঞতা বহন ক'রে।

জীবনের ক্ষেত্র আজ আরও বড়, আরও বিস্তৃত; সীমার ঐ ক্ষীণ রেখাটুকুও যে, যে কোনও মুহূর্ত্তে লুপ্ত হ'য়ে যাবে, তা জগু জানে; কিন্তু সান্ত্বনা এইটুকু, যে আর কেউ কোনওদিন ওর কাছে সাহায্য চাইতে আসবে না, থাকোহরিও নয়। কারণ, জগু আজ তার সব দেনা সুদ সমেত শোধ ক'রে তাকে দিলে—সঙ্কীর্ণ জীবন; আর তার বদলে নিলে মৃত্যুর অপার মুক্তি। কারা কপাটের শিকল বাজিয়ে প্রহরী জানায় সে ঠিক আছে।

অন্য লোকে নিজেদের মধ্যে বলা কওয়া করে—লোকটা খুনী।

জগু ভাবে এ বরঞ্চ বেশ হ'ল,—

বড়বাবু এতদিন নিশ্চয় তার জায়গায় অন্য লোক ভর্ত্তি ক'রেছে; ফকরে, সুধুয়া, রাইচাঁদও এতদিন নিশ্চয় তার খবর পেয়েছে; এখন হয়তো জগুকে ম'নে পড়লে ওদের ভয় করে, কিম্বা ঘৃণা হয়। কিন্তু থাকোহরি! থাকোহরি তো তাকে জানে! হয়তো জানে ব'লেই আজও সময়ে সময়ে পাষাণপ্রাচীর ডিঙিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়—তারপর সেদিনের মত নির্ব্বাক্ মুখে ধীরে ধীরে বার হ'য়ে যায়। তাহ'লেও বাইরে থেকে তার বাঁশী বাজে, আর সেই সুরের সঙ্গে ভেসে আসে ওর মা বউয়ের রোদন ভরা কণ্ঠস্বর—ওরা যেন এক সঙ্গে জগুর আত্মার মুক্তি-প্রার্থনা ক'রছে।

নীলনেশা

বিমল মিত্র

রায়সাহেব মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের শ্বশুরও রায়সাহেব। রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি। শ্বশুর-জামাই দুজনেই রায়সাহেব, এমন যোগাযোগ সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু শ্বশুর জামাই দুজনের বহু দুর্ভাগ্যের ফলেই বুঝি এমন ঘটেছিল।

ঘটনাটি ঘটেছিল পাটনায়।

মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় তখন পাটনা সেক্রেটারিয়েটের সামান্য একজন সুপার ভাইজার থেকে পদোন্নতি পেয়ে সুপারিনটেণ্ডেন্ট। শহরে এবং অফিসে বেশ প্রতিপত্তি তাঁর। সামনের সব ক'টা উন্নতির ধাপ চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে। একটিমাত্র ছেলে, রূপসী স্ত্রী আর একটি সুন্দর অট্টালিকার মালিক। ব্যাঙ্কের টাকায়, স্বাস্থ্যের জৌলুসে প্রতিপত্তির প্রসারে মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের বৃহস্পতি তখন তুঙ্গী-ই বলতে হবে।

সেই সময়ে সেই চৌদ্দবছর আগে চাকরি খুইয়ে রায়সাহেব জে ডি ব্যানার্জি মেয়ের কাছে এলেন। সঙ্গে আরো তিনটি অবিবাহিতা মেয়ে। জ্যোটি, লোটি আর রুবি। জ্যোটি, লোটি, আর রুবিকে নিয়ে মিলির বাড়িতে এলেন। মিলি বড় মেয়ে।

মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় স্টেশনে গিয়েছিলেন মিলিকে নিয়ে। শ্বশুরকে চিনতেন। রাশভারী, শৌখিন, সাহেবী মেজাজের লোক। সস্ত্রীক রিসিভ্ করতে না গেলে কী ভাববেন তিনি।

শীতকাল সেটা, তাঁর পেটেন্ট স্যুট্ সাহেব-বাড়ির অভিজ্ঞ টেলারের তৈরি। হাতে স্টিক্। বাটন্-হোলে রোজ। মাথায় ফেল্ট-হ্যাট্—বাঁকানো। মুখে লম্বা চুরুট।

চায়ের টেবিলে মিলি বললে—তুমি তা হলে চাকরি ছেড়ে দিলে বাবা?

সেই সময়ে চৌদ্দ বছর আগে চাকরি ছেড়ে দেওয়া চারটিখানি কথা নয়। বিশেষ করে জ্যোটি, লোটি, রুবির তখনও বিয়ে দিতে হবে। সারাজীবন মোটা মাইনে পেয়েছেন, আর দুহাতে খরচ করেছেন। না করেছেন একটা বাড়ি, না জমিয়েছেন টাকা। কেবল লাঞ্চ পার্টি আর স্যুট্।

মিলির কথার উত্তরে বললেন—চাকরি আর করবো না রে, মিলি—

—তা হলে? ... কথাটা বলতে গিয়ে বড় মেয়ের গলায় যেন আট্‌কে গেল।

—বাঃ, তা তোরা আছিস কী করতে?

বলে হাসতে হাসতে চুরুট ধরালেন একটা। তারপর বললেন—আমি বুড়ো বাপ সারা জীবন চাকরি করি, এইটেই তুই চাস নাকি?

কথাটা বলে মিলি, জ্যোটি, লোটি, রুবি, শেষ পর্যন্ত জামাই মৃত্যুঞ্জয়ের ওপর চোখ বুলোলেন। কিন্তু কেউ হাসলে না দেখে নিজেই হো হো শব্দে হেসে উঠলেন। তারপর চায়ে চুমুক দিয়েই বললেন—এ কী চা রে মিলি? কত করে পাউণ্ড? ফ্লেভার নেই তো তেমন—

আড়চোখে স্বামীর দিকে চেয়ে মিলি কুণ্ঠিত হয়ে বললে—কেন বাবা, এ তো দামী চা...

—তা হোক্‌গে দামী, আমার জিভে এ-চা চলবে না মা—

ঘাড় নাড়তে লাগলেন রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি। সদ্য কলকাতা ফেরত। পাটনার পাড়াগেঁয়ে মেয়ে-জামাইকে ফ্যাশন শেখাবার অধিকার আছে বৈকি তাঁর।

—আর, এ কাপ-ডিশ্‌ও চলবে না। আর কিছু না হোক, চা-টা বাপু আমাকে দিয়ে পছন্দ করিয়ে কিনো, চা-টাই যদি পছন্দমতো না খেলুম তা হলে বেঁচে থেকে লাভ?

কিন্তু দেখা গেল রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জির কিছু পছন্দ হওয়াই ভারি শক্ত।

—লুঙ্গি দিয়ে কখনও জানালা-দরজার পরদা হয়? মৃত্যুঞ্জয়ের দেখছি সবই পাটনাই টেস্ট—

— বাড়ি করেছ, কিন্তু ডাইনিং হল-এর স্ট্যাণ্ডার্ডসাইজ-ই জানো না —

—ড্রইংরুমে জর্জ দি ফিফ্‌থ্‌-এর ছবি রেখেছ, কিন্তু কুইন মেরীর ছবিটা নেই পাশে—ইংরেজদের চরিত্রে এইটে পাবে না, এই সেন্স অব প্রোপোরশনের অভাব ...

—আ হা. তোমাদের কিচেনের পোজিশনটাই ঠিক হয় নি. কিচেন হবে নর্থ-ইস্ট কর্নারে—মৃত্যুঞ্জয়েব দেখছি .. সুপারিন্‌টেনডেন্ট হলে কি হবে .

পরদিন থেকে বায়সাহেব জে ডি. ব্যানার্জি সংস্কারে লেগে গেলেন। জ্যোটি, লোটি, আর রুবি আদেশ পালন করবে। মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িব সামনে গেট্‌-এ ট্যাবলেট লাগানো হলো। পালিশ করা সেগুন কাঠেব বোর্ডেব ওপর 'বাযসাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি' লেখা। বিকেল বেলা ড্রেসিং গাউন পরে একবাব বাগানে দাঁড়িযে দেখে এলেন। তাব পর নিজেব চুরুটের আব চাযেব ব্রাণ্ড লিখে চাকবকে বাজাবে পাঠানো হলো। নতুন নেটেব পবদা এল দরজা-জানালাব জন্যে। মৃত্যুঞ্জয়েব সঙ্গে থেকে থেকে মিলিটারও টেস্ট খারাপ হয়ে গেছে। মিলিব টেস্ট, মৃত্যুঞ্জযেব টেস্ট. বদলাবাব চেষ্টায় লেগে পড়লেন জীবন পণ করে বাযসাহেব জে ডি ব্যানার্জি। প্রথম দিনটি থেকে।

মিলি বললে—ওপরেব দক্ষিণের ঘরটাতেই তোমাব থাকবাব ব্যবস্থা হলো বাবা--

বাড়ির শ্রেষ্ঠ ঘর সেটা।

ঘরখানা গোছানো হলো। রাযসাহেবের পছন্দমতো গোছানা হলো। শোবার খাটের পাশে 'হোয়াট্‌নট'। চিঠি লেখবার টেবিল একটা জানলার দিকে মুখ করে। একটা টিপয়। আর খাটের দিকে মুখ কবে বসানো ড্রেসিং আলমাবি। রাযসাহেব বললেন—লর্ড কিচেনারের বেডরুম এইরকম সিম্‌প্‌ল ছিল—

তখন কি মিলি জানতো, না মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় জানতেন। কেউ জানতো না। জ্যোটি, লোটি, রুবিও জানতো না, চৌদ্দ বছর রায়সাহেব এ-বাড়িতে থাকবেন। শুধু থাকা নয় সদম্ভে সগৌরবে মাথা উঁচু করে থাকবেন।

দেশী ইংরিজী একখানা দৈনিক পত্রিকা আসতো মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে। তিনি বাতিল করে দিলেন। কুড়ি বছর 'হোয়াইটম্যানে' সহ-সম্পাদকের চাকরি করে এসেছেন। ওইটে চাই। 'হোয়াইটম্যান' আসতে লাগলো পরদিন থেকে।

চায়ের টেবিলে পরোটা বা ওমনি কিছু একটা হতো। রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি আপত্তি করলেন।

—তোদের এইটে ভারি খারাপ সিস্টেম মিলি, টেবিলে খাবে অথচ লুচি পরোটা, দু তিন টাকা বেশি পড়ে বটে, কিন্তু বেকারীতে বলে রাখলেই রোজ সকালে কেক বা পেস্ট্রি দিয়ে যায়— কোনও হাঙ্গামা নেই, কত পরিশ্রম বাঁচে

পরদিন থেকে তা-ই হলো। বাথরুমটা সাজানো হোল নতুন করে। বিলিতী টুথপেস্ট, বুরুশ, হেয়ার অয়েল আর সাবান। বাজারের শ্রেষ্ঠ জিনিস সব। টেবিলে উঠলো বিলিতি লেটার-প্যাড।

মিলির বাবা, মৃত্যুঞ্জয়ের শ্বশুর। রায়সাহেব শ্বশুর। শৌখিন ইংরিজী জানা পাকা সাহেব শ্বশুর। খাতিরের কোনও ত্রুটি রাখলেন না জামাই।

সেক্রেটারিয়েটের বন্ধুবান্ধব আসে বাড়িতে। মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় আলাপ করিয়ে দেন—ইনি আমার শ্বশুর, রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি—

চুরুটটা মুখে লাগিয়েই রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি মাথা নাড়েন। ভোরবেলা শার্টেব গলায টাই থাকে না, কেমন যেন খালি-গা মনে হয় তাঁর। বলেন—মেজব উইন্‌স্‌ফোর্থ যেবার বেঙ্গল গবর্নবের মিলিটারী সেক্রেটারী, সেইবার আমি রায়সাহেব হলুম—কিন্তু রায়সাহেবিটাও ছ্যা ছ্যা হয়ে পড়েছে—রামা-শ্যামা ডিক্-হ্যাবি সবাই পাচ্ছে-- কোনও ইজ্জত রইল না আর আমাদের—

তার পরেই প্রশ্নকর্তা যদি প্রশ্ন কবেন তো ভালোই, না হলে নিজেব বাযসাহেব হওযাব ইতিহাসটা নিজেকেই বলতে হয়—

—'হোয়াইটম্যানে' আমার লীডার পড়েই তো প্রথম মেজর উইন্‌স্‌ফোর্থ চম্‌কে যায়, খাস বিলিতী বাচ্ছা কিনা, গুণেব কদর করতে জানে— তারপর যখন শুনলে লিখেছে একজন বাঙালী, আরো অবাক, একদিন নেমন্তন্ন করলে ডিনাবে। বললে —বাঙালীব মধ্যেও যে জিনিয়াস্ জন্মায় এটা তোমাকে দেখবাব আগে কল্পনাও করতে পারি নি মিস্টার ব্যানার্জি—ওয়েল, তখন আমি শুধু মিস্টার-ই ছিলাম কিনা—

তার পরেও যদি প্রশ্নকর্তা আগ্রহ না দেখান, তখন নিজেকেই বলতে হয—

—আশ্চর্য হয়ে গেলেন মেজর যখন শুনলেন আমি একটা রাযসাহেবিও পাই নি। বললেন — ওয়েল, এটা আমাবই কর্তব্য, দেখি আমি কী করতে পাবি —

প্রশ্নকর্তা যদি তখন প্রশ্ন করেন — তার পর ....?

রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি সে প্রশ্নের উত্তর দেবেন না। চুরুটটাকে দাঁতে চেপে সেইখানে বসেই বহুদিন আগে শেখা মেজর উইন্‌স্‌ফোর্থের সুরের অনুকবণ করে চীৎকাব করবেন—মহারাজ—চা—

আগে হাতে করে চায়ের কাপ দেওয়া হতো। বায়সাহেব আসার পব ট্রের বন্দোবস্ত হয়েছে। বিকেলবেলা একটা পর্ব আছে রায়সাহেবের। সামান্য পর্ব নয। ঝাড়া ঘণ্টাখানেক লাগে। তখন বেরোয় আলমারী থেকে নির্ভাঁজ স্যুটগুলো। একটা একটা করে মিলি কিংবা জ্যোটি, লোটি, রুবি যে-কেউ নামিয়ে দেয়। যেটা কাল পরেছেন আজ সেটা পরতে নেই। সবগুলো বিছানার ওপর পর পর বিছিয়ে দিতে হবে। রায় সাহেব জে ডি. ব্যানার্জি একটা সেট্ বেছে নেবেন তারি মধ্যে থেকে। কোনো দিন ওয়ালনাটের স্টিক কোনো দিন অ্যাশ কাঠের। স্যুটের সঙ্গে যেন ম্যাচ করে। মাথায় লাইট নেভি-ব্লু ফেল্ট-হ্যাট্। আর ঝকঝকে চকচকে দাঁতে কামড়ানো চুরুট। পায়ে পেটেন্ট লেদার শু। হাতের পাঁচটা আঙুলের মতন ওই চুরুটটা ছিল তাঁর শরীরের সঙ্গে একাত্ম। বাথরুমে যাবার সময় মুখে থাকতো চুরুট। মিলির মনে পড়ে না বাবাকে কখনও সে চুরুট ছাড়া দেখেছে। কোথাকার কোন্ লর্ড স্যালসবারি নাকি মারা যাবার পর হিসেব করে দেখা হয়েছিল, জীবনে যত চুরুট তিনি খেয়েছেন তা জোড়া দিলে ছ মাইল লম্বা হয়। তা ছাড়া চুরুট খেলে আত্মবিশ্বাস বাড়ে। সেই লর্ড স্যালসবারি বলেছিলেন—ইতিহাসে কোনও চুরুটখোরের আত্মহত্যার রেকর্ড নেই—

রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি বলতেন— চুরুট খেতে শেখাও ...মাকে মি. অকিমলেক—এদিকে তো পণ্ডিত লোক, ইংরিজীর মাস্টার—ইংরিজী ভাষাটা গুলে খেয়েছিলেন -- ওদিকে

চুরুট খান আমার মতো—তাঁর কাছেই তো এই ইংরেজী বিদ্যেটা আর চুরুট খাওয়ার হাতেখড়ি আমার—

স্যুট্ পরে ছড়িটি ফেলতে ফেলতে যারা পাটনার রাস্তার রায়সাহেব জে.ডি. ব্যানার্জিকে হাঁটতে দেখেছে তারা জানে সেই মন্থর অথচ দ্রুত চালের মুভমেণ্ট। প্রতি পদে সেই ইলাস্টিক স্টেপ্। দেখেই মনে হবে যেন বিরাট গাড়ি, বিরাট বাড়ি সবই আছে—সমাজে সংসারে যেন সুউচ্চ প্রতিষ্ঠায় অধিষ্ঠিত। শুধু স্বাস্থ্যের খাতিরে একটু পদচারণা করতে বেরিয়েছেন।

একমাস পরেই হতাশার সুর বেজে উঠলো।

—নারে মিলি, যা দেখলুম তোরা পাটনায় কী সুখেই আছিস—এতদিনের মধ্যে একটা ভদ্দরলোক নজরে পড়লো না—

পেস্ট্রির ডিশ্‌টা বাবার দিকে এগিয়ে দিয়ে চা ঢালতে ঢালতে মিলি বললে কেন বাবা—ওই তো ইঁয়েরা রয়েছেন, হরসিংপুরের জমিদার জনক বাবুরা রয়েছেন, সব ভাই ক'টা বি-এ পাস, তার পর মুন্সেফ রঘুবীর প্রসাদ বিলেত ফেরত—তারপর নিউ পাটনায় ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের এজেন্ট বাবুল মিত্তির এম-এ, চ্যাটার্ড একাউন্‌টেণ্ট, রণধীর চৌহান ...

—আরে ছি ছি —ওদের তুই বলিস ভদ্দরলোক?

চায়ের কাপটা ঠোঁটে তুলতে গিয়ে একটা 'শ্রাগ্' করলেন রায়সাহেব জে ডি ব্যানার্জি।

— কেউ ইংরিজীর 'ই' জানে না, 'হোয়াইটম্যান' পড়ে না—আবার পলিটিক্স নিয়ে তর্ক করতে আসে ইংরিজী জানা লোক গোটা ভারতবর্ষেই তো আছে মাত্র আড়াইটে, একটা তোদের গান্ধী, একটা টেগোর আর আধখানা ..

আধখানা যে কে আর বলা হলো না! হঠাৎ যেন স্বগতোক্তির সুরেই রায়সাহেব বললেন—ইংরিজীটা কি অত সহজ রে .. তা যদি হতো .. এই দ্যাখ্‌না আজকের হোয়াইটম্যানেই তো চারটে ইংরিজীর ভুল ধরেছি ...

ইংরিজী ভাষাটাই জানতেন রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি। তিনি নিজেই একদিন বলেছেন— কেমন করে শিখলেন বিদ্যেটা। ওটা বড় অদ্ভুত ভাষা নাকি। ভাবতে হয়, পড়তে হয়, লিখতে হয়, স্বপ্ন দেখতে হয়—অনেকের আবার তাতেও হয় না। ওটা অনেকটা কবি হওয়ার মতো। সবাই কি চেষ্টা করলেই কবি হতে পারে? তেমনি সবাই চেষ্টা করলেও ইংরিজী শিখতে পারে না। ওটা একটা ভগবান-দত্ত ক্ষমতা। না হলে তো রানা-শ্যামা, টম-ডিক-হ্যারি সবাই শিখে ফেলে বসে থাকতো। ইংরিজীটা কি অত সহজ রে।

কথাগুলো অনেকটা ধমকের মতো। না জেনে মিলি তার বাবাকে অন্য সকলের সঙ্গে সমান পর্যায়ে নামিয়ে ফেলেছে। কিন্তু বড় শিশুর মতো সরল মন রায়সাহেব জে.ডি. ব্যানার্জির। কিছু মনে রাখেন না। বোধ হয় প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ পরের দিন মিলি নিজে বাজারে গিয়ে বাবার পছন্দ-করা চুরুট আর এক বাক্স আনিয়ে দিলে।

কিন্তু হোয়াইটম্যানের কুড়ি বছরের চাকরিটা যাওয়ার পেছনেও একটা ইতিহাস আছে।

যাঁর ধ্যান-জ্ঞান-স্বপ্নই হলো ইংরিজী, ইংরিজীর ভুল তিনি সইবেন কেমন করে। ভুল দেখলে সইতে পারতেন না, তা সে স্বয়ং এডিটরেরই হোক, আর নিজেরই হোক, একবার নিজেরই একটা ভুল ধরা পড়লো। উঃ, সে কী আত্মগ্লানি। ছাপার অক্ষরেও বেরিয়ে গেল সেটা। সাধারণ পাঠকরা কেউই ধরতে পারলে না বটে, এডিটরও পারে নি। কিন্তু যে-টা ভুল সেটা তো ভুল-ই। কেউ ধরতে পারুক আর না পারুক। নিজেকে তিনি ক্ষমা করবেন কী করে? নিজের কাছে কী কৈফিয়ত দেবেন তিনি?

গল্প হচ্ছিল ডিনার খেতে খেতে।

জ্যোটি, লোটি, রুবি আর মিলি। আর ওদিকে মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়। পাটনা সেক্রেটারিয়েটের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট। মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় বললেন—তারপর?

মিলিও চচ্চড়ির ডাঁটা চিবানো থামিয়ে বললে—তারপর কী করলে, বাবা?

সুপের চামচেটা মুখ থেকে নামিয়ে ন্যাপকিন দিয়ে দুটো ঠোঁট মুছে নিলেন। তারপর আধখাওয়া চুরুটটা মুখে দিয়ে আবার ধোঁয়া ছাড়লেন লম্বা করে। বললেন — ঠিক করলাম আত্মহত্যা করবো, আত্মহত্যাই আমার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত! বোঝো, আমরা সে-যুগে কতখানি জীবন দিয়ে ভালোবাসতুম ইংরিজী ভাষাকে—যাক্‌গে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করা হলো না—

চম্‌কে উঠেছে মিলি। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় নিজের মনেই নিঃশব্দে খেতে লাগলেন।

ছোট মেয়ে রুবি আর চাপতে পারলে না কৌতূহল। বললে— কেন বাবা? ধরা পড়ে গেলে বুঝি?

চুরুটটা টানতে-টানতে থেমে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—এই চুরুট-ই আমাকে বাঁচিয়ে দিলে শেষ পর্যন্ত, লর্ড স্যালস্‌বারির কথাটা মনে পড়লো— কোনও চুরুটখোর আত্মহত্যা করেছে ইতিহাসে এমন ঘটনা তো পাওয়া যায় না—

রায়সাহেব জে. ডি, ব্যানার্জি এক স্লাইস রুটি ছুরি দিয়ে কাটতে লাগলেন।

— তারপর এল ডানকান সাহেব। স্কচের বাচ্ছা। জাঁদরেল লোক। কিন্তু ইংরিজী ভুল। ধরলাম একদিন। অতি সাধারণ ভুল। সাহেবের হাতে অমন ভুল বড় একটা দেখা যায় না। তর্ক হলো। এডিটর বলে ঠিক- অ্যাসিস্ট্যাণ্ট বলে ভুল।

রায়সাহেব রুটি কামড়ালেন তারপর বাঁ হাতের কাঁটা দিয়ে মাংস তুলে মুখে পুরলেন

—দিলাম চাকরি ছেড়ে—

মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় তখনও রায়সাহেব হন নি। বললেন— এই সামান্য কারণে চাকরি ছেড়ে দিলেন আপনি।

—একে তুমি সামান্য বলছ মৃত্যুঞ্জয়?

যেটা সত্যি কথা সেটা ডানকান সাহেব জানুক। আর কারুর জানবার দরকার নেই। সেই সামান্য কারণে রায়সাহেব জে. ডি ব্যানার্জি সাত শো টাকার চাকরি ছেড়ে, কলকাতা ছেড়ে, জ্যোটি, লোটি আর রুবিকে নিয়ে এখানে চলে এলেন। মিলির বাড়িতে। নাই বা থাকলো টাকা, সাত শো টাকা মাইনের চাকরি। মিলি আছে, মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়—পাটনা সেক্রেটারিয়েটের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট আছে। জ্যোটি, লোটি, রুবির বিয়ে মিলি-ই দেবে। তাঁর ডিনার, কেক, পেস্ট্রি, চুরুট, চা, স্যুটের খরচ মিলিই দেবে।

এ সবই চৌদ্দ বছর আগেকার পাটনা।

সেই সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে বিছানায় আধশোয়া অবস্থায় বাসী মুখে বেড্ টি খাওয়া। তার পর ড্রেসিং গাউনটা গায়ে চড়িয়ে চুরুট ধরানো। 'হোয়াট্‌নট' থেকে হোয়াইটম্যান নিয়ে পড়া। পায়জামা-পরা পা দুটো হোয়াট্‌নট্-এর গায়ে লাগিয়ে দেওয়া আর কাগজ পড়া। পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে পড়া। হাতের ফাউনটেন পেন দিয়ে মার্জিনে দাগ দেওয়া। কোথাও ছাপার ভুল থাকলে তা দাগিয়ে দেওয়া। এই কাজেই লাগে দু'ঘণ্টা। এ-সময়ে রায়সাহেবকে পৃথিবী ভুলে যেতে হয়। এই দু'ঘণ্টা তিনি অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে ছোট ছোট অক্ষরের সমুদ্রে ডুবে যান।

• তার পর পড়া, ভাবা, দাগ দেওয়া যখন শেষ হয় তখন লেটারপ্যাড নিয়ে লেখবার টেবিলে গিয়ে বসেন। চিঠি লিখতে বসেন। লম্বা শুদ্ধ ইংরিজী চিঠি। হোয়াইটম্যানের সম্পাদকের নামে। কুড়ি বছর হোয়াইটম্যানের চাকরি করে এসেছেন, লেখার প্রুফ দেখেছেন।

এ-কাজে তিনি অভ্যস্ত। সিদ্ধহস্ত বলা চলে। সেই অভিজ্ঞ কলম নিয়ে লিখে চালান। চিঠির আকারে জানিয়ে দেন সম্পাদককে কোথায় সেদিনকার কাগজের সম্পাদকীয়তে ছাপার ভুল, নয়তো ইংরিজীর ত্রুটি। বিস্তারিত সমস্ত আলোচনা। মতবাদ নিয়ে, কাগজের পৃষ্ঠা-সংখ্যা নিয়ে, বিজ্ঞাপন নিয়ে, কাগজের প্রচার নিয়ে। কাগজের একজন শুভাকাঙ্ক্ষীর মতো ডাক-খরচা দিয়ে দিয়ে চৌদ্দ বছর ধরে দিনের পর দিন এমনি সমালোচনা মৌখিক নয়, লিখিত। এ যেমন বিস্ময়কর তেমনি কৌতুকজনক।

তার পর সেই চিঠি ডাকে দিয়ে আসা। যে-সে গেলে চলবে না। মহারাজকে নিজের রান্না ফেলে চিঠি ফেলে আসতে হবে। একমাত্র বিশ্বাসী লোক সে-ই। চীৎকার করে ডাকবেন—মহারাজ—

রায়সাহেবের মেজাজী গলার আওয়াজে সমস্ত বাড়ির ঘরগুলো গমগম করে ওঠে। মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় তখন অফিসে যাবেন। ঠাকুর-চাকর সবাই ব্যস্ত। মিলিও ব্যস্ত স্বামীর তদারকে। হাতের কাছে গুছিয়ে দিতে হবে জামা, কাপড়, গেঞ্জি, রুমাল, চাবি—সমস্ত। সেই ব্যস্ত আবহাওয়ায় মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় ডাকলেন—মহারাজ—

মিলি বললে—মহারাজ নেই—

— কোথায় যায় অফিসে যাবার সময়?

—মিলি বলে— বাবা পাঠিয়েছেন ডাকের চিঠি ফেলতে—

রায়সাহেব জে. ডি ব্যানার্জি নিজে পাঠিয়েছেন। সুতরাং মহারাজের কোনও দোষ নেই। কিন্তু এখন তিনি অফিসে যাচ্ছেন, তিনি এবাড়ির মনিব, তিনি, অফিসে চলে যাবার পরই চিঠি ফেলতে পাঠালে হতো। কিছু বললেন না মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়, কিন্তু যেন কেমন বিরক্ত হলেন, অন্তত স্বামীর মুখ দেখে মিলির তাই মনে হলো।

আর একদিনের ঘটনা। রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি ড্রেসিং গাউন পরে বারান্দায় পায়চারি করছিলেন চুরুট মুখে। যেমন সচরাচর করে থাকেন।

একটা চাকর এধার থেকে ওধারে যাচ্ছিল ঘর ঝাঁট দিতে। ডাকলেন তাকে।

—এই, শোন্—

চাকরটা সামনে এল বেকুবের মতো।

বললেন—গায়ে জামা দিস না কেন?

মিলিকে ডেকে আনলেন। বললেন—তোদের এ কী সিস্টেম? চাকর-বাকর উর্দি না পরুক, খালি গায়ে থাকে কেন? একটা গেঞ্জি জোটে না—

সেই সময়ে একদিন পয়লা জানুয়ারি তারিখে খবর বেরুল মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় রায়সাহেব হয়েছেন। শ্বশুর রায়সাহেবই ছিলেন, এবার জামাইও রায়সাহেব হলেন। বাড়ির গেট্-এ আর একটা ট্যাবলেট ঝোলাবার কথা। কিন্তু কেন জানি না মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় রাজী হলেন না।

সেদিন সকালেও রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি কাগজের উপাধির তালিকাটা পুঙ্খাপুঙ্খভাবে পড়লেন। দেখলেন কার কার প্রমোশন হলো। নতুন কে কে জাতে উঠলো। খাবার টেবিলে বসে বললেন—এ কী রকম হলো মৃত্যুঞ্জয় ... আমার সময় মনে আছে, টেলিগ্রাম এসেছিল দেড় শো, আর চিঠি বোধ হয় শ তিনেক ... কয়েকটা কাগজে ফোটোও বেরিয়েছিল— চাকরিটা রেগে ছেড়ে না দিলে রায়বাহাদুরও হয়ে যেতাম... কিন্তু তোমার বেলায় এ কী রকম হলো মৃত্যুঞ্জয় ... আজকালকার লোক গুণের কদর করতে কি ভুলে যাচ্ছে ...

মিলিকে বললেন, — তোকে বলেছিলুম মিলি তোদের এখানে একটা ভদ্দরলোক নেই— দেখলি তো, মৃত্যুঞ্জয়কে একটা পার্টি পর্যন্ত কেউ দিলে না ... আমার মনে আছে মেজর উইন্‌সফোর্থ ...

এ সবই চৌদ্দ বছর আগেকার ঘটনা।

তার পর চৌদ্দ বছরের প্রাত্যহিকতায় দৃশ্যপটের কতই না পরিবর্তন হয়ে গেল। মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় বরাবর কম কথার মানুষ ছিলেন, কথা কওয়া আরো কমিয়ে দিয়েছেন।

শ্বশুর জামাইবাড়িতে বেড়াতে এসেই থাকে, কিন্তু এমন বরাবরের মতো বে-আক্কেলে হয়ে যে থেকে যাবেন এ-কথা কে জানতো।

একে একে জ্যোটি, লোটি এবং শেষ পর্যন্ত রুবির বিয়েটাও দিলেন জামাই। প্রত্যেক বিয়েতেই মোটা রকমের খরচ করতে হলো। নইলে পাটনার সমাজে মান থাকে না। সকলেরই বিয়ে দিলেন জাঁকজমক করে। আর তা ছাড়া টাকা খবচের প্রশ্নটাই তো বড় নয়, মেহনত কী কম!

রায়সাহেব মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যাযের কিছু দেনা কবতে হলো। মিলির গায়ের গয়না কিছু ভাঙতে হলো। টাউনের বাইরে কিছু খোলা জমি কেনা ছিল মিলির নামে, সেটা সস্তা দরে ছেড়ে দিতে হলো। উপ্‌রি উপ্‌রি তিনটি মেয়ের বিয়ে দেওয়া সামান্য কথা নয়। তবু রায়সাহেব মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় সেই অসাধ্যই সাধন করলেন। একটিমাত্র ছেলে ছোটবেলা থেকে দেরাদুনে থেকে পড়তো। সিনিয়র কেম্ব্রিজ পাস করাব পর কলেজে পড়ছে, সেখানে, সুতরাং খরচ পাঠানোও বেড়েছে।

এত কাণ্ড ঘটছে, এত দৃশ্যপট বদলাচ্ছে, কিন্তু বায়সাহেব জে ডি. ব্যানার্জি তাঁর সেই উঁচু চূড়ো থেকে একচুল নড়েন নি। সংসাবেব দৈনন্দিন সচ্ছলতা-অসচ্ছলতাব কথা যেন তাঁর জানবার কথা নয়। তিনি যে একজন ব্যয়বহুল গলগ্রহ সে-কথা ভাববার বা বোঝবার তাঁর অবসবই নেই। জামাইকে মেয়ে দিয়েছেন বলে শ্বশুরকে ভরণ-পোষণ করাও যেন জামাইয়েবই অন্যতম কর্তব্য। আর তা ছাড়া তিনি তো এ-সংসারের একজন গর্বেব ও গৌরবের পাত্র। রায়সাহেব জে. ডি ব্যানার্জি তিনি, চালচলনে বলনে নামধাম-পরিচয়ে যে-কোনও জামাই-ই গৌরবান্বিত বোধ করবে। নিয়ে আসুক না মৃত্যুঞ্জয় দশটা নাইট, বিশটা রায়বাহাদুরকে এ-বাড়িতে, দেখাই যাক না তারা মোহিত বিগলিত হয় কিনা রাযসাহেব জে. ডি. ব্যানার্জির আদব-কায়দায়, কেতা-দুরস্ত, ব্যবহারে ঈর্ষান্বিত হয় কিনা মৃত্যুঞ্জয়ের শ্বশুর-সৌভাগ্যে! বিলেতে তিনি যান নি সত্যি, কিন্তু অন্তত দু শো লোক তো তাঁর কাছে বিলেত যাবার আগে আদব-কায়দা শিখে নিতে এসেছে। কাঁটা-চামচ থেকে শুরু করে ডিনার, ড্রয়িংরুম, বাথ, বো, স্যুট্ —হাই সোসাইটির সমস্ত রকম খুঁটিনাটি।

তা সেদিন চা মুখে দিয়েই কাপ নামিয়ে নিলেন রায়সাহেব।

—মিলি, ছি ছি, তোদের টেস্ট দিন-কে দিন কী যে হচ্ছে—

মিলি কিছু উত্তর করলে না। মিলি ভালো করেই জানে এ-চা বাবা মুখে তুলবেন না, তবু চুপ করে রইলো সে। একটু কম দাম। একটু ফ্লেভার কম। কিন্তু সব দিক ভেবেই তো চলা উচিত। উনি বলেছেন—এত দামী চা কি না-হলেই চলে না? তোমার বাবাকে তো পয়সা আয় করতে হয় না, যাকে করতে হয় সে বোঝে।

কথাগুলো তো একেবারে মিথ্যেও নয়। মিলি দেখলে বাবা চা ছুঁলেন না। বললেন—এ নিশ্চয়ই মহারাজের ভুল হয়েছে রে, কিংবা ওকে ঠকিয়ে দিয়েছে—তুই একটা স্লিপ

লিখে পাঠা এখুনি—পাঠা তুই ... প্রমাণ হয়ে যাক—পয়সা দিয়ে কেন খারাপ জিনিস খাবো— বল্?

বাবাকে চিনতো মিলি।

শেষপর্যন্ত লিখতে হলো স্লিপ। স্লিপ লিখে মহারাজের হাতে দিতে যাচ্ছিল—

রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি বললেন— আর ওই সঙ্গে আমার সেই চুরুটের কথাটা লিখে দে না, এ মাসে হঠাৎ ওই খারাপ চুরুটটা যে কেন আনালি—জানিস তো আমি চল্লিশ বছর ধরে ওই এক ব্র্যাণ্ড খেয়ে আসছি ...

শেষ পর্যন্ত মহারাজকে দিয়ে ভালো চা আর চুরুটের ফরমাশ দিতেই হলো। কিন্তু বার বার কাল রাত্রের কথা মনে পড়তে লাগলো মিলির। স্বামী শেষ পর্যন্ত অধৈর্য হয়েই বলেছিলেন— তোমার বাবা বিড়ি খেতে পাবেন না। —যাঁর একপয়সার মুরোদ নেই—তাঁর আবার অত শখ কেন শুনি ...

রাত্রে শোবার ঘরের মধ্যে মিলিকে অনেক সহ্য করতে হয় বাবার জন্যে। আজকাল রায়সাহেব মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের কী যে হয়েছে— বাড়িতে তিনি থাকেন কম। অফিসের আগে আর অফিসের পরে যতক্ষণ তাঁর বাড়িতে থাকবার কথা, সে-সময়টা কাটে তাঁর বাগানে। রাতে হারিকেন আর টর্চ নিয়ে চলে তাঁর গাছের তদবির তদারক। কোনও বন্ধু এলে দেখা করেন বাগানে। মিলি সারাদিন সংসারের খুঁটিনাটি নিয়ে ব্যস্ত থাকে। আর ওদিকে রায়সাহেব জে. ডি ব্যানার্জি? যখন রায়সাহেব মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় অফিসে বেরিয়ে যান, তখন নেমে আসেন তিনি ওপর থেকে।

চীৎকার শোনা যায় দূর থেকে—মহারাজ—

অর্থাৎ আর একবার তাঁর চা চাই।

সেই তখন থেকে যতক্ষণ না রায়সাহেব মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় অফিস থেকে আসেন, ততক্ষণ ঘণ্টায় ঘণ্টায় তাঁর চা চাই। আর সেই দামী চা। সংসার ভেসে যাক, কারু পেট ভরুক আব না ভরুক, রায়সাহেব জে. ডি ব্যানার্জির চুরুট, চা চাই। তা ছাড়া সকাল বেলা চাই তাঁর নিজস্ব একখানা 'হোয়াইটম্যান', লেখবার প্যাড, কলম, কালি আব স্ট্যাম্প। চাই নিজস্ব ব্র্যাণ্ড টুথপেস্ট, টুথব্রাশ, স্নো, পাউডার, মাসকাবারী হাত খবচ কুড়িটি টাকা।

প্রতি মাসের পয়লা তারিখে মিলি দু'খানা দশ টাকার নোট বাবার হাতে গিয়ে দিযে আসে।

মিলির সেদিন নজরে পড়ে। বিকেল বেলা বাবার সেদিন শুরু হয় উদ্যোগ-আয়োজন। রায়সাহেব জে. ডি ব্যানার্জি আবার যেন তাঁর পুরনো ফেলে-আসা দিনগুলো ফিরে পান। আলমারি থেকে বেরোয় সেই সব চৌদ্দ-বছরেব পুরনো স্যুট্। কোনোটা আর শরীরের সঙ্গে এখন ফিট্ করে না। জুতোর গোড়ালি থেকে প্যাণ্টটা দু'ইঞ্চি ওপরে উঠে পড়েছে। জায়গায় জায়গায় পোকায় এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দিয়েছে। অ্যাশ কাঠের সৌখিন ছড়িটা বেরোয়। বেরোয় ফেল্ট-হ্যাট্। মাথায় ঈষৎ বেঁকিয়ে বসিয়ে দেন। হাফসোল দিয়ে দিযে পেটেন্ট লেদারের শু-জোড়ার সে গৌরব আজ অস্তমিত। তবু মাস্টার-টেলারের তৈরি সেই পোশাকে হঠাৎ রায়সাহেবের দেহটা কেমন ঋজু হয়ে ওঠে। যেমন হতো চৌদ্দ বছর আগে সাহেবী হোটেলে ডিনার খেতে যাবার সময়। চুরুটটা দাঁতে কামড়ে যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পড়েন তখন আর ধরতে পারার কথা নয়। খাঁটি বনেদী-চাল। হোন নিঃস্ব, জামাইয়ের গলগ্রহ—একদিন আধদিন নয়, চৌদ্দ বছর ধরে—তবু চালচলন দেখে বোঝা যায় ইজ্জতদার মানুষ, খানদানী আদব-কায়দার মানুষ। সম্ভ্রমে মাথা নীচু হয়ে আসতে বাধ্য।

তারপর যেমন ভঙ্গীতে সে-যুগে হোটেলে গিয়ে ঢুকতেন, তেমনি ভাবে গিয়ে ঢোকেন পাটনার বড় একটা হোটেলে। কলকাতার হোটেলের কাছে এ হয়তো কিছু নয়। কিন্তু রায়সাহেব জে. ডি ব্যানার্জি ভুলে যেতে চেষ্টা করেন যে, এটা পাটনার হোটেল। তাঁর মানসচক্ষে ভেসে ওঠে পাম্ গ্রোভ্ —জাজ্ ওয়াল্জ্ আর স্যুটপরা-স্ত্রী-পুরুষের ভিড়।

একটা চেয়ারে গিয়ে মধ্যেখানে বসেন—সকলের দৃষ্টির সামনে। তারপর যারা সেই অবস্থায় সেখানে ডিনার খেতে দেখেছে তাঁকে, তারা জানে পাকা বনেদিয়ানা কাকে বলে। তাঁর সেই ন্যাপকিন নেওয়া থেকে শুরু করে নিখুঁত সব মুভমেণ্ট লক্ষ্য করার মতো। অন্তত পাটনার ওই হোটেলে এর আগে আর কাউকে অমন ভাবে দেখা যায় নি ডিনার খেতে।

কিন্তু মাত্র তো কুড়ি টাকা। প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহটাই শুধু চলে—আর বাকী সমস্তটা মাস আবার থাকতে হয় পরের মাসেব পয়লা তারিখটির দিকে চেয়ে। কারণ খাওযাই কি শুধু? বকশিশ্ দিতেও যে মোটা বেবিয়ে যায়, আর ওটা না দিলে তো খাতিরও থাকে না।

একবার মেয়েকে বলেছিলেন—মিলি, আমার স্যুট্গুলো সব তো গেছে, আর অন্তত হাফ ডজন না করালে তো আর চলছে না— তোর কী ভুলো মন, তিনমাস থেকে তো কেবল করাবি বলছিস—

রায়সাহেব মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের সেটা ইন্সিওরেন্স-এর প্রিমিয়াম দেবার মাস। সে মাসে হয় না। সুতরাং মিলি চুপ করে থাকে। পরের মাসে ছেলেব পবীক্ষাব ফিস্ দিতে হলো অনেক টাকা। তার পরের মাসে মিলির বিয়ের মাস, জামাই একটা নেকলেস কিনে দিলে স্ত্রীকে, তাব পবের মাসেও একটা-না একটা কি খরচ হয়ে গেল। সুতবাং রাযসাহেব জে ডি ব্যানার্জিব সামান্য হাফ-ডজন স্যুট্, তা-ও হয়ে উঠলো না বহুদিন।

ড্রেসিং গাউনটা ছিঁড়ে যেতে বসেছে। ওই একখানাই এখন সম্বল। কোনদিন পিঠেব দিকটা টান পড়লেই ফাস্ করে যাবে। তবু সকালবেলা ওইটে পরেই হোযাট্নট্-এর ওপব থেকে হোয়াইটম্যান-খানা নিয়ে চাযে চুমুক দিতে দিতে কাগজ পড়তে থাকেন। সেটা ছোট-চা।

তারপর বড়-চা হবে আটটা থেকে ন'টাব মধ্যে। আগে কিছু পেস্ট্রি বা বিস্কুট বা টোস্ট থাকতো সঙ্গে। আজকাল আবাব পবোটায় নেমেছে। তবু সেই পরোটাই ছুরি কাঁটা দিয়ে চিবোতে চিবোতে চা খাওয়া।

আজকাল রায়সাহেব মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় এই বড়-চা'তে থাকেন না। তিনি তখন থাকেন বাগানে। রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি একাই গল্প করে যান তখন।

—জানিস মিলি, এবাবকাব শীতে লণ্ডনের মে-ফেয়ার-এ চৌদ্দ ইঞ্চি ববফ পড়েছিল .

মিলি একমাত্র নীবব শ্রোতা। শুধু বললে—তাই নাকি বাবা?

রায়সাহেব জে ডি ব্যানার্জি বললেন— এতেই তুই অবাক্ হচ্ছিস, কিন্তু যেবার বার্লিনে কলের জল জমে বরফ হয়ে গিয়েছিল, নাইনটিন টোয়েনটিতে—তিনশো তেতাল্লিশ জন লোকের নাক যে একেবারে খসে গিয়েছিল —

চুরুটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি লণ্ডন, বার্লিন আব নিউইয়র্কের গল্প করে চলেন। তার পর এক সময় দেখেন মিলি কখন অজান্তে উঠে চলে গেছে, তখন আস্তে আস্তে ওপবে উঠে যান। ওপরে উঠে গিয়ে লেখবার টেবিলে চিঠি নিয়ে বসেন। চিঠির তাড়া। ম্যানচেস্টার থেকে মিস্টার ক্রফোর্ড চিঠির জবাব দিয়েছেন। ফ্লীট স্ট্রীট থেকে জবাব এসেছে কোনো এক কাগজের মালিক লর্ড ফেয়ারওয়েদারের। চিঠির জবাব পড়া এবং জবাবের জবাব লেখার মধ্যে হঠাৎ দেশলাইয়ের কাঠি ফুরিয়ে গেল।

চীৎকার করে ডাকেন—মহারাজ—

মহারাজ এল না। সাড়াও দিল না। কী হলো সব। কিছু বুঝতে পারলেন না রায়সাহেব জে ডি ব্যানার্জি। অথচ চুরুট নিভে গেছে।

আবার ডাকেন— মহারাজ--

এবার মহারাজ এল। রায়সাহেব জে ডি ব্যানার্জি বললেন- একটা দেশলাই আনো তো মহারাজ— দেশলাই একটা—

কিন্তু সোজা হুকুম তামিল না করে মহারাজ বললে— জামাইবাবু এখন অফিসে যাচ্ছেন। উনি অফিসে বেরিয়ে গেলে দেশলাই কিনে আনবো—

সাহেবী মেজাজ হঠাৎ যেন গরম হয়ে উঠছে যাচ্ছিল। কিন্তু চুরুটখোরেরা সহজে রাগে না বলেই তিনি কিছু [illegible] চুপ করে রইলেন।

কিন্তু খাবার টেবিলে রিপোর্ট না করে পারলেন না। বললেন— আদর দিয়ে দিয়ে তুই চাকরদের একেবারে মাথায় তুলে ছেড়েছিস মিলি, কী বুদ্ধি দ্যাখ— আমার চুরুটটা তখন নিভে গেছে, আমার দেশলাইয়ের চেয়ে জামাইবাবুর অফিসে যাওয়াটাই বড় হলো—

এখন, ঠিক এই সময়ে, এক পয়লা জানুয়ারির সকালবেলায় কাগজ পড়তে পড়তে রায়সাহেব জে ডি ব্যানার্জি থমকে গেলেন। রায়সাহেব মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় প্রমোশন পেয়ে রায়বাহাদুর হয়েছেন।

সেই অবস্থাতেই নেমে এলেন। সেই ড্রেসিং গাউন, বাঁ হাতে চায়ের কাপ, আঙুলের ফাঁকে চুরুট।

মিলি মিলি

মিলি রান্নাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। রায়সাহেব জে ডি ব্যানার্জি বললেন— মৃত্যুঞ্জয় কোথায় রে

মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় বাগানে ছিলেন। যথারীতি চা খেয়েই বাগানে গিয়েছেন।

রায়সাহেব জে ডি ব্যানার্জি হাত বাড়িয়ে দিলেন--কনগ্র্যাচুলেশন্স—

ভিড় হয়ে গেল সকাল থেকেই। লোকের আসা যাওয়া। স্যার জীবনপ্রসাদ এলেন বুইক হাঁকিয়ে। চার্টার্ড একাউনটেন্ট রণবীর চৌহান সাহেব। হরসি হপুরের জমিদার জনকবাবুরা। রিটায়ার্ড মুন্সেফ রঘুবীর প্রসাদ। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ম্যানেজার বাবুল মিত্তির এম এ

দুপুর বারোটা নাগাদ দু' তিনখানা টেলিগ্রামও এসে গেল।

তারপর বিকেলবেলা আর এক দফা। চা, হাসি কথা, নমস্তের ধাক্কা একদিনেই শেষ হলো না। দু'-তিনদিন ধরেই চললো। ডাকে চিঠি আসতে লাগলো। জ্যাঠি লোটি, কবিরা আর তাদের বরেরা লিখেছে। দেরাদুন থেকে ছেলে লিখেছে। চণ্ডলা থেকে মাসিমারা। দিল্লী থেকে লিখেছে পরেশবাবুর স্ত্রী। ভাগলপুর থেকে মামাবাবু লিখেছেন। বোরিবলি থেকে জ্যাঠতুতো ভাই লিখেছে অনেক অনেক চিঠি। সকলকে উত্তর দিতে দিতে মিলি বিব্রত হয়ে পড়লো।

প্রথমে রায়সাহেব জে ডি ব্যানার্জি সত্যিই খবরটা দেখে প্রীতই হয়েছিলেন। কিন্তু এই বাড়াবাড়ি তাঁর ভালো লাগলো না। ডানকান সাহেব তো কথাই দিয়েছিলেন। ওখানে চাকরিতে থাকলে এতদিন রায়বাহাদুরিটা পেতে অন্তত দেরি হতো না। বা এত বড় রায়বাহাদুরের তালিকা তো আর কখনও বেরোয় নি। এমন বছর-বছর গাদা গাদা রায়বাহাদুর যদি বেরোতে থাকে তাহলে কাকে ছেড়ে কাকে দেখবেন।

কিন্তু এতেও বোধ হয় বিচলিত হবার মতো কিছু ছিল না। সবই চাপা পড়ে যেত একদিন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেক্রেটারিয়েটের অফিসাররা একটা বিরাট পার্টি দেবার বন্দোবস্ত

করে বসলো রায়বাহাদুর মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়কে। হাসি পেল রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জির। এমন হাস্যকর ব্যাপার শুধু পাটনা বলেই সম্ভব বুঝি।

তা হোক, পৃথিবী কারও হাসি-ঠাট্টা, সুখ-দুঃখের ভালো লাগা-না-লাগার তোয়াক্কা করে না।

দিনক্ষণ স্থির হয়ে গেছে। আগামী রবিবার। হাতে আর মাত্র চারদিন। ছাপানো কার্ড বিলি হলো সকলের নামে। পাটনার রথী-মহারথীরা কেউ বাদ পড়লেন না। রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জির নামেও আলাদা চিঠি এল একটা।

রবিবার পার্টি। আর শনিবার দুপুর পর্যন্তও কেউ জানতো না।

শনিবার সন্ধ্যাবেলা বললেন মিলিকে। বললেন—কাল তো আমি থাকতে পারছি না, মিলি—আমাকে যে কলকাতায় যেতে হচ্ছে—

— কেন বাবা, হঠাৎ? ... মিলির চমকে ওঠবারই তো কথা।

রায়বাহাদুর মৃত্যুঞ্জয়ও কম চমকে উঠলেন না। বললেন — কেন?

রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি বললেন — তোমার পার্টিতে থাকতে পারবো না, মৃত্যুঞ্জয়, কিছু মনে কোরো না—ডানকান সাহেব জরুরী চিঠি লিখেছে গিয়ে দেখা করবার জন্যে—এতদিন পরে বোধ হয় ভুল ওরা বুঝতে পেরেছে ...

— তোমাকে কি আবার ওরা চাকরি দেবে নাকি, বাবা? .. মিলি প্রশ্ন করলে।

— কে জানে।

— কবে যাবে?

— কালই সকালে, জরুরী চিঠি লিখেছে, দেবি করা উচিত নয়।

— তা তো বটেই—রায়বাহাদুর মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় বললেন।

গুছিয়ে দিলে মিলি। রাত পোহালেই সকাল। সময় বড় কম। রায়সাহেব জে ডি. ব্যানার্জি চলে যাবেন পাটনা ছেড়ে। চাকরি পেলে আর ফিরবেন না। আর একটা দিন পরে গেলেই তো ভালো হতো। কিন্তু উপায় নেই। নইলে জামাইয়ের সম্মানে যে পার্টি দেওয়া হচ্ছে, তাতেই কিনা তিনি থাকতে পারবেন না!

যত কিছু জিনিসপত্র নিজের বলতে ছিল রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জির, সব গুছিয়ে বাঁধাছাঁদা হলো। মিলি স্লিপ পাঠিয়ে দু'কেশ চুরুটও আনালো।

সকালবেলা উঠেই মিলি এসেছে বাবার ঘরে। হঠাৎ রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। চৌদ্দ বছর আগে যেদিন তিনি এ-বাড়িতে এসেছিলেন, সেদিন যেন এমনি করে মিলি কাছে এসেছিল। এমনি করে তাঁর তদারক করতো। মিলি এরই মধ্যে একডজন রেডি-মেড শার্ট আনিয়েছে। আনিয়েছে এক ডজন টাই। রুমাল ছ'টা। এক টিন বিস্কুট, রাস্তার খাবার।

আজই সন্ধ্যেবেলা রায়বাহাদুর মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের পার্টি। শহরের সমস্ত গণ্যমান্য লোকের নেমন্তন্ন। কথাটা মনে পড়তেই রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি লম্বা চুরুটের ধোঁয়া ছাড়লেন।

মিলি শেষ সময়ে বললে—বাবা, হপ্তায় হপ্তায় একটা করে চিঠি বরাবর দিয়ে যেও—তুমি চলে গেলে বাড়িও একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল—

রায়সাহেব অন্যমনস্ক হয়ে বললেন—দ্যাখ্ মিলি, জানিস রায়বাহাদুর আমিও হতুম ... সব বন্দোবস্ত ঠিক—এমন সময় ডান্‌কান সাহেব এসে গোলমাল করে দিলে—

কী কথার উত্তরে কী কথা শুনে মিলি যেন অবাক হয়ে গেল। বললে--তা হোক্‌গে বাবা, সেই ডান্‌কান সাহেবই তো ডেকেছে— সেই ডান্‌কান সাহেবই তো আবার তোমায় চাকরি দিচ্ছে— লোকটা ভালোই বলতে হবে—

একটা খামের মধ্যে কিছু টাকা দিয়ে বাবার জামার বুকপকেটে রেখে দিয়ে বললে—এই পকেটে দু শো টাকা রেখে দিলাম বাবা, মনে থাকে যেন—

আর রায়বাহাদুর মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের নয়, আজ যেন রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জির হুকুম তামিল করতে ছুটেছে চাকর-বাকরেরা!

ট্রেন ছাড়লো। মিলির চোখ দু'টো করুণ হয়ে উঠেছিল। রায়বাহাদুর মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় হাত উঁচু করলেন। হাতের চুরুটটা দাঁতে চেপে রায়সাহেব জে ডি. ব্যানার্জিও হাত উঁচু করে আঙুল নাড়তে লাগলেন। ইঞ্জিনের ধোঁয়ার সঙ্গে তারও একটা স্বস্তির সুদীর্ঘ শ্বাস পড়লো। পাটনায় থাকলে রায়বাহাদুর মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের পার্টিতে তাঁকে যেতেই তো হতো।

সাতদিন পরে মিলি তখন চায়ের আয়োজন করছে।

বাইরে থেকে হঠাৎ চীৎকার এল—মহারাজ—

মিলি বেরিয়ে এসে দেখলে—ট্যাক্সি থেকে নামছেন বাবা।

মিলিকে দেখে বললেন—এই ট্যাক্সি-ভাড়াটা দিয়ে দে তো মিলি—

ঘরে ঢুকে বললেন—রাজী হলাম না, বুঝলি রে . ডান্‌কান সাহেব বললে—সাত শো টাকা দেব, করো তুমি চাকরি আবার। আমি বললাম—চাকরি আমি করবো না সাহেব। তখন বললে—হাজার টাকা দিচ্ছি—। তখন আমিও বললাম--দু হাজার টাকা দিলেও করবো না—

মিলি বললে—তার পর?

—তারপর আর কি — চলে এলাম, চাকরি করবো কোন্ দুঃখে বল্— তোরা থাকতে বুড়ো বাপ চাকরি করবে—এটা কি ভালো দেখায়—লোকেই বা কী বলবে?

অফিস থেকে এসে রায়বাহাদুর মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় শুনলেন। শ্বশুরের হাজার টাকা মাইনের চাকরি না-নেওয়ার কাহিনী।

রায়সাহেব জে. ডি ব্যানার্জি প্রশ্ন করলেন—ভালো করেনি--তুমি কী বলো মৃত্যুঞ্জয়?

রায়বাহাদুর মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় মিলির মতো কোনো মতামত দিলেন না। চুপ করে রইলেন।

রায়সাহেব নিজের মনেই বলতে লাগলেন—হাজার হোক, বেটারা তো আমাদের মতো নয়—গুণের কদর বোঝে—খাঁটি স্কচের বাচ্চা—বললে—রায়সাহেব, তোমাকে আমি রায়বাহাদুর করিয়ে দেব, তুমি এসো আমার এখানে— তোমার মতন লোক রায়বাহাদুর হয় নি! এটা খুব লজ্জার কথা—কিন্তু ..

কিন্তু হঠাৎ কথা বলতে বলতে রায়সাহেব জে ডি. ব্যানার্জির নজরে পড়লো কেউ শুনছে না। না মৃত্যুঞ্জয়, না মিলি। তারা কখন টেবিল থেকে উঠে গেছে তিনি টের পান নি। তিনি একলা।

তারপর একলা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে নিজের ঘরে উঠতে উঠতে হঠাৎ তাঁর মনে হলো এ-বাড়ির সিঁড়িগুলো আজ যেন বড় উঁচু ঠেক্‌ছে।

বনের রাজা

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

'গাছ আমার সঙ্গে কথা বলে।'

'গাছের ডাল? পাতা?'

'ডাল পাতা ফুল কুঁড়ি ফল সব,—সবাই ফিসফিস্ করে আমার সঙ্গে কথা বলে।'

'আমার সঙ্গে বলবে?'

'হুঁ, বলবে না আবার!' নাতির হাত ধরে সারদা তাকে কাছে টেনে নেন। তারপর ওর ছোট মাথাটা বাদাম গাছের গুঁড়ির সঙ্গে ঠেকিয়ে দিয়ে সারদা অল্প শব্দ করে হাসলেন: 'এই বেলা কানটা চেপে ধর, কথা শুনবি।'

মতি তাই করে। প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ির দিকের মোটা বাকলে ঢাকা কাণ্ডের ওপর কান চেপে ধরে মতি স্থির হয়ে দাঁড়ায়। গ্রীষ্মের দুরন্ত এলোমেলো হাওয়া বইছে। সবুজ সতেজ বাদামপাতার সরসর শব্দ তুলে হাওয়া অন্যদিকে ছুটছে। মতির মাথার চুল নড়ছে, সারদার মাথায় টাক, চুল নেই, পাকা গোঁফটা হাওয়ায় একটু একটু কাঁপছে, কিন্তু তার চেয়েও বেশি কাঁপছে সারদার ঠোঁটজোড়া। অবশ্য এটা হাওয়ার জন্য না, শব্দ না করে হাসিটা মুখের ভিতর গলার কাছে ধরে রাখছে বলে দাদুর ঠোঁট নড়ছে, দশ বছরের মতি টের পায়। এটা দাদুর দুষ্টামি। দাদুর বয়সের আর কোনো বুড়ো বা বুড়ি এমন দুষ্টামি করে কি না মতি মাঝে মাঝে চিন্তা করে।

'কি হল, শুনলি কিছু?'

'নাঃ।' মতি মুখ বেজার করে মাথা নাড়ল ও সঙ্গে সঙ্গে কানটা গাছ থেকে আলগা করে আনল। 'কিছুই শুনছি না।'

'ওয়াক থুঃ।' সারদা মুখ ঘুরিয়ে মাটির ঢিপির পাশের কচু জঙ্গলের ওপর থুথু ফেলেন। এবার আর হাসেন না। গোঁফের আড়ালে পুরু ঠোঁট জোড়া স্থির হয়ে আছে। অস্থির হাওয়ায় বাদাম গাছটা বেশি নড়ছে বলে হলদিবনা পাখিটা ডাল ছেড়ে অন্যদিকে উড়ে গেল। যেন হলদিবনার উড়ে যাওয়া দেখতে দেখতে সারদা একটা লম্বা নিঃশ্বাস ছাড়েন। তারপর চোখ নামিয়ে নাতির মুখ দেখেন।

'কান নষ্ট হয়ে গেছে তোর,—শহরে থেকে থেকে এটি হয়েছে দাদু।'

'তাই কি?' দাদুর চোখের ধূসর বাদামী রঙের মণি দুটো দেখতে দেখতে কী যেন ভাবে ও, তারপর দুধ-সাদা দাঁতের সারি বার করে মতি হাসে, মাথা নাড়ে। 'কেন, আমাদের বিডন স্ট্রীটের বাসায় তো একটা পেয়ারা গাছ আছে,—রাস্তার ওপর কত বড় গোলমোহর ফুলের গাছ,—কৈ, সে দুটো গাছ তো কথা বলে না?'

'বিডন স্ট্রীটের গাছ!' গলার বিশ্রী শব্দ করে সারদা কথা বলেন, 'দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা গাড়ির ঘড়ঘড় ভেঁপু, রেডিওর চিৎকার শুনে সে-সব গাছের কিছু আছে নাকি। সব বোবা হয়ে গেছে, কথা বলবে কি, কোনোরকমে প্রাণটা টিকিয়ে রেখে ধুকপুক্ করছে।' সারদা

আর এক দলা থুথু ফেলেন। 'তোদের বিডন স্ট্রীটের পেয়ারা গোলমোহর গাছের পরমায়ু ক'দিন?'

মতি চুপ।

'এখানে গাছের কাছে গাছ ছাড়া আর আর ঐ দ্যাখ্, এক-একটা গাছকে যেমন কিছুই নেই। গুঁড়ির কাছে কত ঘাস মাটি! আদর করে জড়িয়ে ধরেছে অপরাজিতা লতা, ঝুমকা লতা।'

মতি হাঁ করে তাকিয়ে তাকিয়ে চারদিকের গাছ, ঘন লতাঝোপ দেখে। সারদা আঙুল দিয়ে গাছের ডালপাতা দেখান।

'আর পাতার ফাঁকে ফাঁকে ডালে ডালে রঙবেরঙের পাখিরা এসে উড়ে বসে, গান গায়, পাতার বোঁটায় ঠোঁট ঘষে, ফলে ঠোকর মারে, তাই না?'

দাদুর চোখের ধূসর বাদামী মণি দুটো উত্তেজনায় ঝিকিয়ে ওঠে। নাতি ঘাড় কাত করে অস্ফুট গলায় বলে, 'তাই।'

গোঁফের আড়ালে সারদার কালচে পুরু ঠোঁট দুটো হঠাৎ আবার বেঁকে যায়।

'আর তোদের বিডন স্ট্রীটের গাছের গুঁড়ির কাছে কি? পাথরের খোয়া, গরম পীচ, গাছকে জড়িয়ে থাকে ইলেক্‌ট্রিক তার, গাছের মাথা ডিঙিয়ে ওঠে চারতলা, দু'তলা দালান, কেমন?'

নাতি এবারও ঘাড় কাত করে অস্ফুট স্বরে দাদুর কথায় সায় দেয়। দিয়ে চুপ করে পায়ের নখ দিয়ে মাটির ঘাস খোঁটে।

'কাজেই শহরের গাছেরা কথা বলে না, পোড়া পেট্রলের ধোঁয়া খেয়ে খেয়ে তাদের জিভ খসে পড়েছে, গাড়ির ঘড়ঘড় আর রেডিওর চেঁচামেচি শুনে শুনে তাদের কান ভোঁতা হয়ে গেছে।' কথা শেষ করে সারদা কচুজঙ্গলের গায়ে থুথু ছিটান।

'গাছের কান আছে দাদু?'

'আছে বৈকি। জিভ আছে, কান আছে। নাক আছে, চোখ আছে। দাদু গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়েন। 'আমাদের মতো ওরাও সব কিছু দেখতে পায়।'

কালো চক্‌চকে চোখ জোড়া বড় করে মতি এদিক-ওদিক দেখে। সারদা হাঁটেন। মতি হাঁটে। কচুজঙ্গল পিছনে রেখে দু'জন ঢালুজমিতে নামে। রাত্রে জোর বৃষ্টি হয়েছে। হাঁটুসমান জল দাঁড়িয়েছে সেখানে। দু'জন জলের ধারে গিয়েছে কি না গিয়েছে, জলে পা ডোবালো কি না ডোবালো যেন দু-তিনশ' ব্যাং লাফিয়ে ছিট্‌কে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে জলে ঝাঁপ দিল। প্রথমটায় হঠাৎ ভয় পেলেও পরে মতি যেন খুব মজার জিনিস দেখল, দু'হাতে তালি দিয়ে চিৎকার করে উঠল।

'তোর প্যান্টের পকেটে এক-আধ ডজন ঢুকিয়ে নে না।' গম্ভীর থেকে দাদু প্রস্তাব দেন। 'কেমন হলদে তেলতেলে চেহারা ওদের।'

'ধ্যেৎ কী হবে ব্যাং দিয়ে?' মতি নাক সিঁটকায়।

'খাবি ভেজে চচ্চড়ি করে?'

'ওয়াক থুঃ।' মতি থুথু ছিটায়। 'চীনারা ব্যাং খায়। আমরা খাব কেন?'

'হুঁ, তোমরা বরফচাপা পচা পচা মাছ খাবে। পচা বাসি মাছ খেয়েই তোর এমন হাড়গিলে চেহারা হয়েছে, বুকের সব ক'টা হাড় গোনা যায়।'

কথাটা সত্য। মতির শরীর খারাপ হয়ে গেছে। তাই না দাদুর চিঠি পেয়ে সামারের ছুটি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এখানে চলে এল। পাঁচ-সাত দিনেই শরীরটা ভাল বোধ করছে সে। পুকুরের টাটকা মাছ আর খাঁটি দুধ খেতে পারছে এখানে।

মাঠের জল পার হয়ে দু'জন তাদের নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে যায়। একটা না, সাত-আটটা জাম গাছ। ডালপালা ছড়িয়ে জায়গাটা অন্ধকার করে রেখেছে। আর থোকা থোকা কালো জাম ঝুলছে মাথার ওপর। যেন শ্রাবণ আকাশের অগুনতি ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ গাছের মাথায় এসে বাসা বেঁধেছে। মতি হাঁ করে তাকিয়ে দেখে। এক সঙ্গে এত পাকা জাম সে কোনোদিন দেখেনি। সব অবশ্য পাকেনি। কাঁচা কচি সবুজ রঙের,—আধপাকা লাল রঙের জামই বা গাছে কম কি। লাল সবুজ কালো। যেন এক-একটা গাছের ডালের মাথায় লাল সবুজ কালো পাথরের মালা ঝুলিয়ে রেখেছে কে?

'হাঁ করে দেখছিস কি?' দাদু ধমক লাগায়।

'দেখছি, ভারি সুন্দর লাগছে।'

'হুঁ!' সারদা হঠাৎ কি ভেবে হাসেন। 'সুন্দর লাগছে বলে গাছতলায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলে ফলগুলো তোর মুখের ভিতরে লাফিয়ে এসে ঢুকবে, কেমন?'

'না, তা ঢুকবে কেন।' মতি মাথা নাড়ে।

'সুন্দর সুন্দর করেই তো তোরা মরলি।' সারদা কাঁধের গামছাটা কোমরে বেঁধে নেন।

মতির মতো তাঁর পরনেও হাফপ্যান্ট। খালি গা, খালি পা। বুড়ো হলে হবে কি, হাতের পায়ের মাংসের গোছার এখনও শক্ত পাথুরে চেহারা! দাদু গাঁয়ে থাকে বলেই শরীর এত ভাল। মতি ভাবে। অথচ তুলনায় মতির বাবা, হ্যাঁ এই সারদা বাবের ছেলে সুকুমারবাবুর শরীর কেমন নরম ঢিলেঢালা হয়ে গেছে। বাবার চেহারাটা মতির এখন মনে পড়ল। এখন বেলা এগারোটা। তার বাবা অফিসে চলে গেছেন। ডালহৌসী স্কোয়ারের একটা প্রকাণ্ড লাল বাড়িতে বাবার অফিস। একদিন তাদের চাকরের সঙ্গে গিয়ে মতি বাবার অফিস দেখে এসেছে। মতি চিন্তা করল, যদি তার বাবা গ্রামে চলে আসেন দাদুর মতো তাঁরও শরীরটা ভাল হবে, ভাল থাকবে। এবার কলকাতায় ফিরে গিয়ে বাবাকে তাই পরামর্শ দেবে কিনা মতি তা-ও চিন্তা করল। কিন্তু তার বাবা আসতে চাইলেও মা আসবে না। মতি জানে। এখানে তার আসা নিয়ে মা ভীষণ আপত্তি তুলেছিল। সাপ ব্যাং জঙ্গল জল কাদা ছাড়া কিছু নেই এখানে। গাঁয়ে কোনো ভদ্দরলোক বাস করতে পারে নাকি। তাছাড়া, কেবল চাষাভুষো নিয়ে কারবার। হয়তো ওদের ছেলেপুলেরাই মতির সঙ্গী হবে। একটা ভাল কথা শুনবে না, লেখাপড়ার চর্চা থাকবে না, দিনরাত মাঠে-জঙ্গলে ঘুরে পাখির ছানা চুরি আর গরু-ছাগল ঠেঙানো শিখে আসবে মতি। অবশ্য মা আপত্তি করলেও দাদুর চিঠি পেয়ে বাবা তাকে একজন লোক দিয়ে এখানে পাঠিয়েছেন। এখানে এসে মতির ভাল লাগছে। চাষাভুষো সাপ ব্যাং জঙ্গল কাদা ছাড়াও এখানে এমন অনেক কিছু আছে যেগুলি সত্যিই ভাল, সত্যিই সুন্দর। মতির ইচ্ছা, কেবল সামারের ছুটি না, সব সময়ের জন্য এখানে থেকে যায়। তার বাবা-মাও এখানে চলে আসুক।

এই আশ্বিনে ঊনষাট পেরিয়ে ষাটে পা দিচ্ছেন সারদা। গাছের উঁচু ডালে চড়ে তিনি তাঁর দশ বছরের শহুরে নাতিকে অবাক করে দিতে পেরেছেন কিনা চিন্তা করার আগে হাত বাড়িয়ে কালোজামের ছড়া ছিঁড়ে কোমরের গামছায় পোরেন। চার-পাঁচটা জাম মুখে ফেলেন। দশ-বারোটা জাম ছড়া থেকে আলগা হয়ে ছিটকে নিচে পড়ে। মতি মহানন্দে সেগুলি কুড়াতে লেগে যায়। পুষ্ট পাকা জামের মধুর টক টক রসেমাসে সারদার মুখগহ্বর যখন ভরে ওঠে তখন তাঁর চোখের মণি দুটো একটি ছোট ছেলের চোখের মণির মতো চক্‌চকে হয়ে ওঠে, ঘোলাটে বাদামী রং মিলিয়ে গিয়ে পাকা জামের বীচির মতো লাল টুক্‌টুকে হয়ে ওঠে।

'দেখতে সুন্দর। সুন্দর সুন্দর করে তোরা মরবি।' গাছের মগডালে উঠতে চেষ্টা করেন সারদা। 'যা দেখতে ভাল তা খেতেও ভাল। কিন্তু খাওয়া জিনিসটা তোরা ভুলে গেছিস।'

মগডালে চড়ে সারদা মনে মনে নাতির সঙ্গে কথা বলেন। তোদের বীডন স্ট্রীটের বাসায় সুন্দর সুন্দর সোফাসেট, পর্দা, ফুলের টব আছে। রেডিও আছে, নিয়োন আলো আছে, ড্রেসিং টেবিল কাচের বাসন প্ল্যাস্টিকের খেলনা পুতুলে ঘর বোঝাই। তোর মা এ বেলার শাড়ি ও বেলা পরে না। সকালের সুন্দর শাড়ি ব্লাউজ ছেড়ে বিকেলে তার চেয়েও কোন্‌টা সুন্দর , কোন্‌টা বেশি মানাবে ভেবে দিশাহারা হয়। তোর বাবার সুন্দর টাই স্যুট জুতো গাড়ি কেতাদুরস্ত আর্দালি পিওন নিয়ে দিন কাটে না, তোরা উপোস থাকিস বলব না। কাচ-ঘেরা বদ্ধঅফিস-কামরার পাখার তলায় বসে সুকুমার পাউরুটি, টিনের মাখন, শিয়ালদার ঠাণ্ডাঘরে জিইয়ে রাখা দুটো আলু সিদ্ধ, মরিচগুঁড়ো, বাসি ডিম আর কিছু শুকনা আনাজ সিদ্ধ ও গুঁড়ো দুধ জমিয়ে তৈরি একটা বড় বরফি দিয়ে লাঞ্চ খায়। ব্যালান্সড্ ডায়েট? অস্বীকার করবে কে? রীতিমতো শহরের নামী ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে সুকুমার অফিসে বসে খবর কাগজের ওপর চোখ বুলোতে বুলোতে প্রোটিন ফ্যাট্ কার্বোহাইড্রেট মিনারেল্‌স সহযোগে তার দুপুরের সুষম আহার সম্পন্ন করে। ঘরে সুকুমারের স্ত্রী ভেজাল তেল আর গুঁড়ো হলুদ লঙ্কায় রান্না করা মাছের ঝোল ও চচ্চড়ি দিয়ে ভাত খেয়ে উঠে ঢেঁকুর তুলতে তুলতে চিন্তা করছে, শহরের কোন্ সিনেমা ঘরে ভাল ছবি এল, ম্যাটিনী শো দেখে আসা যাক। 'সিনেমা!' কথাটা মনে হতে সারদা মুখ বিকৃত করলেন এবং তাড়াতাড়ি একটা ডবল সাইজের পাকা জাম মুখে পুরলেন। 'ফানুসের পরমায়ু নিয়ে তোরা শহরে বসে আছিস। কেবল বাইরের বংচং আর ঠাটঠমক। এদিকে ভেজাল খাদ্য আর বদ্ধ বাতাস যে তোদের আয়ুর বারোটা—'

নীচে থেকে মতি চেঁচাতে থাকে :

'দাদু অত উঁচোয় উঠছ কেন, —ডাল ভেঙে— ?'

সারদা হাসেন। উঁচু ডালের ওপর বসে মাটির দিকে তাকান।

'ভাঙবার আগে ডাল জানান দেবে, মট্‌মট্ শব্দ হবে, তোদের বিডন স্ট্রীটের গাড়ি-ঘোড়া জানান না দিয়ে এসে ঘাড়ে পড়ে।'

মতি নীরব হয়ে যায়। এ গাছের শালিক বুলবুলির দল দাদুর তাড়া খেয়ে অন্য গাছে উড়ে গিয়ে জটলা করে, পাকা জামে ঠোকর লাগায়। কিন্তু বুড়ো দাদুই বা কম যায় কি! মতি চিন্তা করে। এই তো সকালে বাড়ি থেকে বেরোবার আগে চারটে পাকা আম দিয়ে এতবড় বাটির এক বাটি ক্ষীর মুড়ি খেয়ে এসেছে। এখন আবার গাছে উঠে প্রাণভরে পাকা জাম খাচ্ছে। শ দেড়শ এর মধ্যে খাওয়া হয়েছে ঠিক। মতি বেশি খেতে পারে না। 'পেট চিম্‌সি মেরে গেছে, শহুরে ছেলে, কী আর খাবি, কতটা খাবি।' সকালে দাদু তাকে ঠাট্টা করছিল। কেননা এত ভাল দুধ মেরে তার ঠাকুমা কাল রাত্তিরে ক্ষীর তৈরী করেছে, সেই ক্ষীর মতি কতটা খেতে পারল! ক্ষীরের গন্ধটা এখনও তার হাতে লেগে আছে। দুধের গন্ধ, ঘিয়ের গন্ধ, ক্ষীরের গন্ধ কী মতি এখানে এসে জানতে পারছে। 'খেতে খেতে খাওয়া বাড়বে।' দাদুর ঠাট্টা শুনে মতির ঠাকুমা বলছিল, 'খাওয়াটা অভ্যাসের কাছে,—কলকাতায় থাকতে তুমি কি আর বেশি খেতে পারতে,—এখন তো তোমার খাওয়া দেখে আমিই মাঝে মাঝে অবাক হই।' দাদু হাসছিল। 'অবাক হচ্ছ কি ভয় পাচ্ছ খাঁটি কথাটা বলে ফেল।' যেন দাদুর খোঁচা খেয়ে ঠাকুমা লজ্জা পেয়ে চুপ করে ছিল, কিন্তু দাদু চুপ ছিল না। 'হুঁ, ভুঁড়িটা বেজায় বড় হয়ে যাচ্ছে দেখে ভয় পাবার কথা,—আয়ুর ফিতে লম্বা করতে হলে খাওয়াটা ঠিক রাখতে হবে বৈকি। নাকি ধরো ফিতেটা যদি ফটাস্ করে ছিঁড়ে যায়, থ্রম্বসিস, কি ঐরকম কিছুতে হট্ করে মরে যাই তো তোমার সাহস বাড়বে?' শুনে ঠাকুমা রেগে গিয়ে বলেছিল : 'আহা, কথার কী ছিরি! কেন তোমার কি মরবার বয়স হয়েছে নাকি যে, এসব যা-তা বলছ?' আর কথা না বলে দাদু আম-ক্ষীর খাওয়ায় মনোযোগ দিয়েছে এবং ঠাকুমা আরো

কিছুটা ক্ষীর দাদুর বাটিতে ঢেলে দিয়েছে। এক সঙ্গে দাদুর চোখ ও ঠাকুমার চোখ দেখে তখন মতি বুঝে ফেলেছে, খেতে পেয়ে বুড়ো যেমন খুশী, তেমনি খাইয়ে বুড়ী মহাখুশী।

আয়ুর ফিতা। কথাটা মনে পড়তে মতি তার বাবার কথা চিন্তা করল। না, তার বাবা মোটে খেতে পারে না। এই এতটুকুন ভাত, দু-তিনখানা লুচি কি এইটুকুন সুক্তি খাওয়ার পর দু'হাত তুলে বাবা মাকে আর কিছু দিতে নিষেধ করে। যেন আর একটা লুচি কি একমুঠো ভাত বেশি খেলে বাবার পেট ফেটে যাবে। এটা তো ভাল লক্ষণ না, মতি এখন দাদুকে দেখে, দাদুর কথাবার্তা শুনে বুঝতে পারছে, তার বাবা হয়তো হুট্ করে একদিন—

'নে ধর্।'

মতি চমকে ওঠে। দাদু গাছ থেকে নেমে এসেছে। এই এত জাম কোমরের গামছায় বাঁধা। দরদর করে ঘামছেন সারদা। রোমশ ভুঁড়িটা ফলের রসে যেন আরো ফুলে উঠেছে।

'আমি আর খেতে পারছি না দাদু।' মতি ঘাড় নাড়ে।

'ঐ মাটিরটা কুড়িয়ে খেয়ে তোর পেট ভরে গেল! গাছেরটা খা, দুটো একটা খা।' হেসে সারদা এক খাবলা জাম নাতির হাতে তুলে দেন। মতি আর আপত্তি করে না, দুটো একটা জাম মুখে ফেলে দাদুর সঙ্গে হাঁটে।

'হুঁ, আমার জাম বাগান দেখলি, আম বাগান দেখলি,—এইবেলা তোকে জামরুল আর পেয়ারা বাগানটা দেখাব।'

মতি খুশী হয়ে পা চালায়। দাদুর আম বাগান কাল দেখা হয়ে গেছে, আজ জাম বাগান দেখল।

'সব গাছ তুমি লাগিয়েছ দাদু?'

সারদা থুথু ফেলেন। জামের রসে থুথুর রং গাঢ় নীল রং ধরেছে। 'জাম গাছ আগেই ছিল। এতগুলি জাম গাছ এক জায়গায় আছে দেখে তো এধারের জমিটাও কিনলাম।'

'আম,—সব আমের গাছ তোমার হাতের বলছিলে কাল।'

'হুঁ', সারদা আকাশের দিকে তাকান। 'আমি এসে একটাও আমগাছ পাইনি। হাজার টাকার আমের কলম কিনে আমাকে লাগাতে হয়েছিল। তাই না আজ অত বড় বাগান হয়েছে।'

'বেশ ভাল ভাল আম হয় তোমার বাগানে।'

'হিমসাগর আর মোহনফুলি ছাড়া কোনো আমের কলম লাগানো হয়নি, দাদু,—আমের বেলায় আমি বেজায় খুঁতখুঁতে। বাজে আম আমার দুচোখের বিষ।' সারদা আকাশ থেকে চোখ নামিয়ে নাতির দিকে ঘাড় ফেরান। যেন ছেলেটা কি ভাবছে। ঘেমে মুখখানা লাল টুক্‌টুকে হয়ে গেছে। দাদুর সঙ্গে চোখাচোখি হতে মতি ফিক্ করে হাসল।

'হাসছিস যে।' সারদা ভুরু কুঁচকান। ভুরুতে একটা দুটো সাদা চুল এখনও রয়ে গেছে, বাকি চুল উঠে যাওয়ার দরুন কপালটা আগের চেয়ে চওড়া হয়েছে মনে হয়। কপালের দু-তিনটা গভীর রেখার খাঁজে খাঁজে ঘাম জমে রোদে চিকচিক করে। 'গত বছর পাঁচশ টাকার সিঙ্গাপুরী কলা আর আনারসের চারা লাগিয়েছি।

'কলাবাগান দেখেছি,—আনারসের বাগান দেখা হয়নি।' মতি ঢোক গিলল।

'একে একে সবই দেখা হবে, এখানে এসে গেছিস যখন আনারস, পেয়ারা, কামরাঙা, জামরুল, সবেদা সব-কিছুর বাগান দেখতে পাবি।'

মতির চোখের তারা ঝিকিয়ে উঠল।

'সবেদা খেতে আমি খুব ভালবাসি।'

সারদা কথা বলেন না, হাঁটেন। মতি হাঁটে। একটা বড় দীঘির পাড় ঘুরে দু'জনে আবার রাশি রাশি ডালপাতা ছড়ানো বিশাল ছায়ার জগতে এসে দাঁড়াল। মতি গুনে গুনে দেখল

এক-এক সারিতে চারটে করে গাছ, তিন সারিতে একুনে বারোটা জামরুল গাছ। এক-একটা গাছে পাতার চেয়েও যেন ফল ফলেছে বেশি। ঘন, সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে নধর পুষ্ট দুধরং অসংখ্য জামরুল ঝুলে আছে। জামগাছের চেয়ে এখানে পাখির সংখ্যা বেশি। এখানে তারা বেশি চঞ্চল, বেশি কলমুখর। মতি বুঝতে পারল, টিয়া, বুলবুলি, শালিক, কাক কালো জামের চেয়ে দুধবরন জামরুল পছন্দ করে বেশি। আর কাঠবিড়াল। লেজ ফুলিয়ে ফুলিয়ে ওরা এ-ডাল থেকে ও-ডালে ছুটে বেড়াচ্ছে।

'কেমন দেখছিস মতি?'

'ভারি সুন্দর,—মনে হয় গাছে গাছে তারা ফুটে আছে, রাতের আকাশে যেমন তারা ফোটে।

'কাব্য!' সারদা মুখ বিকৃত করলেন, থুথু ফেললেন। তারপর হাত বাড়িয়ে ঝুলে পড়া একটা ডাল থেকে এক ছড়া জামরুল ছিঁড়ে নাতির হাতে তুলে দেন। 'খেয়ে দ্যাখ, কেমন মিষ্টি রসালো ফল আমার গাছের।'

'খুব মিষ্টি।' মতি একটা ফলে কামড় বসায়। অবশ্য নাতির কথা শুনতে সারদা চুপ করে দাঁড়িয়ে নেই। হাত বাড়িয়ে আর এক ছড়া জামরুল পেড়ে টপাটপ্ মুখে ফেলেন, কচমচ করে চিবোন। ছোট ছেলের মতো জামরুলের রস ঠোঁটের কশ বেয়ে থুতনির আগায় এসে ঝুলতে থাকে সারদার। দেখে মতি মজা পায়। তার ষাট বছরের বুড়ো দাদু যে সত্যি একটি ছেলেমানুষ ছাড়া আর কিছু না, মতি এখানে এসে বুঝতে পারছে, দেখছে। একটা জামরুল সে খেয়ে শেষ করতে পারছে না। দাদু পাঁচটা সাবাড় করে দিচ্ছে। আয়ুব ফিতে লম্বা করছে দাদু। ভেবে মতি নিজের মনে হাসল।

'এইবেলা বুঝি আনারস ক্ষেত দেখতে যাব আমরা?'

'উহুঁ।' সারদা মাথা নেড়ে বলেন, 'আনারস ক্ষেতে যাবি কি, এখনো পাতার রং যায়নি, আর দু-এক পশলা বৃষ্টি হলে তবে তো আনারস পাকতে আরম্ভ করবে। এখন সব কাঁচা রয়ে গেছে।'

কেবল ফলের বাগান দেখা না, দেখার সঙ্গে খাওয়ার একটা অচ্ছেদ্য যোগাযোগ রয়েছে, সারদা নাতিকে বার বার বোঝাতে চাইছেন। বুঝতে পেরে মতি আর আনারসের কথা তুলল না। কিন্তু কথা না বললেও ছেলেটা আবার কি ভেবে ভেবে মিটি মিটি হাসে।

'হাসছিস যে বড়ো?'

'আমার ইচ্ছা করে তোমার একটা নাম দিই দাদু।'

'কি নাম?' সারদা খুশীই হন। পিটপিট করে নাতির চকচকে চোখ দুটো দেখেন। 'বল্, বলে ফেল্।'

'ফলের রাজা।' মতি ফিক্ করে হাসল।

'হুঁ, তার চেয়ে বল্ গাছের রাজা, বাগানের রাজা।' সারদা হাতের শেষ জামরুলটা কচকচ করে চিবোন। 'ফল পিছে, গাছ আগে, বুঝলি।' কি ভেবে সারদা নিজের মনে হাসেন। 'তারপর গেল বার আমার একটাও আম খাওয়া হয়নি জানিস?'

মতি ফ্যালফ্যাল করে দাদুর মুখ দেখে।

'গেল বার ঝড়ে সব আমের বোল গুটি নষ্ট হয়ে যায়। এত বড় আমবাগানে একটা আম বড় হতে পারেনি, পাকেনি!'

'তারপর?'

'তারপর আর কি, পাকা আম খাইনি তো খাইনি, তাই বলে কি আমি বাগানের গাছগুলির ওপর রাগ করেছিলাম, না গাছের যত্ন করিনি! বরং গত বছর আমি আমার নিষ্ফলা আম

বাগানেই বেশি সময় কাটিয়েছি, ওদিকে জামের বাগানে জাম পেকে ঝরে ঝরে নিচে পড়েছে, ঘাসের ওপর হাঁটু-উঁচু কালো জাজিম তৈরী হয়েছে পাকা জামের, কিন্তু আমি একবার ওদিক মাড়াইনি। হুঁ, জামরুল পেকে পেকে সব ক'টা গাছ সাদা হয়ে গেছে, কাঠবিড়াল আর রাজ্যের পাখি পেট ভরে জামরুল খেয়েছে, আমি একবার এখানে চুপি দিতে আসিনি।'

'তবে তো তুমি ফলের চেয়ে গাছকেই বেশি ভালবাস।' মতি আমতা আমতা করে বলল।

'তবে?' সারদা নাক দিয়ে শব্দ বার করলেন। আমি আর ক'টা ফল মুখে দিই, নাকি একলা আমি খাব বলে এত এত গাছ লাগিয়েছি, বাগান করেছি। আমার গাছের ফল পাখিরা বেশি খায়, বাদুড় আর কাঠবিড়ালগুলি বেশি খায়, খাচ্ছে।'

'তাই দেখছি।' সারদার দশ বছরের শহুবে নাতি জামরুলেব ডালে ডালে লেজমোটা কাঠবিড়ালগুলির ছুটোছুটি দেখতে দেখতে খুশী হয়ে ওঠে, উত্তেজিত হয়ে পড়ে। বিডন স্ট্রীটের বাসায় সে তার গুল্‌তিটা ফেলে এসেছে। ওখানে কি আর কাঠবেড়াল আছে। কেবল ইলেকট্রিক তার, ট্রাম, টেলিফোনের তার। তারের গায়ে গুলি ছুঁড়ে ছুঁড়ে মতি কাঠবিড়াল আব পাখি মাবার সাধ মিটিয়েছে। তাবের ঝন্‌ঝন্ শব্দটা এখনও তার কানে বাজছে। শহরের কথা মনে হতে সে দাদুর দিকে তাকায়।

'কিছু বলছিস্?'

মতি অল্প অল্প হাসে।

'তোমার একটা বড় গাড়ি ছিল, হল্‌দে বঙের গাড়ি?'

'হ্যাঁ', সারদা থুত্‌নি নাড়েন। 'কাব কাছে শুনলি?'

'মা বলছিল একদিন, গাড়িটা বেচে দিযেছ?'

'বেচে দেব না তো সঙ্গে করে ওটা গাঁয়ে নিয়ে আসতাম নাকি।' সাবদা থামেন, চাবদিকে তাকান। 'ভাল রাস্তাঘাট নেই, এখানে আমি গাড়ি দিয়ে করতাম কি?'

তাও বটে। দাদুর মতো নাতিও ঘাড ঘুবিয়ে চারদিক দেখে। মাঠ জঙ্গল ডোবা খানা আর এবড়ো-খেবড়ো মেঠো পথে দাদু কী করে গাড়ি চালাতো!

'বেচে দিয়ে ভাল করিনি?' সারদা নাতির চোখ দেখেন। মতি ঘাড় কাত করে। সারদা হাসেন। 'না কি মাঠের ওপর দিয়ে গাড়ি ছুটিয়ে আমি আম বাগানে জাম বাগানে এসে আম জাম খেতাম?''

''ধ্যেৎ!' ছবিটা মতিবও মনঃপূত হয় না। 'তাছাড়া, ঘাসের ওপর দেদাব পাকা জাম জামরুল ছড়িয়ে থাকে। গাড়ি ছুটিয়ে এলে চাকার তলায় সব থেঁতলে যেত।'

সারদা শব্দ করে হাসেন।

'যা বলেছিস দাদু, তাছাড়া, একবার এখানে গাড়ির হর্ন শুনলে আমার গাছের সব পাখি কাঠবেড়াল ভয়ে ছুটে পালাতো। কেমন না?'

মতি ঘাড় কাত করল। কি একটু ভাবল। চঞ্চল চোখে এদিক-ওদিক দেখল। তারপরঃ

'আমার তো মনে হয় গাড়ির শব্দ শুনে ফড়িং প্রজাপতিগুলিও ভয়ে পালিয়ে যেত।'

'তাই, গাড়ি বাজে জিনিস। সাধে কি আর বেচে দিলাম।' সারদা নাতির ওপর সন্তুষ্ট হন।

'তবে কিনা—'

'আবার তবে কিনা কি!' সারদা রুখে ওঠেন। 'আর কি বলার আছে শুনি?'

ঘাড় গুঁজে মতি পায়ের নখ দিয়ে ঘাস খোঁটে। 'পায়ে যদি ধুলো না লাগল, নরম ঘাস না মাড়ালাম তো বেঁচে আছি বলে আমার মনে হয় না।' কথা শেষ করে সারদা গোড়ালি

দুটো জোরে জোরে ঘাসের ওপর ঘষেন। তাই, মতি চিন্তা করল, দাদু সারাদিন খালি পায়ে থাকে, গাছের রাজা জুতো পরে না।

কিন্তু যে কথাটা তার জিভের ডগায় এসেছিল বলতে না পেরে মতি অস্বস্তি বোধ করে। দাদু হাটে, মতি হাঁটে। জামরুল বাগানের ঠাণ্ডা ছায়া মাথাব উপর থেকে সরে যায়। দুজন রৌদ্ররুক্ষ আকাশের নিচে চলে এল।

'বেজায় রোদ।' মতি আস্তে বলল।

'এটা জ্যৈষ্ঠ মাস।' চড়া গলায় দাদু বলল, 'শ্রেষ্ঠ ঋতুর শ্রেষ্ঠ মাস, রোদ তো চড়বেই: না হলে আম জাম কাঁঠাল কলা পাকবে কেন।'

'তাও বটে।' মতি বিড়বিড় করে দাদুর কথায় সায় দেয়, হাতের পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মোছে। তাব কপালটা ঘামছিল বেশি।

'এক কাজ কর না।' সারদা নাতির দিকে ঘাড় ফেরান।

'কি?' মতি ঘাড় ফেরায়।

সারদা হাঁটা বন্ধ করে থমকে দাঁড়ান। মতি বুড়োর চোখ দেখে। বুড়োর চোখেব বাদামী মণি দুটো রোদের তাপে লাল হতে শুরু করেছে কি?

'রোদটা তোব মাথায় বেশি লাগছে, কেমন?' সারদা অল্প হাসেন।

'হুঁ।'

'তা তো লাগছেই,' সারদা আবার এক দলা থুথু ছিটান। মাঠের গরম বালি থুথুটাকে চোখের নিমেষে শুষে নিচ্ছে, যেন মতি তাই দেখতে আরম্ভ কবেছিল। সারদা আঙুল দিয়ে মতিব পরনের হাফপ্যান্ট দেখান। 'ওটা খুলে ফেল্—খুলে মাথায় জড়িয়ে নে, মাথাটা ঠাণ্ডা থাকবে।'

'ধ্যেৎ', মতি ফিক্ করে হাসল, 'তুমি যেন কী দাদু, মাঠেব ওপব দিয়ে আমি লেংটা হয়ে হাঁটব নাকি!'

'আমি গরু, আমি ছাগল, আমি গাছের কাঠবিড়াল, জঙ্গলের শেয়াল' সারদা ভেংচি কেটে বড় একদলা থুথু ফেলেন। 'তোকে এখানে দেখছে কে, কতবড় একটা মানুষ হয়ে গেছিস শুনি? লজ্জা করে!' একটু থেমে সারদা বললেন, 'এ তোমার বিডন স্ট্রীটেব ছাদ দেয়াল ডিঙিয়ে আসা মরা হাজা রোদ্দুর না, এ হল গিয়ে মাঠ ফাটানো দীঘি শুকানো তেজী খাড়া রোদ; অভ্যাস নেই যখন তোমার মাথাটিও ফেটে চৌচির হতে পারে, তাই বলছিলাম দাদু—ওটা মাথায় জড়িয়ে নিতে।'

যেন দাদুকে খুশী করতে মতি পরনের প্যান্ট খুলে মাথায় জড়ায়। প্রথমটায় কেমন বাধো-বাধো ঠেকে তার, কানটা গালটা লাল হয়, তারপর অবশ্য মতি স্বাভাবিক হয়ে যায়, দাদুর সঙ্গে লম্বা পা ফেলে হাঁটে। সত্যি তো, কে আছে কে দেখছে তাকে এই রোদ্দুরে; কাক-শালিকটা পর্যন্ত ধারেকাছে নেই। 'বুঝলি', সারদা হাসেন, নাতির কাঁধে হাত রাখেন; নাতি তাঁর বাধ্য হয়েছে দেখে খুশী গলায় বলেন, 'আমি কিছু গ্রাহ্য করিনে। আম বাগানে কি জাম বাগানে থাকলে, যখন দেখি বেশি ঘাম দিচ্ছে শরীরে, গরম কমছে না, গায়ে কিছু থাকলে খুলে ফেলে স্রেফ লেংটা হয়ে ঘাসের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ি।'

'খুব আরাম লাগে!'

'আলবত লাগতে হবে, হি হি।' ছোট ছেলের মতো শোনায় সারদার হাসি। 'নরম ঘাস তোমার শরীরকে আদর করছে, গাছের মিষ্টি ছায়া তোমার শরীর ঢেকে রাখছে, আরাম না লেগে পারে দাদু।'

'জামা কাপড় কিছু না।' যেন দাদুকে আর একটু খুশী করতে মতি বলল, 'আগে মানুষ যখন জঙ্গলে ছিল, বনে ছিল তখন তো শুনেছি ওরা জামা কাপড় চিনতই না।'

'তবে আর কি, জানিস তো সব!' সারদা আকাশের দিকে চোখ তোলেন। 'আগে মানুষ সুখে ছিল, এখন পোশাক-আশাক তার যন্ত্রণা বাড়িয়েছে।'

দাদুর মেজাজ ফিরে এসেছে বুঝতে পেরে মতি কথাটা বলে ফেলল ঃ 'মা বলে, এতবড় ইঞ্জিনীয়ার ছিল তোর দাদু, এখন একটা চাষাভুষো হয়ে গাঁয়ে আছে।'

'বলুক না, বলতে দে,—চাষা বলছে শুনলে আমি রাগ করিনে।'

'মা দুঃখ করছিল এলগিন রোডের এত বড় বাড়ি তুমি বেচে দিলে।'

'তোর মা তো দুঃখ করবেনই, তোর মা ইট কাঠ লোহা বালির স্বপ্ন দেখেন। আমার স্বপ্ন মাটি, আমার স্বপ্ন গাছ।'

'ঘাস ছায়া পাখি কাঠবিড়াল।' মতি যোগ করল।

কাজেই শহরের বাড়ির বদলে এখানে আমি কী পেয়েছি তোর বাবা-মা জানবে না।' যেন বিরক্ত হয়ে সারদা তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা শেষ করতে চাইলেন। 'শহরের পুবনো পচা আকাশের নিচে থেকে ওদের ইমারতের স্বপ্ন দেখতে দে, কল ইঞ্জিনের ধোঁয়া কালি গিলে গিলে আয়ুর ফিতা গুটিয়ে নিতে দে।' সারদা ভেংচি কাটার মতো চেহারা করে নাতির মুখ দেখেন।

'ওরা তোমার আগে মরে যাবে দাদু?' মতি প্রশ্ন না করে পারল না। 'আমাব বাবা-মা?'

'সব, কলকাতা শহরটাই যে মরতে বসেছে।' দাদু নাকে হাসল। যেন মতি কি ভাবল, ভেবে প্রশ্ন করল, 'বাড়িগুলো? বাড়িগুলোর কী হবে, এত বড় বড় দালান?'

'ভেঙে পড়বে, ভেঙে মাটির সঙ্গে একদিন মিশে যাবে।'

'তারপর?'

'তাবপর সেখানে ঘাস গজাবে, গাছ হবে। ফুল ফুটবে, ফল হবে।'

'খুব চমৎকার হয় তা হলে, না দাদু? কলকাতাব এখানে-সেখানে পাখি ডাকছে, প্রজাপতি উড়ছে।'

'তাই তো হতে হবে, তা না হলে পৃথিবীর নিত্যনতুন চেহারা থাকবে না যে।'

কথা শুনতে শুনতে দাদুব সঙ্গে মতি একটা সুন্দব জায়গায় এসে পৌঁছল। এব আগে সে এদিকে আর একদিনও আসেনি। ভারি সুন্দর গোলমতন একটা প্রকাণ্ড পুকুব। আয়নাব মতো ঝকঝক করছে জল। পুকুবের একদিকে শাপলা আব একদিকে পদ্মবন। থালার মতো সবুজ গোল পদ্মপাতাগুলো জলের উপর চুপচাপ শুয়ে আছে। শাপলা-পাতাগুলো গোল না, অনেকটা পানের মতো দেখতে। টুকটুকে লাল দুটো শাপলা ফুল ফুটেছে। কাল আরো দু-চারটা ফুল ফুটবে, পরশু এক ডজন ফুটতে পাবে, তার পরদিন আবো অনেক বেশি ফুল ফুটবে। সবুজ ডাঁটার আগায় আগায় অসংখ্য কুঁড়ি কলি তৈরী হয়ে আছে। কলিগুলোর গা ছুঁয়ে এক ঝাঁক ফড়িং উড়ছে। 'পদ্মের কলি দেখছি না দাদু।' মতি বলছিল। দাদু হেসে উত্তর করল, 'এখন কি, বর্ষা পড়ুক—বর্ষার জলে কলি কুঁড়ি গজাবে আর শরৎকালে সব ফুটবে।' অবাক হয়ে মতি পদ্মবন দেখল আর চিন্তা করল কবে শরৎকাল আসবে আর রাশি রাশি পদ্ম ফুটবে। 'তুই কেবল জলের ওপরেব ফুলের কথা ভাবছিস, আমার এই পুকুরের জলে কত বড় বড় মাছ আছে জানিস, তোর চেয়েও বড় এক-একটা রুই কাতলা এই পুকুরে আছে।'

ফুলের কথা ভুলে গিয়ে মতি জলের নিচের মাছের কথা চিন্তা করতে লাগল। বড় মাছ মানে অনেক দিনের পুরনো মাছ।

'পুরনো মাছ খেতে ভাল দাদু?'

হুট্ করে নাতির মুখে খাওয়ার কথা শুনে সারদা খুশী হল। 'ভাল না মানে?' সারদার চোখ দুটো ঝলসে উঠল। 'টাটকা হলে সব মাছই খেতে ভাল, নতুন পুরনো বুঝি নে।'

দাদু যে মাছের খুব ভক্ত মতি এখানে এসে জেনে গেছে।

তাও কি তাদের কলকাতার বাসার মতন একটুকরো-দেড়টুকরো মাছ দিয়ে ভাত খাওয়া।

গাদাগাদা মাছ চাই সারদার। দুবেলা!

বাটি ভরে ভরে ঠাকুমা দাদুর পাতের সামনে মাছভাজা, মাছের ঝোল, মাছের চচ্চড়ি সাজিয়ে দেয়।

তাই বুঝি সারদা কাল দুপুরে খেতে বসে নাতিকে বলছিলেন। মাছ খাওয়ার জন্যে তিনটে দীঘি পুকুর কাটিয়েছেন তিনি। 'হুঁ, এমনভাবে মাছ খেতে হয় যেমন কেবল হাতে-মুখে না, গা দিয়েও আঁশটে গন্ধ বেরোয়—তবে না মাছ খাওয়া।'

আর মতির তখন মনে পড়েছে, তার মাকে বাবাকে। হাতে একটু আঁশটে গন্ধ থাকবে বলে খেয়ে উঠে ভাল করে বার বার সাবান দিয়ে হাত ধোয়া। মা সাবান দিয়ে ধুয়ে পরে হাতে পাউডার মাখেন।

'বুঝলি, সর্দি-কাশির ধাত থাকলে তোদের কলকাতার ডাক্তাররা রুগীকে কডলিভার, ইমারসন, এ-ওষুধ সে-ওষুধ খেতে পরামর্শ দেয়। আমি খাই গরম গরম টাট্‌কা মাছের তেলভাজা। সর্দি-কাশি ধারেও ঘেঁষতে পারে না।'

সুতরাং এখন মাছের কথা উঠতে দাদুর চোখ চক্‌চকে হবে, জিভে জল গড়াবে স্বাভাবিক। জলের দিকে তাকিয়ে সারদা হাই তোলেন। 'বড্ড খিদে পেয়েছে রে নাতি, পেট চোঁ চোঁ করছে।'

মতি অবাক হবার ভান করল। হাসল।

'সকালে অনেক আম-ক্ষীর খেয়েছে দাদু, তারপর এত এত জাম-জামরুল। এর মধ্যে তোমার—'

'আমারটা পেট না পিপে, কিছুতে কি আর ভরতে চায়— তোর খিদে পায়নি?' সারদা ঘাড় ফেরাল।

মতি মাথা নাড়ল।

'একটুও না।'

'তোরটাও পেট না, হোমিওপ্যাথির শিশি।'

দাদুর কথা শুনে মতি শব্দ করে হাসল। সারদা এখন আর থুথু ফেলেন না, একটা বড় ঢোক গিললেন।

'সূর্যি এখন মাথার ওপর দেখছিস তো।' বলতে বলতে আকাশের দিকে তিনি চোখ রাখেন। 'আজ আমার উত্তরের পুকুরে জেলেরা জাল ফেলেছে। এতক্ষণে বাড়িতে মাছ পৌঁছে গেছে জানা কথা। হুঁ, চেতল মাছ, বলে দিয়েছি। আমার তো মনে হয়, তোর ঠাকুমা এখন চেতলের পেটিগুলো দিয়ে কালিয়া রাঁধতে বসে গেছে।'

'তা হবে।' মতি খুক্ করে হেসে ফেলল। 'তাই তোমার পেট চোঁ চোঁ করছে।'

'তা হবে মানে?' সারদা রুখে ওঠেন। 'নির্ঘাত কালিয়া পাক করছে বুড়ী, আমি এখান থেকে গন্ধ পাচ্ছি।'

বুড়ো না, একটি শিশু। তেমনি লোভী চঞ্চল। তা হতেই হবে, মতি চিন্তা করল। 'এই বয়সে আয়ুর ফিতে লম্বা করতে হলে এদিকের অনেকগুলি বছর কমিয়ে দিয়ে বাদুড়কে গাছের মগডালে উঠে জাম-জামরুল খেতে হবে, মাছের কালিয়ার নামে বেসামাল হয়ে পড়তে হবে।'

'তুমি তা হলে এখন বাড়ি ফিরছ দাদু?' নাতি শুধোয়।

'আলবত, ভাত খাব মনে পড়লে আমার অন্য কোথাও যেতে, আর কিছু করতে ইচ্ছা করে নাকি?'

'কিন্তু আনারসের বাগানটা দেখা হল না যে।' যেন দুষ্টুমি করে মতি বলল, 'ইচ্ছা ছিল তোমার সঙ্গে আর একটু বেড়াব, তোমার পেয়ারা বাগানটাও দেখব—'

'পেয়ারা এখন পাথরের গুটি হয়ে আছে, আষাঢ় মাস আসুক, দু-চারটা জলের ঝাপটা লাগুক, তবে তো পেয়ারা ডাঁসবে পাকবে, এখন বাদুড়েও পেয়ারা ছোঁয় না।'

কাজেই মতি নিবৃত্ত হয়।

জাম-জামরুল বাঁধা গামছাটা সারদা কোমর থেকে খুলে আলগা করে নেন। 'নে ধর—তোর ঠাকুমার জন্যে ক'টা তো নিয়ে যেতে হবে, আমি নিজের হাতে তুলে না দিলে একটা ফল বুড়ী মুখে দেবে নাকি?'

হাত বাড়িয়ে মতি ফলের পুঁটলিটা নেয়।

'ইচ্ছা হলে তুইও দুটো-একটা খা না, অনেক আছে হ্যাঁ, এই ছায়ায় বসে বসে খা।' সারদা কোমরের বেল্ট খুলতে ব্যস্ত।

তা অবশ্য ইচ্ছা হলে মতি একটা দুটো ফল মুখে দেবে। পুকুরপাড়ের এই ছায়াটাও চমৎকার। মাথার ওপর প্রকাণ্ড হরীতকী গাছ। পুকুরের চার পাড় ঘিরে ঘন বেত-জঙ্গল। কিন্তু তার দাদু এ কী করছে!

'দাদু তুমি কি—' মতির কথা আটকে গেল।

'হুঁ, একটানে সারদা বেল্ট খুলে ফেলেন, 'এখানেই একটা ডুব দিয়ে যাই, বাড়ি গিয়ে আর চানটান হবে কি, গিয়েই খেতে বসে যাব, মাছের কালিয়া আর ভাত।' সারদা হাসলেন।

মতি অবাক হল কি, ভয় পেল কি! বুকের মধ্যে কেমন একটা ধাক্কা অনুভব করল সে। তাড়াতাড়ি অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নেয়।

পরনের প্যান্ট ঘাসের ওপর রেখে দাদু পুকুরে নেমে গেল। না, যদি এটা তাদের মানিকতলার মোড় কি শেয়ালদা হত; অনেক মানুষ, অনেক দোকান, গাড়ি ঘোড়া পুলিস ফেরিওয়ালা থাকত তো মতি মনে করতে পারত লোকটার মাথা খারাপ। একবার টালিগঞ্জ মাসির বাড়ি যেতে মতি ট্রাম থেকে এমন বুড়ো বয়সের একটা পাগলকে দেখেছিল। সম্পূর্ণ উলঙ্গ। দেখে রাস্তার লোক হি-হি করে হাসছে।

কিন্তু এখন? এখানে?

মতি ঘাড় ফেরাল, একটা ঢোক গিলল, ভয়ে ভয়ে ঘাসের ওপর রাখা সারদার ছাড়া হাফ্‌প্যান্টটা দেখল, তারপর যেন একটু সাহস বাড়ল, চোখ তুলে সে পুকুরের জল দেখল। দাদু সাঁতার কাটছে। মতির সঙ্গে চোখাচোখি হতে সারদা হেসে ফেলে জলের নিচে মাথা ডুবিয়ে দেন। আর দেখা যায় না মানুষটাকে। এক দুই তিন ... যেন মনে মনে মতি গুনছে, দাদু কতক্ষণ জলের নিচে থাকতে পারে। দূরে জলের ধাক্কায় পদ্ম পাতাগুলি কাঁপছে, কলি কুঁড়ি নিয়ে শাপলার ডাঁটাগুলি নড়ছে। বুঝল মতি, দাদু ডুবসাঁতার কেটে দূরে চলেছে। আর ঠিক তখন তার মাথার ওপর হাওয়া লেগে হরীতকী গাছের পাতার সরসর শব্দ হল, বেতজঙ্গলের কোন্ দিকে একটা ডাহুক ডাকে, কোথা থেকে একটা সাদা মেঘ উড়ে এসে আকাশের কিনারে ঝুলছে—একটা মাছরাঙা ক্রিক্ শব্দ করে পুকুরের জলে ঝাঁপ দিয়ে তৎক্ষণাৎ একটা রুপোর পাত ঠোঁটে করে আকাশে উড়ে যায়।

মতির খুব ভাল লাগে। হাত বাড়িয়ে ঝুলি থেকে একটা কালো জাম তুলে সে মুখে পুরল। হুঁ, ঠাকুমার জন্যে দাদু জাম নিয়ে যাচ্ছে। বাবার কথা মনে পড়ল তার। মার কথা। কোনোদিন জাম-জামরুল না, আম-আনারস না—অফিস থেকে বাবা যখন বাড়ি ফেরে,

তার হাতে থাকে মার পাউডারের ডিবি, স্নো, ক্রিম। একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলল মতি, তারপর উঠে দাঁড়াল।

মতির এখন খেয়াল হল, সে নিজেও লেংটা। সেই যে দাদুর কথায় প্যান্ট খুলে রোদ বাঁচাতে মাথায় দিয়েছিল, আর সেটা পরা হয়নি। কিন্তু তা হলেও মতির এখন একটুও ইচ্ছা করছিল না, ওটা পরে। কলেজ স্ট্রীট থেকে তার বাবা এটা কিনে দিয়েছিল। তা দিক। তার মনে হল, এটার আর দরকার নেই, বাজে জিনিস। ভীষণ ইচ্ছা করছিল তার এমনি এ অবস্থায় দাদুর মতো সে পুকুরের জলে নেমে যায়। ডুবসাঁতার কেটে শাপলা আর পদ্মবনের কাছে চলে যায়। কিন্তু ইচ্ছা হলে কী হবে, সে সাঁতার জানে না।

তা হলেও সে মন খারাপ করল না। কি একটা পাখি হরীতকীর ডালে এসে উড়ে বসে ভীষণ কিচিরমিচির শুরু করেছে। দাদুর মাথা একবার জলের ওপর ভেসে ওঠে, আবার ডুব দেয়। মতির মনে হয়, ডুব মেরে মেরে দাদু জলের নিচে পুরনো মাছগুলিকে দেখছে। মাছের ভক্ত, কে জানে একটা মাছ না হাত দিয়ে ধরে ফেলে ডাঙায় তুলে আনে।

ভেবে মতি নুয়ে হাত বাড়িয়ে ঠাকুমার জামের পুঁটলি থেকে আর একটা জাম তুলতে যাবে, চমকে উঠল।

হাসির শব্দ। তার পিছনে কে হাসছে। মতি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ঘাড় ফেরায়। একটা মেয়ে। বেতঝোপের কাছে দাঁড়িয়ে। হাতে একছড়া বেতফল। বেতফল খাচ্ছে আর মতির দিকে তাকিয়ে আছে। চকচক করছে চোখ দুটো। ছিপছিপে লম্বা গড়ন। এখানে এসে মতি কালো বাসক গাছ চিনেছে। রোগা লম্বা মেয়েটাকে দেখে তার সরু লিকলিকে বাসক ডাঁটার কথা মনে পড়ল। তেমনি কালো মিশমিশে গায়ের রং। হাসির ঠমকে নড়ছে, বাতাস লেগে বাসক ডাঁটা যেমন নড়ে, কাঁপে।

কিন্তু তার দিকে মেয়েটা এমন করে তাকাচ্ছে দেখে মতির দু-কান লাল হয়ে উঠল, গরম হয়ে উঠল। চালাক ছেলে, শহরের ছেলে। মেয়েটার এভাবে তাকানোর অর্থ বুঝতে মতির এক সেকেণ্ড দেরি হয় না—খপ্ করে সে ঘাসের ওপর থেকে হাফ প্যান্টটা কুড়িয়ে নিয়ে পরে ফেলল। এই এক সেকেণ্ডেই সে বেজায় ঘামছে।

'কি চাই তোর, কি দেখছিস?' প্যান্ট পরে মতি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ধমক লাগায়।

'কিস্সু না, এট্টা বেতফল খাচ্ছি।'

'একটা তো না, একছড়া।' মতি রাগে গসগস করে। কটমট করে মেয়েটাকে দেখে। গায়ের রং যেমন ময়লা তেমনি ময়লা কুটকুটে পরনের শাড়িটা। তার ওপর ছেঁড়া। কিন্তু দাঁতগুলি খুব ফরসা। বকের পাখার মতো সাদা ধবধবে দাঁতগুলি দেখে মতির তবু কিছুটা ভাল লাগল। ভাল লাগল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কি মনে পড়ে তার বুকের ভিতর ঢিব করে উঠল। আড়চোখে সে ঘাসের ওপর ছেড়ে-রাখা বড় হাফপ্যান্টটা দেখল। দাদু এখন কী অবস্থায় জলে সাঁতার কাটছে, সে জানে। ঐ বুঝি দাদুর স্নান সারা হয়েছে, পাড়ের দিকে আসছে না?

'এই কোথায় যাচ্ছিস তুই!' মতি আগের চেয়েও জোরে ধমকে ওঠে, 'কোথায় চললি?'

'এট্টু জল খাব।' ওর সঙ্গে একটা চটের বস্তা। মতি এতক্ষণ এটা লক্ষ করেনি। বেতঝোপের ধার থেকে বস্তাটা টানতে টানতে হরীতকীর গাছের নিচে নিয়ে এল মেয়েটা, তারপর বুঝি জল খেতে পুকুরের দিকে পা বাড়ায়।

'না, এখন জল খেতে হবে না।' মতি রুখে দাঁড়ায়।, 'তোর এই বস্তার মধ্যে কী?'

'শুকনা পাতা।'

'অ, তুই পাতকুড়ুনী।' মতি নুয়ে বস্তার ভিতরটা দেখে। শুকনো পাতার সঙ্গে দুটো আনারস। বেশ তাজা। যেন এইমাত্র বাগান থেকে কেটে আনা হয়েছে। মতি সোজা হয়ে দাঁড়ায়।

'কোথায় পেলি আনারস?'

প্রথমটায় একটু থতমত খায় মেয়েটা, তারপর হাসে, আঙুল দিয়ে পুকুর দেখায়।

'রাজাবাবুর ক্ষেতের, দুটি কেটে আনলুম নুন দিয়ে খেতে।'

তার মানে দাদুর বাগানের; পুকুরের দিকে আঙুল দেখিয়ে দাদুকে রাজাবাবু বলছে ও, মতি বুঝল।

'তোর পিঠের ছাল তুলে ফেলবে রাজাবাবু। তুই কাঁচা আনারস কেটে আনলি।'

'কিছুটা বলবে না মুইকে, মুই কত ফলপাকুড় খাই রাজাবাবুর গাছের, বাগানের, কিচ্ছুটি বলে না।' বকের পাখার মতো সাদা ধবধবে দাঁত বের করে মেয়েটা হাসে, ঘাড় নাড়ে, ভুরু বেঁকায়; তারপর : 'যাই, রাজাবাবুর দীঘির মিঠা জল এখন পেটটি পুরে খাই। বলে কোমরে ক্ষিপ্র মোচড় তুলে ঘাসের ওপর দিয়ে তরতর করে ও পুকুরের ধারে চলে গেল, জলের কাছে।

মতি হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। এইমাত্র যে দুশ্চিন্তাটা তার মনে এসেছিল সেটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। মেয়েটা ঠিক জলের কিনারে চলে গেল তো। দাদু সাঁতার-জল ছেড়ে কোমর-জলে এসে দাঁড়ালো না। ইস্, দাঁত দিয়ে ঠোট কামড়ে ধরল মতি। মুখটা ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেল তার। তবে কি দাদু, এত বড় মেয়েটার সামনে জল থেকে ডাঙায় উঠবে। দাদু! যেন চিৎকার করে ডেকে বুড়োকে সাবধান করে দিতে চাইছিল সে,—গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোয় না, ভয় বিস্ময় ঘৃণা আশঙ্কা বিতৃষ্ণা বিষণ্ণতার ছোট বড় নানা রকম তরঙ্গ তার বুকের মধ্যে খেলা করে গেল। এই একটু সময়ের মধ্যে। উন্মাদ না, শিশু না—মতি মনে মনে বলল, আমার দাদু, এক কালের বড় ইঞ্জিনীয়ার, এলগিন রোডের বাসিন্দা সারদা রায় একটা জন্তু, একটা দানো, একটা ভয়ঙ্কর কুৎসিত জীবে পরিণত হয়েছে।

হাসছে? মেয়েটা দাদুকে দেখে হাসছে? কিন্তু দাদু যে এখনো কোমর জলে দাঁড়িয়ে। নাভিটা পর্যন্ত দেখা যায় না। অণুবীক্ষণের মতো দৃষ্টিটাকে পুকুরের দিকে ধরে রেখে মতি একটা শুকনো ঢোক গিলল। হাওয়ার দোলায় মাথার ওপর হরীতকী গাছের মাথায় নতুন করে সরসর শব্দ জাগল। দূরের বেতঝোপের ভিতর ডাহুকীটা ডাকছে। আকাশের কিনারে সাদা মেঘের দলাটা আরো সাদা হয়ে তুলোর মতো ছিঁড়ে ছিঁড়ে ছড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু এসব কিছুই দেখতে শুনতে ভাল লাগছিল না মতির। তার চোখ তার মন তার সবটুকু চৈতন্য এখন জলের ধারে, জলের ওপর।

ও কি! দাদু হাসছে মেয়েটাকে দেখে? ঘাড় নাড়ছে? পায়ের পাতা জলে ডুবিয়ে মেয়েটা ঘাটের সিঁড়িতে বসে পড়ল যে! সাদা ধূসর লোমে ঢাকা দাদুর ভুঁড়িটা জলের ওপর জাগছে না? নাভিটা দেখা গেল না? মতির শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে, নিশ্বাস ফেলছে না, ঢোক গিলতে পারছে না সে। অবশ্য তখনই মতি একটা হাল্কা নিশ্বাস ফেলল, বড় করে ঢোক গিলতে পারল। দাদু আবার গলাজলে সরে গেছে, সাঁতার-জলে। দাদু সাঁতার কাটছে। মেয়েটা হাত তুলে শাপলা বন দেখাচ্ছে। সবুজ ডাঁটা সমেত বড় শাপলা ফুলটা সারদা ছিঁড়ে আনেন। ফুল নিয়ে ডুব দেন। তারপর ভেসে ওঠেন পুকুরের এধারে। আবার মতির বুকের ভিতর দুবদুব করে। কিন্তু না,—সারদা এবার ঘাটের ওপরের সিঁড়িতে পা রেখে আগের মতো কোমর-জলে কি বুক-জলেও দাঁড়ান না। গলার কাছে জল। জলের সঙ্গে সারদার থুতনি। সেখান থেকেই তিনি ডাঁটা সমেত লাল শাপলা ফুল ডাঙার দিকে ছুড়ে দেন। হাত বাড়িয়ে মেয়েটা তা লুফে নেয়। তারপর ডাঁটা থেকে ছিড়ে ফুলটা খোঁপায় গোঁজে। গলাজলে দাঁড়িয়ে দাদু হাসে, মেয়েটাও হাসে। খোঁপায় ফুল গোঁজা হয়ে যেতে মেয়েটা আঁজলা আঁজলা জল খেল ঘাড় নুইয়ে। চুলের লাল ফুলটা হাওয়ায় কাঁপছিল। জল খাওয়া সেরে ও সোজা হয়ে দাঁড়ায়, তারপর এক ছুটে উঠে আসে তীরের সবুজ ঘাস আর হরীতকী গাছের গুঁড়ির কাছে। শুকনা

পাতার বস্তাটা টেনে কাঁখে তোলে, তারপর কোমরের একটা ক্ষিপ্র মোচড় তুলে ওধারের বেতঝোপের ভিতর ঢুকে পড়ে। যেন বেতজঙ্গলের মধ্য দিয়ে ওর বেরোবাব পথ।

হাঁ করে একটু সময় সেদিকে তাকিয়ে থেকে মতি নিশ্চিন্ত হয়, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। বাঁচা গেল, আপদ গেল। বিড়বিড় করে উঠল সে, আর তৎক্ষণাৎ দাদুকে দেখতে পুকুরের দিকে চোখ ফেরাল। 'দাদু তোমার স্নান হয়ে গেছে?' খুশী গলায় মতি ডাকল। ডাকতে পারল।

'হ্যাঁ বে দাদু, হয়েছে, হয়ে গেল।' সারদা জল ছেড়ে ডাঙায় ওঠেন। ডাহুকটা ভীষণ জোরে ডাকছে। পেঁজা তুলোর মতো সাদা পাতলা মেঘগুলো এখন গায়ে গাযে লেগে একটা বিশাল শ্বেতপদ্মের চেহারা ধরতে আরম্ভ করল না। আশ্চর্য এক মেঘের ফুল। খুশী হয়ে মতি দাদুকে দেখছিল। টপটপ জল ঝরছে কান থেকে, নাকের ডগা থেকে, থুতনি থেকে, হাতের আঙুলগুলি থেকে। দাদুর উলঙ্গ ভেজা শরীরটা দেখে মতির মনে হচ্ছিল একটা পুরনো গাছ। অনেকদিন জলের নিচে থাকার পব এখন উঠে এসেছে। গাছের রাজা তো গাছই হবে, মতি ভাবল। দাদুর গায়ের সাদা ধূসর লোমগুলি যেন গাছের গায়ের শ্যাওলা। শ্যাওলা থেকে টুপটাপ জল ঝরছে। হরীতকী গাছের সরসর শব্দটা মতি কান পেতে শুনল।

সারদা তাঁর হাফপ্যান্ট পরেন, কষে বেল্ট আঁটেন।

ঠাকুমার জামের পুঁটলিটা মতি হাতে তুলে নেয়।

'একটু দেবি করে ফেললাম, কেমন রে নাতি।'

মতি হাসে, কথা বলে না, দাদুব সঙ্গে হাঁটে।

'আমার এই পুকুরের জল চমৎকাব ঠাণ্ডা, একবার নামলে আব উঠতে ইচ্ছা করে না।'

'হুঁ।' মতি প্রথমটায় অস্পষ্ট একটা আওযাজ করে, তারপব কি ভেবে বলল, 'আমার তো মনে হয় ঠাকুমা অনেকক্ষণ কালিয়া রাঁধা শেষ কবে বসে আছে।'

সারদা কথা বলেন না, হাঁটেন। মতি চুপ করে হাঁটে। দাদু কি কিছু ভাবছে? মতি ভাবে। দাদুর আগে আগে, মাথার সামনে, কপালেব সামনে একটা লাল ফড়িং উড়ে উড়ে চলে।

'আচ্ছা দাদু?'

'কি বলছিস?' সারদা থুথু ফেলেন, আডচোখে নাতিকে দেখেন, নাতি তাঁব হাত ধরে হাঁটে।

'তোমাব বাগান থেকে দুটো আনাবস কেটে এনেছে মেয়েটা, শুকনো পাতার বস্তাব মধ্যে লুকিযে রেখেছে।'

'হুঁ', মৃদু গলায় হাসেন সাবদা। 'কাঁচা আনাবস নুন লঙ্কা মেখে খাবে আর কি।' সারদা কপালেব সামনে উড়ন্ত লাল ফড়িংটাকে লক্ষ্য করেন। 'তা আনুক না, কত আর খাবে, হাজারেব ওপর আনাবস হয়েছে এবার আমাব ক্ষেতে।'

মতি একটা ছোট নিশ্বাস ফেলল।

এবাব নাতির কাঁধের ওপব হাত বেখে সাবদা হাঁটেন।

'বাদুড় কাঠবিড়াল শালিক বুলবুলিতে কি কম ফল নষ্ট করে আমাব। করুক। আমি একটুও রাগ করি না। আমার অনেক আছে বলেই তো ওরা খাচ্ছে।'

মতি নিরুত্তর। অনেক হেঁটে তার পা দুটো ধরে গেছে। কিন্তু হঠাৎ একটা জিনিস আবিষ্কার করে যেন সে কেমন চঞ্চল, উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। তার কাঁধের ওপর দাদুর হাত। দাদুর গায়ের গন্ধ চামড়ার গন্ধ তার নাকে লাগছে। মাছের গন্ধ না, আমের গন্ধ না, ক্ষীরের গন্ধ না, জাম-জামরুলের গন্ধ না। জলের গন্ধ? শ্যাওলার গন্ধ? তা-ও না। কোমল মিষ্টি ঠাণ্ডা মৃদু শাপলা ফুলের গন্ধ এটা। মতি বুঝল। মতি বুঝল না আয়ুর ফিতে লম্বা করতে এই গন্ধও শরীরে ধরে রাখাব দরকার আছে কিনা। বুঝতে না পেরে সে ভিতরে ভিতরে ছটফট করতে লাগল। আর হাঁটতে লাগল।

নিম অন্নপূর্ণা

কমলকুমার মজুমদার

যূথী বারান্দায় দাঁড়িয়ে সবুজ পাখিটির ঘোরাফেরা দেখছিল, এ সময় তার হাত-দুটি অদ্ভুতভাবে উঁচু করা ছিল. একারণ, যে-ফ্রকটি তার পরনে ছিল সেটিতে একটিও বোতাম নেই এবং বোতামের জায়গা থেকে সোজা শেষ পর্যন্ত ছিঁড়ে দু-হাট খোলা, ফলে বেচারিকে সর্বক্ষণই সাধারণভাবে চলাফেরাব সময় তার আপনকাব হাত দুটিকে উঁচু করে রাখতেই হয়, এতে করে মনে হয় তার ভাবী আনন্দ হয়েছে—সে খুশি, অন্যথা অর্থাৎ যদি ভুল হয়, যদি সে হাত নামায়, ঝটিতি ফ্রকটি গা বেয়ে ঝরে পড়ে, খুলে পড়ে, তখন সে, যূথী সখেদ একটি 'আরে' বলে. পুনরায় ঠোঁটে ঠোঁট চেপে জোর পটুত্বেব সঙ্গে, ফ্রকটি আপনাব কাঁধে তুলে দিয়ে থাকে।

সম্মুখের টিয়া কেমন ঘাড় বাঁকায়, সম্মুখের টিয়া কেমন পক্ষবিস্তাব কবে —কেমনে পক্ষবিস্তার করত লাল ঠোঁটদ্বারা কী যেন বা পাখাতেই খোঁজে, এসবই তাব নজরে পড়েছিল। কখনও বা টিয়াপাখিটি তেতো বিবক্তির সঙ্গে এক পাহাড় ছোলা থেকে শুধুমাত্র একটি তুলে ছাড়িয়ে ফেলে, খোসাটি মাটিতে পড়ে, যূথী তা লক্ষ করেছিল এবং সে, তখনই একটি ঢোক গিলে আর আর দিকে দেখেছিল। এবার, আবাব তার সামনে, সবুজ পাখি সাদা দেওযাল. অতি মনোহর এক দৃশ্য রচিত হযেছে—তবুও যূথীর চক্ষুদ্বয় দুর্বৃত্ত এবং সে মবিয়া হয়েই. কোনওক্রমে, পাখির বাটিতে আঘাত করে. ফলে দাঁড়টিতে দোলা লাগল, আর সেই সঙ্গেই দুচারটি ছোলাও ছিটকে পড়েছিল, সত্বর তৎপর ছোলাগুলি তুলতে গিযে ফ্রকটি তার খুলে যায়, ছোলাগুলি তুলে মুখে পুরেই তবে সে ফ্রকটি ঠিক করে. এখন সে দাঁড়ের কাছে এল, এক হাত দ্বারা অন্য হাতের কাঁধের কাছের জামার অংশটি ধরে, ডান হাতখানি জামায় মুছে মুছে আপনাকে প্রস্তুত কবছিল, বোধহয় হাতে ঘাম জমেছিল, একথা প্রকাশ থাকে যে জামার একদা রঙিন অদ্য ম্লান ফুলগুলি মুছড়ে মুষড়ে গিয়েছিল। আব পাখিটি ভারী অস্থির, পাখিটি ভারী তেবছা, নিজের দেহেতেই যেন বড় বেশি করে জোট পাকিয়ে গিয়েছে। অবশ্য সে পাখিটি একবারও আওয়াজ করেনি।

এসময়, যূথী একটু ভাবুক হয়েছিল। অন্যমনস্ক হয়েছিল, ভেবেছিল। ভেবেছিল— সে যদি পাখি হত— কেননা সে শুনেছে কোনও কোনও ময়রা দোকানের ঝাঁপ খুলেই রাস্তায় নামে, হাতে এক চ্যাংয়ারি খাবাব, তাতে জিলিপি আছেই কচুরি নিমকি আর আর কী সব আছে, ময়রা 'চিলো চিলো' বলে চিৎকার করে, এবং তাব ঘটিয়াল ভুঁড়িখানা নসরপসর, আকাশ চিলে চিলময়—আকাশটা যেমত বা গাড়ির আড্ডা—ছ্যাকরা গাড়ির ঘোড়ার মতো চিলগুলো চিঁহি চিঁহি করে ওঠে, তদনন্তর খাবারগুলি সে, ময়রা, ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেয় আর বলতে থাকে, 'আমরা বাসি খাবার বেচি না, কাউকে দিইও না', এখানে অনেক ভিখাবির ছেলেরা দাঁড়িযে, কেউ মার কোলে. সকালের সৌখিন রোদ এদের পাশ কাটিয়ে রাস্তায় ইতস্তত, এরা যেমন বা আচারের শিশি থেকে বার হয়ে এসেছে, তারা ময়রাব মহানুভবতা

দেখে, হাতখানি প্রসারিত করে চিলের খাওয়া দেখে।—এই সূত্রে যূথীর, 'ভিখারি' কথাটা মনে পড়তেই, মুখখানি সিঁটিয়ে উঠেছিল, কেননা সে শুনেছে অনেক পাপ, সাতজন্ম পাপ করলেই ভিখারি হয়, ছেলেমানুষ যূথী একথা স্মরণেই ছোট একটা নমস্কারও করেছিল, অর্থ এই যে, তার অতি বড় শত্রুরও যেন এমন দশা না হয়। নমস্কার যেমন সে করেছিল, তেমন সে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল, চিলকে দেখলে তার বড় ভয়, সে চিল হতে চায না, কেননা চিল যদি হয়, তাহলে হয়তো চিলই তার ভয়ঙ্কব ঠোঁট দিয়ে তাকে ছিঁড়ে ফেলবে। এইটুকু ভাববাব পব, সে আর বেশি সময় নেয়নি, একাবণে যে বেশি দেরি করলে, এ বাড়ির লোক— নিশ্চয়ই এসে পডবে।

ইদানীং পাখিটি কিযৎপরিমাণে শান্ত, তার ঠিক কিছু নীচে যূথীব জ্বলজ্বলে মুখখানি, ছেঁড়া লাল পাড দিয়ে বেড়া-বেণী করা, চোখদুটি পিঙ্গল, এলেবেলে হিঙ্গুল, মাবাত্মক, মুখের ছোলাওলি একান্তে ঠেলে দিয়ে, মাথাটা তার কী যেন লক্ষ কববাব জন্য আনচান করছিল, পবক্ষণেই সে হাতটা তিন তিনবার কপালে আর বুকে ঠুকেই ধাঁ কবে দাঁড়টায় যেই না ঠেলা দিতে গেল, পাখিটা তৎক্ষণাৎ তাব লাল ঠোঁট দিয়ে যূথীর আঙুলে কামড়ে ধবেছে।

ছেলেমানুষ যূথীর চিৎকারে এই বাডিখানি যেন বা 'শ্রীমধুসূদন' বলে উঠেছিল, পাখিটা এখনও যূথীব আঙুল ছাড়েনি, দাঁড নড়ছে, এবং কযেকটি ছোলা যূথীব মাথা এবং গা বেযে ঝরে পড়ে। কোনওএ্রমে, ভাগ্যক্রমে সে আপনাব হাতখানি ছাড়িযে আনতে পেবেছিল।

যূথী বোকাব মতোই আঙুলটিব দিকে চেয়েছিল, কেননা, আঙুল বেযে খবধাব রক্ত পড়ে, আব যে কোনও কিছু কবার মতো দক্ষতা তার নেই। এবাডিব বৌটি বয়েসে নবীনা সদ্যস্নাত মুখমণ্ডল, ব্লাউজটি পবা, সবেমাত্র সায়াটি পরে পরনের ভিজে গামছাখানি একহাতে খানিক টেনে যখন বাব করছে তৎক্ষণাৎ এই ভয়াবহ চিৎকাব তাকে বিদ্রাবিত করে, এবং পবক্ষণেই এই আতঙ্ককারী দৃশ্যে সে বক্ষোহীনা স্পন্দন-বহিত, ফলে সাযা থেকে উঠা লাল গামছাখানি তাব হাতে তেমনি সম্বদ্ধ ছিল, সুন্দব খঞ্জন নযনযুগল —স্ফীত, স্বপ্নহীন, ভীত, শক্ত, উজ্জ্বল, বগর্ভোয়া, ভ্রূদ্বযে বিদ্যুৎ ইঙ্গিত, দেহ বযসোচিত ধর্মে উন্মঃ, এখন, এতদ্দর্শনে আগুনগবম সুতরাং আপনার আলুলাযিত কেশবাশি—যা সিক্ত—তাব ঘাড়ে সপ্‌সপে হিম সঞ্চাব করে, তাই তাব রোমহর্ষ হয়। এবং এ তরুণ মুখখানি কক্ষেব আঁধাব থেকে সকালেব তীব্র আলোয ক্ষণেকেব জন্য এসেই পুনশ্চ কক্ষে ফিবে যায়।

যূথীব পালাবাব কোনও পথ ছিল না। ভয়ে বিশেষত যন্ত্রণায এবং কিযৎ-পবিমাণে লজ্জায় তাব আনন পিঙ্গল, চক্ষুদ্বয জলে কালো, মুখখানি পার্শ্ববর্তী শূন্যতায আটকে ক্রমে আড়ষ্ট এমত মনে হয়, আর যে, সে বিবিধ সুকৌশল ভঙ্গি সহকাবে তা খুলে আনবাব প্রাণান্ত চেষ্টা কবে এবং ঠিক এই সময় ডান হাতেব আঙুলটি চেপে ধববাব উচিতবুদ্ধি তার হযেছিল, এতে কবে গায়ের জামাটি, খুব আশ্চর্য যে, মাত্র এক পাশেই খুলে পড়েছিল। এবং যন্ত্রণায় আর একবার সে চিৎকাব করেছিল! এই হৃদয়বিদাবক শব্দে পবিচ্ছন্ন, শুভ্র, লক্ষ্মীশ্রীযুক্ত বাডিখানি বিড়ালেব চোখেব মতো বড় হযে গিয়েছিল এবং তন্নিমিত্ত এ গৃহস্থিত চিনিপাতা জীবন মুহূর্তকালের জন্য পাশার অক্ষেব মতো নিষ্পেষিত শব্দ করে উঠে।

· দ্বিতীয় চিৎকারে এবাড়ির বিধবা গিন্নি খেতু মিত্তিরের মা ছুটে আসনাব চেষ্টা করেছিলেন, কেননা তাঁর ভিজে কাপড়—ভিজে কাপড়েই তাঁকে অনেক শুদ্ধ কাজ করতে হয়—মুখে তাঁর, এ সময়োচিত অষ্টোত্তর শত নাম—'বিদুর রাখিল নাম কাঙাল ঈশ্বব' পদে এসে থেমেই, 'কী হল কী হল' বাক্য, ভিজে কাপড়ে এখনও কিছু ব্যস্ততাব শব্দ ছিল, এ কারণে যে সম্মুখবর্তী এ-দৃশ্যে কিরূপ ভঙ্গি যে করা উচিত তা ভাববার মতো তাঁর অবকাশ ছিল না, হয় তিনি বেশি করে আলো অথবা বেশি করে ঝাপসা কিছু দেখেছিলেন তাঁর দেহটি কেবলমাত্র

কর্তব্যবশে সম্মুখে এব, শুচিবায়ুতাব জন্য পিছনে দুলে গিয়েছিল আব মুখে বাবম্বাব একই কথা ধ্বনিত হয়েছিল, ওমা কী সব্বনাশ গো কী সব্বনাশ।' তাঁব স্ববেব মধ্যে যথাযথ অসহায়তা ছিল। ইত-মধ্যে নবীনা বৌটি কোনওক্রমে এখানে এসেছিল, তখনও বাঁ হাতে সাযাটি আট কবে ধবা, এবাবে ঝটিতি গিট বেঁধেই যখন সে যূথীকে সাহায্য কবতে যাবে তৎক্ষণাৎ থমকে গেল।

কেননা খেতুব মা আপনাব গায গতব খেলিযে বলেছিলেন, বলি হ্যাঁগা তুমি কী পাগল নাকি। বললে বড অন্যায হয, সাধে কী তোমাব ভাগাডে কোল বলি চান কবেছ না, ওকে ছুলে আবাব কাপড জুটবে ?' ইত্যাকাব বাক্যে বুঝা গেল খেতু মিস্ত্রিবেব মা খানিক নিশ্চিন্ত খানিক সমঝে উঠতে পেবেছিলেন এব, আপন পুত্রবধূকে নিবাবণ কবে এবাব যূথীকে ধমক দিযে বললেন, নে নে চোষ না হাবামজাদি আঙুলটা মবণ। হ্যাবা কাটল কী কবে?

যূথী চুপ হয়তো তাব মনে পডেছিল যে পাখিটা কথা বলতে পাবে যলে আবও ভীত হয়ে সে দাঁডিয়েছিল নবীনা বৌটি বক্তদর্শনে মুখখানিক ঠেলে বাধা পর্টালেব মতো কবেছিল অজস্র চুলকে ঘাড থেকে একটু হটাবাব জন্য মাথা নাডা দিয়ে বললে পাখি।

পাখি! সাত সকালে কী অলক্ষ্মণে কাণ্ডবে বাবা বলে খেতুব মা সাক্ষী মানা কণ্ঠে বললেন, পাখি অমন পাখিব তো অমন স্বভাব নয এব, পাছে দোষ পডে— একথা নিশ্চয়ই স্মবণ কবে পুনবায বলেছিলেন তুই সাত সকালে মবতে আমাদেব বাডি ঢুকেছিলি কেন? ... চোষ না আঙুলটা পোডাবমুখী। আবাব বানাপা। ... না ... চুন কবে একটু চুন এনে দাও

বৌটি ... চুন আনতে গেল।— যূথী এখনও বুদ্ধিভ্রংশ খেতুব মাব কথায় খানিক ... কবে বক্তাক্ত আঙুলটি মুখে পুবেবে কিনা ভাবতে যাওয়াব সাঙ্গে সাঙ্গে হঠাৎ ... এবাব আপনাব মুখে সযত্নে বক্ষিত ছানাগুলি যা সে মুখে পুবেই চিবোযান একাবণে যে চিবোলেই তো শেষ তাই অর্থাৎ কৃপণেব মতোই মুখেব কোণে বেখেছিল এব, তা কবে আঙুল মুখে পুবতে না মুখটা আঙুলেব কাছেই নিয়ে যাবে ... দিবস অদ্ভুত হাসকব অবস্থা তাব হয়েছিল—ঠিক এই মুহূর্তে তাব ... ছানা কটি পা ... খেতু ... জল সাদা ... পাযেব নিকটে ... বেচাবি যূথা ... বেচাবি যূথাব ... থেকে অল্প লাল তাব নিজেব হাতেই পাচ্ছি ...

অন্যপক্ষে ছানা পডাতেই খেতুব মা ... এক পা ... সেই ... যূথীকে দেখে বাগে ... তা শুদ্ধ হয়েছিল ... শুরু কবলেন ... পাবলেন না ... অবস্থা হযে গেল ... কী ... গো। ... এসময আপনাব ... ছিল এব পবই দাতে দাঁত ... হয়েছে খুব হয়েছে এবাব নিজেব বক্ত ... খাও

যে যূথী এতক্ষণে কাঁদেনি হঠাৎ ধবা পডে যাওয়াব দাবুণ ... কেঁদে উঠল তথাপি চোখ দুটি ভাবী সজাগ ছিল, খেতুব মা আপনাব ... কাপডে ধবণ কবতে বললেন একা ... দাত কপাটি ভেঙে দেব আবাব ... হচ্ছে ছাঁচ ... আকুটে ভিবিবিব মবণ। পাখিটা তোব টুঁটি ছিঁডলে আমি হবিনুট দিতুম হাবামজাদি ছোলাচুবি। ফেব যদি এ বাডিব ত্রিসীমানায আসবি তো ঝেঁটিয়ে ... খেচে ... তাই বলি আমাব পাখি কেষ্ট নাম ভিন্ন যে জানে না সে কেন কামডাবে ... বাপ মা কি কিছু খেতে দেয না চোষ না বলটা।

এমন সময় বৌটি একটি গোটা পানে খানিক চুন নিয়ে এসে দাঁড়াতেই, খেতুর মা সত্যিই ক্ষিপ্ত তিরিক্ষি হয়ে উঠে ছোট একটা লাফ দিয়ে উঠেছিলেন, বললেন, 'খুব যে দরদ দেখাতে এগিয়ে যাচ্ছিলে' বলেই, পরেই হঠাৎ চুনসমেত পানটির দিকে নজর পড়তেই গায়ে যেন বিছুটি লাগল, খেঁকিয়ে উঠে বলেছিলেন, 'তোমার কী কোনও আক্কেল নেই গা, বলি এই বাজারে একটা গোটা পান নষ্ট করলে, বলি ... আকালের কথা কী তোমার অজানা ... না ... '

বৌটি তটস্থ, থ, জড়সড়, চকিতেই মেঝেতে পানটি রেখে দিলে, না পানটি হাত থেকে খসে মেজেতে পড়েছিল, তা বুঝা গেল না। রক্তের অজস্র ফোঁটার মধ্যে পানটি লক্ষ্য করেই খেতুর মা যূথীকে প্রচণ্ড কণ্ঠে বললেন, 'তোল বলছি, হাঁ করে রইলি যে হারামজাদি!'

এবম্প্রকার বাক্যে বেচাবি যূথীর প্রকৃতপক্ষে কী যে করা শোভনীয় তা সে নিজেই কিনারা করতে পারছিল না, সে একবার মেজের দিকে অন্যবাব খেতুর মার দিকে আড়ে আড়ে চেয়েছিল। খেতুব মা এইটুকু বিলম্বেই অস্থির। মুহূর্তের মধ্যেই সকালের আলোকে বাঁকা চোখে দেখেন এবং নিমেষেই পান তাঁর নিজের হাতে তুলে, একবার মাত্র চুনসমেত পানটির দিকে তাকিযে নিশ্চযই একথা ভেবেছিলেন যে তাকে এ কাজেব পর আর একবার স্নান করতে হবে, ভেবে পরক্ষণেই যূথীব বেড়া বেণীটা হেঁচকাটানে নামিয়ে বেশ জবর মুঠো কবে ধরার পবে পানটা তার কাছে এগিয়ে দিতে— সে, যূথী, অতি সহজভাবে সেটা নিয়ে নিজের আঙুলেব উপব চেপে ধরেছিল, এবং যুগপৎ আপনার দাঁত দ্বারা কাঁধের জামাটা কিঞ্চিৎ টান দিয়েছিল।

খেতুর মার ক্রোধ-উন্মত্ত বেণী আকর্ষণে যূথী বড নিশ্চিত হয়, ঝাঁটা লাথি— এ সবে তার যেমন বা সকল কিছু বোধগম্য পরিষ্কার লাগে, সুতরাং এই সে চেয়েছিল, যেহেতু সে কোন মতেই দুই চোখে দুইদিকে দুভাবে আর দেখতে পাচ্ছিল না, এ ছাড়া এত আলো থেকেও সব কিছুতেই যেমন বা সন্ধ্যা, তাই যূথী ইত্যাকার নির্মম ব্যবহারেও অধিক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছিল, এখন খেতুব মার সঙ্গে পা মিলিয়ে অক্লেশে চলতে পারবে। খেতুর মা আর কালবিলম্ব না করে তাব চুলের মুঠি ধরে এক টান মেবেছিলেন!

খেতুব মা তাকে যখন নিযে যাচ্ছিলেন, তখন পাখিটাব পাশ দিযেই তাঁদেব যেতে হয়, ফলে, এ সময়ে যূথী খেতুব মাব কাছে ঘেঁষে এসেছিল, এবং চোরা-গোপ্তা চাহনিতে পাখিটাব প্রতি সে দেখে, পিতলেব চক্‌চকে দাঁড়েব উপরে নিশিত তীব্র সাংঘাতিক কক্ষ পা দুটি, আর তার ঠিক উপবেই পাখিব সুডৌল উদর দেখা যায়, শেষ রাতে চন্দ্রকিরণে প্রকাশমান শরৎকালীন মেঘ যেমন, হযতো সবুজ কিম্বা পাণ্ডুব, কী নরম কী তুলতুলে! সুন্দর সুডৌল শুকউদব সুকুমাব তথা কোমলতা, একপ যে প্রবচন সেইটুকু প্রত্যক্ষের দেখার মানসে মানুষ কী টিযাপাখি পোষে।

যূথী আপনাকে নির্বিকারভাবে, খেতুব মাব বজ্রমুষ্টিব মধ্যে ছেড়ে দিয়েছিল। তাকে নিযে, বাস্তায় নেমে, এই পরিপ্রেক্ষিতহীন লাল গলিতে নেমেই, দুবার চিক্‌চিক্ করে থুতু ফেলে – মাথাব কাপড়ে হাত দেবাব কথা তাঁব মনেই হয়নি, একারণে যে গলি সুন্‌সান্— যূথীদের বাড়ির দরজার সুমুখে এসে দাঁড়ালেন। এবং দবজায় লাথি মাবতেই দরজাটা আপনা থেকে খুলে গেল, এটা তিনি, খেতুর মা, আশা করেননি, ফলে দোমনা হযে ছেলেমানুষের মতো অহেতুক সর্দি টেনেছিলেন।

দরজা খোলাব পর, ভিতরের ঝাপসা অন্ধকার কাটার পর দেখা গেল প্রীতিলতা।

প্রীতিলতা দেওয়ালে একটি পা ঠেস দিযে দণ্ডাযমান, হাতের আলগা মুঠোয় একগাদা, একথোকা চুল, যা অবহেলায় অনিয়মে মেহেদিপিঙ্গল, তবু সেখানে অন্ধকার; সে জননী,

তথাপি এ খেলা তার ভাল লাগে, অজস্র চুলে চুলে পাচনতুল্য গন্ধ, এ-হেন গন্ধে আপনাকে বড় পুরাতন বলে বোধ হয়, গায়ে ন্যাপথলির আর তোরঙ্গের মরিচার গন্ধে— মিলেমিশে— দিনগুলিকে যেমন বা সুদীর্ঘ করে, আর যে, তাকে প্রীতিলতাকে, অযথাই, মন্দভাগ্যক্রমে, নিশ্চিহ্ন করেছে, বস্তুত সে নিজেকে খুঁজে না পেলেও আপনাকে বুঝে না পেলেও অদ্য সে নিশ্বাস নেয়, আজও সে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করবে। ভেবেছে হায় আমার থেকে আমার ছায়া সুখী। সে চোখ ছোট করে দিনমান দেখে, সে চোখ সুতীক্ষ্ণ করতে অন্ধকার দেখে!

খেতু মিস্তিরের মা প্রীতিলতাকে দেখে থমকেছিলেন, তারপর নিজের বেণীধৃতমুষ্টি দেখেই যেন বা নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধি ফিরে পেলেন, এবং অন্যহাতে ভিজে কাপড়ের খানিক দিয়ে ওষ্ঠদ্বয় আবৃত ছিল, এখন কথা বলার সময় মুখের কাপড় কিয়ৎ পরিমাণে সরানো হয়েছিল, তিনি বলেছিলেন, 'এই নাও বামুনের মেয়ে ...' এই 'নাও' বাক্যের মধ্যে সত্যনিষ্ঠার গরব ছিল।

প্রীতিলতা, অল্প আয়াসেই মুখখানি বাঁকিয়ে তাদের দেখেছিল—ভাতে ব্যাঙ লাফিয়ে পড়লে চাষা যেমত লাফ দিয়ে উঠে— তেমন তেমন লাফ, তেমনই যেমন বা তার ভিতরে দিয়ে উঠল, কিন্তু দেহে কোনও সাড় দেখা গেল না, কেবলমাত্র হস্তধৃত চুলসমূহ, এ দৃশ্য দেখেই, সে চকিতে মুঠো ছেড়ে দিয়েছিল।

অন্যপক্ষে, খেতুর মা যূথীর বেণীও ছেড়ে দিয়েছিলেন, দিয়েই বললেন, 'তোমার মেয়ে কী বলব বাবা, বললে পেত্যয় যাবে না, সাত সকালে লোকে শুনলে বলবে খেতু মিস্তিরের মা কি লোক গা .. ভদ্দরনোকের মেয়ে ঘেন্না পিত্তি নেই একেবারে ভিকিরির অদম গা পাখির ছোলা চুরি করতে গিয়ে কী কাণ্ড বাধালে ... মুখ থেকে না পড়লে কী আমিই টের পেতুম ..' এইটুকু বলেই খেতুর মা চারিদিকে চেয়েছিলেন, এ কারণে যে তাঁর মনে হয়েছিল, এখানে বারান্দায় কেউ নেই, আর যে— তিনি একাই বকে মরছেন, খেতুর মা আশা করেছিলেন এইটুকু বলতেই যূথীর মা যূথীকে আর আস্ত রাখবে না, কিন্তু কই? ফলে তাঁর বড় অসম্ভব রাগ হয়, কণ্ঠস্বর কর্কশ এবং দৃঢ় হল, বলেছিলেন, 'বলি তোমার কী মনে হয় আমি মিথ্যে বলেচি ... সংশাসনে না রাখলে মেয়ে কালে .. বাতাসি ছেনতাল হবে, ঝরঝরে হবে পরকালে ...'

প্রীতিলতা, আশ্চর্য, মনোযোগসহকারে সকল কথাই শুনছিল, যেহেতু খেতুর মার গলায় কথার টানের মধ্যে, লক্ষ্মীর পাঁচালি পড়ার ধাঁচ ছিল, মিল ছিল, বিশেষত যেখানে আছে, 'বন অধিষ্ঠাত্রী তুমি বনে বনে।' যেখানে, 'গৃহলক্ষ্মীরূপে তুমি সকলের ঘরে। দীনজনে রাজ্য পায় তব কৃপা বলে' সে, প্রীতিলতা, যেমন বা করযোড়ে যূথী-সংবাদ শুনছিল, কিন্তু তা হলেও এ কথা সত্য যে, 'ভিকিরি' কথা তাকে রক্তের প্রাচুর্য্য দিয়েছিল—চুরির কথাটা এ তুলনায় মাটির—আচম্বিতে প্রীতিলতার স্বল্পতোয়াসদৃশ দেহখানি রুষ্ট সাপের মতোই আলোড়িত হয়ে উঠে, আপনকার বরফ-দেওয়া চোখের দৃষ্টিকে, অমোঘভাবে ছোরা যেমন করে হাতে ধরে, তেমনি—সেইভাবে উদ্যত করে ধরেছিল। খেতুর মা কথা শেষ না করেই যেই তুড়ি দেওয়ার শব্দের মতো তাচ্ছিল্যভরে 'হ্যাঁ' আওয়াজ করেছেন, তদ্দণ্ডেই প্রীতিলতা 'ইঃ' ধ্বনি করে উঠে, আর ঠিক এ হেন সময় এক ঝাঁক জঙ্গি-বিমান উড়ে গিয়েছিল। এখানকার সকলেই এ বারান্দা প্রায়-ঢাকা-পাঁচিলের ওপরে, উপরে যে আকাশ, সেদিকে চাইল। তথাপি, প্রীতিলতা নিজেকে এখন, ইতঃমধ্যেই শাণ দেবার অবকাশ পেয়েছিল, সে মুখখানিতে ঈদৃশ ভঙ্গি করে যে যেমন মনে হয় সে কিছু খাচ্ছে অথবা তার জিহ্বা আঠায় জড়িয়ে গিয়েছে, এরপরই সে বিড়ালের মতো ফ্যাস্ করে উঠেছিল, বললে, 'নিজে যে বগলে সাবান দাও বিধবা হয়ে, তা-বেলা কিছুটি হয় না ... না?' একবার নিজস্ব ভাষাটা

অনুধাবন করেই পুনর্বার বললে, 'সে-বেলা কিছু হয় না' .... এই সঙ্গে অঢেল শোনা ইংরাজি বলার জন্য—অবশ্য এ সকল শব্দ বাক্য নয়, গ্যাট ম্যাট হুট ফাট জাতীয় ইংরাজিআত্মক—তার জিহ্বা যারপরনাই কড়কে উঠল।

প্রীতিলতার ঘোর বাক্যস্রোতে খেতুর মার মুখাবৃত-কাপড়ের অংশ ঝরে পড়ল, কোন দিকে যে অজস্র আলো তথা কোন দিকে যে দরজা তা বেচারি খেতুর মা, বুড়োমানুষ, ঠিক ঠিক ঠাওর করতে পারলেন না, অবশ্য অবশেষে তিনি অদৃশ্য হন। প্রীতিলতার কাছে খেতুর মার এই চিত্তভ্রমবশত হাঁকপাক বড় মজার মনে হয়েছিল এবং বেচাবি এই প্রসঙ্গে হাসতে গিয়ে আপনকার বিবর্ণ, আর্ত বেদনাময় মুখখানিকে যন্ত্রণা দিয়েছিল! তবু সে কাতব নয়, সে হেসেছিল, তাব শতচ্ছিন্ন কাপড়ের আঁচল তুলতে গিয়ে মাকড়সার পায়ের দক্ষতায় তার আঙুলগুলি পুনরায় চুলগুলিকে সংগ্রহ করে, এবং সে, প্রীতিলতা আপনকার অজস্র চুলের অঞ্জলিবদ্ধ অন্ধকারে মুখমণ্ডল ন্যস্ত করত বব-দেখা হাসি হাসল।

যূথী নিজের ব্যথাটাকে বড় করবার চেষ্টা করে তার মাকে হাতখানি দেখাচ্ছিল, তবু চুলের আঁধার এবং তার উপর ঘোরদর্শন রাত্রে বিদ্যুৎরেখাতুল্য হাসি, তাকে, যূথীকে, অনেকের কথা স্মরণ করিয়েছিল, যথা বাবা কোথায়, যথা লতি কই? নিশ্চয়ই সে তাদেব আঁকড়ে ধবতে চেয়েছিল, কেননা সে এক আপৎকালেব সুমুখে এসে দাঁড়িয়েছিল,। সহসা, পলকেই তার মাথায় যেমত বা বাত্যাপ্রবাহ খেলে গেল, আর যে, সে কেবলমাত্র এক পা পিছনে সরে, ভীতত্রস্তস্বরে আঃ আঃ করে বলেছিল, 'তোমাব পায়ে পড়ি আব করব না আ .. কবব না' এবং তাব স্বল্পবুদ্ধিতে রক্তাক্ত হাতটি ঈষৎ উঁচু করে দেখিয়ে মাব, প্রীতিলতাব, দৃষ্টি আকর্ষণ অথবা করুণা ভিক্ষা করতে চেয়েছিল এ কারণ প্রীতিলতা—সূক্ষ্ম, বিবশ, যদিও বিশীর্ণা যদিচ বহুদিবস হাভাতে তথাপি ইদানীং সরোষিত তীব্র ভয়ঙ্কর ফণা তুলে আসছিল—অজস্র ছেঁড়া-মধ্য দিয়ে প্রকাশিত তার অঙ্গাংশ সকল লাল—মলিন ছিন্ন কাপড়ে ধরা-পড়া একটি ঝড়!

যূথীর গলায় আর কোনও স্বর ছিল না, মুখমণ্ডল ভয়ে কালসিটে, তবু এটুকু ব্যবধান মধ্যে সে একটিমাত্র চোরা ঢোক গিলেছিল, যেহেতু প্রীতিলতা আর বেশি এগিয়ে আসতে পারেনি, যেহেতু গায়ে গতবে, তাব নিজেবই, কোনও ক্ষমতা ছিল না, যেহেতু সে, প্রীতিলতা, যে যূথীব মুখে না-পাওয়ার দুর্দৈব তৎসহ না-মাজা বাসনের মতো ময়লা—'এই 'না মজা' কথাটা তার আপনার ইজ্জতে লেগেছিল, যেহেতু 'না-মাজা' কথাটায় এই সংসার, এখনকাব দিনেব পবিচ্ছন্ন দৈন্য-উপহত চেহারাটা ছিল, যেরূপে বীজমধ্যে বৃক্ষের ছায়া পর্যন্ত নিহিত থাকে; এবং দীনা প্রীতিলতাব মধ্যে দিয়ে একটি দীর্ঘশ্বাস বয়ে গেল, এখন সে থমকে দাঁড়াল।

প্রীতিলতা অন্য আর একদিক থেকে নিশ্বাস নেবার জন্য ছোট বারান্দার আর আব দিকে চাইল, এখানে সেখানে সাতবাসৃটে অন্ধকার—বালতি আব টোল খাওযা ডেকচির জল ছাড়া, আব কোথাও যে সকাল হয়েছে এ সত্যের উল্লেখ নেই, প্রায়-ঢাকা বারান্দার উপব দিয়ে এক লুপ্ত আকাশ দেখা যায়, যাতে করে মনে হয়—তারা যেখানে আছে, সেটা পৃথিবী। অবশ্য মেঘমন্দ্র প্লেনের শব্দ, ক্বচিৎ মোটরের হর্ন, অথবা কখনও সাইরেন আছেই, এতদ্ব্যতীত রাত্রে হরিধ্বনি থেকেও বীভৎস হয়ে উঠে মানুষের কণ্ঠস্বরের নামে উত্তাল উদ্দাম পোড়ার আওয়াজ, মনে হয় এক আপনাকেই কামড়ায় — ধনীরা সুখী কেননা এ-হেন মর্মন্তুদ আওয়াজে তারা পাশবিক অত্যাচারীর সদর্প-মাভৈ ধ্বনি শুনে আপনার দ্বার অর্গলবদ্ধ করে; সুতরাং তারা নিশ্চিন্তে ঘুমায়। অন্যপক্ষে, সামান্যা রমণী প্রীতিলতা তাদৃশ চর্ম-লোল-কারী টঙ্কার শ্রবণে অল্পকাল নিমিত্ত নিশ্বাস স্থগিত রাখে, আপনার গৃহস্থালির কতিপয় ফাঁকা

বাসনপত্রে হাঁড়িতে, এ আওয়াজ নির্দয়ভাবে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠে, তখন সে আত্মরক্ষাহেতু আপনার বক্ষদ্বয়ে হস্তস্থাপন করে, তবু বেচারির শীর্ণ একটি হাত কপালে করাঘাত করতে ছুটে যেতে চায়, এবং সে কোনওরূপে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে 'নারায়ণ-নারায়ণ' বলে কোনওক্রমে হাতের তালু দেয়ালের গায়ে এঁটে ধরে, হাঁকায়, মনে হয় সে যেন বা পালাচ্ছে, রুগ্ন শুষ্ক শক্ত হিম ওষ্ঠপুট জিহ্বা দ্বারা অল্প অল্প বুলাবার চেষ্টা করে এবং পাগল চোখে এদিক সেদিক তাকায়, মনে হয় এ রৌদ্রকর্মা, সে আওয়াজ তাকে যেন টানছে, ডাকছে। সে 'না, না' বলে উঠেছে তবু ঘাম হয় এবং ঝটিতে 'লতি-যূথী' বলে ডাক দিয়ে আপন কন্যাদ্বয়ের সাড়া নেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে মনস্থ করে ঝুল ঝেড়ে ফেলবে, পয়সা পেলেই পবনেব কাপড় ধোপ-দুরস্ত করতে হবে তাহলে এ-দুঃসহ আওয়াজ তাকে—তাদের তার চিনতে পারবে না! কিন্তু অনেক শূন্যতা, অনেক পাগলা সেলাই তাকে, প্রীতিলতাকে অতিমাত্রায় ছোট করে।

এখন, প্রীতিলতা আপন গর্ভজাতকন্যা যূথীব দুঃখময় সুখের দিকে চাইল, ফলে হঠাৎ-নিভে যাওয়া মনটা দুর্দ্ধর্ষ লাল হয়ে উঠল, রক্তস্রোত স্ফীত তাতাথৈ, যদিও সে নিজে ভেবে পায়নি, এমনধারা এক বিচ্ছু খেউড়ে নিষ্ঠাবতী বিধবা খেতুর মাকে বণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য করতে পারে, যার ফলে তার পেটটা যেন বা ভরে গিয়েছিল, পবিধেয় বস্ত্রসকল নিরবচ্ছিন্ন, তা ছাড়া শুভ্র, মুহূর্তের জন্য সে রৌদ্রকর্মা আওয়াজেব ফাঁদ থেকে অনায়াসে অব্যাহতি পেয়েছিল—প্রীতিলতার দেহটা যেমত বা দেহ থেকে ছুটে বাব হয়ে চলে গেছে, নিমেষের জন্য লজ্জাও তাব হয়েছিল, যেহেতু যূথী তার কথাটা, খেতুর মার প্রতি, নিশ্চয়ই শুনেছিল। তাদেব মতো ঘরে এমন কুৎসিত কথা শুনলেও পাপ হয়। এ-কাবণেই রক্ত তাব দিঙ্‌মণ্ডলকে প্লাবিত করে, উক্ত কথার স্মৃতি মেয়ের মন থেকে মুছে দেবাব নিমিত্তই সে ক্ষিপ্রবেগে ছুটে গিয়েছিল, এবং এই আশাতীত দুর্বিভাব্য গতিবেগে যূথীকে পাব হয়ে, ক্ষণেক থেমে আশ্চর্য পলকেই নিশ্চয় করে, অসম্ভব ঢঙে পুনশ্চ কন্যাকে প্রদক্ষিণ করে—বাজিকব যেমন মড়াব খুলিকে কেন্দ্র করে, সাপুড়ে যেমন সাপকে কেন্দ্র করে, পৃথিবী যেমন সূর্যকে - এসময় নাবালিকা যূথী আপনার রক্তাক্ত হাতখানি অন্য কোনও উপায় না দেখে তুলে ধরেছিল।

এখানকার, বারান্দাব, ধূমসদৃশ আলোয় রক্তাক্ত হাতখানি দেখতে দেখতে প্রীতিলতাব চিত্তবিভ্রম ঘটে, সহসা, তাই, সে নতজানু হয়ে বসেই যূথীকে জড়িয়ে ধরেছিল। সেই সেঁকো কদর্য অভাবের মধ্যেও---যে গভীবতা গীতেব শুদ্ধ পর্দায় থাকে, যে গভীরতা জলে প্রতিফলিত তারায়, যে গভীরতা শিশুব হাস্যেব বহস্যের মাধুর্যের প্রাণধর্ম -এ-গভীবতা সহজেই সে খুঁজে পেলে ঘুমজড়িত কণ্ঠে সে বলেছিল, 'খুব কেটেছে।'

যূথী এখন মাব বাহুবন্ধনে, ঈষৎ সলজ্জ আপন হাতের প্রতি নজব বেখে, অতীব ধীরে মাথা নাড়িয়েছিল।

এখন তাবা ঘবে। যূথীর আঙুলটি বাঁধা হয়েছিল, সে মাব কোলে ঠেস দিয়ে আব লতি আর এক পাশে, তারা দুই বোন একটি কথাও বলেনি, এক তক্কে বুঝেছিল যে আমবা বড় নিঃসহায়। এবং মার দিকে বড় বেশি করে ঘেঁষে এসেছিল, প্রীতিলতা এইটুকু উষ্ণতাব মধ্যে এমন হতে পারে যে, সচেতন হয়ে উঠেছিল, কেননা সে যূথীর মাথার উপরে আপন গণ্ডস্থল স্থাপন করে, পরক্ষণেই তার নাসিকা কুঞ্চিত হয়ে উঠল, যেহেতু গন্ধকের মতো ঘৃতকুমারীর মতো এক ধরনের গন্ধ তাকে বিপর্যস্ত করে, সুতরাং প্রীতিলতা, ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মতো উঠে বসে, আড়ে চাইল, সে এখন কঠিন। এ সময়ে তার মনে হয়, মনে পড়ে, কী অদ্ভুতভাবে দুইজনে পিঁপড়েকে অনুসরণ করেছিল, একজন হামাগুড়ি দিয়ে, আর একজন বেঁকে হাঁটুতে হাত দুটি রেখে, অল্পকাল পরে পরেই তাদের দ্রুতগতি দেখা যায়, মাটি থেকে মুখ সরিয়ে ঝটিতি যূথী লতিকে বলেছিল, 'এই, মা দেখছে কি না দেখ', এতে লতি যখন

এদিকে চায়, তখন তার মাথাটা বই পড়ার মতো কবে নেড়েছিল, আর যূথী সখেদে বলল, 'হ্যাঁ।' লতি হঠাৎ চাপা গলায় বললে, 'দিদি এই যে!' আঃ সুন্দর, রুক্ষ, দিবালোক, লাল আনুগত্য, সবুজ যেমন বৃষ্টির অনুগত, বৃষ্টি যেমন মেঘেব, মেঘ যেমন বাষ্পেব, বাষ্প যেমন নীলাব্ধিবসনার। এরপর দুই বোন 'লাইন লাইন' বলে চেঁচিয়ে উঠল। এই লাইন বন্ধ জানলার ফুটো দিয়ে চলে যায়; দুই বোনই দেখেছিল, মধ্যে পগাব তাবপর যে বিরাট বাড়ি তারই খানিকটা, যে বাড়ি থেকে কালোয়াতি গান আসে, ফোড়নের গন্ধ আসে, বিড়ালেব ঝগড়ার শব্দ আসে। বেচাবি লতি বলেছিল, 'দিদি আমরা যদি পিঁপড়ে হতাম'—প্রীতিলতা জননী হয়েও এ দৃশ্য কোনও এক অন্তরাল থেকে দেখেছিল, কোনও এক মন দিয়ে শুনেছিল। এ কথা স্মরণে তার গায়ে যেন বা কাঁটা দিয়ে উঠল। প্রীতিলতা ভীতা।

ঠিক এমত সময়ে একটি কাশিব আওয়াজ, সে আওযাজে বটগাছের শিকড় পর্যন্ত অস্থায়ী হয়ে যায়, প্রীতিলতাব প্রাণপুরুষ কেঁপে উঠল। প্রীতিলতা আপনাব দৃষ্টিকে রূঢ় কবে কব্জা করে বেখেছিল সম্মুখেব অনেকটা সিমেন্ট করা ড্যাম্প সিক্ত দেওয়ালের দিকে, অথচ বিস্ময়কর এ কথা যে কে যেন বা তার দৃষ্টি দেহ মন সব কিছুকে জানলাব দিকে ঘুবিয়ে দিতে চাইছে, যে জানলায দু একটা গবাদ নেই, সেখানে দড়ি দিয়ে বাঁধা। প্রীতিলতা অত্যন্ত শক্ত করে নিজেকে ধবে রাখবার চেষ্টা কবেছিল, কেননা এসময কাশির এবং লাঠিব ঠক্ ঠক্ আওযাজ ক্রমে নিকটস্থ হয, স্বল্পালোকে অদ্ভুত একটু ছাযা পড়বে, এবপর গলিব মাঝেব নর্দমাব ঝাঁঝরিতে লাঠিব আঘাতে ঠং কবে একটা পাক্ত আওযাজ সংঘটিত হবে, আব যে, তাব পবক্ষণেই পৌছবে, তাদেব সূক্ষ্ম গলিতে এবং তাদের বকে—ঐ জানলাব পিছনে—ধপ কবে গাঁঠ্যব বাখাব শব্দ হবে, আব যে তখনই শ্বাসপ্রশ্বাস দীর্ঘনিশ্বাস সমস্ত কিছু মিলে সঘন অধীবতার শব্দ মিলে একটি পাতাহীন পৃথিবীব বক্ষতাব উদয হবে। এই ভযঙ্কব নিশ্বাস সকলেব শব্দ প্রীতিলতাব ঘাড়েব অতীব নিকটে অনুভূত হয, সে বোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল, কেননা ঘাড়েব এইটুকু গোপন-অতীব অল্পপবিসব স্থানেই কেবলমাত্র কাম, অভাবেব দ্বারা তাড়িত হয়ে আশ্রয় কবেছিল, কেননা দেহেব মধ্যে অন্য কোথাও দেহ ছিল না, ফলে প্রীতিলতা বিমর্দিত, ত্রাসিত, শঙ্কাব, জড়তার, ক্লৈব্যেব, শৈত্যেব, জাড্যেব, হিমবাহ স্বেদবিন্দুর সঞ্চাব হল, সে আপনাকে আব কোনওক্রমে আব দৃঢ কবে ধবে বাখতে পাবল না, ঝটিতি জানলার দিকে সে ঘাড় বাঁকিয়ে চেযেছিল।

জানলার পিছনেই বক, সেখানে, ইদানীং পথশ্রমে যাবপবনাই ক্লান্ত—দ্রুত নিশ্বাসে ব্যস্ত হাড়েব খেলা, এ খেলাব আশপাশ দিযে অন্ধকাব সহস্র ছেঁড়া চুলেব মতো ভেসে ভেসে যায। এবাব ছোট ছোট স্বস্তির কাশির আওয়াজ, এবং অশীতিপব বৃদ্ধেব সমস্ত মুখমণ্ডলে যেমত বা ছানিপড়া মুখখানি, দুঃখময়, গ্রহকবলিত, মুমূর্ষু ঘাড়েব উপব নড়ছিল। অনেকটা কাঁচা সর্দি গড়িয়ে পড়ে স্থির, বৃদ্ধ অদ্ভুতভাবে এদিক ওদিক চাইল, তারপরেই ভগ্নস্বরে গান আরম্ভ করল। গানটা টলহদারি, বেখাবের নিজস্ব বেদনা এ গানের সুরে বর্তমান ছিল।

প্রীতিলতা কখন যে এ গানে আপনকার বোধ হারিয়েছিল, তা সে জানত না, গানটি শুনে শুনে, এই কয়দিনেই, তার ভাল লেগেছে এবং সে আপন মনে, অনেক সময, গায। এখন, সহসা সে বুঝতে পাবল যে, সে অতিধীরে বৃদ্ধেব সঙ্গে সঙ্গে গলা মিলিয়ে গানটি গাইছে, আর যে, ত্বরিতে লজ্জায়, কাঁধের পিছন থেকে কাপড় তুলে মাথায দেবার কারণে তুলতে গিয়ে বুঝতে পারলে হাতে কাপড়ের পাড় মাত্র উঠে এসেছে, এবং আর কোনও উপায় নেই বলে মেনে নিয়ে সেটাকেই যথাযথভাবে রাখল। কিছু পবে, যূথী-লতিকে বিশেষ সাবধানতার সঙ্গে আপন দেহ থেকে মুক্ত করত প্রীতিলতা উঠে দাঁড়াল, কারণ এখন, সে

ধীরে ধীরে জানলার এক পাশে এসে, জানলার পাট বন্ধ করে দিয়ে, আপাতত শায়িত বৃদ্ধকে এ কয়েক দিনের অভ্যাসবশত উঁকি মেরে দেখবে। এইভাবে দেখার সময়ে তার নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে এসেছিল, অভুক্ত দেহ কি এক উত্তেজনায় রিমঝিম করে উঠেছিল। পলকেই স্থান পরিত্যাগ কবে যে দেওয়ালে বহুকাল পূর্বে একটি আয়না ছিল, সেখানে এসেই থমকে দাঁড়াল, এখানে একমাত্র জায়গা যেখানে সে আপনাকে আবছায়া দেখতে পায়! হায়! সত্যিই যদি আয়না থাকত!

খানিক সেখানে কালক্ষয় করে, উন্মত্ত যেমত, চঞ্চল পদবিক্ষেপে মেয়েদের কাছে গিয়ে তাদের সজোরে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে দিল, এরা তিনজন কোনও কিছু ভাববার পূর্বেই প্রগল্‌ভ ভয়ঙ্কর কাশির আওয়াজ শুনতে পেলে। প্রীতিলতার কর্তব্যবুদ্ধিভ্রংশ হয়নি, সে অসম্ভব উল্টোপাল্টা কণ্ঠে বলে উঠেছিল, 'ওঠ না তোরা, বুড়ো কী মরবে?'

দুই বোন বিশেষ সপ্রতিভ হয়ে উঠল, কর্তব্যপালনে এদের অল্পক্ষণ দিক্‌ভ্রম ঘটেছিল, তারা খানিক সন্তর্পণে বারান্দায় এল, অন্ধকারে খুঁজল। এরপর একজন দরজা খুলে দিলে, ইতিমধ্যে মার গলা এল, 'দেখিস ছুঁসনি যেন।' অন্যজন জল নিয়ে এসে দাঁড়াল। বৃদ্ধ এখন উঠে বসে কাশছিল, ওদের দেখে আপনাব টিনটা এগিয়ে দিলে।

বৃদ্ধ অদ্ভুতভাবে দুইহাতে টিনটা মুখেব কাছে আনতেই, এ লোল-দেহে যেমন বা বিদ্যুৎ খেলে গেল, দ্রুত একটি হাত সরিয়ে পার্শ্বস্থিত জগদ্দল বালিশেব উপর বাখতে যেই গেল, সে মুহূর্তে খানিক জল তার দেহের এখানে সেখানে পড়ে সাধারণ মনুষ্যদেহেব হিম কল্পনা হযে দেখা দিল। বৃদ্ধ দু-একটা কাশি সহযোগে জল খায় ..।

যূথী লতিকে খুব অল্প-স্বরে বলেছিল, 'কী বোকা, জল গিলে গিলে খাচ্ছে।'

লতি গ্যাসের অন্তিম আলোব কিছুটা মুখে তুলে নিযে বললে, 'চিবিয়ে খাবে বুঝি।'

যূথী পাখিব মতো মুখখানিকে উঠানামা করে বলেছিল, 'আমি তো করি', এবং পবে স্কুল মাস্টারনীর মতো করে স্পষ্ট বলেছিল, 'ওতে পেট ভরে যায়।'

লতি এ তত্ত্ব বুঝবার পূর্বেই হঠাৎ ভৌতিক আওয়াজ শুনল, 'ঘবকে যাওনা, ঘরকে যাওনা।' তাবা দুই বোন দেখল বৃদ্ধ আপনাব বোঁচকাটি দুই হাতে আগলে তাদেব ও কথা বলছে। এতে কবে দুই বোন ঈষৎ ক্ষুব্ধ হয়, কিন্তু বৃদ্ধেব বকম-সকম দেখে মুখটিপে হাসতে লাগল।

বোঝা গেল বৃদ্ধ এবার বেশ রাগ করেছে, যেহেতু, বলেছিল, 'খামাখা দাইড়ে আছ কেন, ঘরকে . ভাল জ্বালা', এ কথা শেষ হওয়াব সঙ্গে সঙ্গে প্রীতিলতাব কণ্ঠস্বব শোনা গেল, 'লতি যূথী ..'

প্রীতিলতা জানত, বৃদ্ধ কাউকে কাছে আসতে দেয় না কেন, প্রথম যেদিন সে তাদের এ গলিতে এসে আশ্রয় নেয় সেদিনই। তাদের বাড়িতে ঠিক দুদিন পর যৎকিঞ্চিৎ চোকর সিদ্ধ হয়েছিল। তারা সকলেই শুয়েছে, ইতিমধ্যে বৃদ্ধ ভাঙা গলায় গান গেয়ে উঠেছিল। ব্রজ ঘুমের জন্য তখন হাঁকপাঁক করছে, কেন না সে কোনওক্রমেই অবশ্যম্ভাবী তথা ভবিতব্যের দিকে আর চাইতে পারছিল না, কেননা আগামী কালের সূর্য শুধুমাত্র যে সে জড়ভরত, তা প্রমাণ করার জন্য পুনর্বার দেখা দেবে। কিন্তু এমত সময় প্রীতিলতার ধোঁয়াটে কণ্ঠস্বর তাকে ব্রজকে, ইহকালের স্যাঁতসেঁতে পৃথিবীর মধ্যে এনে দিয়েছিল। প্রীতিলতা বললে, 'বুড়ো হলে কী হয়, খুব টনটনে জ্ঞান। যখনই যূথী-লতি যায় অমনি মারমুখো হয়ে উঠে ..., বোধ হয় জানে, বোঁচকায় অনেক টাকা আছে।

'দূর'।

'শুনেছি ভিখারিদের অনেক টাকা থাকে ...'

'দুর, লড়াইয়ের বাজারে ... টাকা করতেই লোকে ... বলে ... পয়সা দেবে কে .'

ব্রজের উত্তরের মধ্যে উর্ধ্বের সিলিঙের সমস্ত নগ্নতা ব্যক্ত হয়েছিল। ফলে প্রীতিলতা আপনার কব্জির একমাত্র লোহাটা ঘোরাতে ঘোরাতে বললে, 'মজা দেখছ, বুড়ো রোজ দাড়ি কামায় ...'

ব্রজ এ-হেন এজাহারে চোখ দুটি খুলেছিল, সম্মুখের অন্ধকার দেখে নিয়ে পুনবায় চক্ষুদ্বয় বন্ধ করে আপনার দাড়ি দিয়ে হাতের বাজুর কাছে ঘষলে এবং কথার মোড় ফিরোবার জন্য বললে, 'বস্তায় মানে বোঁচকায় চাল আছে ...'

প্রীতিলতা ব্রজর কথা শুনে প্রথমে বলেছিল, 'তাই-নাকি', তারপর বলেছিল, 'ও'— ছোট কথা অর্থাৎ উত্তর দুটি তাব নিজের কাছে কেমন যেন বোকা বোকা ঠেকেছিল। ইতিমধ্যে স্বামী-স্ত্রী দুজনকেই যা আত্মনিগ্রহ থেকে অব্যাহতি দিয়েছিল, তা বৃদ্ধের গান, যা এখন সদ্য সদ্য শুনলেও মনে হয় বহুদিন পূর্বে শুনেছি— কেননা এই গানটির মধ্যে আধিদৈবিক পূর্ণতা ছিল, বর্ষার নিশ্চিন্ত ঘুমেব মোহ অথবা সুন্দর প্রভাতের সোহাগ এ গীতিব ধমনী. এ জগতের মধ্যে পরিচ্ছন্ন গ্রাম, বাপ মা ভাইবোন আকাশ বাতাস, পুষ্করিণীতে হাসের সন্তবণ, সব কিছুই ছিল।

সকালবেলা, প্রীতিলতা একটু গুড়ো চায়েব পুরিযা নিয়ে এসে গতকালেব যূথী-লতি সংগৃহীত কাঠ-কুটো দিয়ে উনোন জ্বালিয়ে জল চাপিয়ে দিয়েছিল। অদূরে ব্রজ উবু হয়ে বসে, দুটি হাত তার নিজেরই পায়ের তলায় চাপা, কেননা এ সময়ে তার দাড়ি বড় চুলকাচ্ছিল। চুলকালে পাছে প্রীতিলতার নজরে পড়ে. এবং তারই দুরদৃষ্ট অথবা হয়তো অকর্মণ্যতা স্পষ্টত ওতপ্রোত হয়ে উঠে। বেশিক্ষণ ব্রজকে এভাবে থাকতে হয়নি, যেহেতু তারা দুই বোন খাওযা-খাওযা খেলা করছিল।

তাবা দুইবোন, যূথী এবং লতি, খাওযা খাওযা খেলা করছিল, এ খেলার মধ্যে নিশ্চযই পেটভবা বা তৃপ্তির আনন্দ ছিল না, একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তাদের দক্ষতার কারণে মা বাবাকে গর্বিত করা। প্রীতিলতা অনামনস্কভাবে ধোঁয়া থেকে চোখ ফেরাবার অথবা সকালেব আলোকে পড়ে নেবাব জন্য কপালে একটি হাত রেখে এদিকে চেয়েছিল। যূথী-লতিব ন্যাকা, কদর্য, অস্বাভাবিক, পৈশাচিক চর্বণেব চাকুম চাকুম শব্দ ধোঁয়ার মধ্য দিয়ে বড বিশ্রী লাগছিল, প্রীতিলতার দেহে এ কাবণে বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে গেল. সে আব যেন স্থির থাকতে পারল না, ত্বরিতে উঠে ওদের দিকে না গিয়ে সদব দরজায় দিকে গিয়েই আপনাকে স্মরণ করার অর্থে আপনকার কেশদাম দুই হস্ত দ্বাবা আকর্ষণ কবেই একবার ভেবে নিয়েছিল যে. পিছনের দর্শকবা নিশ্চযই বুঝতে পাবেনি যে. কেন সে বাইরের দিকে যেতে চাইছিল— থমকে দাঁডাল। তার পরক্ষণেই ঘুরে সেইভাবে দাঁড়িয়ে, কর্কশ তীক্ষ্ণ আনুনাসিক আওযাজ করে বলল, 'বসে আছ, মারতে পারছ না?' ব্রজর পৌরুষ এতাবৎ একগলা জলে নির্মজ্জিত হয়েছিল, আপনার কন্যাদ্বয়ের এরূপ খেলা তার সকল কিছুকে অপহরণ করে. তথাপি নিজে থেকে কোনও বিহিত করার মতো মানসিক ক্ষমতা তার আয়ত্তের বাইরে ছিল. কেননা ভয় ছিল যে যদি করে তাহলে প্রীতিলতা তার প্রতি হয়তো অদ্ভুতভাবে তাকাতে পারে। এখন প্রীতিলতার হুকুমের সঙ্গে সঙ্গেই সে লাফ দিয়ে উঠল, এসময় তার ছেঁড়া কাপড়টা প্রায় খসে যাচ্ছিল, সেটা নিমেষেই ধরে, প্রচণ্ডভাবে অফুরন্ত কিল চড় ঘুষি মারতে লাগল। প্রীতিলতা নিশ্চয়ই আপনার ক্রোধ সম্বরণ করতে পারেনি সেও লতিকে নিয়ে পড়েছিল। দুজনেই, কন্যাদ্বয়, যখন ধরাশায়ী, তখন প্রীতিলতা তার নগ্ন বক্ষদ্বয় দেখে ঘুরে দাঁড়িয়ে কাপড় সংযত করতে করতে ব্রজর দিকে চাইল, এবং যে ব্রজ তার প্রতি চেয়েছিল। এরপর স্বামী-স্ত্রী জোড়ে, ভূমিলুণ্ঠিত ব্যাকুল ক্রন্দনরত মেঁয়ে দুটির প্রতি পিছন ফিরে দেখেছিল

যূথী উদম ল্যাংট এ কারণে যে সমস্ত ফ্রকটা খুলে গুছিয়ে তার একান্তে, পাশে লতি সর্বাঙ্গ সুন্দর দেহটি আভরণহীন, দুজনে মিলে মনে হয় এক মহতী কল্পনার সৃষ্টি করেছে, মনে হয় এরা দুজনেই মধ্যযুগীর কোনও স্থাপত্যের আহ্লাদিত ফ্রিজের (frie/e) অংশ, বাপ মা ঐ দৃশ্য থেকে চোখ ফিরিয়ে নেবার কালে দুজনে মুখোমুখি হয়েছিল, দুজনেই অপূর্বভাবে হেসেছিল, হয়তো আপন আপন চোখে জল রোধ কববার জনাই হেসেছিল।

এদিকে উনুনের জল তখন ফুটন্ত। প্রীতিলতা তাড়াতাড়ি গুঁড়ো চায়ের পুবিযা খুলে জলের উপর ফেলল এবং একটি ছোট চামচ দিয়ে গুলতে গুলতে ব্রজর দিকে চাইল। ব্রজর কাছে এ চাহনীর অর্থ অতীব সুস্পষ্ট সে অনন্য উপায়ে আপন মেয়েদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, এসময় এক ঝাঁক বোমারু বিমান উড়ে যাওয়ার মর্মভেদী শব্দে তীক্ষ্ণ ক্রন্দনধ্বনি আর ছিল না, ছেলেমানুষ দুটির মুখে শুধুমাত্র ক্রন্দনেব ভঙ্গিমাত্র ছিল! ক্রন্দনের অভিব্যক্তি কী অ-ছবিলা!

'আমার ইচ্ছে করে গলায় দড়ি দিতে, না লেখা না পড়া, খালি খাই খাই .. কোথাকার দুর্ভিক্ষ হাভাতের ঘর থেকে যে এসেছে ভগবান জানেন .. ' প্রীতিলতা বলেছিল।

এ কথায় ব্রজ ভেবেছিল পুনরায় মাববার হুকুম আছে, তাই তাব দেহটা ঈষৎ উঠতে গিয়ে থেমে গেল, একারণ যে, এখন সে আর এক কথা ভাবছিল—ভাবছিল নযত, পাচ্ছিল—ভয়ঙ্কব দুঃসহ গলিত ঘৃণ্য কদর্য গন্ধ, অনেক মৃতদেহেব গন্ধ— মানুষেবা কী আদতে মাছ--অভুক্ত তথা বুভুক্ষ জীবিতদেব শবের গন্ধ নিশ্চযই একরূপই হয় ফলে এ কথায, নিজেব জন্য অবশ্যই ব্রজর যথেষ্ট লজ্জা হয়েছিল।

এখন প্রীতিলতা অনেক কথা বলে চলেছে, 'এই ধাড়িটাই ছোটটাকে পর্যন্ত নষ্ট কবলে - কথা সব শুনলে গা জ্বলে যায়, সেদিন বলছে, ঘরে বসে শুনছি', বলে অসম্ভবভাবে যূথাব কণ্ঠস্বব নকল কবে তথা ভেঙিয়ে বলেছিল, 'লতি মেঘ কি কবে হয জানিস-- হাজাব হাজাব বাড়িব রান্নার ধোঁয়া মেঘ হয, ওটা না রুই মাছের ঝোলেব মেঘ –ওটা না সোনা মুগের ডালের মেঘ' . 'একথা শেষ কবেই অদ্ভুত করে ভেঙাতে গিযেই, প্রীতিলতা ভযঙ্কর ত্রাসে কম্পিত, সে বড় অবাক হয়, কেননা নিমেষেই তার সম্যক উপলব্ধি হয়েছিল যে বহিবাগত ত্রাস তার দেহে সঞ্চারিত এবং রক্তকে যা হেতুহীন কবেছে। এইপ্রকাব জ্ঞানোদযে সে বুঝেছিল তার সুন্দর আয়ত নয়নযুগলের একটি ছোট যুগপৎ অন্যটি বড, এবং বিশেষ পরিমাণে উষ্ণ। প্রীতিলতা, এমন মনে হয, তার ইদানীং স্বভাবসিদ্ধ যন্ত্রণায চিৎকার—কি আর্তনাদ—করে উঠতে চেয়েছিল, এ কারণে যে তার মুখ চিৎকাবকারীব ন্যায় ভাঙাচোরা অথচ কোনও আওয়াজ নেই। পরক্ষণেই যেহেতু সে স্ত্রীলোক সেইহেতু আপনাকে সংযত করতে পেরেছিল। এ কথা যেমন সত্যি, তেমনি সত্যি যে প্রীতিলতা সেই ত্রাসকে প্রতি-আক্রমণ কবতে অথবা ত্রাসের ভাবনা থেকে অব্যাহতি পেতে চেয়েছিল। গরম চায়ের খানিকটা চুমুক দিতেই সে বুঝতে পারলে, দেহে অজস্র শিরা-উপশিরা বর্তমান, এবং সে আপনকার হাঁটুদ্বয় প্রজাপতির পাখার ন্যায় ধীরে বিভক্ত করল, ঝটিতি বন্ধ করে এবং পুনরায় এ কার্যে সে ব্যাপৃত হয়—কারণ তার গাত্র উত্তপ্ত, চোখে লজ্জা অথচ দেহ-প্রজ্বলন-হেতু বৃশ্চিক নিশ্বাস প্রবাহিত হয়নি অথচ তৃপ্তির পূর্বেই অথ খণ্ডিত লক্ষণনিচয় ওতপ্রোত, মনে হয়, নিশ্চয় দেহগত ত্রাসকে দুষ্পুরণীয় কাম দ্বারা জর্জরিত করতে চেয়েছিল, বলেছিল, 'ওই বুড়োটাকে আজ বলে দিও, বড় ভয় ভয় করে .. কার মনে যে কী আছে ... বলা যায় না' বলেই শায়িত উলঙ্গ মেয়ে দুটিকে বলেছিল, 'মরণ—ওঠ্ না বুড়োধাড়ি নির্লজ্জ বেহায়া', বলেই গলা নামিয়ে বলল, 'বুঝলে ...'

ব্রজ বুঝল, যদিও এ-হেন আপৎকালে দীন-ভিখারি-জনিত প্রীতিলতার ইঙ্গিতের পিছনে কোনও সুস্পষ্ট ছবি সে দেখতে পায়নি অথবা আদৌ ছিল না। কেননা মন নির্জনতা-অন্বেষী নয়, কেননা মন দ্বীপ-সন্ধানী নয়, তথাপি বলেছিল, 'পাগল।' ইস্! ভাত যদি থাকত তাহলে সে অনায়াসে এ-মিথ্যা ভয়ের, ত্বরিতেই সুযোগ নিতে পারত।

'না না বড় ভয় করে'—এ কথায়, অন্য কিছু নয়, প্রীতিলতার আপন ত্রাসের উল্লেখ ছিল। আয়না থাকলে, দেখতে পেত যে সে, যারা এখন সমস্ত শহর-কলকাতায় ভূগর্ভের অন্ধকার ছড়িয়ে দিচ্ছে—তাদেরই মধ্যে একজন। কিন্তু সে হার মানবার মতো দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করেনি। কেননা তার কাছে একটা পাড়ই যথেষ্ট—যূথী কাদের বাড়ি থেকে মনোরম নয়ন-অভিরাম জরির পাড় নিয়ে এসেছিল, সেটি প্রীতিলতা আপনাব গায়ে জড়িয়ে দুই মেয়েকে দেখিয়েছিল, তার মাকে এরূপ সজ্জায় দেখে চকিতে শিল্পী হয়ে যায়, তারা রহস্য যে কী তা বুঝেছিল, যে রহস্যে বলাকা-চিহ্নিত শ্যাম আকাশের বৈচিত্র্য, নীল সাগরেব বারিরাশির মধ্যে সন্তরণবিলাসী আলোক, তারই পূর্ণ হেমকান্তি ধরেছিল। যূথী-লতি আর স্থিব থাকতে পারেনি, এরই মধ্যে যূথী বুদ্ধি কবে জানলাটা আরও ভাল করে খুলে দিয়েছিল যাতে মায়ের দেহ জুড়ে যে আলো, তা দূর শতাব্দীর স্মৃতির মধ্যে, তাকে কোলে নেওযা যায়—এবপর দুজনেই মাকে আনন্দে জড়িযে ধরেছিল, মনে হয় তারা যেমত বা অতিশয় ভীত, শঙ্কিত। (ভগবান! তুমি অন্তরে থাকতেও মানুষেব এত ভয় কেন!) প্রীতিলতা অবশ্যই হার স্বীকার করবে না। সে কোনওদিন মরা মাগুর মাছ খায়নি, কাউকে খেতেও দেযনি। সে হাভাতের একজন হতে কোনওক্রমেই পারবে না।

প্রীতিলতা মুখ ঘুবিযে বসে, এদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে পরক্ষণেই সে সেইদিক থেকে মুখ ঘুবিয়ে বসে। পুনরায সেদিক থেকে অন্যদিকে। কিন্তু এই মেয়ে দুটি! মনে হয় এরা বীভৎস, এবা ক্রমশ হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে, ব্রজর প্রতি বাগ কবার কিছু নেই, এ কারণে যে ব্রজব প্লুরিসিই তার কাল, উপবন্তু তার অক্ষমতা—দুই মিলে তার সমস্ত স্বপ্ন শুধু নয়, জীবনকে খানখান করেছে। এখন এ সময় একটা টিউশানি পর্যন্ত নেই, শহরে অনেকে নেই যারা আছে বোবখা পবিহিত আলোয় ভৌতিক। তাবা সকলেই পবমায়ুকে সব কিছু বলে ধরে নিয়েছে। প্রীতিলতাদের কণ্ঠস্বর ফাঁকা হাঁড়িতে প্রতিধ্বনিত হয়, এতে করে আর কারও না হোক প্রীতিলতার গা ছম্‌ছম্ কবে। তখন এ ভয়কে ঠেকাবার জন্য বৃদ্ধেব গীতটি প্রথমে গুনগুন করে গেয়ে যেন আবোগ্য স্নান কবে।

কিন্তু কতক্ষণের জন্য এ গীত! পলকেই প্রীতিলতার দৃষ্টিপথে উদয় হয় এখানে সেখানে জমে থাকা আবর্জনা যেমন অযত্নের গৃহের মাকড়সার জালের মতো শঙ্কাপ্রদ অন্ধকার! এ অন্ধকার ফাংগাস-শীল। প্রীতিলতা মনকে ফেরাবার জন্য তৈজসপত্রের কিছুটা সংস্কাব কবতে মনস্থ কবেছে কিন্তু বাড়িতে এক ফোঁটা ছাই নেই। ছাই নেই তাতে কী, যূথী-লতি তো আছে। যূথী-লতি ছাই নিয়ে এসে খবর দিলে, 'মা আমরা মোড়ের পাঁশগাদায় গিয়ে ছাই তুলব, এমন সময় গিয়ে দেখি বুড়োটা .'

'বুড়োটা' শুনেই প্রীতিলতার গায়ে হিমপ্রবাহ খেলে গেল, আপনার শৃঙ্খলিত অস্থিসমূহের বিশৃঙ্খলতার শব্দ শোনা গেল, তবু আপনাকে সংযত করতে কবতে সে বলেছিল, 'ছিঃ, বুড়োটা বলতে নেই ... আমাদের অমন করে কথা বলতে নেই .. '

যূথী এতে, এখন, থেমেছিল, ফলে লতি দিদির মুখের দিকে একবার চেয়ে নিয়ে বলতে লাগল, 'জানো মা, বুড়ো ... মানে বুড়োমানুষ' বলে মার মুখের দিকে চেয়ে অল্প হাসবার চেষ্টা করেছিল, 'বুড়োমানুষ রাস্তায বসে কাশছে, তার গলা দিয়ে বক্ত পড়ছে .. '

শুনে যেটুকু মন সাড়া দিয়েছিল সেইটুকু দিয়ে এদের মা বলেছিল, 'বলিস কী!' বলেই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, যেহেতু এরূপ সমাচার তার মধ্যে ধূমায়িত হয়ে এক অভূতপূর্ব বিদ্যুৎ-সম্ভূত রোশনাইয়ের সৃষ্টি করে, এমন কী দুটি হাত ছেলেমানুষের মতো হাততালি দেবার জন্য খানিক অগ্রসর হয়েছিল, সে সেইভাবে হাত দুটি রেখে কিম্ভূত এক প্রশ্ন করে ফেলল, 'আঃ কোথায় সে মর ...' কথাটা 'মর'-এ এসেই থেমে গেল, 'বে' অক্ষর যোগে সম্পূর্ণ হয়নি। যূথী-লতি মার এহেন পদ রচনাটি যথাযথ বুঝে উঠতে পারেনি, তারা অবাক হবে কিনা এ কারণে দুজনে দুজনের দিকে চেয়েছিল, ইতিমধ্যে শুনল তার মা পুনর্বার সংশোধন করে বলেছিল, 'বেচারাকে কোথায় দেখলি?'

'মোড়ে—কাশছে আর রক্ত পড়ছে ...' এরপর তিনজনেই স্তব্ধ, তিনজন তিন জনকে অদ্ভুত বিশেষ রূপে নিপাট গম্ভীর দেখেছিল। প্রীতিলতা, এ কথা ঠিক যে, এই মুহূর্তের জন্য অন্তত ছেলেমানুষ ভাবেনি। সহসা এই স্তব্ধতার মধ্যে থেকে কচি কচি মুলো দিয়ে আদা সর্ষে বাটা দিয়ে ডেংও ডাটার চচ্চড়ি বেশ খানিকটা গুড় দেওযা--স্বাদ পেল। এত করে একটি ঢোঁক গিলেই, গলিত শবদর্শনজনিত ভীতি তাকে, প্রীতিলতাকে, অতিমাত্রায় কুক্ষিগত করল। কখন যে আপনকার ছিন্নভিন্ন অঞ্চলপ্রান্ত খসে পড়েছিল তা তার খেয়াল হয়নি এ কারণে যে এখন সে সেই প্রথম ভোরের মোহমুক্ত সজল গীতটি গুনগুন করছিল, কেননা এই গীতে অদ্য সকালের একটি দৃশ্যকে সে মুছে দিতে চেয়েছিল।

প্রীতিলতা, তখন ছোট করে আগুন জ্বালিয়ে একটু চোকর সিদ্ধ করছিল, যূথী আর লতি নিকটে বসে আনন্দে নিজেদের আর সামলে রাখতে পারছে না, তারা বাবু হয়ে বসে আপন আপন হাত কোঁচড়ে ঠেসে রেখেছিল, মাঝে মাঝে কাঁধ উঠছিল। এমত সময়ে লতি জানলার বসানের দিকে দেখে বললে, 'মা দুটো আমলকী ফেলে দাও না—বেশ টকটক হবে।' জানলার বসানে বহুদিন পূর্বে আনা ত্রিফলা পড়েছিল। লতির কথায় প্রীতিলতা গোটাকয়েক আমলকী বেছে নিয়ে ফুটন্ত চোকরে ফেলে দিল।

লতি আহ্লাদে সমস্ত দেহকে কেমন একভাবে মুড়ে ফেলতে চাইল, অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হয়েছে সে, এই কৃতজ্ঞতাবোধ থেকে অর্থাৎ মাকে খুশি করবার মানসে বলেছিল, 'ভাতের থেকে আমার চোকর খুব ভাল লাগে।'

যূথী আপনার নীরবতার বোকামি থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য যোগ দিল, 'ভাতের থেকে চোকর একশগুণে ভাল, হাই ক্লাস . ' মুখখানা এ সময় এমন বিসদৃশ করেছিল যে তার কানটা মলে দিতে ইচ্ছা করে।

প্রীতিলতা মুখ ঝামটা দিয়ে উঠে বললে, 'থাক, থাক, আর চোকরের গুণ গাইতে হবে না ... লোককে যেন বোলো না আমরা চোকর খাই।' এই শেষ উক্তিতে প্রীতিলতা আপনাদের ঘরগত চরিত্রের পরিচয় দিয়েছিল। এর পরেই সে চোকর পরিবেশন শুরু করে।

লতি আপনার পাশতলা থেকে একটি চামচ বার করে বললে, 'আমি সাহেবদের মতো খাই' এ কথা শেষ না হতেই যূথী সুকৌশলে চামচটা কেড়ে নিল, ফলে দুজনে মারপিট বেধে গেল। এ কারণে থালা উল্টে পড়েছিল, যূথী পা দিয়ে লতির থালাও উল্টে দিল। প্রীতিলতা খুব সহজেই দুজনকে প্রচণ্ড দুই চড়ে শান্ত করে পড়ে যাওয়া চোকরের দিকে চেয়ে অদ্ভুত এক দেহভঙ্গি করে মুখ ফিরিয়ে ঘরে যেতে যেতে বললে, 'তুলে খেয়ে ফেল', এই কথাটা বার হতেই এক ঝলক ত্রাস এসে তার দেহে প্রবেশ করেছিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে সে ঘরের জানলার দিকে চেয়েছিল, খানিকটা নির্ঝঞ্ঝাট স্থান সেখানে বর্তমান, খানিকটা অব্যক্ততা সেখানে ওতঃপ্রোত। এইটুকু দর্শনে প্রীতিলতা বলেছিল, 'বেচারা' আর যে, সে অন্যমনস্কভাবে কোনও আপনজনের সঙ্গে প্রত্যহের আগন্তুক হাড়ের খেলাকে মিলিয়ে নিতে চেয়েছিল,

ভেবেছিল 'বাবা যদি বেঁচে থাকতেন, এমনই হতেন।' এ সব কথার কারণ এই যে, আপনজন হলে মানুষ অনায়াসেই নিগূঢ় বেদনা অনুভব করতে পারে।

ব্রজ আজ দুদিন কোনও কিছু আনতে পারেনি, গতকাল সে বলেছিল, 'আজ এক অদ্ভুত জিনিস দেখলুম জানো—এক ভদ্রলোক লোঙ্গরখানায় ...' আর কথা বার হয়নি, অনুক্ত কতার স্বর তার বিশ্রী দাড়িতে ঘোরাফেরা করতে লাগল, শায়িত প্রীতিলতা ,কটা চোখ খুলে ভয়ঙ্করভাবে চেয়ে থেকেই ঝটিতি উপুড় হয়ে শুয়েছিল, ব্রজ স্ত্রীর ব্যবহারে সত্যিই অস্থিহীন হয়ে পড়লে। সে ধীরে ধীরে বসে পড়ল। অন্যপক্ষে, প্রীতিলতা, খানিক সামলে উঠে বসে হঠাৎ ব্রজর হাত ধরে, 'আমাকে বুকে হাত দিয়ে বলো, কখনও এসব গল্প ... আমার বড় ভয় করে', বলে আস্তে হাত সরিয়ে পুনবায় তড়িৎগতি স্বামীব হাতে হাত রেখেই ভীতভাবে বলে উঠল, 'আবাব জ্বর—তাহলে .'

'একটু গা গবম '

প্রীতিলতাব কণ্ঠস্বরে ম্লান সন্ধ্যাব মমত্ব ছিল, যে মমত্ব দীর্ঘশ্বাসেব পরমার্থ, যে মমত্ব কিশোবীর লজ্জার লাল, আপনকার ধমনীসমূহকে ত্বক বিদীর্ণ কবতে বাইরে আনতে ব্রজব ইচ্ছা হল কেননা প্রীতিলতাব প্রশ্নে নয় আগ্রহে, আগ্রহ নয় অনুভূতিব মধ্যে সময়ের বিবেচনা ছিল, পূর্ণতা ছিল, যে পূর্ণতা দ্বাবা রমণীবা চিবকাল ভালবেসেছে। অতএব এরূপ প্রশ্নে ব্রজ কিছু ঘর্মাক্ত হল।

অন্যপক্ষে প্রীতিলতা আপনাব আচল দ্বাবা স্থানটি সংস্কার কবে, যূথীকে বলতে গিয়ে দেখল সে ঘুমিয়ে, লতিব মুখে বুড়ো আঙুলটি, সে বলতে গিযে নিজেই উঠে দাঁড়াল। ব্রজ মাটিতেই শুয়ে পড়তে যাচ্ছিল কিন্তু প্রীতিলতা অত্যন্ত ব্যস্ত হযে উঠে, 'ও কী মাথা খাবাপ নাকি—আশ্চর্য আজ মাসখানেকও হযনি ভুগে .' বলে মাদুবটা মাটিতে খানিকটা গড়িযে দিয়ে, একান্ত তখনও তার হস্তগত, অন্যমনস্ক হয়ে দাঁড়িযে থেকে প্রথম ছোট একটি হাঁ কবে ব্রজর প্রতি চোখ তুলে ধরেছিল, বলেছিল, 'জানো বুড়ো মিনষের নাকি মুখ দিয়ে .'

ব্রজ নিজেব অসুস্থতাব কাবণে অর্থাৎ সে নিজে ভুগছে, স্ত্রীব কথায ভীত হবার পূর্বেই বলেছিল, 'দূর ..'

'আমারও তাই মনে হয দাঁত ফাঁত দিয়ে হযতো পড়ে থাকবে ..' এই বলতে বলতে মাদুব পেতে দিয়ে বললে, 'ভেবেছিলাম তোমাকে বলব ওকে এখান থেকে চলে যেতে, তোমাব শবীব ..'

'আঃ দূব'

'তা পরে ভাবলুম কিছু তো দিতে পারি না, অন্তত একটু জায়গা, কী বলো . গরিবকে দিলে ভগবান মুখ তুলে ...'

পুনরায অভুক্ত স্তব্ধতা। ব্রজ জ্বর-উত্তপ্ত চোখেই ভাবছিল, খুব আশ্চর্য নয়, প্রীতিলতা গান গাইত, প্রীতিলতার কণ্ঠস্বরে লালিত্য ছিল। এখন, বিশেষত আজ তার—একদা মাযাবিনী প্রীতিলতার—কণ্ঠস্বরে ক্রমাগত বালি ঝরার ভয়াবহতা। কে মনে নেই, একদা ধাঁধা জিজ্ঞাসা করেছিল, 'জ্বলল আঁধার নিভল আলো' এর মানে কী, ব্রজ নির্বোধের মতো এই হেঁয়ালির দিকে চেয়েছিল। তেমনি এই কণ্ঠস্বরের দিকে চেয়েছিল, অর্থ করতে পারেনি, হেঁয়ালির অর্থ যে পেট তা ব্রজর বুদ্ধিতে আসেনি—উদর যখন জ্বলে তখন সকলই অন্ধকার, উদব প্রজ্বলন হেতু আলোক, হায় কী অন্ধকারময়ী। তারাই ধন্য, যারা খাবার দেখলে সত্যি সত্যি যারপরনাই ভীত হয়।

অনেকক্ষণ পর অসম্ভবভাবে ঘুম ভেঙে গেল, দেখল ছিন্নভিন্ন বস্ত্রে ভূষিতা প্রীতিলতা, আপনকাব হাঁটুতে মাথা বেখে নির্লজ্জভাবে ঘুমিয়ে, অদূরে কন্যাদ্বয দেওয়ালে— ভিজে

ভিজে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে কান্নার বীভৎসতা প্রকাশ করছে, একারণে ব্রজ রোজগারি বাপের মতো বিরক্ত, সে উঠে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড চড় মারার জন্য কিঞ্চিৎমাত্র চেষ্টা করতেই, দেখল যে তার দুর্বল দেহটা দেওয়ালের সঙ্গে গিয়ে আঘাত খেলে ঃ ইচ্ছা দেহটা যুত করতে পারেনি। খানিক দেওয়ালের কাছে সেইভাবে সে দণ্ডায়মান ছিল।

যুথী-লতি কান্না থামিয়ে চোখ বড় করে, প্রীতিলতা চোখ খুলে তাকিয়েছিল—প্রীতিলতা কিন্তু মাথা তোলেনি, ফলে যে দুঃখময় রেখা তার দেহে ভর করেছিল তা অদৃশ্য হয়ে যাযনি, কী দুগ্ধহীন-স্তনক্ষুব্ধ সে রেখা।

প্রীতিলতা বুঝেছিল, ব্রজ বার হচ্ছে, কেননা এখন সে অতীব নিষ্ঠার সঙ্গে আপনার প্যান্টুলুনের ভাঁজ ঠিক করেছিল। প্রীতিলতা প্রশ্ন করল, 'কোথায় ?'

'বালিগঞ্জ।'

প্রীতিলতা দক্ষিণ দিকে চাইল, কেননা বালিগঞ্জ দক্ষিণে. মনে হল সেখানে কী মৃত্যু নেই... আর্তনাদ নেই! যে আর্তনাদ আরও প্রবলতর হয়ে তাদের দরজায় ফিরিঙ্গি কায়দায় আঘাত করছে। প্রীতিলতা ভয়ে আপন মুখমণ্ডলে বস্ত্রপ্রদান করেছিল। সে ত্রস্ত শঙ্কিত। সমগ্র পৃথিবীটা যেন বা ডাক্তারবাবুর কম্পাউণ্ডার নিমাই জগমণির মতো, অনেকটা ধুকুড়ীয়া বাগানের আখমাড়া ম'ম' করা রাণ্ডি যেন, যার হাস্যে সদ্য কাঁচা সর্দিব আদুবে আওযাজ, পাটের বকমাবি রঙে উদ্‌ব্যস্ত রুমালে বটবৃদ্ধ শবীরটা ঢেকে বসে আর যাই হোক এ দৃশ্য খুব সুন্দর নয়।

প্রীতিলতা মুখমণ্ডলের বস্ত্র সবিয়ে জিজ্ঞাসা কবলে, 'ফিবতে তো

'হ্যা সাতটা আটটা ..' ব্রজ এই উত্তর দিতে দিতে চলে গেল। প্রীতিলতার মনে হল কোথায় যেমন বা ব্রজ অদৃশ্য হয়ে গেল। কী দুর্দ্ধর্ষ রহস্য। মানুষ যে দোমড়ান অনন্ত বৈ অন্য নয়, সে সত্য বুঝবাব পূর্ব মুহূর্তে প্রীতিলতা প্রীতিলতাব মধ্যেই থেমেছে এবং গুনগুন কবে সেই গীতধ্বনি করেছিল।

এখন সে শুয়ে, সে যখন ভাবছিল, ব্রজ দুটি ভাত না পেলে আব উঠতে পাববে না, ঠিক এমত সময়ে, যূথী প্রায় মাব ঘাড়েব উপর পড়ে দ্রুত নিশ্বাসে বলেছিল, 'মা দেখো লতি কী কুড়িয়ে খাচ্ছে '

অতর্কিতে জ্যা-মুক্ত ছিলাব মতন প্রীতিলতা উঠে দাঁড়াল, সত্বব বাবান্দায় গিয়ে লতিব সম্মুখে দাড়াল। ক্ষণেকের জন্য মাব মনে হয়েছিল, আমাব মা যূথীব মতো হিংসে হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে একটি চড়েব আওযাজ শোনা গেল এ চড় লতিব গালে প্রীতিলতাই মেরেছিল সঙ্গে সঙ্গে লতিব মুখ থেকে কী যেন ছিটকে পড়ল। পলকেই প্রীতিলতা এবং যূথী ছুটে গিয়ে দেখে জলসিক্ত হরীতকী .. ছোট একটি ... আহ্লাদ আহ্লাদেব সঙ্গেই ধ্বনিত হয়েছিল বহু পূর্বে সেনেটে উক্ত ... এবং ... এ দৃশ্যে পবক্ষণেই প্রীতিলতা জলদগম্ভীর রৌদ্রকর্মা আওয়াজ ...

প্রীতিলতা সমাগত পবিত্র সন্ধ্যাকে কথঞ্চিৎ ... ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল। অমিত্রাক্ষর ছন্দ যেরূপ সদাই বিষণ্ণভাবে শেষ হয়, তেমনি তার দক্ষিণ হস্ত থেকে ...প্রসূত কতিপয় নকসা অদৃশ্য হল। সে সেই গীতিটি ক্লান্তকণ্ঠে, ছোট ঘবেব মধ্যে মন্থর গতিতে ঘুরে, ঘুরে গাইছিল। ঘরে আর অন্য কারও নিশ্বাস ছিল না। এ কারণে যে যূথী লতিকে বাপেব জন্য অপেক্ষা করতে এই কিছুক্ষণ আগে মোড়ে পাঠিয়ে দিয়েছে

এখন অন্ধকারে কোথায় যে সে, এ কথা ভুলে গেল, সে শুধু দেওয়ালে ...দ্বারা অনুভব করত 'এই যে বোধ হয় আমি' একরূপ মনে করবার চেষ্টা করেছিল, এবং তৎসহ

সমস্ত স্থাপত্যের প্রতি তার বীতশ্রদ্ধা এসেছিল, সমস্ত আকাশের কিছুটা নিদ্রার বাস্তবতা এখানে যে, সে তা জানত না অথবা কেউ তাকে জানায়নি—অনেকবারই সে সেখানে, দেওয়ালে, মাথা খুঁড়েছিল। কিন্তু তবু প্রীতিলতা খুব আশ্চর্য সহকারে দেখেছিল যে এরূপ সংঘাতপ্রসূত বেদনা উক্তির 'উঃ'-কারের মধ্যে বৃদ্ধের প্রভাতী গীতের বেশ বর্তমান।

ইতিমধ্যে, ইদানীং প্রত্যেহের সময়মাফিক নর্দমার লোহা আর লাঠির আওয়াজ, ভয়ঙ্কর আওয়াজ, সমস্ত দিককে বিমর্দিত করেছিল, এবং অন্ধকার কক্ষমধ্যে একাকিনী প্রীতিলতা চকিত ভীতা, আপনকার শীর্ণ হাত দুটি দিয়ে কাকে যে সে রক্ষা করতে চাইল তা সঠিক বুঝা গেল না—যেহেতু এখানে অন্ধকার—সম্মুখের শূন্যতাকে অথবা নিজেকেই। (হায় প্রীতিলতা যদি বুদ্ধিমতী হত তাহলে সে দেখতে পেত, এই শূন্যতা ভেদ করে সে কখনও যায়নি!)

প্রীতিলতা ভীত হয়ে অদ্ভুতভাবে আপন আত্মরক্ষায় যত্নবান হয়েছিল। এবং একথাও ঠিক যে, সে সেই আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে আপন বস্ত্র পরিত্যাগ করে। এবং এতে করে সে আর একটি অন্ধকারে পরিবর্তিত হল।

আদতে আপনাকে ধরে রাখাই তার উদ্দেশ্য ছিল। এই ব্যবস্থা অতীব সাধু কৌশল। ইত্যাকারে খানিক অসময় পার সত্যি হয়েছিল, কিন্তু আর পারা গেল না, কখন যে জানালার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তা তার খোঁজ ছিল না।

তির্যক গ্যাসের আলোয় বসে বৃদ্ধ খানিক শ্রান্তি দূর করে শূন্যতার সংঘাত হেতু কম্পিত হাতখানি দ্বারা আপন কপাল মুছছিল, এরপর অসম্ভব মায়াজড়িত কণ্ঠে বলেছিল, 'হরি বল' ...অনন্তর এখন, যখন সে কিঞ্চিন্মাত্র সুস্থ বোধ করেছিল তখন সে গীতটির সুর ধরেছিল। অন্ধকার কক্ষমধ্যে ইদানীং অন্ধকারে পরিবর্তিত একটি দেহে সে গীত প্রতিধ্বনিত হয়েছিল, এ কারণে যে প্রীতিলতা এখনও তেমনিভাবে দণ্ডায়মান।

বৃদ্ধ গীতটি গাইতে গাইতে, খানিক স্খলিত পদে স্বভাব মতো বাইরে যাবার নিমিত্ত এখান থেকে চলে গেল শুধুমাত্র বস্তাটা সেখানে। প্রীতিলতা আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করেনি। খানিক বিবস্ত্রতা সত্ত্বেও ছুটে, থমকে, কাপড় সংগ্রহ করত কোনওক্রমে জড়িয়ে, সদর দরজায় নিকটে এসে স্থির... এমত সময় সে আপনার নিশ্বাসের সময় পেয়েছিল, শব্দও নিশ্চয়। কত রকমারি নিশ্বাস প্রীতিলতা ফেলেছে উষ্ণ, দীর্ঘ, হাবমানা।

এখন, সে সদর দরজার এপাশে অল্প গ্যাসের আলোয় সেই ঘুমন্ত ভাল্লুকের মতো বস্তাটা এবং সম্মুখেই অদ্ভুত এক ভঙ্গিসহকারে প্রীতিলতা, গৃহিণী, দণ্ডায়মান। মনে হয়, এক মুহূর্তের জন্য মুখ ফিরিয়েছিল, এমন হতে পারে সে ছায়া দেখতে চেয়েছিল। আঃ পরোক্ষ অনুভূতি।

বাটিতি প্রীতিলতা রাস্তায় নেমে, কপাটিতে হাত দিতেই হস্তদ্বয় তড়িৎবেগে ফিরে, কিছুক্ষণের নিমিত্ত, আকাশহীন শূন্যতায় কম্পিত হতে থাকল। পরক্ষণেই যখন সে বস্তাটা ধরে কাখেদা করার চেষ্টা করে, তখন দেখে—বৃদ্ধ হাঁ হাঁ করে ছুটে আসছে, একটু এসেই বৃদ্ধ কেমন যেন বা নেচে উঠল- বোধ হয় খোয়ার জন্য। তারপরই পাশের দেয়ালে হেলে পড়ে দেওয়াল ঘষটে একটু এসেই সমগ্র জোর দিয়ে প্রীতিলতার দেহের উপর ঝুঁকে পড়ল। পুরুষের স্পর্শে গৃহিণী প্রীতিলতা অচিরাৎ এক নৈসর্গিক বয়স ফিরে পেলে, সে পিঠের ঝটকায় এমনভাবে বৃদ্ধকে আঘাত করেছিল যে বৃদ্ধ টাল সামলাতে না পেরে রকে মুখ থুবড়ে পড়ল, কম্পিত, বিচলিত হাত দ্বারা কোনওক্রমে রকের কিনারাটা ধরেছিল, চোখ দুটি চাইবার চেষ্টা করলে, মুখমণ্ডল যেন বা ফুলে উঠে, গ্যাসের আলো পেলে, মুখখানি এসময় অর্দ্ধ উন্মুক্ত ছিল, হঠাৎ বোতল থেকে তরল পদার্থ যেরূপ নির্গত হয় তেমনই সশব্দে রক্ত পড়ল। এ দৃশ্যে, প্রীতিলতা মজ্জাগত মনুষ্যত্বের বশে তাকে সাহায্য করতে গিয়ে, থমকে, আপনকার উদাত্ত

হস্তদ্বয় দেখেই সেই হাতে বস্তাটা তুলতে গিয়ে পুনরায় দেখল যে, রকের কিনার থেকে জর্জরিত হাত দুটি ধীরে নেমে গেল, ফলে সমস্ত শরীরটা তারই দিকে ঢলে পড়তেই একটু সরে গিয়ে—বকে বসে পড়েছিল। শুধু মনে হল, এখনও কী মানুষেরা মৃদুস্বরে কথা কয়, ছোট করে হাসে!

প্রধূমিত কক্ষের মধ্যে প্রীতিলতা যেমন সাঁতার দিয়ে বেড়াচ্ছিল, বহুবার সে জানলায় দাঁড়িয়েছে, গরাদ মুঠো করে পুনর্বার ফিরে গেছে। এমত সময় শুনল, দুটি কচি পদধ্বনি, এখানে এসেই যেন নিভে গেল। জানলা থেকে প্রীতিলতা বললে, 'বক থেকে দেখ তো কী হল বুড়োব'—এ কণ্ঠস্বর আজও প্রতিধ্বনিত হয়নি। যূথী-লতি দেখার পূর্বে—প্রীতিলতা বলেছিল, 'ঝট কবে ক্লাবে খবর দে।'

কিছু পরে ক্লাবের ছেলেরা এল, এসে দেখে বললে, হ্যাঁ শাল্‌লা —চ বে ওঠা শালাকে ... '

যূথী-লতি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে বইল, একবার বুড়োর বস্তার বা লাঠিব বা মগের কথা তাদের মনে হল না। ইতিমধ্যে মার কণ্ঠস্বর শুনেই তারা ভিতরে চলে গেল।

হঠাৎ হাঁড়ি উনুনে চড়েছে, তলায় আগুন, এসব দেখে তাবা যেন এক পবীব বাজ্যে চলে গেল। তারা হাসল, তাবা স্বাভাবিকভাবে চলতে গিয়ে সর্পগতিতে এগিয়ে গিয়েছিল।

যদিও যূথী প্রশ্ন কবতে গিয়ে চুপ, তারা দুই বোন বাবু হয়ে বসে, বাপের জন্যেও একটা জায়গা করেছে, এমন সময় খানিক সুস্থ আওয়াজ। মেয়ে দুটি 'বাবা! বাবা!' বলে উঠে গিয়েছিল।

'আজ খুব বরাত ভাল---চাল পেয়েছি', বলে এক পকেট থেকে চাল বাব কবল। 'একি চাল কোথায় ..'

'বলছি,— তোমাব শরীব ..'

'জ্বর নেই—পাঁচটা টাকাও পেয়েছি '

'বেশ বেশ .. আর দেরি কবো না, বসে পড়ো।'

গবম ভাতের সামনে বসে ব্রজব নিজেকে মানুষেব মতো মনে হল, এবং প্রীতিলতাবে তারিফ করবার জন্য বলেছিল, 'হ্যাঁ কোথায পেলে .'

এ কথার উত্তর প্রীতিলতা প্রস্তুত কববার জন্য ডালভাতেব ন্যাকড়াটাব গিঁট খুলবাব জন্য একটু ঘুরে বসতেই . ব্রজ তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন কবলে, 'ওমা তোমার পাছাব কাছে রক্ত

এ কথার সঙ্গে সঙ্গে প্রীতিলতা ঘুবে বসেই শুনলে, লতি বলছে, 'জানো বাবা বুডোটা মরে গেছে ...'

প্রীতিলতা যুগপৎ বলেছিল, 'কী যে অসভ্যতা করো এদের সামনে, জানো না কিসের রক্ত —নোংবা' বলেই থেমে গিযে জিব কাটল।

ব্রজ দুবার 'ও ও' বলেই কেমন যেন থ হয়েছিল।

'নে খা-না তোরা', প্রীতিলতা দমকা আওযাজ কবে বলেছিল। অনন্তর গবম ভাত পাওয়ার জনাই হোক, অথবা অন্য কোনও কারণেই হোক, একটু সোহাগ-খোরাকি গলায় বলেছিল, 'বুড়োর জন্য মন খারাপ করছে .. খেতে ইচ্ছে হচ্ছে না ..'

বাঘের বাচ্চা

সরোজ দত্ত

হঠাৎ লোকটা থমকে দাঁড়াল। একটা সুঁদরী গাছের ডালে কতকগুলো বানর ও পাখীর অস্থিরতা দেখে লোকটা কিছুক্ষণ আগেই সাবধান হয়েছিল, একবার ভেবেছিল ফিরে যায় কিন্তু কালকের গুছিয়ে রেখে যাওয়া জ্বালানী কাঠের লোভ সম্বরণ কবা সম্ভব হয়নি, তাই অতি সন্তর্পণে চোখ কান খোলা রেখেই সে অগ্রসর হচ্ছিল, হঠাৎ একটা শব্দ কানে আসতেই সে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর যা চোখে পড়ল তাতে তার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল।

শীতের সকাল। বড়জোর ন'টা হবে। অরণ্য শব্দহীন। ঠেলাঠেলি সুন্দরী গাছের ফাঁক দিয়ে রোদ এসে পড়েছে একটু ফাঁকা পরিষ্কার জায়গায়। সেখানে চারপায়ে উবু হয়ে বসে একমনে হরিণ মেরে খাচ্ছে বাঘ। না, বাঘ নয় বাঘিনী। লোকটা যেখানে দাঁড়িয়ে পড়েছিল সেখান থেকে বড় জোর পঞ্চাশ গজ দূরে।

লোকটাব নাম কলিম গাজী। বাদাব মানুষ সে। বাঘ তার অপরিচিত নয়, জীবনে বাঘে মারা বা বাঘে ধবা লোক সে কম দেখেনি। একরকম বলতে গেলে বাঘ নিয়েই তাদের বাস। তবু এভাবে বাঘের মুখোমুখি জীবনে সে হয়নি। প্রথমটা ভয়ে সে একেবারে কাঠ হয়ে গেল। এগুতে এগুতে এত কাছে এসে পড়েছে যে, এখন পিছু হটার মৃদুতম শব্দেও যদি বাঘ মুখ তুলে চায় তাহলেই সর্বনাশ। যখন সমস্ত চিন্তাশক্তি জড়ো করেও সে পালানোর কোনো উপায় বের করতে পারলো না, তখন পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ একাগ্র দৃষ্টিতে জানোয়ারটাকে সে লক্ষ করতে লাগল। তারপর এক সময় আঁৎকে উঠল কলিম গাজী। কি সর্বনাশ! বাঘিনীতো একা নয সঙ্গে বাচ্চা। একটা মায়ের লেজ নিয়ে খেলা কবছে, আর একটা ঘুর ঘুর করে বেড়াচ্ছে মায়ের বুকের একপাশে।

বিদ্যুৎ-চকিতের মত একটা কথা মনে পড়ে গেল কলিম গাজীর, গত সনের আগের সনে যখন সে খুলনায় গিয়েছিল একটা ফৌজদারী মামলার সাক্ষ্য দিতে, কথায় কথায় উকীল যদু চৌধুরী তাকে বলেছিলেন, বাদাব জঙ্গল থেকে একটা বাঘের বাচ্চা যদি কেউ তাকে ধরে এনে দিতে পারে, তবে তৎক্ষণাৎ নগদ পঞ্চাশ টাকা দাম দিয়ে তিনি সেটা কিনে নেবেন। খুলনা কলিম গাজী ভাল চেনে না। ষাট বছরের জীবনে মাত্র দু'বার সে সেখানে গেছে। প্রথম বার মাছের নৌকো নিয়ে গিয়েছিল, ডাঙ্গায় ওঠেনি, দ্বিতীয়বার গিয়েছিল সাক্ষ্য দিতে। কিন্তু উকীল যদু চৌধুরীর বাড়ী তার ভুল হবে না। নদীর পাড়েই বাড়ি, বাড়িব সামনেই একটা কাঁঠাল গাছ আছে। সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে কাছারি ঘরের বারান্দায় বসে গাজীকে বলেছিলেন যদু চৌধুরী. শেখের পো, দেখতো পারো কিনা, বাদা থেকে একটা বাঘের বাচ্চা আমায় এনে দিতে। নগদ পঞ্চাশ টাকা দাম দেব তোমায়। কলিম অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, বাঘের বাচ্চা দিয়ে কি করবেন উকীলবাবু, পুষবেন? হেসে উঠেছিলেন যদু চৌধুরী. আরে না। কলকাতায় বড় বড় জানোয়ারের কারবারী বহু আছে, বাদার বাঘের বাচ্চা পেলে ওরা লফে নেবে। জাত বাঘ কিনা, দুনিয়ার সেরা বাঘ বলতে পার।

পঞ্চাশ টাকা। পঁয়ত্রিশ টাকায় বন্ধকী জমিখানা খালাস করেও হাতে থাকবে পনেরো টাকা। পাঁচ টাকা দিয়ে ভাঙ্গা নৌকাখানা সারিয়ে নেবে কলিম গাজী। নৌকার জন্য আর সে পরের হাতে-পায় ধরতে যাবে না। বাকি টাকায় ঘরটা ছাওয়া হয়ে যাবে। আঃ, তা হলে হাঁফ ছেড়ে কিছুটা নিশ্চিন্ত হতে পারবে কলিম গাজী।

মূর্তিমান মৃত্যু ও হিংসার পঞ্চাশ গজের মধ্যে দাঁড়িয়ে জীবন ও শান্তির স্বপ্ন দেখতে লাগল কলিম গাজী।

কলিম গাজীর মনে পড়ল বাঘিনীতো একসঙ্গে চারটের কম বাচ্চা বিয়োয় না। তবে আর দুটো গেল কোথায়? মদ্দা বাঘে খেয়ে গেল নাকি! না আর দুটো কাছেই আছে কোথাও, সে দেখতে পাচ্ছে না? কলিম গাজীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আপাতত বাঘিনীকে রেখে এদিক ওদিক তার বাচ্চা খুঁজতে লাগল। মাত্র কয়েক মুহূর্ত আগে যে মানুষ মৃত্যুর আতঙ্কে প্রায় নীল হয়ে গিয়েছিল, সহসা তারই সর্বাঙ্গে একটা আনন্দের শিহরণ খেলে গেল। সুঁদরী গাছের শুলোর ফাঁকে ফাঁকে এগুতে এগুতে একটা বাচ্চা তারই খুব কাছে এসে পড়েছে, এবং এখনও সেটা এগিয়েই আসছে। আহাররত বাঘিনীর উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ রেখে আস্তে আস্তে কোমরে জড়ানো গামছাটা খুলে নিল কলিম গাজী। ....

মহামূল্য সম্পদ গামছায় বেঁধে নিয়ে কলিম গাজী যখন প্রায় নিরাপদ দূরত্বে এসে গেছে এবং খালের কোলে বাঁধা নৌকোটাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, তখনই এক প্রচণ্ড গর্জনে সমগ্র অরণ্যভূমি থর থর করে কেঁপে উঠল। জঙ্গলে বাঘের ডাক যথেষ্ট ভয়ংকর, কিন্তু শাবকহারা বাঘিনীর ডাক যে কি ভয়ঙ্কর তা যে না শুনেছে তার পক্ষে কল্পনা করাই শক্ত। দ্বিতীয় গর্জনে কলিম গাজী বুঝল, বাঘিনী তার পায়ের দাগ ধরে তাকে অনুসরণ করছে আর অনুসরণ করছে অত্যন্ত দ্রুতবেগে।

বাদার জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আট দশ হাত চওড়া অসংখ্য ছোটবড় খাল জোয়ারের সময় জলে ও মাছে ভর্তি হয়ে যায়। তারই একটা খাল দিয়ে ডিঙ্গি নিয়ে বাদায় ঢুকেছিল কলিম গাজী। গতকাল এক জায়গায় সে শুকনো কাঠ কুড়িয়ে রেখে গিয়েছিল আজ সেগুলো নিয়ে যেতে না পারলে শুধু রান্না নয়, আগুনের অভাবে রাতের শীত সহ্য করাও কঠিন হবে। গামছায় জড়ানো বাঘের বাচ্চা কোলে নিয়ে প্রাণপণে বৈঠা বেয়ে কলিম গাজী যখন নদীতে এসে পড়ল তখন তার মনে হল সে যেন মুক্তির সমুদ্রে এসে গেছে। শীতের শান্ত নদী। কুয়াশা কেটে গিয়ে রৌদ্রে ঝলমল করছে আকাশ। কলিম গাজী আরাম অনুভব করল। তার মুখ দিয়ে বেরুতে যাচ্ছিল 'মার-দিয়া-কেল্লা', কিন্তু হঠাৎ তার হাতের বৈঠা শিথিল হয়ে এল। মাঝনদী দিয়ে পিটেল বা পেট্রোল পুলিসের লঞ্চ যাচ্ছে। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের সাব ইনস্পেক্টর অর্থাৎ বন দারোগার লঞ্চ। একবার যদি ওরা তাকে দেখতে পায়, তবে বেআইনীভাবে রিজার্ভ ফরেস্টে ঢোকার অপরাধে এখনই গ্রেপ্তার করে সদরে চালান দেবে এবং জেল অনিবার্য। না, ওরা তাকে দেখতে পায়নি। লঞ্চটি ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল বাঁধের ওপাশে। গভীর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো কলিম গাজী।

পুঁটুলি নিয়ে কলিম গাজী সরাসরি ঘরের ভেতরে ঢুকে বৌকে ডাকল। বৌ উঠোনে বসে কি যেন করছিল। ডাক শুনে ঘরের ভেতর এসে দাঁড়াল। স্বামীর চোখমুখের ভাব দেখে সে একটু বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল,—ব্যাপার কি? পুঁটলীতে কি?

কলিম প্রায় ফিসফিসিয়ে বলল,—চুপ, বাঘের বাচ্চা।

শুনে বৌ একেবারে হাঁ হয়ে গেল। গেল লোকটা কাঠ আনতে বাদায়, নিয়ে এল বাঘের বাচ্চা।

তারপর যখন কলিম উত্তেজনায় থেমে থেমে বলে গেল কেমন করে সে বাঘিনীর মুখ থেকে বাচ্চা চুরি করে এনেছে, তখন ভয়ে কলিমের বৌ এর মুখ সাদা হয়ে গেল। বল্‌ল,—কি সর্বনাশ, বাচ্চার খোঁজে বাঘ যদি নদী সাঁতরে তোমার বাড়ী আসে রেতের বেলায়।

স্ত্রী-বুদ্ধি সম্পর্কে একটা বিদ্রূপ করে কলিম হেসে উড়িয়ে দিল বটে কথাটা, কিন্তু সম্ভাবনাটা একেবারে মন থেকে মুছে ফেলতে পারল না। ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়েই নদীর ওপারে অরণ্য দেখা যাচ্ছে। ধ্বক করে উঠল কলিমের বুকটা।

কিন্তু পঞ্চাশ টাকার কথাটা কলিম যখন বৌকে বলল, তখন বৌও কেমন যেন বিচলিত হল। বলল,—বগার হাট থেকে একটা ভাল কাপড় এনে দিতে হবে কিন্তু। এ কাপড়ে আর বেরুতে পারিনে।

কলমি হেসে বল্‌ল,—সব হবে।

কলিমেরা স্বামী-স্ত্রী, এই নিয়েই সংসাব, গত সনের আগের সনে একমাত্র ছেলে দিন পাঁচেকের জ্বরে মারা গেছে। কলিমের জমি নেই। সাতক্ষীরের জোদ্দার প্রশান্ত মুখুজ্জের জমিতে সে ভাগচাষ করে, কখনও বা জন খাটে। কিন্তু দুটি প্রাণীব গ্রাসাচ্ছাদন এতেও কুলোয় না।

তাই কলিমকে অনেকের মতই চুরি করে বাদায় ঢুকতে হয়। মাছ, মধু ও গোসাপের চামড়ার গোপন বিক্রীতে কলিমের দু'পয়সা হয়। কিন্তু বাঘের বাচ্চার কথা কোনোদিন কলিম ভাবেওনি। যদি কোনোমতে একবার খুলনায় নিয়ে যাওয়া যায়, তবে সঙ্গে সঙ্গে নগদ পঞ্চাশ টাকা।

বৌকে কলিম বললে,—খবরদার। কাকপ্রাণীতে যদি টের পায় একথা, তাহলে কথাটা নির্ঘাৎ বনদারোগার কানে যাবে। তখন মালও যাবে, জেলও হবে। সর্বনাশ হয়ে যাবে একেবারে।

দুদিন পরে ছক্রোশ দূরে বড় দলের হাট। তেঁতুল তলাব চর থেকে অনেকগুলো নৌকা যায় ঐ হাটে। ঐ একখানায় কোনো মতে বাচ্চাটাকে লুকিয়ে হাটে নিয়ে যেতে পারলে, ওখান থেকে হেঁটে খুলনায় যাওয়া যাবে। কিন্তু পরের নৌকায় লুকিয়ে এ মাল নিয়ে কেমন করে যাওয়া যায়, অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় পড়ল কলিম গাজী। উপায় নেই, যার নৌকায যাবে, তাকে বলতেই হবে। হয়ত কিছু চেয়েও বসবে সে। কিন্তু উপায় নেই।

পঞ্চাশ টাকা। ঘরে চাল নেই, একফোঁটা জমি নেই, নৌকো নেই, গরু নেই, মেয়ে মানুষের ইজ্জত ঢাকবার মত একটুকরো কাপড় ... নেই। এর মধ্যে পঞ্চাশ টাকা।

আশ্বিনের অমাবস্যার রাত্রি। অন্ধকারে ঢেকে গেছে তেঁতুলচরার চর নদী ও নদীর ওপারের বাদাবন। ঘরের মধ্যে পঞ্চাশ টাকার বিপজ্জনক মাল বুকে আঁকড়ে আতঙ্কে উদ্বেগে বিনিদ্র রজনী যাপন করছে সুন্দরবনের নিঃস্ব চাষী ও তার জীবনসঙ্গিনী। মাল নিয়ে একবার খুলনায় পৌঁছুতে পারলে হয়, জমি হবে, নৌকা হবে, চাল ছাওয়া যাবে, চাই কি একখানা কাপড়ও হয়ে যেতে পারে বৌয়ের।

হঠাৎ অরণ্য কাঁপিয়ে মেঘের ডাকের মত ডাক শোনা গেল। ওপারের বাদায় বাঘ ডাকছে। প্রতি অমাবস্যা-পূর্ণিমার রাত্রে এ ডাক শুনতে তারা অভ্যস্ত। তবু আজ তারা কেঁপে উঠল। একি সেই শাবকহারা বাঘিনীর ডাক? কে জানে?

সকালে উঠোনের রোদে বসে কলিম গাজী তামাক খাচ্ছিল। একজন এসে খবব দিল বন দারোগা এসেছে তেঁতুলতলার ঘাটে। তাকে ডাকছে। হুঁকোটা রেখে গামছাটা নিয়ে

বাড়ীর বাইরে পা দিতেই কলিম দেখে, বনদারোগা জনছয়েক সেপাই নিয়ে স্বয়ং এসে উপস্থিত। কলিম নত হয়ে সেলাম জানাতেই জিজ্ঞেস করলেন,—কাল বাদা থেকে বাঘের বাচ্চা ধরে এনেছিস তুই?

কলিম সহজ কণ্ঠে বলল,—ধরেছিলাম আবার ছেড়ে দিয়ে এসেছি।

দারোগা বলল,—সত্যিকথা বলছিস?

কলিম বলল,—বিশ্বাস না হয় আমার ঘর তল্লাশ করে দেখেন।

কথা হচ্ছিল উঠোনে দাঁড়িয়ে। কলিমের কথা শুনে দারোগা কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর চোখ দিয়ে ইসারা করতেই একজন সেপাই লাফিয়ে উঠে গেল কলিমের ঘরের ভেতর এবং কিছুক্ষণ পরেই বেরিয়ে এল একটা ছোট বেড়ালের মত জানোয়ারের ঘাড়ের চামড়াটা হাতের দুই আঙ্গুলে আটকে তুলে ধরে। সঙ্গে সঙ্গে একটা বুকফাটা আর্তনাদে উঠোনটা যেন কেঁপে উঠলো। কলিমের বৌ আছড়ে পড়েছে দারোগার পায়ের উপর।

এবারের মত মাপ করেন দারোগাবাবু, ও জেলে গেলে আমি যে না খেয়ে মরে যাব।

থানা থেকে কলিম গাজী যখন ফিরে এল তখন বেলা বেশী নেই। বুকে পিঠে সর্বত্র প্রহারের দাগ, সারা গা ফুলে উঠেছে। তেষ্টায় তার ছাতি ফেটে যাচ্ছে, আর সে দাঁড়াতে পারছে না। দারোগা দয়া করে তাকে চালান দেননি, শুধু চোরাই মালটা কেড়ে রেখেছেন থানায়। মরিয়া হয়ে একটু আপত্তি করতে গিয়েছিল কলিম, তারই ফল সর্বাঙ্গে বহন করে ফিরে এসেছে।

ঢক ঢক করে একঘটি জল গলায় ঢেলে দিয়ে দাওয়ার একপাশে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ল কলিম। রাত্রে ভাত খাবে কিনা জানবার জন্যে বৌ ডাকলে কয়েকবার। সাড়া পেলনা। ক্রমে কালকের মতই সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল বাদার চরে ও অরণ্যে এবং শুরু হল কালকের মতই নদীর ওপারে আবার সেই বাঘের ডাক। কিন্তু কলিম গাজী তখন জ্বরে বেহুঁশ।

ওদিকে বনদারোগার সুরক্ষিত কোয়ার্টাসে রান্নাঘরের বারান্দায় বসে দারোগার মেয়ে তখন বাঘের বাচ্চাকে ঝিনুকে করে ছাগলের দুধ খাওয়াচ্ছে এবং দারোগা মোজাম্মেল চৌধুরী ইজিচেয়ারে শুয়ে তাই দেখছে আর ভাবছে, বাঘটা জেলার সাহেব-ম্যাজিস্ট্রেটকে উপহার পাঠালে কেমন হয়?

প্রতিভূ

প্রতিভা বসু

একদিন সন্ধ্যাবেলা এক ভদ্রমহিলা বেড়াতে এলেন আমাদের বাড়ি। মাথার চুল এতো সাদা হয়ে গেছে যে, প্রথমটায় চিনতে পারিনি, একটু পরেই, ও, আপনি? বলে তাড়াতাড়ি আদর-যত্ন করে বসালাম, কক্ষান্তরে গিয়ে চায়ের জল চাপাতে বলে মিষ্টি আনতে দিলাম।

মহিলাটি বললেন, প্রায় দশ বছর বাদে, না?

আমি বললাম, তা তো হবেই।

তোমার চেহারা তো ঠিক আগেব মতোই আছে।

হেসে বললাম, আপনার চুল ছাড়া আপনি প্রায় তেমনি আছেন।

ঠিক তেমনি?

পাড়-ছাড়া কাপড়ে অবশ্য এই প্রথম দেখছি।

বড়ো ছেলের বিয়ে দিয়েই এটা ধরলাম। তারপরে বুলির বিয়ে হলো, রঞ্জনের বিয়ে হলো—

সবাই কলকাতায় আছে তো?

কেউ না। আমি নিতান্তই নিঃসঙ্গ। দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন, ছোট্ট একটা বাড়ি করেছি নিউ আলিপুরে, একা থাকি।

ওঁরা কে কোথায় আছেন?

বড়োটি পুণায়, ছোটটি জলপাইগুড়ি, মেয়ে দিল্লিতে।

সবাই দেখছি খুব দূরে দূরে। যান না মাঝে মাঝে?

যাই, কিন্তু থাকি না।

ঘুরে ঘুরে থাকলে পারেন, তা হলে এতো একা একা লাগে না।

একটু হাসলেন। যাদের নতুন জীবন, নতুন সংসার, পুরোনো মানুষ সব সময়েই সেখানে অবান্তর। এক গ্লাশ জল দেবে?

নিশ্চয়ই।

জল এনে দিলাম। খেয়ে গ্লাশটা নামিয়ে রাখতে রাখতে বললেন, তোমার 'সঙ্গসুধা' গল্পটা আমি পড়েছি।

বলামাত্রই আমার ত্রাস হলো, জানি, এরপর তিনি কী বলবেন।

তোমার তো ঐ একটাই বিষয়— প্রেম।

আপনার জন্য চা করে নিয়ে আসি—আমি ওঠবার চেষ্টা করেছিলাম, তিনি বসিয়ে দিলেন, চা পরে হবে, কিন্তু কথাটা হচ্ছে এই যে, গল্পটায় তুমি যা লিখেছ তা কি সত্যি বিশ্বাস করো?

আমি আমতা আমতা করছিলাম। আমার লেখা নিয়ে চিরকাল আমি এঁর কাছে তিরস্কৃত। অনেকবার অনেক গল্প বা উপন্যাস পড়ে উত্তেজিত হয়ে তিনি ছুটে এসেছেন, মুখ লাল করে বলেছেন, হাজার হোক, তুমি তো একজন মেয়ে, তোমার হাত দিয়ে কী করে এই সব অসংগত অন্যায় ভালোবাসার গল্প বেরিয়ে আসে, ছি! এ রীতিমতো সমাজবিরোধী কাজ, কতো মেয়ের এতে চরিত্র নষ্ট হতে পারে তা তুমি জানো?

আমার মুখটা তখন বোকা-বোকা হয়ে গেছে।

ভুরু কুঁচকে বলেছেন, মনে হয় তোমার জীবন খুব মসৃণ নয়, সত্য করে বলো দেখি কতো পুরুষের সঙ্গে প্রেম করেছ?

মিনমিন করে বলেছি, গল্প তো গল্পই, তার সঙ্গে কি নিজের জীবনের মিল থাকে কোনো?

থাকে। নিশ্চয়ই থাকে। অন্তত তোমার গল্প পড়লে নিশ্চিত বোঝা যায় সেটা। নইলে অত খুঁটিনাটি জানো কী করে? নায়ক-নায়িকার সংলাপ পড়তে পড়তে তো মনে হয় কাগজের পাতা থেকে বুঝি এখুনি উঠে আসবে। এ বয়সে আমাদেরই বুক কাঁপে।

সাহসভরে হাসি হাসি মুখ করে বলেছি, তাহলে বলুন ভালো লাগে আপনার, নইলে বুক কাঁপবে কেন?

ঐ জন্যেই তো বলছি নিজের অভিজ্ঞতা না থাকলে কেউ ও রকম লিখতে পারে!

ঠাট্টা নয়, আমার ধারণা উনি সত্যি আমাকে কখনো বোধ হয় খুব সচ্চরিত্র বলে ভাবতেন না। তবু আমি ভালবাসতাম এই মহিলাটিকে। এক সময় আমরা প্রতিবেশী ছিলাম বয়সে অনেকটা বড়ো হওয়া সত্ত্বেও অদ্ভুত একটা বন্ধুভাব সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলাম। অল্প বয়সের বিধবা, কিছুটা যে পিউরিটান হবেনই এ তো ধরাধার্য, কিন্তু তার বাইরে- সঙ্গটা অতি লোভনীয় ছিলো। অনেক বই পড়তেন, রসিকতা করতেন, নিজের দুঃখ বেদনা নিয়ে কখনো অন্যকে এতোটুকু বিব্রত করতেন না। থাকতেন ভায়েদের সংসারে, একমাত্র মোছামোছা পাড়ের শাড়ি পরা ছাড়া আর অন্য সব বিষয়েই বৈধব্যে নিষ্ঠাবতী ছিলেন। দেখতে সাধারণ হলেও শ্যামলা রংয়ের উপরে সুন্দর একটা সহজাত লালিত্য ছিলো।

পাড়া বদলে আসার পরও আসতেন তিনি, এবং যখনি আসতেন তখনি বুঝতাম কপালে আছে কিছু। কেননা লক্ষ্য করে দেখেছি, যতোবারই এসেছেন, কোনো লেখা পড়ে উত্তেজিত হয়েই এসেছেন। এসেই তীবন্দাজ হয়ে শেলবিদ্ধ করেছেন। আমি রাগ করিনি, ওঁর পছন্দমতো বেশি দুধ চিনি দিয়ে চা করে উত্তেজনা প্রশমিত করেছি। তারপর লেখার প্রসঙ্গ চুকে গেলেই অন্য মানুষ।

সেদিনও চা মিষ্টি দিয়ে মুখ মিষ্টি করতে তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলুম। দশ বছর বাদে হলেও ভয় পেলুম। প্রবল ঢেউটা সামলাবার জন্য অপেক্ষা করছিলুম। বললেন, বিলিতি স্ত্রী-পুরুষ নিয়ে তোমার আরো অনেক গল্প আমি পড়েছি, কিন্তু এদের একেবারে চরমে নিয়ে পৌঁছে দিলে? শেষে একজন ষাট বছরের মহিলা একজন পঁয়ষট্টি বছরের বৃদ্ধকে বিবাহ করলো?

কান চুলকিয়ে বললুম, ঐ আর কী, এই বয়সে বিবাহের মানে তো—

একজন সঙ্গী, এই তো?

ঠিক তাই।

আমার মুখের দিকে অনেকক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে থেকে বললেন, তোমরা কদ্দিন বিদেশে ছিলে!

বললুম, তা মন্দ কী। বছর তিন-চার তো হবেই।

অনেক সাহেব-মেমদের সঙ্গেই নিশ্চয় বন্ধুতা হয়েছে?

তা তো হয়েইছে।

এ-রকম দেখেছ বুঝি?

দেখেছি।

তা হলে আমার বয়সী মহিলাও সেখানে বিয়ে করে?

আপনার বয়সী একজন বন্ধুকে নিয়েই আমার ঐ গল্প।

বলেই ভয়ে-ভয়ে তাকালাম।

ভদ্রমহিলা হাসলেন, এখন আর কী করে বলি এটাও তোমার জীবনের গল্প। তোমার তো সে বয়েসে আসতে ঢের দেরি।

এই সময়ে আমার গৃহসেবিকা চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে ঘরে ঢুকলো। আমি নিচু হয়ে চা ঢালতে লাগলাম। তিনি বললেন, দ্যাখো, আমি কিন্তু তোমার একজন ভক্ত পাঠিকা।

অ্যাঁ। হাত থেকে চা প্রায় ছলকে পড়েছিলো।

তোমাকে আমার একটা গল্প বলতে ইচ্ছে করছে।

বলুন না।

গল্পটা ব্যক্তিগত। শেষ বয়সের একটা স্বীকৃতিমাত্র। বিরক্ত লাগলে বোলো, থামিয়ে দেব।

আমি উৎসুক হলাম।

এক চুমুক চা খেলেন, থেমে থেকে বললেন, জানো তো সারাটা জীবন কীভাবে কাটালাম। স্বামী যখন মারা যান, আমার বয়েস মাত্র তেইশ। তার মধ্যেই তিন সন্তানের জননী। ম্যাট্রিক পাশ করে বিয়ে হয়েছিলো, তারপর তো সব শিকেয় উঠেছে। স্বামী টাকাকড়ি কিছুই রেখে যেতে পারেননি, একটা লাইফ ইনসিওর করবো করবো ভাবছিলেন, ভগবান তার আগেই তুলে নিলেন। কাজেই শ্বশুর ভাসুর তৎক্ষণাৎ অলক্ষ্মী বলে বাপের বাড়ি ঠেলে দিলেন, আমিও বাপহীন বাপের বাড়িতে গিয়ে দুই দাদার গলগ্রহ হয়ে বসলাম। বলাই বাহুল্য, কেউ আমাকে আদর করে জায়গা দেয়নি, নিতান্ত ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে পারেনি বলেই থাকতে দিয়েছে। খাওয়া বিষয়েও ঠিক তাই। আমার আর কী! আমি তো একটা বিধবা মানুষ, মায়ের ভাতের সঙ্গে দুটি ভাত আর কিছু সেদ্ধ, তার উপরে উপোস-কাপাস তো লেগেই আছে, কিন্তু মুশকিল হতো বাচ্চাদের নিয়ে। তারা তো আর আমার মতো খিদে হজম করে থাকতে পারতো না? কাঁদতো। ছোটটাকে বুকের দুধেই ক্ষুন্নিবৃত্তি করাতে চেষ্টা করতাম, বোঁটা টেনে ছিঁড়ে ফেলেও এতোটা খাদ্য সে পেতো না যাতে তার ঐ ছোট্ট পেটটুকুও ভরানো যায়।

আমি কারো দোষ দিচ্ছি না, সত্যি তো আমার পরিবার নেহাৎ ছোটো নয়? তিনটে বাচ্চা, একটা মা, চারটে পেট, ওঁরাই বা পারবেন কেন? সেজন্য আমি দিনরাত খাটতাম, ভাবতাম কাজের লোকটিকে তুলে দিলে সেটুকু তো ওদের সাশ্রয় হবে? তার মাইনেটা তো বাঁচবে। আর সে একা যা খেতো, তাতে আমাদের চারজনের পেট ভরে যাবে। আমার বড়ো ছেলেটা তখন পাঁচে পা দিয়েছে, মেয়েটা তিন, আর ছোট ছেলে মাস দশেকের।

কিন্তু তাতেও খুব সুরাহা হলো না, আমি কাউকেই খুশি করতে পারলাম না। অতিষ্ঠ হয়ে শেষে কাজের চেষ্টায় বেরুলাম। আমার মতো একজন যুবতী মেয়ের বেরুনো নিয়েও আপত্তি উঠেছিলো, সেটা আমি মানিনি, কেননা মানবার কোনো উপায়ই ছিলো না। ইস্কুলে ইস্কুলেই ঘুরতাম, আমাদের সময়ে ভদ্র মেয়েদের ঐ একটা পেশাই মাত্র ছিলো। আমি সেখানে একটা আয়ার কাজের জন্যও চেষ্টা করেছিলাম, হয়নি। একদিন দৈবাৎ একজন

লাইফ ইনসিওরেন্সের ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। এই ভদ্রলোকই আমার স্বামীকে ইনসিওর করতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

আমার দুঃখ-দৈন্য দেখে, সব শুনে উনি আমাকে ওঁদের কোম্পানিতে এজেন্ট হবার পরামর্শ দিলেন। সেই এজেন্সি নিয়ে পরিচিত, অর্ধ-পরিচিত, অপরিচিত, আত্মীয়-কুটুম্ব বন্ধুবান্ধব, কোনো দরজাতেই ধরনা দিতে বাকি রাখিনি। সে যে কী কষ্ট, কী অপমান, আমি কেমন করে বোঝাবো! শেষে আমাকে দেখলে লোক আঁতকে উঠেছে। আমার গলায় দড়ি দিয়ে মরতে ইচ্ছে করতো, কিন্তু ঐ তিনটি পেটের শত্রুই তো ছিলো আমার আসল দড়ি, আমি আর পালাবো কোথায়?

এই করে করেই দু-চার বছরে আয় হতে লাগলো কিছু। অন্তত আমাদের খোরাকিটা আমি ভালোভাবেই আমার বউদিদের হাতে তুলে দিতে পারতাম। কিন্তু তাতেও তাঁরা সন্তুষ্ট ছিলেন না। বলতেন, জাতও গেছে পেটও ভরে না এমন কাজ করে লাভটা কী? দুঃখের সঙ্গী এক বৃদ্ধা মা, কিন্তু তাঁর আর কতোটুকু ক্ষমতা? তিনিও তো পরাধীন।

এই পাথারে ভাসতে ভাসতেই হঠাৎ একজন মানুষকে আমি একদিন ভালোবেসে ফেললাম।

আপনি ভালোবেসেছিলেন! আমি প্রায় চমকে উঠলাম এ কথা শুনে।

প্রায় ষাট বছর বয়সের মহিলাটি তাঁর চেয়ে অনেক কনিষ্ঠ আমার দিকে অপবাধী দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, খুব কি অন্যায়? খুব কি অসম্ভব? তুমি তো এই, আমাদের মতো দুঃখিনীদের জীবনকেই আলোতে নিয়ে যাও। ভালোবাসার সত্তা নিয়েই তো তোমার কারবার, বলো, সে কি ভয়ানক একটা অবাস্তব ঘটনা আমার পক্ষে? জগৎ-সংসার থেকে আমি কতোটুকু পেয়েছি? বিয়ে হয়েছিলো ষোলো বছর বয়সে, তার পরের সাত বছরে এক দমকে তিন সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে, কোন সুখের অমরাবতীতে আমি বাস করছিলুম?

তাইতো।

মানুষটির সঙ্গে আমার খুব অদ্ভুতভাবে চেনা হয়েছিলো। বোঝোই তো যে কাজ আমি নিয়েছি তাতে কেমন তাকে থাকতে হয়? সারাদিন কেবল কাকে ধরি আর কাকে ধরি এই চিন্তা। আসন না পেয়ে একদিন ট্রামে এই ছেলেটি লেডিস সীটে আমার পাশে বসেছিলো, চেহারাটি বেশ শিক্ষিত শিক্ষিত, চোখে মুখে বুদ্ধির ছাপ। একটু তাকিয়ে কেমন মনে হলো এর সঙ্গে একটা ছুতো ধরে পরিচয় করলে হয়। বয়েস অল্প আছে — ধরাপড়া করলে একটা ইনসিওর করলেও করতে পারে। কিন্তু কীভাবে আলাপটা শুরু করা যায় ভেবে পাই না। হঠাৎ গুরুগম্ভীর আওয়াজে সে নিজেই বললো, আমার জন্য আপনার বসতে অসুবিধে হচ্ছে না তো?

আমি বিগলিত হয়ে বললাম, কী আশ্চর্য! অসুবিধে কেন হবে?

সে বললো, অন্যমনস্কভাবে আপনার অনুমতি না নিয়েই বসে পড়েছিলুম।

বলতে যাচ্ছিলুম, তাতে কী হয়েছে? তার আগেই সে আমার দিকে ফিরে তাকালো, আমিও তাকালুম, সঙ্গে সঙ্গে বুকটা কেঁপে উঠলো আর মনে হলো আমার একটা সর্বনাশ হয়ে গেল।

সর্বনাশ কেন?

সর্বনাশ নয়? আমি বিধবা না? আমার তিনটে বাচ্চা আছে না? পাপ-পুণ্য বলে একটা কথা আছে না?

পাপ-পুণ্য!

নিশ্চয়ই। আর তো কোনোদিন একরকম হয়নি? কতো তো ঘুরে ঘুরে কাজ করি। তাড়াতাড়ি রাস্তা দেখতে লাগলাম। বুকটা তখনো ধ্বকধ্বক করছিলো। সেই আমার জীবনে প্রথম প্রেম অথবা প্রথম পাপ।

আমি হেসে বললাম, পাপ তো নয়ই, প্রথম প্রেমও নয়, তার আগে নিশ্চয়ই স্বামীর সঙ্গে প্রেম ছিলো?

তা ছিলো। তিনিও হাসলেন, তবে সে ছিলো জুটিয়ে দেয়া প্রেম। অবশ্য তাও কম খাঁটি ছিলো না। আমার স্বামীকে আমার খুব ভালো লেগেছিলো, কিন্তু তার মধ্যে তো কোনো বাধা-বিরোধ ছিলো না। আমার ধর্মই ছিলো তাঁকে ভালোবাসা। প্রকৃতপক্ষে এই ধরনেব মিলন একটা বাধ্যতামূলক ঘটনা মাত্র। ঐ বয়সে স্ত্রী-পুরুষ মিলিত হলে শরীরে তো আগুন ধরবেই! অন্তত কয়েকদিন পর্যন্ত সে-আগুনেব তাপ ঊর্ধ্বমুখী থাকবেই। সেখানে মনের চেয়ে দেহের প্রশ্নই বেশি। আর তারপরে দুটো মানুষের স্বার্থসংঘাত, সন্তান, একত্র বসবাস সবটা মিলিয়ে এমন একটা আলাদা জগৎ তৈরি হয়ে যায় যে, সেটা প্রায় অবিচ্ছেদ্য হয়ে ওঠে। বলো ঠিক কিনা?

আমি মনে মনে অতীতের সেই শুচিবায়ুগ্রস্তা বিধবাটির সঙ্গে এই মহিলাটিকে মেলাবার চেষ্টা করতে করতে বলি, একদিক থেকে সে তো ঠিকই।

তিনি চশমার কাচ মুছলেন। চা শেষ করলেন। বসবার ভঙ্গি বদলে নিয়ে বললেন, আসলে ভবিতব্য কেউ ঠেকাতে পারে না। মানুষের সাধ্য আর ভগবানের সাধ্য তো এক নয়? তিনি যা করেন তা হতেই হয়। সেদিন ওর সঙ্গে আমার যোগাযোগ হবারই দিন ছিলো, নইলে আমি যেখানে নামলাম, সেও কেন সেখানে নামলো?

আমি বললাম, ওটা বোধহয় উনি ইচ্ছে করেই নামলেন।

না। মোটেও না। মহিলা মাথা ঝাঁকালেন, সে আমাব আগেই নেমেছিলো, ফিবেও তাকায়নি। কিন্তু খুব আশ্চর্য যে, সে যে গলিতে ঢুকলো, আমাবও সেই গলিতেই কাজ ছিলো। একটু দূবে গিয়ে একটা একতলা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে এই প্রথম সে আমাকে লক্ষ্য কবলো। আমাব রকমসকম দেখে জিজ্ঞেস করলো, কোনো বাড়ি খুঁজছেন নাকি?

অপ্রস্তুতভাবে বললাম, হ্যাঁ।

এখানকার নম্বর বড় গোলমেলে। কার বাড়ি বলুন তো?

চোদ্দোব-এক মহিমারঞ্জন সেন।

ও, মহিমবাবু। কিন্তু ওঁরা তো কেউ নেই এখানে, ওঁর মৃত্যুব পরে ওঁর পরিবার তাঁর পিত্রালয়ে চলে গেছেন।

মহিমবাবু মারা গেছেন? আমি একেবারে থ। দিন কয়েক আগে এই নাম-ঠিকানা আমার এক আত্মীয়া আমাকে দিয়েছিলেন, বলেছিলেন, মস্ত চাকরি করেন, নিজের দুঃখ-দুর্দশার কথা বলে তেমন ধরে পড়তে পারো, বেশ মোটারকম ইনসিওর করবেন দেখো। ছোটো ছেলেটাব অসুখ ছিলো, আসতে পারিনি, এর মধ্যেই মরে গেল লোকটা। আমি একেবারে শোকের পাথারে ভেসে গেলাম।

ছেলেটি বললো, আপনার আত্মীয় ছিলেন?

বললাম, না।

বন্ধু?

তখন বললাম, দেখুন, আমি ইনসিওরেন্সের এজেন্সি করি, উনি করবেন এরকম একটা খবর পেয়ে এসেছিলাম, এই মৃত্যু আমি কল্পনাও করতে পারিনি।

হার্টস্ট্রোকে মারা গেছেন। ছেলেটি বেশ ভারভারিক্কি। কোন্ কোম্পানিতে আছেন আপনি?

জেনারেল।

ও, জেনারেল, আমার এ আত্মীয় আছেন সেখানে, আমার কাছে এসেছিলেন একদিন।

আপনি করবেন? আমি আশান্বিত চোখে তাকালুম মুখের দিকে। আবার সেই অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। আবার আমি চোখ সরিয়ে নিলাম। আবার বুকটা কাঁপলো।

ছেলেটি তার স্বভাবসুলভ গম্ভীর ভঙ্গিতে জোর দিয়ে বলল, করবো।

আমি ঢোঁক গিলে ফেললাম, তা হলে কি আমি একদিন আসবো? আপনার ঠিকানাটা—

এই তো আমার বাড়ি, আপনি ইচ্ছে করলে এখনো আসতে পারেন।

দেখলাম তার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েই কথা বলছিলাম আমরা। চট করে একজন অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে অপরিচিত ঘরে ঢুকতে প্রথমে আমার দ্বিধা হয়েছিলো। অল্প বয়সের বিধবা, কতো পুরুষের কতো জঘন্য লোভের হাত থেকে রক্ষা পেতে পেতে এই বয়সে এসে পৌঁচেছি। কাজেই ভয়টা অমূলক ছিলো না। সে কড়া নাড়লো না, তালা খুললো, সহজভাবে বললো, আসুন।

আমি সম্মোহিতভাবে তাকে অনুসরণ করলাম। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটি ঘর, ঘরটি বড়ো, এক কোণে বসবার ব্যবস্থা, অন্য কোণে একটি খাটে ঢাকা বিছানা। মাথার কাছে লেখাপড়ার টেবিল।

বসুন, বলে ভিতরে চলে গেল। ফিরে এলো তক্ষুণি—বললো, চা খান একটু।

আমি সন্ত্রস্ত হয়ে বললাম, না, না।

সে বললো, ব্যস্ত হবেন না, চা-টা আমিই খাবো, আপনি সঙ্গ দিলে খুশি হবো এই পর্যন্ত। সিগারেট খেতে পারি?

নিশ্চয়ই।

এখন বলুন, আপনার নিয়মকানুন, আমি কিন্তু খুব বেশি করতে পারবো না।

কতো? খুশিতে আমি থর থর করছিলাম।

ধরুন হাজার দশেক। পনেরো পর্যন্তও হতে পারে।

আমি চুনোপুঁটি, সারাদিন ঘুরে ঘুরে সাধ্যসাধনা করে একটা লোককে পাঁচ হাজারে বাগাতেই নাকের জলে চোখের জলে এক হয়ে ঘরে ফিরি, আর লোকটা এক ডাকে পনেরোও হতে পারে বলে দিল। থতমত খেয়ে গিয়েছিলাম। তারপরেই সামলে নিয়ে নিস্পৃহ মুখে দালালির মুখস্থ বিদ্যেটা ঝেড়ে দিলাম।

চুপ করে শুনে নিয়ে বলল, কবে আসবেন বলুন, আমি প্রস্তুত থাকবো।

আমি ভাবলাম শুভস্য শীঘ্রম্। বিচলিত গলায় বললাম, কাল আসবো?

কখন?

যখন বাড়ি থাকবেন।

তবে এই সময়েই আসুন।

গেলাম। শুধু সেদিনই নয় সমস্ত কাজটা নিষ্পত্তি করতে বেশ কয়েকদিনই আসা-যাওয়া করতে হলো। আর সেই আসা-যাওয়াই কাল হলো আমার। কখন যেন বুঝে ফেললাম আর উপায় নেই দেখা না করে।

আমি বিধবা, বয়স্ক, তিন ছেলেমেয়ের মা সবই বলেছিলাম তাকে, তাতে তার কিছুই উনিশ-বিশ হয়নি। আর সত্যি বলতে আমি তো দেখতেও ভালো না? এ-কথাও বলেছিলাম। শুনে তাকিয়ে থেকে নিঃশব্দে অনেকক্ষণ হাসলো, তারপর আস্তে আস্তে বললো, তাই নাকি?

আমি বললাম, ঠাট্টার কথা নয়।

সে বললো, আমিই কি ঠাট্টা করেছি? আমি শুধু বলছিলাম যে, আমার যা পাবার তা আমি পেয়েছি, এখন তোমার বিবেচনা।

বিবেচনা মানে কী জানো? বিবাহ। আসলে সেই সময়ে বড়ো অশান্তিতে ছিলাম। বাড়িতে সব সময়ে ঝগড়াঝাঁটি চলছিলো। ভাইয়ে-ভাইয়ে বনছিলো না, বউয়ে বউয়ে নিত্য কলহ। আর আমি তো একটা জগদ্দল পাথর সকলের কাছে। যদিও সেই সময়ে আমার উপার্জন বেশ ভালোর দিকে যাচ্ছিলো, আমি ভালো টাকাই দিচ্ছিলাম, তবু আমার ছেলেমেয়েকে ওরা দেখতে পারতো না, আপদ-বালাই ছাড়া ভাবতো না, দুঃখের কথা কী বলবো, নিজের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খাওয়াদাওয়া সব কিছুতেই এতো তফাৎ করতো যে, প্রায়ই মনে হতো বস্তিতে গিয়ে থাকি, তবু এদের সঙ্গে নয়। আর মাকে তো একটা মনুষ্য হিসেবেই জ্ঞান করতো না।

এই সব শুনেছিলো বলেই বিয়ের প্রস্তাবটা দিয়েছিলো। বলেছিলো, ঐ নোংরার মধ্যে থেকো না, কষ্টের মধ্যে থেকো না, আমার কাছে, তোমার নিজের সংসারে চলে এসো, ছেলেমেয়ের সব দায়দায়িত্ব আমার। বলো তো প্রতিজ্ঞা করতে পারি যে, তাদের নিয়ে কখনোই তোমার কাছে আমি কোনো বেদনার কারণ হবো না। বরং বিনা চিন্তায় বিনা খরচে তিনটি বড়ো বড়ো সন্তানের পিতা হবো ভাবতে আমার ভালোই লাগছে। আমি ছেলেপুলে ভালোবাসি।

ততোদিনে আমাদের বয়েস আরো দু'বছর এগিয়ে এসেছে। আমি বললাম, কেন তুমি এতোদিন বিয়ে করোনি? তবে তো এই বিপদ তোমার হতো না।

সিগারেটে ধোঁয়ার রিং তুলতে তুলতে বললো, যখন দেখা হয়েছিলে তেত্রিশ পূর্ণ করেছিলাম, খুব কি বেশি দেরি করেছি? তাছাড়া যাকে চাই তাকে পাবো তবে তো বিয়ে?

আমি কেঁদে ফেললাম, শেষে কি এই তোমার পাওয়া? মাথায় হাত রেখে বলল, পরিপূর্ণ পাওয়া।

একটা কলেজে পড়াতো সে, মা-বাবা ছিলো না, কিন্তু তাঁদের রেখে যাওয়া কিছু অর্থবিত্ত ছিলো। আর ছিলো একটি পঙ্গু বোন। ছোটবেলায় পোলিও হয়ে তার পা দুটি অকেজো হয়ে যায়। সারাদিন শুয়ে থাকতে হতো তাকে। এই দাদাই লেখাপড়া শিখিয়ে, গান শিখিয়ে এক ধরনের সহনীয় করে রেখেছিলো তার জীবন। যে বাড়িটিতে থাকতো, নিজেদেরই বাড়ি। পিছনের অংশটায় এক গরিব আত্মীয় প্রায় বিনাভাড়ায় ছিলো। সামনের দু'খানা ঘরের একখানাতে সে নিজে, অন্যটিতে তার বোন।

এই প্রেম আমি অতি সাবধানে লুকিয়ে রেখেছিলাম। নিজেকে সব সময়েই কঠিন শাসনে বেঁধে রেখেছিলাম, কিন্তু বিয়ের প্রস্তাবের পরে আমার মনে হলো, লাথিঝাঁটা খেয়ে পড়ে আছি কিসের আশায়? কী আমি আর পাবো এই সমাজ থেকে? ভাইয়েরাই বা কী দেবে যার বিনিময়ে এই সম্মান আমি প্রত্যাখ্যান করবো। কিন্তু ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে বুক হিম হয়ে যায়। ততদিনে তারা তো বেশ বড়ো হয়ে উঠেছে। পাঁচ বছরের ছেলে বারোতে পা দিয়েছে, তিন বছরের শিশু দশ বছরের বালিকা, ছোটটি পর্যন্ত সাত।

এরই মধ্যে কী করে যেন উড়ে উড়ে এই খবরটা পৌঁছে গেল আত্মীয়-পরিজনদের কানে। দাদা-বউদিরাও শুনলেন, মার কানেও গেল। দপ্ করে জ্বলে উঠলো আগুন, আর সেই আগুন আমাকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দিল। দুটি বালক-বালিকাই জ্বালালো সবচেয়ে বেশি। রাত্রিবেলা একা হয়ে চোখ বড়ো-বড়ো করে বললো, মা, মামীরা বলেছে তুমি নাকি আমাদের ফেলে রেখে একটা লোকের সঙ্গে কোথায় চলে যাবে? একথা শুনে

আমার আপাদমস্তক থরথরিয়ে কেঁপে উঠলো। বড়ো-বড়ো নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে বললাম, মামীরা বলেছে?

ছোটো ছেলেটা শুয়েছিলো, ফট করে উঠে বসলো, কচি-কচি ঘুমগলায় বললো, বড় মামী বলেছে তার নাম সাগর।

কী বলবো তোমাকে, সারারাত আমি আর ঘুমুলাম না। পরের দিন ভোর না হতে উঠেই বেরিয়ে পড়লাম, ফিরলাম একেবারে বাড়ি ঠিক করে। বাড়ি মানে টালিগঞ্জ বস্তিপাড়ায় একটা ঘর, ভাড়া পনেরো টাকা। মাকে বললাম, মা, আমি আর দাদাদের সঙ্গে থাকবো না, তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে?

মা কী খুঁজছিলেন, ভুরু কুঁচকে বললেন, কেন, এখানে থাকলে বুঝি ইচ্ছেমতো জীবনযাপন করা যায় না?

মার কাছে এই জবাব আমি আশা করিনি। চুপ করে থেকে বললাম, এখানে যে কী সুখে আছি তা তো তুমি জানো। কিন্তু নিজের জীবন যে-ভাবেই কাটুক, যাদের জন্য উদয়াস্ত রোজগারের ধান্দায় আমার জিভ বেরিয়ে যাচ্ছে, যাদের মানুষ করে তোলবার আশায় আমি নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছি, তাদের জন্য সরে যাওয়া দরকার।

এবার মা যা খুঁজছিলেন তা পেয়েছেন। একটা পঞ্জিকা।

বৃদ্ধ চোখে মনোযোগ সহকারে সেই পঞ্জিকাব পৃষ্ঠায় একাদশীর তারিখটা দেখতে-দেখতে, নিষ্ঠুর হয়ে বললেন, তাদের জন্যে ঘোরো, না কিসের জন্য ঘোরো কে জানে। মেয়েমানুষেব চরিত্রই হলো আসল, সেই চরিত্রই যার খোয়া গেছে তাব আব ছেলেপুলের কথা ভাববার দরকার কী?

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে নিজের ঘবে চলে এলাম। গুছিয়ে নিলাম জিনিসপত্র, খেলাম না, স্নান করলাম না, চলে এলাম ট্যাক্সি ডেকে।

মা ভাইয়েদের সঙ্গেও ওই শেষ, রমেনের সঙ্গেও ওই শেষ।

কার সঙ্গে? আমি কুঁচকোনো চোখে তাকালাম।

তিনি শান্ত গলায় বললেন, ওঁর নাম রমেন।

সে আমি বুঝেছি, কিন্তু ওর সঙ্গেও শেষ কেন?

তা ছাড়া উপায় কী বলো? আমার ছেলেমেয়েদের জীবন নিশ্চয়ই আমার জীবনের চেয়ে অনেক বেশিই মূল্যবান। তাদের মনে এক ফোঁটা কালিও আমি ঢালতে পারি না।

কিন্তু উনি তো ওদের সব ভারই গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন।

সে চাইতে পারে, কিন্তু ওরা যে ওকে কী ভাবে গ্রহণ করবে তা তো আমি জানি না! তাই অনন্যচিত্ত হয়ে ওদের মানুষ করার চেষ্টায় নিজেকে উৎসর্গ করে কঠিন শৃঙ্খলে বেঁধে ফেললাম। আমার ঠিকানা আর কে জানে? কে আমাকে খুঁজে পাবে এত বড়ো একটা শহরে?

পরিজনদের সঙ্গে এই বিদ্রোহটা করতে পেরে আমি সুখীই হয়েছিলাম। আমার ছেলেমেয়েরাও সুখী হয়েছিল। একটা নিরাপদ স্বাধীন জীবনের স্বাদ পেয়ে ভালো স্কুলে ভর্তি হয়ে, ভালো মাস্টারের শিক্ষা পেয়ে ওরা বেশ যোগ্য হয়ে উঠতে লাগলো। লেখাপড়ায় কেউ খারাপ ছিল না, সময় মতো সবাই ভালোভাবে পাশটাশ করে চাকরিতেও ঢুকলো, বিয়েও করলো, আর কাজ ফুরিয়ে আমিও একা হয়ে গেলাম। এখন শুধু ঘাটের আশায় বসে থাকা।

কথা শেষ করে আমার দিকে তাকালেন ভদ্রমহিলা। আমি বললাম, মা ভায়েদের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন, সে তো উচিত কাজই করেছিলেন, ছেলেমেয়েদের সুশিক্ষা ছাড়া আপনার নিজেরও একটা আত্মসম্মানের দায় ছিলো। কিন্তু ওই ভদ্রলোককে কেন আপনি কষ্ট দিলেন?

মহিলা ঠোঁটে জিভ বুলোলেন, কেশে নিয়ে বললেন, তাঁকে কতোটা কষ্ট দিয়েছিলাম তাতো জানি না, নিজের হৃৎপিণ্ড উপড়ে ফেলতে আমার যে খুব লেগেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ওই তো একজন মাত্রই ছিল যার কাছে আমি চোর-জোচ্চোরের মতো ছাপ-মারা বিধবা নামের একটা দাগী আসামী ছিলাম না। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, সে সবকিছু উড়িয়ে দিয়ে বলতো, যারা তোমাকে তোমার চরিত্র নিয়ে নির্যাতন করে তাদের তুমি বুঝিয়ে দিয়ো চরিত্রের অর্থ কেবলমাত্র ঐ একটি কিছুতেই সীমাবদ্ধ নয় এবং ভালোবাসা জিনিসটা কোনো অর্থেই পাপাচরণ হতে পারে না। তুমি তো কাউকে ঠকাচ্ছো না, বঞ্চিত করছ না, এর মধ্যে হিংসা স্বার্থপরতা কুশ্রীতা মিথ্যা কিছুই নেই। শুধু নিজের দুঃখময় জীবনে একটা ছেদ টানার চেষ্টা, অপমান অসম্মানের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া। তোমার স্বামী মারা গেছেন সেটা তো তোমার অপরাধ নয়? তোমাকে থান পরিয়ে মাথা মুড়িয়ে খেতে না দিয়ে কী লাভ হবে? উনি কি বেঁচে উঠবেন তাতে। না কি তুমি তাঁকে খুন করেছ যে এই শাস্তিবিধান? তাছাড়া যারা তোমাকে একটা বোঝা ছাড়া আর-কিছু ভাবেন না তাদের উপর নিজেকে চাপিয়েই বা রেখেছ কেন? আলাদা হয়ে যাও না, বাচ্চাদের শিক্ষার দায়িত্বও তো একটা আছে তোমার? তারা কী শিক্ষা পাচ্ছে সেখানে? কী অন্ধকারে বড়ো হচ্ছে, ভেবেছ কখনো? একটু যুক্তিবুদ্ধির দাস হও, নিজেকে মানুষ বলে ভাবতে শেখো, মেয়েদের জলের তলায় ঠেসে ধরাই যে সমাজের একমাত্র কর্তব্য তার সঙ্গে লড়াই করতে শেখো। আমি তো আছি, ভয় কী তোমার?

তবু ভয়। জন্মেছিলাম একটা গোঁড়া পরিবারে, আমার মেরুদণ্ড ছিল না, এতো কথা শুনেও আমি অবিশ্রান্ত আমার অপরাধবোধে এমন সচেতন হয়ে থাকতাম যে শেষ পর্যন্ত কেমন শুচিবায়ুগ্রস্ত হয়ে উঠলাম। আজ আমি সত্য বলছি, তোমার লেখা পড়ে আমার ভিতরকার আসল সত্তাটা এমনভাবে জাগ্রত হয়ে উঠতে চাইতো যে আমার ক্রোধের সীমা থাকত না। রমেনের সঙ্গে অনেক সময়েই আমার যে ধরনের কথাবার্তা হতো সেই সব কথা যেন তুমি ব্লটিং পেপারের মতো শুষে নিয়ে তুলে ধরতে। আমি থাকতে পারতাম না, তোমাকে ভালবাসি বলেই ছুটে এসে ওরকম ভাবে বকে যেতাম। কিন্তু এটাও খুব সত্য কথা যে সেই লেখা পড়ার জন্য আবার আমি উন্মুখ আগ্রহে অপেক্ষা করতাম।

কিন্তু যাদের জন্য নিজের জীবনের সবকিছু অপচয় করে চুল পাকালাম আজ সেই সন্তানরা আমার কোথায়? আমার কথা তারা কতটুকু ভাবে? প্রয়োজন ফুরানো মাত্রই জীর্ণ বস্ত্রের মতো মাকে ত্যাগ করে কেমন যার যার সংসার নিয়ে সে সে উধাও। আমার কি মনে হয় জানো, ওই যে ছেলেবেলায় তার মামীরা আমার বিরুদ্ধে তাদের মনে এক অবিশ্বাসের বীজ বুনে দিয়েছিল, সেই কণ্টক প্রত্যক্ষে না হোক, পরোক্ষে বিঁধেই ছিল শেষ পর্যন্ত। নইলে মানুষ হওয়া মাত্রই এমন পাখির মতো উড়ে গেল কেন? তারা তো দেখেছে কী ভাবে আমি তাদের খাইয়েছি, পরিয়েছি, সুখে রাখার চেষ্টায় আপ্রাণ হয়েছি? কিছু তো পিছুটান থাকা স্বাভাবিক ছিল? না কি এই-ই জগৎ সংসারের নিয়ম? এ ভাবেই চলতে থাকে চাকা। হয়তো তাই। কিন্তু আমি তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে আমার জন্য অনেক বিশ্রাম খুঁজেছিলুম, পাইনি।

সারাজীবন কাজ করেছি, খেটে-খুটে অনেক উঁচুতেই উঠেছিলাম শেষ পর্যন্ত। তা বলে আমি তো কিছু ভোগ করিনি সেই তো এক বেলা কোনো রকমে সেদ্ধ পোড়া দিয়ে দুটি আতপ চালের তণ্ডুল ভক্ষণ আর বারো মাসে তেরো পার্বণের তেত্রিশ রকমের উপোস, এই তো জীবন। শেষ বয়সে সব খুইয়ে আবার একটা বাড়িও করে বসলাম। সেও তো ওদের কথা ভেবেই? এখন যখ হয়ে নিজেই আগলে বসে আছি। উঠে দাঁড়ালেন, সজল চোখে

হেসে বললেন, তোমাকে খুব জ্বালালাম আজেবাজে বকে। জানি দিদিকে তুমি ভালোবাসো, তাই বিরক্ত হবে না। চলি কেমন?

আমি সাগ্রহে বললাম, আর একটু বসুন। আমার ভীষণ জানতে ইচ্ছে করছিল, সেই রমেনের সঙ্গে আর কখনো তাঁর দেখা হয়েছিল কিনা। ইতস্তত করে বললামও সে কথা। তিনি যেতে যেতে দাঁড়ালেন, মাথা নেড়ে বললেন, মাস কয়েক আগে একদিন দেখা হয়ে গেল পথে। তেত্রিশ বছরের যুবক এখন তেষট্টি বছর পূর্ণ করেছে, কিন্তু চোখ মুখ তেমনি সতেজ, তেমনি সুন্দর। স্বভাবও তেমনি বেপরোয়া। তাকিয়েই বললো, লতিকা না? আমিও অবশ্য পলকমাত্রেই চিনতে পেরেছিলাম। ভোলবার মতো লোক তো সে ছিল না?

তারপর?

তারপর আর কী? গতানুগতিক কুশল প্রশ্নের বিনিময়। শুনলাম, আমাকে অনেক খুঁজেছিল, আমার ভ্রাতাদের কাছে গিয়ে ঘাড় ধাক্কা টাক্কাও হয়তো খেয়ে থাকবে, তারপর উত্তরবঙ্গে না কোথায় অন্য একটা চাকরি জোগাড় করে চলে যায়, শেষে অনেক ঘাটের জল খেয়ে বৃদ্ধ বয়সে আবার ফিরে এসেছে। কপালে আর বিয়ে করা ঘটেনি, বোনটি মারা গেছে বছর দুয়েক আগে, এখন আমার মতোই সীমাহীন সঙ্গীহীন অন্ধকার অবসর।

তারপর?

তারপর? আমার মাথার চুল নেড়ে দিয়ে হাসলেন, তারপর আমার কথাটি ফুরোলো, নটে গাছটি মুড়োলো। সোনামণি তোমার 'সঙ্গসুধা' গল্প গল্পেই ঘটে। জীবনে নয়। ষাট বছরের মহিলা কখনোই আর পঁয়ষট্টি বছরের মানুষটাকে বিয়ে করে সুখের ঘর বাঁধতে পারে না। সন্তান পরিত্যক্ত হয়ে একা ঘরে শক্ত হয়ে মরে পড়ে থাকলেও না। জানো না, মেয়েরা ঘাস মাটি? পদদলিত হয়ে বেঁচে থাকাই তাদের ধর্ম।

সন্ধ্যামালতী

সুশীল রায়

কড়া নাড়ার শব্দ শুনেই দরজা খুলে দাঁড়ালাম।

মস্ত পালোয়ানের মত চেহারার প্রকাণ্ড একজন পুরুষ, তার সঙ্গে ছোট্ট খুকীটির মত ফুটফুটে একটি মেয়ে।

এই অচেনা দুটি মূর্তির হঠাৎ আবির্ভাবে চমকে গেলাম। তাদের আপাদমস্তক ভাল করে দেখে চেনার চেষ্টা করে বললাম, কোত্থেকে আসছেন?

মেয়েটি এগিয়ে এসে বলল, হেনাদি আছেন? আমরা আসছি কালীঘাট থেকে। চিনতে পারেন নি তো?

উত্তর না দিয়ে ভিতর থেকে হেনাকে ডেকে আনলাম।

হেনা এসেই বলল, ও তুই! তোরা! বস্, বস্। তোর বিয়ের কথা শুনেছি। মাস-তিন হল—তাই না?

আমি ওদের দেখতে লাগলাম। ফুটফুটে মেয়ে। সঙ্গের শক্তিমান পুরুষটি মাথা নীচু করে বসে। বয়স তারও খুব বেশী নয়। কিন্তু দেখতে বেশ বড়সড়। শরীরের বাঁধনও বেশ মজবুত।

হেনা ওই ফুটফুটে মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করল, সঙ্গে কে?

প্রশ্ন শুনে মেয়েটি মাথা নীচু করে লাজুক হাসি হাসল। ওই হাসিতেই পরিচয়টা পাওয়া গেল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে বোঝা গেল, মেয়েটি নিয়ম পালন করেই লজ্জার ভান দেখাচ্ছে, আসলে লজ্জা পাবার মত বয়সই তার হয় নি।

আমি বসেছিলাম অনেকটা বেকুবের মতই। এতক্ষণে হেনা আমার দিকে চেয়ে বলল, এদের চিনলে?

মেয়েটিই হেসে তার উত্তর দিল, মোটেই চিনতে পারেন নি। আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন, কোত্থেকে আসছি। তার উপর আবার আপনি বলে কথা বললেন। আমাকে উনি দেখেছেন এতটুকু। এর মধ্যেই একেবারে ভুলে গেছেন। আমি কিন্তু দেখেই চিনতে পেরেছি।

আমি তবু চিনতে পারলাম না। ওদের মুখের দিকে তাকাতে লাগলাম।

হেনা বলল, চিনলে না? এ হচ্ছে তারকাদির ছোট বোন বেলুন।

তারকাদি বলায় মেয়েটির পরিচয় পেয়ে গেলাম। কিন্তু বেলুন নামটা মনে পড়ল না। মনে না পড়লেও তারকাদির নাম শুনেই সব পরিষ্কার হয়ে গেল।

পালোয়ানটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, কী করা হয়?

পুলিসে কাজ করি—ট্রাফিকে।

ভাল।

বেলুনের কাছ থেকে হেনা তারকাদিব খবর জানতে লাগল। এখন নাকি আরও কাবু হয়ে গেছেন তারকাদি। কয়েকটা দাঁতও নাকি পড়ে গেছে।

দশ-এগারো বছর হল বিয়ে হয়েছে আমাদের। এই কটা বছর হেনার মুখ থেকে একটানা শুনে আসছি তারকাদির কথা। কথায় কথায় হেনা একবার করে তারকাদির নাম উচ্চাবণ করেই। আমার দুর্ভাগাই বলতে হবে— কেবল বাঁশি শুনেই চলেছি, আজও তাঁকে চোখে দেখা হয় নি। তার উপর তারকাদির চেহারা ইত্যাদির যা বর্ণনা শুনি, তাতে চোখে দেখার আগ্রহও বড় একটা হয় নি।

ক্রুশের কাজ, চটেব আসন, এমব্রয়ডারি, পায়জামা-পাঞ্জাবি-ব্লাউজ ইত্যাদিব ছাঁটকাট ও সেলাই, আলপনা আঁকা, চরকায় সুতো কাটা প্রভৃতি যাবতীয় কাজের দীক্ষা নাকি হেনোবা পেয়েছে তারকাদিব কাছ থেকে।

এইজন্যে এই ভদ্রমহিলা এদের চেতনাকে একেবারে আচ্ছন্ন করে রেখেছেন। এদের প্রত্যেক কাজের ফাঁকে তাই উঁকি দেন তারকাদি, এবং প্রত্যেক উঁকির সঙ্গে একবার করে উচ্চারিত হয় তাঁর নাম।

দশ-এগারো বছর ধবে তাই ওঁর নামটা শুনে শুনে কান একেবারে পোক্ত হয়ে গিযেছে।

তারকাদির বাবা খুলনার নাম-কবা ডাক্তার। পয়সাকড়ি কবেছেন মন্দ নয়। আগে তারকাদিব পবিচয় ছিল ডাক্তাব ক্ষিতীন্দ্রনাথের মেয়ে বলে। এখন সে পবিচযের ধারাটা উলটে গিযেছে। এখন ক্ষিতীন্দ্রনাথের পরিচয় দিতে হয তাবকাদির বাবা বলে।

ক্ষিতীন্দ্রনাথের পাঁচ মেয়ে। সবচেয়ে বড় মেয়ে তাবকাদি। সবচেয়ে ছোট এইটি।

বেলুন বলতে লাগল, বাবার শবীরও ভাল নয। কদ্দিন বাঁচেন না-বাঁচেন --এইজন্যে চট্ কবে আমাব বিয়ে দিযে দিলেন।

হেসে বললাম, ভালই তো হল।

ঠোঁট উলটে প্রায তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বেলুন বলল, ভাল না ছাই। ওদেব চাকরি বেশীদিন থাকবে না জানেন? শীগগিরই যাবে।

বললাম, কেন কেন?

দেখেন নি? রাস্তার মোড়ে মোড়ে বঙ-বেরঙের বাতি দিয়ে দিয়েছে। ওই বাতিবাই কাজ চালাবে। এদের দিয়ে তবে দরকার কি!

মজবুত চেহাবা হলে হবে কি, এই কথা শুনে কেমন কাবু হযে গেল যেন বেলুনের সঙ্গের মানুষটি। আপত্তি তুলে বলল, আমরা না থাকলে বাতি জ্বালাবে কাবা?

বেলুন বলে উঠল, কিচ্ছু বোঝে না, জানেন? সব কথাতেই মাথা নাড়ে।

হেনা শব্দ করে হেসে উঠে বলল, এখনও ও-বোগ তোর সারে নি বেলুন?

জিজ্ঞাসা করলাম, কি রোগ?

হেনা বলল, নারকেলকে বলে নালকেল, লালার দোকান বলতে পারে না, বলে নালার দোকান, নাড়েকে বলে—

হাসতে হাসতে মাথা নাড়তে লাগল বেলুনেব বব।

অনেকক্ষণ ধরে গল্পগুজবের পর ওরা চলে গেল। ওরা চলে যাবাব পব, আশা করেছিলাম, ওদের নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা চলবে।

কিন্তু ওরা এসে যেন কেবল কোদাল দিয়ে কুপিয়ে একটা বাঁধ ভেঙে দিয়ে চলে গেল। অজস্র ধারায় হেনার মুখ দিয়ে বেরুতে লাগল তারকাদি সম্বন্ধে কথার স্রোত।

মেয়েমানুষ নয়, মেয়ে নাকি ইঁদুর, একেবারে মাল্লা, একেবারে নিখাদ। প্রেম-করা জিনিসটাকে যদি খাদ বলা যায় তা হলে অবশ্য আলাদা কথা।

তারকাদির মত খাঁটি মেয়েও একবার নাকি প্রেমে পড়েছিলেন—মাত্র কিছুদিনের জন্যে। তারপর গা-ঝাড়া দিয়ে সে প্রেম থেকে তিনি উঠে পড়েন।

সে অনেক দিনের কথা। ১৯৩১ সন—সি. ডি মুভমেণ্টের সময়। অর্ধেন্দু পালিত লীডার। হুলারহাটের ঘটনা। ফ্ল্যাগ হয়েস্টিং হবে। পুলিস এসে হাজির। একটা ফ্ল্যাগ আঁকড়ে ধরল দুজন—অর্ধেন্দু পালিত আর তারকাদি।

এরই সঙ্গে প্রেমে পড়েছিল তারকাদি। কিন্তু বেশী দিন সে ব্যাপারকে প্রশ্রয় না দিয়ে চলে গেল ঝালকাঠি। এখানে এসে শুনল অর্ধেন্দু গেছে জেলে। সেই থেকে ছাড়াছাড়ি।

কিন্তু সেই থেকে তারকাদিও গেল বদলে। চেহারা শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠল, স্বাস্থ্যটা গেল ভেঙে। এর কারণ কেউ বুঝল না। প্রেমের আঘাতে যে চুরমার হয়ে গেলেন তারকাদি, এমন আজগুবি কথা কেউ ভাবে নি। কেন না অমন নরম ধাতের মেয়েও যেমন তিনি নন, প্রেমটিও তেমনই গরম হয়ে ওঠার সময়ও পায় নি। অনিয়মের দরুনই তারকাদির স্বাস্থ্যটা যে নষ্ট হয়ে গেল, এতে আর সন্দেহ ছিল না কারও।

হেনা বলল, আমরা তখন খুবই ছোট। একটু বড় হয়ে এই প্রেমের গল্পটা শুনেছি। আমরা তখন ছিলাম তারকাদির পার্টির ভলাণ্টিয়ার। সভায় সভায় তিনি আমাদের নিয়ে যেতেন, গলার শিরা ফুলিয়ে চিৎকার করে আমরা গাইতাম স্বদেশী গান।

যেন গল্প নয়, ইতিহাস শুনছি। স্বাধীন ভারতের মাটিতে বসে পরাধীন ভারতের লাঞ্ছনার কাহিনী।

এই ধরনের কাহিনী প্রায়ই শুনতে হচ্ছে আজকাল। বেলুনরা এসে অনেকগুলো পুরনো বছরকে একেবারে কোলের কাছে টেনে দিয়ে যেন চলে গেছে।

ডাক্তার ক্ষিতীন্দ্রনাথের পাঁচটি মেয়ের মধ্যে চারটিই পার হয়ে গিয়েছে। পড়ে আছে মাত্র একটা—বড়টা। একে নিয়েই যত ভাবনা।

হেনা বলে, খুলনার বাড়িঘরদোর ছেড়ে চলে এসে অসুবিধেতেই পড়েছেন মেসোমশাই। তার উপর আছেন তারকাদি।

পাগল হবার দশা হল আমার। একদিন বিরক্ত হয়ে বললাম, তোমার ওই তারকাদির কথাটা একটু কমাও তো। কান তো গেল। সেই অর্ধেন্দুটা ভুলে যেতে পারল তারকাদিকে, তোমাদের তারকাদি ভুলে যেতে পারল অর্ধেন্দু পালিতকে, কেবল তোমরাই ভুলতে পারছ না। ওই নামটাকে করেছ জপমালা।

কাজ হয়েছিল এই কথায়। এর পর অনেক দিন তারকাদির কথা শুনি নি। অনেকদিন না শুনেও আবার অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। কান দুটো ওই নামের সঙ্গে এমনই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল।

হেনা ব্যস্ত হয়ে ছুটে এসে বলল, শুনেছ?

কি?

মাসিমা মারা গেছেন।

কে?

তারকাদির মা।

হাতের কলম নামিয়ে রেখে হাতের তেলোর মধ্যে থুতনি ডুবিয়ে বিমর্ষ হয়ে বসলাম। বললাম, দুঃখেরই কথা। তোমার তারকাদির ভাগ্য বড় খারাপ। এখন বুড়ো বাপকে আগলে বসে থাকতে হবে। বয়স কত হবে?

বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ—

বললাম, তোমার মাসিমার বয়সের কথা বলছি নে।

তা বুঝেছি। তারকাদির বয়সের কথাই বলছি। ওর চেয়ে দু-এক বছর বেশীও হতে পারে।

থুতনি সরিয়ে নিয়ে কনুইয়ের উপর হাতের ভর রেখে বললাম, লেখাপড়াও তো—

উঁহু, তা হলে তো হতই—নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে পারতেন। এখন হঠাৎ একদিন মেসোমশাই চোখ বুজলেই হল। রাস্তায় দাঁড়াতে হবে। টাকাপয়সা ছিল মেসোমশায়ের। কিন্তু সেসব তো খুলনায় ফেলে আসতে হয়েছে।

সাহস দিয়ে বলার মত করে বললাম, নেই-নেই করেও নিশ্চয়ই কিছু-না-কিছু আছে।

তা আছে। কিন্তু তাতে কি একটা জীবন চলে?

বিজ্ঞের মত মন্তব্য করলাম, বিয়ে করা উচিত ছিল।

হেনা বলল, তুমি তো দেখ নি তাকে। বিয়ের কথা বললে তারকাদি তাড়কা-রাক্ষসী হয়ে উঠতেন। ওঁকে কিছুতে রাজী করাতে না পেরেই তো অগত্যা মেসোমশাই অন্য মেয়েদের বিয়ে দিতে আরম্ভ করলেন।

কথা আর গড়াতে না দিয়ে এখানেই শেষ করে ফেলার জন্যে বললাম, যাক গে, ভেবে লাভ নেই। দুনিয়ার কিছুই অচল থাকে না। তোমার তারকাদিরও চলে যাবেই একরকম করে।

কিন্তু আমার এ কথা মনঃপূত হল না হেনার। হেনা বলল, একটু দুশ্চিন্তাও তোমার হয় না?

অগত্যা চিন্তান্বিত হয়ে বসে রইলাম অনেকক্ষণ।

এক এক সময় আশ্চর্যই লাগে। তার সেই মাসিমা মেসোমশাই তারকাদি—এদের খবর এত পায় কী করে হেনা। প্রায়ই নানারকম খবর সরবরাহ করে আমাকে আবার বিব্রত করতে আরম্ভ করে দিয়েছে।

বলল, খবর জানার আগ্রহ থাকলে পাওয়া যায়, মশাই। দরজা জানলা টাইট করে বন্ধ ঘরের কোণে বসে থাকলে খবর পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু সব মানুষ তো আর ঘরকুনো নয়। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের খবর নিতে জানা চাই।

বললাম, নিয়ো। তারকাদির নতুন খবর পেলে একটু জানিয়ে যেয়ো।

এতেও আবার কাজ হল। অনেকদিন তারকাদির কোনও খবর আমাকে আর শুনতে হয় নি। অনেক দিন ধরে না শুনে মনটা উশখুশ করতে আরম্ভ করেছে, এমন সময় ভেজানো দরজাটা খুলে এ ঘরে ঢুকে বলল, একটা কথা বলব।

কি?

[illegible] মারা গেছেন।

[illegible] তোমার তারকাদির বাবা বুঝি?

[illegible] চেয়ারে বসে পড়ল হেনা। তার চোখ ছলছল করছে।

[illegible] মধ্যে দেখে কাগজপত্র গুছিয়ে বললাম, সাংঘাতিক খবর।

[illegible] বলল, আমি দেখতে যাব।

[illegible] মারা গেছেন? [illegible]।

বললাম, তা হলে তো বডি এতক্ষণে শ্মশানে নিয়ে গেছে।

রেগে উঠল যেন হেনা, বলল, তোমার মাথা। বডি বডি বডি—আমি যেন বডি দেখতে যাচ্ছি।

তবে?

জানি না।

একটু থেমে বললাম, বড় দুঃসময় চলেছে। এ সময়ে তারকাদিকে একবার দেখতে যাওয়া উচিত।

তাই তো বলছি। আমি যাব।

চল। —আমি উঠে দাঁড়ালাম।

আকাশ থেকে পড়ল যেন হেনা। বলল, তুমি যাবে? তা হলে তো খুব ভাল হয়। চল।

মানিকতলার খালের ধারে বাড়ি। বাড়িটা খুঁজে যে পেলাম, এই রক্ষে। রোমাঞ্চ হচ্ছিল আমার সারা শরীরে। এতদিন যাঁর বাঁশি শুনে এসেছি, আজ তাকে নিজের চোখে দেখব।

এই সেই বাড়ি। চাপা কান্নায় থমথম করছে বাড়িটা। সন্তর্পণে ঢুকলাম হেনা আর আমি।

ইশ। আঁতকে উঠলাম। এই সেই তারকাদি! শীর্ণ শরীর, মাংসের লেশ নেই সারা গায়ে। করুণ দৃষ্টিতে তাকালেন আমাদের দিকে, ইশারা করলেন আমাদের বসতে।

মৃত্যুর শোক একটা আছেই। বাড়তি একটা শোকে আমার মন গুমট হয়ে উঠল।

চার বোনের মধ্যে দুই বোন থাকে কলকাতায়। তারা স্বামী সঙ্গে নিয়ে যাতায়াত করছে। কালীঘাট থেকে বেলুনরা এসেছিল, একটু আগে নাকি চলে গেছে।

আমরাও অনেকক্ষণ ছিলাম। রাত্তির বেশী হয়ে যাচ্ছে বলে বিদায় নিয়ে রওনা হলাম। রাত্রে বেলুনের বর নাকি আসবে। এখানেই থাকবে সে।

এর পর কিছুদিন কেটে গেছে। তারকাদির কথা হেনা আমাকে আর বলে না। আর বলে লাভ নেই। আমি তো স্বচক্ষে তাঁকে দেখেই এসেছি।

বলার দরকারও নেই আর, আমি নিজেই ওই মহিলার কথা এখন ভাবতে আরম্ভ করেছি। বেচারি!

বছরখানেক কেটে গেছে ইতিমধ্যে। হেনা একা গিয়ে এর মধ্যে দেখা করে এসেছে।

ঘরে বসে আছি। কড়া নাড়ার শব্দ শুনেই দরজা খুলে দাড়ালাম। মস্ত পালোয়ানের মত চেহারার সেই পুরুষটি, আর খুকীর মত দেখতে ফুটফুটে সেই মেয়েটি। বললাম, এস এস, অনেকদিন আস নি।

হেনাদি কই?

আছেন। বস।

ওরা বসল।

হেনা এসে কুশল প্রশ্নাদি করল, বলল, তারকাদির খবর কি? কেমন আছেন?

বেলুন তার বরের দিকে কটাক্ষে তাকিয়ে হাসল, বলল, বল।

এদের এই রকম সকম দেখে হেনা বিব্রত বোধ করতে লাগল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলল, হাসছ কেন? ব্যাপার কি?

বেলুন মুচকে মুচকে হাসছিল, বলল, বড়দির বিয়ে।

উৎফুল্ল তো বটেই, সেইসঙ্গে খুব আশ্চর্যও হয়েছে হেনা। যেন তার বিশ্বাসই হচ্ছে না। অদূরে বসে আমিও সব শুনছি, বিশ্বাস অবশ্য আমারও হচ্ছে না।

হেনা বলল, বিয়ে। কার সঙ্গে?

বেলুন তার বরের দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে বলল, ও জানে সব

ঝুঁকে বসল হেনা। খবরটা জানার জন্যে সে যে খুব ব্যগ্র তা তার বসার ভঙ্গি দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, বলল, কার সঙ্গে?

বেলুনের বর বলল, চিনবেন না। বড়দির কাছ থেকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জেনে [illegible] [illegible]রেছি।

হেনা বলল, তা না চিনলাম, কিন্তু কে তিনি? নাম কি?

বেলুনের বর বলল, তাঁর নাম অর্ধেন্দু পালিত।

হেনা সোজা হয়ে বসে যেন হাঁফ ছাড়ার মত করে নিশ্বাস ফেলল, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, সাংঘাতিক সুসংবাদ। ভদ্রলোকটি করেন কী?

বৌবাজারে ফুলের দোকান আছে। খুব অমায়িক, খুব ভালমানুষ। আর—

বয়স কত?

ঠিক বলা তো কঠিন। কিন্তু মনে হয় প্রায় পঞ্চাশ হবে।

হেনা নিশ্বাস ফেলে বলল, তা ভদ্রলোকটি এতদিন বিয়ে করেন নি কেন?

বেলুনের বর একটু হাসল, বলল, ও-কথা জিজ্ঞাসা করেছি। বলেন—একদম সময় পাই নি। গড়িয়াতে মস্ত বাগান আছে, সেই নার্শারি থেকে ফুল এনে বৌবাজারে বিক্রি হয়। কারবার মন্দ নয়।

হেনা জিজ্ঞাসা করল, তারকাদি রাজী তো?

এ কথার উত্তর দেওয়ার সময়ই দিল না বেলুন, সে তার বরের দিকে আড়চোখে চেয়ে বলল, ওকে এখন বদলি করে দিতে হবে।

হেনা বলল, কোথায়?

গোয়েন্দা-বিভাগে। জানেন, একটা বছর ধরে টো-টো কোম্পানি করে শেষবেশ খুঁজে বের করেছে। ধরে নিয়ে এসেছে। বড়দির সঙ্গে দেখা করিয়ে দিয়েছে। পাকা গোয়েন্দা।

বেলুনের বর মাথা নাড়তে লাগল।

বেলুন বলল, লজ্জা নেই। সবেতেই মাথা নাড়ে।

বললাম, ঝগড়া করো না তোমরা। মিষ্টি খাও। এমন খবরটা নিয়ে এসেছ, ওদের মিষ্টি খাইয়ে দাও হেনা।

হেনা সায় দিয়ে বলল, নিশ্চয়।

আর ইয়ে ঃ হেনাকে বললাম, আমার সেই দর্শনের কথাটা একবার মনে করো এই সময়।

ফিরে তাকিয়ে হেনা বলল, সেটা আবার কী?

বললাম, যাক গে।

ব্যস্ত হয়ে হেনা ভিতরে চলে গেল।

বাঈজী

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

আনোয়ারীবাঈ ঘরে ঢুকতেই মনোহরপ্রসাদ উঠে দাঁড়াল। হাত কপালে ঠেকিয়ে অভিবাদন করল, তারপর নিজের মেহেদিপাতার রংয়ে ছোপানো দাড়িতে হাত বোলাতে লাগল।

আনোয়ারীবাঈ কার্পেটের ওপর বসলেন। মনোহরপ্রসাদের মুখোমুখি। আজকাল বেশিক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না। কোমর টন টন করে। বাতের মরসুম শুরু হয়েছে। ভরা শীতকালে আর উঠে হেঁটে বেড়াতে পারেন না। মাঝে মাঝে আনোয়ারীবাঈয়ের খুবই আশ্চর্য লাগে। মনেই হয় না, বছর বারো আগে হাঁটু মুড়ে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গান গেয়েছেন। রাত ভোর হয়ে গিয়েছে ঠুংরি আর গজলে। এখন একটা গান গাইতে গেলেই হাঁপ ধরে।

কী ব্যাপার ভাইসায়েব, ভোর ভোর? আনোয়ারীবাঈ চুল সরু খাঁজ ফেললেন কপালে। এত ভোরে ঘুম ভাঙানোতে মেজাজ খুশ নয় মোটেই।

একটা জরুরি খবর ছিল, মনোহরপ্রসাদ দাড়ি ছেড়ে হাঁটুতে হাত বোলাতে আরম্ভ করল। মুখে একটু হাসি হাসি ভাব।

আগের দিন ঠিক এমনিভাবেই মনোহরপ্রসাদ খবর আনত। ছিপছিপে ফরশা চেহারা, হাতের ছোঁয়ায় তবলা যেন কথা বলত। মুজরো নিয়ে বাইরে যাবার সময় আনোয়ারীবাঈ সব সময়ে মনোহরপ্রসাদকে সঙ্গে নিতেন। কোনও ঝামেলা নেই, বদ অভ্যাস নেই। ঘাড় হেঁট করে নিজের কাজ করে যেত। আনোয়ারীবাঈয়ের শুধু তবলচিই ছিল না মনোহরপ্রসাদ, এধার ওধার থেকে খবরের টুকরোও সেই সংগ্রহ করত।

আজ রায় বেরিলির খানসাহেব এসেছেন। এখানে থাকবেন হপ্তা খানেক। খানসায়েব ঠুংরির বড় ভক্ত, দেখি একবার যোগাযোগ করে। কাল পরশু আপনার কোনও বায়না নেই তো কোথাও?

মনোহরপ্রসাদ জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে চাইত আনোয়ারীবাঈয়ের দিকে।

না, বায়না আর কোথায়, আনোয়ারীবাঈ ঘাড় নাড়তেন, বায়না থাকলে আর তুমি জানতে পারতে না?

তা ঠিক। মনোহরপ্রসাদও ঘাড় নেড়েছে। এমনি নানা খবর।

আজ রাতে মীর্জা হোসেন আসবেন গান শুনতে। সন্ধ্যার ঝোঁকে মনোহরপ্রসাদ সংবাদ আনল।

আজ রাতে? সর্বনাশ। বিস্ময়ে আনোয়ারীবাঈ চোখ কপালের মাঝ বরাবর তুলেছেন, আজ যে ডাক্তার জনার্দন সুকুল আসবেন। তিনদিন আগে খবর পাঠিয়েছিলেন।

ও ঠিক আছে, নিস্পৃহ গলায় উত্তর দিয়েছে মনোহরপ্রসাদ, আমি তাঁকে বারণ করে এসেছি। বলেছি আপনার তবিয়ৎ খারাপ। দিন সাতেক পরে আসর বসবে।

কিন্তু কাজটা কি ঠিক হল ভাইসায়েব? আনোয়ারীবাঈ আমতা আমতা করেছেন।

মীর্জা হোসেন কাল সকালে হায়দ্রাবাদ ফিরে যাচ্ছেন। বছর খানেকের আগে আর এ মুখো হবেন না। আর সুকুল সায়েব তো ঘরের লোক।

আনোয়ারীবাঈ রাজি। কোনওদিন মনোহরপ্রসাদের কথার ওপর কথা বলেননি। এটুকু জানতেন, মনোহরপ্রসাদ যা করবে আনোয়ারীবাঈয়ের ভালর জন্যই। নিজের দিকে চাইবে না, গায়েও মাখবে না দুঃখ কষ্ট। সুকুল সায়েবের চেয়ে মীর্জা হোসেন পয়সা কম ঢালবে বলে নয়, হোসেন সাহেব গানের অনেক বেশি সমঝদার। ঠিক জায়গায় তারিফ করতে জানেন, বুঝতে পারেন গলার সূক্ষ্ম কাজের কেরামতি। সুকুল সায়েবের এ সবের বালাই নেই। গান শুরু হতেই তাকিয়া ঠেস দিয়ে শুয়ে পড়েন। ঠিক গান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে ঘাড় নেড়ে বলেন, কেয়াবাত! কেয়াবাত! বড় মিঠে গলা বাঈজীব। ভারী মিঠে।

আজ নিশ্চয় এ সব কথা বলতে মনোহরপ্রসাদ আসেনি। গান ছেড়ে দিয়েছেন আনোয়ারীবাঈ। মনোহরপ্রসাদও আর তবলা ছোঁয় না। গান-বাজনার সম্পর্ক নেই, কিন্তু হৃদয়ের সম্পর্ক ঘোচেনি। সময় পেলেই মনোহরপ্রসাদ ঘুরে যায় একবার। পা মুড়ে বসে ফেলে আসা সুখ-দুঃখের গল্প চলে। জমানা বিলকুল বদলে গেছে, সে সম্বন্ধে আক্ষেপ।

আনোয়ারীবাঈ বিস্মিত হলেন, হেসে বললেন, আর জরুরি খবরে দরকার কী ভাইসায়েব। তিনকাল গিয়ে এককাল ঠেকেছে, এবার যা কিছু জরুরি খবর আসবে একেবারে ওপার থেকে।

মনোহরপ্রসাদ এ কথার কোনও উত্তর দিল না। মাথা নিচু করে কার্পেটের একটা ফুল খুঁটতে খুঁটতে আস্তে বলল, মোতি এসেছে শহরে।

মনোহরপ্রসাদের কথার টুকরো কানে যেতেই আনোয়ারীবাঈ টান হয়ে বসলেন। একটা হাত রাখলেন কানের পাশে। মনোহরপ্রসাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন, কে এসেছে? কে এসেছে শহরে?

মনোহরপ্রসাদ মাথা তুলল, গলাও চড়াল একটু, মোতি এসেছে, মোতি। খবরের কাগজে বেরিয়েছে মেজর বর্মা লক্ষ্ণৌতে বদলি হয়েছেন।

বুঝতে বেশ একটু অসুবিধা হল আনোয়ারীবাঈয়ের। অস্পষ্ট কতকগুলো হিজিবিজি রেখা। অর্থহীন, সামঞ্জস্যহীন। বিড় বিড় করে উচ্চারণ করলেন কিছুক্ষণ, মোতি, মোতিবাঈ, মোতিবাঈ এসেছে শহরে।

দু একদিনের কথা নয়। দেড় যুগেরও বেশি, তখন কত বয়স মোতির। বড় জোর পাঁচ কি ছয়। দুপাশে বেণী দোলানো, রঙিন শালোয়ার পাজামা পরা ফুটফুটে মেয়ে। ছুটে ছুটে বেড়াত এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি। দুনিয়ার লোকের সঙ্গে দোস্তি। চেয়ে চেয়ে আনোয়ারীবাঈয়ের আশ মিটত না। কোনওদিন যে মনের মানুষের সঙ্গে ঘর বেঁধেছিল আনোয়ারীবাঈ, পাতানো নয়, সত্যিকারের স্বামী-স্ত্রী, পরের যুগের গজল-ঠুংরি-খেয়ালের সুরে বাঁধা জীবন নয়, পা ফেলা নয় তবলার বোলের তালে পা মিলিয়ে, মধ্যবিত্ত জীবনের সুখ দুঃখে ঘেরা জীবন, সামাজিকতার গণ্ডির মধ্যে সাবধানে পা ফেলে চলা, মোতি আনোয়ারীবাঈয়ের সেই ফেলে আসা জীবনেরই চিহ্ন।

শুধু মাঝে মাঝে আনোয়ারীবাঈ চমকে উঠতেন। আগুন জ্বলে উঠত মাথায়। যখন দু একজন গানের ওস্তাদ, আশপাশের দু একজন রসিক আদমি মোতিকে আদর করতে করতে বলত, আর কেন আনোয়ারী, এবার মেয়েকে গান বাজনা শেখানো আরম্ভ করো। এখন থেকে শুরু করলে তবে বয়সকালে মার মতন মিঠে গলা পাবে, নাম রাখবে লক্ষ্ণৌর।

মুখে আনোয়ারীবাঈ কিছু বলেননি, কিন্তু মনে মনে শিউরে উঠেছেন। মানুষজন সব সরে যেতে, বাড়ি খালি হয়ে যেতে মোতিকে বুকে জড়িয়ে ধরে অঝোরে কেঁদেছেন। মোতির ঠোঁটে, গালে চুমু খেতে খেতে বলেছেন, না, তোকে আমি কিছুতেই এ পথে নামতে দেব না। কিছুতেই না।

মনের ইচ্ছাটা আড়ালে ডেকে মনোহরপ্রসাদকে বলেও ছিলেন অনেকবার।

মোতিকে আমি সরিয়ে দিতে চাই এখান থেকে। নাচ গান হৈ হল্লা এসব যেন ওর জীবনে কোনও দিন না আসে।

মনোহরপ্রসাদ আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। এ আবার কী কথা! আনোয়ারীবাঈয়ের মেয়ে গান বাজনা শিখবে না তো বেনারস গিয়ে মালা জপবে বসে বসে? তীর্থধর্ম শুরু করবে উঠতি বয়সে?

তীর্থধর্ম করবে কেন এ বয়সে! সংসার করবে। মনের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে ঘর পাতবে। নিজের ফেলে আসা সাজানো সংসারের কথা ভেবেই আনোয়ারীবাঈ উদগত নিশ্বাস চাপলেন।

ঘর সংসার করবে মেয়ে। তা বেশ, কিন্তু জেনে শুনে চকের আনোয়ারীবাঈয়ের মেয়েকে কে এগিয়ে আসবে বিয়ে করতে। ওড়না ফেলে কে মাথায় ঘোমটা দেওয়াবে। দু একজন কাচা বয়সের কচিডানা মেলে সবে উড়তে শেখা ছোকরা হয়তো রাজি হতেও পারে। বিয়ের ভড়ং করে ঘরে নিয়ে গিয়ে ফুর্তি করবে কদিন। তারপর সখ মিটলে কিংবা বাপের দেওয়া মাসোহারা বন্ধ হয়ে গেলে ফেলে পালাবে মোতিকে। তখন।

কাজটা যে সোজা নয়, তা আনোয়ারীবাঈ ভালই জানেন। আর জানেন বলেই মনোহরপ্রসাদকে ডেকেছেন শলা পরামর্শ করতে।

একটা উপায় আছে। আনোয়ারীবাঈ এগিয়ে এসে একটা হাত রাখলেন মনোহরপ্রসাদের হাতের ওপর।

কী উপায়? মনোহরপ্রসাদ নড়ে চড়ে সোজা হয়ে বসল।

বার কয়েক ঢোঁক গিললেন আনোয়ারীবাঈ। কপালে জমে ওঠা ঘামের বিন্দু সুর্বাভিত রুমাল দিয়ে মুছে নিলেন, তারপর বললেন, এমন করা যায় না ভাইসায়েব, আনোয়ারীবাঈয়ের মেয়ে নয় মোতি। ছেলেবেলায় মা-বাপ হারা কোনও অনাথা। তিন কূলে দেখবার কেউ নেই। কোনও ভদ্রলোক যার ছেলেপিলের সাধ অথচ ভগবান কিছু পাঠাননি কোলে, তেমন কেউ মোতিকে নিতে পারে না? নিজের মেয়ের মতন মানুষ করতে পারে না?

সর্বনাশ, বিলিয়ে দেবেন মেয়েকে! কিন্তু মেয়েকে ছেড়ে আনোয়ারীবাঈ বাঁচবেন কী করে?

আনোয়ারীবাঈ বাঁচতে চায় না। মেয়েকে বাঁচাতে চায়! আনোয়ারীবাঈয়ের গলা ধরাধরা।

মনোহরপ্রসাদ বোঝাতে চেষ্টা করল। ব্যাপারটা আনোয়ারীবাঈ ভাল করে ভেবে দেখুন। হঠাৎ উচ্ছ্বাসের ঘোরে এমন একটা কাজ করলে আপসোসের অন্ত থাকবে না। শেষ জীবনে যখন পঙ্গুত্বের অভিশাপ নামবে, দেহ জরাগ্রস্ত হবে, হাজার চেষ্টাতেও গলার মিঠে সুর ফুটবে না, তখন এই মেয়েকে আশ্রয় করেই তো বাঁচতে হবে। এরই রোজগারে দিন কাটাতে হবে। আর কী অবলম্বন থাকবে?

অবলম্বন? আনোয়ারীবাঈ হাসলেন। করুণ হাসি। মনোহরপ্রসাদের দিকে চেয়ে বললেন, শেষ জীবনে মেয়ের চেয়ে আরও বড় কিছু অবলম্বনের খোঁজ করব ভাইসায়েব। সারাটা জীবন তো ছিনিমিনি খেললাম নিজেকে নিয়ে, তখন মালেকের কথা ভাবব। তার হাতেই ছেড়ে দেব নিজেকে।

এর ওপর আর কথা চলে না। তবু মনোহরপ্রসাদ একবার শেষ চেষ্টা করল, কিন্তু মোতি থাকতে পারবে আপনাকে ছেড়ে?

আনোয়ারীবাঈ আবার হাসলেন, মানুষের পরমায়ুর কথা কেউ বলতে পারে? হঠাৎ যদি মারাই যায় আনোয়ারীবাঈ, তাহলেও তো আমাকে ছেড়ে থাকতে হবে মোতিকে। হাজার কাঁদলেও আমাকে ফিরে পাবে না। না, ভাইসায়েব, আনোয়ারীবাঈ গলার সুর নরম করলেন, ভেজা ভেজা স্বর, একটা বন্দোবস্ত করতেই হবে। মোতিকে আমি এ নরকে বাড়তে দেব না। ওকে কোথায়ও সরিয়ে দিতেই হবে। তুলে দিতে হবে কোনও ভদ্র মানুষের হাতে।

মনোহরপ্রসাদ ঘাড় নেড়েছিল বটে, কিন্তু কোনও সুবিধা করতে পারেনি।

আনোয়ারীবাঈ ভোলেননি কথাটা। গান-বাজনার শেষে ক্লান্ত দুটি চোখ তুলে সেই এক মিনতি জানিয়েছেন মনোহরপ্রসাদকে। আর দেরি নয়, মেয়ে বড় হচ্ছে। বুঝতে শিখছে। যা

কিছু করতে হয়, এই বেলা। গাছ একটু বড় হয়ে গেলেই তাকে ওপড়ানো মুশকিল। মাটির গভীরে চলে যায় শিকড়, ডালপালা বিস্তৃত হয় দিকে দিকে, তখন টানাটানি করতে গেলে ক্ষতিই হয়। লক্ষ্ণৌতে সে রকম কেউ না থাকে, মনোহরপ্রসাদ আশপাশে ঘুরে দেখুক। ঘোরবার সব খবচ আনোয়ারীবাঈ দেবেন, কিন্তু আর দেরি নয়।

বরাত ভাল মনোহবপ্রসাদের। এদিক ওদিক ঘুরতে হয়নি। কাছে-পিঠেই খোঁজ পাওয়া গেল। সুন্দরবাগে নতুন এক ভদ্রলোক এসেছেন, স্ত্রীকে নিয়ে। যে বাড়িতে উঠেছেন, সেই বাড়িওয়ালা মনোহরপ্রসাদেব দোস্ত। কথায় কথায় ব্যাপারটা তার কাছ থেকেই জানা গেল।

ভদ্রলোক সরকারের বড় চাকরে। সারা ভারতবর্ষে চাকরিব অন্ন ছড়ানো। ঘুরে ঘুবে সেই অন্ন খুঁটে তুলতে হয়। বছর তিনেক পর পর বদলি হন এক জায়গা থেকে আব এক জায়গা। পয়সাকড়ি, ইমানইজ্জত সব আছে, কেবল সুখ নেই। বছর চারেকের ফুটফুটে একটি মেয়ে ছিল, আজমগড়ে দুদিনেব জ্বরে মেয়েটি শেষ। চিকিৎসার সুযোগও পাওয়া গেল না। সেই থেকে ভদ্রলোকের স্ত্রী অনবরত কাঁদেন আর বুক চাপড়ান। অভিশাপ দেন ভগবানকে। ভদ্রলোক এসব কিছু করেন না। অফিসের সময়টুকু ছাড়া চুপচাপ ঘরে বসে থাকেন দরজা জানলা বন্ধ করে।

মনোহরপ্রসাদ আসমানের চাঁদ পেল হাতের মুঠোয। তকলিফ কবে আসমানে চড়তে হল না, চাঁদ নিজেই যেন নেমে এসে ধবা দিল।

দোস্তের মারফত আলাপ হল। প্রথম প্রথম দু-একটা সান্ত্বনার মোলায়েম কথা, মিঠে মিঠে উপদেশ, দুনিয়াব কিছুই স্থায়ী নয় সে সম্বন্ধে দার্শনিক আলোচনা। তাবপব আস্তে আস্তে কথাটা পাড়ল। খুব সাবধানে।

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ চেয়ে বইলেন মনোহবপ্রসাদেব দিকে, তারপব ধীবগলায বললেন, কিন্তু যাদেব মেয়ে তারা ছাড়বে কেন?

ছাড়বে কেন! মনোহবপ্রসাদ কপালে হাত চাপড়ালেন, বাপ গেছে অনেকদিন, মা যে অবস্থায় আছে, দুবেলা দুখানা রুটিও দিতে পাচ্ছে না মেয়েকে। কোনওদিন দেখব মা আব মেয়ে দুজনেই খতম হয়ে গেছে। নয়তো, মা কি আর সহজে ছাড়তে চায মেয়েকে!

ভদ্রলোক উঠে ভিতরে গেলেন, বোধহয় পরামর্শ করলেন স্ত্রীব সঙ্গে, তাবপর বাইরে এসে বললেন, একবাব দেখাতে পাবেন মেয়েটাকে।

বহুৎ খুব, বলেন তো কালই নিয়ে আসতে পারি।

বেশ। তাই নিয়ে আসবেন।

সোজা মনোহবপ্রসাদ আনেয়ারীবাঈয়ের সঙ্গে দেখা করল। সব ঘটনা জানাল। পরের দিন সকালে মোতিকে নিয়ে যাবে তাও বলল।

মনোহরপ্রসাদ ভেবেছিল, সব ঠিকঠাক হলে আনোয়ারীবাঈ বোধহয় রাজি হবেন না। প্রাণ ধরে ছাড়তে পারবেন না মেয়েকে। কিন্তু আনোয়ারীবাঈ একটুও আপত্তি করলেন না। সামান্য বাধাও নয়। কেবল বললেন, লোক বেশ ভাল তো ভাইসায়েব? মোতির কোনও কষ্ট হবে না?

নিজেব পেটের মেয়ে হারিয়েছে, এখন যাকে নেবে, তাকে নিজের মেয়ের মতনই মানুষ করবে। আর তাছাড়া লোক খুব ভদ্র। খানদানি ঘরের ছেলে, শুনলাম লেখাপড়াও খুব জানে।

আনোয়ারীবাঈ আর কিছু বললেন না, কিন্তু পরের দিন মনোহরপ্রসাদ মোতিকে নিতে গিয়েই অবাক। দামি শালোয়ার, দোপাট্টা, পায়জামায় ঝলমল করছে মেয়ে। গলায় মুক্তোর মালা, কানে পান্নার দুল। পায়ে ভেলভেটের নাগরা।

সর্বনাশ, এই বুঝি অভাব অনটনে দিন কাটানো মেয়ের পোশাকের বহর!

কথাটা মনোহরপ্রসাদ বলল আনোয়ারীবাঈকে।

এত সব দামি জামা গয়না পরিয়েছেন কেন? গরিবের মেয়ে, এই কথাই তো জানানো হয়েছে।

তবে? এই এতক্ষণ পরে একটু যেন ছলছলিয়ে এল আনোয়ারীবাঈয়ের চোখ। ভিজে ভিজে গলা।

সব খুলে ফেলব?

মনোহরপ্রসাদ ভাবল দু-এক মিনিট, তারপর বলল, শালোয়ার পাজামা না হয় থাক, গয়নাগুলো খুলে নিতে হবে।

আনোয়ারীবাঈ এক এক ক'রে সব খুলে নিলেন। মেয়েকে সারারাত ধরে বুঝিয়েছেন। নতুন জায়গায় গিয়ে বেফাঁস যেন কিছু না বলে ফেলে, কান্নাকাটি না করে। বাইরে যাবেন আনোয়ারীবাঈ। তীর্থ-ধর্ম করতে। সেখানে ছোট ছেলেমেয়েদের যেতে নেই। ফিরে এসে মোতিকে তিনি নিয়ে আসবেন।

কার কাছে যাব মা। মোতি অবাক গলায় জিজ্ঞাসা করেছে।

তোমার কাকা-কাকির কাছে। দেখবে কত যত্ন কববে, ভালবাসবে, জিনিস কিনে দেবে।

মোতি আর কথা বলেনি। এখানে মায়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক কম। মাঝে মাঝে আনোয়ারীবাঈ শহরে যান মুজরো নিয়ে। খুব দূরে কোথাও নয়, ধারে কাছেই। কানপুর, বেরিলি, ফয়জাবাদ। সেই সময় মোতি থাকে বুড়ি ঝির কাছে। এখানে থাকলেও আনোয়াবীবাঈ ধারে কাছে ঘেঁষতে দেন না মেয়েকে। গান বাজনার আসরে এসে কাজ নেই। সারেঙ্গীর সুর আর তবলার বোলে শুধু সুর নয়, বিষও আছে, একবার নেশা ধরলে আর রক্ষা নেই।

মোতিকেনিয়ে যাবাব সময় ধাবে-কাছে আনোয়ারীবাঈকে দেখা গেল না। এদিক ওদিক চেয়েও মনোহরপ্রসাদ তাঁর খোঁজ পেলেন না।

ভদ্রলোকের নাম ব্রজবিলাস শকসেনা। আদি নিবাস মজঃফবপুর। বিলেতে ছিলেন বছর চারেক। স্ত্রী পর্দানসীন নন, কেবল আনকোরা শোক পেয়ে বাইরে বেরনো বন্ধ কবেছেন। মোতিকে দেখে ব্রজবিলাসবাবুর স্ত্রী পর্দা ঠেলে সদরে চলে এলেন। দু হাতে মোতিকে বুকেব মধ্যে জাপ্‌টে ধবে ভেঙে পড়লেন কান্নায। ব্রজবিলাসবাবু কাঁদলেন না বটে, কিন্তু তাঁব মুখ চোখের ভাবে মনে হল, মেয়ের শোকটা আবার নতুন করে যেন দেখা দিল।

মোতিকে তাঁরা ছাড়লেন না। কথা হ'ল মনোহরপ্রসাদ বিকেলে এসে মোতিকে নিয়ে যাবে, আবার পরের দিন সকালে মোতিব জামাকাপড় বিছানাপত্র যা আছে সবশুদ্ধ নিয়ে আসবে। সেই সঙ্গে মোতিকেও।

যাবার মুখে ব্রজবিলাসবাবু মনোহরপ্রসাদের কাছে এসে দাঁড়ালেন।

একটা কথা ছিল।

বলুন।

কিছু টাকা, ওর মাকে দিতে চাই। যদি আপনি নিয়ে যান সঙ্গে করে।

মনোহরপ্রসাদের দুহাত জোড় করল। বিনীত গলায় বলল, কসুর মাফ করবেন। টাকা নিতে ওর মা হয়তো রাজি হবেন না। তাহলে মেয়েকে বিক্রি করার সামিলই হবে। মেয়েকে মানুষ করে তুলুন আপনারা তাতেই উনি খুশি হবেন।

তারপর থেকে মেয়ের সঙ্গে আর আনোয়ারীবাঈয়ের দেখা হয়নি। দেখা হয়নি বটে, তবে খোঁজ-খবর পেয়েছেন মনোহরপ্রসাদের মারফত। বছর তিনেক পরেই ব্রজবিলাস বদলি হলেন মীরাট, সেখান থেকে দেরাদুন ছুঁয়ে গেলেন আগ্রা। সব জায়গা থেকেই চিঠিপত্রে যোগাযোগ রেখেছিলেন মনোহরপ্রসাদের সঙ্গে। চিঠিতে বেশির ভাগই মোতির কথা। মোতির মা যে বাঈজী ছিলেন, সেকথা মোতির কাছ থেকেই তাঁরা সংগ্রহ করেছেন, কিন্তু তাঁদের কোনও আক্ষেপ নেই। পিছন দিকে চাইতে আর তাঁরা রাজি নন। পুনর্জন্ম হয়েছে মোতির। আনোয়ারীবাঈয়ের মেয়ে নয় মোতি, এখন সে মোতিকুমারী শকসেনা, ব্রজবিলাস শকসেনা, সিনিয়র অফিসরের একমাত্র মেয়ে।

তারপর বছর কয়েক কোনও খবর নেই। পুরনো ঠিকানায় চিঠি দিয়েও মনোহরপ্রসাদ কোনও উত্তর পাননি। হঠাৎ চিঠি এল মজঃফরপুর থেকে। লিখেছেন মায়াবতী শকসেনা, ব্রজবিলাসের বিধবা স্ত্রী। সামনের মাসে মোতির বিয়ে, আর্মি অফিসর মোহনচাঁদ বর্মার সঙ্গে। তাঁর স্বামী হঠাৎই মারা গেছেন। অফিসের টেবিলে হার্টফেল করে। এই বিয়েতে মনোহরপ্রসাদ অনুগ্রহ করে যদি পায়ের ধুলো দেন তো সবাই কৃতার্থ বোধ করবে।

মনোহরপ্রসাদ যেতে পারেনি, কিন্তু আনোয়ারীবাঈকে পড়িয়ে শুনিয়েছিল সে চিঠি। তখন আনোয়ারীবাঈয়ের অবস্থা পড়তির মুখে। রোগে ধরেছে। লোকের আসা-যাওয়া অনেক কম। প্রায় খালিই পড়ে থাকে জলসাঘর। বাড়িভাড়াও কিছু কিছু বাকি পড়েছে। ভাবছেন সরে গিয়ে কোথাও আরও ছোট বাড়ি ভাড়া করবেন। চকের আরও ভিতরের দিকে।

সেদিন বাক্স হাতড়ে একটা মুক্তোর মালা বের করেছিলেন আনোয়ারীবাঈ। ঝুটো নয়, খাঁটি মুক্তো। বোম্বাইয়ের আমির মকবুল আলির উপহার। খুব বড় বড় জায়গায় যেতে আসতে আনোয়ারীবাঈ গলায় দিতেন। মোতির বিয়েতে সেটাই পাঠিয়ে দিলেন।

বিয়েতে মনোহরপ্রসাদ যায়নি, কিন্তু দিন পাঁচেক পরে বিয়ের বিস্তারিত বিবরণ পড়েছিল খবরের কাগজের পাতায়। খুব ধুমধাম। দু হাজারের ওপর মাননীয় অতিথি। জাঁদরেল সব অভ্যাগতের লিস্ট। সে খবরও মনোহরপ্রসাদ আনোয়ারীবাঈকে শুনিয়েছিল। আজকাল কী যে হয়েছে আনোয়ারীবাঈয়ের। বোধহয় বয়স হয়েছে বলেই, একটুতেই জল জমা হয় চোখের কোণে। দুটো ঠোঁট থরথরিয়ে কাঁপে, আর ঠিক বুকের বাঁ পাশে অসহ্য যন্ত্রণা। নিশ্বাস ফেলতেও কষ্ট হয়।

আনোয়ারীবাঈ বিড় বিড় করে বললেন, একবার মোতিকে বড় দেখতে ইচ্ছা করে। দূর থেকে একটু দেখে আসা।

মনোহরপ্রসাদ এ কথার কোনও উত্তর দেয়নি। অবশ্য মায়াবতী শকসেনাকে চিঠিপত্র লিখে মোতির সঙ্গে যোগাযোগ হয়তো করা যায়, কিন্তু মেয়ে সুখী হয়েছে ভাল ঘরে, ভাল বরে পড়েছে, এই তো যথেষ্ট। চোখে দেখতে যাওয়া মানেই তো মায়া বাড়ানো। আরও কষ্ট পাওয়া।

মনোহরপ্রসাদ লাঠিতে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে গিয়েছিল।

তারপর কয়েক বছর আর কোনও খোঁজ-খবর নেই। কোনও চিঠিপত্রও দেননি মায়াবতী শকসেনা।

মাঝে মাঝে দেখা হলেই আনোয়ারীবাঈ বলেছেন, আর কটা দিনই বা বাঁচব, যাবার আগে বড্ড দেখতে ইচ্ছা করেছে মোতিকে।

মনোহরপ্রসাদ আমল দেয়নি। বলা যায় না মেয়েমানুষের মন। এমনিতে আনোয়ারীবাঈ খুব শক্ত, বাইরে কাঠিন্যের দুর্ভেদ্য আবরণ, কিন্তু চোখের সামনে নিজের মেয়েকে দেখতে পেলে, সে নির্মোক হয়তো খসে পড়বে। কেঁদে ফেলবেন আনোয়ারীবাঈ। অযথা একটা গোলমালের সৃষ্টি। আর্মি অফিসর মোহনচাঁদ বিরক্ত হবেন। এ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য হওয়াও বিচিত্র নয়।

হঠাৎ সকালে খবরের কাগজটা ওল্টাতে ওল্টাতে মনোহরপ্রসাদের চোখে পড়ে গেল। বার বার পড়ল খবরটা, কাগজটা চোখের কাছ বরাবর নিয়ে, তারপরই খবরটা নিয়ে গেল আনোয়ারীবাঈয়ের কাছে।

মেজর মোহনচাঁদ বর্মা জলন্ধর থেকে বদলি হয়েছেন লক্ষ্ণৌ। সামনের সোমবার থেকে নতুন জায়গার কার্যভার গ্রহণ করবেন।

আনোয়ারীবাঈ এগিয়ে এসে একেবারে মনোহরপ্রসাদের দুটো হাত জড়িয়ে ধরলেন।

আমি মোতিকে দেখব। চুপচাপ দেখে চলে আসব। ওর বাড়ির রাস্তায় বসে থাকব, ও বাইরে বেরোবার সময় একবার শুধু চোখের দেখা দেখব। ভাইসায়েব, এইটুকু উপকার আমার করতেই হবে। আমি বুঝতে পারছি, আর আমি বেশিদিন নেই।

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আনোয়ারীবাঈ ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন।

আচ্ছা দেখি। মনোহরপ্রসাদ হাত ছাড়িয়ে বাইরে চলে এল।

বাইরে চলে এল বটে, কিন্তু কথাটা ভুলল না। বিকেলের দিকে টাঙ্গায় চড়ে হাজির হল বাদশাবাগে। বেশি ঘুরতে হল না। রাস্তার ওপরেই খাসা ঝকঝকে দুতলা। বোগেনভিলার গেট, নিচু পাঁচিল আইভি-জড়ানো। রাস্তা থেকেই পুরো লন নজরে আসে। বাহারে গাছের ছিটে দেওয়া মখমল নরম লন।

এগিয়ে গিয়ে তকমা-আঁটা দারোয়ানের সঙ্গেও মনোহরপ্রসাদ আলাপ জমিয়ে ফেলল। মেহ্‌মান আদমি, ঘুরে ঘুরে দেখছে সারা শহর। চমৎকার বাড়ি। যেমন বাড়ি তেমনি বাগান। ভাগ্যবান মালিকটি কে?

মালিক আডভানি সায়েব, দারোয়ানের ভাগ্যে এমন শ্রোতা সচরাচর জোটে না, টুলে বসে আয়েস করে আস্তে আস্তে বলতে শুরু করল, উপস্থিত ভাড়া নিয়েছেন মেজর বর্মা। নতুন এসেছেন এখানে। সামনের রবিবার খানাপিনা আছে। শহরের জাঁদরেল লোকদের আমন্ত্রণ। এখানকার সমাজে পরিচিত হতে চান মেজর সায়েব।

বটে, মনোহরপ্রসাদ কল্পিত বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলল, খানাপিনা হবে কোথায়? কার্লটন হোটেলে?

উহু, হোটেলে কেন, সায়েব এই লনে বন্দোবস্ত করতে বলেছেন। বাইরের লনই তো ভাল।

দরোয়ান বিজ্ঞের মতন ঘাড় নাড়ল।

তা তো নিশ্চয়। সঙ্গে সঙ্গে সায় দিল মনোহরপ্রসাদ, তারপর একটু থেমে বলল, বিবিজী নেই বাড়িতে, না সায়েব একা।

হ্যাঁ, বিবিজী আছেন বৈকি! জিনিস কিনতে হজরতগঞ্জ গেছেন। বিবিজীই তো সব। তিনি ঘোরান, সায়েব ঘোরেন।

দরোয়ানের গলা পরিহাস তরল। মনোহরপ্রসাদ আর কথা বাড়াল না। ধন্যবাদ জানিয়ে টাঙ্গায় এসে উঠল।

ওই কথাই ঠিক হল। সন্ধ্যার ঝোঁকে মনোহরপ্রসাদ টাঙ্গা নিয়ে আসবে। আনোয়ারীবাঈ সঙ্গে যাবেন। নিচু পাঁচিল, রাস্তা থেকে দেখার কোনও অসুবিধা নেই। আর তেমন হলে বেড়ার কাছ ঘেঁষে দাঁড়ালেই চলবে। দরোয়ানের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, ভিতরে না ঢুকতে দিতে পারে, বেড়ার বাইরে দাঁড়ালে আপত্তি করবে না। খানাপিনার ব্যাপার যখন, লনে আলোর বন্দোবস্ত নিশ্চয় থাকবে। আনোয়ারীবাঈয়ের দেখতে কোনও অসুবিধা হবে না। ঠিক চিনতে পারবেন আত্মজাকে। চোখ ভরেই শুধু নয়, মন ভরেও দেখতে পাবেন।

টাঙ্গায় উঠেই আনোয়ারীবাঈ অস্বস্তি বোধ করলেন। বুকের বাঁ দিকে তীব্র ব্যথা। টনটন করে উঠল চোখের দুটো পাতা।

কী হল, কষ্ট হচ্ছে? মনোহরপ্রসাদ আনোয়ারীবাঈয়ের দিকে ঝুঁকে পড়ল।

না, ঘাড় নাড়লেন আনোয়ারীবাঈ, কোনও কষ্ট হচ্ছে না। কেবল বুকের ভিতর অসহ্য দাপাদাপি। এত বছর পরে মেয়েকে দেখতে পাবেন, যে মেয়েকে দু হাত দিয়ে সরিয়ে দিয়েছেন পঙ্কিল পরিবেশ থেকে, বাঈজীর ঘৃণ্য জীবন থেকে উন্নীত করেছেন গৃহস্থ-বধূর পর্যায়ে। তাই বুঝি হৃদয় অধৈর্য হয়ে পড়ছে, অপেক্ষা করতে মন সরছে না।

টাঙ্গা যখন গিয়ে পৌঁছল, তখন অতিথি-অভ্যাগতেরা সবাই এসে গিয়েছেন। জোর বাতির নীচে ঝলমলে রঙিন পোশাকের সার। এতদূর থেকেও প্রসাধনের উগ্র গন্ধ পাওয়া গেল, মদির সুবাস। কিছু কিছু লোককে মনোহরপ্রসাদ চিনতে পারল, শহরের সম্ভ্রান্ত পরিবার।

আমিনাবাদের রিটায়ার্ড জজ কেশরী সুকুল থেকে শুরু করে নবাবের বংশধর আমিনউদ্দিন। সেরা ব্যবসায়ী মিস্টার মোডির পাশাপাশি ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজার হেনরি উড। তাদের সঙ্গে রয়েছেন আত্মীয়া আর বান্ধবীর দল। কলরবে জায়গাটা সরগরম। মাঝখানে মেজর বর্মাকে দেখা গেল। ঘুরে ঘুরে তদারক করছেন, মাঝে মাঝে চোখ ঘোরাচ্ছেন বাড়ির দিকে স্ত্রীর আসায় প্রত্যাশায়।

দারোয়ানই বলল, মেমসায়েব এখনও নামেননি, বোধ হয় সাজছেন।

আনোয়ারীবাঈ একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন গাড়ি-বাবান্দার দিকে। ঐখান দিয়েই তো মোতি আসবে। আনোয়ারীবাঈয়ের আত্মজা, তাঁরই রক্ত-মাংসে গড়ে তোলা স্বতন্ত্র সত্তা।

হঠাৎ আলোড়ন উঠল অতিথিদের মধ্যে। সবাই দাঁড়িয়ে উঠলেন। মেজর বর্মা এগিয়ে এলেন দু-এক পা।

পাতলা ফিনফিনে-ব্লাউজ—কটি উদঘাটিনী, হালকা সবুজ রংয়ের আরও পাতলা শাড়ি। অন্তর্বাস দিনের আলোর মতন স্পষ্ট। আঁকা ভ্রু, ঠোঁটে কৃত্রিম লালিমা, দু-গালে রুজের রক্তিম আমেজ, সুর্মাটানা দুটি চোখকে আয়ত করার দুর্লভ প্রচেষ্টা, চুড়ো-বাঁধা কটা চুলের রাশ।

চেয়ে চেয়ে দেখলেন আনোয়ারীবাঈ। সেদিনের সে মেয়েটির সামান্যতম পরিচয়ও নেই মিসেস বর্মার মধ্যে। শান্ত সুন্দর মেযেটা কী মন্ত্রে রূপান্তরিত হল আজকেব এই উৎকট বিলাসিনীতে। যে পোশাক পরে আনোয়ারীবাঈ কোনও অতিথির সামনে আসতেও লজ্জা পেতেন, কী করে মোতি হাজার অতিথিব মাঝখানে এসে দাঁড়াল সেই পোশাকে!

মিসেস বর্মাকে নিযে যেন লোফালুফি শুরু হল। অপূর্ব ভঙ্গিতে মোতি এক টেবিল থেকে অন্য টেবিলে সরে সরে যেতে লাগল। কোথাও কোনও পুরুষের চটুল উক্তিতে নিচু হয়ে তার গালে আলতো করাঘাত করে বলল, Naughty boy, আবাব কোথাও কোনও পুরুষের বাটনহোল থেকে গোলাপ তুলে নিয়ে নিজের কববীতে গাঁথল। কাবও টেবিলে বসে হেসে গড়িয়ে পড়ল অতিথির গায়ের ওপর, লিপস্টিক-রক্তিম ঠোঁট দুটো ফাঁক করে মোহিনী হাসি উপহাব দিয়ে আবার সরে গেল অন্য টেবিলে।

মনোহরপ্রসাদের টনক নড়ল আচমকা মণিবন্ধে টান পড়তে। হাত দিয়ে মুখ ঢেকে আনোয়ারীবাঈ কান্নায় ভেঙে পড়ছেন। থর থর করে কাঁপছে গোটা শরীর।

টাঙ্গা অপেক্ষা করছিল, আর দেরি করল না মনোহরপ্রসাদ। সাবধানে আনোয়ারীবাঈকে ধরে গাড়িতে নিয়ে এল। কী ভাগিস, জোর ব্যাণ্ড শুরু হয়েছে লনে, আনোয়ারীবাঈয়ের উচ্ছ্বসিত কান্নার আওয়াজ কারও কানে যায়নি।

কী হয়েছে আপনার? শরীর খারাপ লাগছে? মনোহরপ্রসাদ উদ্বিগ্ন গলায় প্রশ্ন করল।

এতদিন পরে নিজের মেয়েকে চোখের সামনে দেখলে কষ্ট হওয়া তো খুবই স্বাভাবিক। এরজন্যই আনতে চায়নি আনোয়ারীবাঈকে।

না, না, শরীর আমার খুব ভাল আছে। কিন্তু কী হল ভাইসায়েব! বাঈজীর মেয়ে বাঈজীই হয়ে রইল! ছেলেবেলা থেকে কাছ ছাড়া করেও রক্তের দোষ ছাড়াতে পারলাম না। পোশাক-আশাক, রং-ঢং, চালচলন—এ সবে চকের রাস্তায় দাঁড়ানো বাঈজীদেরও যে হার মানাল! এ কী হল ভাইসাব, এ আমার কী হল!

দু-হাতে মুখ ঢেকে আনোয়ারীবাঈ কান্নায় ভেঙে পড়লেন।